

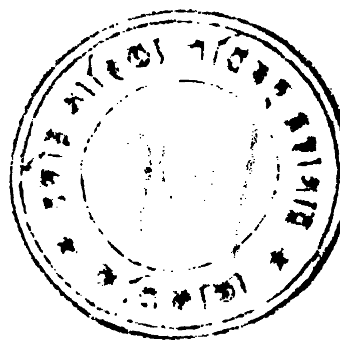
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৬

Class No.
বর্গ সংখ্যা 050

Book No.
স্থানাঙ্ক অলকা. [১ বর্ষ







ভাল ব্লক ও ভাল ছাপার জন্য

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

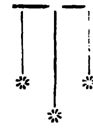
Phone : B. B. 3962 ৭২-১ কলেজ ষ্ট্রীট; কলিকাতা 'Gram : "Mezzotint"

বাসন্তী কটন মিলস লিমিটেড

সকলেই বলেন— বাঙ্গালীর

সবচেয়ে সেরা— নিজস্ব

বাসন্তী-কাপড়



পূজায়

সব জায়গায় পাবেন

মিল পানিহাটি

৩নং লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা

ফোন—কলি ৩২১৬

টেলিফোন—
"বড়বাজার ৯০"

টেলিগ্রাম—
"গিনিহাউস"

বি, সরকার এণ্ড সন্স

"গিনি হাউস"

B.S.

লিমিটেড

১৩১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের ব্রাঞ্চ দোকান নাই কিম্বা আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।
জগদ্ব্যাপী অর্থ সঙ্কট প্রযুক্ত আমাদের সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
যে কোন প্রকার পুরাতন সোনা বা রূপা বাজার দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া নূতন [illegible] দেওয়া হয়।

'অলকা'র নূতন কার্য্যালয়

হিমালয় হাউস

১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ

কলিকাতা

সুরগীতি
গ্রামোফোনের
সুরের মায়া লক্ষ পরাণে-
জাগায় আনন্দ-শিহরণ!
সুরগীতি গ্রামোফোন প্রডাক্টস্
২৭৯ বি, সেন্ট্রাল এভিনিউ
(বিডন ষ্ট্রীট মোড়) কলিকাতা

সূচী

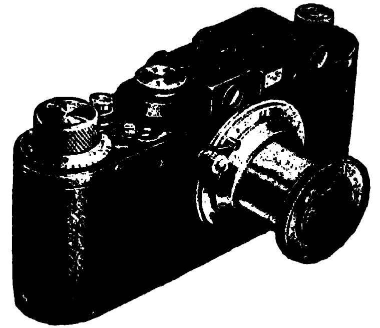
চৈত্র ১৩৪৫



Manufactured By THE LILY BISCUIT Co. CALCUTTA.

ক্যামেরা ?

- লাইকা
- রোলিফ্লেক্স
- বল্‌ডিনা
- ব্রিলিয়াণ্ট



ইত্যাদি সকল প্রকার ক্যামেরা
এবং
সর্ব্বপ্রকার ফিল্ম, প্লেট, পেপার,
ফোটো কেমিক্যাল ইত্যাদি

ডেভেলপিং এবং প্রিন্টিং
আমাদের নিকট
পরীক্ষা করিয়া দেখুন—
খুসী হইবেন।

আমাদের দোকানে ন্যায্য মুল্যে সকল সময় পাইবেন।
একবার দোকানে আসুন কিম্বা তালিকার জন্য পত্র লিখুন ॥

ফোটোগ্রাফিক্ ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি কোং লিঃ

১৫৪, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ঃঃ ঃঃ কলিকাতা



GOVERNMENT PRODUCTS.

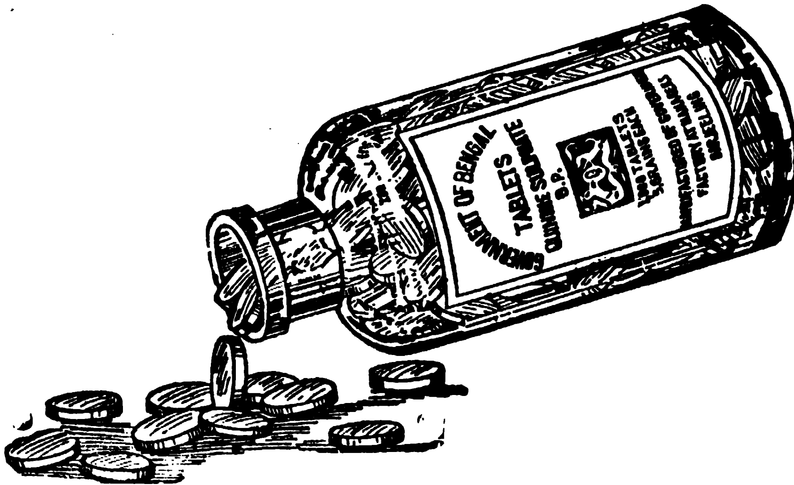
বাংলা গভর্ণমেণ্টের

কুইনাইন

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

সহর ও মফঃস্বলের সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।



জয়েণ্ট এজেণ্টস্‌—

শা, ওয়ালেস এণ্ড কোং

পোষ্ট বক্স নং ৭০, কলিকাতা

চৌধুরী এণ্ড কোং

৪ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

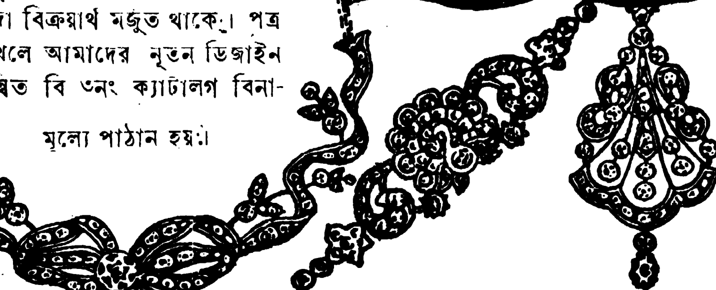
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অফ লেট

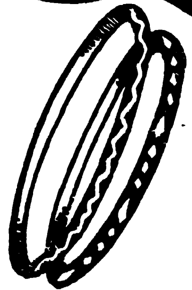
বি, সরকার

ফোন
বড়বাজার
১৭৬১

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ও
রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা







টেলিগ্রাম
ব্রিলিয়্যান্টস

১২৪-১২৪/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

MEGAPHONE RECORDS

এপ্রিল মাসের নূতন রেকর্ড

গণি মিঞা

J. N. G. 5359	ভরায় না দুনিয়াতে মুসলমান	ইস্‌লামী
	আমার চীন, আমার আরব	ঐ

ভবানীচরণ দাস

J. N. G. 5354	আজু পরভাতে দেখিনু	কীর্ত্তন
	নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি	ঐ

নুরউদ্‌দীন আমেদ

J. N. G. 5356	দেখে যারে মোর রসুলে	ইস্‌লামী
	মরুর পথে কে গো চলে যায়	ঐ

মিস্‌ কমলা (ঝরিয়া)

J. N. G. 5358	বিরহ মিলনেরই ডালা	মুলতান
	স্বপন ভেঙ্গো না	ঠুংরী

শ্রীযুত সতীশ সরকার

J. N. G. 5355	ত্রিনয়নী মা যে আমার	শ্যামাসঙ্গীত
	শ্যামানামে এত মধু	ঐ

অনন্তবালা বৈষ্ণবী

J. N. G. 5357	ললিতে সখি কই	ভাটিয়ালী
	মনের পিপাসায়	ঐ

মেগাফোন



কলিকাতা

অলকা

সচিত্র মাসিকপত্র

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

চৈত্র ১৩৪৫—ভাদ্র ১৩৪৬



সম্পাদক ঃ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

হিমালয় হাউস

১৫নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ

কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা চৌদ্দ আনা

অলকা

ষাণ্মাসিক সূচী

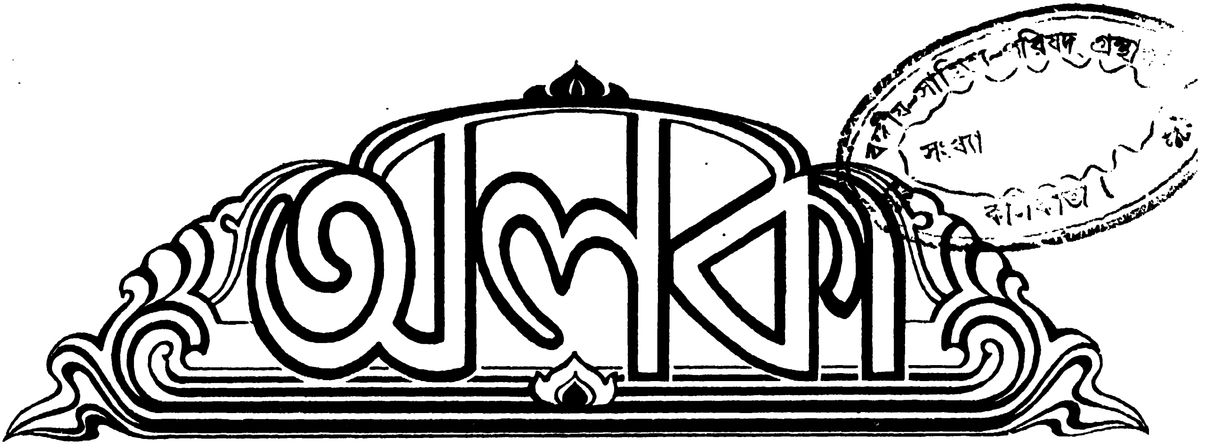
বিষয়-সূচী

লেখক-সূচী

চিত্র-সূচী



দোলা



প্রথম বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৫ | সপ্তম সংখ্যা

সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগর

বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিবেন, একটা বিস্ময়কর ব্যাপার তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধ হইতে ইংরেজ-সংস্রবের ফলে আমাদের রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও সমাজ-জীবনে চিরাচরিত ধারা অব্যাহত ছিল। সেকালের একান্ত ভারতীয় বহুবিধ সামাজিক বিলাস ও আচার-ব্যবহারকে হোমরা-চোমরা সাহেবেরা পর্য্যন্ত অনুকরণের মর্য্যাদা দিতেন; পূজাপার্ব্বণের উৎসবাদিতে পালকি-যানে যোগদান করিয়া সামাজিকভাবে আমাদের সহিত খাতির জমাইতেন; গড়গড়ায় তামাক খাইতেন, কালীঘাটে পূজা ও বাইজীদের প্যালা দিতেন। আমাদের সমাজের কুসংস্কার ও অনাচারকে ব্যঙ্গ করিয়া দেশে ফিরিয়া দুই এক জনে সচিত্র ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করিলেও, এদেশে সকলেই সেগুলিকে সম্মান করিয়া চলিতেন; সতীর প্রজ্জ্বলিত চিতার পাশে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ ইংরেজের কথাও শোনা গিয়াছে। প্রখর বণিক্‌বুদ্ধি তাঁহাদের অন্তরের বিরুদ্ধতাকে সম্ভবত চাপা দিয়া রাখিত। ব্যবসায়ে দোভাষীর প্রয়োজনে ইংরেজী শিক্ষা সে সময় ওয়ার্ড-বুক মারফৎ কণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, মনে প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, শিশুবিবাহ, অন্তর্জ্জলী, বিধবাপীড়ন, বহুবিবাহ প্রভৃতি নানা কুসংস্কার সত্ত্বেও ঋণ, জুয়া, বারবনিতা ও মদ্যের কল্যাণে ইংরেজ-বাঙালীর ঘনিষ্ঠতা জন্মিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে টমাস-কেরি প্রমুখ পাদরি-সাহেবদের আগমনে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে সুরু হইল। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাবৃদ্ধির উৎসাহে তাঁহারা নিষ্ঠুর ও বহু স্থলে কুৎসিত ভাষায় নানা সামাজিক বিচ্যুতি ও কুসংস্কারের দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের ধর্ম্ম ও দেবতাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইলেন; পাদরিদের অনুদারতায় পূর্ব্বেকার প্রীতির সম্পর্কটা ঘুচিয়া গেল। বাহির হইতে এই অপ্রত্যাশিত এবং রূঢ় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাঙালীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে অধিকতর রক্ষণশীল হইয়া উঠিল।



শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের সমাজে লজ্জাকর কুসংস্কার যে প্রচুর পরিমাণেই ছিল, এখন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কেবল বাহিরের চাপে ও প্ররোচনায় বাঙালী

এই সকল কুসংস্কারের উচ্ছেদ-সাধন করে নাই; বহুলপরিমাণে বহিঃপ্রভাব-নিরপেক্ষ ভাবেই, অন্তরে অন্তরে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া, দৃঢ়হস্তে প্রাচীন মজ্জাগত হেয় প্রথার বিরোধিতা করিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বঙ্গমাতার এই সংস্কারক সুসন্তানদের অনেকেই, বিশেষ করিয়া শ্রেষ্ঠ কয়েকজন, এই সংস্কার-আন্দোলনের জন্য ইংরেজী শিক্ষার অপেক্ষা রাখেন নাই; রাজধানীর নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাত-ঘরের সন্তানও তাঁহারা নহেন। শহর হইতে দূরে, নিভৃত আচারনিষ্ঠ পল্লীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাঁহাদের জন্ম। দীর্ঘকালের অভ্যাসে যে সকল সামাজিক নির্যাতন ও অনাচার আমরা বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিয়া চলিতেছিলাম, চিত্তের সহজাত ঔদার্য্যে



শ্রীঠাকুরদাসবন্দ্যোপাধ্যায়



ভগবতী দেবী

তাঁহারা সেগুলির উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই সংস্কারক-সম্প্রদায়ের শিরোমণি রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিতান্ত প্রাচীন দেশীয় প্রথায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী জীবনে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইহারা উভয়ে ইংরেজীনবিশ হইয়া উঠিলেও, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল ইহাদিগকে বলা চলে না। হিন্দু-কলেজে ডিরোজিও-রিচার্ডসনের কাছে পাঠ লইয়া "ইয়ং বেঙ্গল" নামে যে তরুণ-সম্প্রদায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সমাজসংস্কার-ব্যাপারে তাঁহারাও এই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার-কার্য্য মূলত ভিতরের তাগিদেই হইয়াছিল, বাহিরের চাপে হয় নাই। বাংলা দেশের তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিলে, ইহাতে বিস্ময়বোধ না করিয়া পারা যায় না।

এই বিস্ময়ের মধ্যে পরমবিস্ময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার। রামমোহন অপেক্ষাকৃত

ধনিগৃহের সন্তান। আরবী-ফারসী শিক্ষার সাহায্যে ইসলামী একেশ্বরবাদের আদর্শ বাল্যকালে তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; ঈশ্বরচন্দ্র এ ধরণের কোনও আবেষ্টনীর মধ্যে বড় হইয়া উঠেন নাই। গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজের গোঁড়া আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ হইয়াছিলেন; যে পিতামাতাকে তিনি আজীবন প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন, বাহির হইতে দেখিতে গেলে তাঁহারা নিতান্তই সাধারণ গতানুগতিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বিদ্রোহ করিবার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না।

তথাপি তিনি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহের বীজ তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল, পারিপার্শ্বিকতার সহিত তাহার কোনও অনিবার্য্য যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই



বিদ্যাসাগর-বাটী, কলিকাতা

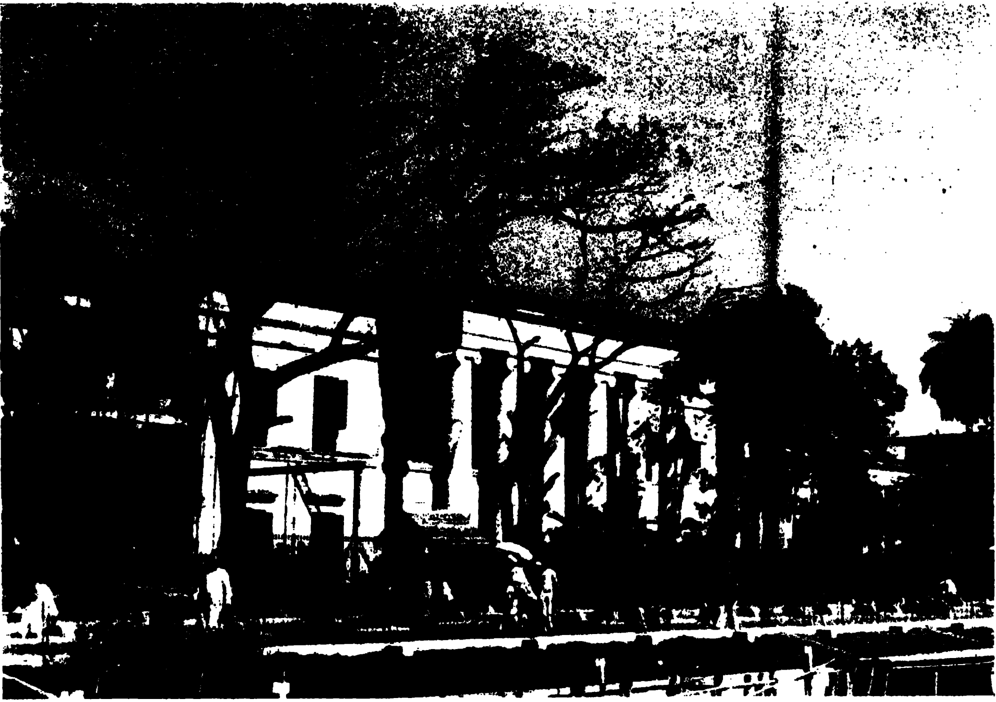
কারণে অনেকে বিদ্যাসাগর-চরিত্রকে অবাঙালীসুলভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বীয় অন্তরের আবেগে বিপুল প্রাণশক্তিবলে তিনি একাকী কঠোর সংগ্রাম করিয়া সকল ক্ষেত্রেই জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনীগুলিতে সেই অপূর্ব্ব সংগ্রামের বিচিত্র ইতিহাস পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন। তাঁহার জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন—

> ...ভারতের সুপবিত্র ক্ষেত্রে অনেক মহাযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, ঋষিরা কতশতবার বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভারতীয় সম্রাট্গণ বহুবার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের এই মৃতপ্রায় অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অভ্যুদিত হইয়া সমগ্র ভারতব্যাপী যে মহা আন্দোলনপূর্ণ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা কোথাও মিলে না।...দরিদ্রের গৃহে, পর্ণকুটীরে ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, লোকে তাহা ভুলিতে পারে, দরিদ্র ঠাকুরদাস

বহুকষ্টে তাঁহাকে লালনপালন করিয়াছিলেন, লোকে তাহা ভুলিতে পারে, বিদ্যালয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়া বিদ্যাসাগর উপাধি পাইয়া সংস্কৃত কালেজ হইতে বহির্গত হন, লোকে তাহাও ভুলিতে পারে, লোকে একথাও ভুলিতে পারে যে, তিনি নিজের স্বাধীন প্রকৃতির অধীন হইয়া পরাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে ঘৃণা করিতেন বলিয়া ৫০০৲ টাকা বেতনের কর্ম্মটী অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে কর্ম্মত্যাগ হইতে বিরত করিতে ছোটলাটের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধও ফলপ্রদ হয় নাই, বাঙ্গালাসাহিত্যের সজীবতা ও শ্রী সম্পাদনে তিনি যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও লোকে ভুলিতে পারে, তিনি যে দুঃখিজনের দুঃখ মোচনে, আর্ত্ত ও বিপন্নজনের সহায়তায় সদা ব্যস্ত থাকিতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণও জনসমাজ ভুলিতে পারে, কিন্তু ভারতে হিন্দু বিধবার বিবাহ প্রচলন ভারতবাসী কোন দিন ভুলিতে পারিবে না।...এই বিধবাবিবাহবিষয়ক আন্দোলনে তিনি জনসমাজসমক্ষে প্রকৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার শরীরে কত শক্তি ছিল, তাঁহার মনের বল কত অপরিমেয় ছিল, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং এতাদৃশ জটিল সামাজিক প্রশ্ন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও তাঁহার রণনৈপুণ্য কতদূর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছে, তাহা চিরদিনই ভাবী বংশের গবেষণার বিষয় ও চিরগৌরবস্থল হইয়া থাকিবে।—'বিদ্যাসাগর', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২১৯-২০।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশে এবং বঙ্গের বাহিরেও দুই এক স্থানে বিধবাবিবাহের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যত একটিও বিবাহ ঘটিতে পারে নাই। এই কঠিন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে ঈশ্বরচন্দ্রের মত অদম্য কর্ম্মশক্তি-সম্পন্ন সাধকের প্রয়োজন ছিল। এই কার্য্যে তাঁহার আত্মনিয়োগের নানা কারণ তাঁহার জীবনীকারেরা প্রদর্শন করিয়াছেন, অনেক গল্পও সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়া আমরা এই মাত্র দেখিতে পাই, এদেশের নারীজাতির অসংখ্য দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং সামাজিক নির্যাতন বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে বিচলিত করিত; বস্তুত তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল, এদেশীয় নারীদের দুর্দ্দশা-মোচন। তিনি জীবনে যত কিছু সংস্কার-কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই নারীজাতিকে কেন্দ্র করিয়া। বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই, তিনি স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'য় "বাল্যবিবাহের দোষ" কীর্ত্তন করিতেছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে যে ঝঞ্ঝার আলোড়ন দেখা দিল, তাহা অবর্ণনীয়। বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত (ইঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমর্থক ছিলেন) গোপনে এবং প্রকাশ্যে, সভা-সমিতিতে বক্তৃতায় অথবা প্রতিবাদ-পুস্তক প্রণয়ন প্রকাশ ও বিতরণের দ্বারা তাঁহার বিরোধিতা করিলেন। ফলে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই তিনি 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশ করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি ৪ অক্টোবর তারিখে নিজের ও অপরাপর এক হাজার ব্যক্তির সহি দিয়া ভারত-গভর্মেণ্টের নিকট এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ আবেদনপত্র পেশ করিলেন; এই আবেদনের সঙ্গে বিধবাবিবাহ-আইনের একটি খসড়াও সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নবেম্বর

তারিখে গভর্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য জে. পি. গ্রাণ্ট কর্তৃক বিলের খসড়াটি কাউন্সিলে উত্থাপিত হয়, সার্ জেম্‌স কল্‌ভিল ইহার সমর্থন করেন। ১৮৫৬ সালের ৯ জানুয়ারি খসড়াটি দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হয়; সভা একটি নির্ব্বাচিত সমিতির হস্তে বিচারের ভার অর্পণ করেন; নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া সমিতি গঠিত হয়—সার্ জেম্‌স কল্‌ভিল, মিঃ এলিয়ট, মিঃ পি. ডব্লিউ. লিগেট ও মিঃ জে. পি. গ্রাণ্ট। এদিকে এই আইনের বিরুদ্ধবাদী দলও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে তাঁহারা ছত্রিশ হাজার সাত শত তেষট্টি জনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি পালটা আবেদনপত্র ১৭ মার্চ তারিখে সরকারে দাখিল করিলেন। ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নদীয়া, বাঁশবেড়িয়া



কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

প্রভৃতি স্থান হইতেও এই ধরণের আবেদন আসে; সর্ব্বসমেত প্রায় চল্লিশটি দরখাস্তে পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার ব্যক্তি খসড়ার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; পক্ষে ছিল প্রায় পঁচিশটি আবেদনপত্রে পাঁচ হাজার স্বাক্ষর। নির্ব্বাচিত সমিতি কিন্তু প্রতিবাদীদের বিপক্ষে অর্থাৎ খসড়া সমর্থন করিয়া ৩১ মে ১৮৫৬ তাঁহাদের মন্তব্য দাখিল করেন; ১৯ জুলাই খসড়ার পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হইবার পর ২৬ জুলাই তারিখে গভর্নর-জেনারেলের সম্মতিক্রমে উহা আইনে পরিণত হয়। আইনটি Act XV of 1856, being an Act to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu Widows নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

> ...১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই



কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে স্থাপিত বিদ্যাসাগরের মর্ম্মরমূর্ত্তি

দেখিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রানুসারে বিধবাবিবাহের বৈধতা লইয়া যে বিচার চলিতেছিল তাহা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। রাজবিধি-প্রণয়নের চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্য্যতঃ বিধবাবিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, মহিলাগোষ্ঠীতে এই কথা চলিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—এই গানাঙ্কিত কাপড় বাহির করিল। এমন কি বিদ্যাসাগরের প্রাণের উপরেও লোকে হাত দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল।—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ'—২য় সংস্করণ, পৃ. ২১২-১৩।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

···বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।···আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখে বিদ্যাসাগর আর বিধবাবিবাহ।···বিধবাবিবাহের আন্দোলনের তরঙ্গ-তুফানে ভাসিয়া বিখ্যাত গায়ক দাশু রায় "বিধবা-বিবাহ" বিষয়ে এক পালা পাঁচালি প্রস্তুত করেন। নানা স্থানে বিধবাবিবাহের গানও সেকালে হইত। এতদ্ভিন্ন বিধবা-বিবাহ নাটকও রচিত হইয়া কলিকাতায় সে কালের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল।—'বিদ্যাসাগর,' ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৫৫।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

···সে আন্দোলন বাত্যাবিক্ষোভিত বারিধিবৎ সমগ্র বঙ্গভূমি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, স্ত্রী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলের মুখে দিবারাত্র এতৎসম্বন্ধে অবিরাম জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। হিন্দুর গৃহে প্রকৃতই একটা বিস্ময়-বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। পক্ষে বিপক্ষে কত রকম ছড়া, গান রচিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পথে, ঘাটে, মাঠে, সর্ব্বত্রই নানারূপ গান গীত হইত। গাড়োয়ানেরা গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে, কৃষক লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে, তাঁতি তাঁত বুনিতে বুনিতে গান গাহিত। শান্তিপুরে বিদ্যাসাগর-পেড়ে নামক এক রকম কাপড় উঠিয়াছিল। তাহার পাড়ে এই গান লেখা ছিল—

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম,
মনের সুখে থাক্‌ব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে॥" *

—'বিদ্যাসাগর', চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ২৯৬-৭।

* এই গানটির একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পাঠ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে' (৩য় সংস্করণ, ১২২ পৃষ্ঠা) মুদ্রিত হইয়াছে।

তদানীন্তন প্রসিদ্ধ সাময়িকপত্র 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কয়েকটি কবিতায় বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যে সোরগোল পড়িয়াছিল, তাহার নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছিলেন। কবিতাগুলি তখন লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের

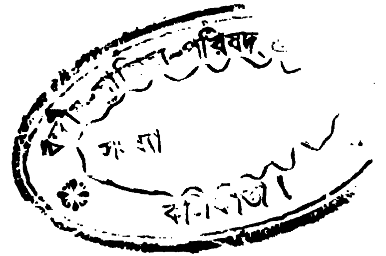


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



দীনময়ী দেবী

ব্যাপকতা বুঝাইবার জন্য কবিতাগুলি অংশত উদ্ধৃত করিতেছি—সমসাময়িক ইতিহাস হিসাবে এগুলির মূল্য আছে।



বিধবাবিবাহ

বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল॥
* * *
একদলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া॥
লাফালাফি, দাপাদাপি, করিতেছে যত।
দুই দলে থাপা থাপি, ছাপা ছাপি কত॥
* * *
"পরাশর" প্রমাণেতে, বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এযে দেখি, সাগরের ঢেউ॥
* * *

যেখানে সেখানে শুনি, এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে, রাজি আছে সব ॥

সকলেই এইরূপ, বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন, বুড়ী নাহি তরে ॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা ?
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাই পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সংবাপ', মায়ের কল্যাণে ?

বিধবাবিবাহ আইন

গ্রাণ্ট করি, গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল, কাল বিল করিলেন পাস।
না হইতে শাস্ত্রমতে, বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন, আইন আদেশ ॥

*　　*　　*

করিছে আমার ধর্ম্ম, আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে, কেন দেন কর ?

সকলেই তুড়ি মারে, বুঝেনাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ ॥
সাগর যদ্যপি করে, সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ॥

১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটিল; বিধবাবিবাহের বিপক্ষদল রটনা করিতে লাগিল যে, বিধবাবিবাহ-আইন পাস করাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ১২৬৪ সালের "বর্ষবিদায়" লিখিতে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিলেন—

শত শত সধবার।　　শাঁখা খাড়ু নাহি আর ॥
পতিহীন হোয়ে সবে।　　কাঁদিতেছে হাহারবে ॥
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই।　　কিসে বাঁচি ভাবি তাই ॥
বিদ্যাসাগর্ নাহি তথা।　　কে কবে বিয়ের কথা ?
বিয়ে হোলে বেঁচে যেতো।　　সাধ পূরে খেতে পেতো ॥
গহনা উঠিত গায়।　　এড়াতো সকল দায় ॥
কি করে কপাল পোড়া।　　বিধাতা নষ্টের গোড়া ॥
যায় সব যমপুরে।　　সাগর অনেক দূরে ॥

*　　*　　*　　*

বিধবায় পতি পায়। আবার কি শুনি তায়॥
অনুকূলা নন কালী। সে গুড়ে বা পড়ে বালি॥
বিলাতের অভিপ্রায়। আইন বা উঠে যায়॥
ওরে কাল দুরাচার। তোর এই অত্যাচার॥
প্রথমে আইন্ খুলে। ফের্ তাহা দিস তুলে॥
সাগর ডাগর হোয়ে। নাগর নাগরী লোয়ে॥
দেখায়ে নূতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে॥
সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়? ফিরে যাবে সমুদয়?

এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা ভাবে বাধাগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়াছিলেন সত্য, তদানীন্তন অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ সমর্থনও করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা বিশেষভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, দুর্গামোহন দাস, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতিও এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। প্রথম বিধবাবিবাহ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়াস্ স্ট্রীটস্থ বাড়িতে সম্পন্ন হয়। পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়া যাঁহারা তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও কম নয়। আজিকার দিনে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পুস্তিকার নামের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত গঙ্গাধর কবিরাজ তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তকে দেখা যাইতেছে, তিনি নিম্নলিখিত কয়েকজন পণ্ডিতের মত খণ্ডন করিয়াছেন, সুতরাং ইঁহাদের সকলেই সে সময় বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়া থাকিবেন।—

আগড়পাড়া-নিবাসী মহেশচন্দ্র চূড়ামণি। কোন্নগর-নিবাসী দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। কাশীপুর-নিবাসী শশিজীবন তর্করত্ন ও জানকীজীবন ন্যায়রত্ন। আরিয়াদহ-নিবাসী শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। পুটিয়া-নিবাসী ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সয়দাবাদ-নিবাসী গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন, রামগোপাল তর্কালঙ্কার, মাধবরাম ন্যায়রত্ন ও রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার। জনাই-নিবাসী জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন। আন্দুলীয় রাজসভার সভাপতি রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত। ভবানীপুর-নিবাসী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি ও হারাধন কবিরাজ। ভাটপাড়া-নিবাসী রামদয়াল তর্করত্ন। শ্রীরামপুর-নিবাসী কালিদাস মৈত্র। মুরশিদাবাদ-নিবাসী রামধন বিদ্যাবাগীশ।

এতদ্ব্যতীত মেদিনীপুরের ভুবনেশ্বর মিত্র, যশোহর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষে জনমেজয় ঘটক, হুগলীর শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ (উমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত), কলিকাতার রামচন্দ্র মৈত্রেয় প্রভৃতিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রতিবাদগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অমিততেজশালী নিজের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সকল প্রতিবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, বিধবাবিবাহের বৈধতা সম্পর্কে তাঁহার ধারণা এক চুল পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তিনি যে শুধু দুইটি প্রস্তাব লিখিয়া ও আইন পাস করাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নয়, এই

কার্য্যে স্বীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় ও সাহায্য করিয়া সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণভারগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ তারিখে খানাকুলকৃষ্ণনগর-নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সহিত একমাত্র পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়া সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই বিবাহ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার সহোদর ও জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

> ...আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমনস্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্র সমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম।...বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্ব প্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি; সে বিবেচনায় কুটুম্ব-বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা।...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ইহাই শেষ কথা। এই ঐকান্তিকতার অপরাধে তিনি যেরূপ লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়াছিলেন, কোনও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য কোন বাঙালীকে কখনও সেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ



শ্মশানে বিদ্যাসাগর

করিতে হয় নাই। ইহার পরেও তিনি বহুবিবাহ-নিরোধ-আন্দোলনে যোগদান করিতে ইতস্তত করেন নাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক

বিচার' এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে উহারই 'দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশিত হয়। আইন প্রবর্ত্তনের দ্বারা এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি না ঘটিলেও ইহা লইয়া বাদানুবাদ কম হয় নাই। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রও এই প্রসঙ্গে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন।

সেকালের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে বাচনিক সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিলেও প্রতিপক্ষের সহিত মসীযুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ একক ছিলেন; তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের পুস্তক ও পুস্তিকা যে কত প্রকাশিত হইয়াছিল, আজ তাহার সংখ্যা করা যায় না। এগুলিতে নানা বিচিত্র যুক্তি এবং ব্যক্তিগত আক্রমণও ছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বেনামীতেও লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার গুরুগম্ভীর প্রমাণ ও যুক্তিমূলক ভাষার সহিত অর্থাৎ বিদ্যাসাগরী ভাষার সহিত পরিচিত, এই সকল হাল্কা ব্যঙ্গরচনা দৃষ্টে তাঁহারা বিস্মিত হইবেন। তিনি যে অপরিপুষ্ট বাংলা গদ্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী, তাঁহার এই সব্যসাচী মূর্ত্তি দেখিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তাঁহার জীবনীকারেরা এই সকল বেনামী পুস্তিকা প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়াছেন; বিহারীলাল সরকার নিজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ আন্দোলন সামাজিক সঙ্কীর্ণতাবশত সমর্থন করিতে পারেন নাই, সুতরাং এই সকল হাল্কা ব্যঙ্গরচনা তাঁহার উপর আরোপ করার বিপক্ষে যুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু অন্তর্লীন প্রমাণ এবং সমসাময়িক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন প্রবীন ব্যক্তির স্মৃতিকথার সাহায্যে এগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই বেনামী পুস্তিকাগুলির নাম যথাক্রমে, 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'বিনয়পত্রিকা' ও 'রত্নপরীক্ষা'। এই পুস্তিকাগুলির প্রত্যেকটিই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্ব "সংস্কৃত যন্ত্রে" মুদ্রিত হইয়াছিল, বিরাম ও ছেদচিহ্নাদি সম্পূর্ণ তাঁহার অনুরূপ। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

> …বহুবিবাহের সময় প্রাচীন হইয়াও তিনি সেই রসিকতা বিস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ব্রজবিলাস', 'রত্ন-পরীক্ষা', 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' [অর্থাৎ 'অতি অল্প হইল' ও 'আবার অতি অল্প হইল'] এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাসার অবতরণ করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ।…এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, …যাহারা বিষয়ী লোক…তাঁহারা বিদ্যাসাগরের এই রসিকতায় আমোদ পাইবেন না।…এই সকল গ্রন্থ রচনা করা বিদ্যাসাগরের একপ্রকার কচুবনে মুক্তা ছড়ান হইয়াছে…।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম ভাগ, পৃ. ২১৩-১৪।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে'র ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন। বিহারীলাল সরকার তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের ২৮৫ পৃষ্ঠায় (৪র্থ সংস্করণ) লিখিয়াছেন—

> …বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বাবু আমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত সমুদায় পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাহার মধ্যে রত্নপরীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি।…

'বিনয়পত্রিকা'ও ঐ সঙ্গে ছিল। বহিঃপ্রমাণ ছাড়াও, যাঁহারা এই পুস্তিকাগুলি পড়িবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালে অপর কেহ তাঁহাকে লইয়া

পুস্তিকান্তর্গত লঘু উক্তিগুলি করিতে পারিতেন না। * বিধবাবিবাহে বিরুদ্ধবাদী অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন অনেকে মনে করেন, তাঁহার মত পণ্ডিত এবং গম্ভীর ব্যক্তি বেনামীতে এই ধরণের হীন আক্রমণ করিতে পারেন না। এই অনুমান তাঁহাদের একদেশদর্শিতার ফল; বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌতুকমাত্র করিয়াছেন, হীনতা প্রদর্শন করেন নাই। ইহার সমর্থনে 'পুরাতন-প্রসঙ্গে' কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তি দ্রষ্টব্য।

বিধবাবিবাহ সমর্থকদলের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় প্রস্তাবে (দ্বিতীয়) পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নাম করিয়াছেন। 'বহুবিবাহ' ব্যাপারে

বিদ্যাসাগরের বাংলা হস্তলিপি

Awarded
to Jogindra Chunder Bose,
at the close of his brilliant
Career as a Student
in the Metropolitan Institution
Iswarchandra Sarmah
8th January 1875

ইংরেজী হস্তলিপি

এই তারানাথ তর্কবাচস্পতিই তাঁহার বিরোধিতা করেন। 'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল'; তাঁহারই প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর। ইহারও উত্তরে "কস্যচিৎ উচিতবাদিনঃ" নাম দিয়া কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি 'প্রেরিত তেঁতুল' নামে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। 'এডুকেশন গেজেটে' "কুলীন-কামিনীর উক্তি"ও এই ব্যপদেশে লিখিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং ইংরেজীনবিশ বন্ধুদের সাহায্যে 'বিধবাবিবাহ' সংক্রান্ত পুস্তক দুইখানির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া *Marriage of Hindu Widows* নামে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। 'বহুবিবাহে'র অনুবাদও তিনি সুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সমাপ্ত হয় নাই।

---

* যথা—"এক গণ্ডা এক মাস অতীত হইল, বিদ্যাসাগর বাবুজি, অতি বিদকুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া, পড়িয়া লেজ নাড়িতেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই।"—'ব্রজবিলাস,' ২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ৩। "হতভাগা বেটার [বিদ্যাসাগরের] বিষয়বুদ্ধি বড় কম; এমন কি, নাই বলিলেও, বোধ হয়, অন্যায় বলা হয় না।"—ঐ, পৃ. ৪১-৪২। এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ৬৪ বৎসর, তাঁহাকে প্রকাশ্যে "হতভাগা বেটা" বলিতে পারে, এরূপ সাহস বাংলা দেশের কাহারও হয় নাই।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধে সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

…বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়? ইহা তিনি বুঝিতেন না, এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল, এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরে করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটীভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন।—'চরিত কথা', ৫ম সংস্করণ, পৃ. ১৬-১৭।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের যে "heart of a Bengali mother"-সমন্বিত করুণার্দ্র মূর্ত্তির সহিত সাধারণ বাঙালী পরিচিত, সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইবেন। তিনি বৃহৎ সমাজের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে একা সংগ্রাম করিয়াছেন, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া উদ্দেশ্য-সাধনে তৎপরতা দেখাইয়াছেন, লোকাচারকে অথবা ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতিকে গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু এই রুদ্রমূর্ত্তির অন্তরালে সতীর লাঞ্ছনা ছিল। বাঙালী নারীর প্রতি অসীম সহানুভূতি ছিল বলিয়াই বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

…বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন।

সেই "সুদূর নির্জ্জনে" এখন পর্য্যন্ত কোনও বাঙালীই তাঁহার নাগাল পান নাই।

[এই প্রবন্ধের ব্লকগুলি মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির সৌজন্যে প্রাপ্ত]

পিরামিড

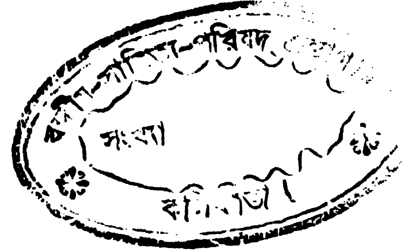
শ্রীঅমূল্যরতন ভট্টাচার্য্য

নির্জ্জন ঘন গভীর অন্ধকার,
সে অন্ধকার প্রলয়ে নিমজ্জিত ;
যক্ষের মত মৃতেরে লুকায়ে বুকে
প্রহর যাপিছে মিশরের পিরামিড।
পাষাণ তাহার গিরি-গহ্বরতলে,—
যেখানে কখনো পশে নি সূর্য্যতারা,—
সমাধি-নিম্নে ঘুমায় যাহারা আজো,
সেই ক্ষণিকা ও চলন্তিকার দলে,—
আমার মনের অসীম শূন্যে যারা
উদিল সহসা, লুকাল আচম্বিতে,
যাহাদের কথা অতীতের যাদুঘরে
শুধুই ভ্রষ্ট তারকার ইতিহাস,
তাহাদের সাথে আজো
তুমিও ঘুমাও হে মোর কৈশোরিকা !

মনে পড়ে সেই শ্যামল উপত্যকা,
তার মাঝে তুমি বালিকা স্রোতস্বিনী,
সেদিন প্রথম উৎসের মুখে তব,
তরুণ অশথ আমি, কিশলয় মেলি
ভালবেসে তব বক্ষে কাঁপানু ছায়া,—
আপনারে হেরি আপনি সে শিহরিনু,—
সে ছায়ারে তুমি রেখেছিলে কি গো মনে ?

কত সন্ধ্যায় শুনেছি স্বপ্নে একা,
কূলে কূলে তব জেগেছে কলধ্বনি ;
আমার পাতার ঘন আবরণ টুটি
ঝিকমিক করে গোধূলির আলোছায়া।
মুখে মনে হ'ল কি যেন বলিতে চাহ।
কত না নিশীথে নীরব অন্ধকারে

সারারাত তুমি আমারে ঘিরিয়া, সখি,
বাজালে তোমার চরণের মঞ্জীর ;
খেয়াল হ'ল না মম।
বুঝি নাই সেই নুপূর-ছন্দে তুমি
কি কথা আমারে জানাইলে ইঙ্গিতে।
সময় তোমার বৃথা গেল বান্ধবী ;
সেদিন তোমার অপেক্ষা সহে নাকো,
ফিরে গেলে তুমি দারুণ নিরাশ্বাসে।



সেদিনের সেই অতি-সুকুমার দেহ,
সরসীর জলে মৃণাল আন্দোলিত,—
বক্ষের তীরে বসন-অন্তরালে
রক্ষিত ছিল যুগল ম্যাগ্‌নোলিয়া।
সে কিশোরী রূপ, সে রূপ চিরন্তনী,
সে আজো তেমনি আছে।

* * *

চ'লে গেল বহুদিন—
সে যে কতদিন সে কথা স্মরণ নাহি।
তোমার আমার সৌরজগত-মাঝে
অসীম কালের প্রগাঢ় অন্ধকার,
কারো দিগন্তে নাহিকো কাহারো ছায়া।
কত দিগ্‌দেশ করিনু পরিক্রম,
অসীম শূন্যে উল্কার বেগে, সখি,
ছুটিয়া ফিরিনু, জানি না কাহার পানে !
সে গতি-বেগের ঘূর্ণাবর্ত্ত-মাঝে
তোমার কাহিনী নিঃশেষে মুছে গেল।

তবু মাঝে মাঝে দূর হতে শুনিয়াছি—
অমাবস্যায় কালাবদরের বুকে
গুমরি গুমরি কাঁদিতেছে বোবা ঢেউ,
দূরে—বহুদূরে কে যেন শ্মশানে কাঁদে !

বহুকাল পরে পুনরায় হ'ল দেখা।
কিন্তু তোমার একি দীনারূপ, রাণি !

জীবন-পণ্যে মাঝ-দরিয়ার মাঝে
মগ্নশৈলে হয়েছে নৌকাডুবি,—
মৃত অতীতের বিধবা ফিরিয়া এলে !
রুক্ষ আজিকে তোমার সিঁথির পরে
জীবনের শেষ ধৌত শ্মশান-চিতা !

আমার জীবনে স্বপ্নের দিন আজো,
সম্মুখে তার এখনো হোলির দিন,
বাস্তবে তাহা হতে না হতেই সুরু
তুমি ফিরে এলে নিঃস্ব-রিক্তা বেশে !
মাঝ-সাগরেতে করেছ নৌকাডুবি ।
সেই সাগরের বারি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তোমা হেলায় ফেলিয়া গেছে
কঙ্করময় এ লবণ-সৈকতে ।

সম্মুখে তব নিঃসীম মরুভূমি
দিগন্তসীমা লেহন করিছে রোষে,
জ্বলিছে মরুর শুষ্ক বালুকারাশি
ধিকি-ধিকি দাহ তুষের আগুন-সম ।
তড়িৎ-জিহ্ব লেলিহ অগ্নিশিখা,
আগুনে গঠিত সরীসৃপের মত,
পদতল বেড়ি পাকাইছে কুণ্ডলী,—
একি এ অগ্নিপরীক্ষা তব, সীতা,
একি অভিনব কৃচ্ছ্র সাধনা তব !

সম্মুখে তুমি ছিন্নমস্তা-সমা
আপনার হাতে আপনার শির ছেদি
তপ্ত রুধির করিতে রহিবে পান,—
সম্মুখে মূঢ়, ভয়ার্ত্ত, অসহায়
আমি শুধু আজ নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
চাহিয়া রয়েছি তব বিভূতির পানে ।

করিবার কিছু নাই—
তোমার বেদনা আমি কি বুঝিব আজি !
এ অনুভূতির বিলাসমাত্র শুধু ।—
আমাদের মাঝে যুগ যুগ ব্যবধান ।

মা

শ্রীবিনয় ঘোষ

সামান্য ভুল অনেক সময় চেষ্টা ক'রেও সারাজীবনে ভোলা যায়।

প্রতিদিনের হট্টগোলে সেই ভুলের নিষ্ঠুর স্মৃতি মনের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন আমোদের কোন আসরে, না হয় নিষুতি রাতে কোন স্বপ্নে সেই স্মৃতির ঘুম ভেঙে যায়। বিকটাকার দৈত্যের মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সে সামনে এসে দাঁড়ায়। সোজা সেই মূর্ত্তির দিকে তাকাবার ক্ষমতা বোধ করি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অপরাধীরও নেই।

লোকচক্ষুর সামনে এই সব অন্যায়কে উড়িয়ে দেবার জন্যে মানুষ কত তর্কই না করে— এ আর এমন কি ? এর চেয়ে কত গুরুতর অপরাধ অসংখ্যবার দিনের মধ্যে ঘটছে ! কিন্তু এ মিথ্যে সান্ত্বনা। এই আত্মপ্রতারণা সম্বন্ধে সে সর্ব্বদাই সচেতন।

আমি কখনও অন্যায় করি নি, আমি নিরপরাধী।

প্রতারক ! খানা-টেবিলে ব'সে তোমার প্রিয়জনের সঙ্গে খেতে খেতে রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর কোন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকের দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তুমি ফিরে চাও নি কোনদিন ? ড্রেনের পাশে উচ্ছিষ্ট জড়ো ক'রে বুভুক্ষু পাগল যখন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে তোমার দিকে লাল চোখ দুটো তুলে জিভ বার ক'রে হাত বাড়িয়েছে, তখন তুমি হাল্কা কথার হাসিতে তাকে উপেক্ষা কর নি ? চোর ভাল। খুনীকে একশোবার ক্ষমা করা যায়। কিন্তু তোমাকে ক্ষমা করবে কে ?

* * *

মা বললেন, বাবা, মুখ অন্ধকার ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে কি করবি বল, তাই না হয় কর, শহরে গিয়েই দেখ না হয়, যদি হাতের কাজকর্ম্ম শিখতে পারিস।

দুদিন পরে যথাসময়ে শুভলগ্নে জীবনের জয়যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লাম। পথ চলতে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম, মা খিড়কির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন।

* * *

গ্রামের রিক্ততায় দারিদ্র্যের যে মৌনগম্ভীর রূপ দেখেছি এতদিন, আজ শহরের মাঝখানে দেখলাম তার মুখর জীবন্ত শ্রী। পল্লীর ধ্যানমগ্ন যোগীকে শহরের মসৃণ রাজপথের ওপর সদম্ভে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু ললাটে তুলে আগ্নেয় ভাষায় অভিসম্পাত করতে আজ এই প্রথম দেখলাম।

সন্ধ্যার কিছু আগে স্টেশন থেকে নেমে শহরের পথ ধ'রে চলেছি। জনাকীর্ণ পথে নানারকম যানবাহনের ভিড়। কিছুদূর যেতেই দেখলাম, এক জায়গায় একটি বিরাট জনতা, প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে লাল পতাকা। শুনলাম, কুলীদের সভা হ'চ্ছে। মাঝে মাঝে সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠছে, তাদের ভাষা প্রথমে বুঝতে পারি নি।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে প্রশস্ত রাজপথের এক পাশে দেখলাম ছোট্ট একটু জনতা। ভিড়ের ভেতর থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, চকচকে গোলাপী রঙের প্রায় দশ ফিট লম্বা একখানা

মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটু দূরে কাঠের একটি দ্বিচক্রযান দলা পাকিয়ে প'ড়ে রয়েছে। মোটরের চাকার পাশে ময়লা কাপড় পরা, ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে একটি লোক হাত পা সিঁটকে শুয়ে আছে। কয়েকজন পথিক ভদ্রলোক তার মাথায় মুখে জল দিচ্ছেন।

পরে শুনলাম, ঐ দলা-পাকানো দ্বিচক্রযানটির নাম রিক্‌শ এবং এই শ্রেণীর মানুষ যারা এর ভেতরে যাত্রী বসিয়ে টেনে নিয়ে বেড়ায়, তাদের বলে রিক্‌শওয়ালা।

মাথার ওপরে কি একটা অদ্ভুত জীব গোঁ গোঁ ক'রে উঠল। চেয়ে দেখি, বহুদূরে সাদা বকের মত ডানা মেলে কি যেন উড়ে চলেছে আর একটু একটু ধোঁয়া ছাড়ছে।

কিছুদূর যেতে যেতে পাশে কচি গলার গান শুনতে পেলাম। ফিরে দেখি, একজন অর্দ্ধনগ্ন স্ত্রীলোকের কাঁকে একটি শিশু, পিঠে পুঁটলিতে আর একটি ঝুলছে, আর তাকে ঘিরে আরও চারটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সমস্বরে গান ক'রে ভিক্ষা করছে।

ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিলাম, গলার স্বর ক্ষীণ হ'লেও বেশ মিষ্টি লাগছিল গান। পিছন দিকে কি একটা জোরে ক্যাঁচ ক'রে শব্দ হতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আশপাশে চেয়ে দেখছি, এমন সময় কোটপ্যান্ট পরা লম্বা একজন বাবু মুখে একটা বাঁকানো নল দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সামনে এসে কি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বকাবকি ক'রে আমার গালে সজোরে এক চড় মেরে আঙুল দিয়ে ফুটপাথ দেখিয়ে দিলেন। তাঁর আঙুলের আংটির পাথরটি রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোয় প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে পড়ল। তারপর তিনি মোটরে উঠে সোজা চ'লে গেলেন।

এই আমার শহরে আসার প্রথম দিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছু নেই। প্রথম দিনের অনভ্যস্ত দৃষ্টি দিয়ে শহরের যে মূর্ত্তি আমি দেখেছিলাম, আজও সেই মূর্ত্তি আমার মনে নিখুঁতভাবে আঁকা রয়েছে।

* * *

প্রায় মাস তিনেক পরে মাকে চিঠি লিখলাম—

"তুমি শহরে আসতে বলেছিলে, এসেছি। পথে পথে অনেক ঘুরেছি, অনেক চেষ্টা করেছি, কিছুই করতে পারি নি। আমার ভাল লাগে না। আবার তোমার কাছে গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। এখানে থাকি বস্তিতে। বস্তি কি, তুমি বোধ হয় জান না। এখানকার বস্তির তুলনায়, মা, তোমার কুঁড়েঘরও রাজার বাড়ি। হুসেনদের মুর্গীর খোপের মত বস্তির ঘরগুলো। এইরকম একটা ঘরে আমরা চারজন থাকি। একজন গাড়ি টানে, একজন মোটরের মিস্ত্রী, আমি আর একজন নতুন এসেছে।"

গ্রামে ফেরা আর হয়ে ওঠে নি। তারপর তিন বছর কেটে গেল, কিন্তু গ্রামে ফেরা হ'ল না। এখন আমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এক লোহার কারখানাতে কাজ করি, সাপ্তাহিক বেতন দু টাকা সাড়ে ন আনা।

অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আমরা সকলে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়িয়ে হাতুড়ি পিটি। বড় বড় উত্তপ্ত লাল লৌহখণ্ড মাথার ওপরে আশেপাশে চলাফেরা করে। আগুনের তাতে গায়ের চামড়া পুড়ে ঝলসে যায়। হাপরের মত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আমরা সকলে শ্বাসপ্রশ্বাস টানি।

আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার কোন মাধুর্য্য নেই। যেমন বৈচিত্র্যহীন, তেমনই একঘেয়ে এই জীবন।

তিন বছর পরে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে তিন দিনের অবসর পেলাম গ্রামে ফেরবার।

* * *

তিন বছর পরে গ্রামে ফিরলাম। আমাদের ঘরখানা ছিল জনমানবহীন পল্লীর এক কোণে। কতকগুলো ঘুণ-ধরা বাঁশ আর মাটির ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই আমাদের নিজের বলতে ছিল না। চালে খড় নেই, মাটির দেওয়াল ধ'সে গেছে, পাশের পুকুরটাও কচুরিপানা আর শ্যাওলাদামে ভরা। বাড়ির চারদিকে বনজঙ্গল।

মরুভূমির মত ফসলক্ষেত ধূ ধূ করে চারিদিকে। মাঠ আছে, ফসল নেই। মাঠে মাঠে আজ তৃষ্ণায় আতুর মাটি কাঁদে, আর ভাঙা লাঙলের মাথায় ব'সে চাষারা কাঁদে। পাথরমাটির বুক চিরে চিরে লাঙল গেছে ভেঙে।

নিরিবিলি ভাল লাগলেও ঘরে ফিরে বিরক্তিপূর্ণ মনে দিন কাটাতাম আমি। আমার সব সময়ই মনে হ'ত, দারিদ্র্য যেন আমাদের হাড়-সার বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছে, ঘুমের ঘোরে বোবায় ধরার মত।

প্রথম রাতে ঘরেই শুয়ে রইলাম। ঘুম আসে, আবার ঘুম ভেঙে যায়। যতবার ঘুম ভাঙে, চোখ মেলে দেখি, মা বিছানা ছেড়ে উঠে ব'সে আছেন। ঘরের ভেতর ভীষণ অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই, তারাও নেই। নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে মার সাদা ফ্যাকাশে মুখখানা আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম শুয়ে শুয়ে। কান পেতে চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। ঘুমের ঘোরে আমি যাকে শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ব'লে মনে করছিলাম, তা চাপা কান্নার গোঙানি। চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে দেখছিলাম মার সেই ফ্যাকাশে মুখখানা, আর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম সেই চাপা কান্নার শব্দ।

ঘরের ভেতর একা একা জেগে ব'সে মা কাঁদছে, বাইরে অন্ধকারের ভেতর মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মাটি।

* * *

পরদিন সকালে ঘরামী লাগিয়ে মণ্ডপের চাল ছেয়ে নিলাম। সেইখানে সময় কাটাবার জন্যে পিঁড়েতে খড় বিছিয়ে চাটাই পেতে নিলাম। প্রায় সব সময়ই আমি এখানে শুয়ে ব'সে নিজের টুকি-টাকি কাজকর্ম্ম করতাম। সামনের বনজঙ্গল, মাঠ, বিল, দূরের গাছপালা, আর গ্রামের চালাঘরের মধ্যে বহুদিন পরে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের যেন আজ খুঁজে পেলাম। প্রতিবেশের রিক্ততার মাঝখান থেকে নিজের মনকে আমি মুক্তি দিতে চেষ্টা করতাম উন্মুক্ত প্রান্তরের আলোবাতাসের মাঝখানে। এই তিন দিন আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে ভুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারি নি, ব্যর্থ হয়েছি।

এই কদিনই শুধু মনে হয়েছিল, কল্পনার কৃপণতা পাশবিকতার ইন্ধন যুগিয়ে থাকে।

অসুস্থ শরীরে সারাদিন অনাহারে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার আগে মার কাছে ক্ষিধের কথা

বলতে মা আমার দিকে একবার মুখ তুলে করুণভাবে চাইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। বিরক্ত হয়ে কোন কথা না ব'লে আমি চ'লে এলাম। মার ওপর আদৌ সন্তুষ্ট হই নি।

মণ্ডপে গিয়ে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে চুপ ক'রে শুয়ে রইলাম। কিছুই ভাল লাগছিল না। কিছুক্ষণ পরে কার মৃদু পায়ের শব্দ কানে এল, ফিরে দেখি, মা অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আসছেন। হাতে একটা গেলাস থেকে ধোঁয়া উঠছে।

মার সেদিনকার অত সুন্দর ও স্বর্গীয় মূর্ত্তি আমি আজও ভুলতে পারি নি। অস্তগামী সূর্য্যের লাল আলো এসে পড়েছে মার মুখের ওপর, মা যেন রক্তমাংসের মানুষ নন ব'লে মনে হ'ল। মার মুখে শিশুর মত সরল হাসি, চোখে সস্নেহ দৃষ্টি, যেন আমাকে অপ্রত্যাশিত কোন উপহার দিয়ে বিস্মিত করতে চান।

মার দিকে ফিরে আমি খুব রুক্ষভাবে বললাম, নিরিবিলিতে আমাকে একটু শুয়ে থাকতেও দেবে না?

তারপর মার দিকে আমি আর ফিরে চাই নি। মা ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঝন ঝন ক'রে শব্দ হতে দেখলাম, পিঁড়ের ওপর গেলাসটা প'ড়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলাম, মা আমার জন্যে গেলাসে ক'রে গরম দুধ এনেছিলেন।

যেখানে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান নেই, সেখানে গরম দুধ কোথা থেকে এল, সে প্রশ্ন সেদিন মনে জাগে নি।

গভীর রাত্রে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ঘরের ভেতর চুপিসারে ঢুকে দেখি, মা ঠিক তেমনিভাবেই ব'সে ব'সে কাঁদছেন। আজও তিনি ঘুমোন নি।

পরদিন আমাকে ফিরতে হবে, ফিরে এলাম। মার সঙ্গে কোন কথা কইবার সুযোগ হয় নি।

* * *

শহরে ফিরে আসার প্রায় ছ মাস পরে শুনলাম, ওলাউঠায় গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। গ্রামের প্রান্তে আমার ভাঙা কুঁড়েঘর রাত্রের অন্ধকারে প্রেতপুরীর কঙ্কালমূর্ত্তির মত প'ড়ে রয়েছে। মা নেই।

* * *

ছ বছর পরের কথা।

কারখানার সর্ব্বগ্রাসী আগুনের চুল্লী শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত শুষে নিয়েছে। ভেতরে শুধু খানকয়েক ফাঁপা হাড়ের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে আমি ও আমার সহকর্ম্মীরা শহরের অলিগলিতে ছায়ার মত ঘুরে-ফিরে বেড়াই। শ্রমশ্রান্ত জীবনের অবসন্ন রাত্রি একটির পর একটি প্রভাত হয়—পাণ্ডুর প্রভাত। সারাদিনের পর কারখানার ছুটি হ'লে ভারাক্রান্ত পেশী শিথিল করবার উদ্দেশ্যে মদের দোকানে যাই।

এখন আমি পশু। হিংস্র বর্ব্বর পশুপ্রবৃত্তি আমার চোখে-মুখে, চলাফেরায়, হাবভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই নির্লজ্জ নির্ম্মম পাশবিকতাই এখন আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

সাপ্তাহিক বেতন সমস্ত নিঃশেষ ক'রে দিয়ে একদিন শুঁড়ির দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম পথে। সেদিন কিছু খাওয়া হয় নি। সন্ধ্যা হয়েছে। বুকে পেটে যেন দাবানল জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে।

গলির দুপাশে সারি সারি টিনের ঘর। ঘরের বাসিন্দারা সকলে পসারিণী, পণ্য তাদের হাটের মাছ, মাঠের সব্জি বা রঙিন কাচের চুড়ি নয়, বাসী দেহের মাংসস্তূপ। শহরে এদের সঙ্গে হয় আমার শেষ পরিচয়।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাবেষ্টিত যেন কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রেতপুরীর মধ্যে এরা সকলে বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে—পূজারিণীর দল। লেলিহান হোমানলের মধ্যে আমাদের বিবর্ণ শোণিতের আহুতি দিচ্ছে মহানন্দে।

একজন স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে আমার হাত ধ'রে বললে, আমার ঘরে এস। গায়ে তার উগ্র গন্ধ। মুখমণ্ডল বর্ষণশেষের ভাঙা মেঘের মত কুঞ্চিত।

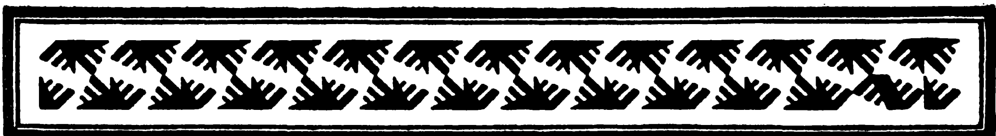
আমাকে সে তার ঘরে নিয়ে গেল ডেকে। অনাহূত আমন্ত্রণে প্রলুব্ধ হয়ে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত পিছু পিছু তার ঘরে গেলাম। পেটের দিকে হাত দেখিয়ে বললাম, কিছু খেতে দেবে ?

একটু হেসে চোখ দুটো তুলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বোধ হয় ভাবলে, আমি বিদ্রূপ করছি।

কিছুক্ষণ পরে সে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে, হাতে একটা গেলাস, মুখে মুচকি-হাসি। অস্পষ্ট দৃষ্টিপথে অসংখ্য অশরীরী স্মৃতির কালো কালো মূর্ত্তি কিলবিল ক'রে উঠল। মনে হ'ল, তীরবেগে আমি যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি।

আমি ভীষণ জোরে চীৎকার ক'রে উঠলাম। কিছুক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হতে চেয়ে দেখি, ঘরে ভিড়, হল্লা চলছে। চারিদিক থেকে একটা কথাই শুধু কানে ভেসে এল, সকলে বলছে, আমি নাকি খুব মাতাল হয়েছি।

মাতাল হ'লেও দেখলাম, আমার আকস্মিক চীৎকারে স্ত্রীলোকটির হাত থেকে গেলাসটি মেঝের ওপর প'ড়ে গুঁড়িয়ে গেছে, আর তার চারিদিকে যা ছড়িয়ে রয়েছে তা গরম দুধ নয়, উগ্রগন্ধি মদ।



নীরব প্রেম

(Oscar Wilde's—'Silentium Amoris'
কবিতার অনুবাদ)

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

জ্যোতিষ্মান তপনের আকস্মিক আবির্ভাবে যথা
বিবর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ যাত্রাপথে থমকি দাঁড়ায়,
সরমে শ্রীহীন তনু অন্ধকারে মিলাইতে চায়,
চকিত চকোরকণ্ঠে থামে গান, স্তব্ধ হয় কথা ;
তেমনি ও রূপ তব নিরখিলে নয়নের আগে
অধরে সরে না বাণী, কণ্ঠে মোর গান নাহি জাগে।

প্রভাত-সমীর যথা পার হয়ে কানন কান্তার
নিভৃত পল্লীর প্রান্তে পরিচিত বেণুবনে আসি
প্রত্যহ প্রভাতী সুরে যে বেণুতে বাজাইত বাঁশী
অসহ চুম্বনে কভু চূর্ণ করে সে বাঁশরী তার ;
দুঃসহ আপন বেগে সমুদ্বেল প্রেম মোর তথা
মৌন রহে মোহবশে, মুখে তার নাহি সরে কথা।

বোঝ নি কি আজো তুমি, নয়নের নীরব ভাষায়
প্রেম মোর মৌন কেন, বাঁশী কেন নাহি গাহে গান ?
না যদি বুঝিয়া থাক, হেথা তবে হোক অবসান
আমাদের মিলনের ; তার কাছে যাও তুমি হায়,
যে তোমা তুষিবে গানে। স্মৃতি তার থাক মোর তরে
যে গান হয় নি গাওয়া, যে চুম্বন ছোঁয় নি অধরে।

"জানি ফিরিবে না আর—"

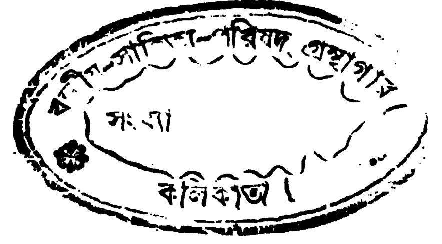
শ্রীমতী নলিনী সেন

জানি ফিরিবে না আর। তবু জানি মনে,
ক্ষণিক মিলনে নয় পেয়েছি তোমারে
সমস্ত জীবন ভরি—সমগ্র ভুবনে
যাহা হারাবার নয় জন্ম জন্ম পারে।

মনে জাগে স্বপ্নসম, আসিলে দুয়ারে
সেদিন ফাল্গুনী রাতে ; পূর্ণিমার আলো
স্বপন রচিয়াছিল ধরার আঁধারে,
দেখিনু ললাটে দীপ্তি, আঁখি দুটি কালো।

তন্দ্রা-বিজড়িত মৃদু বিহগ-কূজন,
ভেসে আসা পথিকের বাঁশরীর তান,
মাধবীর গন্ধ-ভারে মন্থর পবন
বিহ্বল করিয়াছিল দুটি মুগ্ধ প্রাণ।

নীরবে দাঁড়ালে তুমি ধরি হাতখানি,
প্রথম পরশ-সুখে স্তব্ধ হ'ল ভাষা,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছিল অফুরান বাণী,
হেরিনু ভুবন ভরি শুধু ভালবাসা !
প্রভাত-আলোকসম বন্ধনবিহীন,
সে প্রেম-স্বপন হোক চির-অমলিন।



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার
সংখ্যা
কলিকাতা

রবীন্দ্র-পরিচয়

(দ্বিতীয় দফা)

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

সেকালের আশ্রম-শান্তিনিকেতনের—যে যুগে মিস্টার এল. কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট তৎকালীন জঙ্গলা-কীর্ণ শ্রীনিকেতনে কয়েকজন বাঙালী যুবকদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত পন্থায় গ্রাম-সংগঠনের প্রাথমিক কাজ সুরু করেছিলেন, তখন ছেলেদের স্বাবলম্বী করার শিক্ষাদান ব্যাপারে যে প্রাত্যহিক কর্ম্মসূচি প্রস্তুত হয়েছিল, তার মধ্যে একটা দুঃসাধ্য কাজ ছিল—মলমূত্রাদির জন্য ট্রেঞ্চ ব্যবহার করা। গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত সেকেলে ধরণে অস্বাস্থ্যকর প্রথায় মলমূত্রত্যাগের রীতি পরিত্যাগ ক'রে ট্রেঞ্চ ব্যবহারের রীতি অভ্যাস করা আপাতদৃষ্টিতে সহজ ব'লে মনে হ'লেও, বাস্তবিকপক্ষে ঐসব যুবক এবং শিক্ষকদের পক্ষে এ কাজ তত সহজ হয় নি। ট্রেঞ্চ ব্যবহার করাকে অমর্য্যাদার বিষয় ব'লে যাতে গণ্য করা না হয়, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর ব্যবহৃত পথ দেখিয়েছেন দিনের পর দিন। রবীন্দ্রনাথের সকলের সঙ্গে মিশে এ কাজ করা সম্ভব—এ কথা অনেকেরই জানা ছিল না। সেদিন অর্থাৎ গত ৮ই পৌষে, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক সভায় সভাপতির বক্তৃতায় মিস্টার এল্‌ম্‌হার্স্ট সে কথা সভায় সকলকে বলেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব আরও বলেন যে, কবি রবীন্দ্রনাথ সে সময় তাঁর কর্ম্ম-পদ্ধতির ভেতর দিয়ে সকলকে এইটেই বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, দরিদ্রের পক্ষেই নিজের সব কাজ নিজে করাটাই কর্ত্তব্য তা নয়, সমাজে বাস করতে গেলে সমাজের কল্যাণ-বিধানের জন্য এবং নিজের আত্মমর্য্যাদার উৎকর্ষের জন্যই সব কাজ করবার জন্য তৈরি হবার শিক্ষাটাই মানুষের সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ধনৈশ্বর্য্যের মধ্য থেকে হোক, দারিদ্র্যের মধ্য থেকে হোক, মানুষ যেন আত্মমর্য্যাদার সত্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত না হয়। বেশ মনে পড়ে—একবার কেউ একজন রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, ছেলেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন রক্ষার জন্য এবং ছাত্রের চরিত্র সংশোধনের জন্য, কায়িক শাস্তির প্রয়োজন আছে এবং কায়িক শাস্তির ভয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রেরা (এমন কি বুড়োরাও) অপকর্ম্ম করা থেকে নিবৃত্ত থাকে। এ প্রসঙ্গে, ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন খড়ের চালওয়ালা লাইব্রেরি-গৃহের দোতলার ঘরে যা বলেছিলেন, তার সার মর্ম্ম এই—

ছেলেদের কায়িক শাস্তি দেবার বাহ্যিক সাফল্যের বিষয়টা আমি যে জানি না তা নয়। কিন্তু ওটা হ'ল মানুষের সঙ্গে মানুষের—ব্যবহার-জগতের—আদিম নীতি। এই রকম ভাবে শাস্তি দেবার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে শাস্তিদাতার চিত্তের অসহিষ্ণুতা এবং শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ বিষয়ে শিক্ষকের মনে একটা অত্যন্ত খেলোরকমের প্রেস্‌টিজ বোধ। ছাত্রকে সংশোধন করবার যে-সব 'হিউম্যান' দিক আমরা চিন্তা করি, সেসব চিন্তাকে ধৈর্য্যের সঙ্গে, স্নেহভাবের সঙ্গে শিক্ষাদান-ব্যাপারে

তোমরা কি কখনও অ্যাপ্লাই করেছ, তোমাদের যে বিষয়টা সাধনার দ্বারা লাভ করা আবশ্যক, তোমরা চাও, সেটাকে অর্থাৎ ছেলের চরিত্র শোধরানোকে শাস্তি দিয়ে লাভ করতে। এইরূপ আচরণের মধ্যে যে একটা অবাঞ্ছনীয় মনোবৃত্তি রয়েছে, সেইটেই আমি বরদাস্ত করতে পারি না। তোমাদের নিজেদের প্রেস্‌টিজ বাঁচাবার জন্য কিম্বা তোমাদের সাধনাময় কর্ত্তব্যকে বিস্মৃত হয়ে, তোমরা ছেলে ঠেঙিয়ে তাদের ভেতরকার আত্মসম্মানকে দিনে দিনে করবে ধ্বংস, এটা বাস্তবিক অসহ্য। তোমরা মনে কর, বি. এ. এম. এ. পাস করলেই কিম্বা সমাজে ঘরে একটা গুরুজনের পোজিশন পেলেই বুঝি আত্মসম্মানের অধিকারী হয়, আর যারা এসব পদ থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে আত্মসম্মান ব'লে কিছুই নেই, এ রকম মনে করাটাও অন্যায়। যারা এ রকম মনে করে, তাদের নিজেদের আত্মসম্মান-বোধ প্রকৃতপক্ষে আছে কি না, সে বিষয় আমার সন্দেহ হয়।

এই যে তোমরা কতবার বলেছ, মন্দিরে আমার বক্তৃতায় ছোট ছেলেদের থাকার দরকার নেই, তারা কিছুই বোঝে না; শুধু তাই নয়, দুচারটে বড় বড় কথা উচ্চারণ ক'রে ইঁচড়-পাকামোর পরিচয় দেয়; হয়তো এই কথার অনেকটাই সত্যি, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্যি যে, আমার কাছে আসবার কিম্বা আমার কথা শোনবার বিষয়ে তাদের ওপর যদি অনধিকারীর ছাপ দাও সেটাতে তাদের ভেতরের মানুষটিকে নিশ্চয়ই অপমান করা হয়। তা ছাড়া এমনও কতবার দেখা যায় যে, একটি বালকের যেসব জটিল বিষয় বোঝবার সহজ শক্তি আছে, অনেক মাস্টার-শ্রেণীর ব্যক্তিরও সেসব বিষয়ের মর্ম্ম বোঝবার শক্তি নেই। কাজেই একটা বয়সের সংখ্যানুপাতিক মাপকাঠি দিয়ে যে সকলের বোধ-শক্তির স্ট্যান্‌ডার্ড ঠিক করা যায়, এটা নিছক সত্যি ব'লে মেনে নেওয়া শক্ত। এ রকমের একটা বিচার করার নীতির মধ্যেও আছে মানুষের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার অভাব। শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধের মূল ভিত্তিটা হবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতির চর্চ্চা। একবার, বেশ মনে পড়ে, সকালে শান্তিনিকেতনের বেণুকুঞ্জের পশ্চিমের বারান্দায় একদল শিশুদের বাংলা পড়াচ্ছি, সেদিন সকাল থেকেই শ্রাবণের কালো মেঘ সবুজ প্রান্তরে ফেলেছিল সরস ঘন ছায়া, পশ্চিমের ধানক্ষেতের পাশে বাঁশের বনের সবুজ পাতায় মেঘের ছায়া লেগে জেগেছিল ঘন নীল মায়া। আমার বয়স তখন বেশি নয়, ক্লাসের ছাত্রেরাও কেউই বারো তেরো বছরের বেশি নয়। রুটিনের নিয়ম মেনে এমন দিনে ক্লাসের বেড়ার মধ্যে ব'সে, বইয়ের শুকনো পাতায় কালো অক্ষরের লাইন-টানা পথ বেয়ে জ্ঞানরাজ্যে চলবার মত ইচ্ছে ছিল না। ছাত্রদের এবং শিক্ষকের মনও তখন ছেলেদের অভিপ্রায়ের সঙ্গে দিচ্ছিল তাল। অবশেষে ছেলেদের দিয়ে দিলুম ছুটি, বললুম, আজ এই পিরিয়ড স্ফূর্ত্তি ক'রে দৌড়ো-দৌড়ি কর সবুজ মাঠে। উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে সেদিন বিকেলের ডাকে রবীন্দ্রনাথকে দিলুম এক লম্বা চিঠি। সে চিঠিতে ছিল সেদিনকার মেঘলা সকালের বর্ণনা, আর ছিল ক্লাসের বন্ধন থেকে ছেলেদের মুক্তি দেবার সংবাদ। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন শিলাইদহে। সন্ধ্যের পর তৎকালীন সর্ব্বাধ্যক্ষ ৺জগদানন্দ রায় মহাশয় আমায় যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন ক্লাস ছুটি দেবার অপরাধের জন্যে, এবং এই ব'লেও শাসিয়ে দিলেন যে, ভবিষ্যতে ক্লাসে পড়াবার ব্যাপারে এ রকম কবিত্ব বা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলে আমাকে কর্ম্মচ্যুত করা হবে। বিষম দুর্ভাবনা হ'ল, চাকরি যাবার ভয়ে নয়, ভয় হ'ল রবীন্দ্রনাথ না আবার শিলাইদহ থেকে বম-শেল ছাড়েন। কেন না, কাজটা সব দিক থেকেই বেহিসেবী

হয়েছিল। প্রথম বেহিসেব, ছেলেদের ছুটি দেওয়া। দ্বিতীয়, সেইটেকে ফলাও ক'রে কাগজে-কলমে লিখে রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো। জগদানন্দ আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখে পাঠালে আমার তরফ থেকে প্রতিবাদের কিছুই ছিল না। দিন তিন চার ভারি দুশ্চিন্তায় কাটল, এমন দুশ্চিন্তায় গেল যে, শ্রাবণের মেঘোল্লাস এবং দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের ওপর দিয়ে মেঘবাহী ঝড়ো হাওয়ার দৌড়-ঝাঁপ আর কিছুই নজরে পড়ে নি, অন্তরে তখন যেন সঙ্গীহীন বিনিদ্র রাতে অমাবস্যার অন্ধকার। দেখা হ'লেই জগদানন্দবাবু বলতেন, ছেলেদের বকিয়ে দেবার জন্যে মাস্টার হয়েছ! এল আমার চিঠির উত্তরে—রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ভয়ে ভয়ে একলা ঘরে খুললুম খামের মোড়ক। চিঠিটা প'ড়ে ধড়ে এল প্রাণ ফিরে। একবার ভাবলুম, যাই, চিঠিটা জগদানন্দবাবুকে দেখিয়ে আসি। কিন্তু তা করি নি। কবির চিঠির অবিকল নকল এই—

শিলাইদা

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দ হল। পেয়ালা ভরে তোমরা প্রকৃতির সুধার ঝরণা থেকে সুধা পান কর, একদিনও তোমাদের আনন্দ-ভোজের কামাই না যাক, সেদিন ছেলেদের যে ক্লাশের বেড়া টপাটপ ডিঙিয়ে দৌড় দিতে দিয়েছিলে সে খুব ভালো করেছিলে, আনন্দনিকেতনের আনাগোনার রাস্তাটা তাদের খুব করে চেনাশোনা হয়ে যাক্—মক্কা মেদিনা কামস্কাট্‌কা কোচিন পাটাগোনিয়ার ঠিকানা তারা যখন হয় জেনে নেবে, কিন্তু বিশ্বলক্ষ্মীর স্নেহকোলের ঠিকানাটা যদি এই বয়েসে খুঁজে না পায় তবে যেদিন মস্ত পণ্ডিত হয়ে আমার মত চোখে চশমা লাগাবে সেদিন আর কোনো আশা থাকবে না। আর সকল শক্তির চেয়ে খুসি হয়ে ওঠবার শক্তিটা ওদের যেন পূরাপূরি ফুটে উঠতে পায়—আমার এই সব ছেলেরা যেন আকাশের আলোর সঙ্গে তাদের হাসি মেলাতে জানে এবং নববর্ষার ধারার সঙ্গে যেন তারা হৃদয়ের সুর মিলিয়ে মেঘমল্লারে নেচে উঠতে পারে। ওরা অশোক হোক, অভয় হোক, বীর হোক এবং সহজ আনন্দে সর্ব্বদা ভরপূর হোক। ইতি ২৫শে মাঘ ১৩২১

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছাত্রদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল নিবিড়। শুধু আনন্দের উৎকর্ষসাধন করবে ছেলেরা আর চরিত্র গড়বার দিকে থাকবে উদাসীন, রবীন্দ্রনাথ কোনও দিন তা ভাবেন নি। সংযম, দেহ-শক্তি-চর্চ্চা এবং আত্মকর্তৃত্বের চর্চ্চার দ্বারা ছেলেরা হয়ে উঠবে সত্যিকার মানুষ, তাদের দেহে থাকবে বল, মনে থাকবে ধৈর্য্য এবং আনন্দ, চিন্তায় তারা হবে সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মনের ইচ্ছে। সেইজন্যে, তিনি খুবই খুশি হতেন, যখনই শুনতেন ছেলেরা অধ্যাপক কিম্বা শিক্ষকের সহায়তার অপেক্ষা না ক'রে নিজেরাই কোনও মঙ্গলকর্ম্মে ব্রতী হয়েছে। বাংলা সন ১৩২৪ সালের কথা। তখন ছাত্রেরা নিজেদের দৈনিক কাজকর্ম্মের সম্পূর্ণ ব্যবস্থার ভার নিজেরা নেবার জন্যে প্রস্তুত হবার আয়োজন সুরু করেছিল। রান্নাঘরের চাকরবাকরদের ওপরও তৎকালীন ম্যানেজারের কর্তৃত্বের চাপ যাতে না থাকে, চাকরবাকররা নিজেদের কর্ম্মব্যবস্থার ভার নিজেরাই নেবে, এই রকমের ব্যবস্থা তৎকালীন ম্যানেজার নিজেই করেছিলেন। স্বর্গীয় রায়সাহেব জগদানন্দ রায় ছিলেন তখন শান্তিনিকেতনের সর্ব্বাধ্যক্ষ, এবং আমি ছিলুম ম্যানেজার। জগদানন্দবাবু আমাকে

এই কাজে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। পূজনীয় কবির ইচ্ছে ছিল, আশ্রমের সব বাসিন্দা মিলে হবে একটা বৃহৎ পরিবারের মত, এবং সেই পারিবারিক আদর্শকে রক্ষা করবে সকলে ভালবাসার সম্বন্ধের ভেতর দিয়ে। একটি বৃহৎ পরিবারে যেমন ছোট বড় সকলেই কাজ করে আপন আপন যোগ্যতা অনুযায়ী, অথচ কেউ কারও চাকর, কেউ কারও মনিব নয়, তেমনই ক'রেই একটি পারিবারিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে আশ্রমের লোকেরা—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মনের কামনা এবং তাঁর স্বপ্ন। কাজেই যখন তাঁকে আমি চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলুম যে, আশ্রমে সকলের মধ্যে আত্মকর্ত্তৃত্বের একটা ইচ্ছে হয়েছে এবং সেই ইচ্ছের সঙ্গে রান্নাঘরের বামুন-চাকরদেরও শুভ ইচ্ছার সংযোগ হবার একটা চেষ্টার সূত্রপাত হয়েছে, তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি সেই চিঠি পেয়ে আনন্দে অস্থির হয়ে কলকাতা থেকে আশ্রমে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন এবং তার তিন চার দিনের মধ্যে আশ্রমে ফিরেও গিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে যাবার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ আমার চিঠি পেয়েই আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠিটা রবীন্দ্র-পরিচয়ের ইতিহাসে রাখবার মত, সেইজন্যে সেই চিঠিরও অবিকল নকল এই প্রবন্ধে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করলুম। বাংলা সন ১৩২৪ সালের আশ্বিন মাসে তিনি কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি এই—

কলিকাতা

২০শে আশ্বিন [১৩২৪]

কল্যাণীয়েষু,

সুধাকান্ত, তোর চিঠিখানি পড়ে বড় খুসি হয়েচি। আমাদের ছেলেদের মনে যে আত্মকর্ত্তৃত্বের ভাবটা জেগে উঠেছে এটা খুবই আশার কথা। বীজ অঙ্কুরিত হতে সময় লাগে কিন্তু বীজের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে তাহলে একদিন সে সফল হয়ই। আমি কিছুতে আশা ছাড়ি না। আমি ধৈর্য্য ধরে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে রাজি আছি তবু বাইরের শাসনের উপর ভরসা রাখিনে। আস্তে আস্তে সকল দিক থেকেই আমাদের ছাত্রেরা আপন দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে আমি নিশ্চয় জানি, তখনি আমাদের বিদ্যালয় সত্য হয়ে উঠবে। আমাদের বিদ্যালয় ছাত্রদের হাতের গড়া বিদ্যালয় হয়ে উঠবে, আমরা এখানে তাদের সহযোগী হব—এমনি করেই তারা নিজেদের কল্যাণ নিজেরা করবার যোগ্য হয়ে উঠবে—এতে যদি মধ্যে মধ্যে ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলতা ঘটে তাতেও ভয় পাবার দরকার নেই।

ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের সেবকেরাও যে আপনাদের দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। এতে তোরা যতদূর সম্ভব উৎসাহ দিবি। এদের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ছেলেদের উপরেও কাজ করবে। এবং এতে সমস্ত আশ্রমের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভাব জেগে উঠবে। আমি আগামী সপ্তাহেই আশ্রমে যাব। তোর চিঠি পড়ে সেখানে যাবার জন্যে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে উঠেচে। কলকাতা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেচে—কিন্তু কিছুতে বন্ধন কাটচে না।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, তিনি তাঁর আশ্রমকে কি আদর্শে গড়তে চেয়েছিলেন। তৎকালীন আশ্রমে কর্ম্মের সঙ্গে ভাবের একটা গভীর যোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা চলেছিল এবং সেই প্রচেষ্টার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মশক্তি এবং দূরদৃষ্টি। এই দূরদৃষ্টির কথা

প্রসঙ্গে তাঁর রসিকতার একটা নমুনা মনে প'ড়ে গেল। একদিন কথা-প্রসঙ্গে দূরদ্রষ্টাদের কথা হচ্ছিল। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, তোমার চশমার পাওয়ার থেকে তুমি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছ যে, তোমার কাছে কাছের জিনিস ঝাপসা, বিনা চশমায় নিকটের জিনিস নজরে পড়ে না, অথচ দূরের জিনিস দেখতে পাও বিনা চশমায়। অতএব তোমারও দূরদৃষ্টি আছে, এ কথা যখন অস্বীকার করবার উপায় নেই, তখন তোমায় খাতির করা আবশ্যক, অতএব ব'স এবং চা একটু বেশি ক'রে পান কর।

যাক, বলছিলুম তাঁর কর্ম্মশক্তির এবং ভাবী যুগ সম্বন্ধে তাঁর দূরদৃষ্টির কথা। তিনি সেই সময় থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, সামনে একটা এমন সময় আসছে, যে সময়ের তাগিদে ভেঙে যাবে সাবেকের চলতি সব বাঁধন, মানুষ চাইবে মুক্ত হতে বাইরে এবং ভেতরে। মুক্তি-সংগ্রামের যে হাওয়া বর্ত্তমানের সময়-তরঙ্গে ভয়ঙ্কররূপে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে পুরাতন মনকে, তিনি সেই হাওয়ার খবর পেয়েছিলেন পূর্ব্বেই। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর আশ্রমে আজকের দিনের মুক্তি-কামনাকে সুন্দরের সাধনায় সিদ্ধ করতে। যা আসে দারুণ উচ্ছৃঙ্খলার বন্যাবেগে তাকেই চেয়েছিলেন আহ্বান করতে অসঙ্কোচে বন্ধুর মত চিরপরিচিতের মত। এক দিকে কাব্যসাধনা, অন্য দিকে কর্ম্ম, এই দুটোই ছিল তখনকার দিনে তাঁর জীবনের দৈনন্দিন সূচি। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলেছি, রবীন্দ্রনাথ তখন ছাপাখানার কাজ, আপিসের কাজ, হাট-বাজারের কাজ, সবের ওপর নজর রাখতেন। কোন্ বিভাগে কে কি কাজ করবে, তাও ঠিক ক'রে দিতেন। সাধারণের বিশ্বাস, আশেপাশের লেফ্‌ট্‌ন্যান্টের দল কর্ম্ম-পরিচালন সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথকে যা বুঝিয়ে দেন, কবি তাই চোখ কান বন্ধ ক'রে বুঝে ফেলেন এবং সেই ভাবে কাজ করেন। সেটা যে সর্ব্বৈব সত্য নয়, তার প্রমাণ, নিম্নের চিঠি থেকেই পাওয়া যাবে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি থাকেন, তাঁদের ধারণা অন্য রকম। তাঁরা মনে করেন, কবির নিজের স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবার উৎসাহ যদি কম থাকত, তা হ'লে রক্ষা থাকত। তুর্কীনাচ কাকে বলে জানি না, তবে দিল্লীর লাড্ডুর মত তুর্কীনাচের কথা অনেক দিন ধ'রে শুনে আসছি এবং শুনে শুনে ঐ নাচের সম্বন্ধে একটা ধারণাও সাধারণের মনে হয়ে গেছে, নয় কি? রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন ইচ্ছে এবং স্বাধীনভাবে দিনযাপনের উৎসাহ প্রায়ই তাঁর নিকটবর্ত্তীদের তুর্কীনাচ নাচায়। ইংরেজী ১৯১৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে তিনি লিখছেন আমাকে কলকাতার ঠিকানায়—

কল্যাণীয়েষু,

সেই লোকটিকে এখানে একবার আনিলে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে বোঝা যাইবে। দূর হইতে কিছু বলা যায় না। ছাপাখানা দেখা হইয়া থাকিলে চলিয়া আসিবে। এখানে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। পথের মধ্যে শ্যাওড়াফুলির হাট দেখিয়া আসিলে মন্দ হয় না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সময়ে শান্তিনিকেতনে ছোট-খাটো আয়োজনের মধ্যে একটা ছাপাখানা স্থাপনের চেষ্টা চলছিল। আমি কলকাতা থেকে কবির কাছে একজন ভদ্রলোক সম্বন্ধে বিশেষ সুপারিশ ক'রে

চিঠি লিখেছিলুম, এবং তিনিই শান্তিনিকেতনের ঐ ছাপাখানার কাজকর্ম্ম ভাল ক'রে দেখতে পারবেন ব'লে ঐ চিঠিতে বেশ একটু তারিফও করেছিলুম। কিন্তু ঐ লিপিমন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কানের মধ্যেই ছিল, ভিতর দিয়ে মরম পর্য্যন্ত পৌঁছোয় নি। তাঁর চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন, কেমন বৈষয়িক এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল অ্যাটিচ্যুড নিয়ে তখন কাজ করতেন। কলকাতা থেকে ফেরবার পথে শেওড়াফুলির হাটের তরিতরকারির দর পর্য্যন্ত জেনে আসবার আদেশ ঐ চিঠিতেই আছে। এখানে বলা উচিত যে, আমার সুপারিশ সত্ত্বেও কবি সেই ভদ্রলোকটিকে চাকরি দেন নি।

বোলপুরের মতন পাড়াগাঁয়ের শহরে গরুর গাড়িতে ঢিকোতে ঢিকোতে হাটের মাল আসত আশ্রমে, এটা রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হ'ত না। সেইজন্যে একবার তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল, হাটের জন্যে উটের গাড়ি আনবেন। কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন, উটের ব্যবস্থাটা আইডিয়ার দিক থেকে নূতন হ'লেও কাজের দিক থেকে অসুবিধেই হবে বেশি। কবি রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেছিলেন, উট আসুক ; কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথ দিলেন সে ইচ্ছের টুঁটি চেপে। মজা দেখবার জন্যে, কাজের সুবিধে হোক আর নাই হোক, আমি কিন্তু চেয়েছিলুম, উট আসুক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বলদ নিয়েই কাজ করতে হ'ল, উট আর এল না।

স্লেট

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অতরল সিন্ধু নীল, তুমি মহাভাগ,
আসে যায় বুকে কিছু রাখে নাকো দাগ।
এই লেখে এই মোছে চলে অভিনয়,
পলে পলে তব বুকে সৃষ্টি প্রলয়।
শিক্ষার চাঁদমারী, মরি কি বাহার!
লিখনের নার্সারি তুমি পড়ুয়ার,
প'ড়ে আছ দিল্লীর রাজাসনবৎ,
অঙ্ক ও সংখ্যার তুমি পাণিপথ।
ভাষারে আকার দিতে সদা তব সখ,
কাছে তব হাতখড়ি লয় মানবক।
গড়ে আর ভাঙে তারা, ভেঙে গড়ে ফের,
আখড়া দিতেছে আহা, ভাবী জীবনের।
জলদের মাঝে ওই বিজলির প্রায়
টাকা আনা তব বুকে দেখা দিয়ে যায়।
লিপির তো শিলা তুমি, শিলালিপি নও,
বাদ শুধু অস্ত্র, শাসনেরি কথা কও।

বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটু পরে মানীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বাহিরের ঘরে মানীকে সে আসিতে দেখে নাই কখনও।

মানী বলিল, বিপিনদা, রাগ পড়েছে?

বিপিন মানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, তুই কি ক'রে জানলি আমি চ'লে যাচ্ছি। কেউ তো জানে না। শ্যামহরি চাকরকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, আমি কখন এসেছি তা পর্য্যন্ত সে খবর রাখে না।

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার টাঁক আছে মাথায় বিপিনদা, আমি জানতে পারি।

—কি ক'রে বল না মানী, সত্যি, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তোকে দেখে।

মানী তবুও হাসিতে লাগিল। কৌতুক পাইলে সে সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়, বিপিন তাহা ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে, এবং ইহাও একটা কারণ যে জন্যে মানীকে তাহার বড় ভাল লাগে।

—আচ্ছা, হাসি এখন একটু বন্ধ থাকগে। কথার উত্তর দে।

মানী দোরের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, দরজার শিকলটা দুই হাতে ধরিয়া তাহার হাসিবার ভঙ্গি দেখিয়া বিপিনের মনে হইতেছিল, মানী এখনও যেন তেমনই ছেলেমানুষ আছে, শিকল ছাড়িয়া মানী দরজার পাশে একখানা চেয়ারে বসিল। গম্ভীর মুখে বলিল, আচ্ছা, তুমি কি রকম মানুষ বিপিনদা! এসেছ কখন, তা জানি না! একবার দেখা পর্য্যন্ত করলে না! তারপর বাবা বুড়ো মানুষ কি বলেছেন না বলছেন, তুমি অমনই চ'টে গেলে, আর এই ঠিক দুপুরবেলা, খাওয়া না দাওয়া না, কাউকে কিছু না ব'লে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পুঁটুলি হাতে!

—তুই জানলি কি ক'রে?

—আমি জানব কি ক'রে? বাবা রান্নাঘরে গিয়ে মার কাছে বললেন যে, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে কি নিয়ে। মাকে বললেন, শ্যামহরিকে দিয়ে তোমার নাইবার তেল পাঠিয়ে দিতে। বাবার মুখে তাই শুনে আমার ভয় হ'ল, আমি তো তোমায় চিনি। তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এসে দেখি, তুমি ওই বাতাবিনেবুতলা পর্য্যন্ত চ'লে গিয়েছ। চেঁচিয়ে ডাকতে পারি না তো আর। তখনই ছুটে খিড়কি-দোরে গেলুম, রাস্তার বাঁকে তোমায় আসতেই হবে। বাপ রে, কি রাগ!

—রাগ নয়, মনের দুঃখু তো হতে পারে।

—কি দুঃখু? তুমিও বলেছ বাবাকে যে, না পোষায় আপনি অন্য লোক রাখুন। বাবা তোমাকে তো কিছুই বলেন নি।

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। এ কথার জবাব দিতে গেলে অনাদিবাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে হয়, তাহা সে মানীকে বলিতে চায় না।

মানী বলিল, বিপিনদা, আমার কাছে তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?

—কি কথা?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলে? বলেছিলে না, আমায় না জিজ্ঞেস ক'রে চাকরি ছাড়বে না? কথা দিয়েছিলে, মনে আছে?

—মনে ছিল না, এখন মনে পড়ছে বটে।

—তা নয়, রাগের সময় তোমার জ্ঞান ছিল না, এই হ'ল আসল কথা। উঃ, কি জোরে বেরিয়ে যাওয়া হ'ল! দেখতে না দেখতে একেবারে বাতাবিনেবুর গাছের কাছে। ভাগ্যিস আমি ছুটে গেলুম খিড়কির দোরে? নইলে এতক্ষণ রাণাঘাটের অর্দ্ধেক রাস্তা—

—কিন্তু এতক্ষণ পরে একটা কথা বলি মানী, তুই যে এসেছিস বা এখানে আছিস এ কথা আমি কিন্তু কিচ্ছু জানি না। আমি তোকে খিড়কি-দোরের পথে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—বাবা কিছু বলেন নি?

—উনি তোর কথা আমার কাছে কি বলবেন? কখনও বলেন, না আমিই জিজ্ঞেস করি?

—তা নয়। আমি থাকলেই তো খরচ বাড়ে, খরচ বাড়লেই জমিদারির তাগাদা জোর ক'রে করবার ভার পড়ে তোমার ওপর। আমি ভেবেছিলুম, বাবা সে কথা তুলেছেন বুঝি; আমি আছি সুতরাং টাকা চাই, এমন কথা যদি ব'লে থাকেন।

—না, সে কথা ওঠে নি। তুই চ'লে যাবি শিগগির এ তো জেনেই গিয়েছিলুম, আবার এর মধ্যে আসবি তা ভাবি নি।

—তা ভাববে কেন? দেখতে পেলে বুঝি গা জ্বালা করে? দূরে রাখলেই বাঁচ বুঝি?

—বলেছি কোন দিন?

মানী ঘাড় দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমায় রাগাচ্ছি বিপিনদা, রাগাচ্ছি। সেই সব তোমার ছেলেবেলার মত এখনও আছে, কিছু বদলায় নি। আচ্ছা, একটা কবিতা বলব শুনবে?

বিপিন হাত নাড়িয়া যেন মশা তাড়াইবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, রক্ষে কর। ওসব ভাল লাগে না আমার, বুঝি-সুঝি না। বাদ দাও, জান তো আমার বিদ্যে।

মানী গম্ভীর হইয়া বলিল, বিপিনদা, আমার আর একটা কথা রাখতে হবে। তোমায় পড়াশুনা করতে হবে। তোমায় কতকগুলো ভাল বই দোব সেগুলো কাছারিতে গিয়ে পড়বে, প'ড়ে ফেরত দেবে, আমি আবার দোব। বইয়ের আমার অভাব নেই, যত চাও দোব।

বিপিন তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, বই আমি অনেক পড়েছি, তুই যা। বুড়ো বয়েসে আবার বই পড়তে যাই, আর উনি আমার মাস্টারনী হয়ে এসেছেন!

মানী রাগিয়া বলিল, এসেছিই তো মাস্টারনী হয়ে। পড়তে হবে তোমায়। বই দিচ্ছি, নিয়ে যাও যদি ভাল চাও। এঃ, একেবারে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছেন আর কি! পড়াশুনো শিকেয় তুলেছেন!

বিপিন হাসিতে লাগিল।

মানী বলিল, সত্যি বলছি বিপিনদা, নিজের জীবনটা তুমি ইচ্ছে ক'রে গোল্লায় দিলে। নইলে আজ আমার বাবার বাড়ি চাকরি করতে আসবে কেন তুমি? লেখাপড়া শিখলে কাঁকুড়, তোমায় ভাল চাকরি দেবে কে বল তো? আবার তেজ ক'রে চ'লে যাওয়া হয়! যাও, বই দিচ্ছি, নিয়ে পড়গে, আর একখানা ডাক্তারি বই দিচ্ছি, সেখানা যদি ভাল ক'রে পড়তে পার, তবে আর চাকরি করতে হবে না।

ডাক্তারি বইয়ের কথায় বিপিন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। নতুবা এতক্ষণ মানীর গুরুমশায়-গিরিতে তাহার হাসি আর থামিতেছিল না। বলিল, বেশ, ভালই তো। কি বই পড়তে হবে এনে দিও, দেখি চেষ্টা ক'রে।

—মানুষ হও বিপিনদা, আমার বড্ড ইচ্ছে। তোমার বুদ্ধি আছে, কিছু কাজে লাগালে না তাকে। ডাক্তারি যদি শিখতে পার, ভেবে দেখ, কারও চাকরি তোমায় করতে হবে না। আমার এক দেওর ডাক্তারি পাস করেছে, বীজপুরে ডাক্তারখানা খুলে বসেছে, দেড়শো টাকার কম কোনও মাসে পায় না।

—সেসব পাস-করা ডাক্তারের কথা ছেড়ে দে। আচ্ছা, বই প'ড়ে ডাক্তার হওয়া যায়?

—কেন হওয়া যাবে না? খু-উ-ব যায়। তোমায় বই আমি আরও দোব। তারপর আমার সেই দেওরকে ব'লে দোব, তার কাছে ছ মাস থেকে শিখলে তুমি পাকা ডাক্তার হয়ে যাবে। সে কথা পরে হবে, এখন তোমায় বই এনে দিই। সেগুলো নিয়ে কাছারি যেও, আর রোজ প'ড়। কবে যাবে সেখানে?

—কাল সকালেই যেতে হবে, দেরি আর করা চলবে না।

—আচ্ছা, ব'স, আমি বই বেছে বেছে নিয়ে আসি।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া কেমন একপ্রকার হাসিয়া চলিয়া গেল। মানীর এ হাসি বিপিনের পরিচিত। ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে।

মনে মনে ভাবিল, মানীটা বড় ভাল মেয়ে। এতটুকু ঠ্যাকার নেই, বেশ মনটি। তবে মাথায় একটু ছিট আছে, নইলে আমায় এ বয়েসে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে!

মানী একরাশ বই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বিপিনের সামনে বইয়ের বোঝা নামাইয়া বলিল, দেখে ভয় হচ্ছে নাকি? কিছু ভয় নেই। এর মধ্যে দুখানা শরৎবাবুর নভেল আছে, 'শ্রীকান্ত' আর 'দত্তা' প'ড়ে দেখো, কি চমৎকার!

—উঃ, তুই দেখছি আমায় রাতারাতি পণ্ডিত না ক'রে ছাড়বি না মানী!

মানী আর একখানা মোটা বই হাতে লইয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, এইখানা সেই ডাক্তারি বই। এ আমার শ্বশুরবাড়ির জিনিস। তোমায় দিলাম। এ থেকে তুমি ক'রে খেতে পারবে।

বিপিন পড়িয়া দেখিল, বইখানির নাম 'সরল চিকিৎসা-বিজ্ঞান'। গ্রন্থকারের নাম ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় এল. এম. এস.।

মানীর দিকে চাহিয়া বলিল, বেশ ভাল বই?

মানী ঘাড় নাড়িয়া আশ্বাস দেওয়ার সুরে বলিল, খুব ভাল বই। এতে সব আছে ডাক্তারি ব্যাপারের। বাকিটুকু হয়ে যাবে এখন, আমার সেই দেওরের কাছে থেকে কিছুদিন শিখলে। আমি সব ঠিক ক'রে দোব এখন।

—আর ওগুলো কি বই ?

—এখানা শরৎবাবুর 'দত্তা', বললুম যে। চমৎকার বই, প'ড়ে দেখো—উপন্যাস। উপন্যাস পড় নি কখনও ?

—আমাদের বাড়িতে ছিল বাবার আমলের 'ভুবনমোহিনী' ব'লে একখানা উপন্যাস। সেখানা পড়েছি।

—ওসব বাজে বই, ভাল বই তুমি কিছুই পড় নি, খোঁজও রাখ না বিপিনদা। আজকাল মেয়েরা যা জানে, তুমি তাও জান না। দুঃখু হয় তোমার জন্যে।

—শরৎবাবু ভাল লেখক ? নাম শুনি নি তো ?

—তুমি কার নাম শুনেছ ? বঙ্কিমবাবুর নাম জান ? রবি ঠাকুরের নাম জান ?

—নাম শুনেছি ওই পর্য্যন্ত। পড়ি নি কোনও বই। আছে তাঁদের বই ?

এগুলো আগে প'ড়ে শেষ কর। পরে দোব। শোন, আমি শ্যামহরি চাকরকে ব'লে দিচ্ছি, তোমার পুঁটুলি আর বই দত্তপাড়ায় কাছারিতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। নইলে তুমি নিয়ে যাবে কি ক'রে ?

—ওতে দরকার নেই মানী, তোমার বাবা কি মনে করবেন ? আমার মোট বইবার জন্যে চাকরকে বলবার কি দরকার ?

—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বললে বাবা কিছু বলবেন না। আজই যাবে ?

—এখুনি বেরুব। অনাদিবাবু ঘুম থেকে উঠলেই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেই বেরিয়ে পড়ব।

—বাবা ঘুম থেকে উঠলেই আমি চাকরের হাতে চা পাঠিয়ে দোব এখন, চা খেয়ে যেও।

মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়। অনাদিবাবুর এখনও উঠিবার সময় হয় নাই, মানী আরও কিছুক্ষণ থাকুক না !

বিপিন কহিল, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি মানী, নইলে আর কার সঙ্গেই বা করব ! বলাইকে নিয়ে বড় বিপদে প'ড়ে গিয়েছি, ওর অসুখ আবার বেড়েছে, এদিকে এই তো অবস্থা, বাড়িতে থাকলে কুপথ্যি করে, কারও কথা শোনে না। কি করি বল তো, এমন দুর্ভাবনা হয়েছে ওর জন্যে ! এই যে আসতে দেরি হয়ে গেল বাড়ি থেকে, সে ওরই অসুখ বাড়ল ব'লে। নইলে তোর কাছে যা কথা দিয়ে গিয়েছিলাম, তার আগেই আসতাম।

বলাইয়ের অসুখের ভাবনা বিপিনের মনে যেন পাথরের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়া দিয়াছে সব সময়, মানীর কাছে সে বোঝা কিছুক্ষণের জন্য নামাইয়াও সুখ। মানীকে সে মনে মনে বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়ে বলিয়া শ্রদ্ধা করে, অন্তত সে মানীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা মেয়ে কখনও দেখে নাই, সেইজন্য মানী কি পরামর্শ দেয় শুনিবার নিমিত্ত বিপিন উৎসুক হইল।

মানী বলিল, ওকে তো সেবার হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেলে, হাসপাতালে আবার নিয়ে এস না।

—হাসপাতালের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম, তারা ওকে হাসপাতালে রাখতে চায় না। বলে, ও রুগী হাসপাতালে রেখে উপকার হবে না।

মানী একটু ভাবিয়া বলিল, তা হ'লে কি জান, আমার দেওরকে না হয় একখানা চিঠি লিখি। বীজপুরে রেলের হাসপাতাল আছে, সেখানে যদি কোন বন্দোবস্ত করা যায়, দেওর তো ওখানে ডাক্তার। কালই চিঠি লিখব।

এই সময় বাড়ির মধ্যে অনাদিবাবুর গলা শোনা গেল।

তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া দোতলার বারান্দায় কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মানী বলিল, ওই বাবা উঠেছেন, আমি আসি, চা এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর বইগুলো পড়তে হবে আর আমাকে বলতে হবে সব কথা, যেন ভুলে যেও না।

বিপিন হাসিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, ওরে আমার মাস্টারনী রে!

—বাজে কথা ব'ল না বিপিনদা, ব'লে দিচ্ছি। আর ডাক্তারি বইখানার কথা যেন খুব ক'রে মনে থাকে। জীবনে উন্নতি করবার চেষ্টা ক'র বিপিনদা, কেন চিরকাল পরের দাসত্ব করবে?

মানীর কথায় বিপিনের হাসি পাইল। কি মুরুব্বিই হইয়া উঠিয়াছে মানী এই অল্প বয়সে! কথার খই ফুটিতেছে মুখে! বলিল, দাঁড়া মানী, একটা কথা, তুই ব্রহ্মসমাজের মত বক্তৃতা দিবি নাকি? কলকাতায় গিয়ে দেখছি মানুষ হয়ে গেলি!

—আবার বাজে কথা! চুপ। কি কথা বলছিলে বললে? এই বাজে কথা, না আর কোন কথা আছে?

—ইয়ে, তুই আর কতদিন আছিস এখানে?

—ঠিক নেই। যতদিন ওরা রাখে—ওদের মর্জ্জি। কেন?

বিপিন একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, এবার এলে তোর সঙ্গে দেখা হবে কি না তাই বলছিলাম।

—খুব দেখা হবে। কতদিনের মধ্যে আসছ? বেশিদিন দেরি নাই বা করলে?

খুব দেরি করা না করা আমার হাত নয়। যদি আদায় হয় চট ক'রে, এই হপ্তাতেই আসতে পারি, নয়তো পনরো বিশ দিন দেরিও হতে পারে।

মানী বলিল, আচ্ছা, যাই?

মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়, কিন্তু অনাদিবাবু উঠিয়া হয়তো ওপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন, এ অবস্থায় তাহাকে আর ধরিয়া রাখাও উচিত নয়। সুতরাং সে বলিল, আচ্ছা, এস, তোমার বাবা আসছেন বাইরে।

কিন্তু মানী চলিয়া যাইবামাত্র বিপিনের মনে হইল মানীর শেষ কথাটি—'আচ্ছা, যাই?'

মানী যখন চোখের সামনে থাকে, তখন বিপিন মানীর সব কথা ভাবিয়া দেখিবার, বুঝিবার, উপভোগ করিবার অবকাশ পায় না। এখন বিপিন হঠাৎ দেখিল, মানী এ কথা তাহাকে আর কখনও

বলে নাই, অর্থাৎ বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। কি জানি কেন, মানীর এ কথা বিপিনের ভারী ভাল লাগিল।

একটু পরে শ্যামহরি চাকর চা আনিয়া দিল, আর আনিল ছোট একটা রেকারিতে খানকতক পেঁপের টুকরা ও একটা সন্দেশ।

এ মানীর কাজ ছাড়া আর কারও নয়, বিপিন তাহা জানে। এ বাড়িতে মানী যখন ছিল না, বাহিরের ঘরে এক আধ পেয়ালা চা যদি বা কালেভদ্রে আসিয়াছে, খাবার কখনও যে আসে নাই, এ কথা সে হলফ করিয়া বলিতে পারে।

কাছারিঘরে একা বসিয়া সন্ধ্যার সময় বিপিনের আজকাল বড়ই খারাপ লাগে।

ধোপাখালিতে সে আসিয়াছে আজ প্রায় দেড় মাস পরে। এতদিন দেশে ছিল নিজের পরিবারের মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া, আকাশের তারা গুনিবার বিড়ম্বনা সেখানে ভোগ করিতে হয় নাই।

বিশেষ করিয়া মানীর সঙ্গে দেখা হইবার পরে দিন কতক এই নির্জ্জনতা যেন একেবারে অসহ্য হইয়া পড়ে। আবার কিছু দিন পরে সহিয়া যায়।

কাছারির উঠানের সেই বাদামগাছটার ডালপালার মধ্যে কেমন এক প্রকার শব্দ হয়, বিপিন দাওয়ায় বসিয়া চুপ করিয়া রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে।

মানী যে বলিয়াছিল, 'জীবনে উন্নতি কর বিপিনদা'—কথাটা বিপিনের বড় মনে লাগিয়াছে। তখন হাসি পাইলে কি হইবে, এখন সে বুঝিয়াছে, মানীর এই কথাটা তাহার মনে অনেকখানি আনন্দ উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে।

জীবনে উন্নতি তাহাকে করিতেই হইবে।

সন্ধ্যার পরে কাছারির চাকরটা আলো জ্বালাইয়া রান্নার যোগাড় করিতে রান্নাঘরে ঢোকে। কিন্তু বিপিন এবেলা বড় একটা রান্নাবান্নার হাঙ্গামাতে যায় না। ওবেলার বাসি তরকারি থাকে, চাকরকে দিয়া খানকতক রুটি করাইয়া লয় মাত্র। খাইয়া আসিয়া মানীর দেওয়া বইগুলি পড়িতে বসে। এ সময়টা এক রকম মন্দ কাটে না।

বইগুলি একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, মানী সত্যই বলিয়াছিল।

ডাক্তারি বইখানা প্রথম প্রথম সে ভাল বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু ক্রমে এই বইখানাই তাহার গাঢ় মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। মানুষের শরীরের মধ্যে এত সব ব্যাপার আছে, সে কোন দিন ভাবে নাই। দেহের নানা রকম যন্ত্রের ছবি বইয়ের গোড়ার দিকে দেওয়া আছে, বিভিন্ন যন্ত্রের কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে, উপন্যাসের চেয়েও বিপিনের কাছে সে সব বেশি চমকপ্রদ মনে হইল।

তিন চার দিন বইখানা পড়িবার পরেই বিপিন ঠিক করিয়া ফেলিল, ডাক্তারি সে শিখিবেই। এতদিন পরে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এতদিন সে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মানীর কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকিবে পথ দেখাইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া দিবার জন্য।

দিন পনরো লাগিল বইখানা শেষ করিতে।

শেষ করিয়া একটা কথা তাহার মনে হইল, কি অন্যায় সে করিয়াছে পৈতৃক অর্থের অপব্যয়

করিয়া! আজ যদি হাতে টাকা থাকিত, সে চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতায় কোন ডাক্তারি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া কিছুদিন পড়াশুনা করিত। বাংলা ভাষায় ডাক্তারি ব্যবসায় শেখানো হয়, এমন স্কুল কলিকাতায় আছে—এই বইখানার মধ্যেই সে স্কুলের বিজ্ঞাপন আছে শেষের পাতায়।

তাহার মনে হইল মানী মেয়েমানুষ, কিছু তেমন জানে না, তাই সে বলিয়াছিল বীজপুরে তাহার দেওরের কাছে ছয় মাস থাকিলে বিপিন ডাক্তারি-শাস্ত্রে পটু হইয়া যাইবে। বেচারী মানী!

এ সে জিনিস নয়, বইখানা আগাগোড়া পড়িবার পরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ডাক্তারি শেখা ছয় মাস এক বছরের কর্ম্ম নয়। ভাল ডাক্তার হইতে হইলে কোনও ভাল স্কুলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে না পড়িলে কিছুই হইবে না। বহু ব্যাপার শিখিবার আছে, এ বিষয়ে মানীর দেওর কি শিখাইবে?

বিপিনের আরও মনে হইল, ডাক্তারি সে ভাল পারিবে। তাহার মন বলিতেছে, এই কাজে নামিয়া পড়িলে যশ অর্জ্জন করিবে সে। এই একখানা মাত্র বই পড়িয়া সে অনেক কিছু বুঝিয়াছে, বইতে যা বলে নাই, তাহার চেয়ে বেশি বুঝিয়াছে।

মানীর সঙ্গে দেখা করিয়া এসব কথা তাহাকে বলিতে হইবে। মানীর সঙ্গেই পরামর্শ করিতে হইবে, ডাক্তারি শিখিবার আর কি উপায় স্থির করা যাইতে পারে। তাহার ভাল মন্দ মানী যেমন বোঝে, সে নিজেও যেন তেমন বোঝে না।

বিপিন পাঁচ ছয় টাকা খরচ করিয়া রাণাঘাট হইতে কুইনাইন, লাইকার আর্সেনিক, লাইকার অ্যামোনিয়া, এসিড এন. এম. ডিল. প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ আনাইল, যাহা সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রেস্‌কিপ্‌শনে লাগে বলিয়া বইতে লিখিয়াছে। অ্যাল্‌ক্যালি-মিক্‌শ্চারের উপকরণও ওই সঙ্গে কিছু আনাইল।

আনাইবার পরদিনই কামিনীর প্রতিবেশিনী হাবু ঘোষের দিদিমা আসিয়া বলিল, ও নায়েববাবু, কামিনীর বড় অসুখ হয়েছে আজ তিন চার দিন হ'ল, একবার আপনারে যেতে বলেছে।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রথম রোগী দেখিতে ছুটিল। যদিও হাবুর দিদিমা ডাক্তার হিসাবে তাহাকে আহ্বান করে নাই, সে যে ডাক্তারি বই পড়িয়া ভিতরে ভিতরে ডাক্তার হইয়া উঠিয়াছে, এ খবর কেহ রাখে না।

বিপিন এবার যখন কাছারিতে আসে, আজ দিন কুড়ি আগের কথা, কামিনী সেই দিনই গিয়া বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। তারপর দুপুরের পরে প্রায়ই বুড়ী কাছারিতে আসিয়া কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যাইত। তাহার অভ্যাসমত কয়দিন দুধ ও ফলমূলও নিজে লইয়া আসিয়াছে। আজ সাত আট দিন হইল কামিনী কাছারিতে আসে নাই, বিপিনের এখন মনে পড়িল। সে নিজেকে লইয়া এমন মশগুল যে, বুড়ী কেন আজকাল কাছারিতে আসিতেছে না—এ প্রশ্ন তাহার মনে উঠে নাই।

গোয়ালাপাড়ার মধ্যেই কামিনীর বাড়ি।

দুইখানা বড় চালাঘর, মাটির দেওয়াল। খুব পরিষ্কার করিয়া লেপা-পোঁছা। এক দিকে গোহাল, আগে অনেকগুলি গরু ছিল। বিপিন ছেলেবেলায় কামিনীর বাড়িতে আসিয়াছে, কামিনী

কাছারি গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি আনিত এবং ওই বড় ঘরের দাওয়ায় বসাইয়া কত গল্প করিত, খাবার খাইতে দিত, সে কথা বিপিনের আজও মনে আছে। তবে সে কামিনীর বাড়িতে আসে নাই আর কখনও সেই বাল্যদিনগুলির পরে, আসিবার আবশ্যকও হয় নাই।

কামিনী ঘরের মেঝেতে বিছানার উপর শুইয়া আছে।

বিছানাপত্রের অবস্থা দেখিয়া বিপিন বুঝিল, কামিনীর সচ্ছল দিন আর নাই। এক সময়ে এই ঘরের মধ্যে এক হাত পুরু গদির উপরে তোষক ও ধপধপে চাদর পাতা চওড়া বিছানা সে নিজের চোখে দেখিয়াছে। ঘরে নানা রকম ছবি টাঙানো থাকিত, এখনও অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া দুইচারখানা ছবি ঝুল-কালি মাখানো অবস্থায় দেওয়ালে ঝুলিতেছে—কালী, দশমহাবিদ্যা, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রঙিন ছবি, গোষ্ঠবিহার।

কামিনী ময়লা কাঁথার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, এস বাবা, এস, ওই পিঁড়িখানা পেতে দে তো ভাই।

হাবুর দিদিমা পিড়ি পাতিয়া দিল। সেই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে বিপিনকে।

বিপিন বলিল, দেখি হাতখানা, জ্বর হয়েছে, তা আমায় আগে জানাও নি কেন? আজ গিয়ে হাবুর দিদিমা বললে, তাই জানতে পারলাম।

তুমি ব'স ব'স, ভাল হয়ে ব'স। আমার কথা বাদ দাও, অসুখ লেগেই আছে। বয়েস হয়েছে, এখন এই রকম ক'রে যে কদিন যায়।

বিপিন হাত দেখিয়া বুঝিল, জ্বর খুব বেশি। মনে মনে ভাবিল, কি ভুলই হয়েছে! একটা থার্মোমিটার না পেলে কি জ্বর দেখা যায়! একদিন রাণাঘাট গিয়ে একটা থার্মোমিটার আনতেই হবে, নইলে রোগী দেখা চলবে না।

বিপিন হাবুর মাকে বলিল, একটা শিশি নিয়ে চল, ওষুধ দিচ্ছি।

কামিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি ওষুধ দেবে কোথা থেকে?

বিপিন হাসিয়া বলিল, বা রে, তুমি বুঝি জান না, আমি ডাক্তারি করি যে আজকাল!

কামিনী কথাটা বিশ্বাস করিল না। বলিল, আহা, কেবল পাগলামি আর খেয়াল!

হাবুর মা শিশি ধুইতে বাহিরে গিয়াছিল, এই সুযোগে কামিনী বলিল, স'রে এসে ব'স কাছে।

বিপিন মলিন কাঁথা-পাতা বিছানার এক পাশে বসিল।

কামিনী সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, চিরকালটা একরকম গেল। কামিনী আড়ালে আবডালে যে তাহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করে, ইহা বিপিনের অনেকদিন হইতেই জানা আছে। সেও হাসিয়া বলিল, না, সত্যি বলছি, আমি ডাক্তারি শিখছি। শুনবে তবে, কে আমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে? আমাদের জমিদারের মেয়ে।

কামিনী অবাক হইয়া বলিল, আমাদের বাবুর মেয়ে! সে আর কতটুকু, আমি তাকে দেখি নি যেন! কর্ত্তা থাকতে একবার দোলের সময় জমিদারবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন সে খুকীকে দেখেছি, কর্ত্তামশায় তাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখ, আমাদের বাবুর মেয়ে। ওই এক মেয়েই তো! কর্ত্তা বলতেন—। আচ্ছা, কর্ত্তা ইদানীং একটু চোখে কম দেখতেন, না?

বিপিন দেখিল, বুড়ী তাহার বাবার কথা আনিয়া ফেলিয়াছে, হঠাৎ থামিবে না, এখন বাবার সম্বন্ধে বুড়ীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার নাই। সে হাসিয়া বলিল, তুমি সে কতকাল আগে দেখেছিলে, তোমার খেয়াল আছে? সে মেয়ে কি চিরকাল তেমনই খুকী থাকবে? এখন তার বয়েস কুড়ি বাইশ। অনাদিবাবুদের বাড়ি দোল হ'ত আজকের কথা নয়, আমার ছেলেবেলার কথা।

—বাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কোথায়?

—কলকাতায় এক উকিলের সঙ্গে।

—তা সে মেয়ে তোমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে কেমন কথা? সে ডাক্তারি জানলে কোথা থেকে?

বিপিনের ইচ্ছা, মানীর সম্বন্ধে কথা বলে। অনেক দিন মানীর বিষয়ে সে কথা বলে নাই, তাহাকে দেখেও নাই, তাহার মনটা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তত মানীর বিষয় লইয়া কিছু বলিয়াও সুখ। কিন্তু ধোপাখালির প্রজাদের নিকট তো আর জমিদারবাবুর মেয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে না!

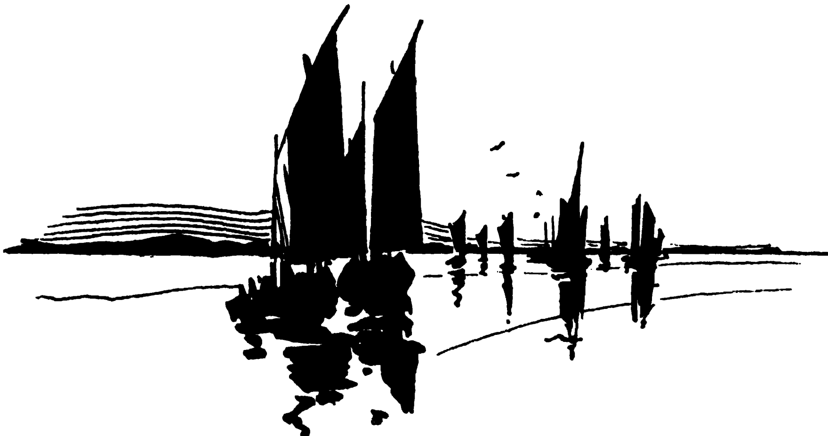
কামিনীর কথার উত্তরে বিপিন যাহা বলিয়া গেল, তাহা বৃদ্ধার প্রশ্নের সঠিক উত্তর নয়, মানীর রূপগুণের একটি দীর্ঘ বর্ণনা।

কামিনী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বিপিনের কথা শেষ হইয়া গেলে বলিল, বেশ মেয়ে। তোমার সামনে বেরোয়?

—কেন বেরুবে না? ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি, আমার সামনে বেরুবে না?

—একটা কথা বলি, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তোমারও ঘরে সোনার পিরতিমের মত বউ। আমার একটা কথা শোন বাবা। তুমি তার সঙ্গে আর দেখাশুনা ক'র না। তুমি কালকের ছেলে, কি জান আর কিই বা বোঝ! তোমার মাথায় এখনও অনেক রকম পাগলামি ঢুকে আছে। তোমায় জানতে আমার বাকি নেই বাবা, কর্ত্তামশায়ের তো ছেলে! তুমি ও মেয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষো না, নিজে কষ্ট পাবে, তাকেও কষ্ট দেবে।

ক্রমশ



ব্রতী

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ দৃশ্য

সেনায়নী গ্রামে মহাসেনের প্রাসাদান্তর্গত পাকশালার একাংশ। নন্দা রাঁধিতেছে, নন্দবলা আয়োজন করিয়া দিতেছে। রুচি আসিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া গেল। সময় অপরাহ্ণ, কিন্তু গৃহমধ্যে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে

নন্দবলা। সন্ধ্যা হয়ে এল, এখনও একজন অতিথিরও দেখা নেই। অন্য দিন এতক্ষণ ভিক্ষুকের ভিড় লেগে যায়। এই যে কাঁড়ি কাঁড়ি রান্না হচ্ছে, খাবে কে বল তো?

নন্দা। ক্ষুধার্ত্তের অভাব নেই বলা, অন্নদাতারই অভাব। এই সেনায়নী গ্রামে খোঁজ করলে অভুক্ত বা অর্দ্ধাহারক্লিষ্ট লোক দুচারজন কি পাওয়া যাবে না? তারা না আসে, আমাদেরই যেতে হবে তাদের কাছে।

নন্দবলা। তাদের জন্যই কি এত মনপ্রাণ দিয়ে রাঁধছ দিদি? স্বর্ণকার সুভূতি যে অন্য দিনের দ্বিগুণ মূল্য নিয়ে গেল ঐ কারুকার্য্য-করা সোনার থালাটার জন্যে, ওটা কি সেনায়নীর কোনও দীন-দুঃখীকে দান করবে ব'লে তৈরি করিয়েছ? সত্যি কথা বল, নিজেকে ঠকিও না।

নন্দা। তুই বড্ড ধ'রে ফেলেছিস।

লজ্জিতভাবে হাসিল। সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন। নিবেদন আছে আর্য্যে।

নন্দা। বলুন।

সুদর্শন। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীমৎ আচার্য্য শীলব্রত আমার গুরুদেব। আজ কর্ত্রী ভট্টারিকার অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আপনাদের কল্যাণার্থে দুটি রক্ষাকবচ দিয়েছেন। মহর্ষি বামদেবনির্দ্দিষ্ট এই শিবকবচ ভূর্জ্জপত্রে লিখে শ্বেতবর্ণ পট্টসূত্রে জড়িয়ে রূপার মাদুলিতে ভ'রে স্ত্রীলোক বাম হস্তে ধারণ করলে দেবতা মনুষ্য এবং গন্ধর্ব্বেরা তার বশ হয় এবং অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি তার করতলগত হয়। আমি বিধানানুযায়ী মাদুলিতে ভ'রে এনেছি আর্য্যে, দুজনের জন্য দুটি। দয়া ক'রে যদি গ্রহণ করেন—

নন্দা। দিন আর্য্য, এতে কুণ্ঠার কি আছে? আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আপনি, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন।

নন্দা বাম হস্তে পরিল, নন্দবলা হাতে লইয়া ইতস্তত করিতে লাগিল। সুদর্শন চলিয়া গেলেন। নন্দা মাদুলিটি খুলিয়া মাথায় ঠেকাইয়া আঁচলে বাঁধিল

নন্দবলা। ওকি দিদি? ওর মানে কি? পরাই বা কেন? খোলাই বা কেন?

নন্দা। যে ভালবাসে, তার মনে কষ্ট দিতে নেই বোন। (নন্দবলা নিজেরটি বাম হস্তে ধারণ করিল) তুই যে বড় পরলি? সামনে পরলে তো খুশি হতেন!

নন্দবলা। সংসারে ভিন্ন রুচির লোকও তো থাকতে পারে দিদি। ভালবাসেন যাঁরা, নিজের বিবেকের অনুযায়ী কাজ ক'রে প্রকাশ্যে তাঁদের মনে কষ্ট দিয়েও আড়ালে সাধ্যমত তাঁদের প্রিয়কার্য্য সাধন করে, এমন মানুষও তো আছে। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) প'রে থাকতে আপত্তিটা কি ছিল ?

নন্দা। নিজের আজীবনের তপস্যা দিয়ে যদি তাকে জয় করতে না পারি বলা, তবে সে অজেয়ই থাক। দেবতার সাহায্য নিয়ে বা মন্ত্রশক্তির সাহায্য নিয়ে চাই না তাকে অনায়াসে জয় করতে।

নন্দবলা। এতদিন ধ'রে কি করছি দিদি ?

নন্দা। চিত্তশুদ্ধির সাধনা করছি বোন। মহামানবের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হবার সাধনা করছি।

নন্দবলা। এই সব বিধিনিষেধ, এই স্বর্ণপাত্রদান, এই সব অর্থহীন আচার পালন ?

নন্দা। সমস্তই চিত্তসংযমের জন্য বলা, নিজেদের নিঃস্ব ক'রে যার প্রয়োজন অধিক, তার প্রয়োজন মেটাবার শিক্ষা। আমাদের এই বারো বৎসরের ব্রতে পিতার বিপুল রত্নভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে, তা তো তুমি জান ; কিন্তু মনে কি তার জন্যে ক্ষোভ আছে ? যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তাতে পথেই দাঁড়াই আর সিংহাসনেই বসি, আমাদের কষ্ট পেতে হবে না ভবিষ্যতে।

নন্দবলা। সত্যি বলছ তুমি, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দৈব সাহায্য চাও না ?

নন্দা। না।

নন্দবলা। তবে আজ বিষ্ণুমন্দিরে গিয়েছিলে কেন পূজা দিতে ? সাবিত্রীস্তোত্র পাঠ করলে কেন ?

নন্দা। মার মনে কষ্ট দিতে চাই না ব'লেই গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম সজ্জনসংসর্গের জন্য, দুটো সৎকথা শোনবার জন্য। বিষ্ণুপ্রণামের সময় কোন ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তাকে আমি মনে স্থান দিতে পারি না বোন। আমার কেবল মনে পড়ে অন্ধরাজপত্নী তেজস্বিনী গান্ধারীর প্রার্থনা—পতিব্রতা, যিনি পতির প্রেমে চির-অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন, কিন্তু পতিকে পাপের পথে চিরদিন যিনি বাধা দিয়ে চলেছেন ; অধার্ম্মিক পুত্রকে মৃত্যুমুখে যেতে দেখেও যিনি তার জয়কামনা করেন নি ; ঈশ্বরের প্রতারণাকে যিনি অভিশাপ দিতে সাহস করেছিলেন, সেই মহীয়সী নারীর প্রার্থনা।

নন্দবলা। কি তাঁর প্রার্থনা দিদি ?

নন্দা। স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিম্ ব্রজাম্যহম্।
তস্মিন্ তস্মিন্ হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তি দৃঢ়োঽস্তু মে॥

আমি তাঁরই সুরে সুর মিলিয়ে বলি, আমি চলব আমার কর্ম্মফলে, সেখানে চাইব না তোমার দয়া ; হে হৃষীকেশ, দয়া যদি করতে হয়, তবে এইটুকু দয়া রেখো, যেন যে জন্মে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার ওপর ভক্তি আমার অচলা থাকে।

হাতজোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল। কস্তুরীর প্রবেশ। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সে চোখ মুছিল, তাহার পর কিছুক্ষণ নন্দার ও কিছুক্ষণ নন্দবলার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া গাহিল

কস্তুরী। নিরালা পথে, সখি, বনতলে,
দুটি আঁখি পড়ে মনে আজি বিরলে।
দুটি আঁখি জলভরা, পরাণ পাগল-করা!
বুঝি বা পড়েছি ধরা যমুনাজলে।

নন্দবলা। হ্যাঁগা কস্তুরীদি, তোমার কি হয়েছে বল তো? বর বাড়ি ফিরেছে তো যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছ, না? আমাদের বাড়ি আর আস না কেন গা?

কস্তুরী। (মুখ বাঁকাইয়া) এই কেউ খেতে দেয় না, বসতে বলে না, মানসম্ভ্রম রাখে না, তাই আর আসি না।

নন্দবলা। আমার কথাই বুঝি আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

কস্তুরী। তা কথা তো মিথ্যে নয়। আমি তোদের আরোগ্যশালার রুগীও নই বা অতিথিশালার ভিখিরীও নই যে, তোরা না খেতে দিলে আমার জুটবে না। আমার চার হাত বর আছে, দশ হাত ঘর আছে, ঘরে হাঁড়িমুখো শাশুড়ী আছে, দোরে দাড়িমুখো দ্বারী আছে, ভাঁড়ারে দধিকর্ণ বেরাল আছে, দেউড়িতে বজ্রদন্ত কুকুর আছে,—

নন্দবলা। হেঁসেলে সাত ব্যান্নন ভাত আছে, পুকুরে রুইকাৎলা মাছ আছে—ব'লে যাও।

কস্তুরী। আছেই তো। আমার অভাব কিসের? তোরা না গেলে এলে, তোরা না গণ্যমান্য করলে আমি খালি খালি যেচে যেচে আসতে যাব কেন লা?

নন্দবলা। সত্যি কস্তুরীদি, তোমার যে অতশত সম্পত্তি আছে, তুমি যে অমন একটা গণ্যমান্য ব্যক্তি, তা আমাদের মনেই ছিল না। তা এমন অসময়ে ভরসন্ধ্যেবেলা কি মনে ক'রে?

কস্তুরী। এই যাচ্ছিলাম পথ দিয়ে। ভাবলাম মঙ্গলা-মালিনী কেমন আছে একবার দেখে যাই। তোদের কাছে এসেছি, মনে করেছিস নাকি? ব'য়ে গেছে আমার।

নন্দা। (হাসিয়া) আতুরাগারে গেছলে নাকি কস্তুরী? কেমন দেখলে মঙ্গলাকে?

কস্তুরী। মনে হ'ল যেন একটু ভালর দিকে যাচ্ছে। তবে বৈদ্যরাজ পঞ্চশিখ যা বললেন, তাতে মনে হয়—(থামিয়া) বোধ হয়—(থামিয়া) অর্থাৎ বিপদ এখনও কাটে নি।

নন্দবলা। মিথ্যেবাদী, এই বুঝি তুমি গেছলে আতুরাগারে? মঙ্গলা আজ সাতদিন হ'ল অন্নপথ্য করেছে, তিনদিন হ'ল মন্দিরে যাচ্ছে সে ফুল নিয়ে। বৈদ্যরাজ পঞ্চশিখ আজ চারদিন হ'ল অসুস্থ, তাঁর পরিবর্ত্তে তাঁর প্রধান শিষ্য লোহিতক চিকিৎসার ভার নিয়েছেন।

কস্তুরী। ঐ একই কথা। আমার কাছে ও পঞ্চশিখও যা, আর লোহিতকও তা। আর মঙ্গলা-মালিনী না হয় সেরে উঠেছে, উজ্জ্বলা-পর্ণিকা তো আর সেরে ওঠে নি। সুতরাং কথা একই দাঁড়াল।

নন্দবলা। তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু আতুরাগার থেকে হঠাৎ রন্ধনাগারে উপস্থিত হ'লে কি মনে ক'রে?

কস্তুরী। পথ ভুলে। পরমান্নের সুগন্ধ যা বেরিয়েছে, নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে এল। আজ তোদের ব্রত উদ্‌যাপন; ভাবলাম, দেখি, যদি বড়লোকের বাড়ি প্রসাদটসাদ কিছু জোটে।

নন্দবলা। ওমা, কোথায় যাব! ভোগের আগেই প্রসাদ? কি হ্যাংলা ভাই তুমি, কস্তুরীদি? আচ্ছা, বরকে তুমি পেট ভ'রে খেতে দাও, না নিজেই তার সব খাবার আগেভাগে প্রসাদ পেয়ে ব'সে থাক? তাই বলি, ভগ্নীপতি আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

কস্তুরী। আমি যা করি নিজের ঘরে করি। বরকে খেতে দিই না দিই, সে আমার খুশি। তা নিয়ে তোর অত মাথাব্যথা কেন লা? এ তো ভাল কথা নয়। (নন্দার দিকে চাহিয়া) সত্যি ভাই, যা মূর্ত্তি ক'রে ফিরেছে বিদেশ থেকে, দেখলে যেন কান্না পায়। এখন তো তবু মানুষের মত আকার হয়েছে, প্রথম যেদিন ফিরল, সেদিন যদি দেখতিস! সর্ব্বাঙ্গে ধুলো, গায়ে খড়ি উঠছে, হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে গেছে—কে বলবে তোর ভগ্নীপতি!

নন্দবলা। কি ক'রে চিনতে পারলে তুমি ভাই? গোঁফ দেখে বুঝি? তোমার কিন্তু খুব বুদ্ধি! তারপর কি করলে?

কস্তুরী। নাওয়ালাম, খাওয়ালাম। তারপর ঘরে খিল দিয়ে খুব ধমক লাগালাম। বললাম, নিশ্চয় চড়া দাম পেয়ে তুমি গায়ের মাংস বেচে খেয়েছ।

নন্দবলা। আশ্চর্য্য নয়। ক্ষত্রিয়ের ছেলে হয়ে যে ব্যবসা করতে পারে, সে সব পারে। তারপর কি বললে?

কস্তুরী। গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করলে যে, সে গায়ের মাংস বেচে নি। এর পরে আর কি ক'রে অবিশ্বাস করি? এমন মানুষ নিয়েও আমায় ঘর করতে হয়!

নন্দবলা। বড় কষ্টে আছ ব'লে তো মনে হয় না কস্তুরীদি? বেশি বুদ্ধিমান স্বামী হ'লে সেই তখন উলটে তোমায় ধমক দিত। বলত, আমি ঘরে ছিলাম না; তুমি বিরহিণী মানুষ, শূন্যগৃহে একবেণীধরা হয়ে শুকিয়ে পাকিয়ে কেঁদে ককিয়ে সলতেটি হয়ে প'ড়ে থাকবে, তা নয় তুমি যে ফুলে হাতীটি হয়ে ব'সে আছ, এর কারণ কি?

কস্তুরী। দেখ, খুঁড়িস নি বলছি। তোর ভগ্নীপতি বলেছে, আমি নাকি ভারী রোগা হয়ে গেছি।

নন্দবলা। তোমারই বর তো! তার ওপর আবার ব্যবসাদার! বলেছি তো, ব্যবসাদারকে বিশ্বাস নেই।

কস্তুরী। কি! পতিনিন্দা! সতীর সামনে! জানিস, এখনই আমি—

নন্দবলা। দোহাই তোমার, এখানে প্রাণত্যাগ ক'র না। এখনও আমাদের রান্না শেষ হয় নি, সব নষ্ট হয়ে যাবে।

কস্তুরী। বেশ, এ যাত্রা ক্ষমা করা গেল। কিন্তু সেদিন যে অত ক'রে ব'লে গেলাম, যাস নি কেন, তাই বল?

নন্দা। আতুরাগারের কাজ সেরে রান্নাবান্না ক'রে আর সময় পাই না, বোন। তারপর কেমন আজকাল একটা অবসাদ আসে অল্পেতেই, সেটাও একটা কারণ অবশ্য।

নন্দবলা। না ভাই কস্তুরীদি, ওর কথা শুন না। মা আমাদের দিনের বেলা বেরুতে বারণ ক'রে দিয়েছে। রোদ লেগে এমন কাঁচা সোনার রঙ যদি ময়লা হয়ে যায়, হবু বর যদি পছন্দ না করে, তাই।

কস্তুরী। তা সন্ধ্যের পরেও তো যেতে পারতিস। কি আমার মাতৃভক্ত মেয়ে রে!

নন্দবলা। সন্ধ্যের পর পথে বেরুব? বল কি তুমি কস্তুরীদি? আমরা তো আর ভাই, তোমার মত কালো কুচ্ছিত নই যে, কেউ চেয়েও দেখবে না। যদি চোরে চুরি ক'রে নিয়ে যায়?

কস্তুরী। তা গেলেও তো বাঁচি। তোরা কি আর তেমন ভাগ্য ক'রে এসেছিস! তোদের সবাই দেবী ব'লে দূর থেকে প্রণাম করবে রে, ভাল কেউ বাসবে না। কেউ কাছে আসতে সাহস করবে না।

নন্দবলা। নাই করুকগে। তা নিয়ে তোমার অত মাথাব্যথা কেন বল তো? তোমার কাছে আসবার, তোমাকে ভালবাসবার লোক আছে তো? তা হ'লেই হ'ল।

কস্তুরী। রাগ করিস নি ভাই। বড় দুঃখে দু একটা শক্ত কথা ব'লে ফেলি। বালাই, ষাট, তোদের ভাল না বেসে কেউ থাকতে পারে রে? আশীর্ব্বাদ করি, তোরা রাজরাণী হ, চিরসুখী হ।

নন্দবলা। একেই ব'লে বড়র পিরীতি! এই শাপমন্যি হচ্ছিল, আবার এখনই বুড়ীর মত আশীর্ব্বাদ হচ্ছে, রাজরাণী হ! আমরা রাজরাণী হ'লে তোমার কি সুবিধেটা হবে বল তো? তাম্বূল-করঙ্কবাহিনী হবার সাধ আছে বুঝি? রাজবাড়ির অঢালা পান গুপুরি যত খুশি খাবে রাণীদের নাম ক'রে?

কস্তুরী। দেখি, যদি অদৃষ্টে থাকে। তোদের ঘরে হরতুকী ছাড়া তো কিছু জুটল না। দেখি, তোদের বর কি করে।

নন্দা। রুচি!

রুচির প্রবেশ। নন্দার ইঙ্গিত অনুযায়ী কস্তুরীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া প্রস্থান

নন্দবলা। দেখ কস্তুরীদি, ভেবে চিন্তে দেখলাম, রাজরাণী হওয়া আমার ধাতে সইবে না। তার চেয়ে তোমাদের বোন হয়ে, বাবা-মার মেয়ে হয়ে জন্ম জন্ম যেন এই ছোট্ট গ্রামখানিতে কাটিয়ে যেতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ তুমি কর।

কস্তুরী। সহসা এ রকম বৈরাগ্যের কারণ?

নন্দবলা। রাণী হওয়ার ঝঞ্ঝাট কি কম! বেশ আছি ঝাড়া-হাত-পা, হেসে খেলে বেড়াচ্ছি। সে এক-গা গহনা প'রে, একরাশ দাসদাসীর মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে থেকে থেকে হাঁপিয়েই ম'রে যাব। তারপর, কে সুয়োরাণী হবে, তাই নিয়ে আবার ঝগড়া বাধবে দিদির সঙ্গে। কাজ নেই বাপু আমার রাজরাণী হয়ে।

নন্দা। (হাসিয়া) তুইই সুয়োরাণী হবি বলা। আমাকে কেবল বনের ধারে একটা পাতার কুঁড়ে বেঁধে দিতে বলিস, আমি ঘুঁটে বেচব আর খাব। কোন ভয় নেই তোর।

নন্দবলা। (গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া) হুঁ, চালাকি! শেষকালে হেঁটে কাঁটা, ওপরে কাঁটা দেওয়ার মতলব? আমি যেন বুঝি না?

সকলে হাসিয়া উঠিল। রুচি তাম্বূলকরঙ্ক আনিল। কস্তুরী পান সাজিতে বসিল। রুচি চলিয়া গেল

কস্তুরী। হ্যাঁ ভাই, তোরা কখনও রাজগৃহে গেছিস? আমার এত ইচ্ছা ক'রে যেতে, অথচ সঙ্গীসাথীর অভাবে হয়ে ওঠে না। তোরা যাবি ভাই একবার? চমৎকার দেশ নাকি শুনেছি!

নন্দা। কি ক'রে যাব ভাই? দেখছিস তো, আমাদের একদণ্ড বসবার সময় নেই, সারাদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে গেলে কি চলে? কিন্তু তোর হঠাৎ দেশভ্রমণের সখ হ'ল যে? ব্যাপার কি বল তো?

কস্তুরী। আমার স্বামী বলছিলেন, রাজগৃহে তিনি নাকি কোন্ এক নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে এসেছেন—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন! তিনি আশীর্ব্বাদ করলে নাকি সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়! যাবি একবার দেখতে তাঁকে? বল, তা হ'লে না হয় মেসোমশাইকে ব'লে ব্যবস্থা করি। বাড়ির কাজ ছুচারদিন যা হয় ক'রে চ'লে যাবে, সেজন্যে ভাবিস নি।

নন্দা। কোনও প্রয়োজন নেই কস্তুরী। আমাদের যিনি আশীর্ব্বাদ ক'রে গেছেন, তিনি ত্রিকালদর্শী মহর্ষি। তাঁর কথা যদি মিথ্যা হয়, তা হ'লে কি আর অন্য কোন অর্ব্বাচীনের কথার ওপর নির্ভর করবার মত মনের অবস্থা থাকবে, বোন?

কস্তুরী। যদি তিনি পারেন তোদের মিলন ঘটিয়ে দিতে—অন্তত চোখের দেখা?

নন্দা। তুই হাসালি বোন।

নন্দবলা। চোখের দেখার জন্য সন্ন্যাসীর সাহায্যের কি প্রয়োজন কস্তুরীদি? বাবার সাহায্য নিয়ে কপিলাবস্তু যাওয়া তো একেবারে অসম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

কস্তুরী। ঐ গর্ব্বেই তোরা গেলি! ওরে, কপিলাবস্তু গেলেও তাঁর দেখা পাবি না আর। গরিবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে। একদিন কাঁদতে হবে, এ সুযোগ ছেড়ে দিলি তার জন্যে—এই ব'লে রাখলাম। আর সাধু-সন্ন্যাসীকে অত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিস নি। কে কখন কি বেশ ধ'রে আসেন, কে বলতে পারে! (ছুইটা পান মুখে পুরিয়া) তা হ'লে আজ উঠি ভাই, উনি বাড়ি নেই, শাশুড়ী একলা আছেন।

প্রস্থানোদ্যত

নন্দা। তুই যেন কি বলতে এসেছিলি কস্তুরী? বলতে পারলি না যেন!

কস্তুরী। (অঞ্চলপ্রান্ত হইতে নির্ম্মাল্য বাহির করিয়া) গ্রামদেবতা সিরিমার নির্ম্মাল্য এনেছিলাম তোদের জন্যে। বড় জাগ্রত দেবী রে! তোরা তো বিশ্বাস করবি না কিছু! তা বিশ্বাস করিস আর না করিস, আমার মাথার দিব্যি রইল, এই ফুলগুলি উপাধানের তলায় রেখে দিস। যক্ষ, রক্ষ, কালকর্ণী, কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। আর এই সিঁদুরের রঙটা কি সুন্দর দেখেছিস? বৈশালীতে চীনদেশের বণিকদের কাছে কিনেছেন আমার স্বামী। আয় না ভাই, ছুটো টিপ পরিয়ে দিয়ে যাই। তোদের সুন্দর মুখে ভারী সুন্দর মানাবে।

উভয়কে একে একে টিপ পরাইয়া দিল

নন্দবলা। সত্যি কথা বলতে বুঝি তোমার মুখে আটকায় না কস্তুরীদি? আমি যেন জানি না? তোমার স্বামী না পুষ্করে গেছলেন? সাবিত্রী-মন্দিরের মন্ত্রপড়া সিঁদুর, আমি যেন বুঝতে পারি নি?

কস্তুরী। বেশ লো, বেশ! আমি মিথ্যাবাদী, আমি প্রতারক। সাধে কি তোদের বাড়ি আসি না? (যাইতে যাইতে) ভোরবেলা একটা সংবাদ দিস নন্দা, রাত্রে আমার ভাল ঘুম হবে না। আর সাবধান, সাধু-সন্ন্যাসী যদি কেউ আসেন, অমান্য করিস নি যেন।

চক্ষু মুছিয়া প্রস্থান

নন্দা। বললে না সব কথা খুলে। কি যেন জানে, অথচ পারলে না বলতে।

নন্দবলা। মহর্ষির কথা তোমার মনে পড়ে না দিদি? হয় তিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হবেন, না হয় তিনি লোকোত্তরচরিত্র সম্যকসম্বুদ্ধ মহাসন্ন্যাসী হবেন। সেই কথাই বোধ হয় মনে করিয়ে দিয়ে গেল কস্তুরীদি। সম্ভবত রাজকুমার প্রব্রজ্যা নিয়েছেন, এ সংবাদ বসুমিত্রদার কাছে পেয়েছে সে। আচ্ছা দিদি, সত্যই যদি তিনি প্রব্রজ্যা নিয়ে থাকেন, আমাদের কি হবে তা হ'লে?

রুচির প্রবেশ

রুচি। নন্দাদি!

নন্দা। কি বলছিস রে?

রুচি। রাগ করবে না?

নন্দা। না।

রুচি। হাসবে না?

নন্দা। না।

রুচি। আচ্ছা, ধ'রে নিয়ে এলে হয় না?

নন্দা। কাকে রে?

রুচি। রাজকুমার সিদ্ধার্থকে।

নন্দা। ধ'রে নিয়ে আসব কি রে? কি ক'রে ধ'রে নিয়ে আসব?

রুচি। লুঠ ক'রে। ডাকাতি ক'রে। রাত্তিরবেলা যদি অনেক লোকজন নিয়ে গিয়ে হঠাৎ —

নন্দবলা। তাই চল রুচি, একটা কাজের কাজ হবে। কিন্তু তার যে অনেক সৈন্য, মস্তবড় পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি, গায়ে খুব জোর। সে যদি আমাদের হারিয়ে দেয়?

রুচি। খুব জোর? তোমার চেয়েও? সুদর্শনদার চেয়েও? বসুমিত্রদার চেয়েও গায়ে জোর?

নন্দবলা। সবার চেয়ে তার জোর বেশি।

রুচি। তা হ'লে তাঁর বাড়িতে না গিয়ে রাস্তাতেই তাঁকে আচমকা ধরতে হবে। রাজার ছেলেরা তো মৃগয়া করতে যায়। আগে চর দিয়ে সন্ধান নিতে হবে। তারপর তিনি যে পথে যাবেন, সেই পথে বনের মধ্যে ফাঁদ পাতব।

নন্দা। ফাঁদ পাতবি কি রে? গর্ত্তর উপর ডালপালা বিছিয়ে ব'সে থাকবি নাকি? যেমন ক'রে বাঘ ধরে?

নন্দবলা। না ভাই, সে চলবে না। প'ড়ে গিয়ে যদি হাত পা ভেঙে যায়! খোঁড়া বর নিয়ে আমার চলবে না।

রুচি। না গো না, আমি তাই বলছি নাকি? আমি আর বলাদি আর সুদর্শনদা আর বসুমিত্রদা—আমরা চার পাশে চারটে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকব, আর নন্দাদি মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় ব'সে কাঁদবে। রাজপুত্র কান্নার শব্দ শুনে সেইখানে এলেই আমরা চারদিক থেকে বেরিয়ে প'ড়ে—। একলাকে আর চার চারজনের সঙ্গে পারতে হয় না, কি বল বলাদি?

নন্দবলা। রুচির বুদ্ধি আছে দিদি। কিন্তু দিদির যে মত হবে না বলা।

রুচি। তা হ'লে আমরা তিন জনেই যাব। ধ'রে নিয়ে একবার বাড়িতে এলে তখন নন্দাদির মত করিয়ে নোব যা হয় ক'রে, আগে নিয়ে তো আসি।

নন্দবলা। সেই ভাল, তা হ'লে আয়োজন আরম্ভ কর। খুব মোটা দেখে একটা শিকল নিতে হবে কিন্তু।

নন্দা। কিসের? সোনার, না লোহার?

নন্দবলা। বাঁধতে যদি হয়, তা হ'লে লোহার নেওয়াই ভাল, যে রকম গায়ের জোর শুনছি।

দ্বারীর প্রবেশ। রুচির প্রস্থান

নন্দা। কি সংবাদ পঞ্চায়ুধ?

দ্বারী। দুজন অতিথি এসেছেন বাইরে। আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

নন্দা। পাদ্য, আচমনীয়, আসন পেয়েছেন তাঁরা?

দ্বারী। পেয়েছেন দিদি।

নন্দবলা। কি পরিচয় তাঁদের, জেনেছ? কোথা থেকে আসছেন?

দ্বারী। তা কিছুতেই বললেন না। শুধু আপনাদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

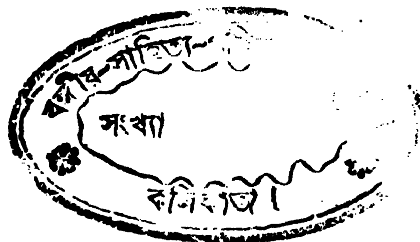
নন্দা। তুমি তাঁদের যথোচিত সম্মানসহকারে নিয়ে এস পঞ্চায়ুধ। বলা, তুই একটু ঠাঁইটা ক'রে দেনা বোন, আমি ততক্ষণ ভাত বাড়ি। রুচি!

রুচির প্রবেশ

রুচি। কি বলছেন নন্দাদি?

নন্দা। দুজন অতিথি আসছেন, এখনই আহারে বসবেন। তুই পাখাটা নিয়ে আয় না বোন। আর আচমনের জল ঠিক ক'রে রাখিস।

রুচি। যাই দিদি।


সংখ্যা

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

গোধূলি। নদীতীরে সঙ্কীর্ণ বনপথ। পিয়ালবনের মাথায় পূর্ণচন্দ্র দেখা দিয়াছে। নন্দা, নন্দবলা স্বর্ণপাত্রে অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া চলিয়াছে

নন্দবলা গাহিতেছে

মাধবী রাতে কুহকী শশী আকাশে বসি কহ কি কহে ?
কাননতল উতল করি শীতল মধু পবন বহে।
পিয়ালবনে কি আলো-ছায়া রচিল একি স্বপন-মায়া ?
জিয়াল যত মরিয়া যাওয়া হারায়ে যাওয়া মধুর মোহে।
পথের সাথী মিনতি রাখ ! এ রাতি গেলে ফিরিবে নাকো ;
মিলন যদি মাগিয়া থাক, জাগ গো জাগ, লগন বহে।

নন্দবলা। গান গাইছি বটে, কিন্তু খালি কান্না পাচ্ছে। এ আমার কি হ'ল দিদি ?

নন্দা। যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হচ্ছে বোন, ভয় পাবার কিছু নেই তো এতে। দেবতার দেউলের চূড়া তার কাছাকাছি আর সমস্ত প্রাসাদশিখরের চেয়ে উঁচু, তাই দূর থেকে ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই শিখর লক্ষ্য ক'রে চলতে চলতে তীর্থপথিক যখন তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন হয় তার বিপদ। সামনের ছোট ছোট গৃহাবলী বাধা দেয় তার দৃষ্টিকে, তীর্থরাজের দেউলের বিরাট দৃশ্য ঢেকে রাখে কিছুক্ষণের জন্য। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে তখন ভাবে, বুঝি বা সব ব্যর্থ হ'ল ! কিন্তু জিজ্ঞাসা যদি তার জাগে, তা হ'লে মন্দির খুঁজে পেতে, দেবতার দর্শন-লাভ ক'রে ধন্য হতে বেশি দেরি লাগে না তার। কারণ সে তখন অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে দেবতার। সাফল্যে সন্দেহ আসে তখনই, যখন সাফল্য প্রায় করতলগত হয়ে এসেছে।

নন্দবলা। আমাকে উপদেশ দেবার বেলা তো তুমি পঞ্চমুখ, নিজের মুখ অত ফ্যাকাশে কেন দিদি ?

নন্দা। (হাসিয়া) দূর, আমার মুখ ফ্যাকাশে হতে যাবে কোন্ দুঃখে ? আমি শুধু ভাবছি, দুজন অপরিচিত লোকের কথায় নির্ভর ক'রে বাবা-মাকে না জানিয়ে এই রাত্রে বনের মধ্যে আসা উচিত হ'ল কি না।

নন্দবলা। আশ্চর্য্য মানুষ কিন্তু ওরা দিদি। অত খাবার আয়োজন, এক কণা মুখে তুললে না। গুরু উপবাসী আছেন, তাঁকে দাওগে। আরে বাপু, তাঁকে তো দেওয়া হচ্ছেই, তোরা যা পেয়েছিস খেয়ে নে। তা নয়। আশ্চর্য্য গুরুভক্তি ! এ রকম নির্লোভ ব্রাহ্মণ আমি তো দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

নন্দা। তুই যখন যাকে বাড়াবি, তখন তাকে স্বর্গে তুলে দিবি। কত দিন কত জন যে আমাদের দান বা অন্ন গ্রহণ করেন নি, মনে পড়ে না ? আমার কেবল আশ্চর্য্য লাগছে, তাঁরা গেলেন কোথায় ? সেই তো বাড়ি থেকে আমাদের কয়েক পল পূর্ব্বে বার হলেন, তারপর তো আর দেখতে পেলাম না ! সামনে পিছনে—কোথাও দেখছি না তো ! (সম্মুখে চাহিয়া) কে যেন আসছে, না ? চেনা চেনা মনে হচ্ছে !

বসুমিত্রের প্রবেশ

বসুমিত্র। কে? নন্দা, নন্দবলা? এত রাত্রে এই নির্জ্জন পথে তোমরা চলেছ কোথায়? সঙ্গে কেউ নেই যে? কি ব্যাপার বল তো?

নন্দবলা। (অনুনয়ের স্বরে) দোহাই বসুমিত্রদা, কাউকে বলবেন না যেন। আমরা অভিসারে যাচ্ছি।

নন্দা। তোর বুঝি পাত্রাপাত্র, গুরুলঘু কিছু দেখবার দরকার হয় না বলা? ঠাট্টা করলেই হ'ল?

নন্দবলা। বারে! ভগ্নীপতির সঙ্গে ঠাট্টা করব না তো কি আচার্য্যকে ডেকে আনব ঠাট্টা করবার জন্যে?

নন্দা। আপনি এ সময়ে কোথা থেকে ফিরছেন বসুমিত্রদা?

বসুমিত্র। গেছলাম গয়শিরে। শ্রেষ্ঠী পদ্মনাভ ডেকে পাঠিয়েছিলেন একটা কাজে। ফেরবার পথে বিলম্ব হয়ে গেল। আমার পূর্ব্বপরিচিত এক সন্ন্যাসীর দেখা পেলাম। তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছিলাম একটা গাছতলায় ব'সে, সারথিকে ছুটি দিয়েছিলাম সেইখানেই। কথায় কথায় কখন সূর্য্য ডুবে গেছে জানতে পারি নি, সময়ের কোনও জ্ঞান ছিল না। তারপর তিনি নৈরঞ্জনায় স্নানে নামলেন, আমি ফিরলাম।

নন্দা। সন্ন্যাসীকে কোথায় দেখেছিলেন আপনি পূর্ব্বে? কি কথা হ'ল আপনাদের?

বসুমিত্র। অনেক কথাই হ'ল নন্দা, এক মুহূর্ত্তে তোমায় কি ক'রে সব কথা বলি! তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার রাজগৃহে আচার্য্য আরাড় কালামের আশ্রমে। প্রথমে আকৃষ্ট হই তাঁর অলোকসামান্য রূপে। তারপর মুগ্ধ হই তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যে, তারপর প্রণত হই তাঁর সর্ব্বজীবহিতেচ্ছায় অসীম আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে।

নন্দা। কি পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁর? কে তিনি?

বসুমিত্র। নিজমুখে তিনি কোনও পরিচয়ই দেন নি। বৈশালীতে গিয়ে জানতে পারি, তিনি একজন গৃহত্যাগী রাজপুত্র। সমস্ত জগৎকে রোগ-শোক জরা-মৃত্যু থেকে মুক্তি দেবেন—এই তাঁর সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পসাধনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। বলছেন, তৃপ্তি পান নি কোথাও। তবু আশা ছাড়েন নি আজও, বলছেন, আমৃত্যু চেষ্টা করবেন।

নন্দবলা। লোকটা পাগল নাকি?

বসুমিত্র। যা বল। নৈরঞ্জনাতীরের দৃশ্য বড় ভাল লেগেছে তাঁর। এইখানেই কোথাও কিছুদিন নিভৃতে তপস্যা করতে চান। আমি তো তাঁকে উরুবিল্বে যাবার পরামর্শ দিলাম—বড় মনোরম স্থান।

নন্দবলা। যে রকম রূপের বর্ণনা শুনছি সন্ন্যাসীর, তাতে কস্তুরীদির চোখে না পড়তে দেওয়াই মঙ্গল। তবে স্থান হিসেবে সেনায়নী কিন্তু কম মনোরম ছিল না।

নন্দা। সন্ন্যাসীর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা তো ক'রে এলেন বসুমিত্রদা, তাঁর কিছু খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা—

বসুমিত্র। ও প্রশ্নটা আমার মনে আসেই নি নন্দা।

নন্দবলা। তা আসবে কেন? নিজে খেয়ে বেরিয়েছেন একচোট, গয়শিরের বন্ধুগৃহে আর একপ্রস্থ চব্যচোষ্য হয়েছে নিশ্চয়। তারপর ফিরে গিয়ে কস্তুরীদির রান্না রাজভোগ আর একবার হবে। এদিকে সন্ন্যাসীর ওপর বড় ভক্তি, কিন্তু তাঁর সারাদিন আহার জুটল কিনা, সে প্রশ্ন মনেই উঠল না! আশ্চর্য্য স্বার্থপর মানুষ বটে আপনি!

বসুমিত্র। আমি যে পুরুষমানুষ বোন, আমি তো মায়ের জাত নই। তা তোমরা কোথায় চলেছ, বললে না তো? সঙ্গে কোন অনুচর নেই! এই বনের পথ!

নন্দা। চলেছি সেই সন্ন্যাসীরই কাছে বসুমিত্রদা। সারাদিন অভুক্ত আছেন তিনি। কত দূরে দেখে এসেছেন তাঁকে?

বসুমিত্র। আর বেশি দূর নয়। ঐ যে নদীর ধারে শালগাছটা, ওরই পাশে তিনি স্নানে নেমেছেন। আমি সঙ্গে যাব কি?

নন্দা। না, বসুমিত্রদা। আমরা নিজেরাই যেতে পারব। আপনি বাড়ি যান।

বসুমিত্র। আমি বরং তা হ'লে এইখানেই অপেক্ষা করি। ফেরবার সময় হয়তো সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। আজ তোমাদের দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হ'ল, না নন্দা?

নন্দা। হ্যাঁ, বসুমিত্রদা। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সার্থক হয় আমাদের ব্রত।

বসুমিত্র। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি বোন।

অষ্টম দৃশ্য

জ্যোৎস্না-রাত্রি। নৈরঞ্জনা নদীতীরে পুঞ্জিত শালতরুমূলে ভোজ্যপানীয় হস্তে নন্দা নন্দবলা দাঁড়াইয়া আছে। সন্ন্যাসী স্নান করিতেছেন। নদীর জলে চাঁদের আলো ঝিকমিক করিতেছে

নন্দবলা। দিদি!

নন্দা। কি বোন?

নন্দবলা। কি মনে হচ্ছে বল তো?

নন্দা। তোর কি মনে হচ্ছে, তা আমি কি ক'রে জানব?

নন্দবলা। মনে হচ্ছে, এই রাত যদি কখনও না ফুরতো! মাথার ওপর ঐ চৈত্রপূর্ণিমার চাঁদ, আর নদীর জলে ঐ নরচন্দ্রমা! কে বেশি সুন্দর দিদি?

নন্দা। ছিঃ বলা, আমরা ব্রতী। মনকে সংযত কর। সন্ন্যাসী কে, তার ঠিক নেই।

নন্দবলা। এখনও তার ঠিক নেই? কস্তুরীদির, বসুমিত্রদার অত কথা শোনবার পরেও? মহর্ষির কথায় সে বিশ্বাস তোমার কোথায় গেল দিদি? আজ চৈত্রপূর্ণিমার রাত্রে যে আমাদের ব্রত উদযাপন! আজ যে তিনি আসবেন! বারো বছর ধ'রে তুমি না আমায় ভরসা দিয়ে এসেছ?

নন্দা। তাই হোক বলা, তাই হোক। নারায়ণ করুন, তোর কথাই যেন সত্য হয়।

সন্ন্যাসী অন্যমনস্কভাবে তীরে উঠিয়া সিক্তবস্ত্রের পরিবর্ত্তে উত্তরীয় পরিধান করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধে চন্দ্রের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। তাহার পর সহসা দুইজন রমণীকে দেখিয়া সরিয়া যাইতেছিলেন

নন্দা। আর্য্য, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

অগ্রসর হইলে সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন

সন্ন্যাসী। কে?

নন্দা। আমরা ব্রতী; সেনায়নী গ্রামের প্রধান, মগধের ভূতপূর্ব্ব মহানায়ক মহাসেনের কন্যা আমরা। শুনলাম, আপনি উপবাসী আছেন, তাই কিছু আহার্য্য এনেছি আর্য্য।

সন্ন্যাসী। কিন্তু আমি তো কারও কাছে এ কথা বলেছি ব'লে মনে পড়ছে না! (ভাবিয়া) কে আপনাদের বললে?

নন্দা। দুজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁরা নিজেদের আপনার শিষ্য ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী। আমার তো কোন শিষ্য নেই। (সন্দেহভরে) সত্যই কি সেই পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা?

নন্দা। মিথ্যা বলবার তো কোনও প্রয়োজন ঘটে নি আর্য্য। যদি তাঁরা আপনার শিষ্য না হন, তা হ'লে বুঝতে হবে, আপনি দেবানুগৃহীত পুরুষ। এ অন্ন দেবতার দান।

সন্ন্যাসী। (উত্তেজিতভাবে) ঐ দেবানুগ্রহই আমাদের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে কল্যাণি। পুরুষকারের চেয়ে দেবানুগ্রহের লোভটা বড় হয়ে উঠেই মানুষকে মনুষ্যত্বহীন ক'রে দিচ্ছে। সম্যক চিন্তা নেই, সম্যক দৃষ্টি নেই, সম্যক চেষ্টা নেই। শিশুর মত, নির্ব্বোধের মত আমরা কেবল খুঁজছি দেবানুগ্রহ! আচ্ছা, বলতে পারেন, প্রসাদলোভী এত ভাগ্যবান থাকতে আমার মত অভাজনের ওপর দেবতাদের এত কৃপা কেন? আমি তো কারও কৃপার ভিখারী নই।

নন্দবলা। সে বোঝাপড়া আপনি দেবতাদের সঙ্গে করবেন। আপাতত আপনি ক্ষুধার্ত্ত, আপনাকে অন্নদান করা আমাদের ব্রতের অঙ্গ।

আসন পাতিয়া দিল

সন্ন্যাসী। উত্তম। আমারও কোন আপত্তি নেই। ভিক্ষাই এখন আমার বৃত্তি।

উপবেশন করিলেন

নন্দা নন্দবলা পরিবেশন করিতে লাগিল, সন্ন্যাসী নীরবে খাইতে লাগিলেন

নন্দা। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। আপনি কতদিন পূর্ব্বাশ্রম ত্যাগ করেছেন?

সন্ন্যাসী। বেশিদিন নয়। সেও এমনই পূর্ণিমার রাত্রি। ঘরে শুয়ে আমার অনিন্দ্যকান্তি— (চমকিয়া) আমাকে পূর্ব্বাশ্রমের কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না শুভে।

নন্দা। পরমান্ন যে সমস্ত প'ড়ে রইল আর্য্য। ওটুকু শেষ করুন। আর ঐ ক্ষীরগর্ভ পিষ্টকখানা—

সন্ন্যাসী। ক্ষুধানিবৃত্তির পর আর আমাদের খেতে নেই ভদ্রে।

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নন্দা ভৃঙ্গার হইতে আচমনীয় জল তাঁহার হাতে ঢালিয়া দিল, তিনি আচমন করিয়া উপবেশন করিলেন

সন্ন্যাসী। তৃপ্ত হলাম। বড় মিষ্ট লাগল আপনাদের শ্রদ্ধার দান।

নন্দবলা। আমাদের রন্ধনবিদ্যা সার্থক হ'ল আজ।

সন্ন্যাসী। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। ভোজ্যপাত্রটি পরিষ্কৃত ক'রে দেওয়া হয় নি।

নন্দবলা। আমি মেজে দিচ্ছি। (মাজিতে লাগিল।) এ থালাখানা কিন্তু আর আমাদের নয়, এখন আপনার এ।

ধুইয়া সম্মুখে রাখিল

সন্ন্যাসী। ও মহার্ঘ স্বর্ণপাত্র এই বনমধ্যে আমার কি কাজে লাগবে ভদ্রে? নিয়ে যান।

নন্দা। আমাদেরও তো আর কোনও কাজে লাগবে না ও পাত্র। আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় অতিথিকে আহার্য্যের সঙ্গে একখানি ক'রে স্বর্ণপাত্র দান করি। আজ দ্বাদশ বৎসর এই ব্রত পালন ক'রে আসছি আমরা।

সন্ন্যাসী। বুঝলাম, আপনারা বিত্তশালী। কিন্তু আমি কেন নোব? জানেন তো, সঞ্চয় করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্মবিরোধী।

নন্দবলা। আমরাই বা কি ক'রে ফিরিয়ে নোব আমাদের দান করা জিনিস? প্রয়োজন না থাকে ফেলে দিন নদীর জলে। আমরা নিরুপায়। অতিথি দান গ্রহণ না করলে সেদিন আমরা জলগ্রহণ করি না। তাই চান?

সন্ন্যাসী। ফেলে দিই? আপনাদের মনে কোনও দুঃখ হবে না?

নন্দবলা। কিছুমাত্র না। দিয়েই দেখুন। (সন্ন্যাসী থালাখানি নদীতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন) সত্যিই ফেলে দিলেন অমন সুন্দর কারুকার্য্য করা সোনার থালাখানা? একটু মায়া হ'ল না আপনার?

সন্ন্যাসী। অনেক সুন্দর জিনিসের মায়া কাটিয়ে এসেছি ভদ্রে। আমি সত্যই বড় নিষ্ঠুর। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) তা হ'লে এখন উঠতে হয়। আপনারা উপবাসী আছেন, ক্লান্ত হয়েছেন। রাতও অনেক হ'ল।

নন্দা নন্দবলা পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে গেল, সন্ন্যাসী বাধা দিলেন

নন্দা। বাধা দেবেন না। আপনি আমাদের প্রণম্য।

প্রণাম করিল

সন্ন্যাসী। বড় প্রীত হয়েছি আপনাদের ব্যবহারে। আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছা হয়। কি আশীর্ব্বাদ করব বলুন তো?

নন্দা। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা বাঞ্ছিত স্বামীলাভ করতে পারি।

সন্ন্যাসী। কে আপনাদের বাঞ্ছিত স্বামী?

নন্দা। কপিলাবস্তুর শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থ।

সন্ন্যাসী। (চমকিয়া) কি বললে?

নন্দা। শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থ। আপনি অমন চমকে উঠলেন কেন? তাঁর সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?

সন্ন্যাসী। ছিল বটে একদিন। (খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে থাকিয়া) তার পরিচয় কোথায় পেলে ভদ্রে? কোথায় মগধের দক্ষিণপ্রান্তে এই সেনায়নী, আর কোথায় হিমাচলের পাদমূলে সুদূর কপিলাবস্তু! সিদ্ধার্থের সংবাদ এখানে কি ক'রে এল?

নন্দা। আজ থেকে বারো বৎসর পূর্ব্বে গয়শিরের ব্রহ্মযোনি মন্দিরে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি অসিতদেবল এসেছিলেন। তাঁরই কাছে শুনি প্রথম শাক্যরাজকুমারের কথা।

সন্ন্যাসী। বুঝেছি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) ও আশীর্ব্বাদ তোমাদের করতে পারলাম না ভদ্রে, মার্জ্জনা কর আমাকে। তোমরা অন্য বর প্রার্থনা কর, আমার তপস্যার যদি কোন শক্তি থাকে, তোমাদের শুভ হবে।

নন্দা। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে) অন্য প্রার্থনা যে আর আমাদের নেই কিছু সন্ন্যাসী। স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও যে অন্য কোন কাম্য আর নেই আমাদের। আজ বারো বৎসর কায়মনোবাক্যে যে আমরা তাঁকে পতিজ্ঞানে পূজা ক'রে এসেছি! আমাদের স্বপ্নে তিনি, আমাদের জাগরণে তিনি, আমাদের আকৌমার কঠিন সাধনার লক্ষ্য তিনি, আমাদের ইহকাল পরকালের একমাত্র কাণ্ডারী তিনি! তাঁকে পাওয়ার প্রার্থনা ছাড়া অন্য প্রার্থনার কথা যে আমরা ভাবতেই পারি না আর্য্য! এ যে আমাদের বারো বৎসরের তপস্যা!

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মারের অনুচরী! এখানেও তোমরা এসেছ আমাকে প্রলুব্ধ করতে? রূপ দিয়ে বাঁধতে পার নি, ঐশ্বর্য্য দিয়ে বাঁধতে পার নি, এখন তপস্যা দিয়ে ভোলাতে এসেছ? পারবে না সুন্দরি, পারবে না।

ব্যঙ্গহাস্য করিলেন

নন্দা। কি বলছেন আপনি আর্য্য!

দাঁড়াইয়া তীব্রদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইলেন

সন্ন্যাসী। (দৃষ্টি নত করিয়া) কিছু না। সাময়িক একটা অপ্রকৃতিস্থতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। ভদ্রে, তোমরা যাও। শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থের লৌকিকজীবন, তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না প্রেম-প্রীতিতে বিজড়িত সাংসারিক জীবন শেষ হয়ে গেছে। সে আজ মুক্তিপথের যাত্রী। পৃথিবীময় এই যে ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর স্রোতের মধ্যে নিরুপায় নিশ্চেষ্ট মানুষের আর্ত্তনাদ উঠছে অহোরাত্র,—এ আর তার সহ্য হচ্ছে না ভদ্রে। সে চায় পথের সন্ধান, যে পথে সমস্ত সৃষ্ট জীব মুক্তিলাভ করবে এই জন্মজন্মান্তরব্যাপী মহাদুঃখের কবল থেকে। বড় কঠিন এই পথসন্ধানের সাধনা, এর জন্য চাই অমানুষিক অধ্যবসায়, অটল সঙ্কল্প। সে সঙ্কল্পের পথে কোন দুর্ব্বলতাকে সে প্রশ্রয় দেবে না, কোন ত্যাগকে সে যথেষ্ট ব'লে মনে করবে না। ভদ্রে, বড় দুঃখিত হলাম, কিন্তু তোমাদের প্রার্থনানুযায়ী বর দেবার সাধ্য আমার নেই। শুধু আমার কেন, বোধ হয় বিধাতারও নেই আজ। তপস্যা ব্যর্থ হ'ল তোমাদের।

নন্দবলা। (আর্ত্তকণ্ঠে) তপস্যা ব্যর্থ হবে? আমাদের আশৈশবের সাধনা ব্যর্থ হবে? আমাদের এতদিনের স্বপ্ন, আমাদের এতদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা—

সন্ন্যাসী। উপায় নেই ভদ্রে। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অনেক বড় সাধনা একজন আরম্ভ করেছে। তোমরা তো জান, মহর্ষি অসিতদেবল ব'লে গেছেন, ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ তথাগত আসছেন, আর্ত্তজগতের ত্রাণমন্ত্র নিয়ে আসছেন তিনি। তোমরা বোধ হয় শুনেছ, তিনি একজন শিশুরাজকুমারের মধ্যে দেখে গেছেন ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের বীজ। তাঁর কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে আর ছয় বৎসরের মধ্যে সেই মহামানবের আবির্ভাব হবে। মানুষকে দাঁড়াতে হবে প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধে নির্ম্মম কর্ম্মচক্রের গতিরোধ ক'রে; যদি কোনও বিশ্বস্রষ্টা থাকেন, তবে হয়তো তাঁরও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমস্ত জীবজগৎকে লুপ্ত করতে হবে অনন্তকালের জন্য। বড় কঠিন এই সাধনা ভদ্রে, এর মধ্যে ছোটখাটো দয়া-মায়া স্নেহ-মমতার স্থান নেই। (কিছুক্ষণ থামিয়া হাসিয়া) তোমাদের বড় সুখের স্বপ্ন ভেঙে দিলাম, না? নিষ্ঠুর সন্ন্যাসীকে মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছ? কি করব বল? আমি নিরুপায়। (কিছুক্ষণ থামিয়া নন্দাকে কাঁদিতে দেখিয়া) আচ্ছা, মানুষে মানুষকে এত ভালবাসতে পারে শুধু শোনা কথায়? চোখে না দেখে?

নন্দবলা। আমরা তোমাকে কি ক'রে বোঝাব সন্ন্যাসী? তুমি তো বুঝবে না স্থির ক'রে ব'সে আছ।

সন্ন্যাসী। বড় অসময়ে এসেছ। অনর্থক কষ্ট পেলে। (হাসিয়া) বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার কি মনে হচ্ছে জান?

নন্দা। কি মনে হচ্ছে?

সন্ন্যাসী। মনে হচ্ছে, যে কঠিন তপস্যা বারো বৎসর ধ'রে তোমরা সামান্য একজন মানুষের জন্য করেছ, সেই তপস্যা আমি যদি আমার বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করতে পারতাম! ঈর্ষা হচ্ছে তোমাদের। মনে পড়ছে আমার অতীত জীবন। বড়ই ছোট মনে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে তুলনায় নিজেকে।

নন্দা। আজ তো সে জীবন আপনার ফুরিয়ে গেছে আর্য্য, তার জন্য বৃথা অনুশোচনা করবেন না।

সন্ন্যাসী। নাঃ, অনুশোচনা কিসের? ভোগ আমাকে আলো দেখিয়েছে ত্যাগের পথে, অনুরাগ আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে বৈরাগ্যের। ওদিকেরও শেষ পর্য্যন্ত দেখেছি, এদিকেরও শেষ পর্য্যন্ত দেখে ছাড়ব। কিন্তু রাত যে বেড়ে যাচ্ছে, তোমরা কখন ফিরবে? বাড়িতে তোমাদের আত্মীয়েরা কত ভাবছেন হয়তো।

নন্দা নন্দবলা নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল

তোমরা মনে কোনও ক্ষোভ রেখো না কল্যাণি। তোমাদের রূপ আছে, অর্থ আছে, বংশ-গৌরব আছে, অনেক যোগ্যপাত্র মিলবে তোমাদের এখনও।

নন্দবলা। চুপ কর তুমি সন্ন্যাসী, ও কথা কানে শুনলেও আমাদের পাপ হয়। তুমি তা হ'লে আমাদের বর দিতে অক্ষম?

সন্ন্যাসী। সত্যই আমি অক্ষম ভদ্রে। আজ স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও শাক্যরাজকুমারের সঙ্কল্প টলাতে পারবেন না, জেনো। নারীর চিন্তা পর্য্যন্ত সে আজ বর্জ্জন করেছে, পাণিগ্রহণ তো দূরের কথা।

নন্দা। কি এমন অপরাধ নারী করেছে তাঁর কাছে? তাঁকে পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে, তাঁকে মাতৃ-রূপে স্নেহ করেছে, পত্নীরূপে ভালবেসেছে, শৈশবে যৌবনে সেবা করেছে, শান্তি দিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে—এই কি তার অপরাধ?

সন্ন্যাসী। তুমি ভুল বুঝ না ভদ্রে। অপরাধ নারীর নয়, অপরাধ নরনারীর মজ্জাগত জীবধর্ম্মের। যতক্ষণ পুরুষ সংসারী, ততক্ষণ নারী তার সৃষ্টিকার্য্যের সহায়। যখন সে মুমুক্ষু, যখন সে মুক্তিপথের যাত্রী, তখন নারী তার বন্ধন, তার প্রলোভন। নারী যদি মুমুক্ষু হয়, তখন তার সম্বন্ধেও পুরুষের বিষয়ে এই একই কথা খাটে। যতক্ষণ মনের মধ্যে এতটুকু দুর্ব্বলতা আছে, ততক্ষণ প্রলোভন থেকে স'রে থাকাই উচিত নয় কি? তোমরা তা হ'লে এবার এস। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের বিগত জীবনের ব্যর্থ তপস্যার স্মৃতি লুপ্ত হোক। ভবিষ্যৎ জীবন সার্থক হোক তোমাদের।

নন্দবলা। আমাদের কিসের ভয় দেখাও তুমি সন্ন্যাসী? বারে বারে ব্যর্থ তপস্যার কথা কি বলছ? তপস্যা ব্যর্থ হয় নি আমাদের। বাঞ্ছিতকে পেয়েছি আমরা। শুধু নাম শুনে বারো বৎসর ধ'রে যার স্বপ্ন আমরা দেখেছি, তাকে চোখে দেখে, তার মহান আদর্শের জন্য অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কাহিনী জেনে আমরা তাকে ভুলতে পারব—এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে সন্ন্যাসী? ছিঃ!

নন্দা। আর্য্য গৌতম!

সন্ন্যাসী। (চমকিয়া) বল দেবি!

নন্দা। আজ আমাদের ব্রত উদযাপনের দিন। বহু বৎসর ধ'রে এই দিনটির পথ চেয়ে ছিলাম আমরা, বহু বাধা-বিপত্তি উত্তীর্ণ হয়ে এই পবিত্র দিনটি এসে পৌঁছেছে আমাদের জীবনে। হে রাজর্ষি, হে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ, আপনি সুপাত্র। আজ পুণ্যলগ্নে আমরা আপনাকে কিছু দান করতে চাই।

গৌতম। কি দান করবে তুমি দেবি? আমার তো কোনও অভাব নেই।

নন্দা। ভুলে যাবেন না সন্ন্যাসী, কোন দুঃসহ অভাবের তাড়নায় আজ আপনি পথে পথে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

নন্দবলা। তোমার অভাব নেই সন্ন্যাসী? তোমার মত অভাব সংসারে কজনের আছে বলতে পার? মানুষ নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পায় না, তুমি সারা সংসারের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চাও! তবু বল, অভাব নেই?

নন্দা। আর্য্য, আপনি আমাদের বর দিতে চেয়েছিলেন, পারেন নি। আমরা আপনাকে একটি বর দিতে চাই। এ কামিনীর হৃদয় নয়, কাঞ্চনের ভোজনপাত্র নয়, আশা করি নিতে আপনার আপত্তির কোনও কারণ হবে না। আপনি কর্ম্মফল মানেন?

গৌতম। মানি।

নন্দা। একজনের কর্ম্মফল আর একজনের ওপর আরোপ করা যায়, বিশ্বাস করেন?

গৌতম। না।

নন্দা। পুত্রের দয়ায় বৃদ্ধ পিতা পুনর্যৌবন লাভ করেছে, শোনেন নি ? পিতার পাপে পুত্রকে প্রাণ দিতে হয়েছে, শোনেন নি ?

গৌতম। শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করি না। যদি কিছু ঘ'টে থাকে, তবে তা তাদের নিজেদের কর্ম্মফলে ঘটেছে।

নন্দা। তাই স্বীকার করলাম। এও তবে আপনার কর্ম্মফল। আর্য্য, মহর্ষির বাক্য যদি সত্য হয়, তবে আপনি আমাদের স্বামী, আমরা আপনার স্ত্রী। (সন্ন্যাসী মুখ ফিরাইলেন।) আমাদের দেহে আপনার প্রয়োজন নেই, আপনি উপেক্ষা করেছেন। সেজন্য আমরা দুঃখিত নই; বিশ্বাস করুন, সেজন্য আমরা গর্ব্বিত। আপনার সহচারিণী হবার সৌভাগ্য থেকে আপনি আমাদের বঞ্চিত করতে চান করুন, কিন্তু ধর্ম্মপথে সহধর্ম্মিণীর অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করবার সাধ্য, আর্য্য গৌতম, আপনারও নেই। আকিশোর আমরা চিত্তসংযমের সাধনা করেছি, এর পর আমৃত্যু জনসেবার মধ্য দিয়ে আত্মজয়ের সাধনা আমাদের করতে হবে। এই সাধনার, এই আজীবন তপস্যার যদি স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও কোনও শুভফল থাকে, তবে হে রাজতপস্বী, হে তাপসোত্তম, তবে তা আমরা আপনাকে দান করলাম। আমাদের তপস্যার ফল আপনার তপস্যার পথকে নির্ব্বিঘ্ন করুক, আপনার সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধির সহায় হউক। নারায়ণ জানেন, এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা আজ আমাদের আর কিছু নেই। (ভগ্নকণ্ঠে) আমাদের নিলেন না, আমাদের তপস্যা নিন।

নন্দবলা। বিশ্বাস ক'র সন্ন্যাসী, এর মধ্যে কোন প্রতারণা নেই, কোন মলিনতা নেই, এ আমাদের চেয়ে বড়, এ তোমার পূজার যোগ্য উপচার।

গৌতম। তোমাদের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করলাম কল্যাণি। (হাসিয়া) জীবনে তোমাদের সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা, এবং হয়তো এই শেষ। কিন্তু মুহূর্ত্তের পরিচয়ে নূতন পথে যে পরম পাথেয় তোমরা আমায় দিয়ে গেলে, তার প্রয়োজন ঘটেছিল। দুর্গম পথে আমার যাত্রা। বাইরে শত্রু, ভিতরে শত্রু। তোমাদের শুভকামনার স্মৃতি আমার অক্ষয় কবচ হয়ে রইল, বাইরের বিপদকে অগ্রাহ্য করতে, নিজের অন্তরের দুর্ব্বলতাকে জয় করতে তোমাদের তপস্যা আমাকে শক্তি দেবে, এ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি এখনই। তোমাদের কল্যাণ হউক, শুভে। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) এখন তা হ'লে—

নন্দা। যাই। আজ আমাদের ব্রত উদযাপন; আশীর্ব্বাদ করুন আর্য্য।

পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল

নন্দবলা আজ আমাদের ব্রত আরম্ভ; আশীর্ব্বাদ কর আর্য্যপুত্র।

সন্ন্যাসীর দুই পায়ের মধ্যে মাথা রাখিল

গৌতম। (উভয়ের মাথায় হাত দিয়া) শিবমস্তু।

কায়াকল্প

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

প্রায় সাড়ে আটটা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তারাপদ, সুধেন—এরা সব উঠিতে যাইতেছিল, বৃষ্টির জন্য আটকাইয়া গেল। আর একচোট চা আনিবার জন্য ভিতরে বলিয়া দিলাম।

তাস আর জমিল না। চা সুরু হইলে চায়ের পথে সাহিত্য আসিয়া হাজির হইল, এবং তারাপদ আধুনিক সাহিত্যকে একটু ঘা দিতেই সুধেনপ্রমুখ কয়েকজন এমন তীব্র প্রতিবাদ সুরু করিয়া দিল যে, অচিরেই ঘরের হাওয়াটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শীতের সঙ্গে বৃষ্টি মিলিয়া যে দারুণ অবস্থাটা সৃষ্টি হইয়াছিল, সেটা অনেকটা কাটিয়া গেল।

তর্ক খুব জমিয়া উঠিয়াছে, মাঘের কনকনানির উপর এই বৃষ্টির রসানের কথা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় রাস্তার দিকের দরজাটা একটু খুলিয়া গেল এবং এক ঝলক সুতীক্ষ্ণ হাওয়া এবং বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে ছাতা মুড়িতে মুড়িতে অবিনাশ-ঠাকুরদা ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা প্রায় সকলেই বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিলাম, ঠাকুরদা এ দুর্য্যোগের মধ্যে যে—এত রাত্তিরে?

ঠাকুরদা হি হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না। দুয়ারটা সম্পূর্ণ খুলিয়া গিয়া বাতাস ও বৃষ্টি জোরে প্রবেশ করিতে লাগিল, ওদিকে ছাতার জলও ঘরের মেঝেয় একখানি রুটির আকারে জমিয়া উঠিল। মনে হইল, কোন কারণে ঠাকুরদা আসিয়াই যেন অপ্রতিভ হইয়া গেছেন। উঠিয়া দুয়ারটা আবার বন্ধ করিয়া তাঁহার হাতের ছাতাটা লইয়া একটি কোণে রাখিয়া দিলাম। অবিনাশ-ঠাকুরদার একটু সম্বিত হইল, আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, না, এখানে আসি নি, তোমার গিয়ে, স্বরূপের কাছে গেছলাম। মনে করলাম, একবার দাঁড়িয়ে যাই এখানে—বৃষ্টিটা বড় জোর পড়ছে কিনা।

বুঝিলাম, স্বরূপ স্যাকরার ওখানে যাওয়ার কথাটা মিথ্যা, ঠাকুরদাকে বানাইয়া বলিতে হইয়াছে। আলনা হইতে তোয়ালে দিয়া বলিলাম, ভালই করেছেন; হাত-পাগুলো একটু মুছে নিন শিগগির। চায়ের কথা ব'লে দিই ঠাকুরদা, আপনি ওই ঈজিচেয়ারে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসুন, বৃষ্টিটা ধরুক একটু, আগে আপনাকে তামাক দিক।

চাকরটাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম।

আবার আধুনিক সাহিত্যের কথা তুলিবার চেষ্টা করা গেল; কিন্তু আর সে উত্তাপ আনা গেল না। সকলেই বুঝিতেছিলাম, অবিনাশ-ঠাকুরদা এইখানেই কোন একটা কাজে আসিয়াছেন, এবং কাজটা খুব প্রয়োজনীয় ও অল্পবিস্তর গোপনীয় বলিয়া আসার জন্য এই সময়টি বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি এমন একটি জমাট আড্ডা এখানে আজ মোটেই আশা করেন নাই। এমন রাত্রে বাহির হওয়ার মধ্যে যে একটা অদ্ভুত কৌতুকাবহতা আছে, তাহার জন্য অপ্রতিভ হইয়া গেছেন।

চা আসিল, তামাক আসিল, বৃদ্ধ কিন্তু সঙ্কোচটা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না যেন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যও ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। একে একে সবাই উঠিয়া পড়িল।

২

তখন অবস্থাটা আরও অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল। অনেক প্রশ্ন, অথচ একটিও করা যাইতেছে না। চৌকির শতরঞ্জির উপর নখ দিয়া অনন্ত হিজিবিজি কাটিয়া চলিয়াছিল; ওদিকে ঠাকুরদাদার তামাক টানা ক্রমেই অধিকতর সঘন হইতেছে, বেশ বুঝা যাইতেছে, আসিবার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কোনমতেই পারিয়া উঠিতেছেন না।

সাড়ে নয়টা বাজিল, ঘড়িই সেটা সশব্দে জানাইয়া দিল। অবশেষে আমিই প্রশ্ন করিলাম, এত রাত্রে স্বরূপের বাড়ি ঠাকুরদা?

অবিনাশ-ঠাকুরদা যেন একটা খেই পাইলেন। কয়েকবার খুব ঘন ঘন তামাক টানিয়া বলিলেন, আর ব'ল না গেরোর কথা ভাই, গয়নার কথা বারণ ক'রে দিয়ে আসতে হ'ল।

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বারণ ক'রে? কেন?

—বিয়ে করবে না।

আমি অকৃত্রিম বিস্ময়ে উঠিয়া বসিলাম, প্রশ্ন করিলাম, করবে না বিয়ে অজয়? কারণ? কি বলছে সে?

অবিনাশ-ঠাকুরদার তামাক টানার গতি প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেল। তীব্র কৌতুকে আমি উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। বেশ বুঝিলাম, সক্ষম কথাটি একেবারে কণ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে, আর বিলম্ব নাই।

ঠাকুরদা টানের ক্ষিপ্রতার উপযোগী একটা সুদীর্ঘ সুখটান দিয়া মুখ ঘুরাইয়া হুঁকাটা রাখিতে রাখিতে বলিলেন, কারণ আর কি? করব না, আমার ইচ্ছে।

এ ভাবে ঔৎসুক্য ঠেলিয়া রাখিবার জন্য রাগও হইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, তবু?

—উপহার চাই—পদ্য।—বলিয়া ঠাকুরদা আরাম-কেদারায় হেলিয়া পড়িয়া উগ্র আশঙ্কার প্রত্যাশায় আমার মুখে দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপনা হইতেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল।

বলিলাম, এই কথা? তা এর জন্যে কি বিয়ে বন্ধ হবে? আপনি স্যাকরার বাড়িতে বারণ ক'রে দিয়ে এলেন?

মুখের ভাবে বুঝিলাম, ঠাকুরদার মনটাও কতকটা হাল্কা হইয়াছে।

—তা হ'লে চাকরটাকে বল, কল্কেটা আর একবার সেজে নিয়ে আসুক।—বলিয়া চেয়ারটা আমার দিকে একটু টানিয়া লইলেন, তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, সেই পরামর্শ করতেই তো তোমার কাছে আসা শৈলেনভায়া। আজ বাদে কাল বিয়ে, সব ঠিকঠাক, শেষকালে কিনা একটা তুশ্চু উপহারের জন্যে সব ভেস্তে যাবে? কিন্তু অজুকে তো জান? যা ধরবে একবার,

ছাড়ায় কার সাধ্যি! একবার ভাবলাম, নিজেই দিই একটা লিখে; এক সময় অত যাত্রার পালা বেঁধে বেঁধে বিলি করেছি, আর আজ নাতি আবদার ধরেছে—! আবার ভাবলাম, নাঃ, শৈলেন-ভায়াকেই বলি, ও আজকাল লিখছে-টিকছে শুনছি।

বলিলাম, ঠাকুরদা, আমাদের লেখা তেমনই; তার ওপর পদ্যের কথা শুনলে তো গায়ে জ্বর আসে; একবার গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে চেষ্টা করেছিলাম; মাঝপথে এসে 'ধর্ম্ম'র মিল খুঁজতে কালঘাম ছুটে যায়, তখন কপাল মুছতে গিয়ে 'ঘর্ম্ম' কথাটা মনে পড়তে সে যাত্রা পরিত্রাণ পাই, সেই থেকে কিন্তু নাকে-খৎ দিয়েছি, আর ও-মুখো নয়।

মৃদু হাস্যের সহিত কলিকাটা হুঁকার মাথায় চড়াইয়া গোটাকতক টান দিয়া ঠাকুরদা বলিলেন, ওটা আবার সবার আসে না। তা তুমি চেষ্টা করলে পারবে—আমি তো রইলামই, কায়দা-কানুন সব বাতলে দোব। কি জান ভায়া, তোমাদের ঠানদিদি কনেবউ হয়ে এল—এগারো বছরের ছোট্ট এতটুকু মেয়েটি, মাথায় টানা চুলের খোঁপা বাঁধা, নাকে নোলকটি দুলদুল করছে, একগলা ঘোমটা—ঐসব নিয়েই পদ্য লিখেছি, হাতে টপ ক'রে অন্য জিনিস বেরোয় না। এখন নাতবউ আসবে একেবারে অন্য কেতায়—লিখলাম কষ্ট ক'রে, তারপর নাতি বোধ হয় নাক সিঁটকে বসল, তার চেয়ে—

বলিলাম, কি জানেন ঠাকুরদা? আমারও ঐ দশা—মানে কপালদোষে ঠানদিদির যুগে না জন্মালেও আমার মনটি সেই যুগেই প'ড়ে থাকে। আপনার নাতবউদের এযুগে কি আছে ঠাকুরদা যে, লোকে পদ্য লিখবে? পায়ের আলতা গেছে, মল গেছে, নাকের নোলক গেছে, মাথার বেণী যায় যায়, কাব্যরাজ্যের অর্দ্ধেক চোখা চোখা উপমাগুলোকে বেকার আর নির্ব্বিষ ক'রে আমাদের অত আদরের ভুজঙ্গিনী এই কোন্ দিন শেষ হয় দেখুন না; তখন ঘোড়ার ছাঁটা ল্যাজের মত—বিঘৎখানেক লম্বা ববের ওপর কি আর পদ্য লেখা চলবে ঠাকুরদা? ও যা গেছে যেতে দিন, বরং এক সেট ব্যাড্‌মিণ্টন কিনে দিন, দুজনে খেলে বাঁচবে।

ঠাকুরদা চক্ষু নত করিয়া নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন, একটু পরে সেই ভাবেই, মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন, চটেছ? তা প্রাণে লাগে বটে। কিন্তু তুমি তো এযুগেরই লোক ভায়া, আলাদা থাকতে তো পারবে না।

বলিলাম, আলদা থাকার কথা নয় ঠাকুরদা; পদ্য ঠেলে বের করবার জিনিস নয়, আসলে যারা তাকে টেনে বের করবে তারা গেছে বদলে। এই দেখুন না, ঠানদিদির সে সময়ের বর্ণনা আপনি একটু করেছেন কি না করেছেন—পদ্য কোথা থেকে আপনিই যেন মনে দানা বেঁধে উঠেছে।—

নোলক, রাঙা অধর-তীরে
আবেশে আছে এলায়ে প'ড়ে,
চমকি কভু ওঠে সে দুলে,
না জানি কেন, কিসের ছলে!
আজিকে ও কি স্বপন দেখে
প্রবালদ্বীপ কাহিনী······?

—একটু আটকেছে এখানে এসে, সামান্য একটু চেষ্টা করলেই এ গাঁটটা কাটিয়ে ফরফরিয়ে এগিয়ে চলবে। কিন্তু আপনার নাতবউ—কানের অর্দ্ধেকটা ফাঁপা চুলে ঢাকা, ন্যাড়া নাক, পানের অভাবে যেন খড়ি-ওঠা ঠোঁট, তাকে নিয়ে কি—

ঠাকুরদা হঠাৎ আমার বাম হস্তটা চাপিয়া ধরিলেন, প্রশংসা এবং ততোধিক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তবে যে পদ্য আসে না বলছিলে ভায়া! ধর্ম্ম ঘর্ম্ম—ওটা বুঝি রহস্য হচ্ছিল।

বলিলাম, রহস্য না ঠাকুরদা, সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম—মানে এ যুগের এরা কাব্য টেনে বের করতে পারে না ; টেবিলে কপাল ঠুকে ঠুকে তো আর—

ঠাকুরদা মুঠাটা আরও চাপিয়া ধরিলেন, কতকটা জেদ এবং তার চেয়ে বেশি মিনতির স্বরে বলিলেন, কিছু শোনা হবে না ; লিখতেই হবে তোমায় শৈলভায়া, না হয় একটু মেহনতই হবে। তবে আসল কথাটা বলব ভায়া ?

আমি বিস্মিতভাবে ঠাকুরদার মুখের পানে চাহিলাম, প্রশ্ন করিলাম, কি আসল কথা ঠাকুরদা ?

ঠাকুরদা চক্ষু নত করিয়া খুব সঘন তামাক টানিতে লাগিলেন, মুঠার চাপাটা কখন উগ্র কখন শিথিল হইতেছে, সেই দ্বিধা, ঠাকুরদা মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অবশেষে টানের গতি আরও দ্রুত করিয়া দিয়া একটা দীর্ঘ সুখটান দিয়া মুখ তুলিলেন, ধূম নির্গত করিয়া বলিলেন, ইয়ে—তোমার গিয়ে অজু উপহারের কথা বলে নি শৈলভায়া ?

খুব বিস্মিত হইলাম না ; কেন না, অজয়ের পক্ষে বলাটাই আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল। মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, তবে ?

স্পষ্ট দেখিতেছি, ঠাকুরদার চোখে কিসের একটা ঘোর লাগিয়া রহিয়াছে। হুঁকায় আবার সঘন টান, তাহার পর একটু যেন অপ্রতিভভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, শৈলভায়া, পঞ্চাশ বছর আগে তোমার ঠানদিকে ঘরে এনেছিলাম। আজ পঞ্চাশ বছর পরে নাতি নাতবউকে ঘরে আনছে ; তখনকার দিনে এসব প্রীতি-উপহার-টুপহার ছিল না—তোমার ঠানদি বেচারি বঞ্চিতই হয়েছে বলতে হবে তো। আজকাল যখন এসব হয়েছে, তখন হবে তোমার একটু মেহনৎ, তা—আর তেমন অসুবিধে হয় নোলকটা মলটা না হয় বসিয়েই দিও। আর দেখ,—ইয়ে—আমার নামেই দেবে, বুঝলে তো ?—মানে, আমি যেন পদ্যটা লিখে নাতবউকে—

ভাবের আপন বেগেই বোধ হয় ঘোরটা কাটিয়া গেল। ঠাকুরদা যেন একটু লজ্জিতভাবে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, বড্ড রাত হয়ে গেল, তাই তো! আচ্ছা, উঠি তা হ'লে এখন। যেমন হয় একটা লিখে দিও, নেহাৎ খালি যাবে ? তাই বলতে এসেছিলাম।

দরজার কাছে গিয়া একটু দাঁড়াইলেন—একটু ইতস্তত ভাব ; তাহার পর ফিরিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন, কি দিব্যি পদ্যটি এখনই বললে শৈলেনভায়া! দাও তো একটা চিরকুটে লিখে। আর কিছু নয়, একটা ভাল জিনিস উঠল তোমার মনে—ভুলে গেলেই তো গেল নষ্ট হয়ে, তার চেয়ে ভাবলাম, লিখে রেখেই দেওয়া যাক না কাছে।

কবিতাটি লিখিয়া দিলাম, আরও খানিকটা শাখা-পল্লবে বিস্তারিত করিয়া ; নোলক-প্রশস্তি শেষ হইলে, মলেরও খানিকটা বন্দনা গাঁথিয়া দিলাম।

৩

তাহার পরদিন সকালে প্রীতি-উপহারের জন্যও কাগজ কলম লইয়া বসিলাম।

কবি নই, তায় সরস্বতীর এলাকার মধ্যে প্রীতি-উপহারের মত অমন অপ্রীতিকর কিছু নাই। নিতান্ত যদি অজয় আর তাহার নববধূ লইয়াই হইত, তাহা হইলে বসিতাম না ; কিন্তু ব্যাপারটা তো ঠিক তাহাই নয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেকার একটি এগারো বছরের নোলক-পরা মেয়েকে ঠাকুরদা নবযুগের নববেশে নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আবার নূতন করিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, যে গৃহ বোধ হয় এবার শীঘ্রই একদিন তাঁহাকে ওপারের আহ্বানে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কালকের নৈশ কাব্য-অভিযানের গোড়ায় এই কথাটাই ছিল, ঠাকুরদা না চাহিয়াও ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

ভাবিলাম, জীবনে অন্তত একবার না হয় কবি হওয়ার চেষ্টাই করা যাক না। এতেও যদি কবিতা না আসে তো আসিবে কিসে ?

চতুর্থ লাইনের মিল খুঁজিতেছি, এমন সময় ভিতর-বাড়িতে হঠাৎ হাসির একটা হররা উঠিল। আরও অন্যান্য সবার সঙ্গে ঠানদিদির গলা। ঠানদিদি চলেন ঢেউয়ের মত, গতিতে থাকে হিল্লোল, আর উপস্থিতিতে সেই হিল্লোল উচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়ে।

ঠানদিদি যেখানে পৌঁছিবেন, সে জায়গাটা রসে বিদ্রূপে পানে গুলে জর্দ্দায় মুহূর্ত্তেই জাগিয়া উঠিবে—স্থানবিচার নাই, বয়সের বিচার নাই—একষট্টি বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে ঠানদিদি আর সবকেই বাতিল করিয়া মাত্র একটি অবস্থাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—তাহা রসোচ্ছল যৌবন। বুঝিলাম, নীচে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে। ঠানদিদি বলিতেছেন, না, তোরা ছাড় দিকিন একটু, যা করতে এসেছি আগে সেরে নিই সেটা। তোমার কর্ত্তাটি কোথায় গো ? তার ঘাড়ে কাব্যি চাপিয়েছে শুনলাম ! সাবধানে থাকিস বাছা, অমন জবরদস্ত সতীন আর নেই, ভুগেছি কিনা এককালে !

গৃহিণী কিছু উত্তর দিল, কি না দিল বোঝা গেল না। ভগ্নীর কণ্ঠস্বর শুনিলাম, দাদা ওপরে ঠানদি, চল না।

তোরা ব'স, একটু আমি ভূত ছাড়িয়ে আসি। বউ, আমার ফী যোগাড় ক'রে রাখ—পান থেঁতো ক'রে।

মিশ্র বিদ্রূপ-কলরবের মধ্যে কে কি বলিল, শুনিতে পাইলাম না—মাত্র একটা প্রবলতর হাসির উচ্ছ্বাস উঠিয়া আসিল। একটু পরেই সিঁড়িতে শুনিলাম, নাঃ, আর পারি না বাছা। বয়েসের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আর ছাতের সিঁড়ি ভাঙা কুলিয়ে ওঠে না ক্ষ্যামতায়। কোথায় গো কবি-মানুষ ?

বলিলাম, আসুন ঠানদি, কি সৌভাগ্য ! কিন্তু ওকি অলুক্ষুণে কথা ! বয়সের সিঁড়ি ভেঙে আপনি তো নীচের দিকেই গেছেন—আপনার ৬১কে আমরা তো ১৬ ব'লেই জানি ঠানদি।

—না ভাই, আর চলে না।—বলিয়া ঠানদিদি একটু ক্লান্তভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর টিনের ডিবা হইতে মুখে একটু গুল আলগোছে ফেলিয়া বলিলেন, মিন্সে বুঝি ঘাড়ে কাব্যি চাপিয়ে গেছে কাল রাত্তিরে এসে ? মুয়ে আগুন, সাতটা কাল আমায় জ্বালিয়েছে, এখন—কাল রাত্তিরে ভিজে চুপসে বাড়ি গিয়ে হাজির। কি গো, একি কাণ্ড ! তা বলতে কি চায় ! শেষকালে, অনেক কষ্টে—কি ? না, শৈলেনকে পির্‌তি-উপহারটা লেখবার মালমসলা দিয়ে এলাম। কি আদাড়ে ঝোঁকে বল তো !—মুয়ে আগুন ! খবরদার আর ওমুখো হবে না। শেষকালে শীতে-বাদলে সান্নিপাতিক ধরুক ; কিন্তু ঝোঁক তো জানি, তাই ভাবলাম একবার দেখে আসি না হয়, ব'লে আসি তাড়াতাড়ি যা হয় একটা দিক নিকে। তা কিছু নিকলে নাকি ? যা হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেল ভাই।

বলিলাম, চেষ্টা তো করছি ঠানদি, কিন্তু হচ্ছে কই ?—এই দেখুন না। সেই কথাই তো বলছিলাম ঠাকুরদাকে—বলি, ঠানদির আমলের আপনারা যেমন এক কথাতেই কবি হয়ে উঠতে পারতেন—এযুগের এদের নিয়ে কি আমরা পারি তেমন ?

ঠানদিদির মুখটা ভিতর থেকে যেন একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল। গালের পান মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, মুয়ে আগুন ! কবি না হাতী—তবে জ্বালিয়েছে অনেক বটে। নিকছে তো নিকেই যাচ্ছে, ব'সে আছে তো কলম ধ'রে ব'সেই আছে, খাবার জুড়িয়ে যায়, পহরের পর পহর রাত কেটে যাচ্ছে, পাড়া নিষুতি, লেখার আর বিরাম নেই—নোলক, খোঁপা ছাইভস্ম—সে সব কি মনেও আছে গা ? না, সে আজকের কথা ? তাই বউকে বলছিলাম, বলি, বউ, অমন সতীন যেন ঘরে না ঢোকে—দেখিস।—ঠানদি ঘাড়টা উল্টাইয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলাম, আপনার নাতবউয়ের সে ভয় নেই ঠানদিদি, এ যা সতীন, এ সতীনের টানেই আসে।

যেন মনে হইল, ঠানদিদি মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তা, এতই যদি উপহারের ঝোঁক তো নিজেই লিখুক না মিন্‌সে।—বলিয়া অনুপস্থিত ঠাকুরদার উদ্দেশ্যে নথের একটা তীব্র ঝাঁকানি দিলেন।

বলিলাম, তা হ'লে তো খুবই ভাল হ'ত, বিশেষ ক'রে তাঁর নিজের নামে যখন লিখতে বলেছেন ; কিন্তু কাজের ভিড়ে রয়েছেন, তায় আবার অভ্যেসটাও বোধ হয় ছেড়ে গেছে—

—পোড়াকপাল, কাজ তো ভারী ! নাতির বিয়েতে রস আরও নতুন ক'রে চাগিয়ে উঠেছে—অসৈরণ ! আর অভ্যেস ছাড়বে ? বলে, স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে,—কাল আদ্ধেক রাত পর্য্যন্ত—

ঠানদিদি হঠাৎ থামিয়া গিয়া মুখে খানিকটা গুল ফেলিয়া দিলেন। আমি কোন প্রশ্ন করিলাম

না, মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ঠানদিদি, আমার চোখে চোখ পড়িতেই হঠাৎ যেন একটু বেশিরকম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সেটা কাটাইবার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক মুখের পান ফেলিবার অছিলায় জানালার কাছে উঠিয়া গেলেন, এবং পান ফেলিতে ফেলিতে বাহিরের দিকেই চাহিয়া বলিলেন, আমি বলছিলাম কি শৈল? পারিস তো মাথা ঘামিয়ে নেক, আর না পারিস তো এক উপায় আছে।

উৎসুকভাবে বলিলাম, পারছি যে কত সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কোন উপায় থাকে তো বলুনই না ঠানদি, রেহাই পাই।

—আছে উপায়।—বলিয়া ঠানদিদি আসিয়া আবার চেয়ারে বসিলেন। বোধ হয় যেন একটু কম্পিত হস্তেই আবার খানিকটা গুল মুখে দিলেন, তাহার পর আঁচলের একটা গেরো খুলিতে খুলিতে বলিলেন, আর সবই কোন্ চুলোয় কবে গেছে—নাতবউ এলে মুখ দেখব কি দিয়ে, তাই বাক্স থেকে একটা গয়না বের করতে গিয়ে এই দুটো হাতে ঠেকল। আমি কি ছাই পড়তে জানি, না ভাল লাগে? দু চক্ষের বালাই! তা নাহক মাথাখারাপ না ক'রে তুই ওই দুটো দিয়েই পিরতি-উপহার না কি—তাই নিকে দে—বুড়োর নামে বলেছে, ওর নামেই দে,—সম্বন্ধে তো আটকাবে না; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে ফিরিয়ে দিস বাপু, আমি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলব। এই সব কাব্যি হ'ত তোমাদের ঠানদিকে উপলক্ষি ক'রে—মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন—চিরকালটা এইভাবে জ্বালিয়েছে কম?

ঠানদিদি আর বসিলেন না। কেমন একটা লজ্জা, গৌরব আর সেই সঙ্গে কতকটা অবহেলার ব্যর্থ প্রয়াসের সঙ্গে দুই টুকরা কাগজ আমার হাতে দিয়া উঠিয়া গেলেন।

* * * *

কাগজ দুইটি খুলিলাম। একটির বয়স অর্দ্ধশতাব্দীর কাছাকাছি হইবে। সেকালের অনুপ্রাসবহুল একটি পদ্য—ভাল পড়া যায় না, কালি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহার উপর তাম্রাভ কাগজটি ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ, নীচে এক টুকরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাগজ দিয়া খণ্ড অংশগুলি জোড়া, তাহাও উল্টাপাল্টা করিয়া। তবে বুঝিলাম, যাহার উদ্দেশ্যে লেখা, সে 'দ্বাদশকলা বিধু জিনি—' কিছু একটা।

অপর টুকরাটি পড়িতে কষ্ট হইল না; একটু বিস্ময় হইল, যদিও তাহাও না হওয়াই উচিত ছিল, এটি কালকের আমারই লেখা নোলক-মলের স্তবগান। বুঝিলাম, ঠাকুরদাদা নিজের নামে চালাইয়া ঠানদিদিকে উপঢৌকন দিয়াছেন, ঠানদিদির নোলক-মলের যুগ স্মরণ করিয়া। ভাল, আমার কবিতা 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' কোন তরুণীর হাতে না পৌঁছাক, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের একটি দ্বাদশীর সুপ্তিতে সে আঘাত দিয়াছে, এটাই কি কম কথা?

'কাল আদ্ধেক রাত পর্য্যন্ত—' ঠানদিদির সেই অর্দ্ধসমাপ্ত অনুযোগের অর্থটাও বোঝা গেল।

কিন্তু সত্যই কি অনুযোগ? বা অনুযোগটা কি সত্য? একা কি ঠাকুরদাদারই দোষ? নাতি, যাহাকে শানাইয়ের বাঁশীর সঙ্গে ঘরে আনিতেছে, তাহার মধ্য দিয়া ঠানদিদিও কি পঞ্চাশ বৎসরের আগেকার পুরানো গীতি, পুরানো প্রীতি নূতন করিয়া আদায় করিয়া লইতে চাহেন না?

মাধ্যাকর্ষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ডি. এস-সি.

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের নানা শাখায় বহু রহস্যের সমাধান হইয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে, ফলিতবিজ্ঞানের নানা ব্যবস্থা বর্ত্তমান সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিবিধ ব্যবহারে প্রযুক্ত হইতেছে। জড়বিজ্ঞানের কৌশলে স্থানের ব্যবধান প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। ঘরে বসিয়া নিমেষে পৃথিবীর অপর প্রান্তের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ঘণ্টায় ৪০০ মাইলেরও অধিক বেগে নানা আকাশযান আকাশপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে। এই সকল অলৌকিক ব্যাপার প্রতিনিয়ত জ্ঞানগোচর করিয়া বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য কে না কীর্ত্তন করিবে? কিন্তু এই সব সত্ত্বেও, এ কথা বলা চলে যে, কোন কোন রহস্যের সন্ধান এখনও বিজ্ঞান পায় নাই। বিদ্যুৎ-শক্তি নানা প্রকারে সভ্যতার উপকরণ সরবরাহ করিতেছে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য হইলেও, "বিদ্যুৎ কি" এই প্রশ্নের সদুত্তর এই বিংশ শতাব্দীতেও বৈজ্ঞানিক দিতে অসমর্থ। কিংবা, আপেল-ফলের ভূপতনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া যে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব বাল্যে আমাদিগকে অনুসন্ধিৎসু হইতে উৎসাহিত করিয়াছে, তাহাও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত একই প্রকার রহস্যাবৃত রহিয়াছে। নিউটনের আবির্ভাবের পর প্রায় ২৫০ বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে; অনেক অজানা, অনেক অজ্ঞেয় পরিচিত ও জ্ঞানগম্য হইয়াছে; কিন্তু সুধী মানবের নানা প্রকার প্রচেষ্টায়ও মাধ্যাকর্ষণ-রহস্য প্রায় সমভাবে অজ্ঞেয়ই রহিয়াছে। অতি বিস্ময়জনক ও স্বয়ম্ভূ এই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি সম্বন্ধে এ যাবৎ কি জ্ঞান আহরিত হইয়াছে ও এই শক্তির কার্য্যক্রম আয়ত্ত করিবার জন্য কি ভাবে প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তি বিবেচনা করা প্রয়োজন। আবার কোন মতবাদ হইতে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব কেবল যে তৎসম্পর্কীয় জ্ঞাত ঘটনাসমূহের কারণ নির্ণয় করিবে, তাহা নহে; ইহা হইতে এমন কোন ঘটনার সম্ভাব্যতা সূচিত হইবে না, যাহার কোন অস্তিত্ব নাই। বস্তুত, কোন তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে হইলে শেষোক্ত বিষয়টি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশেষত, আমাদের পরিচিত বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বের সহিত মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের সাম্য অপেক্ষা বৈষম্যই অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই জন্যই ইহার দুরূহতাও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

দুইটি বস্তু পরস্পর ব্যবধানে অবস্থিত হইয়াও যে শক্তির বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহারই নাম মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি। এই শক্তির ক্রিয়াকলাপ নিউটন গণিতের ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রাখর্য্য দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়। শক্তির প্রাখর্য্য নির্দ্ধারণের এই নীতি আলোক-তাপ-শব্দ-বিদ্যুৎ-চুম্বকাদি সর্ব্বপ্রকার শক্তির ক্রিয়াতেই পরিস্ফুট। ইহা পরীক্ষা-প্রতিপন্ন সত্য ও এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। সুতরাং এই রীতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে আমাদের সুপরিচিত বিদ্যুদাদি শক্তি মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

পরীক্ষাগারে যে সকল পদার্থে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্রিয়া পরীক্ষিত হয়, তাহারা আকারে ক্ষুদ্র, ও তাহাদের ব্যবধানও অল্প। কিন্তু বিশালকায় পদার্থসমূহ বহু দূরে স্থাপিত করিয়া পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য বীক্ষণাগারে না হইলেও, অসীম শূন্যে হইতে পারে। এ কথা সকলেই জানে যে, আকাশচারী গ্রহ-উপগ্রহাদির গতিবিধি তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং এই গতির বিধিও পূর্ব্বে কথিত আকৃষ্যমান পদার্থদ্বয়ের দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে প্রদত্ত হইবে। বিশেষত, এই প্রকার পরীক্ষায় রীতির সামান্য ব্যতিক্রম—যাহা সাধারণ পরীক্ষাগারে ধরিবার কোন উপায়ই নাই—ধরা পড়িবে। কারণ, এই ক্ষেত্রে যে কোন একটি জ্যোতিষ্কের গতি শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্য্যবেক্ষণ করা চলিবে ও সামান্য ব্যতিক্রমও তিল তিল করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিশালরূপে দৃষ্ট হইবে। আবার বহু গ্রহ লইয়া বিচার করিয়া বহু প্রমাণও সংগ্রহ করা যাইবে। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, গ্রহগণের গতিবিধি সাধারণত অতি সূক্ষ্মভাবেই উপরের নিয়মের অধীন। কিন্তু কোথাও কোনও ব্যতিক্রম লক্ষিত না হইলেও, নিউটনের তিরোভাবের পর একবার এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লেভেরিয়ার (Leverrier) প্রথমে বিজ্ঞাপিত করেন যে, বুধগ্রহের গতিতে নিয়মের সামান্য একটু ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। ব্যতিক্রম এত অধিক যে, বীক্ষণ-যন্ত্র-জনিত কোন দোষে এরূপ ঘটিতেছে মনে করা চলে না। এই ব্যতিক্রম যে সত্য সত্যই বিদ্যমান, তাহা পরে আরও পরীক্ষকের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয়। নিউটন-প্রদত্ত নিয়ম মানিতে গেলে, এই ব্যতিক্রমের কোনও প্রমাণ হয় না। তখন এমন প্রস্তাব হইল যে, নিউটনের নিয়মে দূরত্বের ঘাত ২ না হইয়া ২·০০০০০০১৬১২ হইবে। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন মঙ্গলগ্রহের আবিষ্কর্ত্তা আসাফ হল (Asaph Hall) ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। নিউকোম-প্রমুখ অনেক যশস্বী জ্যোতির্ব্বিদ এই নিয়ম গ্রহণও করেন। কিন্তু ব্রাউন দেখাইলেন যে, এরূপে বুধগ্রহের গতি-ব্যতিক্রম দূর হয় বটে, কিন্তু চন্দ্রের গতিতে নূতন অনিয়ম সৃষ্ট হয়। এজন্য নিউটনের নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু বুধগ্রহের গতি-ব্যতিক্রম প্রহেলিকাময়ই থাকিয়া যায়।

পৃথিবী ও অন্যান্য পদার্থের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্রিয়া লইয়া বহু পরীক্ষা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট পরীক্ষা পেণ্ডুলম বা দোলক পরীক্ষা। পৃথিবী-প্রোথিত কোন উচ্চ দণ্ডে কোন গোলক সূক্ষ্ম সূত্রসহযোগে প্রলম্বিত করিয়া একটু দোলাইয়া ছাড়িয়া দিলে গোলকটি আপনা হইতেই অনেকবার দুলিয়া থামিয়া যায়। গোলকটির উপর অন্যান্য শক্তির সহিত পৃথিবীর আকর্ষণজনিত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। উহার দোলন-পর্য্যায়কাল মোটামুটি উহার দৈর্ঘ্য ও মাধ্যাকর্ষণ-ক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীর আকর্ষণে কোনও বস্তু যখন পড়িতে থাকে, তখন উহার গতিবৃদ্ধি হইতে থাকে। যন্ত্রবিজ্ঞানের নিয়মে এই গতিবৃদ্ধি সকল বস্তুতে সমান। এজন্য নিউটন সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কতকগুলি দোলক প্রস্তুত করেন। উহাদের প্রান্তস্থিত গোলক একাকৃতির হইলেও বিভিন্ন পদার্থ হইতে প্রস্তুত। এই সকল পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, এই সকল দোলকের পর্য্যায়কাল এক, অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণজনিত গতিবৃদ্ধি সকল বস্তুতেই এক। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাসেল (Bassel) আরও সূক্ষ্মতর

পরীক্ষায় সেই সত্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি গোলকের জন্য উল্কাপিণ্ডের লৌহ ও প্রস্তরও ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন। আবার এই দোলক-পরীক্ষা বর্ত্তমান শতাব্দীতে এওত্ভস (Eotvos) ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ (Ann. d. physik, 68, 1922 pp. 11-66) অধিকতর সূক্ষ্মযন্ত্রে অতি নিপুণতায় নিষ্পন্ন করেন। ইঁহারা গোলকের জন্য বহু বস্তু ব্যবহার করেন। তুতিয়া স্ফটিকাবস্থায় ও জলে দ্রবণ করিয়া ব্যবহার করিয়া একই বস্তুর অবস্থান্তরে তাহার উপর মাধ্যাকর্ষণজনিত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটে কি না, ইহাও তাঁহারা পরীক্ষা করেন। স্ফটিকবংশীয় কুয়ার্ট্জ, আইস্‌ল্যাণ্ড স্পার প্রভৃতি পদার্থের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দিকে এক ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই। এই সকল পদার্থে আলোক-তাপাদি শক্তির ক্রিয়ায় নানা দিকে নানা গুণ প্রকটিত হয়। কিন্তু ইহাদেরই নানা প্রকারে কর্ত্তিত গোলক সাহায্যে দোলক-পরীক্ষায় মাধ্যাকর্ষণের কোনও ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই। নানা জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণ ও পরে তাহাদের সংশ্লেষণ-সঞ্জাত নব পদার্থ লইয়া দোলকের গোলকে ব্যবহারেও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্রিয়ায় কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। এই সকল পরীক্ষায় মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ আলোক-তাপাদি শক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়াই সাব্যস্ত হয়।

পদার্থের উষ্ণতায় তাহাদের উপর আলোক-তাপাদি শক্তির ক্রিয়ায় পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পি. ই. শ (P. E. Shaw) এক বিশেষ পরীক্ষায় প্রদর্শন করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্রিয়া পদার্থের উষ্ণতার উপর বিন্দুমাত্রও নির্ভর করে না। আকাশ-পর্য্যবেক্ষণ হইতেও ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা যায়। ধূমকেতু আকাশে পর্য্যটন করিতে করিতে একবার সূর্য্যের অতি নিকটে আসে। সেই সময়ে উহার উষ্ণতা সৌরসান্নিধ্যে সমধিক বর্দ্ধিত হয়। এজন্য মাধ্যাকর্ষণশক্তির ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইলে ধূমকেতু প্রত্যাবর্ত্তনপথে কক্ষভ্রষ্ট হইবে। কিন্তু সকল ধূমকেতুই চিরকাল স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষেই পরিভ্রমণ করে। কখনও কাহারও কক্ষের সামান্য পরিবর্ত্তনও দৃষ্ট হয় নাই।

আলোক-তাপাদি সকল শক্তিই প্রবাহের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট গতিতে প্রধাবিত হয়। ইহাদের কোন আধার কোন এক স্থানে স্থাপন করিলে দূরবর্ত্তী স্থানে শক্তি বিকাশে কতক সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালেই নানা পরীক্ষায় মাধ্যাকর্ষণের ঐ প্রকার গতিবেগ থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আলোকের গতিবেগ অত্যন্ত অধিক। উহার সমতুল্য গতিবেগ আর কোন বস্তুতে সম্ভব নহে। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণের গতিবেগ অসীম না হইলেও আলোকের গতিবেগাপেক্ষাও অধিক হইবে। তবে অন্যান্য শক্তির সহিত মাধ্যাকর্ষণ্-শক্তির এক বিশেষ পার্থক্য এই যে, উহারা একমুখী; পক্ষান্তরে মাধ্যাকর্ষণ দ্বিমুখী বল। সূর্য্য পৃথিবীকে যে বলে আকর্ষণ করে, পৃথিবীও ঠিক সেই বলে সূর্য্যকে আকর্ষণ করে। বিশেষত এই আকর্ষণ সকল দিকে সকল পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিজনিত বলের কোন নির্দ্দিষ্ট দিক্ নির্দ্দেশ করা যায় না।

আর এক বিষয়ে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আলোক-তাপাদি শক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আলোক-তাপ-শব্দ-বিদ্যুৎ বা চুম্বক শক্তি প্রহত করিতে পারে এমন পদার্থ বিদ্যমান। সেই সকল পদার্থ দ্বারা তিরস্করণী প্রস্তুত করিলে তাহার সাহায্যে এই সকল শক্তির ক্রিয়া স্থানবিশেষে নিবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু এমন কোন পদার্থই দেখা যায় না, যাহা মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি প্রহত করিতে পারে, কিংবা কোন প্রকার

তিরস্করণীই পাওয়া যায় না, যাহার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্রিয়া স্থানবিশেষে আবদ্ধ রাখা যায়। ইহারও সার্থকতা জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণ হইতেই পাওয়া যায়। চন্দ্রগ্রহণের সময়ে পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে উপস্থিত হয়। এই সময়ে পৃথিবী-তিরস্করণী প্রভাবে সূর্য্যের আকর্ষণ বিন্দুমাত্রও প্রহত হইলে চন্দ্রের গতিতে তাহা প্রকট হইত। কিন্তু বারবার চন্দ্রগ্রহণের ফলেও তাহার গতিবেগে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

এই সকল পর্য্যবেক্ষণলব্ধ ফল হইতে এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, মাধ্যাকর্ষণ অতি দূরধিগম্য বিষয়। নানা পরীক্ষায় ইহাই পরিস্ফুট হয় যে, দুই বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ কেবলমাত্র তাহাদের বস্তুপরিমাণ ও ত্রিমাত্রিক দেশে অবস্থান দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ইহার অন্য কোন গুণধর্ম্ম সূক্ষ্মতম পরীক্ষায়ও প্রতিভাত হয় না। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির স্বরূপ যেন এক দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত। তথাপি অনুসন্ধিৎসু মনীষিগণ নানা প্রকারে উহাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন। এক্ষণে তাঁহাদের কথাই সংক্ষেপে বলিব।

গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততল (Aristotle) পদার্থে গুরুত্ব ও লঘুত্ব গুণ আরোপ করিয়া মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্রিয়া বিচার করিতেন। তাঁহার মতে যাহা হাওয়ায় ভাসে—যেমন ধূম ও অন্যান্য বাষ্প—তাহাই লঘু ও তদ্বিপরীতধর্ম্মী পদার্থমাত্রেই ভারী। বস্তুতঃ পদার্থের গুরুত্ব বা লঘুত্ব বিচারে তাহাদের প্লবনশীলতা ধর্ম্মই যে একমাত্র বিবেচ্য, এ তত্ত্ব আরিস্ততলের জানা ছিল না। কিন্তু আরিস্ততলের প্রভাব এমন সর্ব্বজয়ী ছিল যে, তাঁহার এই বিচারপ্রণালী অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও বহু বৈজ্ঞানিকের নিকট নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য হইত। এই মতবাদে অনুপ্রাণিত হইয়াই মন্ট গল্‌ফার (Mont Golfier) ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে ধূম পরিপূরিত বেলুন উড্ডীয়মান করেন। ধূম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থে পরিপূর্ণ বেলুন আকাশে উড়িতে পারে না—ইহাই তাঁহাদের স্থিরবিশ্বাস ছিল। কিন্তু পদার্থের প্লাবিতাগুণ পরিজ্ঞাত হওয়ার পরই বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পতনশীল পদার্থের ধর্ম্মসম্বন্ধেও আরিস্ততলের ধারণা ভ্রমপূর্ণ ছিল। তাঁহার মতে পতনশীল পদার্থের গতিবৃদ্ধি তাহার ওজনের সমানুপাতিক। গ্যালিলিওর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নানা পরীক্ষায় এই মতের ভ্রম প্রদর্শিত হইলেও গ্যালিলিওর সময় পর্য্যন্ত (১৫৬৪-১৬৪২) আরিস্ততলের উক্ত মতবাদ অনেকের নিকট অবিসংবাদী সত্যরূপে গৃহীত হইত।

যাহা হউক, আরিস্ততল, গ্যালিলিও বা তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী যুগের কোন বৈজ্ঞানিকই মাধ্যাকর্ষণের মূল কারণ সম্বন্ধে কোন মতবাদ প্রচার করিতে সমর্থ হন নাই। এমন কি, নিউটনও মাধ্যাকর্ষণের কারণনির্ণয়ে প্রয়াসী হন নাই। তবে বয়েল-(Boyle)-এর নিকট লিখিত এক পত্রে নিউটন লিখিয়াছিলেন যে, নানা বস্তুর প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণের কারণ এই হইতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের উপরে ইথরের নানা স্তরের গুরুত্ব বিভিন্ন।

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভার বৈজ্ঞানিক ল্য সাঝ (Le sage) এক বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করেন। ধরা যাউক, দুইটি বৃত্তাকার স্থালী পরস্পর সমান্তরালে অবস্থিত ও এই ভাবে উহারা এক শিলাবৃষ্টিতে সংস্থাপিত হইয়াছে। ঝড় এত প্রচণ্ড যে, চতুর্দ্দিক্ হইতেই যেন শিলাবৃষ্টি হইতেছে। তাহা হইলেই

দেখা যাইবে যে, স্থালী দুইটির পরস্পর ভিতর দিকে শিলাঘাত স্বল্প হইবে। তাহারা যেন ঐ অংশ শিলাঘাত হইতে রক্ষা করিতেছে। বাহিরের শিলাঘাতে স্থালী দুইটি যতই সন্নিকটবর্ত্তী হইবে, উহাদের উক্ত রক্ষণশীলতা ততই পরিপূর্ণ হইবে। তাহা হইতে মনে হয় যে, স্থালী দুইটিকে সন্নিকটস্থ করিবার জন্য যেন এক প্রতাড়ন-বল ক্রিয়মান হইয়াছে ; উহাদের ব্যবধান যতই হ্রাস পাইবে, প্রতাড়ন-বলও তত বৃদ্ধি পাইবে। ল্য সাঝের মতে আমাদের এই বিশ্বজগৎ এক প্রকার অপার্থিব কণায় পরিপূর্ণ। ইহারা গ্যাসীয় পরমাণুর ন্যায় সর্ব্বদিকে ধাবমান ও পরস্পর সন্নিকটস্থ পদার্থদ্বয়কে ঠেলিয়া নিকটতর করিতে চেষ্টা করে। এই মতবাদের বিপক্ষে নানা যুক্তি রহিয়াছে।—

(১) কোন প্রকার কণাদ্বারা প্রহত হইলে পদার্থে তাপ উৎপন্ন হইবে। এই ভাবে কোন প্রকার শক্তির অপচয় না হইয়াও তাপ-শক্তির প্রজনন বিজ্ঞানসম্মত নহে।

(২) কোন আবদ্ধ স্থানের অন্তর্গত দেশ আংশিকভাবেও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি হইতে বিযুক্ত হইবে, কারণ সে স্থলে অপার্থিব কণার অবাধপ্রবেশ নাই। কিন্তু এ তত্ত্ব পরীক্ষায় সমর্থিত নহে।

এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ল্য সাঝের সময়ে শক্তির নিত্যতা ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির তিরস্করণীর অভাব বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে পরিজ্ঞাত ছিল না। যাহা হউক, এই মতবাদ বহুকাল বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে ও ইহাকেই ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া আরও বহু প্রকার মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ এক প্রকার প্রতাড়ন-বল, প্রকর্ষণ-বল নহে—এই বৈশিষ্ট্যও পরবর্ত্তী প্রায় সকল মতবাদেই গৃহীত হইয়াছে। এমন কি, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সার্ অলিভার লজ (Nature, Jan. 25, 1883, 305) বৈদ্যুতিক আকর্ষণকেও প্রতাড়ন-বল রূপেই ব্যাখ্যাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে দুইটি পদার্থের পরস্পর আকর্ষণের কোন হেতু বাহ্যত দৃষ্টিগোচর না হইলেও মানব-মনের প্রকৃতিতেই তাহাকে প্রকর্ষণ-বল বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু অনুধাবন করিলেই প্রতীত হইবে যে, বলটি প্রতাড়ক। যখন বলি, ঘোড়ায় গাড়ি টানে, তখন বাস্তবিক অশ্ব তাহার স্কন্ধে সংস্থাপিত বেষ্টনীতে ঠেলা দেয়। আমাদের সাংসারিক জীবনেও দুইটি পদের ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যখন আমাদের মধ্যে কাহারও চাকুরিতে আকস্মিক উন্নতি দেখা যায়, তখন যদিও বলি যে, তাহাকে টানিয়া তোলা হইতেছে ; কিন্তু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, বাস্তবিক তাহাকে ঠেলিয়া তোলা হইতেছে। যাহা হউক, ল্য সাঝের মতবাদ তাঁহার পরবর্ত্তীগণের হস্তে সবিশেষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার অপার্থিব কণাই ক্রমে কণাস্রোত ও অবশেষে পরবর্ত্তী যুগের ইথরে পরিবর্ত্তিত হয়। তবে পূর্ব্বে বর্ণিত নানা কারণে এই মতবাদ ও অন্যান্য মতবাদের ন্যায় স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হয় নাই।

অতঃপর, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কেল্‌ভিন এক মতবাদ প্রচার করেন। সেই মতে ইথরে আবর্ত্তগতি উৎপন্ন হইয়াই পরমাণুর উদ্ভব। এজন্য এই মতবাদ "আবর্ত্ত পরমাণুর মতবাদ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রশ্ন উঠিল যে, এই সকল পরমাণুর ভিতর পরস্পর মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়মান হইবে কি না? গণিতের সহায়তায় ম্যাক্স্‌ওয়েল, থম্‌সন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণের কোন কারণ পাইলেন না ও কেল্‌ভিনও তাঁহার মতবাদ পরিহার করিলেন।

এই ভাবে নানা প্রচেষ্টায় মাধ্যাকর্ষণের কোন সুসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া গেল না। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিরাশার স্থান নাই। প্রচেষ্টার বিরাম হইল না। পরীক্ষায় দেখা গেল, দুইটি কম্পনশীল বস্তু কোন গ্যাসীয় বা তরল মাধ্যমে সন্নিবিষ্ট হইলে ঘটনাবশে কখনও পরস্পর আকৃষ্ট, কখনও বা বিকৃষ্ট হয়। ইহা হইতেই, ইথরে পরমাণবিক কম্পন মাধ্যাকর্ষণের কারণরূপে অনুমিত হইল। এই ভাবে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল পিয়ার্‌সন অনেক গবেষণা করেন ; কিন্তু পরে তাঁহার মন অন্যভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ায় সেই দিকেই মনঃসংযোগ করেন। ইহাই হইল ইথর-ফিন্‌কি (Ether squirts) মতবাদ। পরীক্ষায় দেখা যায়, দুইটি জলবাহী নলের মুখ জলে নিমজ্জিত করিয়া দিলে, মুখ দুইটি ঘটনাবশে কখনও কখনও আকৃষ্ট হয়। পিয়ার্‌সন গণিতের সহায়তায় গবেষণা করেন (Amer. Jour. of Math. 13, 309, 1891) ও দেখিতে পান যে, উপরের পরীক্ষার ন্যায় দুইটি প্রভবই (Source) যে কেবল আকৃষ্ট হয় তাহা নহে, দুইটি প্রলয়ও (Sink) উপরোক্ত প্রকারে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু একটি প্রভব ও একটি প্রলয় পরস্পর বিকৃষ্ট হয়। পিয়ার্‌সনের মতে পরমাণু দুই প্রকার—ইহা ইথরে অবস্থিত প্রভব, যেখানে অবিরত ইথর উৎপাদিত হয় ; কিংবা ইহা একটি প্রলয়, যে স্থলে ইথর অবিরত লয় প্রাপ্ত হয়। কোথা হইতে ইথর আগমন করে ও লয় হইয়াই বা ইহা কোথায় যায়, এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, দেশের চতুর্থ মাত্রা হইতে ইথার আবির্ভূত হয় ও লীন হইয়া সেখানেই ফিরিয়া যায়। অসঙ্কোচনীয়তা ইথরের একটি বিশেষ গুণ ও সমস্ত দেশ উহাতে পরিপূর্ণ। সুতরাং সৎবস্তুরূপে বিদ্যমান পদার্থ পরস্পরবিপরীতধর্ম্মী দুই জাতীয় পরমাণুর সমবায়। কিন্তু এক জাতীয় পদার্থই দেখিতে পাই ও তাহাদের কথাই জানি। তাহার কারণ এই যে, যুগযুগান্ত পরস্পর বিকর্ষণে দুই জাতীয় পদার্থ পৃথক হইয়া গিয়াছে ও বহু দূরে এমত কোন জগৎ হয়তো রহিয়াছে, যে স্থানে এই জগতের বিপরীতধর্ম্মী পদার্থই রহিয়াছে। তবে কোন্‌টি প্রভব-জাতীয় ও কোন্‌টি বা প্রলয়-জাতীয় তাহার নিরাকরণ সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, পিয়ার্‌সনের এই অভিনব মতবাদেও মাধ্যাকর্ষণের তিরস্করণী কার্য্যের কোনও অভাব পাওয়া যায় না।

এইরূপে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে যত প্রকার মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই তিরস্করণীর অভাব নির্দ্দেশের কোন ব্যবস্থা না থাকায় একটিও স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অর্থাৎ নিউটনের তিরোভাবের পর ২০০ বৎসরের গবেষণায়ও মাধ্যাকর্ষণ পূর্ব্বমত রহস্যাবৃতই রহিয়াছে। বিদ্যুৎ-চুম্বকাদি যত প্রকার শক্তির সন্ধান বৈজ্ঞানিক পাইয়াছেন, তাহাদের সহিত মাধ্যাকর্ষণের কেবলমাত্র এক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অধুনাজ্ঞাত সর্ব্বপ্রকার শক্তির প্রাখর্য্যই দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে ধার্য্য হয়। এতদ্ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মেই মাধ্যাকর্ষণের সহিত অন্যান্য শক্তির সাদৃশ্য দেখা যায় না।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে আইন্‌স্টাইন সর্ব্বপ্রথমে নির্দ্দেশ দেন যে, বস্তুর ইনার্‌সিয়া বা জাড্যের ন্যায় আর একটি বিশিষ্ট গুণ আছে। সেই গুণের ক্রিয়া লক্ষিত হয় অপকেন্দ্র-বলের প্রয়োগ-প্রক্রিয়ায়। কোন ভারী বস্তুতে রজ্জু সংযুক্ত করিয়া উহার অপর প্রান্ত ধারণ পূর্ব্বক বস্তুটি শূন্যে ঘুরাইলে অনুভব করা যায় যে, ঘূর্ণ্যমান বস্তুটি হস্তধৃত কেন্দ্র হইতে যেন দূরে অপগত হইতে চায়।

বস্তুটি যে কক্ষে ঘুরিতেছে তাহার কেন্দ্র রহিয়াছে হস্তধৃত রজ্জুপ্রান্তে। সেইজন্য কেন্দ্র হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার এই গুণ অপকেন্দ্র-বলের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। এই অপকেন্দ্র-বল মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় বস্তুর বস্তুমান ও দেশে কালে অবস্থান ব্যতীত আর কিছুর উপর নির্ভর করে না। আইন্‌স্টাইন এক বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা এই তত্ত্ব আরও পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। সকলেই নাগর-দোলা দেখিয়া থাকিবেন। একটি বৃহৎ বৃত্তে বসিবার আসন ঝুলানো আছে ও বৃত্তটি তাহার কেন্দ্রগামী মৃত্তিকা-প্রোথিত দণ্ডে স্থাপিত আছে। বৃত্তটি ঘুরাইলেই আসনে উপবিষ্ট লোকেরা মধ্যদণ্ডটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে থাকে। এক্ষণে মনে করা যাউক, কোন একটি আসন এক বৃহৎ গোলকের অভ্যন্তরে রহিয়াছে ও তাহাতে একজন দর্শক উপবিষ্ট। বৃত্তটি সমবেগে ঘুরাইলে গোলকান্তর্গত দর্শক কিছুতেই বুঝিবে না যে, সে ঘুরিতেছে! যেমন পৃথিবীপৃষ্ঠে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান হইয়াও বুঝিতে পারি না যে, আমরা ঘুরিতেছি। গোলকটির স্থির অবস্থায় দর্শক তাহার অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে কোন বৈলক্ষণ্য বোধ করিবে না; কিন্তু উহার ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ঐ প্রকার চলিতে গেলে, সে গোলকের গতি না বুঝিতে পারিলেও আর এক বৈলক্ষণ্য বোধ করিবে। গোলকের কেন্দ্র ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে গেলেই সে এমন এক বলের অনুভূতি পাইবে, যাহা তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিতে চাহিবে। কেন্দ্র হইতে তাহার অবস্থান-দূরত্ব যত অধিক হইবে, এই প্রতাড়ন-বলও তত অধিক হইবে। এই ভাবে ঘূর্ণায়মান গোলকের অভ্যন্তরে মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্রের বিপরীতধর্ম্মী এক ক্ষেত্র সমুৎপন্ন হইবে। ইহাকে আমরা মাধ্যবিকর্ষণ-ক্ষেত্র বলিতে পারি। ইহা আমরা জানি যে, এই ক্ষেত্রের প্রতাড়ন-বল বস্তুসঞ্জাত। ইহা গোলকের কেন্দ্রে উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু কেন্দ্রাপসারী দর্শকে উহার জন্ম ও সেইজন্যই দর্শক ও কেন্দ্রের ব্যবধানে কোন প্রকার তিরস্করণী স্থাপন করিলেও বলের কোনও লাঘব হইবে না। সুতরাং গতির ক্রিয়ায় বস্তুতে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সহিত উপমেয় শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়। গতিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত শক্তিও লুপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে আইন্‌স্টাইনের আর একটি পরীক্ষা প্রণিধানযোগ্য।

একটি বৃহৎ বাক্সে একজন দর্শক রহিয়াছে ও দর্শকসহ বাক্সটি এমন এক স্থানে আছে, যেখানে উহার উপর বাহিরের কোন শক্তির ক্রিয়া নাই। স্থির অবস্থায় বাক্সটির এক প্রান্তে অনুভূমিক রেখা-ক্রমে একটি তীর নিক্ষেপ করিলে, সেই তীর বিপরীত প্রান্তের দেয়াল ভেদ করিয়া বাহির হইবে ও বাক্সের অভ্যন্তরে তীরের গতিপথ দর্শকের নিকট অনুভূমিক ও সরল হইবে। কিন্তু তীরনিক্ষেপ সময়ে যদি বাক্সটি সমবেগে ঊর্দ্ধোত্থিত হইতে থাকে, তাহা হইলে অভ্যন্তরস্থ তীরগতিপথ সরল হইলেও অনুভূমিক হইবে না। উহা অনুভূমিক রেখার সহিত এক কোণ উৎপন্ন করিবে। আবার বাক্সটি বিষমগতিতে ঊর্দ্ধগমন করিলে, তীরের গতিপথ আদৌ সরল হইবে না; উহা ঊর্দ্ধোত্তল বক্র রেখা (convex upwards) হইবে। দর্শক এই বক্রপথের কারণ এইরূপ মনে করিতে পারে যে, তীরের উপর দুইটি বলের ক্রিয়া হইয়াছে। প্রথমত, ইহার আদিম গতি, যেজন্য উহা এক দেয়াল হইতে অন্য দেয়ালে যাইতেছিল; দ্বিতীয়ত, অন্য কোনও অজ্ঞাত বল তীরটিকে বাক্সের নিম্নতলের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এই অজ্ঞাত বলের কোনও কারণ এ স্থলে দেখা যায় না। আসল

ব্যাপারে এই হইয়াছে যে, স্থির দর্শক গতিশীল হওয়াতে তাঁহার দেশের অবস্থান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও সেইজন্যই তীরের গমনপথ বক্র প্রতীত হইয়াছে। এই ভাবে আইন্‌স্টাইন মাধ্যাকর্ষণের যবনিকা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বস্তুর অবস্থান পরিবর্ত্তন দ্বারা যে জাড্য-ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র তাহারই অনুরূপ। কিন্তু তাঁহার মনোমত গতিবিহীন কোন অবস্থান আমাদের অভিজ্ঞতায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তথাপি আইন্‌স্টাইনের মতানুযায়ী ধারণাসমূহ গ্রহণ করিলে মাধ্যাকর্ষণ-রহস্য অত্যন্ত বিশদভাবে অধিগম্য হয় বলিয়াই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

আইন্‌স্টাইন-তত্ত্বে মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ দেখিতে হইলে একটি অনুভূমিক সমতলের প্রয়োজন। মনে করা যাউক, কোন বিস্তৃত হ্রদের জল শৈত্যে জমিয়া গিয়াছে। উহার পৃষ্ঠতল পূর্ণ সমতল ও এত মসৃণ যে, উহার উপর দিয়া কোন পদার্থ গড়াইয়া গেলেও ঘর্ষণজনিত কোন শক্তি ক্ষয় হয় না। সুতরাং ঐ তলে কোন প্রস্তরখণ্ড নির্দ্দিষ্ট কোন গতিতে চালাইয়া দিলে, নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী উহা সমগতিতে সরল পথে চলিতে থাকিবে। যদি কোথাও গতিপথ বক্র হয়, তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, সেই স্থলে তুষারতলটি ঠিক সমতল নহে ; চতুষ্পার্শ্ব অপেক্ষা হয়তো একটু উন্নত বা অবনত। মনে করা হউক, তুষারোপরি এক স্থলে এক গুরুভার বৃহদ্‌কায় প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য উহার সন্নিকটে কিছুদূর পর্য্যন্ত তলের অবনতি ও উন্নতি দৃষ্ট হইবে। এখন সমতল স্থান হইতে যদি একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর এরূপে চালনা করা যায় যে, উহা বৃহৎ প্রস্তরটির নিকট দিয়া যায়, তাহা হইলে চলমান প্রস্তরটির গতিপথ প্রথমে সরল হইলেও, বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অতিক্রম করিবার সময় উহা বক্রভাবাপন্ন হইবে ও উভয় প্রস্তরের মধ্যে কোনরূপ আকর্ষণ না থাকিলে বক্রপথে অবনত ও উন্নত স্থান অতিক্রম করিয়া উহা পুনরায় সমতলে সরল পথেই চলিতে থাকিবে। কিন্তু অসমতল স্থান অতিক্রম-সময়ে যে গতিপরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহাতে উহার গতিতে প্রথম ও শেষ সরলপথ একই সরলরেখার অংশ হইবে না। অর্থাৎ প্রস্তরটির গতিতে দিগ্‌বিপর্য্যয় ঘটিবে। যে দর্শক সমতলের অবনতি দেখিতে পান না, তিনি নিউটনের মতবাদের আশ্রয় লইয়া বলিবেন যে, ক্ষুদ্র প্রস্তর বৃহৎ প্রস্তরের সন্নিধানে আকৃষ্ট হওয়াতেই উহার এই দিগ্‌-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু আইন্‌স্টাইনের মতে ক্ষুদ্র প্রস্তরটির ইনার্‌সিয়া ও সমতলের অবনতিই উহার দিগ্‌বিপর্য্যয়ের কারণ। এস্থলে কোন প্রকার আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য্য নাই। যদি ক্ষুদ্র প্রস্তর বৃহৎ প্রস্তরের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে হয়তো উহা অবনতি বা গর্ত্ত হইতে বাহিরই হইতে পারিত না। উহা গর্ত্তের অভ্যন্তরে চক্রপথে ঘুরিতে থাকিত। এই কক্ষের আকার, গর্ত্তের আকার ও প্রস্তরটির গতিবেগে, নির্দ্ধারিত হইবে। সাধারণ আপেলের বোঁটার নিকট যে প্রকার গর্ত্ত থাকে, গর্ত্তটি সেইরূপ হইলে কক্ষটি অনেকাংশে মুখ-খোলা উপবৃত্তের ন্যায় হইবে। বুধগ্রহের কক্ষপথ অনেকটা এইরূপ। এই ভাবে আইন্‌স্টাইন দ্বিমাত্রিক তলে তৃতীয় মাত্রার গর্ত্ত কল্পনা করিয়া মাধ্যাকর্ষণ বুঝাইতে চাহেন। আলোক-রশ্মির উপর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্রিয়াও ইহা হইতে বুঝা যায়। কোন তারকা হইতে বিকীর্ণ আলোকরশ্মি

বস্তুজগৎ হইতে বহু দূরে কোটি কোটি মাইল পরিভ্রমণ করে। এই সময় উহা সরলপথেই বিচরণ করে। কিন্তু ঐ আলোক সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইলে কি ঘটিবে? সাতিশয় গুরুভার সূর্য্য দেশে উহার অবস্থানের চতুর্দ্দিকে অবনতি উৎপাদন করিবে। তলের অবনতি আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, কিন্তু দেশের অবনতি বহুলাংশে অনুমানসাপেক্ষ। ইহা অনেকটা মোচড়ের ন্যায় হইবে। দেশের এই বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করিতে আলোকরশ্মির দিগ্‌বিপর্য্যয় ঘটিবে।

আইন্‌স্টাইন তাঁহার রিলেটিভিটি-তত্ত্বের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের যে রূপ প্রকটিত করেন, তাহাতে আমরা দিশাহারা হইয়া যাই। বিষয়বস্তুর স্বরূপই যেন রহস্যময় হইয়া যায়। তবে মাধ্যাকর্ষণ-জ্ঞান নিউটনের সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে একটু অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রহস্যের সম্যক উদ্ঘাটনের যে এখনও বহু বিলম্ব, এ সন্দেহ স্বয়ং আইন্‌স্টাইনও পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার মতের যাথার্থ্য কখনও প্রতিপন্ন হইবে না। হয়তো ভবিষ্যতে পরীক্ষালব্ধ এমন ফলই পাওয়া যাইবে, যাহাতে তাঁহার মত ভ্রান্ত বলিয়াই সাব্যস্ত হইবে।

যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে মাধ্যাকর্ষণের যথার্থ কারণ পরিজ্ঞাত না হইলেও উহা যে কোন কালেই হইবে না, তাহা বলা যায় না। নিউটন সমাধানের এত সন্নিকটে পৌঁছিয়াছিলেন যে, প্রায় ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাই যথার্থ সমাধান বলিয়া মনে হইয়াছে। অনন্ত কাল, অনন্ত সৃষ্টি। সেই মহাক্ষণও আসে নাই ও যে মহামানব স্বকীয় ধীশক্তিপ্রভাবে মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া সাধারণের জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত করিবেন, তাঁহারও আবির্ভাব হয় নাই।



নোনা-গাঙের কাহিনী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নদী।

শান্ত স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়, অভ্র ও পাথর-রেণুমিশ্রিত বালুকা-শয্যার মাঝখানে শ্রান্ত চরণে বহিয়া-চলা স্ফটিকজলের পাহাড়ে ঝর্ণাও নয়। যেখানে আমের জামের স্নিগ্ধ ছায়ায় ছায়ায় মৃদুমধুর জল-তরঙ্গ বাজিয়া উঠে, বৈঁচি-বেতের ঝোপ জলের উপরে নুইয়া পড়িয়া চলস্রোতে অবিরাম ছায়াছবি দেখিতে থাকে, বাঁশ-বনের আড়াল হইতে টুকরা টুকরা চাঁদের আলো ঝরিয়া পড়িয়া ছায়া-নিমগ্ন কাঞ্চননদীর বুকটিকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে, সে রূপের সঙ্গে কোনখানে ইহার এতটুকুও সামঞ্জস্য মিলিবে না।

যতদূর চোখ চাহিবে, এপার ওপার কিছুই দেখিতে পাইবে না, শুধু দিগ্‌দিগন্ত জুড়িয়া একটা শুভ্র রুক্ষতা যেন মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে। বিশাল জলধারা উদ্বেলিত তরঙ্গে তরঙ্গে কুটিল হইয়া উঠিতেছে, ফুটিয়া উঠিতেছে অগণিত ফেনার ফুল। অসংলগ্নভাবে ছড়ানো ছোট বড় বালুচর, প্রবল জলো হাওয়ায় বালি উড়িতেছে, শন শন করিয়া মাতামাতি করিতেছে বকের মত সাদা কাশফুলের শ্রেণী। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের প্রবল সূর্য্যালোকে এই জল হইতে, এই বালুচর হইতে এবং ওই কাশফুল হইতে পর্য্যন্ত কেমন যেন একটা প্রতিরশ্মি পিছলাইয়া পড়িতেছে, শাণিত ছুরির ফলার মত তীব্র এবং উজ্জ্বল।

কাঞ্চন আর মেঘনা। একজন তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া দিতে আসা মৃদু-চরণা কল্যাণী পল্লীবধূ; আর একজন ভৈরবী, হাতে ত্রিশূল লইয়া তাণ্ডবচ্ছন্দে নাচিয়া চলিয়াছে।

*　　　*　　　*

মেঘনার একটি তীর।

নারিকেল এবং সুপারির সারিতে যেখানে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত বাতাসের মর্ম্মর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, সেই বীথি-নিকুঞ্জের অন্তরালে জেলেদের ছোট্ট একটি গ্রাম।

গ্রাম! হাঁ, গ্রাম বলিলে একটু বেশি সম্মান দেওয়া হয় বইকি। একটা বাজার, একটা হাট, নেহাৎপক্ষে একখানা ছোট দোকান পর্য্যন্ত নয়। শিক্ষা-সভ্যতার সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সংস্রব নাই, নদীতে মাছ ধরিয়া, প্রাকৃতিক বিক্ষোভের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত মোটা চাউলের পান্তাভাত খাইয়া এবং পরস্পরের সঙ্গে হিংস্র পশুর মত মারামারি করিয়া ইহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদি মানবের মত নগ্ন পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া ইহাদের হীন জীবন বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। তেমনই অমার্জ্জিত ইহাদের ভাষা, তেমনই অসংস্কৃত ইহাদের দৈনন্দিন জীবন এবং তেমনই দুর্নিবার অসংযত ইহাদের কামনা।

তুমি যদি কখনও এখানে পা বাড়াও, তাহা হইলে কিই বা দেখিতে পাইবে? সামনে নদীর বিরাট নিষ্ঠুর রূপ, পিছনে নারিকেল-সুপারিবনের এখানে ওখানে ছোট ছোট ঘর, খড়ের চাল,

সুপারির খুঁটি, মাটির দাওয়া। এদিকে ওদিকে জাল রোদে শুকাইতেছে, কোথাও বা বড় বড় মাটির পাত্রে গভীর কালো গাবের রস সঞ্চিত, এবং কোথাও কোথাও জলের ধারে তুইএকখানা নৌকা পড়িয়া আছে উবুড় হইয়া। আকাশে গোটা কয়েক উড়ন্ত চিল, নীচে কয়েকটা নিদ্রালস কুকুর, কতকগুলা উলঙ্গ নোংরা ছেলেমেয়ে, অর্দ্ধাবৃতা কুরূপা মুখরা নারী এবং পাথরের মত কঠিন একদল বর্ব্বর পুরুষ। চারিদিকে একটা বিশ্রী আঁষ্টে গন্ধ, বাতাস তাহাতে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ডাকাতির মোকর্দ্দমায় সাত বৎসর জেল খাটিয়া হারু দেশে ফিরিয়া আসে।

সাত বৎসর! মহাকালের পৃষ্ঠায় এই কয়টি বছরের দাবি নিতান্ত সামান্য নয়। সাত বৎসরের মধ্যে ঘটিয়া যায় বহু মহাসংগ্রাম, ভূমিকম্প এবং প্রলয়। কত জীবনের উপর শেষের যবনিকা নামিয়া আসে, কত জীবনের নাটমঞ্চে নূতন করিয়া পাদপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। কত চেনা মুখ বিস্মৃতির অতলে যায় হারাইয়া, কত অচেনা মানুষ তাহাদের শূন্য আসনে জুড়িয়া বসে।

পাঁচকড়ি জালে গাব মাখাইতেছিল, পিছন হইতে ডাক আসে, পাঁচুদা!

পাঁচু চমকিয়া উঠে, তারপর ফিরিয়া চাহিয়া একটা অসীম বিস্ময়ে যেন বিমূঢ় হইয়া যায়। শুধু বলিতে পারে, কে?

এমন এক একটা সময় আসে, যখন আবছায়াভাবে যেন চিনিতে পারা যায়, কিন্তু মনের ভিতর হইতে বিশ্বাসের সমর্থন আসিতে চায় না। অথবা বহুদিনের পার হইতে যেন একটা অস্ফুট গন্ধ স্মৃতির উপরে ভাসিয়া আসে, পরিচিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নির্ণয় করা কঠিন।

আর, না চিনিতে পারিলেও এমন কিছু দোষের কথা নয়। রুক্ষ বিবর্ণ মূর্ত্তি, মুখের উপরে রাশীকৃত গোঁফ-দাড়ি যথেচ্ছভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে। সাত বৎসরের কঠিন কারাবাস-পরিশ্রমে পিঠটা বাঁকিয়া গিয়াছে, গলার আওয়াজ হইয়াছে অনেকখানি কর্কশ এবং ভরাট।

পাঁচুর বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া হারুর কৌতুক বোধ হয়। ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া বলে, চিনতে পারছ না?

পাঁচু তেমনই বিমূঢ়ের মত জবাব দেয়, না।

হারু কপালের উপর হইতে ঝাঁকড়া চুলের গুচ্ছ সরাইয়া দিয়া বলে, আমি হারু।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পাঁচু শিহরিয়া উঠে—হারু! গ্রামের যে বিভীষিকাকে দীর্ঘ সাত বৎসর আগে সকলে খরচের খাতাতেই ধরিয়া রাখিয়াছিল, মৃত্যুর অন্ধকূপ হইতে সে আজ আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিল নাকি! খুন এবং ডাকাতির অভিযোগে দূরের এক জঙ্গল হইতে ফেরারী হারুর হাতে পায়ে কোমরে দড়ি পরাইয়া পুলিস যেদিন সদরে চালান করিয়া দিয়াছিল, সেদিন মাত্র তুইটি ব্যক্তি ছাড়া এই গ্রামের নিতান্ত হিংস্র প্রকৃতির লোকগুলি অবধি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। এই তুইজনের একজন হারুর বিধবা মা, তাহার আর্ত্ত চীৎকারে গ্রামের আকাশ-বাতাস করুণ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। অপর জন ভিন্নগ্রামবাসী দূর সম্পর্কের এক প্রবীন খুড়া, জামিনের চেষ্টায় এবং মামলার ব্যর্থ তদ্বিরে অনেকদিন পর্য্যন্ত সে সদরে ছুটাছুটি করিয়াছিল।

তাই আজ এই দীর্ঘ দিন পরে হারুর সাক্ষাতে পাঁচু আনন্দে নিতান্তই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না। বরঞ্চ স্তম্ভিত ম্লান মুখেই বলে, ওঃ, হারু! কতদিন পরে! কবে খালাস পেলি?

—দিন তিন চার হবে বোধ হয়। ভাল আছ তো সবাই?

পাঁচু সংক্ষেপেই জবাব দেয়, একরকম। তোর শরীর ছিল কেমন?

হারু আবার একটু হাসে, ঘানি ঘুরিয়ে এবং মার খেয়ে যে রকমটা থাকে। তারপর আমাদের বাড়ির খবর কি বল তো? মা কেমন আছে?

মা? হারুর উপরে যতখানি বিতৃষ্ণাই থাকুক, একবারেই দুঃসংবাদ দিয়া ফেলিতে পাঁচু মনের দিক হইতে এতটুকুও অনুমোদন পায় না, চুপ করিয়া থাকে।

হারু অধৈর্য্য হইয়া উঠে, সত্যি বল, মা কি রকম আছে?

পাঁচু ইতস্তত করে বারকয়েক, তারপর অত্যন্ত ধীরে ধীরে জবাব দেয়, তোর মা নেই।

—নেই! হারুর গলা চিরিয়া যেন আর্ত্তনাদের মতই কথাটা বাহির হইয়া আসে, মা নেই!

—না।

পাঁচকড়ির বাড়ি হইতে হারু যখন বাহির হইয়া আসে, তখন ওর সামনেকার সমস্ত পৃথিবীটাই যেন একটা অপরিসীম শূন্যতায় ভরিয়া যায়। দৃষ্টির সম্মুখ হইতে শেষ আলোকের কণিকাটুকু পর্য্যন্ত কে মুছিয়া লইয়াছে, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে দিগন্তব্যাপী নিরন্ধ্র অন্ধকার।

মা নাই! শেষ অবলম্বনটুকুও কি এমনই করিয়াই নিঃশেষ হইয়া গেল! দীর্ঘ কারাবরোধের অন্তরালে ওর মনটা আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, জীবনের এই নিন্দিত গতিপথটার উপরে জাগিয়া উঠিতেছিল একটা দুর্দ্দমনীয় ঘৃণা। ভাবিয়াছিল, মাকে লইয়া এবার শান্তির এতটুকু একটু নীড় বাঁধিবে, রচিবে একটি নিভৃত আশ্রয়। সমস্ত দিনের নির্দ্দোষ পরিশ্রমের পর শ্রান্ত দেহ লইয়া যখন নিজের কুটীরটিতে ফিরিয়া আসিবে, দাওয়ার উপরে তখন অজস্র চাঁদের আলো ঝরিয়া পড়িতেছে, সরসর করিয়া কাঁপিতেছে নারিকেলগাছের পাতা, মেঘনার জলরেণুর স্নিগ্ধতা লইয়া বাতাস ছুটাছুটি করিতেছে আর বুনো ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু কি হইতে কি হইয়া গেল!

নিজের বাড়ির সামনে আসিয়া যখন হারু দাঁড়ায়, তখন তাহার চোখের কোণে ঝকঝক করিতেছে দুই ফোঁটা জল। চারিপাশে আগাছার জঙ্গল, ওদিকের ঘরটা কোন এক বর্ষায় ভাঙিয়া মাটির সঙ্গে মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। এ ঘরখানির চালে খড় বলিতে প্রায় কিছুই নাই, কয়েকটা ভগ্নপ্রায় খুঁটির উপরে কোনমতে দাঁড়াইয়া আছে। হারু সেইখানেই ধূলার উপরে বসিয়া পড়ে।

খবর পাইয়া কেহ কেহ হারুকে দেখিতে আসে।

কতকটা কৌতূহল, কতকটা সহানুভূতি। সাধারণভাবে দুই চারিটা প্রশ্ন করে, কিছুটা সমবেদনাও জানায়। তারপর কোন রকম আত্মীয়তা অনাবশ্যক মনে করিয়া নিজের কাজে চলিয়া যায়। একমাত্র লোচন মাঝি আসিয়া ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ সুরু করিয়া দেয়, পূর্ব্বে একটুখানি যে আত্মীয়তা ছিল, সেটুকু ভুলিতে পারে না হয়তো।

লোচন জিজ্ঞাসা করে, এখন কি করবি ঠিক করলি ?

হারু নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দেয়, জানি না।

লোচনের কণ্ঠে অভিবাবকত্বের সুর লাগে, যা হবার তা তো হয়ে গেল, এখন নতুন ক'রে ঘর-সংসার আরম্ভ ক'রে দে। ইলিশমাছের এই তো সময়, কারও নৌকোয় কাজ করলে বেশ পয়সা পাবি। ইচ্ছে হ'লে আমার নৌকোতেই—

হারু কথা কয় না।

লোচন জাঁকিয়া বসে। লাভের লোভটা তাহার একটু বেশি বলিয়া বড় কেউ রাজি হয় না তাহার সঙ্গে কাজ করিতে, অথচ একজন লোক না হইলে গভীর রাত্রে মাঝ-গাঙে নোকা বাহিতে সাহস হয় না কাহারও। নদীর স্রোতে হাল সামলানো একটা কথা তো বটেই, কিন্তু সেটাই সব নয়। গভীর রাত্রিতে তটচিহ্নবিলুপ্ত মেঘনার সেকি রূপ! এমন বিভীষিকাময় মৃত্যুঘন বিশালতার মূর্ত্তি আর কোথায় বা দেখিতে পাওয়া যায়! মনে হয়, এই গভীর শীতল জলসীমা ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে যেন একটা প্রেতায়িত অনুভূতি! চারিদিকে যেন শত শত অশরীরীর মিলিত কলরব জল-কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে একটা বিচিত্র ঐক্যতান, তাহার ধ্বনি-তরঙ্গে বুকের রক্ত আতঙ্কে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এই মেঘনা কত বৈশাখী অপরাহ্ণে ঝড়ের তাণ্ডবে নাচিয়া উঠিয়াছে, কত আষাঢ়ের দুর্জ্জয় ঘূর্ণির আবর্ত্তে আবর্ত্তে মেঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, আর সেই বৈশাখী তুফানে, সেই ঘুর্ণিপাকের আকর্ষণে কত অসহায় নৌকা ততোধিক অসহায় কত মানুষ লইয়া তিরোহিত হইয়া গেছে মেঘনার অতল অন্ধকারে। কিন্তু এই যে এত লোক ডুবিয়া মরিয়াছে, তাহাদের সকলেই কি আর মুক্তি পাইয়াছে! সেই সমস্ত আর্ত্ত আত্মিকেরা গভীর রাত্রিতে মেঘনার অন্ধকার বুকের উপর দিয়া শরীরী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। জীবলোকের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সে সাক্ষাৎ খুব যে প্রীতিকর হয়, তাহা নয়—একথা লোচন ভালই জানে। সেই যে তারিণী কি দেখিয়া আসিল কে বলিবে, কি ভীষণ অবস্থাই হইল তাহার। রক্তের মত রাঙা চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হইয়া যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়, জিভটা প্রায় এক হাত বাহির করিয়া দিয়া অস্বাভাবিক-ভাবে হাঁপাইতে থাকে। কথা কহিলে জবাব দেয় না, শুধু থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্ত পশুর মত এমন এক একটা চীৎকার করে যে, শুনিলে পা হইতে মাথা অবধি শিহরিয়া উঠে। এমনই অবস্থায় সাত দিন প্রবল জ্বরে ভুগিয়া তারিণী মরিয়া গেল। ক্ষুদু-মাঝি আর একবার আশ্বিনের এক শান্ত রাত্রিতে একাকী মেঘনায় মাছ ধরিতে গিয়া কোথায় গেল কে জানে, আজ দশ বৎসরের মধ্যে তাহার আর কোন সন্ধানই কেউ দিতে পারে নাই।

লোচন বলে, কিরে, রাজি আছিস ?

হারু ভাষাহীন চোখে তেমনই করিয়াই তাহার মুখের পানে দৃষ্টি মেলিয়া রাখে।

লোচন বলিয়া চলে, তোর অবস্থা তো সবই জানি, খাবার সংস্থান তো নেইই, মাথা গোঁজবার ঘরও নেই। তুই আমার বাড়িতে থাকবি, কোন কষ্টই হবে না, পয়সাকড়িও বেশ পাবি। কি বলিস রে ?

হারু মাথা নাড়িয়া শুধু বলে, আচ্ছা।

হারুর জীবন নূতন করিয়া সুরু হয়।

লোচন অবস্থাপন্ন লোক। পঞ্চান্ন বৎসরের বহু জল রৌদ্র তাহার শরীরের উপর দিয়া বহিয়া গেছে, দেহের বলিষ্ঠ গঠন বয়সের চাপে খানিকটা শিথিল হইয়া পড়িলেও যৌবনের তেজে এখনও পরিপূর্ণ। ত্রি-সংসারে থাকিবার মধ্যে নিজের স্ত্রী, তা ছাড়া একটা ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত নাই। একেবারে যে না হইয়াছিল তা নয়, কিন্তু সেই যেবার কলেরার মড়ক আসিয়া গ্রামের আধা-আধি লোককে মুছিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেইবারেই লোচন উহাদের হারাইয়াছে।

প্রথম অবস্থায় দুঃখের ক্ষতটা হয়তো খুব গভীর হইয়াই বাজিয়াছিল, কিন্তু কালের প্রলেপ পড়িয়া পড়িয়া ক্ষত প্রায় মিলাইয়া যাইবারই উপক্রম করিয়াছে। একটা বিশেষ মুহূর্ত্তে মনটা হয়তো লোচনের বিষণ্ণ হইয়া উঠে, লোচনের স্ত্রী অভ্যাসবশতই হয়তো বা মাঝে মাঝে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই, জীবনযাত্রার পথে ইহাতে এতটুকুও ব্যাঘাত ঘটে না। অথবা এমনও হইতে পারে যে, বাহির হইতে অন্তরের আঘাতটার ঠিকমত পরিমাপ করিতে পারা যায় না।

সে যাহাই হোক, লোচনের বিস্তর টাকা জমিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। অন্তত গ্রামের সকলেই এ কথা একবাক্যে অনুমোদন করিবে। তিন চারশো তো হইবেই, তাহার বেশি হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তুমি যদি লোচনকে এ কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে সে বেশ খানিকটা হাসিয়া উঠিবে, তারপরে পরম বিস্ময়ভরে বলিবে, টাকা! পৌনে এক কুড়ি টাকার অভাবে নতুন একখানা নৌকো করিতে পারি না; ঘরের চালে জোটাতে পারি না খড়, আমার কাছে টাকা!

ইচ্ছা হইলে তুমি লোচনের কথা বিশ্বাস করিও, কিন্তু গ্রামের লোক তো আর এত সহজেই ভুলিবার নয়। কানাঘুষা সবাই করিয়াই থাকে। লোচন যে সে টাকা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে— সে কথা কেউ বলিতে পারে না। দুই দুইবার তাহার ঘরে সিঁদ পড়িয়াছিল, কিন্তু চোরেরা গোটা কয়েক থালা বাটি ছাড়া আর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

হারু লোচনের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়।

ঘানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হাতে পায়ে কড়া পড়িয়া গেছে, মাংসপেশীগুলা হইয়া গেছে লৌহ-পিণ্ডের মত সুদৃঢ়। কোন বিপর্য্যয়ই তাহাকে আর টলাইতে পারে না। দুর্য্যোগের সময় মেঘনার জল যখন উত্তাল হইয়া উঠে, রাত্রির কালো আকাশ হইতে অন্ধকার বৃষ্টির ধারা অঝোরে ঝরিতে থাকে, তখন হারু বৈঠার বলিষ্ঠ তাড়নায় নৌকার উন্মত্ততাকে সংযত করিবার চেষ্টা করে। এক একবার বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠে, আর তাহারই তীব্র আলোকে হারুর পাষাণ-মূর্ত্তিটা বিচিত্র মহিমোজ্জ্বল হইয়া দীপ্তি পায়। কালো কঠিন শরীরের উপর দিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া যায়, মাথার চুলগুলিতে জল-কণার উপরে বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়ে, চোখ দুইটা অদ্ভুতভাবে ঝক ঝক করে, পেশীগুলি উঠে

দ্বিগুণ পরিমাণে স্ফীত হইয়া, এবং বৈঠার আঘাতে আঘাতে ক্ষুব্ধ ফেনায়িত জল যেন আহত পশুর মত দাঁত বাহির করিয়া গুমরিয়া উঠে। সেই নির্ভীক বলিষ্ঠ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া লোচন শুধু বলিতে পারে, সাবাস!

হারু অবিশ্রান্ত কাজ করে। অবসরমত একবার যে তামাক টানিয়া লইবে, তাও নয়। লোচন ভাবে, ছেলেটার ক্লান্তি বলিয়া কিছুই নাই।

তিন মাইল দূরের বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিতে হয়। লোচন বলে, অতবড় ঝাঁকাটা তুই আর কতক্ষণ টানবি রে? দে, খানিকটা আমিই নিয়ে যাই।

হারু তেমনই করিয়াই একটুখানি হাসিয়া জবাব দেয়, কিচ্ছু দরকার নেই খুড়ো, এই তো বেশ আছি, মিছিমিছি তোমাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?

লোচনের মনের মধ্যে পরিবর্ত্তন স্থরু হইয়া যায়।

ডাকাতি-মামলার ফেরত আসামী হারু। অবশ্য এই গাঁয়ের লোকেরা এমন কিছু আর শান্ত-শিষ্টতার জন্য বিখ্যাত নয়, কিন্তু দুরন্ত হারু এক সময়ে ইহাদের মধ্যেই এমন একটা বিশিষ্ট স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল যে, সেদিন সবাই তাহাকে ভয় করিত। এই সাত বৎসরের প্রায়শ্চিত্তের পরেও হারুর কতটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কে বলিবে, কিন্তু এখনও তাহাকে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস করা চলে না। এই অবিশ্বাস খানিকটা পরিমাণে লোচনেরও ছিল, কিন্তু হারুর আচারে-ব্যবহারে ক্রমশ সে অবিশ্বাসের মূলে ভাঙন ধরে।

অবশেষে নিজের অজ্ঞাতেই লোচন তাহাকে একটু একটু করিয়া ভালবাসিতে আরম্ভ করে, নিঃসন্তান তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়টি যেন খানিকটা তৃপ্তি পায়। হয়তো একান্ত একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই লোচন বলে, বুঝলি হারু, একটা দুঃখ আমার কিছুতেই যায় না।

হারু প্রশ্নহীন চোখ তাহার মুখের পানে তুলিয়া ধরে। বর্ব্বর মানুষের পাথরের মত অন্তর হইতে অসতর্কভাবে স্নেহ-গঙ্গোত্রীর একটি ক্ষীণ ধারা বাহির হইয়া পড়ে।—আমার ছেলেমেয়ে নেই, এই বয়েসে আমার মুখের পানে তাকিয়ে দেখবে, নেই এমন একটি লোক। তুই যদি আমার নিজের ছেলে হতিস হারু, তা হ'লে আজ আর আমার এতটুকুও দুঃখ থাকত না।

হারুর মুখের উপর কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। নিজের ঝোঁকেই লোচন বলিয়া যায়, অল্প বয়েসে ভুল তো অনেকেই করে, তার জন্যে শাস্তিও তো কম পাস নি। আমি সত্যি বলছি হারু, তুই আমার ছেলে হ'লে—

হারু নীরবে নতমুখে অর্দ্ধসমাপ্ত জালটার সুতার মধ্য দিয়া কাঠি চালাইতে থাকে।

কিন্তু মানুষের মন।

হারুর রক্তে রক্তে যে বীজাণুগুলি সুপ্ত ছিল, তাহারা আবার ধীরে ধীরে পূর্ণ তেজে তাহার শিরা-উপশিরায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, মূর্চ্ছাহত সরীসৃপের ফণায় আবার বিষের সঞ্চার হয়, একটা নিদ্রিত পশু যেন প্রখর ক্ষুধা লইয়া জাগিয়া উঠে। তাহাকে সংযত করিবার শক্তি তাহার নাই,

হারু গম্ভীর হইয়া যায়। কাজের মধ্যে নামিয়া আসে। একটা অলস ঔদাসীন্য, একটা কি যেন চিন্তায় সে সমস্তক্ষণ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ডাকিলে শুনিতে পায় না, নতুবা সাড়া দিতে ভুলিয়া যায়।

লোচন লক্ষ্য করে। সবিস্ময়ে বলে, তোর হ'ল কিরে?

হারু জবাব দেয়, কিছু না।

কিন্তু লোচন সে কথা বিশ্বাস করে না। জোর করিয়া বলে, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। খাটতে খাটতে শরীর খারাপ করছে বোধ হয়। আজ আর তোর নদীতে গিয়ে কাজ নেই।

হারু হঠাৎ বিরক্ত হইয়া উঠে, না না, খুড়ো, আমার কিচ্ছু হয় নি, তুমি নিজের কাজে যাও না।—বলিয়াই ক্ষুব্ধ লোচনকে আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করিবার অবকাশ না দিয়া নিজেই সেখান হইতে উঠিয়া যায়।

লোচন এ দুর্ব্বোধ্য ব্যবহারের কোন মানে খুঁজিয়া পায় না। হারুর উপর একটা অভিমানে সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, মরুকগে, ওর জন্যে আমার কি আসে যায়!

বলে বটে, কিন্তু অন্তর তাহাতে সান্ত্বনা পায় না।

লোচন আর হারু সেদিন হাট হইতে ফিরিতেছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিয়াছে, জোৎস্নায় গ্রামের পথঘাট যেন পরিপ্লাবিত। লোচন গান ধরিয়া দেয়—

শ্যামের মোহন বাঁশী,
শুনে আমার প্রাণ উদাসী—

হারু হঠাৎ থামিয়া বলে, খুড়ো, চল, একবার পূবের চর হয়ে ঘুরে যাই। মামার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না, গোটা কয়েক কাজের কথা আছে।

লোচন একটু ইতস্তত করে, বলে, এখন! ওই জঙ্গলের পথে!

হারু বাধা দিয়া বলে, বেশি দেরি হবে না খুড়ো, যাব আর আসব। চল না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোচন বলে, আচ্ছা।

লোক-চলাচলের রাস্তা ছাড়িয়া ওরা সঙ্কীর্ণ জনহীন জঙ্গলের পথ ধরে। বাঁশ-সুপারির ছায়ায় ছায়ায় লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়া সিঁথির মত চেরা সরু পথের রেখা আলো-ছায়ার মিলনে বিচিত্র হইয়া আছে। সেই পথ বাহিয়াই তাহারা চলিতে থাকে।

লোচন যে অস্বস্তি বোধ করিতেছে, সেটা বুঝিতে পারা শক্ত নয়। বলে, গতবার এই জঙ্গলে বড় শেয়ালে মানুষ নিয়েছিল, ওই কাজির পাড়ায় ভেলু মিঞার ছেলেকে—

হারু হঠাৎ অসংলগ্নভাবে হাসিয়া ওঠে,—বিশ্রী হাসি। অন্তত লোচনের যেন কেমন লাগে। হারু বলে, ভয় কি খুড়ো, আমরা দুজনে তো আছি।

লোচন যেন কোন কথা খুঁজিয়া পায় না, শুধু বলিতে যায়, তা বটে।

কিন্তু কথাটা আর শেষ হইতে পায় না, হঠাৎ পিছন হইতে একটা প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়ে তাহার মাথার উপরে, অপ্রত্যাশিত, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই। মূর্চ্ছিত হইয়া লোচন পড়িয়া যায় পথের উপরে। একটা চীৎকার পর্য্যন্ত করিবার অবকাশ পায় না।

যখন আস্তে আস্তে মস্তিষ্কে চেতনার সঞ্চার হয়, তখন বুকে একটা প্রচণ্ড গুরুভার অনুভব করে। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে, হাতে একখানা তীক্ষ্ণধার দা বাগাইয়া লইয়া হারু তাহার দেহে চাপিয়া বসিয়া আছে।

তাহার আচ্ছন্ন চেতনা যেন বিদ্যুতের আঘাতে এক মুহূর্ত্তে সতেজ হইয়া উঠে, হারুর অকারণ এবং অপরিসীম বিশ্বাসঘাতকতায় সে কেমন বিমূঢ় হইয়া যায়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা যে অকারণ নয়,—সে জবাব হারুই দেয়। আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টার উপক্রম করিতে হারু নিজের কথাটা সহজ-ভাবে বুঝাইয়া দিয়া রূঢ় কর্কশ স্বরে বলে, প্রাণে বাঁচতে যদি ইচ্ছে থাকে, তা হ'লে ব'লে দাও টাকা রেখেছ কোথায়?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া অসহায় গর্জ্জনে লোচন শুধু বলিতে পারে, নিমকহারাম!

হারু সে তিরস্কারে কান দেয় না, বলে, আমার সময় নেই, এখুনি জবাব দাও, নইলে গলায় দা বসিয়ে দোব। বল, টাকা কোথায়?

লোচনের চোখে হিংস্র দীপ্তি জ্বলিয়া উঠে, অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বলে, টাকার কথা বললে আমায় খুন করবি না তো?

—না।

লোচন এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করিয়া বলে, বড় বাঁকের মুখে যে ছোট্ট চড়াটা, তারই হোগলা-বনের উত্তর পাশে জল থেকে সাত হাত দূরে বালির তলায় টাকার হাঁড়ি পোঁতা রয়েছে।

কথাটা শেষ হইবামাত্র হারুর হাতের দাখানা সবেগে লোচনের গলায় নামিয়া আসে। মুহূর্ত্তে মাথাটা ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, খানিকটা টাটকা তাজা রক্ত হারুর হাতে বুকে কাপড়ে ছিটকাইয়া আসে। পা দুইটা বার কয়েক দুমড়াইয়া হাত দুইখানা বার কয়েক ছুঁড়িয়া লোচনের দেহটা স্থির হইয়া যায়, শুধু ডান পায়ের মাংসপেশীর কাছে কয়েকটা শিরা তখন দপ দপ করিতে থাকে। বাঁ হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিকভাবে কোঁকড়াইয়া গিয়া যেন অন্তিম শক্তিতে একগুচ্ছ ঘাসকে আঁকড়িয়া ধরে। চাঁদের আলো আর বনচ্ছায়ার মাঝখানে আগুনের মত তরল লাল রক্ত স্রোতের ধারায় বহিয়া যায়।

হারু উঠিয়া পড়ে। আর এক মুহূর্ত্ত দেরি নয়, টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই নৌকা লইয়া চাঁদপুরের দিকে সরিয়া পড়িতে হইবে।

আকাশ হইতে ঝরিতেছে অজস্র জ্যোৎস্না।

মেঘনার বুকের উপর সৌন্দর্য্যের উৎসব সুরু হইয়া গেছে, জল বহিয়া চলিয়াছে গলানো রূপার মত। ঠাণ্ডা বাতাস প্রচুর জ্যোৎস্না আর অনন্ত জল লইয়া মাতামাতি সুরু করিয়া দিয়াছে।

নির্জ্জন চড়ার বুকে যেখানে হোগলাবন বাতাসে ছুলিয়া উঠিতেছে, সেইখানে আসিয়া হারু নৌকা ভিড়ায়। হাঁ,—ঠিক এই জায়গা, এইখানটা হইতে সাত হাত দূরে—বালির নীচে—

কিন্তু হঠাৎ হারু অনুভব করে, তাহার পা দুইটা বালির মধ্যে বসিয়া যাইতেছে যেন। বিস্মিত হইয়া সে পা উঠাইবার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু আরও বেশি করিয়াই তাহার জানু পর্য্যন্ত বালির নীচে নামিয়া যায়!

নিশ্চিত চোরা বালি!

তারপরেই দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া যায় একেবারে কোমর অবধি। আতঙ্কে তাহার শরীরের রক্ত যেন এক মুহূর্ত্তে শীতল হইয়া গেছে—শুধু একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসে কণ্ঠ হইতে। দিগন্তবিস্তৃত মেঘনা, প্রবল জলকল্লোল, কোথাও জন-মানুষের চিহ্ন নাই। হাজার বার চীৎকার করিলেও কোনখান হইতে এতটুকু সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, কোন নৌকার মাঝি যদি বা শুনিতে পায়, মনে করিবে, ভূতের কণ্ঠ।

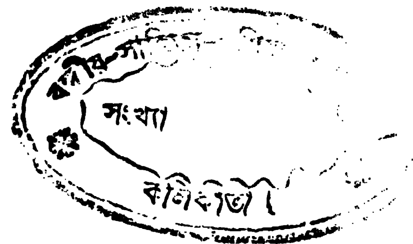
বুক পর্য্যন্ত বালির নীচে নামিয়া আসিয়াছে।

হারুর অসহায় উন্মত্ত বিক্ষুব্ধ দৃষ্টির সামনে লোচনের সেই অদ্ভুত হাসিটা ভাসিয়া উঠে। এতক্ষণে সে হাসির অর্থ পরিষ্কার হইয়া গেছে।

সকালের আলো ছড়াইয়া পড়ে মেঘনার বুকের উপরে।

শুধু দিগ্‌দিগন্ত জুড়িয়া একটা শুভ্র রুক্ষতা যেন মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে। বিশাল জলধারা উদ্বেলিত তরঙ্গে তরঙ্গে কুটিল হইয়া উঠিতেছে, ফুটিয়া পড়িতেছে অগণিত ফেনার ফুল। অসংলগ্নভাবে বিস্তৃত ছোট বড় অসংখ্য বালির চর,—প্রবল জলো হাওয়ায় রাশি রাশি বালি উড়িতেছে, শন শন করিয়া মাতামাতি করিতেছে বকের মত সাদা কাশফুল আর উদ্ধত হোগলার সারি।

আর নির্জ্জন বালুচরের কোলে লোচনের নোঙর-ফেলা শূন্য ডিঙিটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে তীরের গায়ে আছাড়িয়া পড়িতেছে।





সৌরজগতের বাস্তব দশা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনীলরতন কর

শুক্র অপেক্ষা মঙ্গলের সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ঠতা কম; কিন্তু মঙ্গলগ্রহে শুক্রের মেঘাবরণের তুল্য কোনও আবরণ না থাকায়, তাকে অধিকতর স্পষ্টরূপে জানা গিয়েছে। কেবল পৃথিবীর উপগ্রহ—চন্দ্র ব্যতীত সৌরজগতের অপর কোনও আকাশচারী পথিক জ্যোতিষীর দৃষ্টিপথে এত বিশদ আকারে ধরা পড়ে নি। এক হিসেবে মঙ্গলকে আমরা চন্দ্রাপেক্ষাও অধিক জানি, কারণ চন্দ্রের পশ্চাৎপৃষ্ঠ কিরূপ, তা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু মঙ্গলের ভূমির প্রত্যেক দৃশ্যই কখনও না কখনও পৃথিবীর অভিমুখে আবর্তিত হয়।

মঙ্গলের আয়তন পৃথিবীর এক-সপ্তমাংশ, ওজন এক-দশমাংশ এবং তার দিবারাত্রি পৃথিবীর চেয়ে মাত্র ৩৭ মিনিট ২২·৫৮ সেকেণ্ড দীর্ঘতর। আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও এই গ্রহটির সহিত পৃথিবীর সর্বাধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। তার মেরুপ্রদেশে পার্থিব মেরুদ্বয়ের ন্যায় তুষারের আস্তরণ আছে। গ্রীষ্মের সময় যখন তার এক মেরুপ্রদেশের হিম-আবরণ সংকোচলাভ করে, তখন বিপরীত মেরুতে সুদীর্ঘ মাঙ্গল রজনীর শৈত্য তুষারের উত্তরীয় বিছিয়ে দেয়। দ্রবীভূত বরফজাতীয় দ্রব্য অদৃশ্য বাষ্পাকারে এক মেরু থেকে অপর মেরুতে নীত হয়ে এই ঘটনা সম্ভবপর করে—এইরূপ অনুমিত হয়। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, মঙ্গলগ্রহে জল কখনও বিশেষ স্থায়ীভাবে তরল আকারে থাকতে পারে না। বসন্তের অন্তে ও গ্রীষ্মাগমে যখন তুষার গ'লে যায়, তখন তরল মেরুসাগর ও জলাচ্ছন্নভূমি তৈরি হয় বটে, কিন্তু সে অল্প কয়েকদিনের জন্যে। মঙ্গলের ভূভাগের অনেকাংশ মরুভূমি, তার উপর প্রচুর লৌহময় প্রস্তর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সহিত সম্মিলিত হয়ে অয়স্কলঙ্কে আবৃত রয়েছে; এই কারণে মঙ্গলগ্রহ লোহিতাঙ্গ।

মঙ্গলের বিচিত্র খালসদৃশ রেখাগুলি গত শতাব্দীর শেষার্ধভাগে জ্যোতিষী সমাজে বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করেছিল। ইটালীয় জ্যোতিষী শিয়াপারেলী সর্বপ্রথম ১৮৭৭ অব্দে এই রেখাগুলি আবিষ্কার করেন। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট শত শত সরু কৃষ্ণরেখা মঙ্গলের লোহিতাভ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। স্থানে স্থানে রেখাসমূহ পরস্পরকে ছেদ করেছে। যেখানে দুই বা ততোধিক রেখা একত্রে মিশেছে, সেখানে প্রায়শ বৃত্তাকার কালো দাগ দেখা যায়। ডক্টর লাওয়েল এই কালো বৃত্তাকার দাগগুলিকে ওয়েসিস বা মরূদ্যান বলেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে এই মরূদ্যানগুলি মঙ্গলবাসীদিগের বসবাসের বড় বড় কেন্দ্র। কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বৎসর আগে তিনি মন্তব্য করেন যে, মিশরীয়গণ যেরূপ নীলনদের খাল কেটে উপনিবেশ বিস্তার করেছিল, সেইরূপ মঙ্গলগ্রহের ইঞ্জিনীয়ারগণ তার মেরু-প্রদেশের বরফ-গলা জলের ধারা নানা স্থানে নিয়ে যাবার জন্য পরিখা খনন ক'রে চাষ-আবাদের সুবিধা ক'রে নিয়েছে। লাওয়েলের মতের বিরুদ্ধে প্রথম এই আপত্তি উঠেছিল যে, সেরূপ কোনও পয়োনালী মঙ্গলগ্রহে থাকলেও তার বিস্তার অত অধিক হতে পারে না, যাতে তাকে বর্তমানের সবচেয়ে

ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে দেখা যেতে পারে। এ কথার উত্তরে তিনি বলেন, দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে মঙ্গলগ্রহে যে সকল কৃষ্ণরেখা লক্ষিত হয়, সেগুলি কেবল খনিত জলধারার চিত্র নহে, পয়োনালীর দুই তীরবর্তী উদ্ভিদ-ক্ষেত্রসমূহও সেই সঙ্গে মিশে আছে; মঙ্গলগ্রহ থেকে হয়তো শুধু নীলনদকে দেখা না যেতে পারে, কিন্তু নীলনদের উপকূলবর্তী শস্যশ্যামল বিস্তৃত ভূভাগ দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব হবে না। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করার পর ১৯২৫ অব্দে মার্কিন জ্যোতিষী কোব্‌লেন্‌টস্‌ ও ল্যাম্প্‌ল্যাণ্ড মঙ্গলকে পর্যবেক্ষণ ক'রে বলেন যে, তার সবচেয়ে অধিক আলোকপ্রাপ্ত ভূমিসমূহের তাপমাত্রা পৃথিবীর শীতঋতুর রৌদ্রময় দিবসেরই মত। উইল্‌সন পাহাড়ের মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তাঁদের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া গিয়েছে, কাজেই লাওয়েলের সিদ্ধান্ত হয়তো সত্য হতে পারে।

কিন্তু মঙ্গলগ্রহে কোনও মেঘ দেখা যায় না। ডক্টর ডব্লিউ. এইচ. রাইট বেগুনী এবং লোহিত আলোতে মঙ্গলের ফোটো তুলে দেখিয়েছেন যে, ঐ গ্রহে যথেষ্ট বায়ুমণ্ডল আছে। কারণ লাল আলোয় তোলা ফোটোতে মঙ্গলগ্রহ যেরূপ স্পষ্ট দেখায় বেগুনী আলোতে তোলা চিত্রে তার কিছুই দেখা যায় না। অর্থাৎ মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল বেগুনী আলোর পথ রোধ করে, কিন্তু লাল আলো তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। পৃথিবীতে এর অনুরূপ ঘটনা আমাদের সুপরিচিত; সূর্যের উদয় এবং অস্ত সময়ে যখন তার কিরণকে অধিকতর বায়ুস্তর ভেদ ক'রে আসতে হয়, তখন লাল রশ্মি ব্যতীত অপর ক্ষুদ্র আলোক-তরঙ্গগুলি আমাদের চক্ষু পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না; এই কারণে উদয় ও অস্ত কালের সূর্যকে আরক্তিম দেখায়।

মঙ্গলগ্রহে যথেষ্ট বায়ুমণ্ডল থাকলেও তাতে কি কি উপাদান আছে বলা কঠিন। তবে তার মধ্যে সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন আছে ব'লে মনে হয়। কিরণচ্ছত্রের সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয়, মঙ্গলের বায়ুতে জলীয় বাষ্প খুব বেশি নেই; কাজেই মঙ্গলগ্রহ যে মেঘাচ্ছন্ন দেখায় না, এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই।

হ্বিল্‌ট বলেন, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের পাতলা আবরণের উপর সূর্যের আল্‌ট্রাভায়লেট রশ্মি পতিত হওয়ায় ওজোন-স্তর উৎপন্ন হয়; কিন্তু সেই ওজোন-স্তর, পার্থিব বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান ওজোন-স্তরের ন্যায় অত উচ্চে অবস্থিত নহে। মঙ্গলের ওজোন-গ্যাস তার ভূমির উপর অক্সিজেন-প্রক্রিয়া ঘটাতে বিশেষ সহায়তা করে।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে অধিকাংশ গ্রহেই বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব আছে ব'লে জানা গিয়েছে। গ্রহদিগের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে পরীক্ষাসমূহের মন্তব্য থেকে এক কথায় এই বলা যেতে পারে যে, বৃহদ্‌কায় গ্রহের বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন-ঘটিত যৌগিক এবং মাঝারি আকারের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন-ঘটিত যৌগিক বিদ্যমান; ক্ষুদ্রকায় গ্রহে কোনও বায়ুমণ্ডল নাই। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে জন্‌স্টোন স্টোনি ১৮৯৭ অব্দে এইরূপ বিবৃতি দিয়েছিলেন:—ক্ষুদ্র গ্রহদের যথেষ্ট মহাকর্ষক্ষমতা না থাকায় তারা নিজের ক্রোড় থেকে আন্তরগ্রহাকাশের বায়ুপরিশূন্য স্থানে (vacuum of inter-planetary space) গ্যাসদের পলায়ন-প্রবণতা বন্ধ করতে পারে নি। কোনও গ্রহ থেকে গ্যাসের

অণুর পলায়ন-বেগ গ্রহের ভর (mass) ও ব্যাসের উপর নির্ভর করছে। গ্রহ থেকে পলায়নের যোগ্য বেগ প্রাপ্ত হ'লে গ্যাসেরা অধিবৃত্ত (parabola) কিংবা পরাবৃত্ত (hyperbola) আকারে কক্ষ রচনা ক'রে ছুটে যায় এবং যাবার পথে বাহির থেকে কোনও বাধা না পেলে তারা আর ফিরে আসে না। বৃহস্পতির ক্রোড় থেকে গ্যাসের এই পলায়ন-বেগ সেকেণ্ডে ৬০ কিলোমিটর; পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই বেগ সেকেণ্ডে ১১·৪ কিলোমিটর এবং চন্দ্রের ক্ষেত্রে এই বেগ সেকেণ্ডে ২·৪ কিলোমিটর।

যে কোনও গ্যাসের অণু অবিরত চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তাদের গড়বেগ গ্যাসের অণুর গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল। শূন্য সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন অণুর গড়বেগ সেকেণ্ডে ১·৮৪ কিলোমিটর; অক্সিজেনের ০·৪৬ কিলোমিটর এবং কার্বনডায়কসাইডের ০·৩৯ কিলোমিটর। বুধগ্রহ থেকে গ্যাসের পলায়নবেগ চন্দ্র থেকে পলায়নবেগের অর্ধেক। কিন্তু এই গ্রহটি সূর্যের খুব নিকটে থাকায় চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশি উত্তপ্ত, কাজেই সে কেবল সবচেয়ে গুরুভার গ্যাসদের ধ'রে রাখতে সমর্থ। মঙ্গল থেকে গ্যাসের পলায়নবেগ সেকেণ্ডে ৫ কিলোমিটর, এজন্য সেখানে হাইড্রোজেন বাঁধা থাকতে পারে না, কিন্তু জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য ভারী গ্যাস থাকতে পারে। শুক্র ও পৃথিবী তাদের বর্তমান তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনকেও ধ'রে রেখেছে এবং অধিকাংশ বৃহৎ গ্রহেরা ভাস্বর (incandescent) অবস্থাতেও হাইড্রোজেনকে ধ'রে রাখতে সমর্থ।

এই প্রকার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, বুধ ও চন্দ্র কেন বায়ুহীন, ক্ষুদ্রতর উপগ্রহ এবং গ্রহিকারা কেন বায়ুশূন্য। কেবল নেপ্চুনের উপগ্রহ বায়ুশূন্য কি না সন্দেহের বিষয়; তার ওজন অনেক বেশি এবং শৈত্যও অত্যধিক। তাই মনে হয় নেপ্চুনের উপগ্রহে হয়তো বায়ু থাকতে পারে। প্লুটোর বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে এখনও নির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না, তবে সম্ভবত মঙ্গলের ন্যায় তারও একটা পাতলা বায়বীয় আবরণ আছে।

পৃথিবীর উপগ্রহ—চন্দ্র বায়ুপরিশূন্য ঊষর পার্বত্যভূমি। চন্দ্রের উপর যদি হাইড্রোজেন গ্যাসের আবরণ দেওয়া যেত তা হ'লে গড় বেগের চেয়ে একটু অধিক বেগবান প্রত্যেক গ্যাসের অণু অপর কোনও অণুর সহিত সংঘর্ষে না এলে মহাকাশে ছড়িয়ে যেত এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তার বায়বীয় পরিমণ্ডল নিঃশেষ হয়ে যেত। জীন্‌স বলেন, গড়বেগের ত্রিগুণ বেগ প্রাপ্ত হ'লে গ্যাসের অণুরা বায়ুর পরিমণ্ডল থেকে যে হারে বহিষ্কৃত হতে পারে, সপ্তাহকাল মধ্যেই বায়বীয় আবরণ তাতে ক'মে অর্ধেক হয়ে যায়; অতঃপর হ্রাসের হার অত্যন্ত ক'মে যায় এবং পলায়ন-বেগের এক-পঞ্চমাংশ বেগবিশিষ্ট অণুময় বায়ুমণ্ডল বহু কোটি বৎসর বিদ্যমান থাকে।

সূর্যের কিরণপাতে চন্দ্রের ভূমি এক শত সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীর অধিক উত্তপ্ত হয়, কাজেই তার জমির উপর বায়ু কিংবা জলীয় বাষ্প স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না। যদি কখনও চন্দ্রের অতীত ইতিহাসে উত্তপ্ত গলন্ত লাভাময় অবস্থা থেকে থাকে, তবে সে সময়ে তার একটুও বায়ুমণ্ডল ছিল না, কারণ তৎকালে তার উপরিস্থ গ্যাসের অণুর বেগ বর্তমান তাপমাত্রায় অবস্থিত পরিকল্পিত বায়ুর বেগ অপেক্ষা অধিক হ'ত। কাজেই চন্দ্র যে জরাগ্রস্ত, সে বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ। এই প্রকার সিদ্ধান্ত থেকে মনে হয়, চন্দ্রলোকে জীবের অবস্থিতির সম্ভাবনা নেই। চন্দ্রে জল নেই, হিমানীর

আবরণ নেই, এমন কি তার অবয়বের তাপরক্ষণযোগ্য বায়বীয় পরিমণ্ডল পর্যন্ত নেই। দিনের বেলা সূর্যের তেজ এসে তার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ১২০ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী অর্থাৎ জলের স্ফুটনাঙ্ক অপেক্ষাও অধিক হয়, আবার মধ্যরাত্রে তার উষ্ণতা ক'মে গিয়ে —১০০° সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে।

চন্দ্রে বহু গহ্বরযুক্ত পর্বত আছে, তন্মধ্যে কোনও কোনও পর্বতের গহ্বর পৃথিবীর যে কোনও পর্বতগহ্বর অপেক্ষা বৃহত্তর। জরাগ্রস্ত চন্দ্রের এই গহ্বরগুলিকে অনেকে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি ব'লে মনে করেন। অতিকায় দূরবীক্ষণ সাহায্যে লক্ষ্য করলে চন্দ্রকে মাত্র দুই তিন শত মাইলের মধ্যে প্রতীয়মান হয় এবং তার ভূমির পাঁচ শত ফিট ব্যবধানে অবস্থিত বস্তুসমূহের আকারগত বিশেষত্বজ্ঞাপক চিত্র ফোটোগ্রাফে ধরা পড়ে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা যথাযথভাবে জানি না—চন্দ্রের ভূমি কি উপাদানে নির্মিত।

পৃথিবীর এই উপগ্রহটি অপরাপর গ্রহের উপগ্রহ অপেক্ষা অনুপাতে বড়, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চন্দ্র অতি নগণ্য আয়তনের, তার ব্যাস মাত্র ২১৬০ মাইল। অথচ আমাদের নিকট চন্দ্রকে সূর্যের তুল্য প্রতীয়মান হয়; কারণ মাত্র ত্রিশটি পৃথিবী সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করতে পারলেই আমরা চন্দ্রে পৌঁছিতে পারি। মানবের কবিচিত্তের নিকট পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ স্পৃহনীয়, কিন্তু চন্দ্রলোকে কোনও মানবপ্রকৃতিসম্পন্ন জীবের অস্তিত্ব থাকলে তার নিকট পৃথিবীর প্রেরিত জ্যোতিও কম স্পৃহনীয় হ'ত না। জ্যোতিষী এইচ. এন. রাসেল হিসাব ক'রে বলেছেন যে, চন্দ্রলোকে যখন পৃথিবীর পূর্ণিমাকৌমুদী ছড়িয়ে পড়ে, তখন চন্দ্র থেকে কোনও পর্যবেক্ষক পৃথিবীকে লক্ষ্য করলে আমাদের দৃষ্ট পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা তাকে চল্লিশ গুণ উজ্জ্বল দেখবে।

আমাদের এই বসুন্ধরার উপরিভাগ উন্নতাবনত অতিকায় মধুচক্রের মত। পৃথিবীর ওপর মাঝে মাঝে উষ্ণ তরল পদার্থ এবং কোমল নমনীয় বস্তু ইত্যাদি সঞ্চিত থাকলেও তার অন্তরপ্রদেশটি মোটের উপর কঠিন। ধরিত্রীর হৃৎপিণ্ডটি প্রকৃতির কারখানায় নিকেল-মিশ্রিত ইস্পাত দিয়ে রচিত হয়েছে। একেবারে কেন্দ্রীয় অংশটি হয়তো এরূপ গ্যাস অথবা তরল দ্রব্যে পূর্ণ রয়েছে, যা পৃথিবীর উপরিস্থ তরল ও বায়বীয় দ্রব্যাপেক্ষা বহুগুণ ভারী এবং ঘন; এই অংশটির ব্যাস প্রায় ১৬০০ মাইল। কেন্দ্রীয় অংশটি বেষ্টন ক'রে উত্তপ্ত পুরু কঠিন ও ভারী ধাতুময় স্তর বিরাজ করছে। নিকেল-লৌহের এই আবরণ প্রায় তিন হাজার মাইল বেধবিশিষ্ট; এইটি পৃথিবীর অবয়বের খুব বেশি অংশ। নিকেল-লৌহের পিণ্ডটিকে ঘিরে বেসাল্ট (Basalt) নামক এক প্রকার শিলার স্তর প্রায় হাজার মাইল পুরু হয়ে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। শিলাস্তরের উপরিভাগে মাঝে মাঝে গ্রানাইট পাথরের পাতলা প্রলেপ দেওয়া রয়েছে এবং যেখানে এই প্রলেপের অবকাশ আছে, সেই স্থানগুলি জলময় মহাসমুদ্রের অবধারকপাত্রস্বরূপ। পৃথিবীর উপরে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতার মানদণ্ডে দাগ টানা হয়। সমুদ্রতীরে অবস্থিত মহাদেশগুলি পৃথিবীর খুব পাতলা পর্দা মাত্র।

ভূকম্পন-তরঙ্গের পর্যালোচনাফলে স্থির হয়েছে যে, পৃথিবীর সাগরপৃষ্ঠের প্রায় ১৫০০ মাইল নিম্নের ভূমি অতিশয় কঠিন। পূর্বে বলা হয়েছে, পৃথিবীর গড় ঘনত্ব জলের ৫'৫ গুণ; অতএব এটি সুনিশ্চিত যে, তার অভ্যন্তরে প্রচুর গুরুভার বস্তু রয়েছে; কারণ ভূমির উপরিস্থ শিলাসমূহের

ঘনত্ব গড়ে মাত্র ২'৭। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ গুরুভার বস্তুকে লৌহনির্মিত মনে করার একটি কারণ এই যে, পৃথিবী অতিকায় চুম্বকতুল্য আচরণ করে। পৃথিবীর বাহিরের আকাশ থেকে যে সকল উল্কারাশি তার বক্ষে এসে পড়ে, তাতে লৌহ-উপাদানের প্রাচুর্য দৃষ্টে এই অনুমান বলবৎ হয়েছে; কারণ হয়তো এককালে পৃথিবী ও উল্কা একই উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণকালে তা থেকে যে সকল দ্রব্য উত্থিত হয়, তার ভিতরের আগ্নেয় শিলাসমূহ ৩ ঘনত্বসম্পন্ন। পৃথিবীর ঘনত্ব কেন্দ্রভাগে ১১ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে মধ্যভাগে ৩, উপরিভাগে ২'৭ এবং মহাসাগরে গিয়ে ১-এ পৌঁছেছে। মহাদেশগুলি আগ্নেয়শিলার উপরে শঙ্কসদৃশ। ভূতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, একদা গলন্ত আগ্নেয়শিলার উপরে ভূমির পাতলা পর্দা সরের মত ভেসে উঠেছিল; পরে যখন শিলাসমূহ কাঠিন্য লাভ করল, তখন মহাদেশগুলি খোসার মত তার গায়ে সংলগ্ন হয়েছে। মহাদেশগুলির সর্বাপেক্ষা পুরু স্থানসমূহের বেধ প্রায় ত্রিশ মাইল। সাগরপৃষ্ঠ থেকে হিমালয়ের গড় উচ্চতা প্রায় তিন মাইল। যাকে আমরা মাটি বলি, সেটি যেন পৃথিবীর চর্মাবরণ। ত্রিশ মাইল পুরু এই আস্তরণটি বহুসংখ্যক স্তরে বিন্যস্ত দেখা যায়। কি ভাবে কোন্ কালে এই স্তরগুলি পৃথিবীর উপরে রচিত হয়েছিল, ভূতত্ত্ব সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে।

ক্রমশ

হবে অপরাধ

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার

(G. K. Chestertonএর Ecclesiastesএর অনুবাদ

হবে অপরাধ শ্যামল পত্রে হলুদ কহিস যদি,
সূর্য্য শিহরে চাহি সে পাপের পানে।
হবে অপরাধ মৃত্যুরে যদি ডাক দিস নিরবধি,
একা ভগবান মৃত্যু-মহিমা জানে।

ইহাই সত্য, বিষম ভয়ের কালো পাখ্‌নার নীচে
আমের শাখায় মুকুল ফলে না বনে;
নিত্য বস্তু সর্ব্ব বস্তু,—বাকি যা সকলি মিছে,
একথা রাখিস মনে।

শিল্পের উদ্দেশ্য

শ্রীইন্দ্রসোম বর্ম্মন

"যখন বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকে লোকশিক্ষার দাসী করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তাহাতে রাজি হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, চরম সৌন্দর্য্য, পরম সৌন্দর্য্য, অথবা সৌন্দর্য্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম্ম, তাহাই পরম ধর্ম্ম।...কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে Over-rule করিলেন।" —৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ)।

শিল্পের উদ্দেশ্য শিল্পই, না শিল্পাতিরিক্ত কোন বস্তু, এ বিষয়ে বাদবিতণ্ডা অসীম।—এই পর্য্যন্ত লিখিয়া প্ল্যান্‌চেট কিছুক্ষণ জিরাইয়া লইল।

আমি কহিলাম, বাদবিতণ্ডা না থাকিলে আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করিতাম না; সুতরাং চট করিয়া বক্তব্য বিষয়ে প্রবেশ করিলে ভাল হয় না কি?

প্রেত লিখিলেন, দেখ, তোমরা নবীনের দল অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ। সকলে সব কথা বলিবার জন্য সব সময় প্রস্তুত হইয়া থাকে না। যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করি, শিল্প বলিতে তোমরা কি বোঝ? অবশ্যই একটা বাজে উত্তর দিবে; ঠিক উত্তর দিতে পারিলে আমাকে খামকা বিরক্ত করিতে না। আমিও ইতিমধ্যে জবাবটা ভাবিয়া রাখি।

আপনারা বোধ হয় ভূত বিশ্বাস করেন না? আমরা করি। সবুজ-সংঘের সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আর্ট লইয়া দারুণ তর্ক হওয়ায় প্রায় একটি খণ্ডযুদ্ধের উপক্রম ঘটিয়াছিল। তিনি অবশ্য ভবিষ্যৎপন্থী; কিন্তু সে তো আমিও। কিন্তু তাই বলিয়া ভূত মানিব না, ইহাও কোন শাস্ত্রে লেখে না; বিশেষত যখন আমাদের সভাটি থিয়সফিস্ট মহাশয়ের সিয়ান্স-কক্ষেই বসে; আমাদের ভূত-বিশ্বাসে প্রীত হইয়াই তিনি তাঁহার হলটি আমাদিগকে ব্যবহার করিতে দেন। সহকারী সম্পাদক পদ্য-কবিতা লেখেন; এবং বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার অথরিটি। অন্যান্য সভ্যের পরামর্শে সেই বঙ্কিমচন্দ্রকেই প্ল্যান্‌চেটে নামাইলাম। আমাদের তর্ক সুরু হইয়াছিল গদ্য-কবিতা লইয়া, পৌঁছাইল আর্টে। সহসা প্ল্যান্‌চেটের প্রস্তাবে কম্যুনিজ্‌ম্ পর্য্যন্ত গড়াইতে পারিল না।

বিনোদদা আমাদের দলে, উহারই মধ্যে যাহাকে বলে, একটু সপ্রতিভ; প্রেতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একটু কাসিয়া, গলাটি পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিলেন, আর্টের কোন্ সংজ্ঞাটি বলিব? প্লেটো, আরিস্ততল, কান্ট, হেগেল, হুার্ডসোয়ার্থ, কোল্‌রিজ, শেলী, টলস্টয়, বার্নার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ, ক্রোচে, আর্নল্ড, মারি, গান্ধী, অবনীন্দ্রনাথ, অতুল গুপ্ত, মোহিতলাল—কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে রাখিব? তবু তো অনেকেরই নাম বাদ গেল।

প্রেত লিখিলেন, আজকালকার সব ছেলেগুলাই কি এই রকম জ্যেঠা?

আমি কহিলাম, যদি অভয় দেন তো, আমার মতটা শুনাইতে পারি। মতটা অবশ্য ক্রোচের; কিন্তু আমি সেটা হজম করিয়া আত্মস্থ করিয়াছি।

প্ল্যান্‌চেট লিখিল, বল।

আমি কহিলাম, আর্ট আর কিছুই নহে, উহা বিস্ময়ের স্বতঃ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকাশমাত্র। সুতরাং আর্ট উদ্দেশ্যবিহীন। ভাব যখন কর্ম্মে বা চিন্তায় পরিণত হয় না, কেবল বিস্ময়ের উদ্রেক করে, তখনই তাহা রসে পরিণত হয়; এবং রসই যে কাব্যের তথা আর্টের আত্মা, এ কথা কে না জানে?

উৎসাহিত হইয়া আরও বলিয়া ফেলিলাম যে, প্রেতের মত একজন ভাল ঔপন্যাসিক কেন যে আর্টকে নিরুদ্দেশ্য করিয়া দেখেন নাই, তাহা আমার বুদ্ধির বাহিরে। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি কেন যে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাও দুর্ব্বোধ্য। শুধু রোহিণীর হত্যাসংক্রান্ত প্রাচীন অভিযোগটি, নিতান্ত প্রাচীন বলিয়াই, বিশেষ অনিচ্ছায় চাপিয়া গেলাম।

প্রেত লিখিলেন, থাম, থাম। একগঙ্গা বলিয়াছ। এখন একটু আমার কথা শোন। রস, ভাব, বিস্ময় প্রভৃতি অস্পষ্ট কথাগুলিকে তুমি যে একেবারে গণিতের গতের মত করিয়া লইয়াছ। আমি অতটা পারি না। আমাকে একটু ধীরে-সুস্থে বলিতে হইবে, পরে তোমার অভিযোগের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। রসের কথা যে বলিলে, সেই রস কি অদ্বৈত ব্রহ্মের মত একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার? আমার তো মনে হয়, রস নানাবিধ, রস অসংখ্য; এবং কোন রসের সহিতই কোনটার কোন মিল নাই; কেবল সুবিধার জন্য রস নামে কতকগুলি বিচিত্র, বিভিন্ন পরস্পর-সম্বন্ধ-বিরহিত অনুভূতিকে বুঝানো হয়। কোন রসের অবশ্য কোন উদ্দেশ্য নাই বলিয়া আপাতত বোধ হইতে পারে; কিন্তু কোন কোন রসের তো স্পষ্টই উদ্দেশ্য আছে দেখা যায়। 'বিষবৃক্ষে'র শেষে যে কথাটি লিখিয়াছিলাম, তাহা বেশ বুঝিয়া-সুঝিয়া লিখিয়াছিলাম বলিয়াই স্মরণ হয়। 'বিষবৃক্ষ'কে তোমরা আর্টের কোঠায় ফেল কিনা জানি না; কিন্তু উহা যদি আর্ট হয়, তবে উহা উদ্দেশ্যমূলক আর্ট। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও উদ্দেশ্য আছে। আমার প্রায় প্রত্যেক রচনাতেই উদ্দেশ্য আছে।

বিনোদদা থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, আপনি যে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, বরাবরই আমার সেই সন্দেহ ছিল; এখন মুখোস খুলিয়া গিয়া ভালই হইল। বুঝিলাম, আপনার মতে অমর কাব্য একটা কথার কথা।

প্ল্যান্‌চেট লিখিতে লাগিল, দেখ, আমাদের সাহিত্যে এমন এক যুগ গিয়াছে, যখন গালভরা শব্দ ব্যবহার বাঙালী লেখকের মজ্জাগত দোষ ছিল। কিন্তু সে দোষ খুব গভীর নয়, নিতান্তই উপরকার ব্যাপার। কিন্তু তোমাদের কি অদ্ভুত প্রবৃত্তি! তোমরা ফ্যাশনের বশে গালভরা শব্দ ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়াছ বলিয়া শুনি, কিন্তু মগজভরা বড় বড় আইডিয়ায় তোমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। পাগলে যেমন নির্ব্বিচারে পাৎলুনের পায়ে হাত গলাইয়া দিয়া ভাবে, জামা পরিয়াছি, তোমরাও তেমনই অস্থানে আইডিয়ার অপপ্রয়োগ করিয়া ভাব, বেড়ে বলিয়াছি। নাস্তিক কথাটাও তুমি পাগলের মত প্রয়োগ করিলে।

অমর কাব্যও আমার মতে যখন উদ্দেশ্যহীন নয়, তখন উদ্দেশ্যপূর্ণ হইলে সেই অমর কাব্যও যে মরিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে মনুষ্যজাতি যে অচিরেই কবির ভাব-স্বর্গের অধিবাসীতে

পরিণত হইবে, তাহার কোনও নিশ্চয় না থাকায়, আদর্শবাদী মহান কাব্যকে অমর বলা হয়। এই অর্থে অমর কাব্যের প্রতি আমার অভক্তি নাই। কিন্তু যে আদর্শ কোন দিনই করায়ত্ত হইবে না, যাহা অনুসন্ধিৎসুর কাছে দিগ্বলয়ের মত চিরদূরবিসর্পী, তাহাকে লইয়া মাথা ঘামানো ভাববিলাস মাত্র ; মহান কবিত্ব তাহাতে আমি দেখিতে পাই না। অথবা যে কাব্যের মধ্যে উচ্চাশা নাই, যাহা ক্ষণস্থায়ী উন্মাদের মধ্যে আত্মবিস্মৃতির পথ নির্দ্দেশ করে, তাহাও কু-কাব্য। সেই ধরণের কাব্যে যাহারা তৃপ্তি পায়, তাহারাই বলে, শিল্পের উদ্দেশ্য শিল্পই ; আসলে সেই উন্মার্গগামীর শিল্পের উদ্দেশ্য আত্মবিস্মরণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমি ক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি কথা? অমর কাব্য বলিয়া কিছুই কি নাই? হোমর, ব্যাস, কালিদাস, সেক্ষপীয়র, ইঁহারা কি মরিয়াছেন? কোন দিনই কি মরিবেন? মানুষের সুখ-দুঃখ, লজ্জা-ভয়, এগুলি চিরদিনের বস্তু ; এগুলি যে কাব্যের আশ্রয় সে কাব্য কি মরিবে?

প্রেত লিখিলেন, যত দুগ্ধপোষ্যের পাল্লায় পড়িয়াছি দেখিতেছি। আরে, সুখ-দুঃখ লজ্জা-ভয় ইত্যাদিকে চিরন্তন বলিবার সময় ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভাবগুলি যুগে যুগে বিভিন্ন বিভাবের সহিত জড়িত হইয়াই দেখা দেয়? বিভাব ব্যতিরেকে ভাবের কল্পনা করিতে পার কি? ভাব ও বিভাবের একটি বিচিত্র সমন্বয়কে রস বলা যায় ; সেই রস অখণ্ড বস্তু। এক যুগের ভাব-বিভাবের রস-সমন্বয় অপর যুগের সঙ্গে মেলে কি? মেলে না। সুতরাং দুঃখই থাক আর সুখই থাক, তাহাদের রসমূর্ত্তির যখন পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন বিভিন্ন যুগের কাব্যে একাত্মতা কল্পনা কর কি করিয়া? এক যুগের কাব্য অপর যুগেও যে পূর্ব্ববৎ আস্বাদনীয়, তাহাই বা কেমন করিয়া ভাবিতে পার? যে কাব্য যত প্রাচীন হয়, সেই কাব্যের বিভাবগুলিও প্রায়শ ততই বিস্মৃতির গর্ভে তলাইতে থাকে। ইতিহাসের ডুবারি-প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিমজ্জিত বিভাবরাশিকে দেখিতে দেখিতে যাহা উপভোগ কর, তাহা রসের শবমাত্র, সজীব শরীর নহে। রসের সেই মৃত শরীর ইতিহাসের আলোকবিকিরণক্ষমতা অনুসারে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট হয় এইমাত্র ; কিন্তু তাহা মৃত শরীর। রূপরসগন্ধস্পর্শময়ী পৃথিবীতে একদিন যাহা জীবিত ছিল, আজ তাহার মৃত্যুই ঘটিয়াছে ; ইতিহাসের বিদ্যুৎশক্তি তাহাকে গ্যাল্‌ভ্যানাইজ করিলেও সে মৃতই।

তবে একটা কথা আছে। কোন কোন যুগ কিঞ্চিৎ দ্রুত-নিঃশেষী, কোন কোনটি আবার কিছু মন্থর-পরিণামী। কাব্যও তদনুসারে ক্ষণিক বা দীর্ঘজীবী হয়। আবার কোন কোন কাব্য এমন কতকগুলি বিভাবকে আশ্রয় করে, যাহাদিগের অধিকাংশই দুর্ম্মর। সেই কাব্যগুলিই মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু ভোগ করে। অপরগুলি শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়। কিন্তু যথার্থরূপে কহিতে গেলে কোন কাব্যই অমর নহে ; কারণ অপরিবর্ত্তনশীল বিভাব বলিয়া জগতে কিছুই নাই। স্বল্পজীবী কাব্য যে দীর্ঘজীবী কাব্য অপেক্ষা সর্ব্বদাই মহত্তর, এরূপ ভাবিবারও কোন কারণ নাই। দুই জাতীয় কাব্যই সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধিত করে। সুতরাং "অমর" কাব্য রচনার কথা বিস্মৃত হইয়া যে দেশে এবং যে কালে জন্মিয়াছ, তাহারই প্রকাশ-বেদনা এবং বিকাশ-কামনা তোমাদের কাব্যকে উদ্বুদ্ধ করুক ; অনন্ত

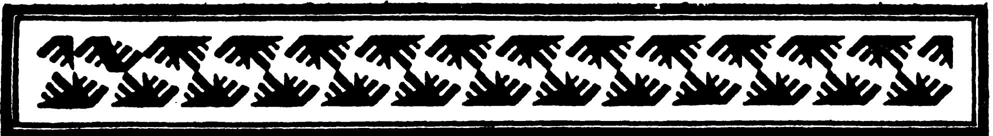
কাল আপনার তদারক আপনিই করিবেন; তাঁহার ক্ষেত্রে দেবতারাও বিচরণ করিতে ভয় পান; তোমরা সেখানে পা বাড়াইও না।

প্ল্যান্‌চেট থামিলে পর আমরা দীর্ঘ লেখাটি পড়িলাম; কি জবাব দিব ভাবিতে লাগিলাম; সহসা বিনোদদা প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, ওঃ, কাব্য তাহা হইলে সমাজের উন্নতিসাধনের যন্ত্রমাত্র? তাহার উদ্ভব হওয়া উচিত কেবল মজুরি খাটিতে? আইন করিলেই যে লেঠা চুকিয়া যায়, তাহার জন্য কাব্যরচনা নাই করিলাম?

প্ল্যান্‌চেট বিচলিত হইয়া নড়িয়া উঠিল, পরে স্থির হইয়া লিখিতে লাগিল, হায়! তাহাই যদি হইত! কিন্তু তাহা এখন সম্ভব নয়। অমানুষ যেখানে দলে ভারী, সেখানে মানুষের আইন চলে না। কাব্য এবং শিল্প অমানুষকে ভুলাইয়া মানুষ করে। শিশু যেমন খেলিবার আনন্দে আপনার সুপ্ত কর্ম্মশক্তিকে জাগাইয়া তোলে, আপনার ব্যক্তিত্বকে নির্ম্মাণ করে, কবি এবং শ্রোতা তেমনই কাব্যের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করে। কাব্যের মূল্যও সেই মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে, তাহার নিজের মধ্যে নয়। যে নিতান্তই অমানুষ, সেই পৌত্তলিক। আপনার ক্রীড়নকে সমর্পিত-প্রাণ সেই মূঢ় আপনাকে এবং পরকে বিড়ম্বিত করে।

দেখ, আমার লেখক-স্বর্গে, কালির মন্দাকিনীতীরে, কাগজের মন্দারকুঞ্জে বসিয়া বহুদিন ভাবিয়াছি, কবে এমন দিন আসিবে, যখন মানুষ আত্মোন্নতির জন্য ক্রীড়নকের সাহায্য লইবে না; যখন চিরবিকাশশীল মনুষ্যসমাজে আর্ট প্রত্নাগারে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু সেদিন আজিও বহু-দূরে; মানুষকে এখনও ক্রীড়নক রচিতেই হইবে; কিন্তু দেখিও, তোমরা যেন উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝিও না।

লেখা থামিয়া গেল। বিনোদদার অনেক প্রশ্নবাণেও যখন প্ল্যান্‌চেট নিঃস্পন্দ রহিল, বুঝিলাম, প্রেত আপনার লেখক-স্বর্গে বিদায় লইয়াছেন। কিন্তু সভাভঙ্গসময়ে প্রেতের মিডিয়ম আমাদের দিকে চাহিয়া যেরূপ নিগূঢ় হাস্য করিলেন, তাহাতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও প্ল্যান্‌চেটে বিশ্বাস করিব না; ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত জুয়াচুরি। কিন্তু থিওসফিস্ট মহাশয়ের হলে বসিয়া প্রতিজ্ঞাটি উচ্চারণ করিলাম না। তাঁহার প্রকাণ্ড হলটি হাতছাড়া হইলে, হয়তো সংঘ উঠিয়াই যাইবে।





গ্রন্থ-পরিচয়

চলন্তিকা, আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান—শ্রীরাজশেখর বসু

[বর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স লিমিটেড, মূল্য ২৲০]

বাংলা ভাষার কুলজি-কোষ্ঠী অর্থাৎ জাতি যে নিশ্চিত এবং সম্যকভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, একথা এখনও বলা চলে না। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অর্থাৎ দেশজ শব্দের প্রাধান্য-দ্বন্দ্ব এখনও শেষ হয় নাই। সংস্কৃতের আত্মজারূপে বঙ্গভাষার যে মূর্ত্তি গত শতাব্দীর অভিধান-পৃষ্ঠায় দেখিতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র, সুনীতিকুমার, শহীদুল্লাহ্, সুকুমার প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ব-প্রধানদের আলোচনা ও গবেষণার ফলে সে মূর্ত্তিতে খুঁত ধরা পড়িয়াছে—খাঁটি বাংলার একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মাটির মূর্ত্তি আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতেছে। ভাষার এই সহজ দেশজ রূপের দিকেই আমাদের প্রবণতা, কিন্তু দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক প্রয়োগের অভ্যাসে সহজের ব্যবহারই আমাদের অনায়ত্ত রহিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ক্ষেত্রে এই খাঁটির আন্দোলন সুরু হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি অসম্পূর্ণ নোট-বহিতে যাহার পত্তন করিয়া যান, আচার্য্য যোগেশচন্দ্র তাঁহার 'বাঙ্গালা শব্দ-কোষে' তাহাকেই সম্পূর্ণতা দান করিয়া সাধারণের গোচরে আনেন। এই অভিধান-আন্দোলন ছাড়াও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল, বঙ্কিম, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতপ্রধান ভাষাকে স্ব স্ব প্রতিভা-গুণেই কতকটা দোআঁশলা করিয়া ছাড়িয়া দেন, কিন্তু পাঠশালা এবং স্কুলের চারুপাঠ-শকুন্তলা-কাদম্বরীর শিক্ষা অপরিণত বয়সে মগজে এমনই প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে যে, শেষ পর্য্যন্ত কলম ধরিতে গিয়া সাধারণ লেখকদের পক্ষে তাহার মোহ এড়ানো কঠিন হয়। 'সবুজপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ এবং বীরবল এই মোহমুক্তির যে প্রয়াস করেন, তাহা কতকটা কার্য্যকরী হওয়াতেই শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর এই 'চলন্তিকা' অভিধান বাংলা ভাষার লেখকদের অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বসু মহাশয় আমাদের মনোভাব-পরিবর্ত্তনের এই সুযোগকে গ্রহণ করিয়া প্রশংসনীয় বিচারশক্তির প্রয়োগে চলতি ভাষার এই যে শব্দকোষটি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে অনেকখানি গুরুভার (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান) হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই কারণেই বাংলা দেশের আধুনিক লেখক ও পাঠক সম্প্রদায়ের তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

'চলন্তিকা' যে চলিয়াছে, তাহার প্রমাণ অল্পকালের মধ্যে ইহার তিনটি সংস্করণ প্রয়োজন হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণে প্রথম দুই সংস্করণের অনেক অভাব ও ত্রুটি পূরিত ও সংশোধিত হইয়াছে, শব্দসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। অর্থাৎ 'চলন্তিকা' গতানুগতিকভাবে চলে নাই, উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই চলিতেছে। বাঙালী গ্রন্থকারের পক্ষে ইহাও কম প্রশংসার বিষয় নহে। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, "এতদিন পরে বাঙলা ভাষার অভিধান পাওয়া গেল"—ইহা অত্যুক্তি নয়।

'চলন্তিকা' আকার-ইকার-ক্রমে কতকগুলি প্রচলিত শব্দের সমষ্টি মাত্র নয়, দৃষ্টান্তসহ ইহাতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগের সমীচীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে; 'চলন্তিকা' লেখকদের অভাব-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঙ্কলিত। দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী এইরূপ একখানি অভিধান-প্রকাশও যে এদেশে সম্ভব হইয়াছে, ইহাতেই বিস্ময়বোধ

করিতেছি। মুদ্রাকর-প্রমাদশূন্য এরূপ একখানি সুমুদ্রিত অভিধান গ্রন্থকারের দেশপ্রীতির পরিচায়ক।

মৌচাকে ঢিল—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৫৮+৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০]

গ্রন্থকার ইহাকে 'রাজনৈতিক তর্কনাট্য' বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হয়, তিনি দুঃসাহসী। তর্ক এবং রাজনীতিকে একসঙ্গে নাটকের বিষয়ীভূত করা সহজ নয়; বানার্ড শ'য়ের মত না পরোয়া প্রতিভারাই সচরাচর এজাতীয় দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশী নাটকের বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচনে এবং রচনা-পদ্ধতিতে শ'-পন্থী, এদিকে তাঁহার প্রতিভাও উত্তরোত্তর বিকাশ পাইতেছে। ভূমিকায় তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার সাহিত্যবুদ্ধিও সদাজাগ্রত। কিন্তু তাঁহার অহমিকা স্থানে স্থানে দৃষ্টিকটু হইয়া পড়াতে তাঁহার আসল উদ্দেশ্য বহু স্থলে ব্যর্থ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

'মৌচাকে ঢিল' নাটকটি একটি অদ্ভুত সম্পূর্ণ-নূতন টেক্‌নিকে লিখিত; ইহাতে পুরাতন ও আধুনিক, গম্ভীর ও হাস্যরসাত্মক, ঐতিহাসিক ও সামাজিকের এমন বিচিত্র সমন্বয় সাধিত হইয়াছে যে, অনভ্যস্ত পাঠকের বিভ্রম জন্মিতে পারে। পাঠক বলিলাম এইজন্য যে, এই-জাতীয় নাটক সহসা এদেশে অভিনীত হইবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও যে কোনও পাঠক নাট্যকারের মুন্সীয়ানা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গতানুগতিকতার মোহ যাঁহাদের কাটিয়াছে, 'মৌচাকে ঢিল' পাঠে তাঁহারা সত্যকার আনন্দ পাইবেন।

পরিচয়—৺দীনবন্ধু রায় চৌধুরী ও শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

[প্রকাশক: শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দে, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ১।০]

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আত্ম-পরিচয়দান-প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয় বঙ্গজ কায়স্থ সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন—সে হিসাবে ইহা কুলপঞ্জিকা-জাতীয় গ্রন্থ। ইহাতে ফরিদপুরের অন্তর্গত উলপুর, শাহাপুর প্রভৃতির প্রাকৃতিক বিবরণীও প্রদত্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থটিকে বঙ্গজ বসু-বংশের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী—শ্যামানন্দ

[প্রকাশক স্বামী শ্যামানন্দ, রেঙ্গুন, বর্ম্মা; ৬২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৸০]

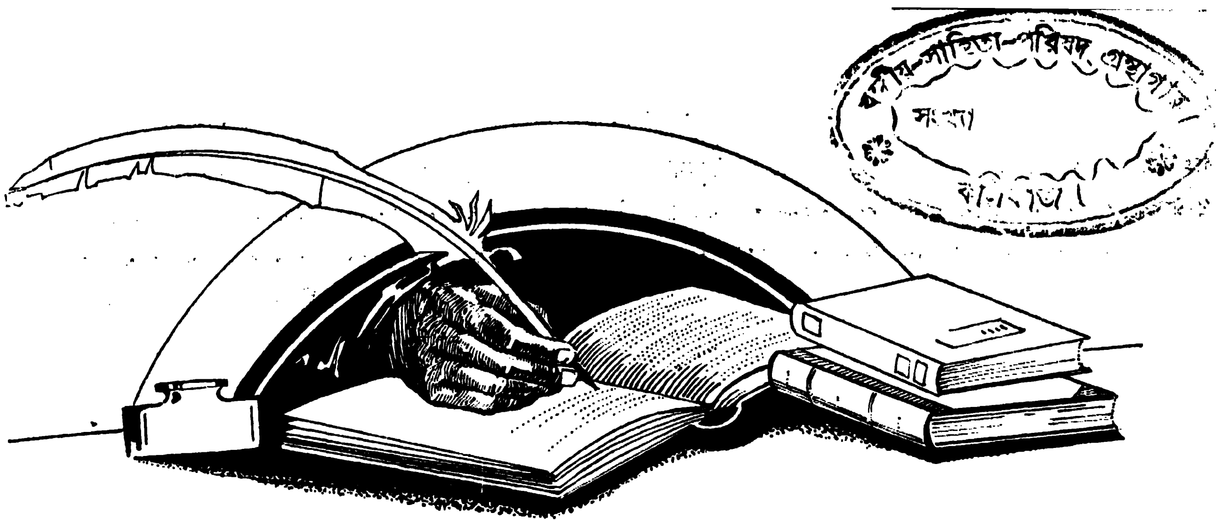
বাংলা সাহিত্যে জীবনী-কাব্য খুব বেশি নাই, চৈতন্যদেবের জীবনী লইয়া যে কয়খানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইয়াছিল, জীবনীকাব্যের দিক দিয়া মাত্র সেগুলিই সাহিত্যের সম্পদ হইয়া আছে। পরবর্ত্তীকালে মহৎ জীবনকে কাব্যমহিমা দিবার কয়েকটি ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী'ও কাব্যের দিক দিয়া সার্থক হয় নাই, কিন্তু ইহা পদ্যে রচিত একটি উৎকৃষ্ট জীবনী হইয়াছে। ভক্তজনের পক্ষে এই জীবনী যথাযথ আয়ত্ত করিবার বাধা অর্থাৎ গদ্যের বাধা দূর করিয়া গ্রন্থকার তাঁহাদের বিশেষ উপকারসাধন করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ে এবং সাধারণের মধ্যে এই পুস্তক পঠন ও পাঠন হইলে এই মহৎ জীবনী মুখে মুখে প্রচার হইবে, লোকে রামায়ণ মহাভারতের মত সুর করিয়া এই গ্রন্থ পড়িতে ও মুখস্থ করিতে পারিবে। স.

সাহসীর জয়যাত্রা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[প্রকাশক—এস. কে. মিত্র অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা; মূল্য ১৲]

বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে যাঁরা গতানুগতিকের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সংগ্রাম ক'রে দেশে দেশে নূতনতর ইতিহাস সৃজন করেছেন, এমন আটজন মহামানুষের জীবনের বীরত্বের মূল কথাগুলি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ছেলেদের জন্যে বইখানিতে লেখা হয়েছে। গ্রন্থকার দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক বর্ত্তমান ইতিহাসের চর্চ্চায় বাঙালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত। দেশের মধ্যে রাজনীতির চর্চ্চা আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত পৃথিবীর বিরাট অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্তের সঙ্গে যোগ না থাকলে আমরা নিজেদের অবস্থা তাদের তুলনায় বুঝতে পারি না। এই শিক্ষা মজ্জাগত করতে হ'লে শিশুকাল থেকেই তার গোড়াপত্তন হওয়া দরকার। অথচ নিতান্ত জটিল রাজনীতির গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করতে শিশু কেন, অনেক বয়স্ক লোকেও সক্ষম হয় না। সেই জটিলতার জাল ছাড়িয়ে জগতের নবজাগরণের ছবিটি সহজ ও সুস্পষ্ট ক'রে তিনি যে এই বইখানি রচনা করতে পেরেছেন, আমার মনে হয়, এইটেই গ্রন্থকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। বইখানি শুধু শিশুকে নয়, শিশুর পিতাকেও আনন্দ ও শিক্ষা দিতে পারবে। বইখানি প্রত্যেক অভিভাবক আগ্রহের সঙ্গে পড়বেন এবং ছেলেকে পড়তে দেবেন, এতে সন্দেহ নাই।

শ্রীজীবনময় রায়



সম্পাদকীয়

শিক্ষা ও স্বাধীনতা

পৃথিবীতে যে সকল স্বাধীন রাজ্য শক্তি ও ঐশ্বর্য্যে প্রতিদিন আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিতেছেন, সন্ধান লইলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের এই শক্তি ও সম্পদের মূলে তাঁহাদের জাতীয় শিক্ষা। গত কয়েক শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া প্রাধান্য লাভ করিতেছে, বর্ত্তমানকে এই পশ্চিমী সভ্যতার যুগও বলা চলে। এই সভ্যতার মূল কথা—জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। যে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা যত অধিক, সে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিমাণও ঠিক ততখানি। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও অধঃপতনের পরিমাপ করিবার পক্ষেও ইহাই মাপকাঠি, এখানে ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা মাত্র ৭ জন লিখিতে পড়িতে জানে, একথা বলিলেই অনেকখানি বলা হয়। আমাদের বাংলা দেশের অবস্থা এই অনুপাতে খুব অধিক আশাপ্রদ নয়। শতকরা ৮ জন বাঙালী কোনও রকমে লিখিতে পড়িতে পারে। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে নিরক্ষরতা একটা সমস্যা বটে, শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা সমস্যা নয়। এই বিরাট নিরক্ষর অন্ধবিশ্বাসী অজ্ঞ জনসমাজকে যথাযথ শিক্ষা দিয়া মনুষ্য-নামের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। অথচ আমাদের এই বিরাট বপুটি অনড় থাকিলে উচ্চ-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার সকল মহিমা লইয়াও আমরা বিনষ্ট হইব। আমাদের বৈদেশিক শাসনকর্ত্তারা নিজেদের প্রয়োজনেই এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন; কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতি চর্চ্চার মত বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা সলজ্জভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, বেতার-স্টেশনে পল্লীমঙ্গলের আসর বসাইয়া দুই-দশটা জাল ভাটিয়ালি গান ছাড়িয়া, দেশভক্তির নামে রাজভক্তির বীজ ছড়াইলেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় না, সরকারী সাহায্যে পরিচালিত দশ-বিশটা টোল-পাঠশালা মক্তব-মাদ্রাসাও এই বিরাট অজ্ঞতা-রোগের সামান্য মাত্র প্রতিষেধকও নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের ছাত্রসঙ্ঘকে এই মহান ব্রত গ্রহণে উৎসাহিত করিয়া যথার্থ দেশপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে দীর্ঘকাল মনে রাখিতে হইবে—

> প্রাথমিক শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাংলা দেশে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করা এক বিরাট কার্য্য। বঙ্গের নিঃস্বার্থ ত্যাগী কর্ম্মীরা, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্রেরা যদি স্বেচ্ছায় এই শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ না করে, তবে এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

সবিশেষ আশার কথা, এই বৎসরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মহলে, এই কঠিন জাতীয় শিক্ষার গুরুভার তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া বহন করিবেন, এইরূপ লক্ষণ দেখা

যাইতেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০০ ছাত্র আগামী গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামে গ্রামে হানা দিয়া নিরক্ষরতা-সমস্যার ক্রমিক সমাধান করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট তাঁহাদিগকে প্রাথমিক ট্রেনিং দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

ডঃ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

এই কার্য্য সহজ নহে এবং ইহাতে বাধাবিঘ্নও যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণ এই প্রচেষ্টা অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু তাহাদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা এই ব্রত গ্রহণ করিবেন,—নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁহাদের উহা পালন করিতে হইবে। ক্ষণিক উত্তেজনা ও ভাববিলাসে চালিত হইয়া যাঁহারা এই কার্য্য আরম্ভ করিবেন, তাঁহারা শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন না।

এইভাবে সহস্র সহস্র যুবকের চেষ্টায় আমাদের শিক্ষা-সমস্যার যদি ধীরে ধীরে সমাধান হয়, জটিল সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাধীনতা সমস্যাও আমাদের নিকট আর সমস্যা থাকিবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলাম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের সংস্কৃতি ও ইসলামের বাণী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিবার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক সিণ্ডিকেটের নিকট একটি প্রস্তাব দাখিল করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, অথচ ইসলামের বাণী অথবা সংস্কৃতি শিক্ষাদানের কোনই ব্যবস্থা নাই—এই প্রস্তাব আনয়নের পক্ষে তাঁহার মতে এই কারণ যথেষ্ট।

এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পুস্তকাবলী প্রণীত হইবে, পুরস্কার-প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত হইবে এবং ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এ. ও এম. এ.তে ইসলামের সংস্কৃতি-শিক্ষা অন্যতম পাঠ্যবিষয়রূপে প্রবর্ত্তিত হইবে।

ভাইস-চ্যান্সেলরের মন্তব্যে আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ আছে—বিজ্ঞান-শ্রেণীতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাল্পতা, আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ ও ইণ্টারমিডিয়েটে অতিরিক্ত ভাষারূপে উর্দ্দু প্রচলন। এই সকল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে উপদেশ দিবার জন্য একটি অ্যাড্‌ভাইসরি বোর্ড গঠনের প্রস্তাবও এই মন্তব্যের অন্তর্গত। ১৫ জন সদস্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে এবং সদস্যদের প্রত্যেকে মুসলমান হইবেন, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের খাতিরে অন্য সকলের মতামতের জন্য দুইজন অতিরিক্ত অমুসলমান সদস্য মনোনীত হইবেন।

স্বসম্প্রদায়ের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই-জাতীয় প্রস্তাব যে সাধু প্রস্তাব, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের মনে হয়, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের মন্তব্যের গোড়াতেই কিছু ভুল আছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষার এবং তুলনামূলক-ভাবে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও কোনও ধর্ম্মের বাণী শিক্ষা দিবার কোনও বন্দোবস্ত নাই; তুলনামূলক আলোচনায় অন্য ধর্ম্মের সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মেরও স্থান আছে। ধর্ম্মকেন্দ্রিক-ভাবে হিন্দু বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই। মনে হইতেছে, ধর্ম্মপ্রাণ ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের প্ররোচনায় অতঃপর হইবে।

আমরা জানি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইতিহাসের দিক দিয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিও একটি স্বতন্ত্র বিষয়। এই নজিরে আরবীর সঙ্গে ইসলামের সংস্কৃতিও ন্যায্য স্থান দাবি করিতে পারে। কিন্তু 'ইসলাম' ও 'ইসলামের কাল্‌চার' এক বস্তু নয়। তা ছাড়া, মাত্র পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় চাহিতেছেন, প্রবেশিকা হইতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাস পর্য্যন্ত ইসলামের বাণী শিক্ষা দেওয়া হউক। অন্য ধর্ম্মের নজির দেখাইয়া সুতরাং এই দাবি কিছুতেই করা চলে না। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল এবং কলেজ সম্প্রদায়গত চেষ্টায়

নিশ্চয়ই স্থাপিত হইতে পারে এবং সেখানে ইসলামের বাণী অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ও হইতে পারে ; কিন্তু ইউনিভার্সিটির উপর এতখানি আকস্মিক ভার চাপানো কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

এই ধরণের চিন্তাও যে একজন ভাইস-চ্যান্সেলরের মাথায় উদিত হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সেটা অত্যন্ত দুর্লক্ষণ বলিতে হইবে।

আমাদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে, ভারতবর্ষে ইসলামীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতি এক বস্তু নয়। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের গৌরব যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা সকল ধর্ম্মমূলক সংস্কৃতিকেই সর্ব্ববরেণ্য ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করিবার সাধনাই করিবেন, ভারতের বাহিরে অভারতীয় মৃত্তিকায় যে সংস্কৃতি জন্মলাভ করিয়া বিলুপ্তি বা পুষ্টি লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষের ঘাড়ে সেই সংস্কৃতির জোয়াল চাপাইয়া 'কৃষ্টি'র চেষ্টা কখনই সুফলপ্রসূ হইবে না।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম

ভারতবর্ষে যুক্তিবিচারহীন "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"-মনোবৃত্তি ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কি ভয়াবহ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা প্রতিদিনই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূলে এই একটি মাত্রই কারণ। অনেকে ডিসিপ্লিন-আশ্রয়ী সৈন্যদের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিবেন, পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি বড় হইয়াছে, তাহারা নেতৃত্বের শাসন কড়াকড়িভাবে মানিয়াই বড় হইয়াছে ; হিট্‌লার-মুসোলিনিকে দ্বিধাহীনভাবে মানিয়াছে বলিয়াই জার্ম্মানি ও ইটালি এত শক্তিশালী। যাহারা আজীবন সমরক্ষেত্রের নিয়মানুবর্ত্তিতা অনুসরণ করিয়া চলিতে অভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষে যাহা সত্য, গোবর-গাদায় নিশ্চিন্ত আলস্যে গড়াগড়ি দেওয়া যাহাদের স্বভাব, তাহাদের পক্ষে তাহা সত্য নয়। সমবেতভাবে পা ফেলিবার সুবিধা এবং অসুবিধা দুইই আছে। জানিয়া শুনিয়া রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া বৃহত্তর মানবসমাজ অথবা আপন আপন দেশ বা জাতির কল্যাণের জন্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ইঙ্গিতে চালিত যাহাদের সমবেত পদক্ষেপকে গড্ডলিকাপ্রবাহ বলিয়া সন্দেহ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, আমাদের দেবতা, গুরু অথবা পঞ্জিকাপ্রীতি ঠিক সে জাতীয় কর্ত্তাভজন নয়। অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ এবং অজ্ঞাত দেবতার উপর ফলাফলের বরাদ্দ দিয়া আমরা সমবেতভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি ; আমাদের সমবায়—নিষ্ক্রিয়তার, সক্রিয়তার নয় ; কর্ত্তার ইচ্ছায় আমাদের কর্ম্ম নয়, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মহীনতা। ত্রিপুরী কংগ্রেসে বাংলার এবং ওম্-মণ্ডলী সংক্রান্ত ব্যাপারে সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুসমাজের এই বুদ্ধিবিচারহীন লজ্জাকর নিশ্চলতার ভয়াবহ কুফল দৃষ্টে যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মহাকালের দরবারে আমাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হইয়া গিয়াছে এবং এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল নাই।

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্মেলন

গত ২৫এ মার্চ শনিবার হইতে কলিকাতা আশুতোষ মেমোরিয়েল হলে বঙ্গীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়াছে, তাহা নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী একই সভায় উভয়বিধ পণ্ডিত-জনের মিলনবাসরে এভাবে ইতিপূর্ব্বে জয়যুক্ত হয় নাই। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-মতাবলম্বীরা এই সভায় আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে ইঙ্গিতে নিন্দা করিয়া উদারতা এবং সহৃদয়তার পরিচয় দেন নাই। প্রাচ্য বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"মোহমুক্ত ভারতীয়গণের মধ্যে অনেকে এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আশুফলদায়ক ঔষধাদি দ্বারা কোন একটি রোগ আসুরিক উপায়ে দমন করিবার ফলে তাঁহাদের শরীর অসংখ্য রোগের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে। সকল সাঙ্গোপাঙ্গ রোগ নির্ম্মূল করিয়া দেহ নিরাময় ও সুস্থ করিবার একমাত্র প্রশস্ত উপায় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।"

আধুনিক ভারতবর্ষের গৃহকর্ত্তাদের মাসিক ব্যয়ের হিসাব কিন্তু অন্য কথা বলে।

হিন্দু ও হিন্দুস্থান

শ্রীযুক্ত সাভারকর প্রভৃতি চিন্তাশীল নায়কদের নেতৃত্বে সম্প্রতি ভারতবর্ষে অর্থাৎ হিন্দুস্থানে হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণের

উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল সভা-সমিতি ও আন্দোলন হইতেছে, আমাদের বিশ্বাস তাহা ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া যাইবে। পরাধীনতার অপমান জগদ্দল পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে, আমাদের যত কিছু অভাব-অভিযোগ তাহার মূলে প্রধানত এই ব্যাধি এবং এই ব্যাধির জন্যই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহের উপসর্গ ক্রমশই মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে। কাশীর দাঙ্গা শেষ হইতে না হইতেই এলাহাবাদের দাঙ্গা সুরু হইয়াছে। মূল ব্যাধির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই রামমোহন রায় প্রমুখ দূরদর্শী বাঙালীরা সুরু করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতকের নবম দশকে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যে সংগ্রামের প্রণালীবদ্ধ পরিণতি—উদ্দেশ্য সফল হইতে না হইতেই সেই সংগ্রাম আত্মকলহে পরিণত হইলেও তৃতীয় পক্ষের প্রাধান্যকালে এই পরিণতি অস্বাভাবিক নহে। অপরের দ্বারা যাহারা উত্তেজিত এবং এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ যাহাদের স্বার্থদুষ্ট নেতারা প্রতিদিনই পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছেন, দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে সাময়িক-ভাবে যদি তাহাদিগের সহিত অসহযোগও করিতে হয়, পরাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন সম্প্রদায়কে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাহাই করিতে হইবে। বিহার প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতিরূপে মুঙ্গেরে শ্রীযুক্ত সাভারকার এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন—"কেহ যদি বলেন যে, ভারতের জাতীয়তা অর্থে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট হিন্দুগণের বার বার লাঞ্ছনা স্বীকার, হিন্দুদের উত্তরোত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া, তাহা হইলে এইরূপ জাতীয়তা শুধু হিন্দু-বিরোধীই নহে, প্রকৃত জাতীয়তা-বিরোধীও বটে।...হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভারতবর্ষ চিরকাল হিন্দুস্থানই থাকিবে—পাকীস্থান বা ইংরাজস্থান হইতে আমরা কিছুতেই দিব না।"

বহুধাবিভক্ত হিন্দুসমাজকে একতাবদ্ধ করিয়া হিন্দুস্থানের হৃতগৌরব পুনঃসংস্থাপন সম্পর্কে অ্যাল্‌বার্ট হলে ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর বক্তৃতা উপরের মহদুদ্দেশ্য-সাধনেরই সহায় হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। গত ১৮ই মার্চ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের সভাপতিত্বে বিখ্যাত ফরাসী সাংবাদিক জিন হার্‌বার্ট, যে ভারতীয় সংস্কৃতির সহায়তায় পৃথিবীর বর্ত্তমান শক্তিসংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটিবে বলিয়াছেন, তাহা এই হিন্দু-সংস্কৃতিই।

নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা

বাংলা দেশে সমগ্র বাঙালীজাতির ভাগ্য যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহাদের নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা বারম্বার প্রকট হইয়া উঠিয়া অন্য সম্প্রদায়কেও আত্মস্থ হইতে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে। মাননীয় হক সাহেবের গোপন পত্র, নূতন মিউনিসিপাল বিল ইত্যাদিকে দুর্লক্ষণ মনে না করিয়া সাবধান হইবার ইঙ্গিতও জ্ঞান করিতে পারি। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষুচিকিৎসা-বিভাগের ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ডিঙাইয়া ডাক্তার টি. আমেদের নিয়োগ-ব্যাপার যে কতখানি চক্ষুলজ্জাহীনতার পরিচায়ক, ঠিক বর্ত্তমান অবস্থায় বাংলা দেশের মুসলমান শাসক-সম্প্রদায় তাহা বুঝিবেন না।

কুমিল্লা সাহিত্য সম্মেলনে "বন্দে মাতরম্"

১৬ই চৈত্র তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কুমিল্লা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে "বন্দে মাতরম্" গান গাহিতে না দেওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল ধরের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে সম্মেলনে বাঙালী হিন্দু সাহিত্যিকদের যোগ দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। সাহিত্য পলিটিক্‌স নয়—একথা সত্য; কিন্তু যে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত অংশত জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হইবার উপযুক্ত বলিয়া নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, কুমিল্লাতে তাহা অংশত গীত হইবার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিই টিকিতে পারে না। "বন্দে মাতরম্" বন্ধ করিতে হইলে নিতান্ত গায়ের জোরেই করিতে হইবে। আশা করি, সম্মেলন-কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিয়াই কাজ করিবেন, হুমকির ভয়ে কোনও সিদ্ধান্ত করিবেন না।

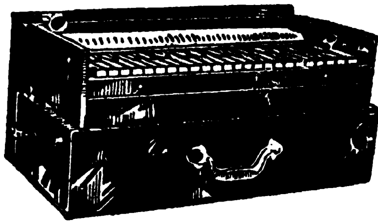
'অলকা' আপিসের স্থান পরিবর্ত্তন

৭৭নং ধর্ম্মতলা স্ট্রীট হইতে 'অলকা' আপিস "হিমালয় হাউস" ১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ উঠিয়া আসিয়াছে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৬।১ এল্‌গিন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

আপনি নানাপ্রকার ভাল হারমোনিয়ম দেখিয়াছেন সত্য, কিন্তু একবার যদি বিখ্যাত

বীণা অর্গান হারমোনিয়ম



বাজাইয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন—
ভাল হারমোনিয়ম সত্যই কত ভাল হয়!

'বীণা অর্গান'

হারমোনিয়ম

আপনার পছন্দমত মডেল আমাদের দোকানে দেখুন, কিম্বা সচিত্র তালিকার জন্য পত্র লিখুন। মূল্য ২২॥০ হইতে আরম্ভ। **বীণা অর্গান হারমোনিয়ম** উপহার দানে আনন্দ গ্রহণে তৃপ্তি।

সি. সি. সাহা লিঃ	এম. এল. সাহা লিঃ
১৭০ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট	৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

পরিবেশনে নবতম চিত্র-আকর্ষণ

ফিল্ম কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার
বাঙলা ছবি
"রিক্তা"
পরিচালক: সুশীল মজুমদার

রাধা ফিল্মসের
নূতন পৌরাণিক
চিত্রকাহিনী

নর-নারায়ণ

পরিচালক: জ্যোতিষ বন্দ্যো।

• •

দ্রৌপদী

পরিচালক:
অহীন্দ্র চৌধুরী

অমৃতাঞ্জন

আপনাদের বন্ধু,
রোগের চিকিৎসক, রোগীর সেবিকা।



মাথাধরা, বাত, সর্দ্দি, কাশি, দন্তশূল, কাটা, পোড়া ঘা, পোকায় কামড়ান প্রভৃতিতে অমরুতাঞ্জন্ অমোঘ ঔষধ। বিশুদ্ধ ভারতীয় উপাদানে প্রস্তুত। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

অমরুতাঞ্জন্ লিমিটেড

১৩২।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
টেলিফোন—বি, বি, ২০৫৩
টেলিগ্রাম—অমরুতাঞ্জন



সকল প্রকার

আধুনিক পোষাকের জন্য

সুদক্ষ কাটার-পরিচালিত **টিনমণি এণ্ড কোম্পানীতে** পদার্পণ করুন।

টিনমণি এণ্ড কোং

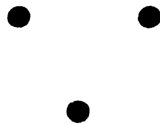
২১৯ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

সাক্সেরিয়া হাউস

(চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগ স্থল)

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা



দেশের মাটি

ইত্যাদি নিউ থিয়েটার্সের
শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি আমাদের
নিকট পাইবেন।



বিশেষ বিবরণের জন্য অদ্যই
পত্র লিখুন বা নিজে আসুন



অরো-ফিল্মস্

কলিকাতা :: মান্দ্রাজ

'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষান্মাষিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষান্মাষিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক-খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

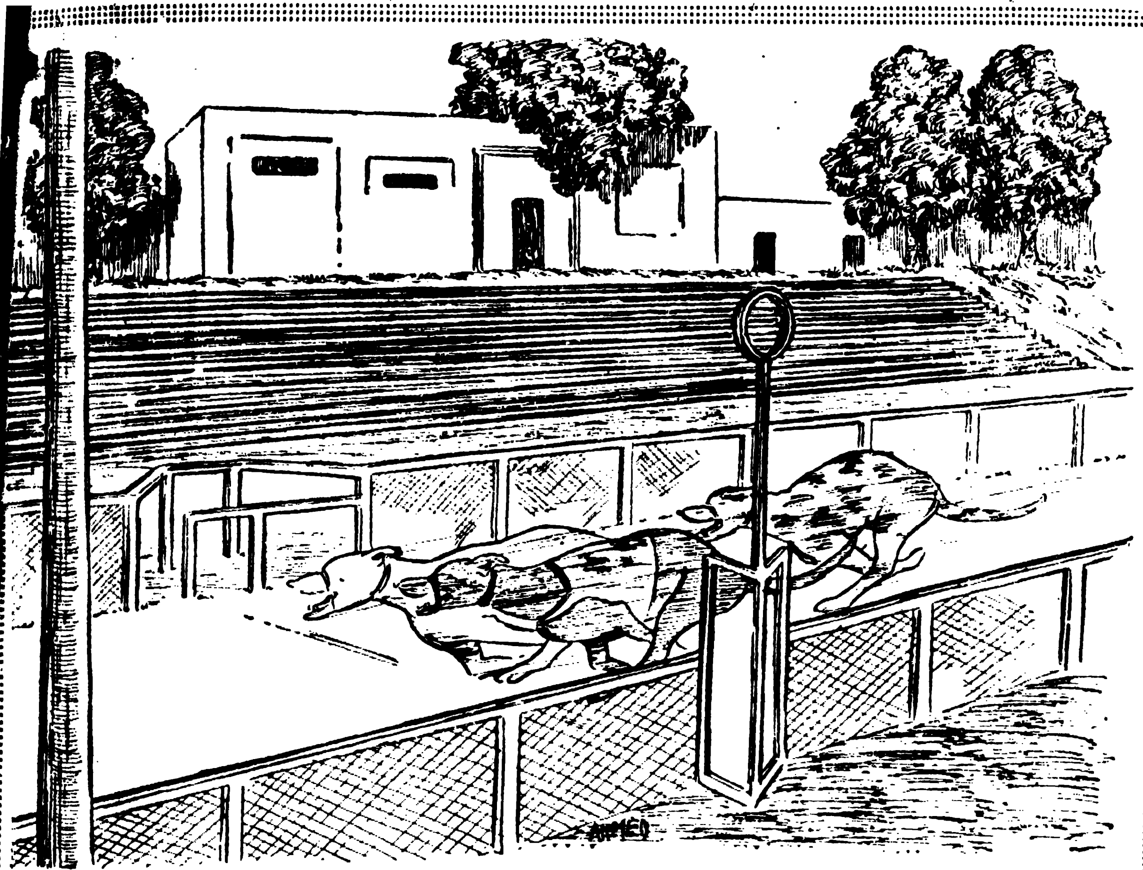
সাধারণ	১	পৃষ্ঠা	প্রতি মাসে	২০৲
"	½	"	"	১১৲
"	¼	"	"	৬৲
কভার	৪র্থ	"	"	৬০৲
"	২য়	"	"	৫০৲
"	৩য়	"	"	৪৫৲

(বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

হিমালয় হাউস
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার



গ্রেহাউণ্ড রেসিং

দি ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত

আজকালকার সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য আমোদ।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিতে ভুলিবেন না—তাঁহারা আরও অধিক আনন্দ পাইবেন।

উত্তেজনাপূর্ণ উন্মাদনাকারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আনন্দ!

প্রবেশ মুল্য	এনক্লোজার	"এ"	১।০	স্পেশাল এনক্লোজার (বক্স)	৪৲
	"	"বি"	॥৶০	ঐ মহিলাদের জন্য	২৲

স্থান—বেহালা (ডায়মণ্ডহারবার রোড)

ট্রাম ও বাস পাওয়া যায়।

বাসন্তী কটন মিলস লিমিটেড

সকলেই বলেন— বাঙ্গালীর

সবচেয়ে সেরা— নিজস্ব

বাসন্তী-কাপড়

পূজায়

সব জায়গায় পাবেন

মিল
পানিহাটি

৩নং লায়ন্স রেঞ্জ
কলিকাতা

ফোন—কলি ৩২১৬

টেলিফোন—"বড়বাজার ৯০"

টেলিগ্রাম—"গিনিহোম"

বি, সরকার এণ্ড সন্স

"গিনি হাউস"

B.S.

লিমিটেড

১৩১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের ব্রাঞ্চ দোকান নাই কিম্বা আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।
জগদ্ব্যাপী অর্থ-সঙ্কট প্রযুক্ত আমাদের সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
যে কোন প্রকার পুরাতন সোনা বা রূপা বাজার দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া নূতন গহনা দেওয়া হয়।

'অলকা'র নূতন কার্য্যালয়

হিমালয় হাউস

১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ

কলিকাতা

ফোন—কলিকাতা ৬৩৫৫

সর্ব্বপ্রকার কাগজ
এবং ষ্টেশনারীর জন্য

আমাদের নিকট আস্থন।
নানাপ্রকার নূতন ধরণের
দেশী ও বিলাতী কাগজ
আমাদের ষ্টকে
পাইবেন



বসু ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৪।২, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অমৃতাঞ্জন
আপনাদের বন্ধু,
রোগের চিকিৎসক, রোগীর সেবিকা।



মাথাধরা, বাত, সর্দ্দি, কাশি, দন্তশূল, কাটা, পোড়া ঘা, পোকায় কামড়ান প্রভৃতিতে অমরুতাঞ্জন্ অমোঘ ঔষধ। বিশুদ্ধ ভারতীয় উপাদানে প্রস্তুত। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

অমরুতাঞ্জন্ লিমিটেড
১৩২।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
টেলিফোন—বি, বি, ২০৫৩
টেলিগ্রাম—অমরুতাঞ্জন



এজেণ্ট্স
ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা


লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
LILY BRAND BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
গঠনকরে
স্বাস্থ্যবান
হৃষ্টপুষ্ট
ছেলেপুলে
LILY BRAND BARLEY
FINEST FOOD DRINK
Manufactured By THE LILY BISCUIT Co. CALCUTTA.

সুরগীতি
গ্রামোফোনের
সুরের মায়া লক্ষ পরানে
জাগায় আনন্দ-শিহরণ!
সুরগীতি গ্রামোফোন প্রডাক্‌স্
২৭৯ বি, সেন্ট্রাল এভিনিউ
(বিডন ষ্ট্রীট মোড়) কলিকাতা

সূচী

বৈশাখ ১৩৪৬



GOVERNMENT PRODUCTS.

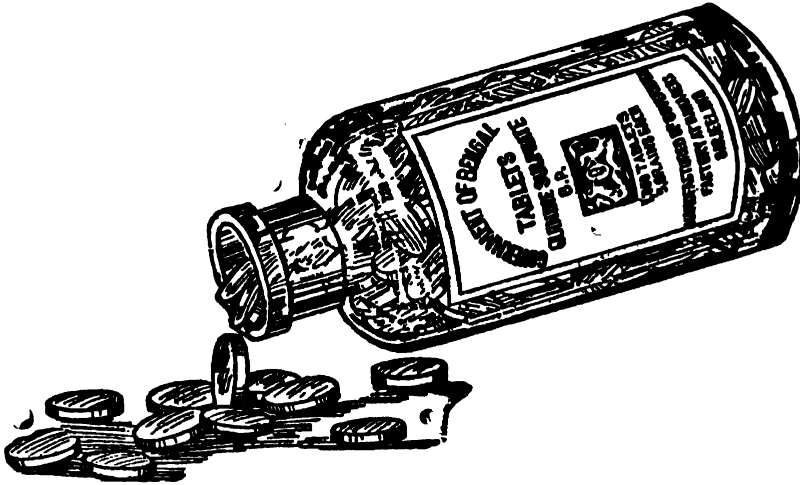
বাংলা গভর্ণমেণ্টের

কুইনাইন

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

সহর ও মফঃস্বলের সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।



জয়েণ্ট এজেণ্টস্—

শা, ওয়ালেস এণ্ড কোং

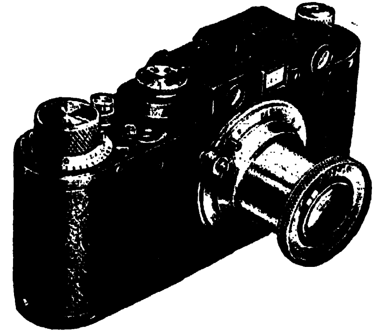
পোষ্ট বক্স নং ৭০, কলিকাতা

চৌধুরী এণ্ড কোং

৪ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্যামেরা ?

- লাইকা
- রোলিফ্লেক্স
- বল্‌ডিনা
- ব্রিলিয়াণ্ট



ইত্যাদি সকল প্রকার ক্যামেরা
এবং
সর্ব্বপ্রকার ফিল্ম, প্লেট, পেপার,
ফোটো কেমিক্যাল ইত্যাদি

ডেভেলপিং এবং প্রিন্টিং
আমাদের নিকট
পরীক্ষা করিয়া দেখুন—
খুসী হইবেন।

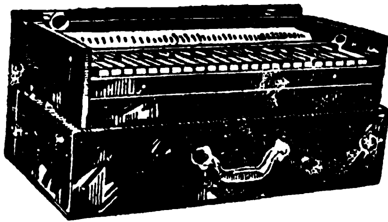
আমাদের দোকানে ন্যায্য মূল্যে সকল সময় পাইবেন।
একবার দোকানে আসুন কিম্বা তালিকার জন্য পত্র লিখুন॥

ফোটোগ্রাফিক্ ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি কোং লিঃ

১৫৪, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: :: কলিকাতা

আপনি নানাপ্রকার ভাল হারমোনিয়ম দেখিয়াছেন সত্য, কিন্তু একবার যদি বিখ্যাত

বীণা অর্গান হারমোনিয়ম



বাজাইয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিবেন—
ভাল হারমোনিয়ম সত্যই কত ভাল হয়!

'বীণা অর্গান'

হারমোনিয়ম

আপনার পছন্দমত মডেল আমাদের দোকানে দেখুন, কিম্বা সচিত্র তালিকার জন্য পত্র লিখুন। মূল্য ২২৷৹ হইতে আরম্ভ। **বীণা অর্গান হারমোনিয়ম** উপহার দানে আনন্দ গ্রহণে তৃপ্তি।

সি. সি. সাহা লিঃ
১৭০ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

এম. এল. সাহা লিঃ
৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

পরিবেশনে নবতম চিত্র-আকর্ষণ

ফিল্ম কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার
বাঙলা ছবি
"রিক্তা"
পরিচালক : সুশীল মজুমদার

রাধা ফিল্মসের
নূতন পৌরাণিক
চিত্রকাহিনী

নর-নারায়ণ

পরিচালক : জ্যোতিষ বন্দ্যো

• •

দ্রৌপদী

পরিচালক :
অহীন্দ্র চৌধুরী

'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; যান্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; যান্মাসিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; যান্মাসিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক-খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	১	পৃষ্ঠা	প্রতি মাসে	২০৲
"	½	"	"	১১৲
"	¼	"	"	৬৲
কভার	৪র্থ	"	"	৬০৲
"	২য়	"	"	৫০৲
"	৩য়	"	"	৪৫৲

(বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট আবশ্যক।

হিমালয় হাউস
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা
ফোন: কলিকাতা ৬৩৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

সকল প্রকার

আধুনিক পোষাকের জন্য

সুদক্ষ কাটার-পরিচালিত **টিনমণি এণ্ড কোম্পানীতে** পদার্পণ করুন।

টিনমণি এণ্ড কোং

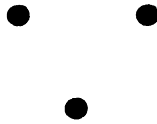
২১৯ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

সাক্‌সেরিয়া হাউস

(চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগ স্থল)

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা



দেশের মাটি

ইত্যাদি নিউ থিয়েটার্সের
শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি আমাদের
নিকট পাইবেন।



বিশেষ বিবরণের জন্য অদ্যই
পত্র লিখুন বা নিজে আসুন



অরো-ফিল্মস্

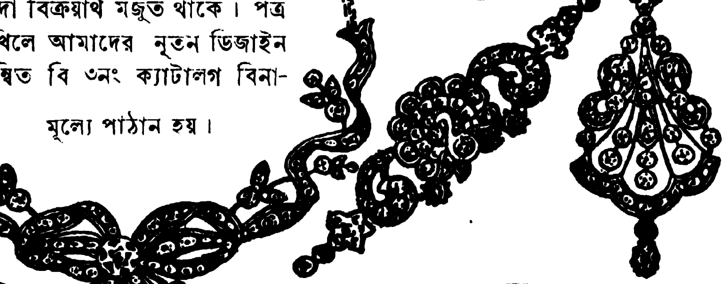
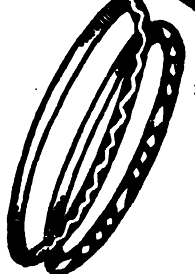
কলিকাতা ঃঃ মান্দ্রাজ

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অফ লেট্
বি, সরকার

ফোন
বড়বাজার
১৭৬১

একমাত্র গিনি সোনার অলঙ্কার ও
রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত
একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পত্র লিখিলে আমাদের নূতন ডিজাইন সমন্বিত বি ৩নং ক্যাটালগ বিনা-মূল্যে পাঠান হয়।

টেলিগ্রাম
ব্রিলিয়ান্টস্

১২৪-১২৪/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

MEGAPHONE RECORDS

এপ্রিল মাসের নূতন রেকর্ড

গণি মিঞা

J. N. G. 5359 — ডরায় না দুনিয়াতে মুসলমান — ইস্‌লামী
আমার চীন, আমার আরব — ঐ

ভবানীচরণ দাস

J. N. G. 5354 — আজু পরভাতে দেখিনু — কীর্ত্তন
নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি — ঐ

নুরউদ্দীন আমেদ

J. N. G. 5356 — দেখে যারে মোর রসুলে — ইস্‌লামী
মরুর পথে কে গো চলে যায় — ঐ

মিস্ কমলা (ঝরিয়া)

J. N. G. 5358 — বিরহ মিলনেরই ডালা — মুলতান
স্বপন ভেঙ্গোনা — ঠুংরী

শ্রীযুত সতীশ সরকার

J. N. G. 5355 — ত্রিনয়নী মা যে আমার — শ্যামাসঙ্গীত
শ্যামানামে এত মধু — ঐ

অনন্তবালা বৈষ্ণবী

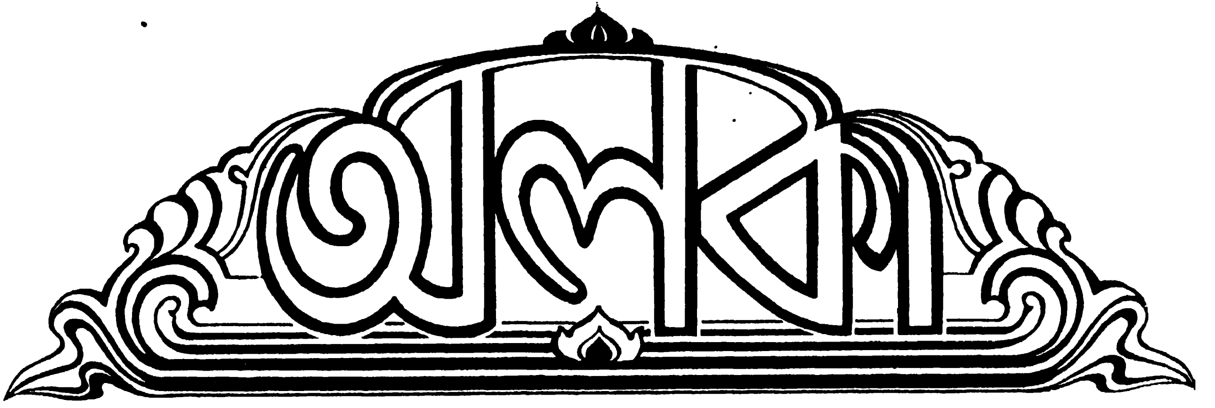
J. N. G. 5357 — ললিতে সখি কই — ভাটিয়ালী
মনের পিপাসায় — ঐ

মেগাফোন  কলিকাতা



গৌরীর তপস্যা

শ্রীখগেন রায়



প্রথম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৬ | অষ্টম সংখ্যা

ব্রহ্ম ও ধর্ম

ডক্টর শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু

ভারতের আর্ষ দর্শনের অন্তর্গত মীমাংসা শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত—পূর্ব এবং উত্তরমীমাংসা। জৈমিনিকৃত সূত্র পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহার প্রথম সূত্র—"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা"। গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করিবার পর ধর্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় ধর্মের বিচার আরম্ভ করা কর্তব্য। কিন্তু ধর্ম শব্দে কি বুঝায়? কোন বস্তুর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার লক্ষণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ধর্মের লক্ষণ কি?

মানুষ নিজ অভীষ্ট লাভের জন্য নানা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কর্ম বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়মিত না হইলে ফল অনিশ্চিত। মানবজীবনের চরম অভীষ্ট প্রদান করিতে সমর্থ যে কর্ম, সেই কর্মে যাহা প্রেরণা বা প্রবর্ত্তনা দান করে, তাহাই ধর্মের লক্ষণ। বেদবিহিত যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠানে মানবজীবনের পরম অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির এই অভিমত। ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র গ্রন্থগুলিতে যে সকল কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠানই সুতরাং ধর্ম।

বেদে যেমন যজ্ঞাদি কর্মের নির্দেশ আছে, তেমনই দেবতার স্তুতিতেও বেদ পরিপূর্ণ। দেবস্তুতি দেবতাসম্বন্ধীয় জ্ঞানসাপেক্ষ। দেবতাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মানবচিত্ত পরমদেবতার জ্ঞানে উপনীত হয়। "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—(ঋক্ ১.১৬৪.৪৬)—এক সত্যস্বরূপকে পণ্ডিতেরা বহুবিধ দেবতার নামে অভিহিত করেন। "একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্"—(৮.৫৯.২)—সেই এক নানা হইয়াছিলেন। উপনিষদেও এই ভাবের বাক্য আছে। "সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" ইত্যাদি—(কঠ ২.১৫) সর্ব বেদ যাঁহার মনন করে। এই পরমদেবতার জ্ঞানে—ব্রহ্মজ্ঞানে—মানবের পরমপুরুষার্থসিদ্ধি—মুক্তি, বেদশিরোভাগ উপনিষদের এই অভিমত।

বাদরায়ণকৃত উত্তরমীমাংসাসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের অর্থাৎ বেদান্তের মর্ম সমন্বিত হইয়াছে। তাহার প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। মোক্ষলাভের ইচ্ছা যাহার জাগ্রত

হইয়াছে, শমদমাদি সাধন করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার কর্তব্য। কারণ, কর্মদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন—"অমুত্র পুণ্যচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে"—ক্রিয়াকর্মদ্বারা পুণ্যার্জিত ফল—স্বর্গবাস—ক্ষয় পায়, নিত্য নহে। আর তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন—"ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্"। ব্রহ্মজ্ঞানী পরমপুরুষার্থ মুক্তি লাভ করেন।

বৈদিক সাধনায় স্তুতি এবং যজ্ঞ একত্র ছিল। কালক্রমে সেই সাধনা দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩।৩

অর্থাৎ নিষ্ঠা দুই প্রকার—জ্ঞানযোগ আর কর্মযোগ। কর্মবাদিগণ ক্রিয়াকর্মকে প্রাধান্য দিয়া জ্ঞানের প্রতি উপেক্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন। তাই দেখিতে পাই, জৈমিনি সূত্র নিবদ্ধ করিতেছেন—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাম্"—(১.২.১)। অর্থাৎ যেহেতু বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য ক্রিয়াকর্ম, সুতরাং তদতিরিক্ত যাহা কিছু বেদে আছে, সকলই অনর্থক। সিদ্ধ বস্তু-কথনরূপ বাক্য—যেমন দেবতার স্তুতি—কোন কর্মে প্রবৃত্তি দান করে না। A statement or proposition is not an injunction or direction for action. অতএব তাহা বৃথা।

পক্ষান্তরে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানে পরমপুরুষার্থসিদ্ধি স্বীকার করিয়া যজ্ঞের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা"—(মুণ্ডক ১.২.৭) অর্থাৎ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে যাগযজ্ঞরূপ ভেলা নিতান্ত দুর্বল। "ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং। নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ ॥"—ঐ, ১.২.১০। অর্থাৎ অতি মূঢ় ব্যক্তিরা মনে করে যে, যাগাদি এবং লোকহিতকর কর্মই শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই। ফলে জ্ঞানমার্গে মোক্ষলাভ এবং ধর্মাচরণে, কর্মানুষ্ঠানে অভীষ্টসিদ্ধি—এই দুই পরস্পরবিরোধী পন্থা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ব্রহ্ম এবং ধর্মে বিরোধ উপস্থিত হইল।

পরমপুরুষার্থসিদ্ধি, মুক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানসাপেক্ষ—ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। আর এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষণীয়। কিন্তু লোকে মুক্তিকামী দীপ্তশিরা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। দেখা যায়, প্রায় মানুষমাত্রই অভ্যুদয় বা ইহপরকালে সুখশান্তি লাভ করিতে প্রয়াসী। মানবের অভ্যুদয় এবং সমাজরক্ষার জন্য বিধিনিষেধের শাসন এবং ইষ্টাপূর্তের অনুষ্ঠান যে প্রয়োজনীয়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ফলে পরবর্তী কালে সম্প্রদায়বিশেষে জ্ঞান এবং কর্ম উভয়ের যুগপৎ সাধন স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়বাদ।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে কর্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন। কর্মের বিষয় বলিতে গেলে বৈদিক যজ্ঞের কথা সহজেই উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥

অর্থাৎ প্রজাপতি আদিতে যজ্ঞাধিকারী প্রজার সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধিলাভ কর, ইহাই তোমাদের অভীষ্ট ভোগসকল প্রদান করিবে। এখানে যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত

হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞসম্বন্ধীয় উক্তিগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, তিনি যজ্ঞ শব্দ অতি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। পরিশেষে বলিতেছেন—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥

অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, এবং সকল কর্মের পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে। এ কথা হইতে মনে করা যাইতে পারে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। গীতার শেষ অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

অর্থাৎ সকল ধর্মাচরণ বা কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। কর্মানুষ্ঠান না করা হেতু যে অকল্যাণ সঞ্চিত হয়, তাহা হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। এ কথায় কর্মের অবশ্যপালনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের 'জ্ঞানযজ্ঞ' শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ভগবদ্গীতার যে সকল ভাষ্য ও ব্যাখ্যা প্রচলিত দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক ভাবে লিখিত। জ্ঞান, কর্ম অথবা ভক্তির আলোকে এই সকল গ্রন্থ রচিত। কিন্তু সমগ্র গীতাখানি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ উক্ত তিন সাধনপন্থার সমন্বয়ের পক্ষপাতী। এই অভিমতের সমর্থনে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া শুধু এইটুকু বলা যায় যে, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" এই শ্লোকার্দ্ধ তিনি একাধিক বার উচ্চারণ করিয়াছেন। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির যুগপৎ সাধনাই তিনি নির্দেশ করিতেছেন। গীতাকে সমন্বয়ের শাস্ত্র বলা যায়।

শঙ্করাচার্য কিন্তু জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয় স্বীকার করেন না। ছান্দোগ্যভাষ্যে তিনি লিখিতেছেন—

"কর্মকাণ্ডের সহিত এই উপনিষদের সম্বন্ধ এইরূপ—প্রাণ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবিজ্ঞানের সহিত সমস্ত কর্ম অধিগত হইলে, তাহা অর্চিরাদি মার্গক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়; কিন্তু দেবতা-বিজ্ঞানরহিত কেবল কর্মমাত্র অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা ধূমাদি মার্গক্রমে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির কারণ হয়; আর যাহারা উক্ত উভয়মার্গভ্রষ্ট স্বাভাবিক (অর্থাৎ আহার পানাদি) কর্মে প্রবৃত্ত, তাহাদের সম্বন্ধে কষ্টকর অধোগতি উক্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় মার্গের একটি পথেও আত্যন্তিক পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধ হয় না; এই কারণে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ সংসার-গতির কারণোচ্ছেদার্থ কর্মনিরপেক্ষ অদ্বৈত আত্মজ্ঞানের উপদেশ করা আবশ্যক; এতদুদ্দেশে উপনিষৎ শাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। অদ্বৈত আত্মজ্ঞান ভিন্ন আত্যন্তিক নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) প্রাপ্তি হয় না। * * * এই কারণে অদ্বৈত আত্মজ্ঞান কখনই কর্ম-সহভাবী (কর্মের সহিত একত্র অনুষ্ঠেয়) নহে; কারণ, ক্রিয়া, কারক ও তৎফল—এই ত্রিবিধ ভেদের বিলোপপূর্বক সমুৎপন্ন 'সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিশ্চয় এক ও অদ্বিতীয়', 'এই সমস্ত জগৎ আত্মস্বরূপ' এবংবিধ বহুতর বাক্যজনিত জ্ঞানের বাধক জ্ঞান উপপন্ন বা যুক্তিসিদ্ধ হয় না।"

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহে শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"জ্ঞানোৎকর্ষ-পরায়ণ পুরুষের কর্ম উপযোগী নহে; কর্ম এবং জ্ঞাননিষ্ঠা কখনই একত্র অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম ও জ্ঞান ভিন্নস্বভাব,

সুতরাং তাহাদের পরস্পর বিরোধ থাকায়, সহাবস্থান হইতে পারে না। কারণ, কর্ম কর্তৃত্বভাবাপন্ন, জ্ঞান তাহার বিপরীত।

ব্রহ্মসাধন ও কর্মানুষ্ঠান, অথবা ব্রহ্ম ও ধর্ম—এই দুইয়ের বিরোধ সাময়িক নহে। যুগে যুগে এই বিরোধ বিভিন্ন আকারে দেখা দেয়। গত শতাব্দীতে বঙ্গদেশে এই বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশে রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত দেবপূজা, আচার-অনুষ্ঠান, লৌকিক সংস্কারাদির বর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন। উপনিষৎ ও বেদান্ত গ্রন্থ ইংরেজী, বাঙ্গালা এবং হিন্দী অনুবাদসহ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। তাঁহার এই সকল প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের ফলে দেশে উদ্বেগের সঞ্চার হয়। ধর্ম নষ্ট হইল বলিয়া রব উঠে। রাজা রাধাকান্ত দেবপ্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রামমোহনের ব্রহ্মসভার প্রতিযোগিস্বরূপ ধর্মসভা স্থাপন করেন। তাঁহাদের সহযোগী সদাচার-সম্পন্ন সুপণ্ডিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ এবং স্মৃতি গ্রন্থাবলী সানুবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান, পূজাবিধি ও সংস্কারাদির সংরক্ষণ এই সকল উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

রামমোহন ব্রহ্মসূত্রের "পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ" (৩. ৩. ৫০) সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীতানুকূল ব্যাপার এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা হয়, যেহেতু শ্রুতি ও স্মৃতিও এইরূপ উপাসনাকে অনেক স্থানে কহিয়াছেন।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মধর্মবীজ" নিবদ্ধ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" ঈশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্যসাধন—এই দুই তাঁহার উপাসনা। রামমোহনের "প্রীতানুকূল ব্যাপার" এবং দেবেন্দ্রনাথের "তাঁহার প্রিয়-কার্যসাধন" এই উভয়ের অর্থ লোকহিতকর কার্য। ব্রাহ্মসমাজে এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সূত্রের অধিকরণ এবং ভাষ্যটীকাদিতে প্রদত্ত পরম্পরাগত অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, এখানে শাস্ত্রবিহিত কর্ম অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানই লক্ষিত হইয়াছে। সমন্বয়বাদী শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" প্রভৃতি শ্লোকে যে ভাবে কর্মকে ব্রহ্মময়রূপে দেখিয়াছেন, রামমোহন কর্মকে ঠিক সেই চক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

ব্রহ্মানন্দ কেশব যৌবনাবধি জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি নানা লেখ ও বক্তৃতায় harmonious developmentএর কথা বলিয়াছেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Tracts for the Timesএ ইহার আভাস পাওয়া যায়। ঐ বৎসরের শেষভাগে স্থাপিত সঙ্গত সভার আলোচনার ফলে পরবৎসর 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তিনি প্রকাশিত করেন। ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Social Reformation in India নামক বক্তৃতায় আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করেন এবং জাতকর্ম, নামকরণ, দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি এবং শ্রাদ্ধ—এই ছয়টি সংস্কারের উল্লেখ করেন। তিনি জীবনের শেষভাগে ১৮৮৩ সালে "নবসংহিতায়" ধর্মজীবন পালনের যুগোপযোগী বিধি নিবদ্ধ করেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি মানব-

প্রকৃতির তিন মূলঘেঁষা ভাবের অভিব্যক্তি—ইহাই কেশবের অভিমত। কর্ম অর্থে তিনি "প্রীতানুকূল ব্যাপার" (রামমোহন) অথবা "তাঁহার প্রিয়কার্যসাধন" (দেবেন্দ্রনাথ) অর্থাৎ লোকহিতকর কার্য-মাত্র গ্রহণ করেন নাই। তিনি কর্ম অর্থে আচার-অনুষ্ঠানকেও স্বীকার করিয়াছেন। যখন তিনি দেশীয় এবং বিদেশীয় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের কোন কোন সংস্কার নিজ মণ্ডলীতে গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠান করেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে "অব্রাহ্ম" ("un-Brahmic") বলিয়া তাহার প্রতিবাদ হয়। "ব্রহ্মগীতোপনিষদে" তিনি যোগ, ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান সকল পন্থার সমন্বিত সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। ভগবদ্গীতায় হৃষীকেশ কেশব সমন্বয়বাদের আরম্ভ করেন। ব্রহ্মগীতোপনিষদে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেই পন্থারই অনুসরণ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে আলোচ্য বিরোধ বিদ্যমান দেখা যায়। Epistle of Jamesএ আছে—"What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have no works ? Can faith save him ?" (2. 14). কর্মবিহীন ব্রহ্মানুরাগ কি মুক্তি দান করিতে পারে ? "By works a man is justified, and not by faith only." (2. 24). পক্ষান্তরে St. Paul তাঁহার Epistle to the Galatiansএ বলিতেছেন—"A man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ." এখানে faith অর্থে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ব্রহ্মানুরাগ ; work অর্থে শাস্ত্রবিহিত কর্ম—ধর্মানুষ্ঠান।

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে ব্রহ্ম ও ধর্মের বিরোধ নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। তাহার প্রভাব ভারতেও কতকটা অনুভব করা যায়। মানবাতীত কোন পরম তত্ত্ব বা আদর্শকে স্বীকার না করিয়া, মানুষ হিসাবে মানুষের যাহা (গীতার ভাষায়) "ইষ্টকামধুক্"—অভীষ্টফলপ্রদ, তাহাই অনুসরণীয়—Humanism, Communism প্রভৃতি মতবাদগুলির আশয়। এই মতগুলি নাকি বিজ্ঞানালোকে নির্ধারিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিজ্ঞানের স্থির প্রতিষ্ঠা কোথায় ? অধুনা বিজ্ঞান প্রজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এতদিন বিজ্ঞান বহির্মুখীন ছিল, এখন অন্তর্মুখীন হইতেছে। জড়ে চৈতন্যের অধিষ্ঠান দেখিতেছে ; নিয়মের অন্তরালে নিয়ন্তার সন্ধান করিতেছে। আশা করা যায়, নূতন সমন্বয়ের পথে ব্রহ্ম ও ধর্মের বিরোধভঞ্জন হইবে। সমন্বিত সাধনের ফলে মানুষ মনুষ্যত্ব পরিহার না করিয়া মানবতার উপাধি হইতে ক্রমে মুক্তিলাভ করিবে।



বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল।

দুপুরের পরে বিপিন কাছারিতে বসিয়া হিসাবপত্র দেখিতেছে, নিবারণ গোয়ালার ছেলে পাঁচু আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, কামিনী পিসী একবার আপনাকে ডেকেছে।

বিপিন গিয়া দেখিল, কামিনীর অসুখ বাড়িয়াছে। গায়ের উত্তাপ খুব বেশি, জ্বরের ধমকে বৃদ্ধা যেন হাঁপাইতেছে, বেশি কথা বলিবার শক্তি নাই।

বিপিন বলিল, কি খেয়েছ?

কামিনী ক্ষীণস্বরে বলিল, নিবারণের বউ একটু জলসাবু ক'রে দিয়ে গেল, দুপুরের আগে তাই একচুমুক—মুখে ভাল লাগে না কিছু।

—আচ্ছা, আচ্ছা, চুপ ক'রে শুয়ে থাক।

—তুমি আমায় আজ দেখতে আস নি কেন?

কথাটা কামিনী কেমন যেন গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল; বেশ একটু অভিমানের সুরও বটে।

বিপিন মনে মনে অনুতপ্ত হইল। দেখিতে আসা খুব উচিত ছিল; সকালে কাছারিতে জনকতক প্রজার সঙ্গে গোলমাল মিটাইতে দেরি হইয়া গেল, নতুবা ঠিক আসিত। কামিনীর কেহ নাই, বৃদ্ধা হয়তো আশা করে, বিপিন তাহার অসময়ে পুত্রবৎ দেখাশোনা করিবে; যদিও বিপিন কামিনীর মনের এত কথা বুঝিতে পারে না, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, অপরের দিকে চাহিবার অবসর তাহার কোথায়?

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে বিপিন বলিল, এখন যাই, প্রজাপত্তর আসবে, আর আমায় একবার গদাধরপুর যেতে হবে একটা জমির মীমাংসা করতে। সন্ধ্যের পর আবার আসব।

কামিনী উঠিতে দেয় না, হাত বাড়াইয়া টানিয়া টানিয়া বলিল, যেও না, যেও না, ও বাবা বিপিন, যেও না, ব'স, ব'স।

বিপিনের কষ্ট হইল বৃদ্ধাকে এভাবে ফেলিয়া যাইতে। কিন্তু সত্যই তাহার থাকিবার উপায় নাই। গদাধরপুরে কয়েকঘর জেলে প্রজা আছে, তাহারা স্থানীয় বাঁওড়ের দখল লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার ফলে কাছারির খাজনা আদায় হইতেছে না। বিপিন নিজে গিয়া এ ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিলে তাহারা মানিয়া লইবে, এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছে। সুতরাং যাইতেই হইবে তাহাকে। অনাদিবাবুর কানে যদি কথা যায়, তবে এতদিন সে যায় নাই কেন, এজন্য কৈফিয়ৎ তলব করিয়া পাঠাইবেন।

আড়ালে পাঁচুকে ডাকিয়া বলিল, পাঁচু, তোমার মাকে বল এখানে একটু থাকতে। আমি আবার আসব এখন, একবার কাজে যাব গদাধরপুরে। আর একবার একটু সাবু ক'রে খাইয়ে

দিতে ব'ল তোমার মাকে। খরচপত্তর যা হবে, সব আমার। আমি সব দোব। আচ্ছা, একটা লোক দিতে পার, রাণাঘাট থেকে কমলালেবু আর বেদানা কিনে আনবে ?

বিপিন কাছারির নায়েব বটে, কিন্তু সে ভালমানুষ নায়েব। লোকে সেজন্য তাহাকে তত ভয় করে না। বিপিনের বাবার আমলে প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না, মুখের কথা খসাইয়া হুকুম করিলেই চলিত।

পাঁচু বলিল, আচ্ছা বাবু, আমি দেখছি যদি হাবুল যায়, ব'লে দেখছি।

—এই আট আনা পয়সা রাখ। হাবুলকে পাও বা যাকে পাও, দিয়ে ব'ল ভাল বেদানা আর কমলালেবু আনতে; আর যে যাবে, তার জলখাবার আর মজুরি এই নাও চার আনা।

বিপিন কাছারি আসিয়া গদাধরপুর যাইবার জন্য বাহির হইয়াছে, এমন সময় পাঁচু আসিয়া বলিল, কেউ গেল না নায়েববাবু, আমি নিজেই চললাম রাণাঘাট। ফিরতে কিন্তু আমার রাত হবে, তা ব'লে যাচ্ছি।

বিপিন বুঝিল, মজুরি ও জলখাবারের দরুন চার আনার পয়সার লোভ সম্বরণ করা পাঁচুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; তারপর বাকি আট আনার ভিতর হইতে অন্তত চার ছয় পয়সা উপরিই বা কোন্ না হইবে?

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা।

গদাধরপুর এখান হইতে তিন চার মাইল পথ। বিপিন জোরে হাঁটিতে লাগিল। বজরাপুর পর্য্যন্ত সে ও পাঁচু একসঙ্গে গেল। তারপর রাণাঘাটের রাস্তা বাঁকিয়া পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। পাঁচু সেই রাস্তায় চলিয়া গেল। গদাধরপুর যাইবার কোনও বাঁধা-ধরা পথ নাই। মাঠের উপর দিয়া সরু পায়ে চলার পথ, কখনও বা ফুরাইয়া যায়, আবার কিছু দূরে গিয়া অন্য একটা পথ মেলে। মাঠে লোকজনও নাই যে, পথ জিজ্ঞাসা করা যায়। নানা সরু সরু পথ নানা দিকে গিয়াছে, কোন্ পথ যে ধরিতে হইবে, জানা নাই। বিপিন এক প্রকার আন্দাজে চলিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। রোদের তেজ কমিয়া গেল।

মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় আকন্দগাছে ফুল ফুটিয়াছে। সোঁদা, রোদপোড়া মাটি ও শুকনো কাশঝোপের গন্ধ বাহির হইতেছে। ফাঁকা মাঠ, গাছপালাও বেশি নাই, কোথাও হয়তো বা একটা নিমগাছ, মাঝে মাঝে খেজুরগাছ।

অবশেষে দূর হইতে জলাশয় দেখিয়া বিপিন বুঝিল, এই গদাধরপুরের বাঁওড়, সুতরাং সে ঠিক পথেই আসিয়াছে।

গদাধরপুরের প্রজারা বিপিনকে খাতির করিয়া বসাইল। গ্রামের মধ্যে একটা কলু-বাড়ির বড় দাওয়ায় নূতন মাদুর পাতিয়া দিল বিপিনের জন্য। এ গ্রাম অনাদিবাবুর খাস তালুকের অন্তর্গত, গোটা গ্রামখানার সব লোকই কাছারির প্রজা।

বাঁওড়ের দখলের মীমাংসা করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

দুই তিন জন প্রজা বলিল, নায়েববাবু, বলতে আমাদের বাধ-বাধ ঠেকে, কিন্তু আপনার একটু জল মুখে দিলে হ'ত।

বিপিন বলিল, না, সে থাক। এখনও অনেক কাজ বাকি। আমাকে আবার সব কাজ সেরে ফিরতে হবে এতখানি রাস্তা।

প্রজারা ছাড়িল না, শেষ পর্য্যন্ত বিপিনকে একটা ডাব খাইতে হইল।

একটি চাষাদের বউ কি মেয়ে এক কাঠা ধান হাতে কলু-বাড়ির উঠানে আসিয়া বলিল, হ্যাদে, ইদিকি এস। তেল দ্যাও আধপোয়া আর এক ছটাক নুন, আধপয়সার ঝাল—

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি ধান দিয়ে জিনিস কেনো?

মেয়েটি বলিল, হ্যাঁ বাবু, কনে পয়সা পাব? শীতকাল গেল, একখানা বস্তর নেই যে গায়ে দিই। যে কবিশ ধান পেয়েলাম, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে খাবার ধান চাট্টি ঘরে ছেল। তাই দিয়ে তেল নুন হবে সারা বছরের আরও খাওয়া হবে।

—এতে কুলোবে সারা বছর?

—তা কি কুলোয় বাবু? আষাঢ় শ্রাবণ মাসের দিকি আবার মহাজনের গোলায় ধামা হাতে যাতি হবে। ধান কর্জ্জ না করলি আর চলবে না তারপর।

কলু-বাড়িতে একটা ছোট মুদীর দোকানও আছে। আরও কয়েকটি লোক জিনিসপত্র কিনিতে আসিল। মেয়েটি তেল নুন কিনিয়া যাইবার সময় বলিল, মুসুরি নেবা?

হরি কলু বলিল, নতুন মুসুরি? কাল নিয়ে এস।

—মুসুরির বদলে কিন্তু চাল দিতি হবে।

বিপিন বলিল, তোমার ঘরে ধান আছে তো চাল নিয়ে কি করবে?

মেয়েটি উঠানে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। তাহার ভাই জন খাটিয়া খায়, কিন্তু তাহার হাঁপানির অসুখ, দশ দিন খাটে তো পনরো দিন পড়িয়া থাকে। সংসারের বড় কষ্ট, সাত জন লোক এক এক বেলায় খায়, দু বেলায় চোদ্দ জন। যে কটি ধান আছে, তাহাতে কয় মাস যাইবে? সামান্য কিছু মুসুরি ছিল, তাহার বদলে চাল না লইলে চলে কি করিয়া?

এই সব প্রজা। ইহাদের নিকট খাজানা আদায় করিয়া তাহাকে চাকুরি বজায় রাখিতে হইবে। অনাদিবাবুর চাকুরি লইয়া সে মস্ত বড় ভুল করিয়াছে। এ সব জিনিস তাহার ধাতে নাই। বাবা কি করিয়া কাজ চালাইতেন সে জানে না, কিন্তু তাহার পক্ষে অসম্ভব।

মানী ঠিক পরামর্শ দিয়াছে।

ডাক্তারি শিখিতেই হইবে তাহাকে। ডাক্তারি শিখিলে এই সব গরিব লোকের অনেকখানি উপকার করিতেও তো পারিবে।

এখানকার আর একজন প্রজার কাছে অনেকগুলি টাকা খাজানা বাকি। বিপিন সন্ধ্যার পরে তাহার বাড়ি তাগাদা দিতে গেল। গিয়া দেখিল, খড়ের ঘরের দাওয়ায় লোকটা শয্যাগত, মলিন লেপ কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। তিন চারটি পাড়ার লোক নায়েববাবুর আগমন-সংবাদ শুনিয়া

বাড়ির উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রোগীর বিছানার পাশে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, বিপিনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

লোকটির নাম বিশু ঘোষ, জাতিতে কৈবর্ত্ত। বিপিনকে সে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু বিপিন দাওয়ায় উঠিয়া বসিতেই তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কে? ছিরাম? তামাক দে, ছিরাম খুড়োকে তামাক দে।

বিপিন তো অবাক। পরে রোগীর চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল, চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল। ঘোর বিকার। রোগী মানুষ চিনিতে পারিতেছে না। বিপিন বলিল, ওর মাথায় জল দাও। দেখছে কে?

একজন উত্তর দিল, ফকির সায়েব দেখছেন।

—কোথাকার ফকির সায়েব? ডাক্তার?

—আজ্ঞে না, তিনি ঝাড়ফুঁক করেন খুব ভাল। তিনি বলেছেন, উপরিভাব হয়েছে।

বিপিন বুঝিতে না পারিয়া বলিল, উপরিভাব কি ব্যাপার?

দুই তিন জনে বুঝাইয়া দিবার উৎসাহে একসঙ্গে বলিল, আজ্ঞে, এই দিষ্টি হয়েছে আর কি, অপদেবতার দিষ্টি হয়েছে।

—ভূতে পেয়েছে?

—ভূতে পাওয়া না ঠিক। দিষ্টি হয়েছে আর কি।

বিপিনের যতটুকু ডাক্তারি-বিদ্যা এই কয়দিন বই পড়িয়া হইয়াছে, তাহারই বলে সে বলিল, ওর ঘোর জ্বর, বিকার হয়েছে। লোক চিনতে পারছে না, চোখ লাল, রক্ত উঠেছে মাথায়। মাথায় জল ঢাল। উপরিভাব-টাব বাজে, ওকে ডাক্তার দেখাও, নইলে বাঁচবে না। ফকিরের কর্ম্ম নয় এ সব।

উহাদের মধ্যে একজন বলিল, এ দিগরে বরাবর থেকে ফকির সায়েব ঝাড়ান-ফাড়ান, তেলপড়া দিয়েই রোগ সারান বাবু। ডাক্তার কোথায় এখানে? ডাক্তার আছে সেই রামনগরের হাটে, নয়তো সেই চাক্‌দার বাজারে। আর এক আছে রাণাঘাটে। দু কোশ রাস্তা। এক মুঠো টাকা খরচ ক'রে কি গরিবগুরবো লোকে ডাক্তার আনতি পারে?

গদাধরপুর হইতে বিপিন যখন বাহির হইয়া ফাঁকা মাঠে পড়িল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি, একটু পরেই চাঁদ উঠিবে। চাঁদ উঠার জন্যই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল।

মাঠে জনপ্রাণী নাই। অপূর্ব্ব তারাভরা রাত্রি। আকাশের দিকে বিপিনের নজর পড়িত না, যদি চাঁদ কখন উঠে, ইহা দেখিবার প্রয়োজন তাহার না হইত। কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়া নক্ষত্রভরা অন্ধকার আকাশের দৃশ্য দেখিয়া জীবনে এই বোধ হয় বিপিনের বড় ভাল লাগিল।

কেমন নিস্তব্ধতা, কেমন একটা রহস্যময় ভাব রাত্রির এই নিস্তব্ধতার! এত ভাল লাগিবার প্রধান কারণ, এই সময় মানীর কথা তাহার মনে পড়িল।

মানী কি বুদ্ধিমতী মেয়ে! অদ্ভুত, ও রকম কেহ নাই। আজ যে এই সব দরিদ্র রোগপীড়িত মানুষদের সে চোখের উপর মরণের পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আসিল অজ্ঞতার ফলে, মানীই তাহাকে পথ দেখাইয়া বলিয়া দিয়াছে, ইহাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে কি করিয়া বাঁচাইতে হইবে। ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, সৎপরামর্শ দিবার মানুষ নাই, কঠিন সান্নিপাতিক বিকারের রোগী, সম্পূর্ণ অসহায়। জলপড়া, তেলপড়ার চিকিৎসা চলিতেছে। ওদিকে কামিনী-মাসীর ওই অবস্থা, তাহার ভাইয়ের ওই অবস্থা।

মানী তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যে পথে গেলে অর্থ ও পুণ্য দুইই মিলিবে।

গরিব প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া, তাহাদের রক্ত চুষিয়া তাহার বাবা এবং মানীর বাবা দুইজনেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সে পাপপথে চলিবে তো নাইই, বরং পিতৃদেবদের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবে নিজেদের দিয়া।

মানী তাহাকে জীবনে আলো দেখাইয়াছে।

একটি অদ্ভুত মনের ভাবের সহিত বিপিনের পরিচয় ঘটিল আজ হঠাৎ এই মাঠের মধ্যে। মানীর সঙ্গে ভালবাসার যে সম্পর্ক তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে, এতদিন অন্তত বিপিনের মনের দিক হইতে তাহা দেহসম্পর্কহীন ছিল না, মনে মনে মানীর দেহকে সে বাদ দিতে পারে নাই। বিপিনের স্বভাবই তা নয়, সূক্ষ্ম মানসিক স্তরের আদানপ্রদান তাহার ধাতুগত নয়। মানীর সম্বন্ধে এ আশা বিপিন কখনও ছাড়ে নাই যে, একদিন না একদিন সে মানীকে নামাইবে তাহার নিজস্ব নিম্নস্তরে। সুবিধা সুযোগ এখন নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও কি ঘটিবে না?

আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, মানীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্য ধরণের। মানী তাহাকে যে স্তরে লইয়া গিয়াছে, বিপিনের মন তাহার সহিত পরিচিত ছিল না। অনেক মেয়ের সঙ্গে বিপিন মিশিয়াছে পূর্ব্বে অন্যভাবে। মন বলিয়া জিনিসের কারবার ছিল না সেখানে। হয়তো মন জিনিসটাই ছিল না সে ধরণের মেয়েদের।

কিন্তু মনোরমা? বিপিন জানে না। মনোরমার মন সম্বন্ধে বিপিনের কখনও কৌতূহল জাগে নাই। তেমন ভাবে মনোরমা কখনও বিপিনের সঙ্গে মিশে নাই। হয়তো সেটা বিপিনেরই দোষ, মনোরমার মনকে বিপিন সে ভাবে চাহিয়াছে কবে? যে সোনার কাঠির স্পর্শে মনোরমার মনের ঘুম ভাঙিত, বিপিনের কাছে সে সোনার কাঠি ছিল না।

বিপিনের মনের ঘুম ভাঙাইয়াছে মানী। সে সোনার কাঠি ছিল মানীর কাছে।

দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে। বিপিন একটা খেজুরগাছের তলায় ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। ভারী ভাল লাগিতেছিল, কি যে হইয়াছে তাহার, কেন আজ এত ভাল লাগিতেছে—এই আধ-অন্ধকার মাঠ, পূব-আকাশে উদীয়মান চন্দ্র, মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় সাদা আকন্দফুল, হুহু হাওয়া—কখনও তেমন ভাবে বিপিন এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই, আজ যেন কি হইয়াছে তাহার!

বলিতে লজ্জা করিলেও বলিতে হইবে, তাহাদের গ্রামের দোকানে সে সন্ধ্যার পর গোপনে তাড়ি পর্য্যন্ত খাইয়া দেখিয়াছে—কি রকম মজা হয়! এই বছর পাঁচ আগেও। বাবা তখন

অল্পদিন মারা গিয়াছেন। হাতে কাঁচা পয়সা, বিপিন তখন খুব উড়িতেছে। অবশ্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই খাইয়াছিল। খানিকটা বাহাদুরিও বটে। ভোলা ছুতারের ছেলে হাবুলের সহিত বাজি ফেলা হইয়াছিল।

এ সব কথা বিপিনের আজ এমন করিয়া কেন মনে হইতেছে?

সে মানীর বন্ধুত্বের উপযুক্ত নয়। নিজেকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বিপিনের তাহাই মনে হইল। নিজেকে সে কলঙ্কিত করিয়াছে নানা ভাবে। মানী নিষ্পাপ নির্ম্মল।

বিপিন উঠিয়া পথ চলিতে লাগিল। বোধ হয় সে অপেক্ষা করিতেছিল চাঁদ ভাল করিয়া উঠিবার জন্য।

একটা নীচু খেজুরগাছে এক ভাঁড় খেজুর রস দেখিয়া সে ভাঁড় পাড়িয়া রস খাইল, সন্ধ্যার টাটকা রস সাধারণত মেলে না। ভাঁড়টা আবার গাছে টাঙাইয়া রাখিবার সময় সে ভাঁড়টার মধ্যে দুইটি পয়সা রাখিয়া দিল। পল্লীগ্রামে এত ধার্ম্মিক কেহ হয় না, কিন্তু আজ বিপিনের মনে হইল, চুরি সে করিতে পারিবে না। মানীর কাছে দাঁড়াইতে হইবে তাহাকে, চোরের বিবেক লইয়া দাঁড়াইতে পারিবে সেখানে?

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, ছোকরা চাকরটা তাহার জন্য বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

বিপিন বলিল, এই ওঠ, উনুন ধরাগে যা। দুধ দিয়ে গিয়েছে এবেলা?

চাকরটা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বাবা! কত রাত ক'রে আলেন নায়েববাবু? আমি বলি রাত্তিরি বুঝি থাকবেন সেখানে।

—কামিনী-মাসী কেমন আছে রে? রাণাঘাট থেকে লেবু নিয়ে ফিরেছে কিনা জানিস?

—জানি নে বাবু।

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া কামিনীকে দেখিতে গেল।

বেশ জ্যোৎস্নাভরা রাত। কিন্তু গাঁয়ের লোক প্রায় সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গোয়ালাপাড়ার মধ্যে কাহারও বড় একটা সাড়াশব্দ নাই।

কামিনীর ঘরের দোর ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। ঘরের মেঝেতে একটা পিলসুজের উপরে মাটির পিদিম টিম টিম জ্বলিতেছে, বোধ হয় পাঁচুর মা জ্বালিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। রোগী কাঁথামুড়ি দিয়া একলাটি শুইয়া বোধ হয় ঘুমাইতেছে।

বিপিন ডাকিল, ও মাসী, কেমন আছ, ও মাসী?

সাড়াশব্দ নাই।

বিপিন বিছানার পাশে গিয়া বসিয়া বৃদ্ধার গায়ে হাত দিয়া দেখিল। নাড়ী দেখিয়া মনে হইল, নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ। খুব ঘাম হইতেছে, বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে ঘামে। বৃদ্ধা ঘুমাইতেছে, না ক্রমশ অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছে, বোঝাও কঠিন।

যাই হোক, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে কামিনী চোখ চাহিয়া বিপিনের দিকে চাহিল। কি যেন বলিল, বোঝা গেল না, ঠোঁট যেন নড়িল।

বিপিন বলিল, কি মাসী, কেমন আছ ? বলছ কিছু ?

কামিনীর জ্ঞান নাই। সে দৃষ্টিহীন নেত্রে বিপিনের দিকে চাহিল, ঘরের বাঁশের আড়ার দিকে চাহিল, আলনায় বাঁধা পুরানো লেপ-কাঁথার দিকে চাহিল। বৃদ্ধার এই ঘরে তাহার বাবা ৺বিনোদ চাটুজ্জে নিয়মিত আসিতেন, এ কথা বিপিন জানে ; ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে তুই এক বার এখানে আসিয়াছে। কামিনী তখন দেখিতে বেশ ফর্সা ও দোহারা চেহারার স্ত্রীলোক ছিল, কালাপেড়ে কাপড় পরিত, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙা করিয়া রাখিত, হাতে সোনার বালা ও অনন্ত পরিত, কালো চুলে খোঁপা বাঁধিত, এ কথা বিপিনের বেশ মনে আছে। বাইশ তেইশ বছর আগের কথা। এই যে বৃদ্ধা বিছানার সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে, মাথায় পাকা চুল, গায়ের রং হাজিয়া আধকালো, দাঁত পড়িয়া গালে টোল খাইয়া গিয়াছে, বিশেষত জ্বরে ভুগিয়া বর্ত্তমানে তাড়কা রাক্ষসীর মত চেহারা হইয়া উঠিয়াছে যাহার, এই যে সেই একদিনের হাস্যলাস্যময়ী সুন্দরী কামিনী, যাহার চটুল চাহনিতে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, ইহাকে দেখিয়া কে বলিবে সে কথা ? কামিনী কিন্তু সত্যই বড় একা পড়িয়াছিল নায়েব মহাশয়ের মৃত্যুর পরে। সত্যই সে বিনোদ চাটুজ্জেকে ভালবাসিত। প্রথম যৌবনে তুইজনের দেখাশোনা হয়। কামিনী ছিল গোয়ালার মেয়ে—বালবিধবা, সুন্দরী। বিনোদ চাটুজ্জেও ছিলেন লম্বা চওড়া জোয়ান, বড় বড় চোখ, গলার স্বর গম্ভীর ও ভারী—পুরুষের মত শক্ত সমর্থ চেহারা। তা ছাড়া ছিল অসম্ভব দাপট। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগের কথা, তখন নায়েববাবুই ছিলেন এ অঞ্চলের দারোগা, নায়েব-বাবুই ম্যাজিস্ট্রেট।

কামিনী বিনোদ চাটুজ্জেকে ভালবাসিবে, এ বিচিত্র কথা কি ?

সারাজীবন একসঙ্গে যাহার সহিত কাটাইয়া, নিজের উজ্জ্বল যৌবন যাহাকে দান করিয়া কামিনী নারীজন্মের সার্থকতাকে বুঝিয়াছিল, সেই বিনোদ চাটুজ্জের অভাবে কামিনীর জীবন শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

হয়তো এইমাত্র অজ্ঞান অচৈতন্য জ্বরঘোরে কামিনীর মন ঘুরিয়া ফিরিতেছিল তাহার প্রথম যৌবনের সেই পাখী-ডাকা, ফুল-ফোটা, আলো-মাখা মাধবী রাত্রির প্রহরগুলি অনুসন্ধান করিয়া, আবার মনে মনে সেখানে বাস করিয়া, হারানো রাত্রির শিশিরসিক্ত স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করিয়া। হয়তো মনে পড়িতেছিল প্রথম দিনের সেই ছবিটি।

সে তাহাদের বাড়ির সামনের বেগুনের ক্ষেত হইতে ছোট্ট চুপড়ি করিয়া বেগুন তুলিয়া ফিরিতেছিল।

পথে আসিতেছিল যুবক বিনোদ চাটুজ্জে, ধোপাখালি কাছারির নায়েব, ধোপাখালি গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। সবাই বলাবলি করিত, নায়েববাবুর কাছে গেলে সব জব্দ হয়ে যাবে এখন! নায়েব এসেছে যা জবর ! কোন ট্যাঁ-ফোঁ খাটবে না সেখানে। নায়েবের মত নায়েব !

সে কৌহতূলের সহিত চাহিয়া দেখিল। বেশ মনে আছে, বেগুনের ক্ষেতের কঞ্চি-বাঁধা আগড়ের কাছে দাঁড়াইয়া।

লম্বা, সুপুরুষ, টকটকে ফর্সা, মাথায় ঢেউ খেলানো কালো চুল, তবে বয়স খুব কম নয়। ত্রিশ বত্রিশ হইবে, কিংবা তারও কিছু বেশি।

নায়েববাবু যখন কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহার তখন বড় লজ্জা হইল। বাঁ হাতে বেগুনের চুপড়িটা, ডান হাতে কঞ্চির আগড়টা শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল।

হঠাৎ বিনোদ চাটুজ্জে তাহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন।

—বেগুন ওতে? এ কাদের ক্ষেত?

সে লজ্জায় সঙ্কোচে বেড়ার সহিত মিশিয়া কোন রকমে উত্তর দিল, আমাদের ক্ষেত।

—তুমি কি রসিক ঘোষের মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—বেগুন কি বিক্রি কর তোমরা?

—না, এ খাবার বেগুন।

—তোমার বাবা কোথায়?

—চিলেমারি দুধ আনতে গেছে।

—ও।

নায়েববাবু চলিয়া গেলেন।

তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। ভয় না লজ্জা, কে জানে। বাড়ি আসিয়া দিদিমাকে (মা তাহার আগের বছর মারা গিয়াছিল) বলিল, আইমা, ওই বুঝি কাছারির নতুন নায়েব? যাচ্ছিলেন এখান দিয়ে, আমার কাছে বেগুন দেখে বললেন, বেগুন বিক্রির? কি জাত, আইমা?

তাহার দিদিমা বলিল, বামুন যে, তাও জান না পোড়ারমুখ মেয়ে। চাইলেন কিনতে, বেগুন কটা দিয়ে দিলেই হ'ত। আমার তো মনে থাকে না, তোর বাবাকে বেগুন দিয়ে আসতে বলিস কাছারিতে। বামুন মানুষ।

এক চুপড়ি ভাল কচি বেগুন ও এক ঘটি দুধ সে-ই কাছারিতে দিয়া আসিয়াছিল। পরদিন বিকালবেলা বাবার সঙ্গে গিয়াছিল।

কিন্তু হায়! সে প্রেমমুগ্ধা তরুণী পল্লীবালিকা আর নাই, সে সুপুরুষ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েববাবুও আর নাই।

অনেক কালের কথা এ সব।

* * *

বিপিন পড়িল মহা মুস্কিলে।

কামিনী যখন মারা গেল, তখন রাত দেড়টার কম নয়। মৃতদেহ ফেলিয়াই বা কোথায় সে যায় এখন? বাধ্য হইয়া ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইল। বৃদ্ধার মৃতদেহ এ ভাবে ফেলিয়া সে যাইতে পারিবে না, মনে মনে সে মায়ের মতই ভালবাসিত কামিনীকে। ভোর হইল। কাক

কোকিল ডাকিয়া উঠিতেই বিপিন গিয়া ডাকহাঁক করিয়া লোকজন উঠাইল। পাঁচু কাল অনেক রাত্রে রাণাঘাট হইতে কমলালেবু লইয়া ফিরিয়াছিল, সকালে দিতে আসিতেছিল, পথে দেখা। তাহাকে পাঠাইয়া ওপাড়া হইতে গোয়ালার পুরোহিত বামনদাস চক্কত্তিকে আনাইল। এ সব পাড়াগাঁয়ে 'প্রাচিত্তির' না করাইলে মড়া-দেহ ছুঁইবে না, বিপিন জানে। কামিনীর আপনার বলিতে কেহ ছিল না, দূর সম্পর্কের এক বোনপো আছে রাণাঘাটে, তাহাকে খবর দিবার জন্য লোক পাঠাইল। তাহাকে দিয়াই শ্রাদ্ধ করাইতে হইবে। সব কাজ শেষ করাইয়া দাহ করিতে বেলা একটা বাজিল।

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, পলাশপুর হইতে জমিদারবাবুর পত্র লইয়া লোক আসিয়া বসিয়া আছে। নানা রকমের কাজের তাগাদা চিঠির মধ্যে, বিশেষ করিয়া টাকার তাগাদা—ত্রিশটি টাকা এই লোকের হাতে যেন আজই পাঠানো হয়।

লোকটাকে বিপিন বলিল, আজ কাছারিতে থাক। এখন টাকা অবেলায় কোথায় পাব? কাল যাবে। দেখি, নরহরি দাসকে ব'লে।

লোকটা আর একখানি ক্ষুদ্র খামের চিঠি বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, মনে ছেল না নায়েববাবু, দিদিমণি এই চিঠিখানা আপনাকে দিতে বলেছেলেন। আমি যখন আসি, খিড়কি-দোরের পথে এসে দিয়ে গেলেন।

মানীর চিঠি! কখনও তো সে বিপিনকে চিঠি দেয় নাই! কি লিখিয়াছে মানী? বিপিন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া যতদূর সম্ভব উদাসীন মুখে বলিল, ও, বোধ হয় বড় মাছ চাই। বাবাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে মাছ চেয়ে পাঠায় বটে। আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর।

বাদামতলায় দাঁড়াইয়া মানীর চিঠি খুলিয়া পড়িল। ছোট্ট চিঠি। লেখা আছে,—

"বিপিনদা,

প্রণাম নেবে। অনেকদিন গিয়েছ, আদায়পত্র কেমন হচ্ছে? নায়েবি কাজের যেন গলদ না হয়, তাগাদাপত্র ঠিকমত হচ্ছে তো? নইলে কৈফিয়ৎ তলব করব, মনে থাকে যেন। আমিও জমিদারের মেয়ে।

আর একটি বিশেষ কথা। আমি এই মাসেই চ'লে যাব, আমার ছোট দেওরের বিয়ের হঠাৎ ঠিক হয়েছে। যাবার আগে তুমি অবিশ্যি একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে। একবার এসেই না হয় চ'লে যেও, কিন্তু আসাই চাই। আবার কবে আসব, তার ঠিকানা নেই। চিঠির কথা লোকটাকে যেন কিছু ব'ল না। কাউকে ব'ল না। ইতি

মানী"

ক্রমশ

বাংলা মঙ্গলকাব্য

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিরাট অংশকে পুরাণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুরাতন আখ্যান বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহাদের নাম পুরাণ—শাস্ত্রকারেরা এ কথা জানাইয়া দিয়াছেন। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের অধিকার ছিল না। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নিকট বৈদিক ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে পুরাণ রচিত হইয়াছিল, তাই বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় ঐতিহ্যই ইহাদের ভিত্তি।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশ্যানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ, মন্বন্তরের বিবরণ, বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ ও সেই সকল বংশজাত ব্যক্তিগণের বিবরণ,—পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ।

কিন্তু এখনকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথন, দেবার্চ্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত-নিয়মাদির বিবরণেই পরিপূর্ণ, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় পাওয়া যায়, সেগুলি আনুষঙ্গিক মাত্র। যদি ধর্ম্মোপদেশ দানই অধুনাতন প্রচলিত পুরাণের ন্যায় পূর্ব্বতন পুরাণেরও উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সেগুলি আজকালকার ব্রাহ্মণ কথকের ন্যায় ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ বর্ণেরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া ব্যবস্থিত হইত—সূতাদি নিকৃষ্ট জাতির হইত না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মহাপুরাণ দশাধিক লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন একটি লক্ষণ ও অন্যান্য দেবতাদির বর্ণনা অপর একটি লক্ষণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকে আমরা যে ভাবে পাই, তাহার রচনাকাল অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কাজেই মনে হয় যে, পুরাণ প্রথমে ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্য সংগ্রহ করিয়া হিন্দু-সংস্কৃতির একটি ধারা রক্ষা করিতেছিল। জনসাধারণের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনকল্পে পুরাণ রচিত হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে যে উহাকে ধর্ম্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিতে হইবে—এ কথা পুরাণকার বুঝিয়াছিলেন, কারণ হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থকে কোনও দিন শ্রদ্ধা করে নাই। তাই পরবর্ত্তী কালে পুরাণের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং রূপক ও অলৌকিক ঘটনাদ্বারা দেব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে থাকে।

এই জাতীয় কতকগুলি গ্রন্থকে এখন উপপুরাণ বলা হয়। এগুলিতে পঞ্চ লক্ষণের একটিও দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিকাপুরাণ নামক একখানি গ্রন্থকে উপপুরাণ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শিবের বিবাহমন্ত্রণা, সতীর জন্ম-কথন, সতীর শিবারাধনা ও শিবের সহিত সতীর কৈলাস-গমন ও তাঁহাদের নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক-বর্ণন, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সেই যজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগ, সতীশোকে শিবের বিলাপ

ও উন্মাদ, সতীর মৃতদেহ খণ্ডনদ্বারা পীঠস্থানের উৎপত্তি ও কামরূপাদি ঐ সমস্ত তীর্থভূমির মাহাত্ম্য-বিবরণ, ২৪শ অধ্যায়ে শিবের তপস্যা-অবলম্বন, ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক মায়ার স্তুতি এবং জগৎ-প্রপঞ্চের অসারত্ব চিন্তা করিয়া সার বস্তুতে শিবের চিত্তার্পণ, বত্রিশ হইতে সাঁইত্রিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতার প্রস্তাব ইত্যাদি শিব, শক্তি ও অন্যান্য দেবতা-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এখন পুরাণ-সাহিত্য কোথা হইতে কিসে পরিণত হইল, ইহা অনুমিত হইতে পারে।

সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, বেদের অন্তর্গত দেবাসুরের যুদ্ধবর্ণনা প্রভৃতির নাম ইতিহাস আর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বিবরণের নাম পুরাণ।

শঙ্করাচার্য্যও পুরাণ সম্বন্ধে এইরূপই লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, উর্ব্বশী-পুরূরবার কথোপকথনাদি-স্বরূপ ব্রহ্মণভাগের নাম ইতিহাস আর সৃষ্টি-প্রক্রিয়াঘটিত কথা সমুদয়ের নাম পুরাণ। এগুলি হইতে বেদের সহিত পুরাণের একটি সম্পর্ক সূচিত হইতেছে। এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ বোধ হয়, যখন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের আলোচনা করা যায়। ব্রাহ্মণকে বেদের শাখা বলা হইয়াছে এবং ইহাতে বেদোক্ত যজ্ঞাদির বিষয় বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বেদের আরও অনেক বিষয় ইহাদের মধ্যে লিখিত হইয়াছে, যাহা হইতে পরবর্ত্তী কালে পুরাণ ও মহাকাব্য রচনার উপাদান সংগৃহীত হয়। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর প্রেম ও বিরহের যে উপাখ্যান ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে, তাহা ব্রাহ্মণে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা কাব্য-নাটকাদির উপাদানরূপে পরবর্ত্তী কালে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি কালিদাস তাঁহার বহু নাটকের বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদোক্ত বিষয় কিরূপে ক্রমশ পল্লবিত হইয়া ভিন্ন আকার ধারণ করে, তাহা একটিমাত্র দৃষ্টান্তে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ঋগ্বেদে আছে—

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূঢ়মস্য পাং সুরে।

বিষ্ণু এই জগতে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন; সমুদয় জগৎ তাঁহার ধূলিযুক্ত পদদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্

দুর্দ্ধর্ষ ও সকল জগতের রক্ষাকারী বিষ্ণু ধর্ম্মের পুষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

নিরুক্তকার যাস্ক এই দুই ঋকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

যদিদং কিঞ্চ তদ্বিচক্রমে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপুণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভ। (১২।১৯)

বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রম করেন। তিনি তিন প্রকার ভাব গ্রহণার্থ তিনবার পদবিক্ষেপ করেন। শাকপূণি বলেন, (বিষ্ণু) ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকে পদবিক্ষেপ করেন। ঔর্ণবাভ বলেন, উদয়স্থানে, মধ্যাকাশে ও অস্তগমন-স্থলে পদার্পণ করেন।

অতএব ঔর্ণবাভের মতে, এই বিষ্ণু সূর্য্য ও তাঁহার ত্রিপাদ-বিক্ষেপ উদয়, অস্ত ও মধ্যাহ্নকালের

গতি ছাড়া আর কিছুই নহে। দুর্গাচার্য্য নিরুক্তভাষ্যে এই কথাটি সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—(ঋ সং—১০।৮৮।১০)।

বিষ্ণু সূর্য্য; কেন না, তিনি তিনবার পদবিক্ষেপ করেন। কোথায়? শাকপূণি বলেন, ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষে। তিনি পার্থিব অগ্নি-স্বরূপ হইয়া পৃথিবীতে যৎকিঞ্চিৎ গমন ও অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ-স্বরূপ ও দ্যুলোকে সূর্য্যস্বরূপ হইয়া গমন ও অধিষ্ঠান করেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'দেবগণ সেই (সূর্য্যস্বরূপ) অগ্নিকে তিন ভাবে বিদ্যমান করিয়া দেন'। ঔর্ণবাভ বিবেচনা করেন, উদয়কালে উদয়াচলে এক পাদ বিক্ষেপ করেন, মধ্যাহ্নকালে বিষ্ণুপাদে অর্থাৎ মধ্যাকাশে অপর এক পাদ এবং অস্তাচলে গয়শিরে অর্থাৎ অস্তগমনস্থলে অন্য এক পাদ বিক্ষেপ করেন।

পুরাণে বামনাবতারের উপাখ্যানে লিখিত আছে, বিষ্ণু বামন-রূপ ধারণ পূর্ব্বক বলিরাজাকে ছলনা করিতে গিয়া ভূতলে এক পাদ, অন্তরীক্ষে এক পাদ এবং অবশেষে বলির মস্তকোপরি এক পাদ অর্পণ করেন। এই জন্য এই অবতারকে ত্রিবিক্রমাবতারও বলে। সায়নাচার্য্য উল্লিখিত দুই ঋকের ব্যাখ্যায় পৌরাণিক বিষ্ণুর উক্ত অবতারের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু বেদোক্ত বিষ্ণু বলি-বঞ্চক পৌরাণিক বিষ্ণু নহেন; মূলেও কোন অবতারের প্রসঙ্গ নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরাও ইহার সেরূপ অর্থ করেন নাই। সায়নাচার্য্যের পরবর্ত্তী নিরুক্তকার দুর্গাচার্য্যও এই মত গ্রহণ করেন নাই, পূর্ব্বোদ্ধৃত নিরুক্তপাঠে তাহা স্পষ্টই জানা যায়। ইহা হইতে এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত যে, বেদোক্ত বিষ্ণু নামক আদিত্যবিশেষের উল্লিখিত ত্রিপাদবিক্রমের প্রসঙ্গ হইতেই পৌরাণিক বিষ্ণুর উপাখ্যান উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণেও এক যজ্ঞবাচক বামনরূপী বিষ্ণুর উপাখ্যান আছে; তিনি অসুরগণের নিকট হইতে কৌশলে সমগ্র ভূমণ্ডল অধিকার করেন। (১।২।৫।১-৭)।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ঋগ্বেদ-সংহিতার আদিত্যবিশেষ বিষ্ণু হইতেছেন—সূর্য্য, যিনি উদয়কালে উদয়গিরিতে, মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে, এবং অস্তকালে অস্তগমনস্থলে পদবিক্ষেপ করেন; আর শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে, যজ্ঞস্বরূপ বামনরূপী বিষ্ণু কৌশলক্রমে অসুরগণকে ছলনাপূর্ব্বক অবনিমণ্ডল অধিকার করেন। এই সৌরকীর্ত্তি ও যজ্ঞমহিমা-প্রতিপাদক বৈদিক উপাখ্যান হইতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা বৈকুণ্ঠবাসী পৌরাণিক বিষ্ণুর বামনাবতার বিষয়ক উপাখ্যান উদ্ভাবিত হইয়াছে। ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের সপ্তদশ অবধি তেইশ অধ্যায় এবং বামন-পুরাণের পঁচাত্তর অধ্যায় পাঠ করিলেই সবিশেষ জানা যাইবে।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আচার্য্য ঔর্ণবাভের মতে বিষ্ণু অস্তাচলে গয়শিরে এক পাদ বিক্ষেপ করেন। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন, এই গয়শির শব্দ পাইয়াই বোধ হয় গয়া-মাহাত্ম্য ও গয়াসুরের উপাখ্যান বিরচিত হইয়াছে। এইরূপ অনুমান কোনক্রমেই অসম্ভব বা অসঙ্গত নয়। *

* নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে নানা উপাদান সংগৃহীত:—উইণ্টারনীট্‌স: সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস; ঘাটে: ঋগ্বেদ; গিরিন্দ্রশেখর বসু: পুরাণপ্রবেশ; অক্ষয় দত্ত: উপাসক সম্প্রদায়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ ও ভাবধারা অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে। আপন প্রয়োজনমত বহু সংস্কৃত শাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করায় বাংলা দেশে আর্য্য-সংস্কৃতির একই ধারা প্রবাহিত। জনসাধারণের মনোরঞ্জনের মধ্য দিয়া আর্য্য-সংস্কৃতির যে ধারা পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থসকল প্রচারিত করিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে অপর এক শ্রেণীর গ্রন্থ ইহার অনুসরণ করিয়া এই ধারাকে বাঙালীর চিত্তে শাশ্বত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালি-গান নামে পরিচিত। পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তাই একটি ভাবগত ও ধর্ম্মগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মঙ্গল শব্দের সাধারণ অর্থে ইহা শুভজনক ক্রিয়াদ্বারা আরম্ভ অথবা দূরতম অর্থে স্তুতিগান। কিন্তু পাঁচালির অর্থ কি, তাহা আজও নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনেকে মনে করেন, এই শ্রেণীর পালা-গান পাঞ্চাল দেশ হইতে আসিয়াছে। এজন্য ইহাদের নাম পাঞ্চালী>পাঁচালি। আবার, অনেকে বলেন, পদ-চালনা করিয়া করিয়া এই গান গীত হইত বলিয়া, ইহাদের নাম পাঁচালি। এই জাতীয় ব্যাখ্যা নিতান্ত কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়।

বাংলা অলঙ্কার বিষয়ে কোনও প্রাচীন গ্রন্থ নাই; কোনও প্রাচীন গ্রন্থে বাংলা কাব্যের লক্ষণ অথবা ধর্ম্মের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বৈষ্ণবকবি নরহরি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত গীতচন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থের খণ্ডিত পুথি ত্রিপুরা আগরতলা ও বরাহনগর পাটবাড়িতে পাইয়াছেন। (সাপ্তাহিক দেশ, ২য় বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, পৃ. ৫৪)। এই গ্রন্থে কাব্যের ভেদ করা হইয়াছে—চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পাঞ্চালী। গ্রন্থকর্ত্তা পাঞ্চালীর লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন—

বহুপদে পাঞ্চালী শাস্ত্রেতে নিরূপয়।
সধ্রুব অধ্রুব সে দ্বিবিধ সুনিশ্চয়॥
এ সুলভ গৌড়ে পাঞ্চালী প্রসিদ্ধ হয়।
ঐছে ভাষান্তরে কবি যথেচ্ছা বর্ণয়॥
দিব্য গীত জানহ মানুষ গীত আর।
দিব্য মানুষ গীত এ তিন প্রকার॥
সংস্কৃত দিব্য প্রাকৃত মানুষ কয়।
সংস্কৃত প্রাকৃতে দিব্য-মানুষ হয়॥
দেশ ভাষা বর্ণনে মানুষ কহে কেহো।
দেশ অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গাদি ব্যক্ত সেহো॥
যে দেশে যে ভাষা সেই দেশে সে সুন্দর।
সে সে ভাষাতে কাব্য রচে কবীশ্বর॥

কিন্তু ইহাতে পাঁচালির নায়ক কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়। দেবতা, মানুষ বা মনুষ্যরূপী দেবতা ইহার নায়ক হইবেন। তবে আর একটি কথা হইতেছে এই যে, পাঁচালিতে বহু পদে আখ্যানবস্তু বর্ণিত হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এক অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"প্রাচীন আখ্যানময় ধর্মমূলক কাব্য রচনা করিবার ধারা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, বিভিন্ন দেবতার এবং তাঁহাদের আশ্রিত বা অনুগৃহীত পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র লইয়া ধর্মমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কতকগুলি কাব্যগ্রন্থে, যেগুলিকে লক্ষণ ধরিয়া, আমরা 'মঙ্গলকাব্য' নাম দিয়া একটি পর্যায়ে ফেলিতে পারি। * * * 'পদ বা পদাবলী' শব্দ, এবং 'মঙ্গল' শব্দ,—এই শব্দদ্বয়, * * দুই বিশেষ প্রকারে শ্রব্য-কাব্য সম্বন্ধে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বেই বাঙ্গালা ভাষায় রূঢ়ী হইয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা বৌদ্ধ চর্যাগান, উক্ত গানসমূহের টীকায় 'পদ' আখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। জয়দেব কবি সংস্কৃতে যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য লিখিলেন, তাহার 'গীতগোবিন্দ' নাম সার্থক হইল এই জন্য যে, ঐ মঙ্গলকাব্য 'উজ্জ্বল-গীতি' ('শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদম্ মঙ্গলম্ উজ্জ্বল-গীতি')। * * জয়দেবের গীতগোবিন্দে একাধারে আমরা 'মঙ্গল' এবং 'পদাবলী' পাইতেছি।"

কি কি লক্ষণ ধরিয়া কাব্যগুলিকে এক পর্য্যায়ে ফেলা হইবে—সুনীতিবাবু স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই। তবে তাঁহার অভিভাষণ হইতে মঙ্গলকাব্যের আর একটি লক্ষণ আমরা পাই যে, মঙ্গলকাব্য উপাখ্যানমূলক পালাগান; ইহাতে 'দেব-চরিত্র বর্ণনা' অথবা 'আদর্শ মানব-চরিত্র অঙ্কন' করা হইবে।

এই সবগুলি স্মরণ রাখিয়া প্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলির সূচীপত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পুরাণের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও পাঁচটি লক্ষণ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আপাতত এই পাঁচটিকে মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ বলা যাইতে পারে—

১। সকল জনপ্রিয় দেবতাদিগের স্তুতিরূপ মঙ্গলাচরণ দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ।

২। দেবতাবিশেষের মাহাত্ম্য-বর্ণন ও পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থের উৎপত্তি।

৩। দৈব-লীলায় ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্য-বিপর্য্যয়।

৪। সুখদুঃখের বিশদ বর্ণনা (বারমাস্যা প্রভৃতি)।

৫। শৃঙ্গার ও হাস্য রসাশ্রিত কলহাদি ঘটনার সমাবেশ (সম্ভবত পালাগানকে জনপ্রিয় করিবার জন্য)।

মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়সূচীর বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উপপুরাণ শ্রেণীর গ্রন্থে ঘটনার যেরূপ সমাবেশ, মঙ্গলকাব্যেও সেইরূপ। কাজেই এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয় যে, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য একজাতীয় গ্রন্থ। পুরাণের ন্যায় ইহাও পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহার অপর নাম পাঁচালি।

মঙ্গলকাব্যের পাঁচটি লক্ষণ আপাতত নির্দ্দেশ করিবার একটি কারণ আছে। মঙ্গলকাব্যকে আমরা বর্ত্তমানে যে আকারে পাই, তাহা যে উহার আদি রূপ—এ কথা জোর করিয়া বলা যায়। বরং ইহা রূপ-পরিবর্ত্তন দ্বারা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত। অনেকে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে একটি মঙ্গলকাব্য বলেন। ইহা আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত। ইহার সহিত পরবর্ত্তী কালে রচিত যে সমস্ত গ্রন্থকে মঙ্গলকাব্য বলা হয়, তাহাদের পার্থক্য অত্যন্ত

স্পষ্ট। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের হয়তো অন্য পাঁচটি প্রধান লক্ষণ ছিল ; ইহাদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপে যে পাঁচটি স্পষ্ট লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহাদেরই আমরা মঙ্গলকাব্যের লক্ষণ বলিয়া আপাতত নির্দ্দেশ করিলাম।

পুরাণ অবলম্বনে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে ; কিন্তু সকল সময়ে পুরাণবর্ণিত কাহিনী ঠিক-ভাবে রক্ষিত হয় নাই। মঙ্গলকাব্যের রচনাকার স্বীয় কল্পনার রঙে কাব্যের কাহিনীকে রঞ্জিত করিয়াছেন ; অনেক সময়েই এই রঙ অতিরিক্ত মাত্রায় হইয়াছে। ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা পুরাণ হইতে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপেই নূতন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, পুরাণবর্ণিত কাহিনীগুলির মূল প্রায়ই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু উহা ক্রমশ রঞ্জিত হইয়া তিল-প্রমাণ বস্তু তালে পরিণত হইতেছে ; ইহা যখন পুরাণকারের নিকট আসিল, তখন অতিমাত্রায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। একে পুরাণেই অতিরঞ্জিত অত্যন্ত অধিক, তাহার উপর মঙ্গলকাব্যের কবিগণের হাতে ইহারা এরূপে রঞ্জিত হইল যে, অতি-প্রাকৃত দৈবী-লীলা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না, যাহা মানবীয়।

বিষ্ণুর কথা ঋগ্বেদ হইতে পুরাণে কিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে। শাস্ত্রকার বলেন, বিষ্ণুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণলীলা কি আকারে বাংলা মঙ্গলকাব্যে স্থান পাইয়াছে, আমরা এখন তাহাই আলোচনা করিব।

কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।—

(১) মহাভারত ; (২) হরিবংশ ; (৩) পুরাণ (ক) ব্রহ্ম, (খ) পদ্ম, (গ) বিষ্ণু, (ঘ) বায়ু, (ঙ) শ্রীমদ্‌ভাগবত, (চ) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, (ছ) স্কন্দ, (জ) বামন, (ঝ) কূর্ম্ম।

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ এই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণলীলা রচনা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই ; তবে তাঁহারা কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এখন আমরা এই বৃন্দাবন-লীলার মৌলিকত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। পুরাণাদিতে বৃন্দাবন-লীলার সবিস্তার বর্ণনা আছে ; কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে কেবল মাত্র গোপীলীলাই বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। এই গোপীলীলার ইতিহাসও বিচিত্রভাবে সৃষ্ট ও পল্লবিত হইয়াছে।

কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন,—"এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তারপর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্রোত বহিয়াছে।" বঙ্কিমচন্দ্র অল্প কথায় যে সত্যটি প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহাকেই বিশদ করিবার চেষ্টা করিব।

মহাভারতে গোপীগণের কোনও উল্লেখ নাই। মহাভারত রচনাকালে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-গোপীগণ-ঘটিত লীলার কথা প্রসিদ্ধ থাকিলে সভাপর্ব্বের শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণনিন্দাকালে শিশুপাল কৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার এরূপ সুযোগ কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। তবে, দ্রৌপদী বস্ত্রহরণকালে কৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে এক স্থানে "গোপীজনপ্রিয়"

বলা হইয়াছে। গোপ-গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ প্রাচীন এবং প্রামাণিক সন্দেহ নাই, কিন্তু গোপীগণের সহিত তাঁহার রতিক্রীড়া একটি অভিনব সৃষ্টি।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাস-ক্রীড়া করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। রাসের অর্থ কি, তাহা শ্রীধরস্বামী বুঝাইতেছেন—'অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদো রাসো নাম।' অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের হাত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। ইহাকেই হরিবংশে হল্লীষ বলা হইয়াছে।

এই বর্ণনায় সংস্কৃত রম্‌-ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার সাধারণ অর্থ ক্রীড়া; কিন্তু ইহাকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে নানা উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে।

হরিবংশে এই হল্লীষের যে বর্ণনা আছে, তাহা বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। ইহার হেতু আছে। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থ দুইটি পরস্পরের প্রতিপূরক। এখানে যাহা সবিস্তারে বর্ণিত, ওখানে তাহা সংক্ষিপ্ত। উভয় গ্রন্থ সমগ্রভাবে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কবিত্বে, গাম্ভীর্য্যে, পাণ্ডিত্যে এবং ঔদার্য্যে হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা অনেক লঘু। হরিবংশকার বিষ্ণুপুরাণকারের রাসবর্ণনার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়া বুঝেন নাই। ফলে, বিষ্ণুপুরাণের চপলা বালিকা হরিবংশে বিলাসিনীরূপে চিত্রিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। ভাগবতকার গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন।

১০ম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায়ে প্রথমে গোপীদিগের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে এবং তারপর বস্ত্রহরণ-উপাখ্যান দ্বারা গোপীগণের কৃষ্ণপ্রীতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে।

কথিত হইয়াছে যে, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পতিত্বে একটা ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ রহিয়াছে। কাজেই, সেই ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ভাগবতের রাসবর্ণনায় প্রবেশ করিয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের রাসবর্ণনায় লিখিত হইয়াছে—

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্ক রেখাবন্তালি পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃত গামিনঃ॥
কাপিতেন সমং যাতা কৃত পুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্য স্তনূনিচ॥

এই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশরেখাবন্ত পদচিহ্ন সকল লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের। কোন পুণ্যবতী মদালসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্নগুলি তাহারই।

ঘটনাটি অতি সামান্য; ইহা গোপীগণের মনের একটি ভাব ব্যক্ত করিতেছে মাত্র। কিন্তু এখানে একটু সম্ভাবনার আভাস পাইয়া ভাগবতকার তাঁহার হস্তাবলেপন দ্বারা বিষয়টিকে ঘোরালো করিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণের সঙ্গসুখে নিজেদের সৌভাগ্যে গর্ব্ব অনুভব করায় তাহা দূর করিবার জন্য তিনি অদৃশ্য হইলেন। কাতর ক্রন্দন ও অনুনয়ে ডাকিতে ডাকিতে গোপীগণ খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করিল এবং অবশেষে তাঁহাকে পুনরায় দেখিতে পাইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার এই মস্ত সুযোগ কোনমতেই

ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি লিখিলেন যে, গোপীগণ খুঁজিতে খুঁজিতে কৃষ্ণকে পাইল বটে, কিন্তু দেখিল যে, তিনি অপর একজন গোপীকে লইয়া সেখানে বিরাজ করিতেছেন; এই গোপীই রাধা। রাধাকে আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই সর্ব্বপ্রথম পাই।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহে আমরা পাই যে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার মাত্র! কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাই যে, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে আর কৃষ্ণ ইহার বহু উচ্চে, গোলোকে রাসমণ্ডলে। কৃষ্ণ কেবল বিষ্ণুকে নয়, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি সকল দেবদেবীকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃষ্ণের আবাসস্থান গোলোকে গো, গোপ ও গোপীগণ বাস করে। এই গোলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই রাধা, ইনি কৃষ্ণপ্রিয়া।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে রাধাই কেন্দ্রস্বরূপ। ইহাকে লইয়া বৈষ্ণবকবিগণ ইচ্ছামত ঘটনা সৃষ্টি করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। জয়দেব তাঁহার 'শ্রীগীতগোবিন্দমে' ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকেই মূলত আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যকে আশ্রয় করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ নূতন কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কালের ঘটনার পরিবর্ত্তন হইয়া শেষে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিষ্ণুও নাই, কৃষ্ণও নাই; সেখানে কানু বা কানাই ওরফে কালাচাঁদ রাধার সহিত প্রেমের চাতুরিই করিতেছেন।

বাংলা মঙ্গলকাব্য রচনার ইহাই উপাদান। অন্য সকল মঙ্গলকাব্য রচনার উপাদানের ইতিহাস প্রায় এইরূপ।

বৃথা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

কবিতা তো মোর উড়িয়া পড়ে না নীল প্রজাপতিসম
কালো চোখে আর পিঠেতে ছড়ানো চুলে তব অনুপম।
কবিতা তো মোর থাকিতে পারে না মিশিয়া তাহার মত
চূড়াসম কালো চুলের উপরে তব রূপধ্যানে রত।

কবিতা তো মোর মধুপের মত ক্ষণে ক্ষণে কানে কানে
ভরিতে পারে না মন তব প্রিয়া, সুরে সুরে গানে গানে।
কবিতা তো মোর পাপড়ির মত রহে না আড়াল ক'রে
কমনীয় তব মধুলাবণ্য কমলাননের 'পরে।

কবিতা আমার ঝরিতে পারে না সাদা শেফালির মত
চুলে, চোখে, কোলে, আঁচলে তোমার সারাদিন অবিরত।
শিশিরে ভিজিয়া কবিতা তো মোর তোমার পায়ের তলে
শেফালির মত রাঙিয়া ওঠে না অলক্তে পলে পলে।

মিছে কেন তবু গাঁথি ব'সে এই কথার উপরে কথা,
বাঁধা যদি তাতে নাহি পড়ে প্রিয়া তোমার চঞ্চলতা;
মনের গভীর অতলে তোমার ডুবিতে পারি না যদি,
ধ্বনির সায়রে সন্তরি শুধু কেন ফিরি নিরবধি!

ধূলা লাগিতেছে

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি. টি. এম.

এই পৃথিবী নিতান্তই ধূলিময়। সুসভ্য লণ্ডন ও নিউইয়র্ক শহরেরও ধূলা, আবার অতি অসভ্য বাংলা দেশের নিশ্চিন্তপুর গ্রামেও ধূলা। কম বেশি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। শহর গ্রাম বন জঙ্গল সর্বত্রই ধূলায় ধূসর। গ্রামদেশের ধূলা বরং তবু ভাল, ঝড়ো হাওয়া না উঠিলে বড় উড়ে না, কিন্তু শহরের ধূলা নিত্যই উড়িতেছে, এক মিনিট যাবত স্থির হইয়া মাটিতে পড়িতে পায় না। মানুষের হুড়াহুড়িতে, ট্রাম বাস ও মোটর গাড়ির দৌড়াদৌড়িতে, ইলেক্ট্রিক পাখার ঘূর্ণনে, কলকারখানার চিমনিগুলার উদ্গীরণে ধূলা ক্রমাগতই পাক খাইয়া উড়িতেছে। আমরা সভ্য হইয়া জুতা পরিয়া কেবল মাত্র নিজেদের পদধূলাই নিবারণ করিয়াছি, কিন্তু গায়ে মাথায় যে নিত্য ধূলা লাগিতেছে, তাহার কিছুই নিবারণ করিতে পারি না। সভ্যতার নিদর্শন যদি হয় পরিচ্ছন্নতা, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সম্পূর্ণ সভ্য হইতে এখনও আমাদের অনেক দেরি। আমরা যখন সম্পূর্ণ সভ্য হইব, তখন হয়তো আমাদের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ধূলার অস্তিত্বই থাকিতে দিব না। বর্তমান যুগের চিন্তাশক্তিশালী মনীষী এইচ. জি. ওয়েল্‌স সহস্র বৎসর পরবর্তী আদর্শ বৈজ্ঞানিক জগতের কল্পনা করিয়াছেন। সে জগতের লোক নাকি সম্পূর্ণরূপে আধিব্যাধিশূন্য হইবে। তাহা যদি হয়, তবে নিশ্চয়ই সেই জগতে উড়ন্ত ধূলার কোন অস্তিত্বই থাকিবে না, যাহা কিছু ধূলা সমস্তই কোন উপায়ে সম্ভবত এঁটেল মাটির মত সর্বদা পৃথ্বিসংলগ্ন হইয়া থাকিবে।

কিন্তু ধূলার উপর এত আক্রোশ কেন? ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার যে, ধূলাময়লার মধ্য দিয়া বহুতর রোগ শরীরে প্রবেশ করে, উহা যদি কোনমতে একেবারে নিবারণ করা যায়, তবে রোগ প্রবেশ করিবার সম্ভাবনাও একেবারে কমিয়া যাইবে। বর্তমান কালের উন্নত সার্জারি-বিদ্যার ইহাই মূলমন্ত্র। এই কথা নিশ্চিতরূপে জানেন বলিয়াই কেবল ধূলাময়লা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সার্জনগণ নিশ্চিন্ত মনে শরীরের মধ্যে যথা ইচ্ছা অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারেন এবং তাহা হইতে কোনও বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা করেন না। ধূলাময়লার মধ্যে যে নিজস্ব কোন দোষ থাকে, তাহা নয়। কিন্তু উহার মধ্যে থাকে নানারূপ রোগের বীজ। ধূলাই এত সূক্ষ্ম বস্তু যে, নিতান্ত অনেকটা পরিমাণে না উড়িলে তাহা আমরা চোখে দেখিতেই পাই না। বাতাসে নিত্যই যে কিছু কিছু ধূলা উড়িতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা কি আমরা চোখে দেখিতে পাই? অথচ তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্টই পাইয়া থাকি। আবার ধূলার অপেক্ষাও রোগের বীজ অনেক সূক্ষ্ম বস্তু। যত পরিমাণেই উহা ধূলার মধ্যে মিশিয়া থাক, আমাদের কাছে তাহা গোচর হইবার উপায় নাই। বোধ করি, বিধাতা ইহা ভালই করিয়াছেন, কারণ আমাদের চোখের লেন্স্ যদি অণুবীক্ষণযন্ত্রের লেন্সের মত শক্তিশালী হইত, তাহা হইলে নিত্যই দেখিতে পাইতাম যে,

প্রতি মুহূর্তে বাতাসের সহিত কত ধূলা আসিয়া গায়ে লাগিতেছে ও নাকের মধ্যে ঢুকিতেছে, এবং তাহার সহিত কত রোগের বীজাণু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তাহা হইলে আমরা ভয়েই মরিয়া যাইতাম। একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের শিশুপুত্র একদিন ধূলা লইয়া খেলা করিতেছিল। তাঁহার হঠাৎ কি খেয়াল হইল, তিনি ঐ ধূলা অল্প পরিমাণে লইয়া অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে বসিয়া গেলেন। পরীক্ষার দ্বারা অবশেষে দেখিলেন যে, ঐ একটু ধূলার মধ্যে সংখ্যায় প্রায় এক কোটি বীজাণু রহিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে আছে টিটেনাস, নিউমোনিয়া, বসন্ত, আমাশা, ডিফথীরিয়া ও যক্ষ্মারোগের বহু পরিচিত বীজাণু। বৈজ্ঞানিক মহোদয়ের যে কয় রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়াছিল, সে সংবাদ আমরা জানি না।

কিন্তু ধূলা ময়লার মধ্যেই বা বিশেষ করিয়া এত রোগের বীজাণু আসিয়া জোটে কোথা হইতে? পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল যে, রোগসমূহের হয়তো কিছু অদৃশ্য রকমের বিষ আছে, তাহা দূষিত হাওয়ার সহিত উড়িয়া আসে, দূষিত জলের সহিত ভাসিয়া আসে, কিম্বা কোথা দিয়া কেমন করিয়া আসে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। কিন্তু আজকাল আবার বীজাণুর কথা শুনিয়া শুনিয়া অনেকের ধারণা জন্মিয়া যাইতেছে যে, উহা অনির্দিষ্ট প্রকারের বিষ নয় বটে, তবে নির্দিষ্ট প্রকারের বীজাণু, আর আমরা যেমন চলৎশক্তিবিশিষ্ট বুদ্ধিমান জীব, উহারাও বুঝি তেমনই চলৎশক্তিবিশিষ্ট বুদ্ধিমান জীব। আমাদের শিশুরা যেমন ধূলা লইয়াই খেলা করিতে ভালবাসে, উহারাও বুঝি তেমনই ধূলার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে; সুতরাং নিতান্তই মুস্কিল এই যে, সর্বদাই আমাদের ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইবে, কারণ কোথায় কোন্ অদৃশ্য বীজাণু ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, তাহা জানা নাই, অজানিতে কাহারও কাছাকাছি হইবামাত্র হয়তো তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া আসিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনর্থ ঘটাইবে। খানিকটা সত্যের সহিত অনেকটা কল্পনা মিলাইয়া আমরা যে এই প্রকার ধারণা কতই করিয়া থাকি, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। কিন্তু বীজাণু এইরূপ কোনও হিংস্র প্রাণী মোটেই নয়। বস্তুত অধিকাংশ রোগ-বীজাণু প্রাণীই নয়, উহারা সম্পূর্ণ অসাড় এবং নিষ্ক্রিয়, চলৎশক্তিও নাই, চৈতন্যও নাই। নানাবিধ গাছগাছড়ার বীজও যেমন, নানাবিধ রোগের বীজও তেমন। প্রকৃতপক্ষে দুইই সমজাতীয় ও সমধর্মী। গাছের বীজ মাটিতে প্রোথিত হইলে তবেই শিকড় গাড়ে ও গাছ জন্মায়, নতুবা কিছুই না। রোগের বীজও শরীরে প্রবেশ করিলে তবেই শিকড় গাড়ে ও রোগ জন্মায়, নতুবা কিছুই না। গাছের বীজও যেমন গাছ হইতেই ঝরিয়া পড়ে, উহার মধ্যে অনেক নষ্টই হইয়া যায়, দৈবাৎ যাহা মাটিতে পুঁতিয়া যায়, তাহা হইতেই পুনরায় গাছ জন্মায়,—রোগের বীজও তেমনই রোগ হইতেই ঝরিয়া পড়ে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়, দৈবাৎ যাহা মানুষের শরীরে ঢুকিয়া যায়, তাহা হইতেই রোগ জন্মায়। শরীরের বাহিরে উহারা সম্পূর্ণ নিরীহ এবং জড়বৎ, কোনও চেষ্টার দ্বারা কোথাও প্রবেশ করিবার শক্তি নাই, কিন্তু দৈবাৎ প্রবেশ করিলে তখন আপনাপন প্রকৃতি অনুযায়ী ক্রিয়া করিতে পারে।

ধূলা ঘাঁটিতে বসিয়া বীজাণুর অবতারণা করা সম্ভবত আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু কি করিব? ধূলা উঠাইতে গেলেই উহার সহিত বীজাণু উঠিয়া আসে। তাই তো বলিতেছিলাম, ধূলার

মধ্যে এত বীজাণু আসে কোথা হইতে? অবশ্য তাহা রোগমুক্ত ও সদ্যরোগমুক্ত রোগীর শরীর হইতে আসে। আমরা যে সকল বস্তু সর্বদা বর্জন করি, অর্থাৎ কাছে থাকিতে না দিয়া দূরে সরাইয়া ফেলিয়া দিই, তাহাকে বলি আবর্জনা। এই আবর্জনা বাহিরেও যেমন চারিদিকে অনেক জমা হয়, শরীর হইতেও তেমনই অনেক বাহির হয়। এই আবর্জনা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়া জমে? সমস্তই এই ধূলায়। যাহা কিছু ফেলিয়া দিয়া মনে করিলাম, আপদ দূর হইল, তাহা নানারূপ বিচিত্র অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত গুঁড়া হইয়া ধূলাতে গিয়াই দাঁড়াইল। আমাদের শরীরের মলমূত্র নিষ্ঠীবন বা সম্পূর্ণ মৃতদেহ, সমস্তেরই ঐ গতি, সমস্তই শুকাইয়া গুঁড়া হইয়া ধূলাতে গিয়া মিশিবে। এখন যদি হিসাব করিয়া দেখি, পৃথিবীতে কত মানুষ এবং কত অন্যান্য প্রকারের জীব, তাহাদের মধ্যে কত রোগ জন্মিতেছে ও কত মৃত্যু হইতেছে এবং প্রত্যেক ঘটনাতেই কত অসংখ্য রোগবীজের মুক্তি হইতেছে; যদি ধারণা করিয়া দেখি, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক রোগের যত কিছু আবর্জনা শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাসী ধূলায় গিয়া জমা হইতেছে, তাহা হইলে অল্পটুকু ধূলার মধ্যে যে এক কোটি বীজাণু থাকিবে, ইহা অনুধাবন করা কিছুই কঠিন নয়।

কিন্তু তাহা যেন হইল। বাতাসে নিত্য ধূলা উড়িতেছে, নানাবিধ রোগের অসংখ্য বীজাণু উহার সহিত নিত্য উড়িয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের গায়ে লাগিতেছে, নাক দিয়া ঢুকিতেছে, মুখ দিয়াও খাইয়া ফেলিতেছি, তথাপি আমরা বাঁচিয়া আছি কেমন করিয়া? বিজ্ঞানের নির্ণয় সত্য হইলে এ বড় সমস্যার কথা। অবশ্য আমরা প্রায়ই রোগে ভুগিয়া থাকি এ কথাও সত্য, ভুগিতে অক্ষম হইলে মরিয়া যাই এ কথাও সত্য, কিন্তু তবুও দেখিতে পাই যে, যতদিন বাঁচিয়া আছি, তাহার অধিকাংশ সময় চারিদিকের ধূলা খাইয়াও সুস্থ থাকি এবং এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া আপনাপন কাজকর্ম করিয়া স্ফূর্তি করিয়া বেড়াই। অথচ ধূলা যে নিত্যই লাগিতেছে, বীজাণুও কত তাহার সহিত আসিতেছে, এ কথা নিশ্চয়। একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গায়ের যে কোন স্থান হইতে এক বিন্দু ময়লা উঠাইয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে চড়াইলেই দেখা যাইবে, তাহার মধ্যে স্ট্রেপ্টোকক্কাস ও স্ট্যাফিলোকক্কাসের ছড়াছড়ি,—যা ফোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কোন মারাত্মক রোগ নাই, যাহা এই বীজাণুগুলির দ্বারা সম্ভব না হইতে পারে। অথচ উপস্থিত তো কোন রোগবালাই নাই, দিব্য সুস্থ শরীরেই আছি। নাকের ভিতর হইতে অল্প একবিন্দু সিক্নি লইয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, তাহার মধ্যে কত রকমের কত বীজাণু, সর্দি কাসি হইতে আরম্ভ করিয়া নিউমোনিয়া এবং মেনিঞ্জাইটিস রোগের বীজাণুও হয়তো তাহার মধ্যে পাওয়া গেল, অথচ উপস্থিত আমার একটি হাঁচিও হয় নাই। গলার ভিতর হইতে তুলির স্পর্শের দ্বারা একবিন্দু রস উঠাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও ঐ সকল বীজাণু পাওয়া যাইবে, অথচ গলায় কোন পীড়াই নাই। বুঝা যাইতেছে যে, ধূলার সাহায্যেই ইহারা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি এখনও পর্যন্ত রোগ হইল না কেন?

প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে বিপদও যত আছে, তাহার প্রতিবিধানও তত আছে। লীলাময়ী এক দিকে করে সমস্যার সৃষ্টি, অন্য দিকে করে তাহার সমাধান, এবং এই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই

জীবনচক্র ঘুরিতে পারে। কথাটা হয়তো দর্শনঘেঁষা হইয়া গেল, কিন্তু এমন করিয়া না বলিলে কথাটা আপনারা বুঝিবেন না। আমাদের শরীর এক দিকে যেমন বীজাণু উপ্ত হইবার পক্ষে উর্বর, অন্য দিকে তেমনই উহার এক প্রকার প্রতিরোধশক্তি আছে, যাহার বলে বীজাণু আসিলেও তাহাকে উহা নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতে পারে। এই প্রতিরোধশক্তির অনেক গুণ, কিন্তু সে সকল কথায় এখন আমাদের কাজ নাই। মোটের উপর, এই শক্তি ভিতর হইতে শরীরের নানা স্থানে যেন লক্ষ্মণের গণ্ডির মত কতকগুলি গণ্ডি টানিয়া রাখিয়া দিয়াছে, মায়াবী বীজাণু-রাক্ষস যতই কেন আসুক না, ঐ গণ্ডি পার না হওয়া পর্য্যন্ত সীতাহরণের কোনও আশঙ্কা নাই।

কতকগুলি ঐ প্রকার স্বাভাবিক গণ্ডির কথা বলি। যেমন মনে করুন, আমাদের গায়ের চামড়া। এই চামড়া যে আমাদের শরীরের কত বড় বর্ম তাহা সহজ অবস্থায় আমরা বুঝিতে পারি না, বুঝিতে পারি যখন কোথাও একটু কাটিয়া ছিঁড়িয়া যায়। চামড়ার এক আশ্চর্য গুণ এই যে, শরীরের ভিতরের অনেক ময়লাই সে ঘমরূপে বাহির হইতে দিবে, কিন্তু বাহিরের কোনও ময়লার এক কণাও সে ভিতরে ঢুকিতে দিবে না। বাহিরের অনেক ময়লাই চামড়ার উপর আসিয়া জমিতেছে, ধূলার সঙ্গে অনেক বীজাণুই গায়ের ঘামের সহিত জড়াইয়া চামড়ার উপর লেপিয়া থাকিতেছে, কিন্তু তথাপি তাহার ভিতরে ঢুকিবার উপায় নাই। কিন্তু যদি কোথাও কাটিয়া গেল বা ছিঁড়িয়া গেল, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার গণ্ডিও ভাঙিয়া গেল, চামড়ার উপরকার বীজাণু তখন ঐ ভাঙনের মুখ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন সেখানে ঘা হইল, পুঁয হইল, অথবা তাহা হইতে টিটেনাস, রক্তদুষ্টি এবং মারাত্মক অনেক কিছুই ঘটিতে পারিল। তেমনই নাকের মধ্যেও কয়েক প্রকার গণ্ডি আছে। নাকের মধ্যে রোম থাকে, তাহাতে কতক ময়লা আটকায়। নাকের মধ্যে ঝিল্লির আবরণ আছে, তাহাও বীজাণুদের আটকাইয়া রাখে, ভিতরে ঢুকিতে দেয় না। প্রশ্বাসবায়ুর অক্সিজেন প্রায়ই উহাদের নষ্ট করে। যদিও কোন বীজাণু শ্বাসনালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করে, তাহাও অক্সিজেনের দ্বারা নষ্ট হয়। আমরা যদি এক ঘণ্টাকাল দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া তাহার পর দুই ঘণ্টা মুক্ত বায়ু গ্রহণ করিতে পারি, তবে উহার দ্বারা দূষিত বায়ুর যত কিছু বীজাণু ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, সমস্তই মরিয়া যাইতে পারে। বীজাণু প্রবেশ করিবামাত্রই যে তাহারা কাজ আরম্ভ করিতে পারে, এমন নয়। বৈজ্ঞানিক বলেন, যক্ষ্মাবীজাণুও ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে স্থান করিয়া লইতে পারে না, এগারো দিন পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারিলে তৎপরে আপন শিকড় গাড়িতে সুরু করে। ইহার মধ্যে যদি ফুস্‌ফুসে যথেষ্ট অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং উহাদের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, তবে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করা সত্ত্বেও উহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। এত প্রকার গণ্ডি অতিক্রম করিয়াও যখন উহারা টিকিয়া যাইতে পারে, তখনই জন্মায় রোগ, নতুবা নয়।

মুখ দিয়া আমরা যে সকল বীজাণু ধূলাবালির সহিত গলাধঃকরণ করিয়া ফেলি, তাহারাও সহজে নিষ্কৃতি পায় না। পাকস্থলীর মধ্যে থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তাহা অতীব বীজঘ্ন। ঐ অ্যাসিডের পাহারা পার হইয়া যাওয়া খুবই কঠিন। তথাপি যেগুলি দৈবাৎ পার হইয়া যায়, তাহারাই অতঃপর রোগ জন্মায়।

যাক, এক দিকে রহিয়াছে রোগের বীজাণু, অন্য দিকে রহিয়াছে প্রতিরোধশক্তি, মাঝখানে রহিয়াছে শরীরদুর্গ, উহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের দিক দিয়া কি কিছুই করিবার নাই? দেখা যাইতেছে যে, বীজাণু-সংক্রমণের সহিত প্রতিরোধশক্তির সংগ্রাম নিত্য এবং অবশ্যম্ভাবী। বীজাণুও নিতান্ত নিরাপদ নয়, প্রতিরোধশক্তিও সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়। অতএব আমাদের যথাসম্ভব সাবধান থাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। বীজাণুকুলকে একেবারে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই সুবিধা হইত, কিন্তু আপাতত তাহা অসম্ভব। ধূলা উড়িবেই, তাহার সঙ্গে বীজাণুও আসিবেই। সব দিক দিয়াই উহারা আসিতে পারে,—খাদ্য, পানীয়, রোগীর সংস্পর্শ, মশা, মাছি প্রভৃতি বহু প্রকারের বাহনই উহাদের আছে এবং প্রবেশের পথও বহু প্রকারের আছে, তন্মধ্যে উপস্থিত কেবল একটা দিকের কথাই বলা হইতেছে। মোটের উপর, উহাদের সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করা যায় না। দ্বিতীয় উপায়, প্রতিরোধশক্তিকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য করা। তাহাও আমাদের সাধ্যের অনায়ত্ত। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইহার ভার লইয়াছে এবং নানারূপ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে। হয়তো এমন দিন আসিবে, যখন সকল রোগেরই প্রতিরোধশক্তি নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করিয়া লইয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। কিন্তু এখনও তাহার যথেষ্ট বিলম্ব আছে। উপস্থিত আমরা কতটুকু করিতে পারি?

উপস্থিত আমরা শরীরদুর্গকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত রাখিব। যদি এইটুকু করিতে পারি, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ধূলা লাগিতেছে জানি, যথাসম্ভব তাহা লাগিতে দিব না। অঙ্গকে আবৃত করিয়া বাহির হইব, ধূলা উড়িতে দেখিলে নাসিকাকে আবৃত করিব, রোগীর হাঁচি-কাসির সম্মুখে নাক বাড়াইয়া দিব না, ধূলা উড়িয়া খাদ্যে পড়িতে দিব না, হাত না ধুইয়া কিছু খাইব না, এবং গাত্রচর্মকে যথাসম্ভব ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিব। ইহাতে সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা কাজ হইবে, কতকটা রোগ নিবারণ হইবে। এই কতকটা পর্যন্ত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা আমাদের ধর্ম। এইটুকু করিতে পারিলে প্রকৃতি বাকিটুকু করিয়া দিবে। হয়তো আমাদের চেষ্টাকে সজাগ রাখিবার জন্য প্রকৃতি এমন অদ্ভুত নিয়ম করিয়া লইয়াছে যে, অল্প দোষ হইলেই সে কাটাইয়া লইতে পারিবে, কিন্তু অধিক দোষ হইলে তাহা পারিবে না। অতএব আমাদের কেবল এইটুকুই দেখিতে হইবে যে, দোষ যেন অধিক হইয়া না পড়ে, উহা যেন অল্পের সীমা অতিক্রম না করে। ধূলা যেন অল্পই লাগে, অধিক না লাগিতে পায়।



বন্ধু

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

বন্ধুর পথে দাঁড়ায়ো বন্ধু, জীবনে মোর,
সৌম্য নয়নে জ্বালায়ো প্রেমের দীপশিখা,
মহাসাগরের গম্ভীরতার গান গেয়ে
উজ্জ্বল রেখো মরমের মণি-মঞ্জুষা।

বন্ধু, তোমায় খুঁজিতেছি জনসিন্ধুতে—
ঢেউ গুনে গুনে সমুখে যেটুকু দৃশ্যমান,
গভীরে সেথায় কি যে আছে হায় সঞ্চিত !
সন্দেহ জাগে সন্ধান মোর কল্পনা।

ঢেউ আসে পুন পিছু হ'টে হ'টে ফিরিয়া যায়,
সূর্য্যকিরণে ঝিকমিক করে বালুকাচর,
বিপুলোচ্ছ্বাসে পুন ফিরে আসে ফেনায়মান—
বন্ধু, তোমায় খুঁজে মরি সেই সিন্ধুতে।

মহাসাগরের প্রান্তসীমায় পাহাড়েরা
পাষাণ-প্রাচীরে ঘিরিয়া রেখেছে বেষ্টনী,
ওপারে হয়তো শস্যশ্যামল ধানের ক্ষেত
মলয়-পরশে ভূমিশয্যায় শিহরিছে।

বন্ধু, আমায় লয়ে চল সেই পল্লীতে,
মহাসাগরের কূলহীনতা যে সহে না আর !
জনসিন্ধুতে তুমি নাই ওগো বাঞ্ছিত,
তবু ঢেউগুলি সমুখে নাচিছে ফেনায়মান।

শঙ্খ কুড়ায়ে সিন্ধুর গান তবু শুনি,
রজতশুভ্র ঝিনুকের মায়া মরীচিকায়,
শামুকে রচিত তোমারি গোপন লিপিরেখা—
আজিও বন্ধু, পারি নি করিতে পাঠোদ্ধার।

গগনে উড়িছে আঁকা-বাঁকা ধূমকুণ্ডলী—
সোনালি মীনের চিতানল হতে উত্থিত,
ক্রুর "মুলিয়া"রা মত্ত বুঝিবা রন্ধনে,
সাগর-বাতাসে ধীবরের জাল রোদে শুকায়।

সাগরের পারে সবুজ বনের সীমারেখা,
বলাকা-পাখায় দিবস যেথায় বিলীয়মান,
মেঘের কাজলে বিদ্যুৎ যেথা দিশাহারা,
বন্ধু, আমায় ল'য়ে চল সেই প্রান্তরে

ত্রিকালদর্শী দূর-কাঞ্চনজঙ্ঘাতে
বহ্নি-তুষারে রূপান্তরিতা পার্ব্বতী—
মদনান্তকে স্মরিছে যেথায় রাত্রিদিন,
বন্ধু, আমায় লয়ে চল সেই তীর্থেতে।

শামুক কুড়ায়ে মহাসাগরের কূলে কূলে
রূপালি মীনের পাখনায় প্রেম অর্পিয়া
বন্ধু, তোমার উদ্দেশে দিনু ভাসায়ে আজ,
উজ্জ্বল কর এ বুকের মণি-মঞ্জুষা !

"কুশিক্ষার বিষময় ফলে আজকাল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতেছে। আগে এ সব ছিল না। এক পাড়ার পাশাপাশি বাড়ীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনমণ্ডলী খুব সদ্ভাবের সহিত বাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য একটা সম্পর্কও থাকিত। কুশিক্ষার ফলে—ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখন সে ভাব তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের কতকগুলি কুশিক্ষাপ্রাপ্ত লোক হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ জন্মাইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু-মুসলমান ভারতমাতার যুগল সন্তান, ইহারা পরস্পর ভাই ভাই। যতদিন এই জাতির মধ্যে ঐক্য, সখ্য, সাম্যভাব সংস্থাপিত না হইবে, ততদিন আমাদের মায়ের কল্যাণ নাই—দেশের কল্যাণ নাই।"

—কায়কোবাদ

কৃষ্ণা

শ্রী—

বর্ষার রবিবার। মামার বাড়ি হইতে খাইয়া আসিয়া ঘরের মধ্য চুপ করিয়া বসিয়া আছি। সকাল হইতেই বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। কখনও একটু কমে, আবার চাপিয়া আসে। নগেন ও ভবেশ আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। সিক্ত ছাতাটি এক পাশে খুলিয়া রাখিয়া জামা ছাড়িয়া নগেন বলিল, তুখানা কাপড় দে দেখি।

ভবেশ বলিল, বাপ, আমি আর বেরোচ্ছি না। সে কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, আঃ। তারপর কহিল, খাবার-টাবার কিছু আছে তো রে?

বলিলাম, তা আছে। ভয় নেই, তোকে শুকিয়ে থাকতে হবে না।

নগেন গল্প করিতে করিতে হঠাৎ বলিল, প্রশান্ত, বিয়ে করবি? এক ভদ্রলোক ভয়ানক ধরেছে রে।

আমি বলিলাম, মাপ কর ভাই, নিজে লেজ কেটেছ কেটেছ, আবার সবাইকে দলে টানার চেষ্টা কেন?

নগেন কহিল, তোরা বিয়ে না করলে মেয়েদের কি হবে?

বলিলাম, বিয়ে করলেই বা তাদের কি সুবিধেটা হবে? আমার কথাটাই ধর, পাই তো তিরিশ টাকা। কখনও যে বাড়বে তা মনে হয় না। এখন বারো টাকা ঘরভাড়া দিয়ে আর কি থাকে? এতে আমার নিজের কোন রকমে চলে যায়, তবু তো মামাদের ওখানে বিশেষ কিছু দিতে হয় না। আমার তো মনে হয়, এই সময় আবার বহুবিবাহ চালানো উচিত। তোমাদের খাওয়াবার সংস্থান আছে, তোমরা আরও গোটাকয়েক বিয়ে কর।

নগেন কহিল, বাপ, একটার ঠেলা সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে!

ভবেশ বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছে?

কহিলাম, নগেন তোর জন্যে একটি পাত্রী ঠিক করেছে, সেই কথাই বলছে।

ভবেশ বলিল, পাগল না ক্ষেপা! যা ঝড়-ঝাপটা আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, তারপর আর বিয়ে করা অসম্ভব। তা ছাড়া অবস্থারও আমার কোন পরিবর্তন হল না। হবেও না।

নগেন কহিল, এর মধ্যে ঝড়-ঝাপটা আবার কি গেল শুনি?

ভবেশ বলিল, সে অনেক কথা। শুনে কাজ নেই।

নগেন ছাড়িল না। অনেক পীড়াপীড়ির পর ভবেশ বলিল, দেখ, সব কথা বলতে কেমন লজ্জা হয়। তবে বলতে পারি এক সর্তে—এ নিয়ে বউয়ের কাছে গল্প করতে পারবি না। প্রশান্তকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু তুই বিয়ে করেছিস, তোকে বিশ্বাস করা অসম্ভব।

নগেন শপথ করিল।

ভবেশ বলিতে লাগিল। বাহিরের অশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের ঝিরঝির শব্দের মধ্যে ঘরের ভিতর আমাদের গল্প বেশ জমিয়া উঠিল।

ভবেশ বলিতেছিল—

বছর কয়েক আগে, তখন বাবা সবে মারা গেছেন, আমি আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি দুটি ছেলেকে পড়াতুম।

রাত্রে বরাবরই আমাকে দু জায়গায় পড়াতে হয়। তা না হলে কুলিয়ে উঠতে পারি না। আপিস থেকে চল্লিশ টাকা আর টুইশনি থেকে কুড়ি টাকা—এই তো আমার আয়। এর মধ্যে বাড়িভাড়াই দিতে হয় পঁচিশ টাকা। তার ওপর সেজদির ছেলেটার স্কুলের মাইনে আছে, মার রোগের চিকিৎসা আছে। ওদিকে মেজদির অবস্থা খারাপ, তারও ছেলের পড়ার খরচ-টরচ বাবদ পাঁচ টাকা করে মাসে পাঠাতে হয়। তা ছাড়া অসুখ-বিসুখ হলেই ভগ্নীপতিরা সবাইকে আমার এখানে পাঠিয়ে দেন। এদিকে বড়দিদি মারা যাবার পর থেকে তার মেয়েটিও আমাদের কাছেই থাকে। মাইনে যা পাই, তাতে অতি কষ্টে চালাতে হয়। সকালে অবশ্য আর কিছু করতে পারি না। ভাগ্নেটাকে পড়ানো, বাজার যাওয়া—এই করেই সকালটা কাটে।

হ্যাঁ, সেখানে তো পড়াই। একদিন রাত্রে—তখন সাড়ে নটা হবে—পড়িয়ে তেতলা থেকে নেমে আসছি। সিঁড়িটা অন্ধকার। হঠাৎ কে এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলে! আমি প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলাম, কিন্তু তার আগেই সে বললে, আমি কৃষ্ণা। তুমি আমাকে বিয়ে করবে বল? তবে ছাড়ব।

আমি তো ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলুম, ওপরে নীচে একবার চকিতে দেখে নিয়ে বললুম, ছাড় ছাড়, এখুনি কে এসে পড়বে! শেষে এক বিপদ হবে!

কৃষ্ণা বললে, না, আগে বল।

মহা মুস্কিলে পড়লুম। কি যে উত্তর দোব খুঁজে পেলুম না। কার পায়ের শব্দও যেন কানে এল। ব্যস্ত হয়ে বললুম, তার জন্যে আর কি, আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। এখন ছাড়, লক্ষ্মীটি, ঐ বুঝি কে এসে পড়ল!

যাই হোক, পায়ের শব্দ আরও কাছে এলে সে চট করে উঠে পড়েই ওপরে উঠে গেল। আমিও ছুটে নেমে গেলাম, প্রথমে দোতলায়, তারপর দোতলা থেকে একতলায়। রাস্তায় বেরিয়ে ভাবতে লাগলুম, কি করা যায়? হেদোয় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। শেষে দরোয়ান এসে জানালে, দরজা বন্ধ করবার সময় হয়েছে, বেরিয়ে যেতে হবে।

বাড়ি গেলুম। ঘুম হল না। আকাশ-পাতাল চিন্তারও শেষ নেই।

এইখানে ওদের বাড়িটার কথা কিছু বলে নিই। বাড়িটা দেবোত্তর। এখনও তাই টিকে আছে। টাকাকড়ি কোন কালেই কিছু ছিল না। একতলায় রাস্তার ওপরেই দুখানা ছোট ঘরে বহুকাল থেকে এক স্যাকরা ভাড়া আছে। মাসিক পনরো টাকা ভাড়ার সবটাই গৃহদেবতা

রাধাকৃষ্ণের সেবায় খরচ হয়। কৃষ্ণার ঠাকুরদারা ছিলেন তিন ভাই; বড়র দুই ছেলে—নরেন আর হরেন; মেজর তিন ছেলে—অনাথ, মহেন আর অন্নদা; আর ছোটর তিন ছেলে—বিজয়, বিপিন আর বিহারী। এ ছাড়া মেয়েরাও ছিল, কিন্তু তাদের কথা এখানে বলবার দরকার নেই। আট ভাইয়ের কারও অবস্থাই তেমন ভাল নয়। তবে এর ওর তুলনায় উনিশ-বিশ একটু হতে পারে। সকলেই পৃথক, এক বাড়িতে আটটা হাঁড়ি। কৃষ্ণা হচ্ছে অন্নদার মেয়ে। আমি পড়াতে যাই হরেনের দুই ছেলেকে। অন্নদার অবস্থাই হচ্ছে সকলের থেকে খারাপ। তা ছাড়া তার মাথায় একটু যেন ছিটও আছে। শোনা যায়, যৌবনে সে একটু উচ্ছৃঙ্খল ছিল, সেই সময় কে নাকি কি খাইয়ে দেয়, সেই থেকেই সে ঐরকম।

কৃষ্ণাকে দেখতে কালো। মুখখানা সাধারণ। তবে স্বাস্থ্য খুব ভাল, সচরাচর ওরকম দেখা যায় না। বাপের অবস্থা খারাপ এবং মনোযোগও নেই বলে লেখাপড়া সেলাই বোনা—এসব শেখবার তেমন সুযোগ পায় নি। অবশ্য সংসারের কাজকর্ম্ম সবই জানে। আর আমাদের সংসারে সাধারণত এর বেশি কিছু দরকারও হয় না। আমি ভাবছিলুম, বিবাহিত জীবনের কথা। কৃষ্ণা কালো, তা হোক। রূপ আমরা চাই বটে, কিন্তু ঐটেই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা নয়, বিবাহিত জীবনের সুখ রূপের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। কিন্তু এটা ঠিক যে, আমার এ অবস্থায় বিয়ে করা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নানা দৈন্যের চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠল। দেখলুম, বিবাহিত জীবনের যে মাধুর্য্য বিয়ের আগে কল্পনা করেছিলুম, বিয়ের পরে তা আকাশকুসুমের মতই মিলিয়ে গেছে। দেখলুম, কয়েক বছরের মধ্যেই যেন পাঁচ ছটা ছেলে হয়েছে। কালো কালো ছেলেমেয়েগুলো উলঙ্গ রুগ্ন দেহ নিয়ে চীৎকার করছে; কারও সর্দ্দি, কারও কাসি, কারও জ্বর, কারও পেটের অসুখ; তার ওপর মায়ের সে স্বাস্থ্যও নেই, ছেলেমেয়েদের দেখবার অবসরও নেই, তাই একান্ত অসহ্য বোধ হলে মাঝে মাঝে এসে একে ওকে তাকে পিটছে; আর আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি; দুজনের মেজাজই রুক্ষ, খিটিমিটি লেগেই আছে; জীবনের আর কোন আকর্ষণই নেই। বুঝলুম, এ অসম্ভব, এ বীভৎসতা আমি সহ্য করতে পারব না। অকারণে এই একঘেয়ে নিঃসাড় জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কি প্রয়োজন?

দুদিন আর পড়াতে গেলুম না। কিন্তু বেশি কামাই করা যায় না। তাই যেতে হল ফের। তবে এবার গেলুম সন্ধ্যার সময়। আর এক জায়গায়—যেখানে সন্ধ্যায় যেতুম, সেখানে রাত্রে যাব ঠিক করলুম। পড়িয়ে যখন ফিরতুম, তখন সিঁড়ি দিয়ে প্রায়ই লোকজন যাতায়াত করত, আলোও থাকত। তবুও যতক্ষণ ওখানে থাকতুম, মনে একটা আতঙ্ক অনুভব করতুম। বেরিয়ে আসার পরে হাঁপ ছেড়ে ভাবতুম, বাঁচা গেল, দেখা হল না। আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলেছে যা হোক!

কিন্তু সন্ধ্যায় যাওয়া বেশি দিন চলল না। অপর বাড়ির ছাত্রটি একদিন বললে, মাস্টারমশাই, মা বলছিল, আপনি আগে যেমন আসতেন, সেই রকম আসবেন। নইলে এত রাত্তিরে এলে আমার ঘুম পায়।

বিপদে পড়লুম, কিন্তু উপায় কি ? আগের মতই একদিন ধরা পড়লুম সিঁড়িতে। প্রশ্ন হল, কই, কি ঠিক করলে ?

কি যে উত্তর দোব ভেবে পেলুম না। বিয়ে করব না—এ কথা একেবারে মুখের ওপর তার বলতে পারলুম না। একটু ইতস্তত করে বললুম, দেখ, মার এখন বিয়ে দিতে মত নেই।

কৃষ্ণা বাধা দিয়েই বললে, অমতও নেই। তোমার মা বলেছিলেন, ছেলের এখন বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই। তবে তাকে রাজি করাতে পারলে তিনি আপত্তি করবেন না। এখন বল, তুমি কি করবে ?

তারপর আমার ডান হাতটা চেপে ধরে আবার বললে, বাবার অবস্থা তো জান, তুমি আমাকে না নিলে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো যার তার হাতেই বাবা আমাকে তুলে দেবে। আর সারা জীবন আমাকে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। দেখ, তোমার মত ছেলের কথা বাবা মা ভাবতেই পারে না। খালি শুনি, বুড়োদের কথা। বড় বড় ছেলেপিলে, নাতি-নাতনী হয়ে গেছে—তা হোক, খেতে পাবে, কষ্ট পাবে না। যেন খাওয়া ছাড়া মানুষের আর কোন কামনাই নেই।

বললুম, কিন্তু আমার অবস্থাও তো ভাল নয়। আমি নিজেই এখনও ভাল করে দাঁড়াতে পারলুম না। এ অবস্থায় বিয়ে করলে তোমারও কষ্ট হবে, আমারও হবে।

কৃষ্ণা দৃঢ়স্বরে বললে, না, হবে না। কষ্ট যাতে না হয়, আমি সেই চেষ্টাই করব।

বললুম, ও কোন কাজের কথা নয়। আচ্ছা, এখন ছাড় দেখি, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

হাতটা জোর করে টেনে নিয়েই আমি ছুটে নীচে নেমে গেলুম। কৃষ্ণা যে এই রকম সব কথা বলবে, আমি তা ভাবতেও পারি নি।

তার পরদিন থেকে আমি কেড্‌স পরে যেতে লাগলুম, পায়ের শব্দ হবে না বলে। কারণ ছিল দুটো। প্রথম কারণ এই যে, কখন আসছি বা যাচ্ছি কৃষ্ণা সহজে বুঝতে পারবে না; আর দ্বিতীয়, যদিই কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হয়, তবে সিঁড়ির মাঝখানে আমার পায়ের শব্দ হঠাৎ কয়েক মিনিটের জন্যে থেমে গেলে অন্য কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

যাই হোক, প্রথম দু চার দিন তো কৃষ্ণাকে এড়িয়ে চলতে পারলুম। একদিন দোতলা থেকে একতলার সিঁড়ির মুখে পেছন থেকে জামাটা কে চেপে ধরলে! আমি তো ছিনিয়ে নিয়েই তাড়াতাড়ি ছুটে নীচে নেমে গেলুম।

পরদিন কিন্তু আর পারলুম না। তেতলা থেকে নেমে ঠিক সিঁড়ির মাঝখানটায় এসেছি, এমন সময় দুটো হাত আমার গলা জড়িয়ে ধরলে। ফিস ফিস করে কৃষ্ণা বললে, বড্ড পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ কদিন ধরে, আজ যাও তো দেখি! কি ঠিক করলে বল, রাজি তো ?

আমি উত্তর দিতে পারলুম না। তার সেই স্পর্শ, তার বুকের স্পন্দন, চুলের অদ্ভুত গন্ধ, মুখের ওপর তার উত্তপ্ত নিশ্বাস, সমস্ত মিলে আমাকে মাতাল করে তুললে। সমস্ত দেহ যেন আগুন হয়ে উঠল। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না, দুহাতে তাকে সজোরে চেপে ধরে একটা চুমু

খেলুম। কতক্ষণ ঐ ভাবে ছিলুম জানি না, কৃষ্ণা হঠাৎ নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নিঃশব্দে ওপরে চলে গেল, আমিও নীচে নেমে গেলুম।

রাস্তায় বেরিয়েও সে উন্মাদনা আমার গেল না। হঠাৎ পেছনে একখানা মোটর সশব্দে ব্রেক কষলে। পাশ থেকে কতকগুলো লোক হাঁ হাঁ করে উঠল, সবাই বললে, হর্ন শুনতে পান না! আর একটু হলেই তো গিয়েছিলেন।

আরও খানিকটা আসতে একটা বাঁকের মুখে সাইকেল সুদ্ধু একটা লোক আমার ওপর এসে পড়ল। লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, অন্ধা হ্যায়? বেল নেহি শুনতা?

মাতালের মতই হেদোয় ঢুকে ঘুরতে লাগলুম। শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করে একটা অন্ধকার বেঞ্চের ওপর বসে পড়লুম। আকাশ-পাতাল কি যে ভাবছিলুম, তা মনে নেই।

রাত্রে বাড়ি ফিরতেই মা বললে, তোর অসুখ করেছে নাকি? আজ আর তা হলে কিছু খেয়ে কাজ নেই।

আমারও খাবার ইচ্ছে ছিল না। জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুম এল না। ভোর-রাত্রে কেবল একটু ঘুমিয়েছিলুম।

আবার দুদিন কামাই। কেমন একটা ভয় হল, লজ্জাও হল,—পাছে কৃষ্ণার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। কিন্তু সেদিনের স্মৃতিও মন থেকে গেল না; মাঝে মাঝে মনে পড়ে, আর সর্ব্বশরীর শিউরে ওঠে। বড় মধুর মনে হয়। অতৃপ্তির দুঃখে মনটা যেন অজ্ঞাতেই ভরে ওঠে।

ছাত্রেরা অনুযোগ করলে, মাস্টারমশাই, আপনি আজকাল বড্ড কামাই করেন!

দু চার দিন আর কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হল না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলুম, বাঁচা গেল। কিন্তু মনটা তাতে খুশি হল না মোটেই। খুব যেন হতাশ হয়ে পড়লুম।

আবার একদিন কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হল। আমার হাত দুটো চেপে ধরে সে বললে, কি, ভাবা হল? রাজি তো?

কিন্তু বিয়ের কথা কি এ কদিন আমি ভাবতে পেরেছি? ভেবেছি অন্য কথা। সেদিনের সেই নতুন অনুভূতি—সেই স্পর্শ পুনরায় লাভ করবার একটা গোপন আকাঙ্ক্ষাই কেবল মনের মধ্যে অহরহ ঘুরে বেড়িয়েছে।

কৃষ্ণা আমার হাত দুটো ধরে ছিল। তার ঐটুকু স্পর্শই আমাকে মাতাল করে দিলে। হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে আমি তাকে বুকে চেপে ধরলুম, মুক্ত হবার জন্যে একবার সে চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। তখন মুখটাকে হাত দিয়ে আড়াল করে বললে, কই, আমার কথার জবাব দিলে না তো?

আমার তখন আর ভাববার মত অবস্থা ছিল না। বলে ফেললুম, নিশ্চয়, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না।

কৃষ্ণা তার হাতটা সরিয়ে নিলে।

এইভাবেই কিছুদিন কেটে গেল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এ আমি করছি কি? কৃষ্ণাও বলেছে,

বাড়িতে তুমি এখনও বললে না? আচ্ছা, আমার মাকে একবার তুমি বলবে চল, আমার ভারী লজ্জা করে।

এ অবস্থায় বিয়ে না করাটা যে অন্যায় হবে, তা আমি বুঝতুম, কিন্তু ঠিক করে কিছু বলতেও পারি নি। কৃষ্ণাকে শুধু স্তোক দিয়ে বার বার বলেছি, এত তাড়া কিসের? সে একদিন বললেই হবে, এ কমাস তো বিয়ে নেই। তা ছাড়া আমার কালাশৌচ না গেলে তো কিছু হবে না। মা রাজি হবে না।

বুঝতুম, ভয়ানক অন্যায় আমি করছি। কিন্তু তবুও নিজেকে দমন করতে পারতুম না। আত্মসংযম আমি একেবারেই হারিয়েছিলুম। সারাদিনের অনুশোচনা ও আত্মগ্লানির পর হয়তো কোন কোন দিন স্থির করতুম, ও বাড়িতে আর যাব না, পড়ানোই ছেড়ে দোব। কিন্তু রাত্রি হলে আর থাকতে পারতুম না, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যেত ওখানে।

একদিন পড়াচ্ছি, বাইরে কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে ভীষণ গোলমাল করছিল। দু তিন বার ধমক দিয়েও যখন ফল হল না, তখন আমি তাদের তাড়া করলুম। ছেলেগুলো কৃষ্ণাদের ঘরে ঢুকে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ল। কৃষ্ণার ছোট ভাইটাকে ধরতে পারলুম, তার পিঠে দুটো চড় বসিয়ে দরজার দিকে ফিরে দেখলুম, বন্ধ দরজার ওপর পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা। সে বললে, গোলমাল করতে আমিই ওদের শিখিয়ে দিয়েছিলুম, তাই শাসন করতে হলে আমাকেই করতে হয়। তারপর একটু হেসে আবার বললে, নইলে তো আর এ ঘর মাড়াবে না তুমি! দেখ, আমার আর ভাল লাগছে না। তুমি মাকে একবার বল, আমি ডেকে আনছি; পালিও না কিন্তু।

মহা বিপদে পড়লুম। নিজেরই আমার দ্বিধা ঘোচে নি, কৃষ্ণার মাকে আমি কি বলব! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে কে দরজায় আঘাত দিয়ে বললে, কৃষ্ণা, এই কৃষ্ণা, দরজা দিয়ে কি করছিস, খোল না!

এ আবার আর এক বিপদে পড়লুম। বন্ধ ঘরের মধ্যে দুজনে রয়েছি—অপরের চোখে ব্যাপারটা খুব ভাল ঠেকবে না। আমি খাটের নীচে থেকে ছেলেগুলোকে বের করে সশব্দে কিলটা চড়টা মেরে চীৎকার করেই বলতে লাগলুম, আর করবি গোলমাল, পাজি কোথাকার? ফের যদি—

কৃষ্ণার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত্ত কাঠের মত দাঁড়িয়ে থেকে সে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল গৌরী। তীব্র দৃষ্টিতে সে একবার আমার দিকে, আর একবার কৃষ্ণার দিকে চেয়ে ছেলেগুলোকে বললে, এই, তোরা সব এখানে কি করছিস? বেরো ঘর থেকে। তারপর কৃষ্ণাকে বললে, তোকে কাকীমা ডাকছে।

আমি নিঃশব্দেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

এর পর থেকেই দেখতুম, আমার যাবার আর আসবার সময় সিঁড়ি দুটোর আলো নিয়মিত-ভাবেই জ্বালা হয়। কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাতের আর সুবিধে হয় না। খুশিও হই, আবার দুঃখও হয়। একদিন পড়িয়ে ফেরবার সময় সিঁড়িতে পা দিতেই আলোটা নিভে গেল। আমার পা আর উঠল না। যেন নিজের অজ্ঞাতেই একটু অপেক্ষা করলুম, হয়তো কৃষ্ণা আসবে। কিন্তু কৃষ্ণা এল না।

কতকগুলো কথা শুনতে পেলুম। গৌরী বলছে, মাস্টারমশাই নামছে দেখে আমি আলো জ্বেলে দিলুম, তুই পোড়ারমুখী কেন নিভিয়ে দিলি? আমি কিছু বুঝি না, না? এবার সব বলে দোব।

কৃষ্ণা বললে, বল না কি বলবি, আমি কি করে জানব যে মাস্টারমশাই নামছে? আলো তো সব সময় নেভানোই থাকে, তাই শুধু শুধু জ্বালা রয়েছে দেখে নিভিয়ে দিয়েছি। তুই হাত ছাড় বলছি, নইলে চুল ছিঁড়ে নেড়া করে দোব।

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না।

আরও কদিন পরে একদিন দেখলুম, সিঁড়ির আলো জ্বলল না। সিঁড়ির মাঝখানে আসতেই কৃষ্ণা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে, গৌরী মুখপুড়ী আজ মার সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে, আবার আসবে এক্ষুনি। দেখ, একটা কথা বলে রাখি, তুমি আমাকে বিয়ে কর আর না কর, গৌরীকে কিন্তু কখনও ক'র না। ওঃ, সেদিন আমাকে যা মুখে এসেছে তাই বলেছে!

গৌরী মেয়েটি কৃষ্ণার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। তবে দেখতে রোগা বলে কৃষ্ণার চেয়ে ছোটই মনে হয়। রঙ ফরসা, কিন্তু মুখখানা ভাল নয়। স্কুলে পড়ে। ঘুরিয়ে কাপড় পরে, দেখায় খুব স্মার্ট। সে নরেনের একমাত্র মেয়ে। বাপের অবস্থা আর সকলের চেয়ে ভাল। মাও তাঁর মায়ের গয়নাপত্র আর কিছু টাকাকড়ি পেয়েছেন। মেয়ের বিয়ের জন্যে আমার মাকে একবার বলেন। মা তখন—সেদিন কৃষ্ণা যা বললে—সেই জবাবই দিয়েছিলেন। গৌরীর মা তারপর আমাকে ধরেন, আমি বহুকষ্টে কথাটাকে উড়িয়ে দিই। এর পরেই একদিন পড়ানোর পর ঘর থেকে বেরিয়ে জুতো পরতে গিয়ে দেখি, তার ভেতর ভাঁজ করা একখানা চিঠি। তাড়াতাড়ি সেটা পকেটে পুরে ফেললুম। রাস্তায় এসে একটা গ্যাসের নীচে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়লুম। গৌরী লিখছে, সে আমাকে খুব খু—ব ভালবাসে। সীতা রামকে অথবা সাবিত্রী সত্যবানকে বোধ করি অত ভালবাসে নি। এমন যে ভালবাসা, এর কোন প্রতিদানই কি সে পাবে না? আমি কি এতই নিষ্ঠুর হব? তার মা আমাকে যখন বললেন, তখন আমি কেন রাজি হলাম না? তাকে অপছন্দ হল কি? কিন্তু কেন পছন্দ হল না? সে ফরসা, লেখাপড়া জানে, গান-বাজনা জানে, সেলাই জানে, বোনা জানে, রান্না জানে, নানা রকম খাবার তৈরি করতে জানে। এর বেশি মেয়েদের আর কি থাকা প্রয়োজন? তবে কি তার মুখখানাই আমার ভাল লাগে নি? কিন্তু সে দোষ কি তার? এই সব অনেক কথা সে লিখেছিল।

চিঠিখানা আমি সেইখানেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। ভাবলুম, আচ্ছা পাকা মেয়ে তো! হল কি! ফের যদি এই সব পালগামি করে, তবে বেশ করে একদিন ধমকে দিতে হবে।

কিন্তু আর কিছু সে করে নি। বোধ হয় সেদিনের ঢিলটা হাত থেকে বেরিয়ে যাবার পর তার লজ্জা আর অনুশোচনা হয়। এর পর থেকে পারতপক্ষে সে আর আমার সামনে আসত না। এ অনেক দিন আগের ঘটনা। বাবা এর পরেই মারা যান।

যাক, আরও কিছু দিন কেটে গেল। কৃষ্ণার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইবার আর সুবিধে হয় না। আমার যাবার বা আসবার সময় রোজ গৌরী আলো জ্বেলে সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে। আমি অধীর হয়ে উঠলুম।

মাঘ মাস এসে গেল।

পাশের মিত্তিরদের বাড়ি মেয়ের বিয়ে। খুব ধুমধাম। এদের বাড়ির সকলে সেখানেই গেছে। ছেলেছুটোকে পড়াচ্ছি, এমন সময় পাশের বাড়িতে ঘন ঘন শাঁক বাজতে লাগল। ছাত্রেরা বললে, মাস্টারমশাই, ঐ বোধ হয় বর এল, আপনি একটু বসুন, আমরা দেখে আসি।

সাদা আলোটা নিভিয়ে আমি নীল আলোটা জ্বেলে দিলুম। তারপর র্যাপারটায় পা পর্য্যন্ত ঢেকে পাশের ডেক-চেয়ারটায় গিয়ে বসলুম। বোধ হয় চোখ বুজে ছিলুম। হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধে আর শীতল স্পর্শে আমি চমকে উঠলুম। চেয়ে দেখলুম, আমার গলায় একটা মালা, আর কৃষ্ণা পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। তারপর মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে বললে, আমার মালা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

আমি মালাটা খুলে তার হাতে দিতে গেলুম। সেটা সে আমার হাত দিয়েই নিজের গলায় পরে নিলে। বললে, তোমার কালাশৌচ যেতে আর কত দেরি?

বললুম, এখনও চার পাঁচ মাস—সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে।

কৃষ্ণা বললে, বাবা, অত দেরি! তারপর একবার খুব খানিকটা হেসে বললে, মালাটা আমি ওদের বাড়ি থেকে লুকিয়ে নিয়ে এলুম। গৌরী মুখপুড়ী ওদিকে বর দেখতে গেছে, আর আমি পালিয়ে এসেছি। আমাকে কিন্তু এক শিশি এসেন্স, এক শিশি হেজলিন, এক কৌটো পাউডার আর এক বাক্স সাবান দিতে হবে। কবে আনবে?

বললুম, ক্ষেপেছ! রাখবে কোথায়? কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেই বা কি? না না, ওসব পাগলামি করো না।

কৃষ্ণা একটু ভেবে বললে, আচ্ছা, তবে শুধু একখানা ভাল সাবান কিনে দাও। আমি বলব, নিজেকে দিয়ে আনিয়েছি। নাঃ, মালাটা তুমিই নিয়ে যাও, আমার কাছে থাকলে কে আবার দেখে ফেলবে!

মালাটা সে আবার আমার গলায় পরিয়ে দিলে। আমি তাকে বুকে চেপে ধরলুম। তখনও পাশের বাড়িতে ঘন ঘন শাঁক বাজছিল।

না, আমি যাই।—বলে কৃষ্ণা ছুটে ঘর থেকে চলে গেল। কিন্তু সিঁড়ির মুখেই একটা কোলাহল উঠল।

—এই কৃষ্ণা, তুই যে বড় মালাটা নিয়ে এলি?

—হ্যাঁ, মালা এনেছি, তুই দেখেছিস!

—দেখেছিই তো। তুই আনিস নি? মিথ্যেবাদী কোথাকার! আমি কিছু বুঝি না, না? মাস্টারমশাইকে তুই—

—মুখ সামলে কথা কইবি। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

—হ্যাঁ, মুখ সামলে কথা কইব! দাঁড়া না, আমি কাকীমাকে সব কথা বলে দিচ্ছি।

—বলগে যা না কি বলবি, ভারী তো ভয়! মেয়ে হিংসেয় গেল!

—তোর মতন কয়লার খনিকে কেউ কি বিয়ে করবে যে, হিংসে হতে যাবে আমার?

—না, তোর মতন প্যাঁচামুখীকে বিয়ে করবে!

—তবে রে, দেখবি?

এর পরই মারামারি আর কান্নাকাটি।

আমি মালাটা তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। বললুম, কি ব্যাপার?

গৌরী আমাকে দেখে সরে গেল। কৃষ্ণাও কাঁদতে কাঁদতে নীচে নেমে গেল।

আমি মন স্থির করে ফেললুম। নাঃ, যা হবার তা হবে, ইতস্তত আর করব না। আজই গিয়ে মাকে কথাটা বলব। তারপর কৃষ্ণার মাকে কাল পরশু মা বলেন ভাল, নইলে আমিই জানিয়ে দোব।

পড়ানোর কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে বাড়ি ফিরলুম। সেজদি দরজা খুলে দিলে। জিজ্ঞেস করলুম, মা কোথায়?

সেজদি বললে, কোথায় কথকতা হচ্ছে, তাই শুনতে গেছে। তোকে খাবার দোব?

বললুম, দাও।

খেয়ে শুয়ে পড়লুম। পরদিন সকালে মার সঙ্গে অনেকবারই দেখা হল। কিন্তু কথাটা বলে ফেলবার মত উৎসাহ বা উত্তেজনা কিছুই আর খুঁজে পেলুম না। ভাবলুম, এত তাড়া কিসের? এখনও তো অনেক সময়। তা ছাড়া নিজেরা ঠিক থাকলেই হল। আর ইতিমধ্যে চেষ্টা করে আরও কিছু কাজের যোগাড় করে নেওয়া যাক।

সেদিন রাত্রে আর কৃষ্ণাকে দেখতে পেলুম না। তারপর আরও কদিন কেটে গেল। যাবার সময় যেমন উৎসাহ নিয়ে যাই, ফেরবার সময় তেমনই হতাশ হয়েই ফিরি। মনে হয়, আমার সর্ব্বস্ব বুঝি হারিয়ে গেছে। অথচ কাউকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না—যদি কিছু মনে করে!

একদিন পড়াতে যাচ্ছি, দরজায় দেখলুম, কৃষ্ণার ছোট ভাই নিতাই দাঁড়িয়ে।

তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে দু পয়সার লজেঞ্জস কিনে তার হাতে দিয়ে বললুম, তোর দিদি কোথায় রে?

নিতাই উত্তর দিলে, দিদি মামার বাড়ি গেছে। দিদিমার অসুখ কিনা তাই।

জিজ্ঞেস করলুম, কবে আসবে?

নিতাই বললে, তা তো জানি না। মাকে জিজ্ঞেস করে আসব?

বললুম, না না, থাক। তুই ঐ সবগুলো খেয়ে তবে বাড়ি যাবি বুঝলি, আর কাউকে দিস নি যেন!

মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, শুধু কি দিদিমার অসুখের জন্যই কৃষ্ণাকে যেতে

হয়েছে ? বুঝলুম, আমাদের কথা এখন সকলেই শুনেছে। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে মনে হতে লাগল, স্ত্রীপুরুষ যারই দৃষ্টিপথে আমি পড়ছি, সেই আমাকে দেখে নিঃশব্দে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ছাত্র দুটোও, মনে হত, যেন আমারই অলক্ষ্যে মুচকে হেসেই বইয়ের ওপর চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। সমস্ত বাড়িটা আমার অসহ্য হয়ে উঠল। গৌরীর ওপর একটা বিজাতীয় ক্রোধে মনটা ভরে উঠল।

সেদিন পড়াচ্ছি। হঠাৎ গৌরী এক কাপ চা নিয়ে এসে হেসে বললে, মাস্টারমশাই, চা খান। মা পাঠিয়ে দিলে।

তার হাসি দেখে আমি জ্বলে উঠলুম। বেশ কঠোরস্বরেই বললুম, অমন দাঁত বার করে হাসতে লজ্জা করে না ? নিয়ে যাও চা।

এই আকস্মিক কঠোরতায় গৌরীর হাসি মিলিয়ে গেল। কিন্তু ছেলে দুটো ফেললে হেসে। তাদের গালে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে দিয়ে বললুম, পড় তোমরা, এত হাসি কিসের ?

পড়িয়ে ফেরবার সময় গৌরীর মা ডেকে বললেন, ভবু, চা খেলে না কেন ?

বেশ কঠিনভাবেই বললুম, এত রাত্রে আমি চা খাই না।

কিন্তু সময়ে সকল ক্ষতই সেরে যায়,—মনের আর দেহের উভয়েরই। তবে কিছু চিকিৎসা আর ঔষধপ্রয়োগ হলে হয়তো আরও তাড়াতাড়িই সারে। আমার মনের আঘাতও সেরে উঠল,—গৌরীর মায়ের চিকিৎসায়, আর গৌরীর প্রলেপে।

একদিন গৌরীর মা ডাকলেন, ভবু, শোন। তারপর মেয়েকে বললেন, খাবারগুলো নিয়ে আয় তো মা।

মেয়ে একথালা খাবার আর এক গেলাস জল নিয়ে এল। মা বললেন, সব গৌরীই করেছে। খেয়ে দেখ না, কেমন হয়েছে।

আর একদিন গৌরী এসে বলে গেল, মাস্টারমশাই, যাবার সময় মার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন।

সেদিন গৌরীর মা সেলাই-বোনার বিদ্যা মেয়ে কতখানি আয়ত্ত করেছে, প্রমাণসহ তারই পরিচয় দিয়ে কতকগুলো সুতো আর পশম আনবার ভার আমাকে দিলেন। অবশ্য দুটো টাকাও ঐসঙ্গে দিলেন।

একদিন মা মেয়েকে বললেন, ওরে, ভবুকে দুটো গান শোনা না।

মেয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলে, কোন্‌টা গাইব মা ?

আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। বললুম, না না, গান এখন থাক। আজ উঠি, এখুনি আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

আর একদিন গৌরী একখানা বই নিয়ে এসে বললে, মাস্টারমশাই, এই জায়গাটার মানে বলে দিন না !

গৌরীর মা ডেকে বললেন, ভবু, গৌরীকে যদি তুমি পড়াও। ক্লাস সেভেনে উঠল। বাইরের লোক কে এসে পড়াবে ! তার চেয়ে তুমি রয়েছ, আর গৌরীরও খুব ইচ্ছে তোমার কাছে পড়ে।

বললুম, আমার কি সময় হবে ?

গৌরী বলে উঠল, হ্যাঁ মাস্টারমশাই, আপনি আর একটু সকাল সকাল আসবেন।

এইভাবে মায়ের মধ্যস্থতায় মেয়ের ও আমার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা একটু একটু করে বাড়তে লাগল। কৃষ্ণা চলে যাবার পর যে একটা লজ্জার ভাব আমাকে চেপে ধরেছিল, তাও ক্রমশ কেটে গেল। অদূরভবিষ্যতে আমাদের যে বিয়ে হবে, এমন ইঙ্গিতও মা মাঝে মাঝে করতেন।

বৈশাখ মাস এসে গেছে। সেদিন পড়াতে গিয়ে বাড়িটাকে যেন একটু অন্য রকম বোধ হল। একটু বেশি আলো, একটু বেশি লোকজন। ছাত্রেরা নীচেই ছিল। বললে, মাস্টারমশাই, আজ আর পড়ব না। আজ কৃষ্ণাদির বিয়ে।

আমি চমকে উঠলুম। কথাটা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। সামনেই ঠাকুর-দালানে ফরাসের ওপর তাকিয়ায়-ঠেস-দেওয়া এক বৃদ্ধকে ঘিরে জনকয়েক লোক বসে আছে। বললুম, আ—চ্ছা।

বোধ হয় আমাকে চলে আসতে দেখেই কৃষ্ণার বাবা ছুটে এসে বললেন, ভবু, ভবু, দাঁড়া বাবা, দাঁড়া ; কোন ঠিক ছিল না তো, তাই তোকে আগে বলতে পারি নি, বাবা। তা কিছু মনে করিস নি ; আয়, বসবি আয়। আর আমার অবস্থা তো জানিস, সবাইকে যে বলব সে সামর্থ্য তো নেই। আর সময়ও ছিল না। কাল রাত্তিরে কথা হল, আর আজ বিয়ে। ভদ্রলোক এসেছিলেন কৃষ্ণার মামার বাড়িতে, ছেলের জন্যে মেয়ে দেখতে। তা নিজের মনে লেগে গেল, বললেন, তাঁরও তো সেবা করবার একটা লোক চাই। টাকাকড়ি কিছু লাগল না। তবে কি জানিস বাবা,—ও হরিচরণ শোন, একটা কথা আছে,—তুই একটু দাঁড়া বাবা, আমি আসছি, চলে যাস নি যেন।

তিনি চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, হ্যাঁ, কি বলছিলুম ? দেখ, আমার খুব ইচ্ছে ছিল না। হাজার হোক বয়েস হয়েছে তো। আমাদের বড়দার চেয়েও বড়। বছর তিন হল, গিন্নী মরেছেন। ছেলে অবশ্য একটি, আর দুটি ছিল, মারা গেছে অনেকদিন। এই ছেলের বউ দুটি ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেছে এই মাস ছয় হল। তাই তার জন্যেই মেয়ে দেখতে এসেছিলেন ; বললেন, নতুন বিয়ে হয়ে ছেলে-বউ যদি আমাকে নাই দেখে। দেশে জমিজমা আছে, চাষবাস আছে, অবস্থা ভাল ; তাই কৃষ্ণার মা আর মামারা একেবারে জিদ ধরে বসল। টাকা লাগবে না, মেয়ের খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না, এত সুবিধে আর কোথায় পাওয়া যাবে ? তবে মেয়ের কপালে থাকে এইতেই সুখী হবে, কি বলিস ? আচ্ছা, তুই বস বাবা, আমি আবার দেখিগে ওদিকে কি সব হচ্ছে ; সময় তো নেই, তাড়াতাড়িতে ঝঞ্ঝাট অনেক।

হঠাৎ ঠাকুর-দালানের ওপর বৃদ্ধ বরটি ভয়ানক কাসতে সুরু করলেন। সে কাসি আর থামে না। চার পাঁচটা লোক হিমসিম খেয়ে গেল। কেউ পাখা করছে, কেউ বুকটা চেপে ধরেছে। কৃষ্ণার বাবা সেইদিকে ছুটলেন। আমার গলা দিয়ে আর স্বর বেরোচ্ছিল না, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল, গলাটা কিসে যেন চেপে ধরেছিল ; কোন রকমে বললুম, আমার একটু বিশেষ দরকার আছে, আমি ঘুরে আসছি।

সদর-দরজার কাছে পৌঁছতে গৌরী ছুটে এসে বললে, চলে যাচ্ছেন যে বড়, আসুন, মা ডাকছে।

তাকে আমি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একরকম ছুটেই রাস্তায় বেরিয়ে গেলুম। যেন ভয়ানক কি অপরাধ করে ফেলেছি, এই রকম একটা ভাব আমাকে অধিকার করে বসেছিল।

অভিভূতের মতই লক্ষ্যহীনভাবে পথ বেয়ে চলেছি। সামনে একটা মনিহারী দোকান দেখে ভাল এক বাক্স সাবান, এসেন্স, স্নো, পাউডার কিনে আবার কৃষ্ণাদের বাড়ির দিকে অগ্রসর হলুম। এই জিনিসগুলো সে চেয়েছিল, দেওয়া হয় নি। কিন্তু আজ কি আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব ? ভাবলুম, বাইরে থেকেই কারও হাত দিয়ে এগুলো পাঠিয়ে দিলে হয় না ? কিন্তু সেটাই কি ঠিক হবে ? আজকের দিনে এ উপহার কি খুব নিষ্ঠুর হবে না ? আঘাত যা দেবার তা তো দিয়েইছি, আবার কেন ? আর কৃষ্ণা যখন তার অভিযোগ আর ভৎসনাপূর্ণ সজল চোখ দুটো তুলে আমার দিকে চাইবে, সে দৃষ্টি কি আমি সহ্য করতে পারব ? কিম্বা হয়তো ফিরে চাইবেও না। আমার উপস্থিতি সে অনুভব করবে, কিন্তু আমার অপরাধের কথা স্মরণ করে অভিমানভরেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাবে ; অথচ সেই অবজ্ঞার আড়ালে যে ব্যথা তার হৃদয়ে জমা হয়ে উঠেছে, তা তার সমস্ত অন্তরকে বিক্ষুব্ধ করে তুলবে।

আমি ফিরে এলুম। হেদোয় ঢুকে উপহারের জিনিসগুলো জলে ফেলে দিয়ে ট্রামে উঠলুম। এস্‌প্ল্যানেডে নেমে এদিক ওদিক ঘুরে একটা সিনেমায় গিয়ে ঢুকলুম। অন্তত ঘণ্টা দুয়েক তো অন্যমনস্ক থাকা যাবে।

এর পর আর আমি ওবাড়িতে যাই নি। মায়া বা মোহ কিছুই আর আমাকে ধরে রাখতে পারে নি। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত অনুভব করেছি, স্থির সজল দুটো চোখ নিঃশব্দ তিরস্কারে আমাকে যেন অহরহ বিদ্ধ করছে।

কিন্তু সময়ে আমার মনের এ আঘাতও সেরে উঠল। তিরস্কারপূর্ণ সেই চোখ দুটোও ক্রমে মিলিয়ে গেল।

অনেকদিন পরে আমার ছোট বোনের বাড়ি গিয়েছিলুম এক বিয়ের নিমন্ত্রণে। সেখানে দেখা হল কৃষ্ণার সঙ্গে। আমি জানতুম না যে, কৃষ্ণার শ্বশুরবাড়িও ঐ গ্রামেই।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে একটা ঘরে শুয়ে ছিলুম। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে বললে, কি, তুমি কখন এলে ? কেমন আছ ?

আমি চমকে উঠে তার দিকে চাইলুম। দেখলুম, আমারই দিকে চেয়ে আছে সে, আর হাসছে মৃদু মৃদু। তার সে হাসি, সে দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারলুম না। মুখ নামিয়ে নিলুম। তার কথার উত্তর দিতে আমার মনে পড়ল না।

একটু পরে কৃষ্ণা আবার বললে, কই, কথা কইছ না যে? কি হল তোমার?

তবু মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুল না। কি যে বলব, খুঁজে পেলুম না। কৃষ্ণা নিঃশব্দেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা সহ্য করতে পারলুম না। মনে হচ্ছিল, বিচারকের সামনে আমার যেন বিচার হচ্ছে। অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এখন শুধু রায়ের অপেক্ষা। সহসা বেশ উত্তেজিত স্বরেই বলে ফেললুম, দেখ কৃষ্ণা, আমাকে ক্ষমা কর তুমি। আমি—

কৃষ্ণা বাধা দিয়ে বললে, আহা, তুমি অমন করছ কেন? তোমার এতে দুঃখ পাবার কি আছে? দেখ, কপালে না থাকলে তুমি আমি কি করতে পারি? আমি চেষ্টা তো করলুম, কিন্তু আমার কপালে ছিল সেই বুড়ো বর, তা কে খণ্ডাবে বল?

সে চুপ করলে, তারপর আবার বললে, বিয়ের পরই বুঝি তুমি এখানে পড়ানো ছেড়ে দিয়েছ? আর একটা যোগাড় করে নিয়েছ নাকি?

বললুম, হ্যাঁ।

কৃষ্ণা বললে, বাড়ির সব ভাল আছেন, মা ভাল আছেন?

বললুম, হ্যাঁ।

কৃষ্ণা আবার বললে, কই, আমার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলে না?

বললুম, কি জিজ্ঞেস করব বল?

কৃষ্ণা বললে, কেন, অনেক কথা! কেমন আছি? এখানে কি করতে হয়? কত বড় আমার সংসার? কত কাজ?

বললুম, বল শুনি।

কৃষ্ণা একটু হেসে বললে, ওঃ, আমার এখন অনেক কাজ! বাড়ির গিন্নী। তাই কাজের আর অন্ত নেই। কর্ত্তার হাঁপানি আর বাত, তাঁর সেবা করা, মালিশ দেওয়া; রান্নাবান্না, সকলকে খাওয়ানো ধোয়ানো; ছেলের নতুন বউ এসেছে, তার আদরযত্ন; নাতি-নাতনীদের দেখাশুনো; তারপর ধান শুকোনো, ধান কোটা; গরু-বাছুরের সেবা—কাজের কি আর শেষ আছে! মাঝে মাঝে জ্বর হয়; সবাই বলে, ও কিছু না, ম্যালেরিয়া; ভাত-টাত খাও, সেরে যাবে। আমাদের গিন্নীদের কি আর জ্বর-জ্বালা গ্রাহ্য করলে চলে, সংসার অচল হয়ে যাবে না!

মনে হল, তার গলাটা ভারী হয়ে উঠেছে। চঞ্চলপদে নিঃশব্দেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়ের বিয়ে। তাই সে রাত্রে আর ফিরতে পারলুম না। বোন বললে, কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে যেও।

একটা ছোট ঘরে রাত্রে শুয়েছিলুম। ঘরখানার একদিকে নানা জিনিসপত্র ছিল গাদা করা। অবশিষ্ট জায়গাটুকুতে একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়েছিলুম।

রাত্রি কত হবে জানি না। কার উত্তপ্ত স্পর্শে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জিজ্ঞেস করলুম, কে?

সে আমার মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়ে ব্যস্তভাবে বলে উঠল, চেঁচিও না। আমি কৃষ্ণা। এ লোভ আমি সামলাতে পারলুম না।

তাহার উন্মত্ত নিষ্পীড়নে রক্তে আমার আগুন ধরে উঠল।

পরদিন সকালে যখন উঠলুম, একটা ভয়ানক লজ্জার ভাব আমাকে চেপে ধরলে। পূর্ব্বরাত্রের সে উন্মাদনাও কিছুতে ভুলতে পারলুম না। যেখানে কৃষ্ণা আছে, সেখানে থাকা আমার যেন একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠল। আপিসে আজ না বেরোলেই নয়, এই রকম যা হয় একটা ওজর দেখিয়ে কৃষ্ণাকে লুকিয়েই পালিয়ে এলুম।

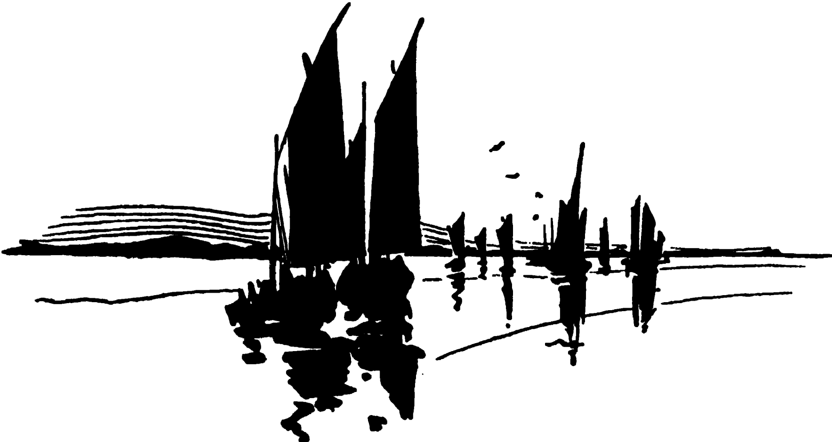
তারপর অনেকদিন কেটে গেল। পূর্ব্বস্মৃতিও ক্রমে ম্লান হতে হতে মিলিয়ে গেল।

একদিন সকালে কি একটা বিশেষ কাজে যেতে হয়েছিল কৃষ্ণাদের বাড়িতে। কাজ সেরে যখন ফিরছি, পূর্ব্বের মতই দেখলুম, কৃষ্ণা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসছে। তাকে দেখে আমি চমকে উঠলুম। কেমন একটা বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল। তবু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, একি! তুমি? চেহারা এমন যে?

কৃষ্ণা আমাকে দেখে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ওপর-নীচে একবার চকিতে দেখে নিয়ে বললে, দেখ, একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে। আমার সঙ্গে আর কখনও দেখা ক'র না তুমি। আমার এবার ছেলে হবে।

চোখের কোণ দুটো তার চকচক করে উঠল। গলাটাও ভারী হয়ে এল। সে আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেল।

আমার মনে পড়ে গেল—সেই রাত্রির কথা। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। হাত-পাও যেন কাঁপতে লাগল। এক রকম ছুটেই আমি নীচে নেমে গিয়ে পথের জনতার মধ্যে মিশে গেলুম।



সৌরজগতের বাস্তব দশা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনীলরতন কর

গ্রহ-উপগ্রহমণ্ডলীর উৎপত্তি-প্রণালী বিষয়ে এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ যত প্রকার সিদ্ধান্তের অবতারণা করেছেন, তার কোনটিই পর্যবেক্ষিত তথ্যসমূহের সমর্থক হিসাবে সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয় নি। কিন্তু সূর্য-প্রদক্ষিণশীল অবয়বসমূহকে তাঁরা সূর্যেরই সন্তান-সন্ততি ব'লে অনুমান করার পক্ষে বহু সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করেছেন। সূর্যের শরীরের রাসায়নিক উপাদান পরিমাণগতভাবে নির্ণয়ের পথে অনেক বাধা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সূর্যের বহিঃস্তর হাইড্রোজেন-নির্মিত; তার নীচে হিলিয়ম, অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, সিলিকন ও নানাবিধ ধাতু প্রচণ্ড চাঞ্চল্য নিয়ে অবস্থান করছে। এই সকল মৌলিকে গঠিত বিরাটকায় বস্তুপিণ্ডের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন ক'রে শীতল হতে দিলে সেটি যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থার সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। বিচ্ছিন্ন অংশটি খুব ছোট হ'লে তার বায়বীয় আবরণ পলায়ন করে; তখন তার অবস্থা হয় চন্দ্র কিম্বা গ্রহিকাদের মত। কিন্তু সেটি ওজনে চন্দ্রাদির অপেক্ষা বেশি হ'লে তা থেকে প্রথমে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম গ্যাস অপসৃত হয়। বিচ্ছিন্ন হবার সময় নিয়ন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি যে সকল হালকা গ্যাস এই প্রকার বস্তুপিণ্ডে লিপ্ত ছিল, তারাও পলায়নোন্মুখ হয়। মুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান অক্সিজেন গ্যাসও পালাতে থাকে। কেবল যে অক্সিজেনটুকু সিলিকন প্রভৃতি ধাতুর সহিত রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেইটুকুই শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। বিস্ফারণ ও তেজ-বিকিরণের ফলে গ্যাসীয় পিণ্ডটি শীতল হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যন্তরে গলন্ত ধাতু ও লাভার ফোঁটা সঞ্চিত হতে আরম্ভ করে এবং সেগুলি কেন্দ্রাভিমুখে জমা হয়ে গ্রহের হৃৎপিণ্ড প্রস্তুত করে। সৃষ্টির প্রাথমিক বিক্ষোভ অন্তর্হিত হ'লে গলন্ত গ্রহের বায়ুমণ্ডলে আর্গন ও অপরাপর উদাসীন গ্যাস (inert gas) থেকে যায়; হয়তো সেই সঙ্গে কিছু কার্বন্‌ডায়ক্সাইড গ্যাস এবং পালিয়ে যাবার পর উদ্‌বৃত্ত নাইট্রোজেন ও নিয়ন গ্যাস প'ড়ে থাকে।

আকাশের জ্যোতিষ্কসমূহ পর্যবেক্ষণ ক'রে কয়েক বৎসর পূর্বে এইচ. এন. রাসেল এবং মেন্‌জেল (Menzel) জানিয়েছেন যে, তারকাপুঞ্জ ও নীহারিকায় নিয়ন গ্যাসের প্রাচুর্য তথাকার আর্গন গ্যাসের পরিমাণের প্রায় সমতুল্য, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আর্গন গ্যাসের অনুপাতে মাত্র ১/৫০০ ভাগ নিয়ন গ্যাস আছে। নাইট্রোজেন গ্যাসও বিশ্বের মধ্যে অতিশয় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান; কিন্তু পার্থিব নাইট্রোজেনের পরিমাণ পৃথিবীর ওজনের খুব সামান্য অংশ। এ থেকে জ্যোতিষীগণ অনুমান করেন যে, পৃথিবীর আদিম বায়ুমণ্ডলের অনেকখানি মহাকাশে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

জেফ্রিসের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমিত হয় যে, গলন্ত পৃথিবী শীতল হবার সময় প্রথমে তার ২০০০ মাইল গভীর লাভা-সমুদ্র জ'মে গিয়েছিল, তারপর ক্রমশ উপরিভাগ শীতল হতে থাকে। সেই সময়ে কঠিনাবস্থাপ্রাপ্তিশীল বস্তু থেকে বহুলপরিমাণে জলীয় বাষ্প ও নানাবিধ

গ্যাস নির্গত হয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর নূতন বায়ুমণ্ডল গঠন করেছিল। এর পর গ্যাসেরা পলায়নোন্মুখ হয় নি, কারণ তখন পৃথিবীর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক'মে গিয়েছিল। কঠিন অবস্থা গ্রহণের পর ভূপৃষ্ঠ অতি দ্রুত শীতল হতে আরম্ভ করে এবং তার শিলাময় ত্বকের উপর জলের ধারাবর্ষণ মহাসাগরের পাত্রগুলি প্লাবিত ক'রে দেয়। সেই সময়কার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে, পূর্বেকার উদ্বৃত্ত নাইট্রোজেন, আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি গ্যাসের সহিত, গলন্ত খনিজমণ্ড-(magma)-নিঃসৃত কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইড মিশে ছিল। কিন্তু তন্মধ্যে মুক্ত অক্সিজেন গ্যাসের অস্তিত্ব ছিল ব'লে মনে হয় না। কারণ প্রায় সমস্ত আগ্নেয়গিরি-উদ্‌গীরিত শিলাতে প্রচুর লৌহ ফেরাস (ferrous) অবস্থায় বিদ্যমান দেখা যায়। ফেরাস অবস্থায় থাকলে লৌহের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সম্মেলন হতে পারে। সেকালের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন যদি মুক্ত অবস্থায় উদ্বৃত্ত থাকত, তবে আগ্নেয়গিরির এই শিলাসমূহের উপাদানীভূত লৌহ ফেরাস অবস্থায় কেন রয়েছে, তা বোঝা যায় না। তা ছাড়া আগ্নেয়গিরি-নির্গত অধিকাংশ গ্যাস বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন-সংস্পর্শে দহনশীল হতে দেখা যায়; লৌহাদি ধাতুকে কলঙ্কযুক্ত করার পরেও অক্সিজেন উদ্বৃত্ত থাকলে এই সকল সহজদাহ্য গ্যাস নবীন পৃথিবীর উপরে নিশ্চয় দগ্ধ হয়ে যেত। এজন্য অনেকে অনুমান করেন যে, পৃথিবীতে প্রথম জীবাবির্ভাবের পরবর্তী কালে অক্সিজেন-সংশ্লিষ্ট যৌগিক বস্তুর উপর জীবনেরই প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলকে অক্সিজেন দান করেছে। পৃথিবীর উপর ইতস্তত পরিব্যাপ্ত সবুজ উদ্ভিদের রাজ্য বায়ুমণ্ডল থেকে এরূপ দ্রুততালে কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইড শোষণ ক'রে চলেছে যে, দহনক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া ও পচনক্রিয়ার ফলে এই গ্যাস পুনরুৎপন্ন না হ'লে তারা বোধ হয় দশ বিশ বৎসরের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের সমস্ত কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইড নিষ্কাশন ক'রে নিত। দহন, পচন ও শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা যে অক্সিজেন কার্বনের সঙ্গে গ্রথিত হয়, তাকে উদ্ভিদেরা দ্রুতগতি নির্মুক্ত ক'রে দেয়। কিন্তু পৃথিবীকে মুক্ত-অক্সিজেন-রিক্ত করার অনুকূলে অত্যন্ত ধীর গতিতে এরূপ এক প্রক্রিয়া চলেছে, যেটি বিপর্যাসের অযোগ্য (irreversible)। বায়ু-মণ্ডলের অক্সিজেন পার্বত্যশিলাসমূহের ফেরাস লৌহের উপর ক্রিয়া ক'রে তার প্রায় অর্ধেক লৌহকে ফেরিক (ferric) আকার প্রদান করছে। গোল্ড্‌শ্মিট (Goldschmidt) মন্তব্য করেছেন যে, পৃথিবীর পাললশিলার (sedimentary rocks) মধ্যে এই ভাবে গ্রথিত অক্সিজেনের পরিমাণ অন্ততপক্ষে পৃথিবীর বর্তমান বায়ুমণ্ডলের সমান, এমন কি হয়তো দ্বিগুণ হওয়াও সম্ভব।

রেডিয়ম, ইউরেনিয়ম, প্রভৃতি যে সকল রেডিও-অ্যাক্‌টিভ বস্তু পৃথিবীতে আছে, তাদের বিভজনকালে বিচ্ছুরিত দ্রুতগামী কণিকা ও রশ্মির আঘাত বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। মহাদেশ-সমূহের মৃণ্ময় আবরণের তলে এই সকল রেডিও-অ্যাক্‌টিভ বস্তুর প্রভাবে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বিশেষভাবে বর্ধিত হয়। বহুকাল এইভাবে প্রচুর তাপসঞ্চয়ের ফলে মৃত্তিকাস্তরের অবস্থানের ভিত্তিভূমি বেসাল্ট্‌ শিলামণ্ডল তরল আকার ধারণ করে। তখন মহাদেশসমূহ পুনরায় গলন্ত আগ্নেয়শিলার (igneous rocks) উপর ভাসমান হয়। তরল হওয়ার সময় এই শিলামণ্ডল আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়াতে পৃথিবীর ব্যাস কয়েক মাইল বিস্ফারিত হয়ে ওঠে ও সেজন্য

ক্ষিতিবক্ষ স্থানে স্থানে উদ্ভিন্ন হয়ে গলন্ত শিলারাশি নিক্ষেপ করে। এই উপায়ে ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য অঞ্চল এবং পৃথিবীর অন্যান্য আগ্নেয়শিলাময় ভূভাগ নির্মিত হয়েছে।

আগ্নেয়শিলার ঘনত্ব ক'মে গেলে মহাদেশগুলি অবনমিত হয় এবং ভূমির সাধারণ উচ্চতা ক'মে যাওয়াতে কোন কোন স্থানে অগভীর সমুদ্র তৈরি হয়ে যায়। নিম্নভূমিতে আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণতা লাভ করে। এবং উদ্ভিদের জীবনধারণের অনুকূল অবস্থা পেলে যুগ যুগ ধ'রে বনানীর কঙ্কাল কয়লার খনি প্রস্তুতের উপাদান দিয়ে যায়। গলন্ত শিলার উপর চন্দ্রের আকর্ষণ যে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি করে, তার ক্রিয়াফলে মহাদেশসমূহ স্থিতিস্থান পরিবর্তন ক'রে পশ্চিমাভিমুখে স'রে যায়। ক্রমে উত্তপ্ত আগ্নেয়শিলার উপর শীতল কঠিন পর্দা গ'ড়ে ওঠে এবং মহাসাগরের অংশবিশেষ তার উপর অবস্থিতি করে।

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপকে বাইরের শৈত্য থেকে রক্ষার নিমিত্ত মহাদেশগুলি শীতবস্ত্র-সদৃশ; কিন্তু মহাসাগরসমূহের আলোড়নশীল জলরাশি পৃথিবীর ভিতরের উত্তাপকে সম্পূর্ণ রক্ষা পেতে দেয় না, নিম্নবর্তী শিলাস্তর থেকে সেই তাপের কিছু অংশ আত্মসাৎ ক'রে নেয়। ভূতাত্ত্বিকগণ গণনা ক'রে বলেছেন, প্রায় চার কোটি বৎসর ধ'রে পাতালপ্রদেশে তাপ সঞ্চয়ের পর সেটি ঠাণ্ডা হতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হয়।

গলন্ত আগ্নেয়শিলা শীতল হয়ে কঠিন অবস্থা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আয়তনে ছোট হয়ে যায়, কাজেই পৃথিবীর উপরের জমিও পূর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু স্থলভাগ সঙ্কুচিত হ'লেও সমুদ্রতলস্থ ভূভাগের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না; কারণ সমুদ্রতলস্থ ভূমি খুব কঠিন থাকে। মহাদেশ-সমূহের অত্যধিক সংকোচনে স্থানে স্থানে ভূমি অতি বিচিত্রভাবে উন্নতাবনত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার ফলেই হিমালয়, আল্প্‌স, আন্দিজ প্রভৃতি উন্নত পর্বতমালার অভ্যুত্থান হয়েছে।

অধ্যাপক জোলি (Joly) তাঁর সিদ্ধান্ত দ্বারা দেখিয়েছেন যে, সুমহান পর্বতও অচল-প্রতিষ্ঠ নয়, ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবর্তে ক্ষণিকের বুদ্‌বুদমাত্র। প্রকৃতির শক্তি যুগের পর যুগ মহাদেশ-সমূহকে বিমর্দিত ক'রে বিশাল পর্বতশ্রেণী রচনা ক'রে চলেছে; আবার বৃষ্টিপ্রবাহ, বাত্যা, ঝটিকা ও তুষারপাত দ্বারা সেই পর্বতরাজিকেই সমতলক্ষেত্রে পরিণত ক'রে পুনরায় নূতন পর্বত তৈরির চুনোট কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। ভূতাত্ত্বিক কালের মানদণ্ডে উত্তুঙ্গ পর্বতসমূহের স্থায়িত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত; ক্ষয়কারী নৈসর্গিক শক্তিসমূহের চাপে তাদের সমুন্নত শীর্ষদেশ অচিরে অবনমিত হয়। উচ্চ পর্বতসমূহের ক্ষয় যেরূপ দ্রুতহারে চলতে থাকে, সেই তুলনায় সমতলভূমি ও অগভীর সমুদ্র অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী।

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে জলে স্থলে বায়ুমণ্ডলে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ উদ্ভিদ প্রাণী ও জীবাণুকুল বিদ্যমান রয়েছে। এদের বিচরণক্ষেত্রের পরিসর অধিক দূর বিস্তৃত নয়। সমুদ্রমধ্যে প্রায় ২৪,০০০ ফিট গভীরে, অন্তরীক্ষে প্রায় চার পাঁচ মাইল উর্ধ্বে এবং ভূমির অভ্যন্তরে কয়েক শত ফিট নিম্নে জীবগণের অধিকৃত রাজ্যের সীমানা। পৃথিবীর বিভিন্ন খনিজদ্রব্যমিশ্রিত মৃত্তিকা ও জল এবং কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইড, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সমন্বিত বায়বীয় আবরণ যেরূপ অনুপাতে সমাবিষ্ট হয়ে যে প্রকার তাপমাত্রা

ও চাপের সীমামধ্যে এই জীবনজগতকে ঘিরে রেখেছে, তাকে অতিক্রম ক'রে অধিক দূর অগ্রসর হ'লে জীবনকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদি উষ্ণতা কিংবা শৈত্য পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা অপেক্ষা পঞ্চাশ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী অধিক হয়, তবে জীবনের অস্তিত্ব লোপ পায়। আবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের অনুপাত যদি বর্তমানের চতুর্গুণ অথবা একচতুর্থাংশ হয়ে যায়, তা হ'লেও প্রাণধারণ সম্ভবপর হয় না। জীবনের প্রবাহ অপ্রতিহত রাখার পক্ষে বায়ুস্থিত কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইড এবং সাগরজলে দ্রবীভূত লবণাদিরও একটা চূড়ান্ত সীমা আছে, তাকে অতিক্রম করলে জীবন বাঁচে না। জীবনরক্ষার অনুকূল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক অবস্থার গণ্ডি এত সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিগত শত কোটি বৎসরের মধ্যে পৃথিবী জীবনের অনুকূল অবস্থার এই সীমা অতিক্রম করে নি। সার্ জেম্‌স জীন্‌স বলেন যে, সূর্য থেকে পৃথিবীতে তেজ-শক্তি সরবরাহ হওয়ার ফলে জলমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলে তাপের প্রবাহ এবং জীবশরীরের ভিতর দিয়ে কঠিন, তরল ও বায়বীয় বস্তুর গতায়াত এমন চমৎকারভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যে, অতীতকালে যতদিন পর্যন্ত জীবনের অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে অন্তত-পক্ষে তার শত কিংবা সহস্রগুণ কাল পৃথিবীতে জীবনপ্রবাহ স্তব্ধ হবে না। কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, লবণাক্ততা ও জীবের অবস্থানের পরিমণ্ডলস্থ চাপের যদিও খুব সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে, তথাপি আমাদের সহনশীলতার মানদণ্ডে এই সামান্য কম-বেশি হওয়াকে শৈত্য ও উষ্ণতার উগ্র রূপ ব'লেই প্রতীয়মান হয়। মেরুপ্রদেশের প্রাণহীন শীতলতা এবং মরুর অগ্নিবর্ষী উত্তাপ ব'লে যাকে আমরা গণ্য করি, বিশ্বের প্রাকৃতিক অবস্থার প্রচণ্ড মাত্রা-বৈষম্যের কাছে তাকে বাস্তবিকই সামান্য বলা চলে। উত্তর-পশ্চিম সাইবেরিয়ার কোন কোন প্রদেশের গড় তাপমাত্রা -৫০° সেন্টিগ্রেড এবং সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা -৭০° সেন্টিগ্রেড; এইটিই পৃথিবীপৃষ্ঠের সবচেয়ে শীতল তাপমাত্রা। ভূপৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত স্থান ত্রিপোলির অন্তর্গত; সেখানে ৫৬° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা পাওয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর ভূমি ও সাগরপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে গমন করলে তাপমাত্রা প্রথমে ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই কারণে পর্বতচূড়া হিমানীবৃত দেখা যায়, এমন কি বিষুব-প্রদেশেও এর ব্যতিক্রম হয় না। পূর্বকালে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, আমরা যতই ঊর্ধ্বাভিমুখে যাব, তাপমাত্রা ততই কমতে থাকবে, শেষে একেবারে শৈত্যের চরমে গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর পরীক্ষাফল এই মতকে খণ্ডিত করেছে। অন্তরীক্ষপথে ছয় সাত মাইল উপরে যাবার পরে সেখানে তাপমাত্রা আর হ্রাস পায় না, কিছুদূর পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রায় সমান থাকে, অথবা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়।

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যে উচ্চতা পর্যন্ত ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এবং যে বায়ুস্তরের মধ্যে মেঘ, বৃষ্টি, করকাপাত, তুষারবর্ষণ ও ঝটিকাপ্রবাহ সংঘটিত হয়, তার নাম দেওয়া হয়েছে—ট্রপোস্ফিয়ার বা ক্ষুব্ধমণ্ডল। ক্ষুব্ধমণ্ডলের উচ্চতা পৃথিবীর সর্বত্র এক নয়; বিভিন্ন অক্ষাংশে (latitude) এবং আবহের শান্ত অথবা ঝটিকাময় অবস্থা অনুসারে তার উচ্চতার তারতম্য হয়। মেরুদ্বয়ের নিকট ক্ষুব্ধমণ্ডল মাত্র চার মাইল পুরু, কিন্তু নিরক্ষীয় প্রদেশে (equatorial region) সেটি দশ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বাভিমুখে প্রতি মাইলে ক্ষুব্ধমণ্ডলের

তাপমাত্রা প্রায় দশ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী হারে কমেছে। এই ভাবে কমতে কমতে ক্ষুব্ধমণ্ডলের উপরিতল অত্যন্ত শীতল অবস্থা পেয়েছে। মেরু অঞ্চলে সাগরপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নিরক্ষীয় প্রদেশের তাপমাত্রা অপেক্ষা অনেক কম ; কিন্তু মেরু অপেক্ষা নিরক্ষীয় প্রদেশে ক্ষুব্ধমণ্ডলের উচ্চতা বেশি হওয়াতে তাদের উপরিস্থ ক্ষুব্ধমণ্ডলের সীমান্তে তাপমাত্রার অবস্থা ঠিক বিপরীত ; অর্থাৎ মেরুর ক্ষুব্ধমণ্ডলসীমান্তের চেয়ে নিরক্ষীয় প্রদেশের ক্ষুব্ধমণ্ডলসীমান্ত অধিকতর শীতল। নিরক্ষীয় প্রদেশের এগারো মাইল উপরের তাপমাত্রা –৮০° সেন্টিগ্রেড ; বায়ুমণ্ডলের এই অংশটির শৈত্য সর্বাপেক্ষা অধিক। মেরু-প্রদেশের অন্তরীক্ষে যেখানে ক্ষুব্ধমণ্ডল শেষ হয়েছে, সেখানকার তাপমাত্রা হিমাঙ্ক (freezing point) অপেক্ষা চল্লিশ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী কম।

ক্ষুব্ধমণ্ডলের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে উর্ধ্বাভিমুখে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা আর কমে নি, ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর উর্ধ্বলোকের এই বায়ুস্তরটি স্ট্রাটোস্ফিয়ার বা স্তব্ধমণ্ডল নামে পরিচিত। উচ্চতা অনুযায়ী ক্ষুব্ধমণ্ডলের তাপমাত্রা যে হারে কমেছে, স্তব্ধমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় সেই হারে বর্ধিত হয়েছে। স্তব্ধমণ্ডলের উর্ধ্বাভিমুখে প্রতি মাইল উচ্চতায় প্রায় দশ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী হারে তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে অবশেষে তার কি পর্যন্ত উষ্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে, তা এখনও সুনির্দিষ্ট হয় নি। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল উপরের বায়ুর তাপমাত্রা অন্ততপক্ষে এক শত সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী ব'লে অনুমিত হয়। আরও উচ্চে তাপমাত্রা এতদপেক্ষাও অধিক।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য আজকাল প্রতি বৎসর পৃথিবীর নানা দেশ থেকে হাইড্রোজেন পূর্ণ বেলুন ওড়ানো হয়। স্বয়ংলেখযন্ত্রযুক্ত বেলুন দ্বারা এ পর্য্যন্ত ১৭½ মাইল উচ্চতার বিবরণ পাওয়া গিয়েছে এবং লেখযন্ত্রবিহীন বেলুন ২৩½ মাইল উপরে উঠতে সমর্থ হয়েছে। অধ্যাপক পিকার্ড পৃথিবীর অন্তরীক্ষে কস্‌মিক রশ্মির তীব্রতা নির্ণয়ের জন্য স্তব্ধমণ্ডলে অভিযানকালে দশ মাইল উপরকার বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবার পর সোভিয়েট গণ্ডোলা বারো মাইল পর্যন্ত উচ্চে উঠেছিল, কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় ফিরতে পারে নি। ইউনাইটেড স্টেট্‌সের অ্যাণ্ডার্‌সন ও স্টিভেন্‌স ১৯৩৫ অব্দে ১৩½ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত ওঠবার পর নির্বিঘ্নে ফিরে আসেন। কিন্তু এর চেয়েও উপরের বায়ুর অবস্থা কিরূপ, তা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় নি ; নানা প্রকার নৈসর্গিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং কৃত্রিম ঘটনা সংঘটিত ক'রে তার অবস্থা অনুমান করা হয়।

মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রত্যহ অন্ততপক্ষে দুই কোটি সংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ উল্কাপিণ্ড বর্ষিত হয়। কোন উল্কা সূচ্যাগ্রের মত ছোট, আবার কোনটি বিশ ত্রিশ টনের অধিক। ১৯০৮ অব্দে সাইবেরিয়াতে একটি ১৩০ টন ওজনের উল্কা পড়ে, তার তীব্র উত্তাপে সেখানকার বহু শত বর্গমাইল গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এই সকল আগন্তুকদের প্রতি সেকেণ্ডে এক শত ত্রিশ মাইল পর্যন্ত বেগ অর্জন করতে দেখা যায়। অধিকাংশ উল্কাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে চল্লিশ ও ষাট মাইলের মধ্যে প্রজ্বলনশীল দেখা যায়। আবার কোন কোন উল্কা এক শত মাইল থেকে ত্রিশ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত দীপ্তি দিয়ে থাকে। লৌহপ্রস্তরময় এই উল্কাপিণ্ডগুলি যে বায়ুস্তরের মধ্যে

প্রজ্বলিত দেখা যায়, সেটি যদি অত্যন্ত শীতল অবস্থায় থাকত তা হ'লে উল্কা থেকে লোহিত এবং শুভ্রবর্ণের আলো নিঃসৃত হ'ত কিনা সন্দেহ।

উল্কাপতন ঘটনাকে বীক্ষণাগারে অনুকরণ করা সহজ নয়; কারণ কৃত্রিম উপায়ে নিক্ষিপ্ত বস্তুপিণ্ডের সর্বাধিক বেগ সেকেণ্ডে মাত্র কয়েক হাজার ফিট; পক্ষান্তরে উল্কাদের বেগ সেকেণ্ডে শতাধিক মাইল। পতনশীল উল্কার দ্যুতিমান অবস্থা দেখে লিণ্ড্‌মান এবং ডব্‌সন অনুমান করেন যে, যে বায়ুস্তরের মধ্যে উল্কারা দীপ্তিশীল হয়, সেটি পৃথিবীর প্রথম দশ মাইল উর্ধ্বের বায়ুস্তর অপেক্ষা উষ্ণ। তাঁদের এই উক্তি একটি ভিন্ন প্রকার ঘটনা থেকে সমর্থন পেয়েছে।

কামান-গর্জন অথবা অপর কোনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-শব্দ তার নিকটবর্ত্তী ত্রিশ চল্লিশ মাইলের পর প্রায়শ শোনা যায় না, কিন্তু তা থেকে অনেক দূরে নব্বই অথবা শত মাইল দূরত্বে সেই শব্দ পুনরায় কর্ণগোচর হয়। শব্দের শেষোক্ত দূরত্বে ঋজুপথে পৌঁছতে যে সময় লাগা উচিত, প্রকৃতপক্ষে তাকে তার অনেক পরে শোনা যায়। বহুকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ এই ঘটনার সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করতে পারেন নি। অবশেষে ডক্টর হুইপ্‌লে (Whipple) তার যথার্থ হেতু নিদেশ করেন। তিনি বলেন যে, ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটবর্ত্তী বায়ুস্তরের চেয়ে উর্ধ্ব অন্তরীক্ষের তাপমাত্রা অধিক; প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গ উপরের দিকে শীতল হালকা বায়ুর ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে যখন সেই উষ্ণ বায়ুমণ্ডলে পৌঁছোয়, তখন তার গতিমুখ নিম্নাভিমুখে বক্রতা লাভ ক'রে মাটির বুকে ফিরে আসে। এই কারণে সেই বিস্ফোরণ-শব্দ মধ্যপথে শোনা না গিয়েও দূরবর্ত্তী প্রদেশে শ্রুত হয়ে থাকে। ডক্টর হুইপ্‌লের গণনাফলে বায়ুমণ্ডলের যে উচ্চতায় শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হয় ব'লে স্থির হয়েছে, তারই নিকটবর্তী অন্তরীক্ষ-প্রদেশে অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডকে জ্বলতে দেখা যায়।

অন্তরীক্ষের এত উর্ধ্বে বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল কেন? বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, উত্তপ্ত ভূমির সংস্পর্শ বায়ুকে ক্রমাগত যে তাপ প্রদান করছে, তারই সাহায্যে স্কন্ধমণ্ডলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্কন্ধমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুদের অবিরত সংমিশ্রণ চলেছে; কিন্তু স্তব্ধমণ্ডলের সহিত তার নিম্নের বায়ুস্তরের মেলামেশা নেই বললেই চলে। স্তব্ধমণ্ডলের তাপমাত্রা তেজ-শক্তির শোষণ ও বিকিরণের উপর নির্ভর করে। সূর্যের তেজ প্রধানত দৃশ্য আলোকের আকারে বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং তার সমপরিমিত শক্তি অদৃশ্য তাপতরঙ্গের আকারে বহির্মুখে চ'লে যায়। কেবল বায়ুমণ্ডলের কয়েকটি গ্যাস এই তেজের শোষণ ও বিকিরণ কার্যে প্রবৃত্ত থাকে। বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে গমনশীল সর্বপ্রকার তেজের নিকট নাইট্রোজেন গ্যাসকে প্রায় স্বচ্ছ বলা চলে। কিন্তু অক্সিজেন, ওজোন এবং জলীয় বাষ্প কতকগুলি তেজ-তরঙ্গকে তীব্রভাবে শুষে নেয় ও বিকিরণ করে এবং অবশিষ্ট তেজ-তরঙ্গসমূহের নিকট স্বচ্ছ থাকে। অক্সিজেন গ্যাস সূর্যপ্রেরিত আল্‌ট্রা-ভায়লেট রশ্মি থেকে কেবল তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি শোষণ করে, পক্ষান্তরে ওজোন গ্যাস আল্‌ট্রাভায়লেট রশ্মির দীর্ঘতর তরঙ্গগুলি শোষণ করে, আবার সেই সঙ্গে হলদে সবুজ আলো ও লাল-উজানী রশ্মি (Infra red rays) শুষে নেয়। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন আর ওজোন গ্যাস মিলে সূর্যতেজের শতকরা প্রায় ছয় ভাগ শোষণ ক'রে নেয়। বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বদেশে যে অক্সিজেন এবং ওজোন গ্যাস, আছে তারাই এই শোষণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ ক'রে দেয়।

কোনও বস্তু তাপপ্রভাবে লাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে তেজ বিকিরণ করে, সেটি প্রধানত লাল-উজানী রশ্মি। ওজোন ও অক্সিজেন গ্যাস এই প্রকার রশ্মিকে বিকিরণ করে না। জলীয় বাষ্প সূর্য-প্রেরিত অধিকাংশ দৃশ্য আলোক ও আলট্রাভায়লেট রশ্মির নিকট স্বচ্ছ থাকে, কিন্তু সেটি পৃথিবী-প্রেরিত দীর্ঘতেজতরঙ্গ লাল-উজানী রশ্মিকে শোষণ করে। ভূপৃষ্ঠের উপর যদি শুধু জলীয় বাষ্পের আবরণ থাকত, তা হ'লে সেটি পৃথিবী-প্রেরিত লাল-উজানী রশ্মি শুষে নিয়ে বায়ুর তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অপেক্ষা পঞ্চাশ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী কমিয়ে দিত। এই প্রকার শৈত্যে পৌঁছোলে জলীয় বাষ্প সমান হারে তেজ শোষণ এবং বিকিরণ করে, ফলে তাপমাত্রার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। স্তব্ধমণ্ডলের তাপমাত্রা ঠিক এই প্রণালী অনুসরণ করে। সেখানে জলীয় বাষ্প অত্যন্ত বিরল হওয়াতে বায়ুমণ্ডলের সহজে তাপক্ষয় হয় না এবং ওজোন ও অক্সিজেন কর্তৃক বায়ুমণ্ডলের চরম উচ্চতায় তেজ শোষণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরে তারা আর তেজ শোষণ করবার সুযোগ পায় না।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, উর্ধ্বতন বায়ুস্তরের অক্সিজেন এবং ওজোন গ্যাস সূর্যতেজের প্রায় শতকরা ছয় ভাগ শোষণ ক'রে নেয়; জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সেখানে অতি সামান্য; কাজেই তেজ বিকিরণ দ্বারা সে স্থানের সহজে তাপক্ষয় না হওয়াতে তার তাপমাত্রা বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

বায়ুমণ্ডলের যে কোনও স্তরের প্রকৃত তাপমাত্রা সে স্থানে প্রবেশশীল তেজ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে এবং সেই তেজ-তরঙ্গ শোষণ ও বিকিরণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অপর কথায়, উপরের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় যে অনুপাতে অক্সিজেন, ওজোন এবং জলীয় বাষ্প ছড়িয়ে আছে, তারই দ্বারা তার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই যে কোনও বায়ুস্তরের উপাদানসমূহের অনুপাত জানতে পারলে তার তাপমাত্রা সহজেই হিসাব ক'রে ব'লে দেওয়া যায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন এবং ওজোন গ্যাস কি ভাবে ছড়িয়ে আছে, তা অনেকটা জানা গিয়েছে; কিন্তু বারো মাইল উচ্চতার পরে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব ভালভাবে জানা যায় নি। বিভিন্ন অনুপাতে এই সকল গ্যাসের সমাবেশ হিসাব ক'রে ডক্টর গোহ্বান (Gowan) বলেছেন যে, চব্বিশ মাইল উর্ধ্বে বায়ুস্তরের তাপমাত্রা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ুমণ্ডলের যে উচ্চতায় শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হয়, পরীক্ষায় তা জানা গিয়েছে। ডক্টর গোহ্বানের গণনার ফল তাকে সমর্থন করে।

অক্সিজেন ও ওজোন গ্যাস বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বলোকের উষ্ণতা বৃদ্ধি করেছে। সেই তপ্ত বায়ুস্তরের উপরের অংশে অক্সিজেনের প্রভাব বেশি এবং তার নীচের অংশে ওজোনের প্রভাব অধিক। পৃথিবীতে ওজোনের পরিমাণ খুবই সামান্য। বায়ুমণ্ডলের সমস্ত ওজোন গ্যাস পৃথিবীপৃষ্ঠে সঞ্চিত করলে তার বেধ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চের বেশি হবে না। কিন্তু পরিমাণে সামান্য হ'লেও সূর্যের আলট্রাভায়লেট রশ্মিকে তীব্রভাবে শোষণের ক্ষমতা থাকা হেতু বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে তার প্রভাব খুবই প্রবল। ভূমির নিকটবর্তী বায়ুতে ওজোন গ্যাসের পরিমাণ খুব অল্প, তার মধ্যে আবার বিষুব-প্রদেশে ওজোনের অনুপাত সবচেয়ে কম। বায়ুর মধ্যে ওজোন গ্যাসের অনুপাত বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় একুশ মাইল উর্ধ্বে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এই গ্যাসটির পরিমাণ, পৃথিবীর অক্ষাংশ, আবহ এবং ঋতুভেদে কম-বেশি হয়। পৃথিবীতে ওজোনের অনুপাত সাধারণত বসন্তকালে বৃদ্ধি পায় এবং শরৎকালে ক'মে যায়। কুড়ি থেকে চল্লিশ মাইল উচ্চতার মধ্যে বায়ুস্থিত ওজোনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হওয়াতে সেই স্তরটিকে ওজোনোস্ফিয়ার বা ওজোনমণ্ডল বলে।

ক্রমশ

ষষ্ঠীতলার পুকুর

শ্রীসতীশ রায়

কথাটা যে কোথা থেকে উঠেছিল, কেউ বলতে পারে না। একদিন সকাল হতেই শোনা গেল, ষষ্ঠীতলার পুকুরধারে পিঁপড়ের সারের মত লোক জমতে সুরু হয়েছে। পাতলা-হেন ছোট মানুষ রাইচরণ চোখ বড় বড় ক'রে বলছিল, কর্ত্তাবাবুর পুণ্যের শরীর, স্বর্গে গেছেন। কাল সমস্ত রাত তিনি যোগাসনে পুকুরে ভেসেছেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

অক্রূর যেমন বেঁটে, তেমনই মোটা। সে বললে, শুনলে তো রুইদাস, এবার পেত্যয় হ'ল ?

রুইদাস দোমনা হয়ে শুধালে, পুকুরে ডুব দিলে কি কি সারবে ?

রাইচরণ বললে, শোন কথা! পুকুরে যখন দেবতার ভর হয়েছে, তখন কি সারবে না, তাই শুধোও!

নিমাই দে দাঁতন করতে করতে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু ওপাড়ার লোকগুলো জানতে পারলে কি ক'রে হে ?

অক্রূর ব'লে উঠল, এসব খবর হাওয়ায় উড়ে যায়। ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার কিনা!

রাইচরণ বলতে লাগল, আমার খুড়তুত ভাই সর্ব্বেশ ছিল বাতব্যাধিতে শয্যাগত। ছেলেমানুষ, কোথা থেকে যে কাল রোগে ধরল—

অক্রূর তার কথার মাঝখানে ব'লে উঠল, রোগের আবার বয়েস আছে নাকি ? তুমি অবাক করলে! সর্ব্বেশ স্বরূপনগরে ওকালতি করত না ?

রাইচরণ বললে, হ্যাঁ গো। শোন আগে, সমস্তটা বলি। তার শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট। দেখলে মনে হয় না, কোন রোগবালাই আছে। কিন্তু বাতে পঙ্গু। কোন রকমে লাঠি নিয়ে চলাফেরা করে। বয়েস তিরিশের মধ্যে। কিন্তু চুলদাড়ি গজিয়েছে একরাশ। লোকের মতামতে যার কিছু এসে যায় না, সংসারে তার বিরাগ এসেছে বলতে হবে। সর্ব্বেশের তখন সেই অবস্থা। গলায় সন্ন্যাসীর দেওয়া রুদ্রাক্ষমালা। হাতে অষ্টধাতুর তাগায় সোনার মাদুলি ঝুলছে। ডাক্তার বদ্যি দেখাতে সে ত্রুটি করে নি। পয়সাকড়ি খরচও ক'রে ফেলেছে বিস্তর। কিন্তু কিছুতেই কিছু না। তখন ভাবলে, দৈব ছাড়া পথ নেই। একদিন সে গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখলে, মহাদেব যেন তাকে বলছেন যে, অমুক জায়গায় ষষ্ঠীতলার পুকুরে তুই যদি স্নান করতে পারিস তো, তোর রোগ সেরে যায়।

সমাগত সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল। নীরবতা ভঙ্গ ক'রে অক্রূর বললে, এ দেবতার দয়া, বিচার-বিতর্কের বাইরে। কিন্তু সে হ'ল উকিল মানুষ। বিশ্বাস হ'ল তো শেষে ? বলে, বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।

রাইচরণ বললে, সর্ব্বেশ একদিন সত্যিই স্বরূপনগর থেকে আমাদের চক্রধরপুর এসে পৌঁছুল। সমস্ত রাত উপোস আর ধ্যানধারণার পর ভোরবেলা ষষ্ঠীতলার পুকুরে আরোগ্যস্নান সেরে নটার গাড়িতে কর্ম্মস্থানে ফিরে গেছে। এখন সে দিব্যি আগেকার মত কালো আল্‌পাকার চোগা চাপকান

প'রে আপিস কাছারি করছে, দুপয়সা যে আনছে না, এমন কথাও বলা যায় না। চিঠি লিখেছে আমাকে। এই দেখ সে চিঠি।

সকালবেলা জমিদার রঞ্জন চৌধুরী বৈঠকখানায় ব'সে। সঙ্গে আছেন ভগ্নীপতি সত্যসখা। রঞ্জন চৌধুরী গড়গড়াতে একটা সুদীর্ঘ টান দিয়ে চিন্তিত হয়ে বললেন, ম্যানেজারবাবু মোল্লাখালি থেকে লিখছেন যে, সেখানকার প্রজাদের মতিগতি ভাল না। তার ওপর রুদ্রেন্দ্র রায় সেখানে তার ক্যাম্প ফেলেছে। সে তাদের অনবরত উসকুনি দিচ্ছে খাজনা বন্ধ করতে।

সত্যসখা কলকাতায় থাকেন। শ্বশুরবাড়ি দিনকয়েকের জন্যে বেড়াতে এসেছেন। ধরানো সিগারেটটা দাঁতে চেপে তিনি বললেন, রুদ্রেন্দ্র রায়টা আবার কে?

রঞ্জন চৌধুরী সাশ্চর্য্যে বললেন, তাঁকে চেন না? সেই তো যত নষ্টের গোড়া। প্রজাদের ব'লে বেড়াচ্ছে, জমি চষবি তোরা, আর ঘরে ফসল তুলবে অন্য লোকে, সে কি ক'রে হতে পারে? তোরাই তো মালিক। জমিদারকে টাকা দিতে যাবি কেন? ও তো মাঝের লোক।

সত্যসখা ঔৎসুক্য নিয়ে বললেন, যুক্তিটা প্রজাদের মনে ধরেছে?

রঞ্জন হেসে বললেন, ধরবে না? পাওনা টাকা না দিতে হ'লে সব যুক্তিই মনে ধরে।

সত্যসখা জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি কি তার অভিযোগ?

—বলছে, বনজঙ্গল কেটে তোরাই তো চাষ-আবাদ করেছিস। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, সারা বছর ধ'রে খেটে মরেছিস। তবু দিনান্তে আধপেটা খেতে পাস না, পরনে কোনদিন আস্ত কাপড় জুটল না। রোগ হ'লে বিনা চিকিৎসায় ছেলেমেয়েগুলো ইঁদুরছানার মত মরে; তোরা শুধু খড়ের ঘরের কোণে মুখ গুঁজে কাঁদিস, কিছু করতে পারিস না কেন?

সত্যসখা বললেন, এ যেন যে গাছে নিজে ব'সে, সেই গাছেরই গুঁড়ি কাটা! সেও তো শুনেছি জমিদার। বুঝতে পারে না?

রঞ্জন বললেন, খুব বোঝে। বোঝে ব'লেই তার আক্রোশ আরও বেশি। বলে, তোরা যখন এমনই ক'রে না খেয়ে না প'রে বিনা চিকিৎসায় দিনের পর দিন তিল তিল ক'রে ভুগে ভুগে মরছিস, তখন তোদেরই টাকায় কলকাতায় মজা লুটছে এক দল দালাল। তারা বাড়ি ওঠাচ্ছে, গাড়ি ছোটাচ্ছে, হালফ্যাশানের রেশমী জামা কাপড় প'রে মেয়েদের নিয়ে হোটেল-সিনেমা-থিয়েটারে ভিড় করছে। গরম পড়লে বাবুদের সুখের শরীরে আঁচ লাগে, যাচ্ছে সব পুত্রপরিবার নিয়ে পাহাড়ে, সমুদ্রের ধারে; পশ্চিমে যাচ্ছে হাওয়া বদলাতে। তোদের মুখের গ্রাস আর পরনের কাপড় কেড়ে নিয়ে তাদের এই নবাবী। তোরা সব এক হয়ে দাঁড়া দেখি। জীবন পণ ক'রে বল, সর্ব্বস্ব যাক, তবু খাজনা দোব না। খাজনা বন্ধ হ'লেই শহর-খোপের সুখের পায়রাদের জারিজুরি ভাঙবে। তখন তোদের উন্নতির চেষ্টা তাদের মনে জাগবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

এমন সময় বুড়ো খাজাঞ্চি মশায় হন্তদন্ত হয়ে এসে করজোড়ে দাঁড়ালেন।

রঞ্জন শুধালেন, কি খবর? বুড়ো খাজাঞ্চি মিনতি ক'রে বললে, বাবু মশায় দোষ নেবেন না। একটু আস্তে কথা বলুন। পাশের ঘরে মফঃস্বল থেকে মাতব্বর প্রজারা এসেছে হুজুরের কাছে

দরবার জানাতে। তাদের কানে আপনাদের ও কথাবার্ত্তাগুলো গেলে বিপদ আছে। এখুনি শুকনো কাঠে আগুন ধ'রে যাবে। একেই সামলানো যাচ্ছে না।—ব'লে তিনি প্রণামান্তে প্রস্থান করলেন।

রঞ্জনবাবু গুম হয়ে ব'সে রইলেন।

সত্যসখা হেসে বললেন, আর ঢাকঢাক গুড়গুড়ে কতদিন চলবে? এধারে রুদ্রেন্দ্র যে গাঁ জ্বালিয়ে তুললে! এইবার মরতে হবে আমাদের সকলকে।

রঞ্জন নিশ্বাস ফেলে বললেন, ছেলেবেলায় রুদ্রেন্দ্রের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। সে সময় আমরা কলেজে পড়ি। ও তখন ব্রাউনিঙের কবিতা আওড়ায়। সে যে শেষে এমন ক'রে বিপদে ফেলবে, কে জানত!

সত্যসখা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সংক্ষেপে বললেন, লোকটা তো দেখছি ভয়ানক!

রঞ্জন বললেন, বাড়ির দরোয়ানগুলো পর্য্যন্ত ওর ওপর বিরক্ত হে! রুদ্রেন্দ্র বাড়ি আছে কি না খবর নিলে বলে, জানি না, ভেতরে জিজ্ঞেস করুন। ওর জন্যে জমিদারির এই অবস্থা, ঠিক সময়ে মাইনে পায় না বোধ হয়। মেজাজ তো বিগড়ে যাবেই।

সত্যসখা বললেন, তোমার তো আলাপী লোক, একখানা চিঠি লিখে দেখ না। যদি এ এলেকা ছেড়ে চ'লে যায়। অন্য কোন ধারে গিয়ে ওর কার্য্যক্ষেত্র ঠিক ক'রে নিক না। তা হ'লে তো মন্দের ভাল।

রঞ্জন বললে, সে চেষ্টাও কি করি নি ভেবেছ? লিখেছিলুম—ভাই, জ্ঞাতসারে তোমার তো কোন অনিষ্ট করি নি। ছেলেবেলার ভালবাসার খাতিরে অন্তত তুমি মোল্লাখালি ছেড়ে যাও। অন্য জায়গায় গিয়ে তোমার ক্যাম্প ফেল।

—তা কি উত্তর দিলে?—সত্যসখা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করলে।

—লিখলে—ছিঃ, নিজের ছোট স্বার্থকে এত বড় ক'রে দেখতে আছে? দেশের চাষাদের দুর্গতি সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিতে না পারি তো, লেখাপড়া শিখে লাভ হ'ল কি? আশা করি, অন্যায় অনুরোধ আর করবে না। এবং তুমিও এ কাজে যোগ দেবে।

রঞ্জন আর সে চিঠির জবাব দেন নি। রঞ্জন বললেন, তা এখন কি করা যায় সত্য? মোল্লাখালি আমার আশা-ভরসা। সেখানে তো এই অবস্থা। এবার তো লাট দেওয়াই দায়।

সত্যসখা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, জমিদারি রেখে আর লাভ নেই। বিশেষ ক'রে ছোট-খাটো জমিদারি। লোকসানের ভয়ে কিনতেও চায় না কেউ। ঘর থেকে আর কত খাজনা গুনবে? নিলেমে চড়িয়ে দাও।

রঞ্জন বললেন, তা যা বলেছ! চাষারা হয়ে উঠেছে চালাক। তার ওপর তাদের উসকুনি দেবার লোকের অভাব নেই। নানান ছল-ছুতো ক'রে যা কিছু ছুটছাট পাওয়া যাচ্ছিল, সে পথও হয়ে গেছে বন্ধ। অল্প পয়সায় আর আমলা-কর্ম্মচারীও থাকতে চায় না। হিসেবানা, মাথট, পাঁচ রকম বাড়তি পাওনার লোভেই তো আগে মাইনে ঠিক সময় না পেলেও প'ড়ে থাকত। এখন ওই

গুনতি টাকা কটি ভরসা। আমাদেরও হয়েছে তাই। এ অবস্থায় জমিদারি নিলেমে চড়িয়ে দিলেই ভাবনা যায়।

সত্যসখা বললেন, জগতে কি চিরদিন এক ব্যবস্থা চলে? অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়।

রঞ্জন হেসে বললেন, এক শ্রেণীর লোক পাল্কিতে চড়বে এবং আর এক শ্রেণীর লোক তাদের ব'য়ে নিয়ে যাবে, এই ব্যবস্থা?

সত্যসখা তেমনই ক'রে বললেন, হ্যাঁ।

রঞ্জন বললেন, সমাজে এ কোন না কোন আকারে থাকবেই। যতই না কেন সমতা আনবার চেষ্টা কর।

সত্যসখা শুধালেন, তা হ'লে এখন তুমি কি করতে চাও?

রঞ্জন বললেন, মহৎ কিছু না। চাই শূন্য থলি পূর্ণ করতে।

সত্যসখা হেসে বললেন, জগতে তো ওটা একটা শক্ত কাজ ব'লে গণ্য।

রঞ্জন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, একটা মতলব মাথায় ঘুরছে। আমরা কখন সব-চেয়ে দুর্ব্বল হয়ে পড়ি, বল তো?

সত্যসখা চুপ ক'রে ভাবতে লাগলেন।

রঞ্জন বললেন, বলতে পারলে না? যখন আমাদের হৃদয়াবেগে পেয়ে বসে। এ যেন চিন্তা-শক্তির ঘুমিয়ে পড়া। ঘুমিয়ে পড়লে আমরা যেমন অসহায় হই, তখনকার দশা আমাদের ঠিক তেমনই। বদ্ধ মুঠো এ অবস্থায় খুলে যায়। সেই দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তে আঘাত করলেই জিতব। টাকা ঝর ঝর ক'রে আপনা থেকে ঝ'রে পড়বে।

সত্যসখা হেসে বললেন, সংক্ষেপে তোমার কথা—বনের ভেতর মোহরের বাগান নয়, মনের ভেতরই মোহরের বাগান।

রঞ্জন মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ।

সত্যসখা আমোদ পেয়ে শুধালেন, টাকা আদায় করতে তুমি কি তোমার প্রজাদের হিপ্‌নটাইজ করতে চাও?

রঞ্জন বললেন, জগতে সব শক্তিই করে হিপ্‌নটাইজ। একজনের ব্যক্তিত্ব যখন আমাদের অভিভূত করে, তখনই তো আমরা সব কিছু দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠি।

সত্যসখা শুধালেন, বড় বড় আদর্শের নাম ক'রে টাকা তোলা কি তাই?

রঞ্জন বললেন, ব্যক্তিত্বের একটা ওজন থাকেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই গালভরা আদর্শগুলো আমাদের হিপ্‌নটাইজ করে। উপরন্তু যদি মুখরোচক কিছু থাকে তো, সোনায় সোহাগা!

সত্যসখা গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন, সোহাগা মানে লাভের আশা? তা হ'লে কি সোনা গ'লে পড়বেই?

রঞ্জন বললেন, ঠিক তাই। আর আদর্শগুলো যিনি প্রচার করছেন, তাঁর যদি ধনী কি ধার্ম্মিক

নামে খ্যাতি থাকে—যেমন আমার আছে—এবং আমরা যদি বুঝি, তিনি যে টাকা চাইছেন, তা তাঁর কোনও সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে নয়, ধর্ম্মায় কি জগৎহিতায় ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সময়ও মন্দ কাটবে না। তখন তো আমরা নিজের গরজে ছুটে আসব।

সত্যসখা বললেন, এখন তোমার প্ল্যানটা কি বল তো ?

রঞ্জন হেসে বললেন, সেটা ক্রমশপ্রকাশ্য।

—যেটা অধুনাপ্রকাশ্য, সেটা ?

রঞ্জন সহজভাবে বললেন, বিশেষ কিছু না। মোটেই বৃষ্টি নেই এবার, চোত মাসের গরমেই ঝলসে দিলে। বৈশাখের মাঝামাঝি শিলঙে বেড়াতে যাব। যাবে আমার সঙ্গে ?

সত্যসখা বললেন, এদিকে তো বলছ ভাঁড়ে মা ভবানী। যাচ্ছ কি ক'রে ? কাপ্তেনি করবারও সাধ যায় দেখি !

রঞ্জন হেসে বললে, ভাঁড়ে ভবানী থাকলে কি আর অভাব থাকে ? কে ও প্রবাদটা বার করেছিল ?

তারপর বললেন, সে তোমায় ভাবতে হবে না, যারা এতকাল দিয়ে আসছে, তারাই দেবে। খাজনা দোব না বললেই হ'ল ? যাও যদি তো, আজ রাত্রে রমলাকে জিজ্ঞেস ক'রে রেখো। সে যেন তার বউদিদির সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলে।

সত্যসখা সহাস্যে বললেন, যাওয়া সম্বন্ধে এতদূর ঠিক ?

রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁগো হ্যাঁ, অনেক বেলা হ'ল, চল, স্নানাহার করা যাক।

যত দিন যায়, ষষ্ঠীতলার পুকুরে লোকের ভিড় ততই বেড়ে চলে। দূর-দূরান্তর থেকে যাত্রীরা আসছে। কেউ পায়ে হেঁটে, লাঠিতে ভর দিয়ে, পথশ্রমের ক্লান্তিতে মরি-বাঁচি ক'রে। কেউ বা পুত্র-পরিবারের হাত ধ'রে, তার কাঁধে ফেলা লাঠির আগায় বাঁধা পুঁটুলি। খোঁড়া ভাইকে এনেছে দাদা কাঁধে ক'রে—পুকুরে স্নান ক'রে তার খঞ্জত্ব দূর হবে। বিশ্বাসের বলে দৈবাৎ যাদের সেরেছে, তারা করে প্রচার। যাদের সারল না, তারা নীরবে আপন ভাগ্যের দোষ দেয়।

সব বয়সের এবং অবস্থার মেয়েরা আসছে দলে দলে। ওদের মত সরল বিশ্বাসী বুঝি আর নেই। কেউ এসেছে ছেলের রোগবালাই দূরে যাবার মানত ক'রে। কারও বা ছেলেমেয়ে নেই, ষষ্ঠীতলার পুকুরধারের পিটুলিগাছে ঢিল বেঁধে একটুখানি কচিকাঁচা যা হোক কিছু যদি কোলে পায়, এসেছে সেই আশায়। স্বামীর সুমতি হোক, সে যেন আর কাউকে ভাল চোখে না দেখে, তাকেই শুধু ভালবাসে, এ কামনা নিয়েও এসেছে কেউ কেউ। মাথার ওপর রুদ্র বৈশাখের অগ্নিবৃষ্টি আর নীচে ষষ্ঠীতলার পুকুরে বাসনা-পীড়িত নরনারীর ভিড়। লোকের গোলমালে কোকিল গেল দূরবনে উড়ে। চিনি-বাতাসা আর মুড়ি-মুড়কির লোভে শুধু কাকগুলো কা কা ক'রে উড়ে বসছে।

এই অল্প সময়ের মধ্যে ষষ্ঠীতলার পুকুরধারে দোকান-পসার যা ব'সে গেছে তা বিস্ময়কর। আশপাশের নির্জ্জন মাঠকে মনে হচ্ছে একটি ছোটখাটো শহর। বড় আদর্শ প্রচারের ইন্দ্রজালে

ঘটেছে এই অভিনব পরিবর্ত্তন। চাষাদের গাঁটের কড়ি ছিল শক্ত ক'রে বাঁধা ; ধর্ম্মের ভেল্কিতে আজ গেল ঢিলে হয়ে। জুয়াখেলায় জয়ী হতে জুটছে যেন অজস্র নরনারী। আর তাদের বিচিত্র প্রয়োজন মেটাতে বসেছে হরেক রকম দোকান-পাট।

জমিদার রঞ্জন চৌধুরীর তহবিল পুরে উঠল দেখতে দেখতে। প্রজারা খাজনা বন্ধ করায় বিকাশ চক্রবর্ত্তীর চাকরি যাবার আশঙ্কা হয়েছিল। সে সপরিবারে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিল। এখন সে সরবে গরবে অধিষ্ঠিত হয়েছে ষষ্ঠীতলার পুকুরের পাশে, অস্থায়ী কাছারি-বাড়িতে।

একলা সে হিসেব রাখতে আর পারছে না। তার এখন তিন চার জন সহকারী। লাল মলাট দেওয়া মোটা জাবদা-খাতা নিয়ে ব'সে গেছে হিসেব রাখবার কাজে। কলিং-বেলমুখরিত, চেয়ার-টেবিলমণ্ডিত, নানান বিভাগে বিভক্ত, বিচঞ্চল আপিসে অধিষ্ঠান করছে বিকাশ চক্রবর্ত্তী। বারবার টাকমাথায় হাত বুলিয়ে, এবং কাঁচা-পাকা ছাঁটা গোঁফ চুমরিয়ে হেসে ব'লে উঠল, কথায় বলে, ইন্দ্রের জল আর গাছের ফল,—দেবতার দয়া না হ'লে আর মানুষের সাধ্যি কতটুকু, কি বল হে রাইচরণ ?

রাইচরণের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে রঞ্জন চৌধুরী স্বয়ং তাকে বাহাল করেছেন। এই পাতলা-হেন ছোটখাটো লোকটির সঙ্গেই যত সব সলা-পরামর্শ। সুতরাং তাকে একটু খিদমত করা দরকার। বাবুর কানে ছুটছাট তুলতে পারে। নইলে বিকাশ চক্রবর্ত্তী নতুন লোকদের সঙ্গে কথা কয় না।

রাইচরণ খাতার পাতায় হিসেবের অঙ্কের দিকে দৃষ্টি রেখে ছোট ক'রে জবাব দিলে, দয়া দেবতার, কিন্তু বুদ্ধিটা মানুষের, নায়েব মশায়।

বিকাশ মৃদু হেসে বললে, বাস্তবিক, ছোটবাবুর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। বলে, কি কল বানিয়েছে ইংরেজ কোম্পানি! টাকা ঝর ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ছে!

এবার খাতাটা বন্ধ ক'রে রাইচরণ বললে, খাজনা দোব না বললেই হ'ল ? এ যে ভগবানের মার। বিধেতা ওকে করেছে জমিদার, আর তোকে করেছে পেরজা। সে কথা বুঝিস না, বেটা চাষারা ?

বিকাশ বললে, এদিকে কথায় কথায় ধ্যান ধরে, খেতে পাই না, পরতে পাই না ; ধর্ম্মের লোভ দেখাও, তখনই কাছার খুঁট থেকে টাকা বার করবে।

রাইচরণ বললে, আমরা যে ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। যেখানে যা কিছু দেখব, সব আমাদের দেবতা। তা সে সাপ, বাঘ, ওলাউঠো, বসন্ত যাই হোক না কেন। ভয়ে সকলের দরজায় আমরা ঢিপ ঢিপ ক'রে মাথা কুটব।

বিকাশ শুধালে, বাঘও আবার দেবতা নাকি ?

রাইচরণ হেসে বললে, তা বুঝি জানেন না ? বাঘকে বলে বনবিবি। কাঠুরেরা যে বাদায় কাঠ কাটতে যায়, বনবিবির পূজো না দিয়ে কেউ সুঁদুরবনে ঢোকে না।

বিকাশ বললে, কি বলছিলুম, হ্যাঁ, টাকার আণ্ডিলও আছে এদেশে হে, না খেয়ে না প'রে পুরুষানুক্রমে করেছে। কোনও সৎকাজে দান করা তো দূরের কথা, তাদের হাত দিয়ে জল গলে না।

কিন্তু সস্তায় ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভে খুব উৎসাহ। লোভ দেখাও, তখুনি গাঁট থেকে টাকা বার করবে।

তারপর নতুন বাহাল হওয়া অক্রূরের পানে চেয়ে বললে, এক গেলাস জল খাওয়াতে পার হে অক্রূর ?

অক্রূর নায়েবের মনস্তুষ্টির জন্যে শশব্যস্ত হয়ে উঠল। হিসেবের খাতা বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দুপুরবেলা বামুন-দেবতা জল চাইলেন, তা শুধু জল খাবেন ? খানকতক বাতাসা নিয়ে আসি ডালাওয়ালাদের কাছ থেকে।

বিকাশ চক্রবর্ত্তী হেসে বললে, যাত্রীদের চিনি-বাতাসার ভোগে তো ষষ্ঠীতলার পুকুরের জল সরবৎ হয়ে উঠেছে। আর বাতাসার দরকার নেই। তুমি এমনই এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও।

তারপর জলপানশেষে শুধালেন, যাত্রীদের পয়সা ছুঁড়ে ফেলবার অত্যাচারে পুকুর তো বুজে ওঠবার উপক্রম। ওগুলো তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে কি না, বাবু শুধোচ্ছিলেন সেদিন।

রাইচরণ জবাব দিলে, দোবে চোবে তেওয়ারীরা মিলে দিনরাত লাঠি-সোঁটা হাতে পাহারা দিচ্ছে। পুরুতঠাকুর মশায়ের হাতে দক্ষিণা জমা না দিয়ে কাউকে আর আরোগ্য-স্নানের জন্যে পুকুরে নামতে দেওয়া হয় না। জলের মধ্যে পয়সা কড়ি ফেলাও বারণ। কিন্তু বারণ শুনছে কে বলুন ? এক এক ডুব দেয়, আর মুঠো মুঠো পয়সা আধলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে। হাত তো আর চেপে ধরা যায় না।

বিকাশ চক্রবর্ত্তী চিন্তিত হয়ে বললে, এও আর এক ফ্যাসাদ। ওরকম করলে তো দেখতে দেখতে পুকুর পুরে উঠবে। কারবারেও লালবাতি জ্বালতে হবে। তা তোলবার ব্যবস্থা করলে হয় না ?

রাইচরণ পরামর্শ দিলে, ও কাজটি করবেন না নায়েব মশায়। এসব দৈবী ব্যাপার। ভুল ভেঙে গেলে ধর্ম্ম-পাগল লোকগুলো অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটাবে। শেষকালে কি চাকরি করতে এসে প্রাণ হারাব ?

বিকাশ বললে, তা হ'লে থাক। বুড়ো পুরুতঠাকুর মশায়কে চুলদাড়ি গজাতে, নখ রাখতে এবং গেরুয়া ধরতে ব'লে দিয়েছ তো ? তাঁর নিখুঁত অভিনয়ের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। বাবুর হুকুম তামিল না হ'লে কারও চাকরি থাকবে না, মনে রেখো।

রাইচরণ বুক ঠুকে বললে, রাইচরণ থাকতে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না। সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকবেন। তারপর হাতজোড় ক'রে বললে, শুধু গরিবের ওপর নেক-নজর রাখবেন একটু।

সন্ধ্যেবেলায় রঞ্জন চৌধুরী তাঁর বৈঠকখানায় ব'সে। বিকেলে দালানের সামনের বাগানে মালি ঝারি ক'রে বেলফুলগাছের ঝাড়ে জল দিয়ে গেল। সিক্ত বেলফুলের স্নিগ্ধ গন্ধে বাতাস ভরপুর। সে যেন গ্রীষ্মকাতর দেহমনে সুগন্ধি শীতল প্রলেপ। সুদৃশ্য আলবোলায় চাকর তাওয়া দেওয়া কল্কেতে অম্বরী তামাক সেজে দিয়ে গেছে। তারই ধূমায়িত সৌরভ উঠতে লাগল বেলফুলের

সুগন্ধের সঙ্গে মিশে। রঞ্জন চৌধুরী ধীরে ধীরে আলবোলার নলে টান দিচ্ছেন আর কি যেন ভাবছেন। সঙ্গে ইয়ার-বক্সী কেউ নেই। শুধু সেদিনকার মত ভগ্নীপতি সত্যসখা পাড়াগাঁয়ের বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রায় বিরক্ত হয়ে যেন আক্রোশভরে সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস ক'রে চলেছেন।

তারপর চা এল। সত্যসখা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে রঞ্জনকে অন্যমনস্ক দেখে শুধালেন, তুমিও তা হ'লে গম্ভীর হতে জান দেখছি। এত ভাবছ কি ?

রঞ্জন চৌধুরী বললেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

সত্যসখা হেসে বললেন, স্থানকালপাত্র অনুকূল হ'লে সবই সম্ভব। কোন্ কবিতাটা ?

রঞ্জন কাব্যচর্চ্চা করে তিনি জানতেন। তবে সাধারণ মন নিয়ে নয়। হৃদয়াবেগের মুহূর্ত্তে কবিরা কত কি ব'লে ফেলেন, মনস্তত্ত্ব হিসেবে সে তা স্টাডি করে।

রঞ্জন বললেন, যে লাইন দুটো মনে আসছে, তাতে আকাশ-বাতাসের অবকাশ নেই। নিছক তত্ত্বকথা। প্রবাদ হয়ে যাবার যোগ্য। "লক্ষ্মীর পরীক্ষা"র দুটি লাইন—

"বুদ্ধিমানেরা পেটের দায়
লক্ষ্মীমানেরে ঠকিয়ে খায় !"

বড় খাঁটি কথা হে।

সত্যসখা সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, প্রয়োজনের পৃথিবীতেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার এত দাম কে জানত ? আমার তো বরাবরের ধারণা, উনি ধূপের ধোঁয়ার কবি।

রঞ্জন বললেন, তবে আর একটা গল্প বলি। পৌষ কিস্তি পেয়ে কলকাতায় গেলাম বড়দিন করতে। এ-ও-তা কিনতে আর দেখতে কিছুদিনের মধ্যে ব্যাগ হয়ে গেল শূন্যপ্রায়। ভাবলাম, যা আছে, এই নিয়ে রেসে যাই, টাকার কিছু বাচ্চা বের ক'রে তো আনি। তুমি যে সেই মোক্ষম টিপটা দিয়েছিলে, মনে নেই ?

সত্যসখা ব'লে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। টিপ দিয়েছিলুম, লাকি বয়। দিব্যি করিয়ে নিয়েছিলুম, শুধু এই বাজিটা ধ'রে জেতো হারো চ'লে আসবে ; নইলে বউদিকে ব'লে বকুনি খাওয়াব।

রঞ্জন হেসে বললেন, হ্যাঁ, কনককে একটু ভয় করি। কাজ কি জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'র ? পারিবারিক শান্তি বজায় রাখা একটা শক্ত সাধনা। মেয়েরা এত অবুঝ, জিদ তারা রাখবেই। অস্ত্র তো অভিমান আর অশ্রুজল, কিন্তু বড় শাণিত অস্ত্র হে। যাক, কি বলছিলুম ?

সত্যসখা বললেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা।

রঞ্জন বলতে লাগলেন, আমি তো ঘোড়দৌড়ের ছাই বুঝি। তোমাকে এত সাধ্যসাধনা ক'রেও যখন সঙ্গে পেলাম না, তখন ভয় হতে লাগল। পথে অনেক সহযাত্রী দেখে ভরসাও হ'ল। তোমার টিপের ঘোড়াটাকে দেখলাম, লিকলিকে চেহারা। ভাবলাম, এ জানোয়ার বাজি জিতবে কি ক'রে ?

ভুল খবর পেয়েছ বোধ হয়। যাক, দুর্গা ব'লে টাকা বার করছি, এমন সময়ে মনে এল রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

"বিনা পণে খেলব না গো
খেলব রাজার ছেলের মত।
ফেলব খেলায় ধনরতন
যেথায় মোদের আছে যত।"

বাস, ফিরে আসবার ট্যাক্সিভাড়াও রাখি নি। ধ'রে দিলাম গোছাসুদ্ধ নোট। বরাত ভাল। শেষে সেই লিকলিকে পক্ষীরাজই বাজি জিতল। বরাবর পেছনে আসছিল। বাঁকের মুখে এগিয়ে এল। আমি উত্তেজনায় অধীর হয়ে ডাকলুম, লাকি বয়, লাকি বয়। সে বুঝি আমার ডাক শুনল। উইনিং-পোস্টের কাছে এসে যেন স্প্রিঙের মত বেড়ে গেল হে।

সত্যসখা চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেদিন তুমি আমাদের চাংওয়াতে ভোজ দাও। সন্ধ্যার পর শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখাতেও নিয়ে গিয়েছিলে যেন।

রঞ্জন চৌধুরী হেসে ব'লে উঠলেন, ও উৎপাতের কড়ি চিৎপাতেই যায়।

এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিলে, সদর-নায়েব বিকাশ চক্রবর্ত্তী দেখা করতে চান। রঞ্জন চৌধুরী সাগ্রহে বললেন, নিয়ে এস তাকে।

বিকাশ এসে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালে রঞ্জন চৌধুরী শুধালেন, বিকাশবাবু, তবিলে কত টাকা হস্তবুদ আছে ?

বিকাশ বললে, হাজার দুই হবে হুজুর।

রঞ্জন বললেন, টাকাটা ঠিক থাকে যেন।

তারপর ভুরু কুঁচকিয়ে শুধালেন, খাজনা বাবদ বাকি-বকেয়া নিয়ে কত হ'ল ?

বিকাশ বললে, বিশেষ কিছু না। যা হয়েছিল, তাতে চোত কিস্তির লাটের টাকা কোনমতে দেওয়া গেছে। এখন যা আছে, তা সবই ষষ্ঠীতলার পুকুরের দরুন।

রঞ্জনবাবু বললেন, পুরুতঠাকুর মশায়কে যাত্রীদের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডার তালিকা ক'রে এনে তোমাকে দিতে বলেছিলুম, পেয়েছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আর রাইচরণ ব'সে সেটাকে একটু মেজে ঘ'ষে নিয়ে এয়েছি। দেখবার সময় হবে কি ?—ব'লে বিকাশ চক্রবর্ত্তী পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করবার উপক্রম করল।

আচ্ছা, পড়।—ব'লে রঞ্জন চৌধুরী গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে নিয়ে তাকিয়া হেলান দিয়ে অবহিত হয়ে বসলেন। বিকাশ চক্রবর্ত্তী পড়তে লাগল—

ষষ্ঠীতলার পুকুর-পূজায় ডালা বা পূজা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ডালার কম বেশি পরিমাণ অনুসারে ⁄০ হইতে ১।০ পাঁচ সিকা ; ছাগল ও মেষ আদির প্রত্যেক বলির জন্য ।⁄৫ আনা

ও তৎসঙ্গে /১।০ পাঁচ পোয়া চাউল—চাউল না দিলে তৎবাবদ অতিরিক্ত /৫ পয়সা একুন ।৶১০; হত্যা দেওয়ার জন্য প্রত্যেকের নিকট ॥০ আনা; মস্তক মুণ্ডন বা ধার শোধের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট বয়সের তারতম্য অনুসারে ॥৵০ আনা হইতে ১॥০ টাকা; পুকুরপাড়ের পিটুলিগাছে সন্তান-কামীদের ঢিল বাঁধার জন্য প্রত্যেক ঢিল বাবদ ৶১০ পয়সা; অলঙ্কার প্রদান জন্য স্বর্ণালঙ্কারের ভরি পিছু ৵০ ও বস্ত্র প্রদান জন্য বস্ত্র প্রতি ৵০ হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা আদায় করা হইবেক।

রঞ্জন চৌধুরী বললেন, এ তো গেল ষষ্ঠীপুকুরে পূজোর ব্যাপার। এ ছাড়া যে দোকান-পসার বসেছে?

—সে আমি আর রাইচরণ ফর্দ্দে যোগ ক'রে দিয়েছি।—ব'লে বিকাশ আবার পড়া সুরু করলে—এ ছাড়া ষষ্ঠীতলার পুকুরের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রান্তরে যাহারা দোকান বসাইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট প্রতি হাত স্থানের জন্য ৶১০ পয়সা করিয়া দোকানের কর আদায় করা হইবেক।

রঞ্জন চৌধুরী বললেন, আর যারা সার্কাস, ভোজবাজি, জুয়াখেলা ইত্যাদি ষষ্ঠীতলার পুকুরের মেলায় আমদানি করেছে?

বিকাশ একটু থেমে বললে, সেও আছে।—এতদ্ব্যতীত যে সকল জুয়াখেলা, ভোজবাজি, সার্কাস আদি মেলায় বসে, তাহাদের নিকট হইতে উহাদের আয় অনুসারে টাকা আদায় করা হইবেক।

আয় অনির্দ্দিষ্ট হ'লেই আমলা-কর্ম্মচারীর লাভ। সুচতুর বিকাশ চক্রবর্ত্তী নিজের ব্যবস্থা ঠিক রেখেছে।

রঞ্জন চৌধুরী মৃদু হেসে ব'লে উঠলেন, বাস, তুমি এখন যেতে পার বিকাশ। সব দিক বজায় রেখে কাজ চালাতে হবে। চারদিকে চোখ কান খোলা থাকে যেন।

—সে আর বলতে হবে না হুজুর।—ব'লে সদর-নায়েব বিকাশ চক্রবর্ত্তী প্রণামান্তে প্রস্থান করলে।

বিকাশ চ'লে গেলে সত্যসখা হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, তুমি যে জাল ফেলেছে, তাতে চুনোপুঁটি থেকে রুই কাতলা কারও পার পাবার আশা নেই রঞ্জন।

রঞ্জন চৌধুরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে জাগল বন্ধু। ও থেকেই আমি প্রেরণা পাই।

"তোমা সবাকার ঘরে ঘরে
আমার ভাণ্ডার আছে ভরে।"

সত্যসখা মৃদু হেসে বললে, ঠাট্টা না, সত্যি। আগে বুঝতাম না, আমাদের দেশের মোহান্ত-মহারাজদের ঐশ্বর্য্য রাজা-মহারাজদের চাইতেও কি ক'রে বেড়ে ওঠে, এবার তার হদিস পেয়েছি।

রঞ্জন বললেন, আমাদের দেশের লোক ভক্তিমদে মাতাল, অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়বার জন্যে সব সময়ে ব্যগ্র। মাথা নুইয়েই আছে। এই বৈষ্ণব-দাস্য আর বিনয়-বাহুল্য হয়েছে কাল।

চেলা-চামুণ্ডারাও আমাদের দেবতা। তেত্রিশ কোটি তারই প্রতীক। তাই প্রকৃত দেবতা চিরদিন থেকে যান দূরে। যেখানে-সেখানে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মস্তিষ্ক যায় ক্ষয়ে। সেই অদ্বিতীয়ের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছবার ধৈর্য্য নেই। বক্তৃতাটা একটা সঙ্গীত দিয়ে শেষ করি—

"তোমার চরণ ধূলায় ধূলায়
আমি ধূসর হব হে!"

—এও কবির দুর্ব্বতার মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ নাকি?—সত্যসখা হেসে শুধালেন।

রঞ্জন শুধু বলিলেন, নয় কি?

সত্যসখা হেসে বললেন, এবার তোমার কথাগুলো আচার্য্যের মুখের উপযোগী হ'ল। সময়-বিশেষে সকলেই স্ক্রিপ্‌চার আওড়ায়, সেটা দেখছি সত্যি।

রঞ্জন কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে বললেন, শালাকে শয়তান বললে, আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। কিন্তু কি করব? জমিদার হ'ল পরগাছা। দুর্ব্বলতার ভিত্তিতে শিকড় গেড়েই তার জীবন। রুদ্রেন্দ্রের কথাই বোধ হয় সত্যি।

রুদ্রেন্দ্র রায় যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়ত, তখন থেকে সহপাঠি রঞ্জন চৌধুরীর কলকাতার বাড়িতে তার যাওয়া-আসা। রঞ্জনের বোন রমলা তখন কিশোরী। বাড়িতে মেম গভর্নেসের কাছে পিয়ানো বাজিয়ে শেখে গান বাজনা ও ফরাসী ভাষা। ফ্যাশানদুরস্ত চলাফেরা এবং বিলিতি আদব-কায়দাও রপ্ত করতে হ'ত। পারিবারিক অভিনয়ে একটা গীতি-নাটকের মহলা দেবার ছলে রমলার সঙ্গে রুদ্রেন্দ্রের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়।

রমলার হাসিখুশিভরা মধুর প্রকৃতি সকলকে করত আকর্ষণ। রুদ্রেন্দ্রের কাছে অবশ্য মোটেই স্পষ্ট ছিল না, তখন ও কিসের টানে সে বাড়িতে সময়ে অসময়ে ঘন ঘন যায় আসে। কারও মিষ্টিমুখের সরল সহাস অভ্যর্থনা, না রঞ্জনের সঙ্গে কাব্য-আলোচনা?—কোন্‌টা যে ছিল বেশি প্রবল, নিজেই জানত না।

ব্রাউনিঙের যৌবন-স্বপ্নের পুষ্পবনে সে করত তখন বিচরণ, আর রমলা ছিল তার বসন্তলক্ষ্মী।

জীবনের সে দিনগুলোর কথা মনে এলে রমলার হাসি পায়। তবুও তার মনে আলোর অক্ষরে লেখা। তারপর যেন এক যুগ কেটে গেছে। সে রুদ্রেন্দ্র আর নেই। সে রমলাও গেছে হারিয়ে—সংসারের ভিড়ে। ছেলেখেলা ভুলে পাঁচজনের মত দিব্যি সংসার পেতেছে।

রুদ্রেন্দ্রের কাছে সে ছিল নারী। পাঁচজন মেয়ের জীবনে সৃষ্টিকর্ত্তার যে গূঢ় অভিসন্ধি, ওর জন্যে নাকি সে তুচ্ছতা নয়। ও যেন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, ফলপ্রয়োজনহীন ফুল। ওর জন্যে পৃথিবীকে নতুন ক'রে গড়লেও বেশি করা হয় না। ও বীণাপাণি, রুদ্রেন্দ্রের মনে ত্যাগের অগ্নিবীণা বাজাচ্ছে। ওকে রুদ্রেন্দ্র বিরাট বিশ্বের মধ্যে দেখতে চায়। ছোট ঘর-সংসারের ঘরণীরূপে পেতে লজ্জা করে। নইলে সামাজিক কি আর্থিক দিক দিয়ে মিলনের বিশেষ কোন বাধা ছিল না। কিন্তু সমস্ত সাংসারিক প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে যেন ওর যথার্থ মূল্য। দেবীকে প্রয়োজনের মধ্যে টেনে আনা যে অপমান, পূজারী রুদ্রেন্দ্র তাকে বুঝিয়েছিল। তাই তার স্মৃতি বুকে নিয়ে রুদ্রেন্দ্র

গিয়েছে ইউরোপে, বিশেষ ক'রে রাশিয়ায়। যেখানে পৃথিবীর সমস্ত বহুজীর্ণ বিধিব্যবস্থা নতুন ক'রে ঢেলে সাজবার সাধনা চলছে।

কনক অন্তঃপুরের বাগানে রমলার সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন, কি এত ভাবছিস বল তো? আমিই কেবল ব'কে মরছি। তোর দিক থেকে একটু সাড়া নেই।

কনক যখন এ বাড়িতে এলেন, সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন রমলা ছিল ছোট। রমলার ছেলেবেলার গল্প সবই জানেন। তাই আবার হেসে বললেন, জানিস ছুটকী, আমাদের ষষ্ঠীতলার পুকুরের খ্যাতি মোল্লাখালি গিয়ে পৌঁছেছে। রুদ্রেন্দ্র 'নো রেণ্ট্‌ ক্যাম্পেন' ক'রে প্রজাদের টাকা দেওয়া বন্ধ করতে পারছে না। তোর দাদা লোকমুখে খবর পেয়েছেন যে, সে সদলবলে শিগ্‌গির আসছে।

রমলা বললে, পরের পেছনে লাগবার স্বভাব তার কোন কালে ছিল না, লোকটা এত বদলে গেল কি ক'রে?

কনক হেসে জবাব দিলেন, দশানন রামচন্দ্রকে শত্রুভাবে পেতে চেয়েছিল, ও বোধ হয় তোদের সেই ভাবে পেতে চায়।

তারপর আরও হাল্কাভাবে পরিহাস ক'রে বললেন, তুই ওকে বিয়ে করিস নি, সেই রাগেই হয়তো আসছে।

রমলা আজকালকার মেয়ে। সে সহজেই জবাব দিলে, বারে, আমাকে ও চাইলে কবে? আমি কি ওকে সেধে বিয়ে করতে যাব?

কনক সকৌতুকে বললেন, চাইলে বোধ হয় নিরাশ হতে হ'ত না, না রে?

সে প্রশ্নের উত্তরে রমলা শুধু বললে, যাঃ!—ব'লে চুপ ক'রে থাকল।

সন্ধ্যার আকাশে শব্দ নেই, আছে বর্ণ। আর আছে একলা তারার সৌন্দর্য্য। রমলার সেই লজ্জারাঙা মুখে 'যাঃ' কথাটি তেমনই মিষ্টি লাগল।

কনক বললেন, সন্ধ্যা হয়ে এল, কাজ আছে। ঠাকুরজামাইকে চা আর খাবার পাঠাতে হবে। তুই থাকবি, না যাবি?

—আর একটু থাকি বউদি।

—আচ্ছা, থাক তা হ'লে। কিন্তু একলা ভয় করবে না তো?

কনক একটু হেসে বাড়ির ভিতর চ'লে গেলেন।

বউদিদির পরিহাসে রমলা সায় দিতে পারে না। সাংসারিক দিক দিয়ে কোন কিছু অভাব-অভিযোগ তার তো নেই। তবু ভাল ক'রে নিশ্বাস নিতে সে কেন পারছে না? পৃথিবীতে যেন যথেষ্ট বাতাস নেই।

এমন সময় সত্যসখা বাড়ির ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বাগানে নেমে এসে বললেন, রমল, এখনও তুমি এখানে? নাও চটপট ক'রে জিনিসপত্র গুছিয়ে। আজ রাত্রেই আমরা রওনা হচ্ছি।

—কই, আগে তো কিছু বল নি? কি ক'রে আমি জানব?—রমলা যেন চমকে জেগে উঠল।

সত্যসখা বললেন, কিছু ঠিক ছিল না। এইমাত্র তোমার দাদা বললেন। কেন যে, তাও জানি না। এখন আর ট্রেনেরও সময় নেই। মোটরে ক'রে কলকাতায় গিয়ে কালই শিলং মেল ধরতে হবে।

রমলা আশ্চর্য্য হয়ে শুধাল, ব্যাপারখানা কি বল তো? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

সত্যসখা বললেন, ঠিক জানি না। তবে ব্যাপার গুরুতর, সন্দেহ নেই। নইলে রঞ্জন চৌধুরীর মত স্থিরবুদ্ধি লোক হঠাৎ এত চঞ্চল হয় না।

*   *   *

দুদিন পরে সকালবেলা শিলঙের একটি প্রথম শ্রেণীর স্যানিটেরিয়ামে পর্য্যাপ্ত মাখন-রুটি ফল-মিষ্টি ও আণ্ডাপোচের সঙ্গে বয় চা নিয়ে হাজির হ'ল। এ ছাড়া ট্রেতে ছিল একখানি তাজা দৈনিক সংবাদপত্র।

চারজনে চেয়ার নিয়ে টেবিল ঘিরে বসলেন। চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজে চোখ রেখে সহসা রঞ্জন ব'লে উঠলেন, ওহে সত্য, এই দেখ।

তারপর মৃদু হেসে কাগজটা তার হাতে দিয়ে বললেন, পড় তো, আমরা শুনি।

সত্যসখা পড়তে লাগলেন, গত সন্ধ্যায় এক দল ক্ষিপ্তোন্মত্ত কৃষক প্রজা ঝুড়ি কোদাল কাঁধে চক্রধরপুর গ্রামে সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানকার ষষ্ঠীতলার পুকুর নামে খ্যাত ধর্ম্মসরোবরটি তাহারা রাতারাতি ভরাট করিয়া সকালে সরিষা বুনিয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে চরমুখে তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া জমিদারের আমলা-কর্ম্মচারী ও দরোয়ানরা পলাইয়া বাঁচে। অস্থায়ী কাছারি-বাড়িটি ভস্মীভূত।

দ্বারাবতী হতে সংবাদ এল—

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার

"They told me, Heraclitus, they told me you were dead."
—Cory

দ্বারাবতী হতে সংবাদ এল, হে সখা, রেখেছ দেহ,
—নিষ্প্রভ চোখে রুধিনু নয়নজল।
আজিও গোকুলে আছে নরনারী, মথুরায় বসে হাট,
পথে পথে গীত যৌবন-মঙ্গল।

তুমি ভাস দূর সিন্ধু-সলিলে, চরণে নিহিত শর,
—বৃথা ভাবি, তুমি উজিবে কি যমুনায়!
তোমার প্রিয় সে তরুণ তমাল আজিকে বনস্পতি;
তারি তলে মোর দীর্ঘ দিবস যায়।

ভীতু

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

শ্যামাদাস তার লাইব্রেরি-ঘরে বই পড়িতেছিল। চাকর হরিচরণ আসিয়া হাতের চিঠিখানা সম্মুখের টেবিলে রাখিয়া কহিল, থানা থেকে এসেছে। লোক দাঁড়িয়ে আছে।—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

চিঠি পড়িয়া শ্যামাদাসের মুখ শুকাইয়া উঠিল,—বড় দারোগাবাবু তাহাকে থানায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, এখনই যাইতে হইবে।

থানায় যাইবার মত কোন গর্হিত কর্ম্ম সে করিয়া বসিয়াছে, এখন শাস্তির ভয়ে মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে—তাহা নয়; কারণ গর্হিত কিছু করিবার মত ক্ষমতা শ্যামাদাসের ছিল না। তাহার চরিত্রে ভয় বস্তুটিই স্বভাবত বেশি ছিল এবং এত বেশি ছিল যে, দশখানা গ্রাম খুঁজিলেও এমন ভীতু মানুষ পাওয়া যাইত না। সমস্ত পৃথিবীকেই সে ভয়ের চোখে দেখিত। একটা অহেতুক ভয় জন্ম হইতেই সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, তাই ভয়ের জন্য কারণ-অকারণের আদৌ দরকার হইত না। অথচ লোকটি শিক্ষিত—অবশ্য শিক্ষাটাও ভয়ের জন্যই হইতে পারিয়াছিল; পিতার ভয়ে এম. এ. পাস করিয়াছে, আইন পাস করিয়াছে এবং পিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার ভয়ে ওকালতি ব্যবসাও সুরু করিতে সে বাধ্য হইত। কিন্তু পিতার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় উকিল হইবার হাঙ্গামা হইতে সে বাঁচিয়া গিয়াছিল। খাওয়া-পরার কোন ভাবনা ছিল না; কারণ পিতা কৃষ্ণদাসবাবু প্রচুর অর্থ ও শহরের প্রান্তে বৃহৎ বাড়ি রাখিয়া সে ভাবনা হইতে শ্যামাদাসকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

চিঠি পড়িয়া ভয়ে শ্যামাদাসের নড়িবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, চিঠি হাতে ঈজি-চেয়ারে নির্জ্জীবের মত সে পড়িয়া রহিল।

খবর পাইয়া কমলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, থানায় নাকি ডেকে পাঠিয়েছে?

কমলাকে দেখিয়া শ্যামাদাসের শুষ্ক মুখ আরও শুষ্ক হইয়া উঠিল। কৃষ্ণদাসবাবুর ভয়ে সে 'না' বলিতে পারে নাই, তাই বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষিতা ধনী কন্যাটি স্ত্রী হইয়া যেদিন তাহাদের ঘরে আসিয়াছে, সেদিন হইতেই তাহাকে সে এমন করিয়া ভয় করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে যে, এ লইয়া পাড়াপড়শীরাই শুধু আলোচনা করিত না, কমলা নিজেও হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আচ্ছা, তুমি এত ভয়ে ভয়ে থাক কেন? আমি কি বাঘ, না ভাল্লুক? কমলা বাঘও নয়, ভাল্লুকও নয়, তথাপি শ্যামাদাস তাহাকে ভয় করিত, বোধ হয় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পিতাকে ছাড়া এত ভয় কোন মানুষকে সে করে নাই।

কেন যে এমন অদ্ভুত ভয় তাহার হয়, কারণটা সে বুঝাইতে পারিত না। কমলার প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটু হাসিত, তাও ম্লান।

স্বামীর এই ভীরু স্বভাব প্রথম প্রথম কমলাকে খুব উত্তেজিত করিত। শ্যামাদাসকে নির্ভীক

করিতে, তাহার পৌরুষ জাগাইতে, অন্তত আর দশজন মানুষের মত চলনসই করিয়া তুলিতে কমলা বহুদিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। তাহাতে কেবল শ্যামাদাসের ভয় আরও বাড়িয়া যাইত। অবশেষে কমলা হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। যে ভয় ও ভীরুতা স্বভাবে এমন করিয়া মিশিয়া আছে, তা এ জীবনে দূর হইবার নয় বলিয়াই সে মানিয়া লইয়াছে। তাই স্বামীর স্বভাব বদলের ব্যর্থ চেষ্টা এখন সে আর করে না। গোপন দুঃখের মতই স্বামীর এই চরিত্র তাহার মনে স্থায়ী ক্ষত করিয়া রাখিয়াছিল; নিজের অদৃষ্টের এই সামান্য অবিচারটুকু মনে মনে ক্ষমা করিতে পারে নাই।

কমলার প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাদাস কোনমতে কহিল, হুঁ।—বলিয়া হাতের চিঠিটা বাড়াইয়া দিল। কমলাও মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার শঙ্কিত হইবার কারণও ছিল।

চিঠি শেষ করিয়া সে আপন মনেই বলিল, কেন ডেকে পাঠিয়েছে, তা লেখে নি? তারপর স্বামীর শুষ্ক ভীতু মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, ডেকে যখন পাঠিয়েছে, তখন না গিয়ে উপায় কি? নাও, দেরি ক'র না।

শ্যামাদাস উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু মুখের চেহারা মড়ার মত সাদা, যেন সমস্ত রক্ত সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছে। কমলা মুখে হাসি টানিয়া কহিল, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? এতে ভয়ের কি আছে,—চোরও নও, খুনীও নও। তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তোমাকে যেন ফাঁসি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। মনে একটু জোর আন তো।

কিন্তু শ্যামাদাসের মুখের দিকে চাহিয়া তাহারও জোর কমিয়া গেল, কহিল, হরিচরণকে তোমার সঙ্গে দোব?

—দাও।

হরিচরণই আসিয়া ঢুকিয়া কহিল, লোকটা তাড়া দিচ্ছে। বলে, তাড়াতাড়ি আসতে বল।

কমলা হরিচরণকে তাড়া দিয়া উঠিল, তাড়া দিচ্ছে? বলগে যা, দেরি করতে না পারে, চ'লে যাক, বাবু পরে যাচ্ছেন।

শ্যামাদাস বাধা দিয়া কহিল, না না, বলগে যে, আমি এক্ষুনি আসছি। তুই আগে আমাকে এক গেলাস জল দিয়ে যা।

এই শীতেও শ্যামাদাসের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বোধ হয় বিন্দু বিন্দু ঘামও কপালে দেখা দিয়াছিল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া কমলার দয়া হইল। এই বয়স্ক লোকটি যে শিশুর চেয়েও অসহায়, এই পুরানো কথাটাই আজ আর একবার নূতন করিয়া তাহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। কহিল, তুই থাক, আমি জল এনে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে নে, তোকে বাবুর সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

তৈয়ারি হইবার জন্য হরিচরণ ও জল আনিবার জন্য কমলা বাহির হইয়া গেল। কমলা জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, শ্যামাদাস সেই এক স্থানেই তেমনই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

হরিচরণকে সঙ্গে লইয়া শ্যামাদাস বাহির হইয়া গেলে পরও কমলা জানালায় দাঁড়াইয়া রহিল। শহরের দিকে যে রাস্তাটা গিয়াছে, সেদিকে চোখ পাতিয়া সে ভাবিতে লাগিল। স্বামীর ভয়ার্ত্ত মুখের

ছবি কিছুতেই সে মন হইতে মুছিতে পারিতেছিল না, সে মুখ যেন আগুন দিয়া দাগ দিয়া তাহার মর্ম্মে ছাপিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ আর তাহার রাগ হইল না, করুণায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। পক্ষীমাতা যে স্নেহে শাবককে ডানায় ঢাকিয়া লয়, সে স্নেহ যেন তাহার বুকের নীড় ছাড়িয়া ডানা মেলিয়া ঐ সম্মুখের পথে উড়িয়া চলিয়াছে কাহাকে ছায়া-আচ্ছাদনে আড়াল করিবার জন্য। সেও যে এত ভালবাসিতে পারে, এত স্নেহ যে তাহার বুকেও আছে, কমলা নিজে তাহা জানিত না। নিজের মন সে ঠিক করিয়া ফেলিল।

বাড়ির ভিতরের দিকের একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া সে একটুক্ষণ থামিল। তারপর বদ্ধ দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। দেওয়ালের দিকে খাটে একটি লোক বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া বই পড়িতেছিল, কমলাকে ঢুকিতে দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া রাখিয়া কহিল, এস।

কমলা দরজা ভেজাইয়া চেয়ার টানিয়া লইয়া পাশে আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, সন্তোষদা, এখন কেমন আছ?

—ভালই। একি, তোমার অসুখ করেছে নাকি?

—না। তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

—একটা কেন, দশটা কথা বলতে পার। কিন্তু তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন?

কমলা কহিল, ও কিছু না। শোন, তুমি আজ যেতে পারবে? এখানে তোমার থাকা চলবে না।

—কেন, পুলিসে খবর পেয়েছে নাকি?

—না, এখনও পর্য্যন্ত পায় নি। পুলিসের ভয় আমি করি না। কিন্তু তবু তোমাকে এই অবস্থায় যেতে বলতে হচ্ছে। যেতে পারবে না?

সন্তোষ কহিল, খুব। কিন্তু কি হয়েছে, আমাকে বলতে কি কোন বাধা আছে?

কমলা কহিল, না, কোন বাধা নেই। কিন্তু তুমি কি সত্যিই মনে কর যে, তুমি হাঁটতে পারবে? ঘা তো এখনও শুকোয় নি।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা নিজের ডান পায়ের দিকে চাহিয়া লইয়া সন্তোষ কহিল, ও শুকোতে দেরি আছে। কিন্তু কি জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ, তা তো বললে না?

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে কহিল, আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয় নি। তুমি যে এখানে আছ, তা তিনি জানেন না।

সন্তোষ কহিল, তা আমি জানি।

—তিনি যে কত ভীতু মানুষ, তা তাঁকে না জানলে বুঝতে পারবে না। কিছুক্ষণ হ'ল, তাঁকে থানায় ডেকে নিয়ে গেছে। তাঁর যে মুখের ছবি আমি দেখেছি, তাতে তোমাকে এখানে রাখা আমার সম্ভব নয়। তোমাকে সত্যিই বলব, ঐ লোকটির জন্যে আমার মন—করুণা দয়া যা বল, তাতে ভ'রে গেছে। তুমি যদি সে মুখ দেখতে, তবে তোমারও দয়া হ'ত। এত ভীরু, এত অসহায়, তা তুমি ভাবতে পার না।

সন্তোষ হাসিমুখে কহিল, এই কথাটা বলবার জন্যে মুখ এত শুকনো ক'রে আসতে হ'ল? এত গম্ভীর ও ম্লান হয়ে ঢুকেছিলে যে, ভেবে পাচ্ছিলাম না, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘ'টে গেল, যার জন্যে তোমার চেহারা এমন ক'রে বদলে গেছে। কিন্তু আমাকে তাড়াতে হ'লে তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে।

কমলা চোখ তুলিয়া চাহিল, দৃষ্টি তাহার যেন শোকাচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিল, কি কাজ?

—খুব বিশ্বাসী লোক একজন আমার সঙ্গে দিতে হবে।

তেমনই শান্ত স্বরে কমলা কহিল, তা তুমি পাবে। অন্য লোক না পাওয়া যায়, আমিই সঙ্গে যাব। কিন্তু কোথায় যাবে?

সন্তোষ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তুমি বিশ্বাসী সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নেওয়া চলবে না।

—কেন?

—কারণ, পথে তুমি আমার কোন কাজেই আসবে না। পায়ের অবস্থা তো জানই, আমাকে এক রকম ব'য়েই নিয়ে যেতে হবে। সে কাজ তুমি পারবে না।

—আচ্ছা, সে লোক তুমি পাবে। তোমার দ্বিতীয় কাজটি কি?

—এটা তুমি পারবে। ব্যাণ্ডেজটা খুলে একটু ওয়াশ ক'রে নিতে চাই। বেশ ভাল ক'রে বেঁধে দেবে, যাতে চলার ধাক্কাটা সামলাতে পারি। যদি চলতে না পারি, পথেই ধরা প'ড়ে যাই, তবে সে দোষ কিন্তু তোমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধার—বুঝলে?

কমলা এ হাসিতে যোগ দিল না, রসিকতারও উত্তর করিল না, জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে?

—বেশি দূরে নয়, এই শহরেই। তা ছাড়া, বেশি দূরে যাবার ক্ষমতাও নেই।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এখনই যেতে চাও?

—না, সন্ধ্যের পর একটু রাত হ'লে বার হব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা ডাকিল, সন্তোষদা, সত্যি কথা বলবে?

—বলব, কিন্তু প্রশ্নটা কি শুনি?

—এই অবস্থায় তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, আমার ওপর শ্রদ্ধা তোমার নিশ্চয় নষ্ট হয়েছে। ভাবছ, এ লোকটাকে যা এতকাল জেনেছি, তা এ নয়, আর দশ জনের মতই এ স্বার্থপর, আত্মসর্ব্বস্ব। সত্যি কি না বল?

—সত্যি নয়। আমি ভাবছি যে, তুমি খামকা মনে এত কষ্ট পাচ্ছ কেন? কোন জিনিসকে সহজভাবে নেবার শক্তি তোমারও নেই, তাই অনাবশ্যক দুঃখ তোমরা পাও।

কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল গরম জল ক'রে নিয়ে আসছি। আজও জ্বর হয় নি, না?

—না, দু দিন যাবৎ জ্বরটা বন্ধ আছে দেখছি। বেঁচে থাকলে শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে একদিন এসে আলাপ ক'রে যাব।

—এ সখ কেন ?

—এ সখ নয়। যে ভীরুতা এমন ক'রে তোমাকে মুগ্ধ করেছে, তার জাতটা জানবার লোভ হচ্ছে।

—আলাপ ক'রে সুখী হবে না, খামকা একটা লোকের ওপর তোমার ঘৃণা জ'ন্মে যাবে।

—আচ্ছা আচ্ছা, আপনি থামুন, সে আমি বুঝব।

বাহির হইয়া যাইবার জন্য কমলা দরজায় হাত দিয়া কহিল, আমি এখনই আসছি, বেশি দেরি হবে না।

—শোন।

আহ্বান শুনিয়া কমলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়া রহিল।

সন্তোষ কহিল, দেখ, আমার মানিব্যাগটা একেবারে খালি। বুঝতেই পারছ, ওটাতে কিছু দেওয়া দরকার।

—তা আমাকে বলতে হবে না। সময়ে ওটা ভরতিই পাবে।

—বাবাঃ, রাগটা তো পুরোমাত্রায়ই আছে দেখছি।

দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়া কমলা চলিয়া গেল।

হরিচরণকে সঙ্গে লইয়া শ্যামাদাস থানার কাছাকাছি যখন আসিল, তখনও আকাশে সূর্য্য ছিল, সন্ধ্যা হইতে তখনও কিছু দেরি আছে। সারা পথটা সে মুখ বুজিয়াই আসিয়াছে, একটিও কথা বলে নাই। শ্যামাদাসের স্বভাব হরিচরণের জানা ছিল, তাই সেও কোন কথা না কহিয়া মনিবের পিছনে মনিবের মতই মুখ বুজিয়া পথ চলিয়াছে। থানার লোকটি আগে আগে যাইতেছিল, বাক্যালাপের মত মেজাজ বা উৎসাহ বোধ হয় তাহার ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে ফিরিয়া দেখিতেছিল যে, পিছনের লোক ঠিক আসিতেছে কি না। থানার নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্যামাদাসের ভয় এত বাড়িয়া গেল যে, তাহার পা উঠিতে চাহিতেছিল না।

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, দাঁড়ালেন যে ?

শ্যামাদাস কহিল, না, এই—

কথা আর সমাপ্ত করিল না, আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

শ্যামাদাস বুঝিতে পারিল, তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অসম্ভব দ্রুত হইয়াছে। এবং শ্বাসের ক্রিয়াও এত দ্রুত হইতে সুরু করিয়াছে যে, তাহারা এত চেষ্টাতেও সহজ ও স্বাভাবিক হইতে রাজি হইতেছে না। দেহের সমস্ত কল-কব্জাগুলিই যেন অন্য কোন তৃতীয় শক্তির দখলে গিয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। নিজের শরীরের উপর তাহার নিজের কোনও অধিকার আর নাই।

শ্যামাদাস আচ্ছন্নের মতই পুলিস-ব্যারাক পার হইল, অস্ত্রাগারও পার হইল—সেখানে একটা সিপাই বন্দুক কাঁধে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহারা দিতেছে, এক পাশে পিতলের একটা বড় পেটা ঘণ্টা

ঝুলিতেছে, সে নগণ্য বস্তুটি পর্য্যন্ত শ্যামাদাসের নজরে পড়িল। অবশেষে থানার ঘরের সামনে আসিয়া তাহারা পৌঁছিল। সঙ্গের লোকটি বারান্দায় উঠিতে উঠিতে পিছন ফিরিয়া কহিল, আসুন।

শ্যামাদাসের মানসিক অবস্থা ইতিমধ্যেই যে অবস্থায় আসিয়াছিল, তারপরেও ভয়ের কোন জায়গা না থাকারই কথা। কিন্তু 'আসুন' আহ্বান শুনিয়া সে এত ভয় পাইয়া গেল যে, ইহার তুলনায় তাহার কিছুক্ষণ আগের অভিজ্ঞতা অতিশয় সুসহ ছিল।

লোকটিকে অনুসরণ করিয়া শ্যামাদাস উপরে উঠিয়া গেল। ঘরে ঢুকিবার মুখে লোকটি হরিচরণকে কহিল, ওখানে গিয়ে ব'স।—বলিয়া বারান্দার এক ধারে বেঞ্চি দেখাইয়া দিল।

শ্যামাদাসকে কহিল, আপনি আসুন।

শ্যামাদাস হরিচরণের মুখের দিকে এমন ভাবে চাহিল, যেন সে জন্মের মতই বিদায় লইয়া যাইতেছে।

দুই ধারে টেবিলে কর্ম্মচারীরা কাজে ব্যস্ত ; মধ্য দিয়া পথ করিয়া শ্যামাদাস লোকটির পিছনে পিছনে আসিয়া বড়বাবুর টেবিলের সামনে আসিয়া থামিল।

বড়বাবু লিখিতেছিলেন ; সেলাম দিয়া লোকটি পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

বড়বাবু চোখ তুলিলেন, কহিলেন, কি ?

—হুজুর, শ্যামাদাসবাবু।

—ওঃ।—বলিয়া শেষটা বাঁ হাত দিয়া চশমাটা খুলিয়া লইয়া শ্যামাদাসের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বসুন।

শ্যামাদাস দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ যদি তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিত, তবে সত্যই তাহার সাহায্য করা হইত। নিজের ইচ্ছাটা পর্য্যন্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

বড়বাবু কহিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।—বলিয়া সম্মুখের চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। শ্যামাদাস বসিয়া পড়িল।

হাতের কাজ রাখিয়া বড়বাবু কহিলেন, আপনাকে ভাল মানুষ ব'লেই জানি, তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি। ব্যাপারটা ভয়ানক গুরুতর, যা জানেন পরিষ্কার খুলে বলবেন, কিছু গোপন করবেন না ; তা হ'লে বিপদে পড়বেন।

গোপন করিতে নিষেধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, শ্যামাদাসকে এ উপদেশ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। আর ভয়ের কথা শ্যামাদাসকে বলার কি কোন অর্থ হয় ? বড়বাবু বোধ হয় জানিতেন না যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই গীতা বুঝাইতেছেন ; নতুবা শ্যামাদাসকে ভয়ের কথা বলা সম্ভব হয় কি করিয়া ?

বড়বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আসুন। শ্যামাদাস যন্ত্রের মতই উঠিয়া দাঁড়াইল। একটি কামরার সামনে আসিয়া বড়বাবু কহিলেন, একটু দাঁড়ান।—বলিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে ঢুকিলেন। পর্দ্দার এ পাশে দাঁড়াইয়া শ্যামাদাস ভাবিতে লাগিল, না জানি কোন্

দুর্ভাগ্য তাহার জন্য ওপাশে প্রতীক্ষা করিতেছে। পর্দ্দার এক পাশ দিয়া বড়বাবুর মুখ বাহির হইল, তিনি কহিলেন, ভেতরে আসুন।

ভিতরে ঢুকিয়াই শ্যামাদাস সাহেবের মুখোমুখী পড়িয়া গেল, সাহেব এদিকে মুখ করিয়া সামনের টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। তিনি ঘাড় তুলিয়া চাহিলেন, কিন্তু শ্যামাদাসের সাহস হইল না যে, সে মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে। প্রথম দৃষ্টিতেই সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, সাহেবের ভ্রূ নাই বলিলেই চলে, মনে হয়, দাড়ি গোঁফের সঙ্গে তাহাও কামাইয়া সাফ করিয়া ফেলিয়াছেন।

শ্যামাদাসের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সম্ভ্রান্ত বংশের লোক বলিয়া বুঝিতে বিদেশী সাহেবেরও কষ্ট হইল না, কিন্তু তিনি গম্ভীর কণ্ঠেই কহিলেন, টেক ইওর সীট।

বড়বাবু কহিলেন, বসুন শ্যামাদাসবাবু।—বলিয়া তিনি সাহেবের অনুমতি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সাহেবের বাঁ দিকে যে ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া শ্যামাদাসের মনে যেটুকু বা ভরসা ছিল, লোপ পাইল। মানুষের চোখ মুখ যে এত কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর হইতে পারে, শ্যামাদাসের জানা ছিল না। লোকটি যেমন কালো, তেমনই মোটা। মাতালের চোখের মত চক্ষু দুইটি লাল, এ পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্যামাদাসকে দেখিবার জন্য তিনি ঘাড় ফিরানো দরকার বোধ করেন নাই, চোখের কোণায় অক্ষিগোলক দুইটিকে সরাইয়া আনিয়া দেখার কাজ সারিতেছেন। হাতে তাঁহার একটা মোটা জ্বলন্ত চুরুট, তাহা হইতে ধোঁয়া উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে এবং কড়া গন্ধ সারা ঘরময় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

এক সময় সাহেব কহিলেন, মাখনবাবু, বুঝতেই পাচ্ছেন যে, এ সহজে কিছু স্বীকার করবে না। দেখে মনে হয়েছিল, সরল ভদ্রমানুষ, কিন্তু তা নয়।

মাখন কহিলেন, হুঁ! তারপর শ্যামাদাসের দিকে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনি তবে বলতে চান যে, আপনি টেররিস্ট্‌দের টাকা দিয়ে সাহায্য করেন নি?

জেরা ও প্রশ্ন এবং তৎসঙ্গে ভীতিপ্রদর্শন—এই তিনের ধাক্কায় ইঁহারা ইতিমধ্যেই শ্যামাদাসকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্যামাদাস এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, একটু শুইতে পারিলে বাঁচিত।

কোনমতে কহিল, আমি এদের কাউকেই চিনি না, টাকা দোব কেমন ক'রে?

মাখনবাবু অপাঙ্গের দৃষ্টিতে শ্যামাদাসকে খানিকক্ষণ বিদ্ধ করিয়া পরে কহিলেন, বেশ, আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম, আপনি ওদের টাকা দেন নি। কিন্তু আপনার স্ত্রী?

—তার কথা আমি কেমন ক'রে বলব?

—স্ত্রীর কাজকর্ম্মের খোঁজ আপনি রাখেন না, এই বলতে চান? বিয়ের আগে তিনি কলকাতায় কলেজে পড়তেন, এ খবর রাখেন?

শ্যামাদাস ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, এ সমস্ত সে অবগত আছে।

—বেশ, তখন তিনি এ দলে ঢুকেছেন, তা আপনি জানেন?

শ্যামাদাস ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, তাহা সে জানে না।

—জানেন না ? আচ্ছা, জানেন কি না, পরে বোঝা যাবে। এখন আর একটা কথার উত্তর দিন, সন্তোষ রায় ব'লে কাউকে আপনি চেনেন ?

শ্যামাদাস আবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, ও নামের কাহাকেও সে চেনে না।

—আপনি পত্রিকা পড়েন ? বেশ, তবে এ নাম কোন দিন আপনার নজরে পড়ে নি ?

নজরে পড়ে নাই শুনিয়া মাখনবাবু তীক্ষ্ণ কটাক্ষ দিয়া শ্যামাদাসের গোটা শরীরটায় মুখ হইতে সুরু করিয়া উপর নীচ বার কয়েক এমনভাবে টহল দিয়া লইলেন যে, ক্ষুধার্ত্ত পশু যেন জিভ দিয়া মৃতপ্রায় শিকারের গা চাটিতেছে।

পরে কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, সন্তোষ রায় টেররিস্ট্, পলাতক। তার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি, দিন পনরো আগে আপনার বাড়িতে তিনি এক রাত্তির ছিলেন। আপনার স্ত্রীর তিনি বিশেষ পরিচিত। পায়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, রোগা লম্বা কালো, এ রকম লোক কি আপনার বাড়িতে যায় নি ? গোপন করবার চেষ্টা করবেন না। কবে গিয়েছিল, তারপর কবে চ'লে যায়, সঙ্গে কে ছিল এবং কোথায় যায়, যাবার সময় কত টাকা দিয়েছেন, সমস্ত সংবাদ যা জানেন খুলে বলুন, যদি বাঁচবার ইচ্ছে থাকে।

বাঁচিবার ইচ্ছা শ্যামাদাসের ছিল, কিন্তু খুলিয়া বলিবার মত শুধু একটি মাত্র কথাই তাহার ছিল, যাহা সে বারবার জানাইয়া আসিতেছে যে, এসব খবর সে কিছুই জানে না।

—চুপ ক'রে থাকলে লাভ হবে না, জবাব দিন।

—বলেছি তো, আমি কিছুই জানি না।

মাখনবাবু কটুকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, কিছুই জানেন না ? স্ত্রীর চরিত্রের খবরটা জানেন ?

এই অভদ্র ইঙ্গিতেও শ্যামাদাস চুপ করিয়া রহিল, কারণ প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, এ কথায় চটিবার মত সাহস বা মনের অবস্থা তাহার নয়।

সাহেব কহিলেন, মাখনবাবু, মিথ্যে চেষ্টা করছেন, এ ভাবে হবে না।

মাখনবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, অল্‌রাইট। উঠুন, আপনি কতবড় শয়তান আমি দেখে নিচ্ছি। এ হাত দিয়ে যে সব লোক শায়েস্তা হয়েছে, তাদের কাছে আপনি তো শিশু। উঠুন।

ধমক খাইয়া শ্যামাদাস উঠিয়া দাঁড়াইল।

সাহেবের দিকে চোখ ঘুরাইয়া মাখনবাবু কহিলেন, ইউ আর কামিং, মিস্টার মেয়ার্স ?

মিঃ মেয়ার্স কহিলেন, সার্টেন্‌লি।

মাখনবাবু হাঁকিলেন, পাঁড়ে!

যমদূতের মত দেখিতে বিরাটকায় পাঁড়ে আসিল। সেলাম দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হুজুর

শিওপ্রসাদ আছে ? বেশ, তোরা দুজনে বাবুকে নিয়ে আয় তো।—বলিয়া মেয়ার্সকে সঙ্গে

লইয়া বাহির হইয়া গেলেন ; যাইবার সময় কি একটা বস্তু ড্রয়ার হইতে তুলিয়া লইয়া পকেটে ভরিয়া লইলেন।

শিওপ্রসাদ আসিয়া পৌঁছিলে, পাঁড়ে শ্যামাদাসকে কহিল, চলুন।

থানার পিছনের দিকের দরজা দিয়া উভয়ের তত্ত্বাবধানে শ্যামাদাস বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল ; দেখিল, ইতিমধ্যে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আকাশে আলো নাই এবং পৃথিবীতে ছায়া নামিয়াছে। শিওপ্রসাদ ও পাঁড়ে তাহাকে এক সময়ে যেখানে আনিয়া হাজির করিল, তাহা একটা নির্জ্জন পুকুরের পাড়, ধারে-কাছে কোথাও জনমানব চোখে পড়ে না, শুধু দূরে থানার আলো দেখা যাইতেছে। মিঃ মেয়ার্স ও মাখনবাবু আসিয়া দেখা দিলেন।

আসিয়াই মাখনবাবু হুকুম দিলেন, নে, জামা খুলে ফেল।

পাঁড়ে ও শিওপ্রসাদ আজ্ঞাপালনে লাগিয়া গেল, প্রথমে গা হইতে শালখানা খুলিয়া লইল, বোতাম উন্মুক্ত করিয়া গরম পাঞ্জাবিটা উন্মোচন করিয়া ফেলিল। তারপরে শ্যামাদাসের গা হইতে গেঞ্জিটা খুলিবার জন্য হাত দিতেই মাখনবাবু বাধা দিলেন, থাক, আর দরকার নেই, এতেই চলবে।

খোলা আকাশের নীচে খোলা গায়ে এই নির্জ্জন পুকুরপাড়ের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শ্যামাদাসের সমস্ত শরীর শীতে হিম হইয়া আসিতে লাগিল।

মাখনবাবু মুখোমুখী দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, কি, কিছু বলবেন, না বলবেন না ?

মানুষের গলা এমন হয় কেমন করিয়া ? যেন একটা অশরীরী ক্ষুধার্ত্ত হিংস্রতা চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। শ্যামাদাসের চেতনা প্রায় নিবু নিবু অবস্থায় আসিয়াছে, উত্তর দিবার শক্তি তাহার ছিল না।

—আচ্ছা, তবে চুপ ক'রেই থাকুন।—বলিয়া পকেট হইতে পিস্তল টানিয়া বাহির করিয়া মাখনবাবু, শ্যামাদাসের বুকের উপর ধরিলেন, কহিলেন, আপনাকে জন্মের মতই চুপ করিয়ে দিচ্ছি।

অর্থহীন নিষ্প্রভ চোখ মেলিয়া শ্যামাদাস চাহিয়া রহিল। শীতে ও ভয়ে শরীর ও মন দুইই তাহার পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হইয়া গিয়াছে।

অকস্মাৎ সেখানে ভয়ানক আলোড়ন দেখা দিল, নিবিবার আগে প্রাণশিখার বোধ হয় এ অন্তিম পাখার ঝাপট। নাভির কাছটা কেমন করিতেছে, সমস্ত শিরা-উপশিরা বারম্বার কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে, কি যেন ছিঁড়িয়া যাইবে মনে হয়। নাভিমূলেই কি প্রাণের স্থান ? মায়ের সঙ্গে তো নাড়ীর ঐখানেই যোগ ছিল একদিন, প্রাণপথের সেই সেতু ধরিয়াই এ ধারে সে আসিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইবার কালে এখানে একবার ছেদ করা হইয়াছে, আজ বোধ হয় সেতুর অপর দিকটায় ছেদ পড়িতে চলিয়াছে। তাই নাভির কাছটা এমন করিতেছে। বুকের কাছটায়, যার সোজাসুজি পিস্তলের মুখটা ধরা আছে, যেখান হইতে মৃত্যুর ছোবল আসিয়া পড়িল বলিয়া, সেইখানটায় ঝড় উঠিয়াছে, হৃৎপিণ্ডের গতি অসম্ভব দ্রুত হইয়াছে, যন্ত্র বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে। জাহাজের নাবিকের মত দুর্য্যোগের অন্ধকার সমুদ্রে কেহ কি প্রাণপণ লড়াই করিতেছে শরীরের ঐ ছোট্ট সামান্য চাকাটাকে আয়ত্তে রাখিতে ? ডান পাশে ফুসফুসেও ঝড় সংক্রামিত হইয়াছে, পালে মৃত্যুর ঝড়ো হাওয়া

জোরে ঠেলা দিতেছে, ছিঁড়িয়া ফেলিল বলিয়া। সমস্ত কিছু লইয়া শরীররাজ্যে যেন কোন অদৃশ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাণান্ত প্রতিরোধ চলিয়াছে। জীবনের সীমান্তরেখায় সে আসিয়াছে, আর একটু সামান্য ঠেলিয়া দিলেই হয়। নাভির প্রাণবন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে, হৃৎযন্ত্র থামিয়া চিরশান্ত হইবে, ফুসফুসের ছেঁড়া পাল নামিয়া গুটাইয়া পড়িবে। প্রান্তসীমার ওধারে যে অজানা অবস্থা রহিয়াছে, তাহার প্রতীক্ষায় শ্যামাদাসের চেতনা কোনমতে ধুক ধুক করিতে লাগিল।

অবশেষে মৃত্যুর শেষ ঢেউ শ্যামাদাসের শরীর ও মনের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল; সমস্ত শরীর একটা ঝাঁকানিতে কাঁপিয়া স্থির হইল। শ্যামাদাস চক্ষু বুজিল। কিন্তু সে তো মরে নাই, এখনও বাঁচিয়া আছে। নাভির কাছে কিছু একটা ছিঁড়িয়াছে, সে টের পাইয়াছে। ফুসফুসের পালটা উল্টাইয়া গিয়াছে, স্বাভাবিক অবস্থায় নাই, তাহা সে পরিষ্কার অনুভব করিয়াছে। হৃৎযন্ত্র সহজ অবস্থায় আসিয়াছে, বেশ বুঝিতে পারিয়াছে।

কিন্তু একি হইল তাহার! এ রকম লাগিতেছে কেন? শরীরে ভার নাই নাকি? নিজের চিন্তাকে সে দেখিতে পাইতেছে যে! নিজের মধ্যে এ কোন্ জায়গায় সে আসিয়া পড়িয়াছে? এমন স্থান যে থাকিতে পারে, সে তো কোন দিন জানে নাই, সন্দেহমাত্র করে নাই। নিজের যে অস্তিত্ব সে এতদিন জানিয়াছে, সে অস্তিত্ব, সে শ্যামাদাস তুচ্ছ হইয়া ঐ যে সামনে নীচে পড়িয়া আছে। নিজের মধ্যে এ বিভাগ আসিল কোথা হইতে? কোথায় বিদারণরেখা টানা হইল, যাহার জন্য আর একটা অস্তিত্বের অবকাশ হইল? নিজের এতদিনের পরিচিত 'আমি'টা ক্ষুদ্র নগণ্য হইয়া গিয়াছে, তাহার আরও গভীরে আরও ঊর্দ্ধে একি স্থান ও অবিস্থিতি! হঠাৎ তার বুক কাঁপিয়া উঠিল, তবে কি এই সেই স্থান, যাহার জন্য এই ত্রিশ বছরের জীবনে একান্ত সঙ্গোপনে প্রাণপণ প্রার্থনা করিয়াছে? যেখানে পৌঁছিলে মৃত্যুর ভয়, ক্ষতির ভয়, দুঃখের ভয় কিছুই থাকে না, যেখানে কেবল অমৃত ও আনন্দ। ভয়ের পথ দিয়া তাহার জীবনবিধাতা সত্যই কি শেষে তাহাকে সেখানেই আনিলেন? দেবতার জয় হউক, দেবতা, তোমার জয় হউক।—শ্যামদাসের মুদিত দুই চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মাখনবাবু ও মিঃ মেয়ার্স এ চোখের জলের সহজ অর্থই বুঝিলেন, অর্থাৎ ভুল অর্থ বুঝিলেন।

মেয়ার্সের কণ্ঠস্বর শ্যামাদাসের কানে আসিল, Give him a last chance to speak out his mind।

শ্যামাদাস চক্ষু মেলিল। কিন্তু দৃষ্টি তাহার নূতন হইয়া গিয়াছে; দেখিল, সম্মুখে ছায়ামূর্ত্তি মাত্র রহিয়াছে।

শ্যামাদাস কিন্তু জানিতেও পারে নাই যে, এই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটিতে সেকেণ্ড কয়েকের বেশি লাগে নাই। মাখনবাবু 'অল রাইট' বলিয়া পিস্তল নামাইয়া লইয়া কহিলেন, আপনাকে শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি, বলবেন কিনা বলুন?

শ্যামাদাসের হাসিতে ইচ্ছা হইতেছিল, ইহারা যে অভিনয় করিতেছে, তাহা ইহারা জানে না।

কিন্তু সে শান্ত সুরেই জবাব দিল, না, বলব না। কারণ, আমি কিছু জানি না।

চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাষা যে সাধারণ মানুষের মত নয়, পূর্ব্বের শ্যামাদাসের মত তো নয়ই—পাঁড়েজী ও তাহার সঙ্গী শিওপ্রসাদ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। তাহারা শ্যামাদাসের দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। শ্যামাদাসের বেশ মজা লাগিতেছিল, এতদিন সে ভয় পাইয়াছে, আজ সেই ভয় পাইবার পালা ইহাদের আসিয়াছে। কিন্তু ইহারাও তাহারই মত ভুল করিতেছে, জানে না যে, এ ভয় সত্য নয়, খামকা এ ভয়ে ভুগিতেছে।

—বলবেন না?—মাখনবাবুর গলা তেমনই পূর্ব্বের মত কটু, কিন্তু শ্যামাদাসের কানে তাহার অন্য আস্বাদন লাগিল।

—না, জানলেও বলতাম না।

এ উত্তরে মাখনবাবুর হিতাহিতজ্ঞান লোপ করিয়া দিল, ভদ্রতা আর বজায় রাখিতে পারিলেন না। অশ্রাব্য ও অভদ্র গালাগালি দিয়া কহিলেন, আচ্ছা, বল কি না দেখছি। নে, হারামজাদাকে জলে নামা তো। চুবিয়ে জল খাইয়ে একটু একটু ক'রে শ্বাস বন্ধ ক'রে মারব।—বলিয়া নিজেই শ্যামাদাসকে ধাক্কা দিয়া তাহাদের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। পাঁড়ে ও শিওপ্রসাদ তাহাকে টানিয়া পুকুরের কিনারে লইয়া গিয়া দুই হাত ধরিয়া জলে নামাইয়া দিল।

শ্যামাদাস জলে পড়িয়াই মনে মনে বলিয়া উঠিল, উঃ, জল কি ঠাণ্ডা! যদি বেশিক্ষণ থাকিতে হয়, তবে প্রাণধারণ সম্ভবপর নাও হইতে পারে। বরফের দেশে লোক থাকে কেমন করিয়া? তাহাদের অভ্যাসে সহ্যশক্তি আসে। কিন্তু এই প্রথম চেষ্টাতেই এতখানি সহ্যশক্তি সে নিজের ক্ষেত্রে আশা করিতে পারে না। গলাজলে দাঁড়াইয়া নিজের অবস্থায় সে বেশ একটা কৌতুক বোধ করিল। শীতে সিদ্ধ করে না বটে, কিন্তু চরম শীতটার স্বাদ আগুনের মতই লাগে যেন, হাড় বিদ্ধ করিয়া শীতের বাধাহীন যাতায়াতের পথ।

মাখনবাবুর আহ্বানে শ্যামাদাসের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি পাড় হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি, বলবার ইচ্ছে হচ্ছে?

—হচ্ছে, কিন্তু কথা তো আপনি বুঝবেন না। যেটা বুঝবেন, তাই বলছি। মারার মতলব যদি সত্যিই না থাকে, তবে বেশিক্ষণ আর এখানে রাখবেন না, টেনে তুলুন। নইলে শেষটায় আপনাদেরই ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

—ফ্যাসাদে পড়তে হবে?—বলিয়া মাখনবাবু উপরে দাঁড়াইয়া ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন। পরে কহিলেন, নে, ব্যাটাকে তোল তো।

আজ্ঞা পাইয়া পাঁড়ে ও তাহার সঙ্গী শিওপ্রসাদ ব্যাটাকে এক রকম হেঁচড়াইয়া টানিয়া উপরে তুলিল। উপরে আসিতেই রাত্রির বাতাস গায়ে লাগিয়া শ্যামাদাসের শীত যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল, ইহার চেয়ে জলেই সে ভাল ছিল। গেঞ্জিটা কোনমতে খুলিয়া ফেলিয়া কাপড়ের কোঁচা নিংড়াইয়া শরীরের জল মুছিতে ব্যস্ত হইল। শরীরটা বেশ কাঁপে কিন্তু, যেন ছড়ের মার খাওয়া বীণার তার। উপমাটা জুতসই হইয়াছে শ্যামাদাসের মনে হইল। দাঁতে দাঁত লাগিয়া ঠকাঠক আওয়াজ বাজিতেছে,

শেষটা উহারাও বাদ্যযন্ত্রের পংক্তিতে উঠিল নাকি! হাঁটু দুইটা সেই যে সমান তাল ঠুকিতেছে, ক্ষান্ত দিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

—আচ্ছা, আজ যান। এই কেবল সুরু হ'ল, মনে রাখবেন শ্যামাদাসবাবু। দেখি, আপনার কাছ থেকে কথা বের করা যায় কিনা।—বলিয়া মেয়ার্সকে, পাঁড়েকে ও শিওপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া মাখনবাবু শ্যামাদাসকে ত্যাগ করিয়া থানার দিকে চলিয়া গেলেন। শ্যামাদাস পিছনের অন্ধকার হইতে ডাকিয়া কহিল, আমার চাকরটা থানায় আছে, দয়া ক'রে পাঠিয়ে দেবেন।

পিছনে হরিচরণ ভিজা কাপড়, গেঞ্জি ও জুতার পুঁটলি লইয়া দৌড়াইয়া প্রভুর সঙ্গ রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। আর এদিকে শ্যামাদাস দুই তিনটা সিঁড়ি এক এক লাফে ডিঙাইয়া দালানে গিয়া ঢুকিল। প্রভুর হাবভাব দেখিয়া ভৃত্য হরিচরণ ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, শেষটা পাগল হইয়া যায় নাই তো? একমাথা দুশ্চিন্তা লইয়া এই শীতের রাত্রে সে এতখানি পথ অন্ধকারে দৌড়াইয়া মরিয়াছে, সিঁড়ি ভাঙিয়া এতক্ষণে সে দালানে ঢুকিতে পারিল।

—কমলা, কমলা!—বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্যামাদাস কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া চলিল। ঝিকে সামনে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মা কোথায়?

ঝি অবাক হইয়া গিয়াছিল, এক পাশে সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ ছাড়িয়া দিল এবং একটা দরজার দিকে দেখাইয়া দিয়া নিম্নস্বরে কহিল, ঐ ঘরে।

—কমলা!—বলিয়া ডাক দিয়া দরজা ঠেলিয়া শ্যামাদাস ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।

কমলা টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, খাটের কাছে চেয়ারে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পা তুলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটি লোক কি করিতেছিল এবং তাহার পাশেই বছর ষোলর একটি হৃষ্টপুষ্ট ছেলে হাতে ছোট একটা সুটকেস ঝুলাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তিনজনেই গলার ও দরজা খোলার শব্দে এদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। শ্যামাদাসকে দেখিয়া বিস্ময়ে যেন তাহারা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

নিজের পোষাকের দিকে শ্যামাদাসের এতক্ষণে দৃষ্টি পড়িল। শালখানা কাপড় করিয়া পরা, খালি পা, ভিজা চুল কপালে মুখে ছড়ানো।

স্বামীর দিকে চাহিয়া কমলা অবাক হইয়া গিয়াছিল, চোখে মুখে এ কোন্ আলো ও আনন্দ লইয়া সে আসিল! তাহার মহাদেবের কথা মনে পড়িল, সব দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা বাঘছাল পরিয়া থাকেন, তাঁহার সঙ্গে স্বামীর কোন সাদৃশ্য সে যেন দেখিতে পাইয়াছে।

শ্যামাদাস কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, ইনিই কি সন্তোষবাবু? নমস্কার, আপনার কথাই তবে ওরা জিজ্ঞেস করছিল। কোথাও যাচ্ছেন নাকি?

কমলা কহিল, চ'লে যাচ্ছেন, আমি যেতে বলেছি।

—কেন? না না, আজ তো কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। আমার অনেক কিছু

বলবার ও জানবার আছে। নিন, বিছানায় শুয়ে পড়ুনগে। আমি কাপড় বদলে আসছি। তুমি একবার লাইব্রেরিতে এস তো, কথা আছে।—বলিয়া শ্যামাদাস বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তাহার গলা শোনা গেল, এই যে হরিচরণ, ওগুলো রেখে দে তুই। যা, শিগগির গরম একবাটি চা নিয়ে আয়, যা, দেরি করিস নি। ব্যাটারা জলে ডুবিয়ে শরীরে আর আগুন রাখে নি।

শুনিয়া ঘরের মধ্যে কমলা কাঁপিয়া উঠিল। এতদিন পরে আজ তাহার আশঙ্কা ও ভয় দেখা দিল, যে অদৃশ্য আগুন স্বামী চোখে মুখে জ্বালিয়া আনিয়াছেন, তাহা কি তাহার ছোট্ট দুইটি হাতের আড়ালে সে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে?

সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিল, শ্যামাদাসবাবু? সুরে সম্ভ্রম ও বিস্ময় মিশানো।

কমলা কহিল, হ্যাঁ, আমার স্বামী। যাওয়া যখন হবে না, তখন গায়ের ওগুলো খুলে ফেল। নিতাই, তুই তবে যা, দরকার হ'লেই খবর দোব, কেমন? আমি আসছি।—বলিয়া কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছায়া-ছবি

শ্রীশান্তি পাল

ডাক রে ডাক পাখী, পরাণ ভ'রে ডাক,
তোর এ ডাক যেয়ে সেখানে পৌছাক।
এখানে খোলা-মাঠ শ্যামল নদীকূল,
চলেছে এঁকে বেঁকে ডাকিছে কুলুকুল।
ডাকিছে সহকার, ডাকিছে তালীবন,
আয় রে আয় হেথা, জুড়াবি তনুমন।
প্রভাত-সমীরণ ব্যাকুল ব'য়ে যায়,
শীতল পরশন শিহরি উঠে গায়।
পড়েছে কচি রোদ সবুজ তৃণ 'পরে,
মেঘের সাথে সাথে বাতাসে খেলা করে।
উড়িয়া আসে বক সারস গাঙচিল,
নদীর কালো জলে করিছে ঝিলমিল।
উড়িছে প্রজাপতি শিশির-ভেজা ঘাসে,
রঙিন পাখা লয়ে ফুলের রেণু-আশে।

ডাক রে ডাক পাখী, পরাণ ভ'রে ডাক,
তোর এ ডাক যেয়ে সেখানে পৌছাক।

বেলা যে ব'য়ে যায়, দিনের অবসান,
বিজন নদীকূলে বল কি গাহি গান?
গোক্ষুরধূলা উঠে ভরেছে সারা মাঠ,
পথিক ফিরে গাঁয়, সাঙ্গ হ'ল হাট।
বিহগ কলভাষে কুলায়ে ফিরে যায়,
বধূরা ঘট কাঁখে চলেছে পায় পায়।
কাঁকন বেজে উঠে কলস লাগি তার,
আঁচল খ'সে পড়ে পথ যে চলা ভার!
উথলি উঠে জল, সোহাগে মূরছায়,
চাহিতে ঢাকে মুখ সরমে ঘোমটায়।
একি রে একি লাজ, একি রে একি মায়া,
আবার সেই ছবি, আবার সেই ছায়া!
আয় রে আয় নেমে, আঁধার নেমে আয়,
ঢেকে দে চারিপাশ নিবিড় তমসায়।

অতি-আধুনিক চিত্রচর্চ্চা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ইউরোপের ভাঙবার যুগ আরম্ভ হয়েছে বহুকাল থেকে। অনুসরণ ও অনুকরণের প্রেরণা বহুকাল ইউরোপের সাহিত্যকে বস্তুবাদ ও প্রাকৃতবাদের মধুচক্রের দিকে নিয়ে গেছে। জোলার উপন্যাস প্রভৃতি খুঁটিনাটি



দেরাজের শহর City of drawers ডালি

বাস্তব রচনার দিকে প্রতীচ্যকে এক সময় আহ্বান করেছিল। সে যুগের পর এসেছিল নব্যসমস্যার যুগ। তখন মনে প্রশ্ন ও সন্দেহ জাগে। যা হচ্ছে তা ঠিক, না আর কিছু হ'লে ঠিক হ'ত? সমস্যার যুগের পর এল স্বপ্নের যুগ। নূতন ভাব ও আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। নূতন সমাজের কল্পনা প্রভৃতি কার্ল মার্ক্‌স প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ কল্পনা করতে সুরু করেন—বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান ক'রে একটা কল্পিত জগতের উদ্বোধন কর হ'ল বড় কাজ। এসব যুগের প্রতিবিম্ব বার বার শিল্প ও সাহিত্যে ধরা পড়েছে।

শিল্পকলায় সাহিত্যের মত ভাবের এই তরঙ্গিত ধারা প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। জাপানী শিল্পী হোকুসাই ও হিরোশিগের চিত্রাদি যখন ইউরোপের চোখে পড়ে, তখন তারা বিস্মিত হয়ে যায়—রঙের কালোয়াতি ও রেখার মসলিনী চাল দেখে। তখন ইউরোপের মনে সন্দেহ জাগে—হুবহু এঁকে চরম তৃপ্তি পাওয়া যে অসম্ভব, তা পশ্চিম বোঝে। ফলে এল আভাস-পদ্ধতিতে (Impressionist) খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে ছবি আঁকা। এটা জাপানী পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিম বললে, এ পদ্ধতিই ঠিক ও সত্য; কারণ দূর থেকে যে দৃশ্য দেখা যায়, তাতে খুঁটিনাটি চোখে পড়ে না।

ভাঙবার প্রবৃত্তি একটি শনির রন্ধ্র পেয়ে গেল। তারপর ইউরোপের সাহিত্য চিত্র ও ভাস্কর্য্য বিপ্লবের নূতন সৈকতে উপস্থিত হতে সুরু করে। এক দিকে যন্ত্রযুগের নূতন আহ্বান, অন্য দিকে নূতন সমাজের গোড়াপত্তনের সীমাহীন উৎসাহ সব কিছুকে একটি বিরাট কটাহে নিক্ষেপ করতে উৎসাহিত করে। মহাযুদ্ধ এই বিপ্লবের একটা আংশিক প্রতিক্ষেপ মাত্র। এই রাবণ থেকে যে নব্য রাবণের উৎপত্তি হয়েছে, তা চূড়ান্তভাবে পশ্চিমের শাসনপদ্ধতিকেও ভেঙেছে। Nazism, Fascism ও নব্য Sovietismএর বিরাট ও বিস্তীর্ণ



স্বতস্ফূর্ত্ত অঙ্কণ আরূপ

ভেদ সত্ত্বেও এসবের কল্পনা হচ্ছে "Pyramidal"—"Circle"এর নয়।

নাট্যকলায় এই প্রশ্ন ইউরোপে পূর্ব্বেই ওঠে। প্রত্যেক নাটকে নায়ককে মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ করা হয় Star systemএ। অন্যান্য সকল অভিনেতারা যেখানে নায়ককে মুখ্য ক'রে নিজেরা গৌণ হবে—সেটা হচ্ছে Star system। ইংলণ্ডে এই system বহুকাল থেকে প্রচলিত। আবার যেখানে প্রত্যেক ছোট বড় অভিনেতারই মঞ্চের উপর তুল্যমূল্য অর্থাৎ সকলে মিলে যখন একটা পরিপূর্ণতা



এক দিকে উপবিষ্ট অসভ্য জাতি, অন্যদিকে মুখ (Double image) আরনষ্ট

সৃষ্টি করে—কেউ কারও নিকট খর্ব্ব নয়—নায়ক হোক বা ভৃত্য হোক, কাকেও সেখানে বাড়িয়ে তোলা হয় না—সেটাই হ'ল Circle system। কন্টিনেন্টে সর্ব্বত্র এই রীতি প্রচলিত। সেখানে রঙ্গমঞ্চের উপর কোন বিশিষ্ট অভিনেতাকে করতালি দেওয়া হয় না, কারণ তাতে নাটকের অখণ্ডতা নষ্ট হয়—শুধু নাটক অভিনয়ের শেষেই করতালি দেওয়া হয়। বিখ্যাত Max Reinhardtএর সৃষ্টি এই পন্থাই অনুসরণ করেছে।

Star system হ'ল "Pyramidal"। অর্থাৎ একটা বিন্দুকে মাথায় ক'রে সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপারটি সজ্জিত। একের প্রভুত্ব ও সমগ্রের আনুগত্য, এ হ'ল ভিতরকার কথা। রাষ্ট্র-ব্যাপারে একের প্রভুত্ব এ যুগের নানা ভাবে অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। Totalitarian রাষ্ট্রগুলির সৃষ্টির পেছনে ইউরোপের নব্য অন্ধতার প্রতি অসীম প্রীতি বর্ত্তমান। নব্য মধ্যযুগের এমন কি নব্য Neolithic প্রেরণার চর্চ্চায় ইউরোপ স্বেচ্ছায় মশগুল হয়েছে—একের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে ইউরোপের নব্য দর্শন "blood" "race" "instinct" প্রভৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।



কার্নিভাল হিউই

আধুনিক কলাচর্চ্চায়ও এই বিদ্রোহ মুখর হয়ে উঠেছে। সমগ্র বুদ্ধিবাদের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত নষ্ট-কাগজের চুপড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। শিল্পী স্জান (Cezanne) প্রাকৃতিক আয়োজনকে (Nature's Order) ভ্রান্তিপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। শিল্পী ম্যাতেস (Matisse) তাহিতি দ্বীপের বুনো লোকের সঙ্গে বাস ক'রে ওদের আদিম শিথিল জীবনযাত্রার ভগ্ন ও গলিত উৎসাহের ভিতর সৌন্দর্য্যের উদ্দাম উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। গ্রাম্য চিত্র (Folk Art) নিগ্রো ভাস্কর্য্য ও সঙ্গীতের ভিতরকার স্বচ্ছ ও স্বাধীন কারুতার তরঙ্গভঙ্গকে ওরা "logic" "হিসেব-কেতাব" ও "কৃত্রিমতার" কঠোর শাসন থেকে নির্ম্মুক্ত মনে করেছে। যারা ভারতীয় কলাকে "grotesque" বা অদ্ভুত মনে করত, আজ তারা নিজেদের কলাকেই অদ্ভুততর ক'রে তুলেছে।

ফলে Picasso যখন ঘনবাদ (cubism) কল্পনা ক'রে চিত্রকলাকে বিপর্য্যস্ত করলেন, তখন ইউরোপে স্বভাববাদ

বা প্রাকৃতবাদের অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। নব্য রসিকরা তার ভিতর খুঁজে দেখল "decorative quality" বা



নারী পিকাসো

"আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্য"। Archipenko, Gaudier Brzska প্রভৃতি এরই ভিতর নব্য রহস্যবাদ (new mysticism) পরিবেশন স্বরু করলেন। Kandinskyর অধ্যাত্মকলাও এই আন্দোলনের ফল। তারপর এল ভবিষ্যবাদীর (Futurists) চক্র। এরা পিকাসোর স্থিতি-মূলক রচনাকে অতিক্রম ক'রে গতিমূলক প্রেরণা কল্পনা ও সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হ'ল। এমনই ভাবে "Neo Expressionism" "Synthesism" "Synchronism" প্রভৃতি চক্রও সমগ্র যুগবিপ্লবের পরিপোষক হয়ে উঠল।

ইদানীং এই সমস্ত রচনাচক্র এক নব্য সঙ্গমে উপনীত হয়েছে। এই সঙ্গমের নাম হ'ল—প্রাকৃতও নয়, অপ্রাকৃতও নয়—অতিপ্রাকৃত বা sur-real। এই অতিপ্রাকৃতবাদের মূলে একটা যথার্থ অনুসন্ধিৎসা আছে। আমাদের বহিরঙ্গ পরিপূর্ণতা ও ভদ্রতা, কৃত্রিম আচার, লোকশিক্ষা, সমাজবিধি ও আইনের শাণিত রক্তচক্ষুর শাসনে নিয়ন্ত্রিত। এসব কঠিন শৃঙ্খলের অতীত জায়গায় মানুষের চিত্তের অর্গলহীন আনন্দলোক। সে লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করার উৎসাহ থেকে এই আধুনিকতম কলাচর্চ্চা সম্ভব হয়েছে। এ শ্রেণীর চিত্রকলার প্রবর্ত্তক হচ্ছেন Georgio Di Chirico। ইনি ইতালীয় পিতামাতার সন্তান, এঁর জন্ম গ্রীসে। এই sur-real বা অতিপ্রাকৃত কলার ক্ষেত্রে আধুনিক সমগ্র কলারই সংযোগ হয়েছে। বিখ্যাত শিল্পী Dali (১৯৩৫-৩৬), Ernst (১৯৩০-৩৬), Arp (১৯২৫), Burra (১৯৩২) প্রভৃতি শিল্পী অতিপ্রাকৃত রচনার বৈচিত্র্য ও বিরূপবজ্র ইদানীং আমেরিকা ও ইউরোপের আনন্দ-বর্দ্ধন করছে। গণিত-শাসিত যন্ত্রযুগের চুলচেরা বিচারের জায়গায় আজ সমাসীন হয়েছে ব্যঙ্গ ও অত্যুক্তিমূলক এই অতিগণিতের রূপরাজ্য। বিপরীতের মিলন এমনই ভাবেই হয়ে থাকে।

অতিপ্রাকৃত কলার মূল কথা হচ্ছে অন্তরঙ্গতত্ত্বের প্রচার। আমাদের মনের অন্তঃপুর অহরহ নানা রূপাবলীর অকুণ্ঠিত লীলায় ভরপুর। ভিতরকার এই রূপরস কোন অবান্তর শাসনে নিগৃহীত হয় না। এলোমেলোভাবে বাস্তব ও স্বপ্ন গণিত ও গীতিকা সবই ওতপ্রোত হয়ে আছে। Dalir City of Drawersএ মানুষের দেহকে Chest of Drawers প্রভৃতির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলিত করা হয়েছে, এই মিলনে কোন বাধা ঘটে নি, অন্তরের অনাবিল রাজ্যে সব কিছুই সঙ্গত করা হয়েছে। আর্‌নস্ট Double Imageএ একটি ছবির ভিতর দুটি রাজ্যকে যুক্ত করেছে। এক দিক থেকে দেখা যায়, একখানি কুঁড়েঘরের সামনে কয়েকটি লোক ব'সে আছে,



আর্‌নষ্ট

আবার অন্য দিক থেকে মনে হয়, একখানি প্রকাণ্ড মুখোস যেন মাটির ওপর রাখা হয়েছে। ঘনপন্থী (cubist) পিকাসোর নারীমূর্ত্তিতে কয়েকটি সংহত ছায়া-নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, বহু তলের (plane) সমাবেশের ভিতর। আবার Expressionist চিত্রকর স্তজানের "স্নানার্থিনীদের" ভিতর ল.ক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে আলুলায়িত রেখাবিন্যাসের কালোয়াতি। মূর্ত্তি হিসেবে নারীদের চেহারাগুলি দেখবার বিষয়ই নয়। সব কিছু মিলে দুদিক থেকে অবনত রেখাপুঞ্জের বিরোধের ভিতর একটি সামঞ্জস্য বিধানই হচ্ছে লক্ষ্য। স্তজানের মতে প্রাকৃতিক বিধান এলোমেলো ও অসঙ্গত—শুধু আর্টেই এই বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দূর করা সম্ভব হয়। অতিপ্রাকৃত চিত্র "স্বতঃস্ফূর্ত্ত অঙ্কন" বা Instinctive Paintingএ মানুষ, পাখী, মাছ, ফুল প্রভৃতি সব কিছুকেই ঐক্য দেওয়া হয়েছে একটি কল্পনার ভিতর।



স্নানার্থিনী — স্তজান

শিল্পী এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নি। শিল্পী হিউইর "Carnival" নামক চিত্রে চিত্তের অর্গলহীন স্বেচ্ছাতন্ত্র মুকুরিত হয়েছে। পাখী, মানুষ, ফ্লকির, পিপে, গাছপালা প্রভৃতির একটা অদ্ভুত সমবায় দেখে তাক লেগে যায়। পাগল না হয়ে পাগলামি করা বড় শক্ত—madness এ method রাখা কঠিন। এসব sur-real কলার নমুনা। এই আধুনিকতম চিত্রকলার ভিতর দিয়ে প্রতীচ্য-কলা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। চিত্র, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির ভিতর বিষয়টি (subject matter) যে কিছুই নয়—উপলক্ষ মাত্র, এ কথা বহুকাল থেকেই ইউরোপের জানা আছে। রসসৃষ্টির এই মুখ্য তত্ত্ব থেকে এসব সৃষ্টির সম্ভাবনা হয়েছে। বিষয়কে বর্জ্জন ক'রে অন্তরের অস্পষ্ট আলেয়া ও আন্দোলনের দিকে সকলের দৃষ্টি ফেরানো হয়েছে।



খোলাডাঙার মাঠ

শ্রীসুনীলকুমার বসু

—তোমাদের যশোরে কি একটুও বেড়াবার জায়গা নেই? এ কদিন ঘর থেকে বেরুতে না পেরে প্রাণ যে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে!—বলিয়া নববধূ অবসাদে চোখ বুজিলেন।

আমি দেখিলাম, চিন্তার কথা, এখানে আসিতে না আসিতেই যদি নববধূর প্রাণ এমনই করিয়া হাঁপাইয়া উঠিতে থাকে, তবে তো মুস্কিল। কিন্তু উপায়ই বা কি! বিষণ্নমনে কহিলাম, তা সত্যি, শহরের ভেতরে বেড়াবার মত জায়গা পাওয়া কঠিন। তবে শহরের বাইরে গেলে যে একেবারে পাওয়া যায় না, তা নয়।

বধূ বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিলেন না, কহিলেন, শহরের বাইরে মানে গ্রামে বল।

আমি একই সঙ্গে 'হা' ও 'না' দুইই উচ্চারণ করিয়া ঢোঁক গিলিয়া মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, ঠিক তা নয়, এই শহর থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে। অন্তত একটা জায়গা আছে, আমি জোর ক'রে বলতে পারি, যেখানে বেশ প্রাণ খুলে বেড়ানো চলে। তবে একটু দূরে, এই যা।

প্রেয়সী কহিলেন, কোথায়? চল না, একদিন যাওয়া যাক। ঘরের ভেতর ব'সে থেকে থেকে এমন সুন্দর বিকেলবেলাগুলো আর কত নষ্ট করা যায় বল তো?

—জায়গাটির নাম খোলাডাঙার মাঠ। শহরের উত্তরে, প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। কিন্তু সে কি তোমার ভাল লাগবে? কলকাতার খাঁচায় পোষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে তোমার বাস, ইডেন গার্ডেন ও ঢাকুরিয়া লেক দিয়ে তুমি আত্মার এবং বোধের ক্ষুধা মেটাও, এখানকার এই বিশৃঙ্খল প্রকৃতি বোধ হয় তোমাকে শুধু আঘাতই দেবে, আনন্দ দিতে পারবে না।

বধূ কহিলেন, সেজন্যে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই, সে ভাবনা আমার। এখন জানতে চাই সেটা শুধুই মাঠ কি না!

—হ্যাঁ মাঠ, বিরাট, প্রায় সীমাহীন ব'লে মনে হয়। অন্তত এপার থেকে ওপারের সীমা হঠাৎ চাইলে চোখে পড়ে না। ছেলেবেলায় ভূগোল পড়তে পড়তে মনে হ'ত, আর্ক্‌টিক সমুদ্রের মত মাঠটিও যেন এক অনাবিষ্কৃত রাজত্ব। মাঝে মাঝে দু একটা গাছ আছে, তবে তা বার্চ বীচ পাইনও নয়, তাল তমাল হিন্তালও নয়, মাত্র শীর্ণকায় কতকগুলি খেজুরগাছ। কিন্তু এটুকু জানি যে, প্রতিদিন সেখানে সবার অলক্ষ্যে প্রকৃতির যে অপূর্ব্ব রূপ ফোটে, তা বাস্তবিক উপভোগ করবার মত জিনিস।

—তুমি নিশ্চয়ই যাও দেখতে।—বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি কহিলাম, যাই না, কিন্তু যেতাম একদিন।

—তবে হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করলে কেন? মাঠের ভেতর একটু হাঁটাহাটি করলে বেশ খানিকটা এক্সার্‌সাইজও হয়।—বলিয়া চোখে একটু কৌতূহল মাখাইয়া নববধূ আমার পানে চাহিলেন।

আমি কহিলাম, যেতাম ছেলেবেলায়। তখন আমার বয়স বোধ করি ন দশ হবে। ঐ মাঠের

কাছে আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি ছিল, এখন অবশ্য তারা ওখানে নেই। তখনই ঐ মাঠের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, তখনই ঐ মাঠে আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ অধ্যায় রচিত হয়েছিল।

—তোমার কথা শুনে ব্যাপারটার সম্বন্ধে রীতিমত কৌতূহল হচ্ছে।

আমি কহিলাম, হওয়ারই কথা, শোন তবে বলি। ছেলেবেলায় ঐ মাঠটাকে আমি খুব ভালবাসতাম। সুবিধা পেলেই যে দিদির বাড়ির দিকে ছুট দিতাম, সে কি শুধু দিদির আপ্যায়নের জন্যে? তা নয়, তার পেছনে ছিল ঐ মাঠের দুর্নিবার আকর্ষণ। ওখানে আমি কি যেন এক অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পেতাম। দিদির বাড়িতে আমার সমবয়সী কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল, তাদের নিয়ে দিনরাত ওখানে করতাম অভিযান। কতদিন ভোরবেলায় আমরা দিদিকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, ঐ দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখেছি, পুব-আকাশে রঙের উৎসব। আর দেখেছি, সভ্যজগতের অন্তরালে, সবার অগোচরে দিন ও রাত্রির রহস্যময় লুকোচুরি-খেলা। দুপুরবেলায় মাথার ওপর রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে, বেরিয়ে পড়তাম দিদির নিষেধ না মেনে। অন্য সময়ে তবু দু একজন লোকের দেখা পাওয়া যেত, কিন্তু দুপুরবেলায় ওখানে ভয়াবহ নির্জ্জনতা, মানুষকে তা অকারণেই সশঙ্কিত ক'রে তুলত। যেন কোন নাম-না-জানা আতঙ্ক অদৃশ্যলোকের হিম-শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যেত, অশরীরী ছায়ামূর্ত্তিরা রূপ নিত আমাদের মনে আর তাদের অদৃশ্য প্রতিরূপগুলি ঘুরে বেড়াত চারিধারে, অতি সন্তর্পণে, আমাদের অতর্কিত স্পর্শ এড়িয়ে। মাঝে মাঝে দূর থেকে একটা অদ্ভুত সোঁ সোঁ শব্দ বাতাসের সঙ্গে ভেসে এসে আমাদের চঞ্চল ক'রে তুলত। শব্দ লক্ষ্য ক'রে ছুটে যেতাম, পেতাম না সন্ধান, আমাদের মন হঠাৎ অজানা ভয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে দাঁড়াত। তবু মাঠের মোহ ছাড়তে পারতাম না। আমার বেশ মনে আছে, কোন কোন দিন সন্ধ্যেবেলায় আকাশ জুড়ে কালো মেঘের ভিড় লাগত। সন সন শব্দে বাতাস ব'য়ে চলত, আমরা হয়তো তখন মাঠের মাঝখানে। ভয় পেয়ে বাড়ির দিকে ছুট দিতাম দল বেঁধে, ছুটতে ছুটতে পেছন ফিরে চাইতাম। ভয় পেতাম, কিন্তু ভালও লাগত।

একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রেয়সী বলিলেন, শুনতে মন্দ লাগছে না, তোমার গল্প বলার ক্ষমতা আছে দেখছি, বেশ কাব্যি ক'রে বলতে পার।

বধূর সন্দেহে মর্ম্মাহত হইলাম; কহিলাম, না, এর এক বর্ণও অতিরঞ্জন নয়। আমার জীবনের কয়েকটা শ্রেষ্ঠ দিন কেটেছে ঐ মাঠে, ঐ মাঠের মহারঙ্গভূমিতে সকাল সন্ধ্যা আকাশ, বাতাস, ঝড়, বিদ্যুৎ এবং আরও কত প্রকৃতি-শিশুদের লীলা দেখে দেখে। সে সব কথা মনে পড়লে, বুঝলে না, একটু যেন সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ি। তার জন্যে কিছু মনে ক'র না। একদিনের কথা বলি শোন। সেদিন আমরা সদলে বেরিয়েছিলাম পাখীর ছানা সংগ্রহ করতে। হেসো না, ঐটাই ছিল আমাদের সদোষ অথবা নির্দ্দোষ প্রমোদ। খেজুরগাছের মাথায় অনেক পাখী বাসা বাঁধত আর আমাদের গাছে ওঠার ওস্তাদ ছিল দিদির দেওর পুটু, সেই ছিল আমাদের কাপ্তেন। আমরা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি, কতকক্ষণ যে হেঁটেছি তার খেয়াল নেই। একটা গাছ থেকে বিফল হয়ে খালি হাতে নেমে এসে পুটু জানালে যে, তার ভীষণ পিপাসা পেয়েছে, আমরা সবাই হঠাৎ

উপলব্ধি করলাম, পিপাসা আমাদেরও পেয়েছে। পেছন ফিরতেই দেখা গেল, দুরন্ত মাঠ ধূ ধূ করছে। যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। সামনেও তাই। কিন্তু পাখীর ছানা তখনও হস্তগত হয় নি, মনে তখনও উৎসাহের জোয়ার, তাই বাড়ি ফেরার কথাটা আমলেই আনলাম না। এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। আমাদের এক সহযাত্রী বললে, ঐ যে দূরে একটা ঝোপ দেখা যাচ্ছে, চল, ওখানে যাওয়া যাক। সবাই সম্মত হলাম। ঝোপের কাছে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, একখানা ভাঙা কুঁড়েঘর বিশাল মরুর বুকে ক্ষুদ্র মরুদ্যানের মত, আর তার পাশে একটা দীঘি—শেওলাভরা মস্তবড় একটা কালো দীঘি। পিপাসার মুখে প্রাণপণে সেই জলে চুমুক দিলাম। তোমরা কাদের বাছা গো?—হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের ক্ষীণ স্বরে এই কথা কটি আমাদের কানে গেল। চেয়ে দেখি, অপর পারে সেই কুঁড়েঘরখানির সামনে দাঁড়িয়ে এক বুড়ী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার হাতে একটা লাঠি, সমস্ত শরীর তার থর থর ক'রে কাঁপছে। বুড়ী যে কে এবং কি উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছে, সে সব কথা ভাববার সময় তখন আমাদের নেই। সেই অজানা অচেনা পরিবেশের মধ্যে, সেই নিঃসঙ্গতার বুকে দাঁড়িয়ে ঐ লোলচর্ম্মা মূর্ত্তিমতী স্থবিরতা আমাদের মনে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করল। বুড়ীর কথার উত্তর দেওয়ার মত অবস্থা তখন আমাদের নয়, ভয়ে পিপাসা তখন উবে গেছে। আমরা কোন দিকে না চেয়ে পেছন ফিরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলাম। বাড়িতে এসে দিদির দেওর আমার কানে কানে বললে, ও কে জানিস? ডাইনী বুড়ী, ছোট ছোট ছেলেদের রক্ত চুষে খায়। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। পরে অবশ্য জানতে পেরেছি যে, সে ডাইনীও নয় পেত্নীও নয়, সামান্য একটা ভিখিরী বুড়ী। আমরা সেদিন যেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, সেটাকে মাঠের প্রান্তভাগ বললেও চলে, সেখান থেকে শঙ্করপুর গ্রাম খুব নিকটে, বুড়ী সেই গ্রামেই ভিক্ষা করত। সে যাই হোক, ছেলেবেলায় আমরা কোন দিনই খুব সহজ মনে ওর কাছে যেতে পারি নি। বুড়ী আমাদের কত ডাকাডাকি করত। অবশ্য পরে আমাদের সাহস হয়েছিল, কিন্তু ভয় একেবারে ভাঙে নি। তখন গিয়ে দূর থেকে ওকে দু একটা পয়সা দিয়েও আসতাম।

বধূ কহিলেন, তোমার বর্ণনা শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল, বিকেলবেলাগুলো নিতান্ত নষ্ট হবে না ব'লে বোধ হচ্ছে। আজ তো আমাদের হাতে কোন কাজ নেই, চল না, আজই যাওয়া যাক।

বধূকে বিশ্বাস করাইতে পারিয়াছিলাম বলিয়া মনে মনে খুবই পুলকিত হইয়াছিলাম, কহিলাম, বেশ, আজই যাওয়া যাবে।

বিকালবেলায় চা-পানাদি শেষ করিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে গাড়ি ছুটিতেছিল, প্রচণ্ড বাতাসে প্রেয়সীর আঁচল উড়িয়া পড়িতেছিল আমার গায়ে। আমরা দুইজনেই নির্ব্বাক, অনিশ্চিত আনন্দের কল্পিত পুলকে আমাদের মন হইয়া ছিল ভারী। গাড়ি মোড় ফিরিতেই আমি কহিলাম, থামাও।

—এই বুঝি তোমার খোলাডাঙার মাঠ?—প্রেয়সী কহিলেন।

আকাশের মত, মরুভূমির মত, সমুদ্রের মত সীমাহীন মাঠ, আগাগোড়া সবুজ ঘাসে ঢাকা। যে দিকেই চাওয়া যায় শুধু সবুজ, যেন সবুজের ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অপূর্ব্ব বিস্ময়রসে দুইজনেরই মন ভরিয়া উঠিল। এত বিরাট, এত আলোময়, এত খোলা! অন্ধ গৃহকোণে বসিয়া প্রেমগুঞ্জনে অভ্যস্ত স্থবির মন আমার হঠাৎ এই উলঙ্গ স্পষ্টতার মধ্যে আসিয়া যেন ভয় পাইয়া থমকিয়া গেল। এত উন্মুক্ততা সহ্য করা যায় না। একটা যেন রূঢ় আঘাত লাগে গৃহকোণবিলাসীর মনে। এই আমার শৈশবের সেই মহারঙ্গভূমি, এখানে সঙ্গীদের লইয়া কত খেলাই না করিয়াছি! কত আনন্দের কত বেদনার পালাই না এখানে অভিনয় করিয়াছি! অনেক পুরানো স্মৃতিতে মন ভারী হইয়া উঠিল।

দুইজনে চলিতে সুরু করিলাম। বধূ কহিলেন, কি বিশাল মাঠ বাবা, এর যে শেষ কোথায়, তা ধারণায়ই আনা যায় না!

আমি কহিলাম, হ্যাঁ, তোমার হৃদয়ের মতই বিশাল, যেখানে প্রতি পদে পদে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজেকে নিজের কাছে অপরিচিত ব'লে মনে হয়।

প্রেয়সী কহিলেন, চারিদিকেই সবুজ!

আমি কহিলাম, তোমার নরম কচি মনের মত চিরসবুজে ঢাকা।

বধূ সম্ভবত একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া কহিলেন, তুমি কাকে দেখছ, মাঠকে না আমাকে?

আমিও সগর্ব্বে উত্তর দিলাম, মাঠকে দেখছি তোমার মাঝে।

পরিহাসচ্ছলে প্রেয়সী কহিলেন, তুমিই পারবে অস্ত্রপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে।

হাঁটিতে হাঁটিতে আমরা অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি কহিলাম, এবার ফেরা যাক, নতুবা সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

বধূ কহিলেন, না, এত তাড়াতাড়ি ফিরব না।

সুতরাং দুইজনে হাতধরাধরি করিয়া চলিতে লাগিলাম। দূরে সেই ঝোপটি দেখা গেল। প্রেয়সী কহিলেন, চল, ওখানে গিয়ে ঐ দীঘির ধারে ব'সে একটু বিশ্রাম করা যাক।

পুকুরটি খুব ছোট নয়, পূর্ব্বে জলের যে স্বচ্ছতা ছিল, এখন তাহা আর নাই, এখন শেওলা-পানার দলে ভরিয়া গিয়াছে। কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে ভয় হয়, মনে হয়, জলের ঐ রহস্যময় আঁধার রূপের মধ্য হইতে শেওলাদলের জটিল বাঁধন ছিঁড়িয়া রূপকথার সেই যক্ষি এখনই বুঝি উঠিয়া আসিবে। পুকুরের সিঁড়িগুলো ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহাদের ফাটলের মধ্য হইতে নানা প্রকারের গাছ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। পুকুরধারে বসিয়া মনে পড়িল অতীত দিনের কথা, তখন এর এই দুরবস্থা ঘটে নাই। এর জল ছিল সুন্দর, সুপেয়। কহিলাম, এই ঘাটে ব'সেই সেই বুড়ীর সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা।

নববধূ কহিলেন, ঐ বুঝি বুড়ীর বাসা?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু বহুদিন তার খোঁজখবর নেওয়া হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। হয়তো তার কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব উত্তরাধিকারী ঘরখানা দখল ক'রে ব'সে আছে।— বলিতে বলিতে বুড়ীর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার অনুমান সত্য হইল না। দেখিলাম,

বুড়ী বাঁচিয়া আছে এবং রীতিমত বাঁচিয়া আছে, অর্থাৎ দাওয়ায় বসিয়া শাক বাছিতেছে। কালের নিষ্ঠুর পীড়নে বুড়ীর শরীরটা জরজর হইয়া গিয়াছে, মাথায় একটি চুলও আর কালো নাই। বুড়ী আমাকে চিনিতে পারিল না। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল। না চেনারই কথা। আমার সেই মধুর শৈশবকে অনেকটা পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি। তখনকার অনেক ছবি আমারই চোখে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। বুড়ীর আর দোষ কি! সে যে কালের সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া বহুদিনকার পুরানো সেই জরাজীর্ণ জীবনটাকে জীর্ণতার এই সীমাশেষ পর্য্যন্ত টানিয়া আনিতে পারিয়াছে, এই যথেষ্ট। নূতন করিয়া পরিচয় সুরু করিলাম। বুড়ীর চলাফেরার শক্তি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছিল। একটা ছোট ছেলেকে দেখিলাম, সে বুঝি বুড়ীর দূর সম্পর্কের বোনপো না কি হয়, এই অসময়ে বুড়ী ঐ মা-মরা ছেলেটিকে কাছে আনাইয়া লইয়াছে। সেই বুড়ীর জন্য ভিক্ষা করিয়া আনে। দাওয়ায় বসিয়া সুখদুঃখের কথা সুরু হইল। আমাদের সহানুভূতির স্পর্শে সে তাহার মন খুলিল। বুড়ীর জীবনের ইতিহাস শুনিলাম। একদা সে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরেরই মেয়ে ছিল, জীবনের অনেক সুখ-সুবিধাই সে উপভোগ করিয়াছে। কিন্তু বিবাহ হইল এক দুঃস্থ পরিবারে। তাহাতেও বুড়ীর অভিযোগ ছিল না, স্বামীপুত্র লইয়া নির্ব্বিবাদে সে সংসার করিতেছিল। হঠাৎ একদিন দুইটি নাবালক ছেলে রাখিয়া স্বামী অকালে মারা গেলেন। একে একে সে দুইটিও বুড়ীকে ছাড়িয়া গেল। জমিজমা যাহা কিছু ছিল, তাহা কিছু বা দেনার দায়ে বিক্রয় হইল, কিছু বা আত্মীয়স্বজনে ফাঁকি দিয়া লইল। এইরূপ নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া বুড়ী ভিখারী হইল। শুনিতে শুনিতে নববধূর চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, দেখিলাম, তিনি রুমাল বাহির করিতেছেন। আমারও মনটা অজানা ব্যথায় টনটন করিয়া উঠিল, আমিও রুমাল বাহির করিলাম। উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, নববধূ কানে কানে কহিলেন, ওকে কিছু দোব। আমি তখনই বধূর হাতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলাম। বধূ তাহা বুড়ীর হাতে তুলিয়া দিলেন। বুড়ী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। আমরা চলিয়া আসিলাম।

সেই হইতে আমরা প্রায়ই খোলাডাঙার মাঠে যাইতাম। সারাদিনের কর্ম্ম-কোলাহলের পর সন্ধ্যায় ঐ মাঠের স্নিগ্ধ নির্জ্জন শান্তি বড়ই মনোরম লাগিত। বুড়ীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হইত। তাহার সুদীর্ঘ জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলি আমাদের বড় ভাল লাগিত। নববধূ প্রায়ই তাহাকে কিছু দান করিতেন, হয় পয়সা, না হয় কাপড়, না হয় অন্য কোন সাংসারিক বস্তু। আমাদের দুইজনের ক্ষুদ্র জগতের সেও যেন ক্রমে ক্রমে একজন অধিবাসী হইয়া উঠিতেছিল। মোটের উপর দিনগুলা ভালই কাটিতেছিল।

একদা এক অকল্যাণকর প্রভাতে ঘুম ভাঙিতেই দেখিলাম, আমার শয্যা শূন্য, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, বধূ গত রাত্রে বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার মনের সমস্ত মাধুর্য্য-রসটুকু কে যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইল। মনের মধ্যে একটা দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সাধের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। এতদিন বধূকে লইয়া যে একটা অখণ্ড জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, হঠাৎ তাহা যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সারাটা দিন সেই ভাবেই কাটিল।

সাথীহারা শূন্য ড্রেসিং-টেবিল হইতে ক্ষণে ক্ষণে দামী টয়লেটের মদির সৌরভ ভাসিয়া আসিয়া আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল না। কারণে অকারণে অবাধ্য ক্রেপ শাড়ির মধুর প্রগল্‌ভতা আমাকে চকিত চমক দিয়া গেল না। আড্ডা দিতে গেলাম, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের চটুল পরিহাস সহ্য করিতে পারিলাম না। গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপাইলাম, নারীকণ্ঠে গান সুরু হইল, "শূন্য মন্দির মোর।" তাড়াতাড়ি গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রিয় সেতারটি লইয়া বসিলাম, কিন্তু একটি সুরও তুলিতে পারিলাম না, যাহা তুলিলাম তাহা আর্ত্তনাদ। বধূর নিজের হাতের সাজানো বইগুলি যেন আলমারি হইতে আমাকে উপহাস করিতে লাগিল। ছটফট করিয়া সারাদিন কাটাইলাম। বিকালে মনে পড়িল খোলাডাঙার মাঠের কথা, সেখানে গেলে হয়তো বিরহতাপিত প্রাণে কিছু শান্তি পাইতে পারি। তাই প্রিয়াহারা নিঃস্ব আমি ছুটিয়া গেলাম আমার শৈশবের সাথীর কাছে এক বিন্দু সান্ত্বনার আশায়।

প্রতিদিনের মত আজও খোলাডাঙার মাঠ তেমনই ভাবেই বিরাজমান, স্তব্ধ, গভীর, অচপল, বিশাল, আপনার ঐশ্বর্য্যে আপনি মুগ্ধ, আমার পানে ফিরিয়া চাহিবারও সময় যেন আর তাহার নাই। হঠাৎ আমার মনের মধ্যে কি যেন একটা ওলট-পালট হইয়া গেল। বিরহের তীব্র বেদনায় আমার মন বিষাইয়া উঠিয়াছিল। আমার চোখের সামনে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি একটা কালো কুৎসিত রূপ ধারণ করিল। আমার শৈশবের সাথীকে আজ চিনিতে পারিলাম না। পায়ের তলায় নরম সবুজ ঘাস কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। পশ্চিম-আকাশের রক্তরাগকে মনে হইল, যেন কাহার আহত বুকের রক্তস্রাব। ঘনায়মান কালো আঁধারকে কোন্ অদৃশ্য মায়াবীর বুজরুকি বলিয়া বোধ হইল। তবুও পাগলের মত ছুটিতে লাগিলাম। যদি আমার পূর্ব্বপরিচয়ের একটা ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশও কোথাও খুঁজিয়া পাই। এই তো সেদিনও প্রেয়সী এখানে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, খেজুরের শুকনো ডালগুলো যেন ঠিক চামরের মত ঝুলছে। কই, আজ তো তাহা মনে হইতেছে না! বরং ওগুলাকে বিকৃত বার্দ্ধক্যের প্রতীক বলিয়া বোধ হইতেছে। বুঝিলাম, আমার মনোরাজ্যে কি এক বিপ্লব ঘটিয়াছে। বুঝিলাম, আমার সে দিনের সে আমি আর নাই, আছে আমার অনুভূতিহীন প্রেতমূর্ত্তি।

সেই পুকুরটার ধারে আসিয়া বসিলাম, এই তো সেদিনও এখানে বসিয়া প্রেয়সীর সঙ্গে কপোতের মত গুঞ্জন করিয়াছি, আর আজ সে কতদূরে! ভাবিতে ভাবিতে আমার চোখে প্রায় জল আসিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাতে আমার এই দুঃখ-বিলাস অবাঞ্ছিতরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইল।

—হ্যাঁ বাবা, গরিবের কুঁড়েয় একবারডা আসবা না?

চাহিয়া দেখি সেই বুড়ী, আমাকে এখানে একলা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অতি কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিয়াছে। মনে করুণার পরিবর্ত্তে ক্রোধের সঞ্চার হইল, ভাবিলাম বুড়ী পয়সার লোভে আমাকে ডাকিতেছে। কথার উত্তর দিলাম না।

—হ্যাঁ বাবা, কথা বলছ না যে?—বুড়ী কহিল।

মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিলাম, যাও বুড়ী, এখন বিরক্ত ক'র না।

বুড়ী তবু জিজ্ঞাসা করিল, শরীরডা কি খারাপ হয়েছে ?

অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিলাম, তবু তাহাকে আর একবার সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলাম, এখন যাও, আমার শরীর মন কিছুই ভাল নেই।

নাছোড়বান্দা বুড়ী আবার কহিল, আমার দিদিমণিরি দেখছি না যে ?

এই অবাধ্য বুড়ীর অসংযত কৌতূহল আমাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল, শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের সীমা পার হইয়া যাইতেছিলাম। বার বারই মনে হইতেছিল স্বার্থপর বুড়ী প্রতিদিনকার মত আজও বুঝি কিছু রোজগারের লোভে অবাঞ্ছিত দরদ দেখাইতেছে। উত্তর না পাইয়া সে সহজ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিল, দিদিমণি বুঝি বাবার বাড়ি গিয়াছেন! আহা, দাদাবাবুরি অমন একলাডা ফেলে—

মাথায় খুন চাপিয়া গিয়াছিল, দুরন্ত আক্রোশে গর্জ্জন করিয়া উঠিলাম, তবে রে হতভাগা বুড়ী, পাঁচশো বার বলছি দূর হয়ে যেতে, তবু যাবি না!

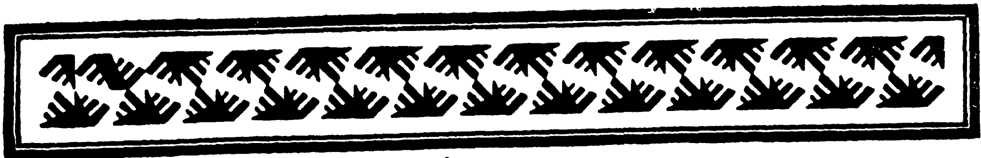
কিছুক্ষণ সেই ভাবে মুখ না ফিরাইয়াই বসিয়া ছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, বুড়ী চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনে শান্তি পাইলাম না। উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম, বুড়ী যায় নাই, বসিয়া আছে। তাহার অবসন্ন পা দুইখানি ঐ জীর্ণ শরীরটুকুর ভারও আর বেশিক্ষণ বহন করিতে পারে নাই। তাহার দীপ্তিহীন ঘোলা চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গিয়াছে।

আর একবার সে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শরীরডা ভাল আছে তো বাবু ?

সে স্বরে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই, কোন্ অজানা স্নেহের উৎস হইতে তাহা প্রবাহিত! বুঝিলাম, বড় কোমল স্থানে আঘাত করিয়াছি। তাহার পানে চাহিতে পারিলাম না, কিছু না বলিয়া অপরাধীর মত নতমুখে চলিয়া আসিলাম।

আশেপাশে নীরব প্রকৃতির মৌন আহ্বান, শত অর্থময় ইঙ্গিত আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে আহ্বানে মাদকতা আছে, শান্তি নাই। তুমি মাঠটাকে খুব ভালবাস ?—প্রেয়সী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আজ নূতন করিয়া সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ভাবিলাম, মাঠকে ভালবাসি না, ভালবাসি আমার সর্ব্বগ্রাসী যৌবনকে আর যে তাহার কাছে নতি স্বীকার করে, তাহাকে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।



পশ্চিম-বঙ্গের আদিম শিল্প

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়

ভারতবর্ষের আদিম শিল্প অনার্য্যদিগের সৃষ্টি এবং হিন্দুশিল্পশাস্ত্রের কোন বিশেষ নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না। আমাদের দেশের কলারসিকেরা বর্ত্তমানে হিন্দু বা বৌদ্ধ শিল্পের আলোচনায় ব্যস্ত থাকায় ভারতের আদিম অনার্য্য অধিবাসীদিগের শিল্পের আলোচনায় তত মনোযোগ দিতে পারেন নি। কিছুদিন থেকে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের ও অন্যান্য কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় ভারতবর্ষের লোকশিল্পের বা আদিম শিল্পের কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ হয়েছে।



হাতীর পিঠে দেবীমূর্ত্তি। পিতলের তৈরি
বাঁশের ও বেতের অনুকরণে তার জড়িয়ে জড়িয়ে গ'ড়ে তোলা হয়েছে

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি পশ্চিম-বঙ্গের কয়েকটি আদিম ধাতুমূর্ত্তির আলোচনা করব। কিন্তু এটা প্রথমেই স্বীকার করতে চাই যে, ভারতবর্ষের আদিম শিল্প সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা একান্তই প্রাথমিক স্তরের এবং কোন মতবাদ সৃষ্টির পক্ষে তা একেবারেই অপর্য্যাপ্ত এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে সমস্ত মূর্ত্তির প্রতিকৃতি ছাপা হ'ল, সেগুলি সাধারণত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ বা সাঁওতাল পরগণার মধ্যে কোন না কোন জায়গায় পাওয়া গেছে। এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন স্বর্গীয় পূরণচাঁদ নাহার। নাহার



ময়ূর। পিতলের তৈরি। পূজার উপকরণ

মহাশয়ের প্রত্নতত্ত্বের দিকে খুব ঝোঁক ছিল। এবং তাঁর সংগৃহীত নানা শিল্পদ্রব্যের একটি সংগ্রহশালা তিনি মৃত্যুর



গণেশ। ব্রোঞ্জের তৈরি
সাঁওতাল পরগণায় মাটির তলায় প্রাপ্ত

পূর্ব্বে স্থাপন ক'রে গেছেন। এই মূর্ত্তিগুলি এখনও তাঁর সংগ্রহশালায় রয়েছে। *

মূর্ত্তিগুলি পুরাতন। কিন্তু কত পুরাতন, তা বলা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, এই শিল্পের ধারা হাজার হাজার বছর ধ'রে চ'লে আসছে। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাজপুত আদিম মূর্ত্তিশিল্পকে আর্য্যপূর্ব্ব সৃষ্টি বলেছেন,† আমিও পশ্চিম-বাংলার এই আদিম মূর্ত্তিশিল্পের ধারাকে আর্য্যপূর্ব্ব ব'লে দাবি করতে চাই।

যাই হোক পশ্চিম-বাংলার এই ধাতুমূর্ত্তিগুলি লক্ষ্য ক'রে দেখলে দেখা যায় যে, এগুলির সৃষ্টির মূলে রয়েছে আদিম মানবের যাদুবিদ্যায় ও পৌরাণিক উপকথায় বিশ্বাস। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অদ্ভুত অলঙ্কার আর বিকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুসমন্বয়ের প্রকাশ লক্ষ্য হয়। বিশেষত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কোনক্রমেই প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে দেওয়া হয় নি।



তামার তৈরি সর্দ্দার বা কোন দেবতার মূর্ত্তি

এই সমস্ত মূর্ত্তির মধ্যে একটা সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এর গঠনবৈচিত্র্য। বাংলা দেশে বেত আর বাঁশ খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। বাঙালীরা বেতের ও বাঁশের ডালা, কুলো, ঝাঁকা, তীর-ধনুক, ঢাল প্রভৃতি অনেকদিন থেকে ব্যবহার ক'রে আসছে। বিশেষ ক'রে ঘরের চালে বেতের নানাবিধ শিল্পকাজে পশ্চিম-বঙ্গের তুলনা নেই।* তাই বাংলার এই আদিম অধিবাসীদের

* সম্প্রতি এই সংগ্রহ নাহার মহাশয়ের পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। —অ. স.

† Rupam, July, 1937, p. 81

* Indian Art & Letters, London, Vol. X, No. 1, 1936, Pl. 111, Fig. 6-7.

ধাতুশিল্পের কাজে বেতের বা বাঁশের কাজের একটি ছাপ পড়েছে দেখতে পাই। এমন কি, আমার মনে হয়, ধাতুর ব্যবহার জানবার আগে এই সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি বেত আর বাঁশ দিয়ে তৈরি হ'ত, কারণ বেতের কাজ আর বাঁশের কাজের নকলে তৈরি এই মূর্ত্তি-গুলির মধ্যে তার স্বাধীন গঠন-নৈপুণ্যের প্রকাশ লক্ষ্য হয় না। ভারত-বর্ষের স্থাপত্য-কলাও এমনই ক'রে কাঠের আর বাঁশের কাজের নকলে তৈরি হয়েছিল। এর নিদর্শন আমরা ভারুত সাঁচি প্রভৃতির স্থাপত্যের মধ্যে পাই।

এমনই ক'রে পূর্ব্বে যে সমস্ত শিল্পী বেতের আর বাঁশের নানাবিধ কারু-শিল্পের কাজে নৈপুণ্যলাভ করেছিল, তারাই বা তাদের বংশধরেরা এক-দিন ধাতুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার ব্যবহার আরম্ভ করলে ঠিক তাদের বাঁশের আর বেতের কাজের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা নিয়ে। এ যেন নীল চশমা এঁটে জগৎটাকে দেখার মত।

বেতের আর বাঁশের শিল্পী যেন ধাতুকেও দেখলে বেতের আর বাঁশের মত ক'রে। ধাতুকে তার ধাতুগত গুণাবলীর মর্য্যাদা দিলে না। পরন্তু বেতের অনুকরণে লম্বা সরু তামার বা পিতলের তার জড়িয়ে জড়িয়ে বা বাঁশের অনুকরণে লম্বা টানা ডাণ্ডার সাহায্যে মাচার মত ক'রে মূর্ত্তি তৈরি করা হয়েছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত ধাতুমূর্ত্তিগুলো দেখলে এর পরিচয় পাঠকেরা বিশেষ ক'রে পাবেন।



গণেশ। পিতলের তৈরি।

উপসংহারে এইটুকু বলতে চাই যে, পশ্চিম-বঙ্গের আদিম মানুষের তৈরি এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটা বন্য আর তাজা আর অপ্রাকৃত স্টাইল বিদ্যমান। ভয়ে ত্রাণলাভের এবং দুষ্ট অপদেবতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই এই সকল মূর্ত্তির কল্পনা করা হয়েছে। নিছক শিল্পানুভূতির খাতিরে এগুলি সৃষ্টি হয় নি। আমাদের আদিম মানবসমাজের ধর্ম্মাচরণের অঙ্গহিসাবে মূর্ত্তিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। আদিম মানবের সুখদুঃখময় বন্য জীবনযাত্রার আওতায় এই শিল্প সভ্য মানবের অগোচরে কখন জন্মলাভ করেছে, তা আমরা জানতে পারি নি।





সম্পাদকীয়

নববর্ষ

পুরাতন বৎসরের অভাব-বিয়োগ স্খলন-ভ্রান্তি এবং দুঃখ-বেদনাকে ভুলিবার জন্য নূতন বৎসরকে আমরা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া বরণ করি, খাতা বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সাদা পাতা রমণীয় ছাঁদের অক্ষরে ভরিয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু এবারকার শুভ নববর্ষ আমাদিগকে সুরু হইতেই রূঢ় আঘাতে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে। গ্রীষ্মাধিক্য, জলাভাব, মহামারী এবং বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে, মাজদিয়ার ভয়াবহ ট্রেন-দুর্ঘটনাও বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া ঘটিবে না জানি, তথাপি আমাদের মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধভীতি ও অশান্তির ঢেউ আমাদের শান্ত সমুদ্র-সৈকতে আসিয়াও লাগিতেছে, ইউরোপের হিংসা-বিষবাষ্পে সমস্ত পৃথিবীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; ভারতের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও ঝড়-তুফানের আশঙ্কা বড় কম নয়। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল বিলের ভয়াবহ সম্ভাবনা বাঙালী হিন্দুর নববর্ষকে নিদারুণ অশুভের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল, আমাদের যে সামান্য একটু মুক্তির ক্ষেত্র ছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সাধনায়, তাহাও যে অচিরকালমধ্যে নানা বন্ধনের দ্বারা পীড়িত হইবে, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। মোটের উপর, নূতন বৎসরে নানা অমঙ্গলেরই সূচনা দেখিতেছি।

মানুষের লোভ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে, আমরা অ্যাডভেন্‌চার নাম দিয়া লোভকে মহনীয় করিয়া তুলিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছি। সুতরাং লোভের যাহা অনিবার্য্য পরিণতি—সেই হিংসাই এখন প্রবল। পৃথিবীর চিন্তানায়কেরা মানুষের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পীড়িত হইতেছেন। আমাদের দেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও নববর্ষের বাণীকে এবারে আশার বাণী করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন—

নববর্ষ এলো আজি দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকারে,
আনে নি আশার বাণী, দেবে না সে করুণ প্রশ্রয়,
প্রতিকূল ভাগ্য আসে হিংস্র বিভীষিকার আকারে,
তখনি সে অকল্যাণ যখনি তাহারে করি ভয়।
যে জীবন বহিয়াছি পূর্ণ মূল্যে আজ হোক কেনা,
দুর্দিনে নির্ভীক বীর্য্যে শোধ করি তার শেষ দেনা॥

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

গত মাসে কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন বাংলা দেশের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ২৫এ ও ২৬এ চৈত্র ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন কুমিল্লার রাষ্ট্রনেতা শ্রীকামিনীকুমার দত্ত; এবং কাজি আব্দুল ওদুদ, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী ও ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন যথাক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

সম্মেলনের বিবরণী যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে মনে হয়, দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে উদ্দেশ্য লইয়া ইহার পত্তন হয়, সে উদ্দেশ্য হইতে আমরা দূরে চলিয়া গিয়াছি, বিস্মৃত পূর্ব্বপুরুষের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের মত ইহা একটা গতানুগতিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার সহিত বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রাণের যোগ ছিন্ন হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, এই সকল সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্য অপেক্ষা পলিটিক্‌স, আর্থিক আভিজাত্য অথবা নৃত্যগীত প্রবল—কুমিল্লাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া সাহিত্যের প্রতি এই অবহেলা প্রশংসনীয় নয়। আমরা এই সকল সম্মেলনের পরিচালন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করি।

সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরে একবার কি দুইবার দেশব্যাপী এই আলোড়ন হয়, তাহাতে সুফল যে কিছু ফলে, ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সমাজে আর পাচজনের মত কলম-নবিশদেরও যে স্থান আছে, এই সুযোগে তাহা ঘোষিত ও বিজ্ঞাপিত হয় এবং সাহিত্য-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন জনসাধারণ দৈনিক সংবাদপত্র মারফৎ নানা সাহিত্য-সমস্যা সম্পর্কে এক বা একাধিক দিন চিন্তান্বিত হইয়া উঠেন। এবারে এইরূপ চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছেন মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বঙ্গভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবি করিতে পারে কি না, তাহা লইয়া তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর প্রীতি ও প্রেম বশত আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা আজকাল রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে বাংলার প্রাধান্য লইয়া আলোচনা করিতেছেন, সুনীতিবাবুর এই বৈজ্ঞানিক বিচার তাঁহাদিগকে ক্ষুণ্ণ করিবে। সাহিত্য-সম্পদে শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভাষার বিশেষ গঠন হেতু বাংলা ভাষা যে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা হইয়া উঠিবার উপযোগী নয়, সুনীতিবাবু তাহা

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিকে খণ্ডন করিবার মত ভাষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লইয়া কেহ আলোচনায় নামিতেছেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

সুনীতিবাবু তাঁহার অভিভাষণে অপর যে সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আসলে অদূরভবিষ্যতে তাহাই একমাত্র মারাত্মক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। মুসলমান সাহিত্যিকদিগের সহিত সহযোগিতার এখন হইতে একটা সমাধান-চেষ্টা না হইলে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাষ্ট্রভাষার গৌরবও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুনীতিবাবু বলিতেছেন—

> কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সমক্ষে একটা ঘোর বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িতেছে—তদ্দ্বারা হয় তো আমাদের এক এবং অখণ্ড বাঙ্গালা ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িবে। আমার মনে হয়, নিখিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা-পদবীর জন্য বাঙ্গালার দাবী উত্থাপন অ-প্রাসঙ্গিক; এবং হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী কবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়া বাঙ্গালা-ভাষার হানি করিবে, তজ্জন্য আমাদের কাহারও কাহারও মনে যে দুশ্চিন্তা দেখা দিতেছে, তাহাও নিতান্ত অসাময়িক এবং অমূলক-ভীতি-প্রসূত।...
>
> রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন অপেক্ষা আরও গুরুতর ব্যাপার হইতেছে, বাঙ্গালা ভাষাকে নূতন ভাবে দ্বিখণ্ডিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। হাজার বছর ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষা বিদ্যমান—বাঙ্গালা ভাষার প্রারম্ভ হইতে এখন পর্যন্ত শত শত বঙ্গদেশীয় কবি, মনীষী ও সুলেখক এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া বিরাট্ করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন।...
>
> ভারতীয় ভাষার সংস্কৃত শব্দাবলীতে কখনও কোনও প্রাচীন মুসলমান লেখকের আপত্তি হয় নাই। আরবী ফারসী শব্দ যাহা আসিয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে আসিয়াছে, সাহিত্যের উপরে জবরদস্তী করিয়া আনা হয় নাই। উর্দু ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলেই এ বিষয়টী স্পষ্ট দেখা যায়। উর্দু কবিতার আরম্ভ হয় দাক্ষিণাত্যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে; দক্ষিণের প্রাচীন উর্দু কবিতার ভাষা আর তখনকার দিনের হিন্দী কবিতার ভাষা, দেশী হিন্দী আর সংস্কৃত শব্দ প্রায় সমান ভাবেই ব্যবহার করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি মুসলমান লেখক এখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে 'ইস্‌লামীয়' করিতে চাহিতেছেন। উর্দু ভাষায় যে আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য বর্তমানে দেখা যায়, তাহা ইঁহাদের কাহারও-কাহারও কাছে বাঙ্গালা ভাষাতেও কাম্য এবং অনুকরণীয় বলিয়া বোধ হয়।...
>
> বিগত শতকের মধ্যে কলিকাতায় মুদ্রিত মুসলমানী কেচ্ছা-সাহিত্যে যে একটা খিচুড়ী বাঙ্গালা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যাহা প্রাচীন মুসলমান লেখকগণের ধারাকে অনুসরণ করে না, বাঙ্গালা দেশের কোনও অঞ্চলের মুসলমানদের বা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক ভাষার সঙ্গে যাহার কোনও সংযোগ নাই, যাহার মধ্যে বিশেষ কৃত্রিমতার সঙ্গে অনাবশ্যক ভাবে উর্দুর শব্দ ও বাক্যরীতির প্রয়োজন করা হয় (যথা—'তেরা পাও' অর্থাৎ 'তোমার পা', 'দেলের বিচেতে'='মনের মাঝে', 'পয়দা করে জাহান'='জগৎ সৃজন করে', 'ওয়াস্তে খোদার'='ঈশ্বরের জন্য', 'এছা, জেছা, তেছা'='এমন, যেমন, তেমন', ইত্যাদি)—সেই কেচ্ছা-সাহিত্যের ভাষাকে কেহ কেহ মুসলমান বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। যদি এই ভাষায় শক্তিশালী লেখক দেখা দেন, তাহা হইলে বিশ্বজগৎ ইহাকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু যাঁহারা ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে এই ভাষা, সাহিত্য-বোধ এবং ভাষা-জ্ঞান, উভয় বিষয়েই অক্ষমতার পরিচায়ক। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে, হিন্দু এবং মুসলমানের লেখা পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় নাই, যাঁহাদের প্রধান সম্বল অল্পস্বল্প আরবী ফারসী ও উর্দু, এহেন শক্তিহীন পেশাদার লেখকের হাতে এই আরবী-ফারসী-মিশ্র কেচ্ছা-সাহিত্যের বাঙ্গালা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। ইহা খাঁটী বাঙ্গালাও নহে, শুদ্ধ উর্দুও নহে,—'ন ঘর-কা' ন ঘাট-কা'। কেচ্ছা-সাহিত্যের বাহিরে, মুসলমান-ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু কিছু পুস্তক এই ভাষায় লিখিত হইয়াছে—তাহাতে আরবী ফারসী শব্দের অবাধ প্রবেশের ওজুহাত অনেকে দেখিয়াছেন।
>
> বাঙ্গালা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানের ভাষা-গত ঐক্যের হানি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য দেশের যথার্থ হিতকামী বঙ্গ-সন্তান চেষ্টিত হইবেন; অন্যথায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মহান্ অনর্থ হইবে। আমার মনে হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভারতের রাজ-নৈতিক গগন যেরূপ মেঘাড়ম্বরময়, তাহার কৃষ্ণ ছায়া আমাদের সাংস্কৃতিক জগতেও প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। রাজনৈতিক গগন পরিষ্কার হইলে, আশা করি এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি খুলিবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যও নবীন গরিমার দ্বারা উদ্ভাসিত হইবে।

কুমিল্লা অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ নিতান্ত স্কুলের ছেলেদের প্রবন্ধের মত হইয়াছে,

অক্ষম ভাষায় নিতান্ত মামুলি কথার সমাবেশ বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সভার সম্মান যে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, অভিভাষণ লিখিবার সময় সভাপতি মহাশয় বোধ হয় ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা না করাই ভাল।

কুমিল্লা সাহিত্য-সম্মেলনে শাখা-সভাপতিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাষণ ইতিহাস-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় দিয়াছেন। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার গভীর অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ইহার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়, তাঁহার লিখনভঙ্গিও সুন্দর। আমরা অভিভাষণটি অংশত উদ্ধৃত করিতেছি—

> ঘটনা ও তারিখের তালিকা ইতিহাস নহে, মহতের প্রশস্তি ইতিহাস নহে, শক্তিমানের কীর্ত্তি-কথাও ইতিহাস নহে। তবে ইতিহাসের বিচার্য্য বিষয় কি? ঘটনার সুশৃঙ্খল বিবরণ ব্যতীত ইতিহাস হয় না। ঘটনা-বিন্যাসের জন্য তাহার কাল নির্ণয় করা প্রয়োজন। মহতের প্রভাবও ইতিহাস অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এখন ইতিহাস আলোচনা করে সমগ্র মনুষ্যজাতির কথা। সাধুর তিরোধান হয়, বীরেরও মৃত্যু অনিবার্য্য; রাজা ও রাজ্য কাল-সাগরের বক্ষে বুদ্বুদের মত উঠিয়া বুদ্বুদের মত ডুবিয়া যায়, কিন্তু মনুষ্যজাতির মৃত্যু নাই। আদিম যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সমগ্র মনুষ্যজাতির জীবন-প্রবাহ নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিবিধ প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মনুষ্যের এই জয়-যাত্রার বিবরণই ইতিহাসের উপজীব্য। জাতি-নির্ব্বিশেষে, শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে মানুষের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই আমাদের শাস্ত্রের লক্ষ্য। চির নির্ভীক, চির অশ্রান্ত, চির কৌতূহলী মানুষের আমরা জয়গান করি; প্রকৃতির সহিত মানুষের যে অবিরাম সংগ্রাম, ইতিহাস তাহারই চারণ। অতীতের সাহায্যে ইতিহাস বর্ত্তমানকে বুঝিতে চেষ্টা করে, ভবিষ্যতের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পায়। তাই শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত—মানুষের মনের পরিচয় যাহাতে পাওয়া যায়, মানুষের প্রাণের স্পর্শ যেখানে আছে, মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা, কল্পনা যেখানে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার কিছুই ইতিহাসের গণ্ডির বাহিরে পড়ে না। ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছিল রাজা, বাদশাহ, যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী লইয়া, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাতের কথা লইয়া। এখন আর ইতিহাসের দৃষ্টি রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নহে। এখন বিজ্ঞানের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, ধর্ম্মসঙ্ঘের ইতিহাস, শ্রমজীবীসমবায়ের ইতিহাস রচিত হইতেছে: আর তাহারই মধ্য দিয়া মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র ও চিন্তাধারা বিবর্ত্তনের প্রভাবে কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে তাহারই ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে।

জলধর সেন

প্রবীণতম সাহিত্যসেবী রায় জলধর সেন বাহাদুরের মৃত্যুতে বাংলা দেশের সকল সাহিত্যিকই আত্মীয়-বিয়োগের বেদনা বোধ করিয়াছেন। এযুগে সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন নিরহঙ্কারী অমায়িক ভদ্রলোক কদাচিৎ দেখা যায়। গত ২৬এ চৈত্র রবিবার উন-আশি বৎসর এক মাস বয়সে স্বজনপরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি দরিদ্র ঘরের সন্তান, অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া সাহিত্যপথে যাত্রা করিয়া সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট আসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের কাহিনী, কলেজের বেতনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হওয়া, শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ হইতে না হইতে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা, বিবাহ এবং স্ত্রীবিয়োগ, সংসার-বৈরাগ্যে হিমালয় ভ্রমণ, প্রত্যাবর্ত্তন নূতন সংসার এবং 'হিতবাদী' 'বঙ্গবাসী' ও 'বসুমতী' মারফৎ ধীরে ধীরে সাহিত্যকেই একাধারে সাধনা ও উপজীবিকা করিয়া লওয়ার কথা, এমন কি তাঁহার 'হিমালয়', 'বিশুদাদা', 'পরাণমণ্ডল', 'কাঙ্গাল হরিনাথ', 'অভাগী', 'হরিশ ভাণ্ডারী'র কথা পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার জীবিতকালেই ভুলিয়া বসিয়াছি, তথাপি তাঁহার সুমধুর ব্যক্তিত্ব লইয়া তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সগৌরবে বাংলা দেশের সাহিত্যসংসারে উত্তরসাধকদের অগ্রজরূপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই দলাদলি ও বিস্মৃতির যুগে তাহা কম আশ্চর্য্যের কথা নয়। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন, এমন সহৃদয় সাহিত্যিককে আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

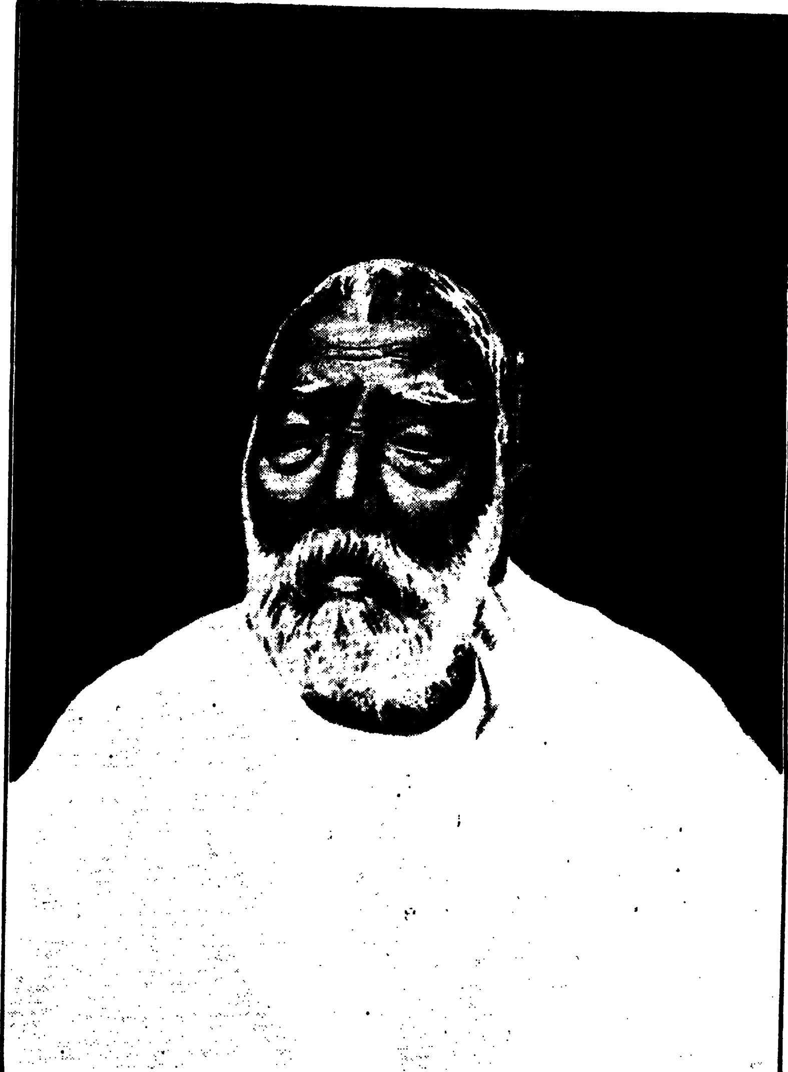
জলধর সেন বঙ্কিম-যুগের পরিপূর্ণ গৌরবের মধ্যে বঙ্গ-বীণাপাণির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, বিকাশ ও তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার পরম প্রকাশও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তথাপি যখন দেখিতে পাই, অতি-আধুনিক নটরাজের ভাঙন-লীলাও তিনি প্রসন্ন হাস্যে সমর্থন করিয়াছেন, তখন বুঝিতে পারি, জলধর সত্যকার পরিব্রাজক ছিলেন, পথ চলিতে চলিতে কোথায়ও থামিয়া যান নাই। আমাদের আনন্দ-উৎসবে তাঁহাকে পাইয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি, প্রাচীনপন্থীর প্রতি সহজ সঙ্কোচে আমাদের আনন্দ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সকল সাহিত্যিকের তিনি নিতান্ত

আপনার জন ছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া আমরা আপনার জনকেই হারাইয়াছি।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

মাত্র সেদিন যাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে'র দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ড হাতে পাইয়া বাংলা ভাষাভাষী-মাত্রেই সত্যকার আনন্দ অনুভব করিয়াছে, 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', 'চরিত্র গঠন' ও 'ঋদ্ধি' লেখক সেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় গত ১৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার রাত্রিতে তাঁহার আগড়পাড়া ভবনে অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অন্য কোনও কীর্ত্তি থাকুক আর নাই থাকুক, এই অভিধান-গৌরবে তিনি চিরদিন বাংলা দেশে বাঁচিয়া থাকিবেন; দীর্ঘ বাইশ বৎসরে তিলে তিলে গড়িয়া তোলা ইহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এই বিরাট কার্য্যের জন্য তিনি কোনও সহকারীর সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য যাবতীয় সাহিত্য-পুস্তক ঘাঁটিয়া শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ তিনি একরূপ একাই আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণও তাঁহার অদ্ভুত অধ্যবসায়ের ফল; সাংঘাতিক বহুমূত্র রোগের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত এই সংস্করণটি বাহির করিতে পারিয়াছেন,



জলধর সেন

ইহাই আমাদের ভাগ্যের কথা। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' পুস্তকেরও একটি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বাহির করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, অনেক নূতন উপকরণও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ডাক পড়িল। এই পাহাড়-কাটা কাজ সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন, এমন অধ্যবসায়ী পুরুষ তো বাংলা দেশে বড় একটা দেখিতেছি না।

মাতৃভাষা ও মুসলমান

এই সংখ্যার অন্যত্র (পৃ. ১২৫) পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি কায়কোবাদের, গত ২রা বৈশাখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত, অভিভাষণ অংশত উদ্ধৃত করিয়াছি। সাম্প্রদায়িকতার উগ্রমূর্ত্তি যখন সাহিত্যেও ভীতির সঞ্চার করিতেছে, তখন এই ধরণের হক কথা যিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারেন, তিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন। এই মনোভাব প্রচারিত হইলে আমাদের অনেক কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কবি কায়কোবাদ আরও বলিয়াছেন—

> বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা—আমাদের জন্মভূমির ভাষা। এই ভাষার উপর হিন্দু মুসলমানের সমান অধিকার। এই ভাষাতেই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। এই ভাষার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। এই ভাষাতে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ করিতে না পারিলে, আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি সুদূর-পরাহত।

কিন্তু সহজকে সুদূরপরাহত করিয়া তুলিবার লোকের অভাব এখন বাংলা দেশে নাই, আমাদের দুঃখ ইহাই।

নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা

গত সংখ্যার "সম্পাদকীয়" বিভাগে "শিক্ষা ও স্বাধীনতা" শীর্ষক মন্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে গিয়া নিরক্ষরতার সহিত সংগ্রাম করিতে ছাত্রদিগকে কি ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারও ঢাকার ছাত্রদিগকে এই কাজে উৎসাহিত করিতেছেন। জাতিগতভাবে ভবিষ্যৎ আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কিছুই করিবার নাই, এবং জাতির সকলকে লিখিতে পড়িতে শেখানো প্রস্তুত হওয়ার গোড়ার কথা। মজুমদার মহাশয় বলেন—

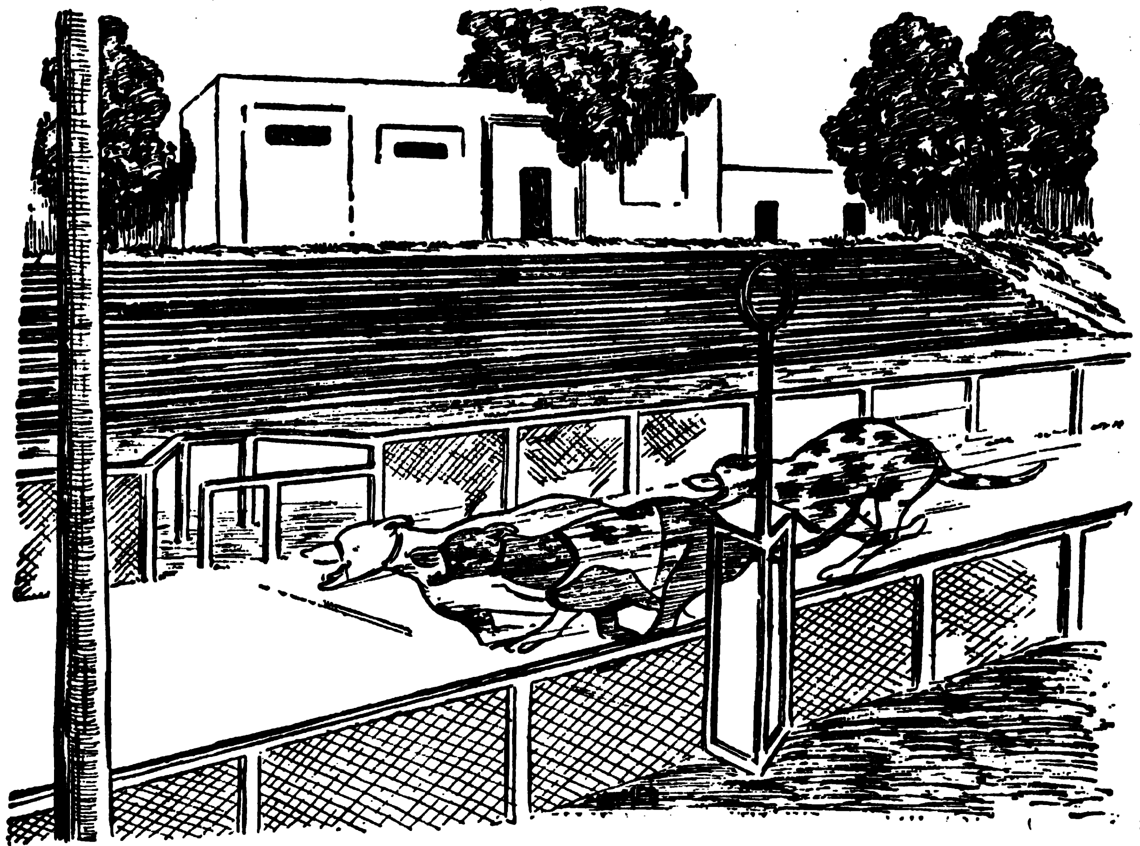
> যে দেশের শতকরা ৯০ জন লোক অশিক্ষিত, সে দেশের শতকরা দশজন লোক দিয়া কোন উন্নতি সম্ভব নহে। জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে শিক্ষিত লোকদের অবশ্যকর্ত্তব্য এই সব অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। সামান্য একটু লিখিতে ও পড়িতে পারে এরূপ শিক্ষা দিতে পারিলেও যথেষ্ট কাজ হয়। ছেলেরা অবসর-সময় সামান্য কষ্ট স্বীকার করিলেই দেশের তথা দশের মহৎ উপকার হইতে পারে। জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই গণ-শিক্ষা এবং এই জন্যই যাহারা শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে, তাহাদের উচিত গ্রামে গিয়া ঠিক আপনার জনের মত সরল সহজ ভাবে শিক্ষিতদের মধ্যে মিশিয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে চেষ্টা করা।

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক কলহ যে এতটা প্রখর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ, কতকগুলি মতলববাজ শিক্ষিত লোক জনসাধারণের নিরক্ষরতার সুযোগ লইয়া অন্ধ গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন, এবং অধিকাংশ ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাদিগকে দূরে পরিহার করিয়া সেই উত্তেজনা বৃদ্ধিরই সুযোগ দিতেছেন। এই আন্দোলন যদি খবরের কাগজে প্রকাশিত বক্তৃতাতেই সীমাবদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে এই সাংঘাতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনে বেশি সময় লাগিবে না।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলন

আগামী ৬ই ৭ই মে কলিকাতা মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট হলে উক্ত সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে, তাহা নানা দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাংলা দেশের মুসলমান সাহিত্যিকেরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলে যে তাহা সমগ্র দেশের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইবে না, কবি কায়কোবাদের মত অনেকেই তাহা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে 'মোহাম্মদী' ও 'আজাদে' প্রত্যহ যে সকল উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ যদি ভ্রান্তিবশত তাহার প্রভাবে পড়েন, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের দুর্দ্দিন আসিতেছে বলিতেই হইবে। ধর্ম্মে আমরা স্বতন্ত্র হইলেও দুই দলের মিলনের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল সাহিত্য। সেই সাহিত্যকেও যাঁহারা কলুষিত করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা দেশের ও জাতির শুভানুধ্যায়ী নহেন, ইহা সর্ব্বদা সকলকে স্মরণ রাখিতে বলি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৩।১ এমার্ষ্ট রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত



গ্রেহাউণ্ড রেসিং

দি ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত

আজকালকার সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য আমোদ।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিতে ভুলিবেন না—তাঁহারা আরও অধিক আনন্দ পাইবেন;

উত্তেজনাপূর্ণ উন্মাদনাকারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আনন্দ!

প্রবেশ মুল্য	এনক্লোজার	"এ"	১৷০	স্পেশাল এনক্লোজার (বক্স)	৪৲
	"	"বি"	৷৶০	ঐ মহিলাদের জন্য	২৲

স্থান—বেহালা (ডায়মণ্ডহারবার রোড)

ট্রাম ও বাস পাওয়া যায়।

নিউ থিয়েটার্সের

আগামী বাংলা চিত্র

রজত-জয়ন্তী



রজত-জয়ন্তী

পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া

ভূমিকায় : বড়ুয়া, মেনকা, মলিনা, পাহাড়ী, ইন্দু, শৈলেন, ভানু, সত্য মুখার্জ্জি, পণ্ডিত সোর ইত্যাদি।

═ আগতপ্রায় ═

টেলিফোন বড়বাজার ৯০

টেলিগ্রাম "গিনিহোস"

বি, সরকার এণ্ড সন্স

"গিনি হাউস"

B.S.

লিমিটেড

১৩১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের ব্রাঞ্চ দোকান নাই কিম্বা আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।

জগদ্ব্যাপী অর্থ-সঙ্কট প্রযুক্ত আমাদের সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

যে কোন প্রকার পুরাতন সোনা বা রূপা বাজার দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া নূতন গহনা দেওয়া হয়।

'অলকা'র নূতন কার্য্যালয়

হিমালয় হাউস

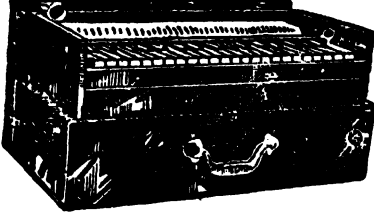
১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ

কলিকাতা

ফোন—কলিকাতা ৬৩৫৫

অপূর্ব্ব মনোহর

"বীণা অর্গান" হারমোনিয়ম



সকল সুররসিক ও সঙ্গীতবিলাসীর প্রশংসা লাভ করিয়াছে। নিম্নলিখিত মডেলটি আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে, মূল্যের তুলনায় ইহার গুণ অনেক বেশী।

প্রিন্স ফ্লুট মডেল নং ১৫০৫

ডবল সেট জার্ম্মান রিড্, ৩ অক্টেভ
বাক্স সমেত মুল্য মাত্র ৪৭৷৷০

আপনার পছন্দমত বিভিন্ন দামের বিভিন্ন মডেল আছে, দোকানে আসুন, বাজাইয়া পরীক্ষা করুন কিম্বা অদ্যই তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম. এল, সাহা, লিঃ
৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অথবা

সি, সি, সাহা, লিঃ
১৭০ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নুতন সংযুক্ত শো-রুম ঃ ৪৫ মতি শীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বপ্রকার কাগজ
এবং ষ্টেশনারীর জন্য

আমাদের নিকট আসুন।
নানাপ্রকার নূতন ধরণের
দেশী ও বিলাতী কাগজ
আমাদের ষ্টকে
পাইবেন



বসু ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪।২, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডাক্তাররা বলেন-
'লিলি'
ব্র্যাণ্ড
বার্লি
ভারতে শ্রেষ্ঠ
পানীয় খাদ্য

লিলি বার্লি প্রত্যহই কলিকাতায় প্রস্তুত হয়, সুতরাং
ঋতুর প্রকোপ ইহার গুণ নষ্ট করিতে পারে না।
সেই কারণেই—
লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য পথ্য ও পানীয়।



সুরগীতি
গ্রামোফোনের
সুরের মায়া লক্ষ পরাণে-
জাগায় আনন্দ-শিহরণ !
সুরগীতি গ্রামোফোন প্রডাক্টস্
২৭৯ বি, সেন্ট্রাল এভিনিউ
(বিডন ষ্ট্রীট মোড়) কলিকাতা

সূচী

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

কালের বিচার

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সাহিত্য

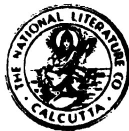
বঙ্গদর্শন

কালের বিচারে জয়ী হইয়া

পুনর্মুদ্রিত হইল!

অভাবনীয় আয়োজন!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

১৬-পাতার সুসজ্জিত বিবরণী-পুস্তিকা বিনামূল্যে



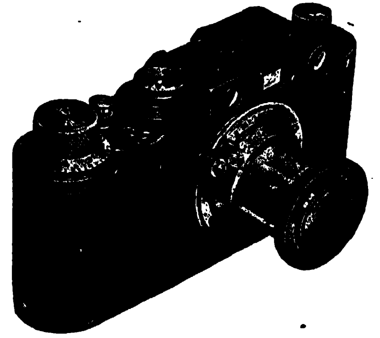
দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং

পোঃ বঃ ২৩৭৩ কলিকাতা

ক্যামেরা ?

- লাইকা
- রোলিফ্লেক্স
- বল্‌ডিনা
- ব্রিলিয়াণ্ট

Leica



ডেভেলপিং এবং প্রিন্টিং
আমাদের নিকট
পরীক্ষা করিয়া দেখুন—
খুসী হইবেন।

ইত্যাদি সকল প্রকার ক্যামেরা
এবং
সর্ব্বপ্রকার ফিল্ম, প্লেট, পেপার,
ফোটো কেমিক্যাল ইত্যাদি

আমাদের দোকানে ন্যায্য মুল্যে সকল সময় পাইবেন।
একবার দোকানে আসুন কিম্বা তালিকার জন্য পত্র লিখুন॥

ফোটোগ্রাফিক্ ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি কোং লিঃ

১৫৪, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ঃঃ ঃঃ কলিকাতা

রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক

নর-নারায়ণ

রূপবাণীতে আগতপ্রায়

রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক

দ্রৌপদী

পরিচালক : অহীন্দ্র চৌধুরী

ফিল্ম কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার

রিক্তা

পরিচালক : সুশীল মজুমদার

ফিল্ম কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার

তটিনীর বিচার

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
নাটক অবলম্বনে

নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি

রজত-জয়ন্তী

পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া

সোল্-ডিষ্ট্রিবিউটর্স্

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

৭৬-৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ফোন : বি. বি. ১১৩ = গ্রাম : রূপবাণী



এজেণ্ট্স

ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সকল প্রকার

আধুনিক পোষাকের জন্য

সুদক্ষ কাটার-পরিচালিত টিনমণি এণ্ড কোম্পানীতে পদার্পণ করুন।

টিনমণি এণ্ড কোং

২১৯ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

সাক্সেরিয়া হাউস

(চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগ স্থল)



GOVERNMENT PRODUCTS.

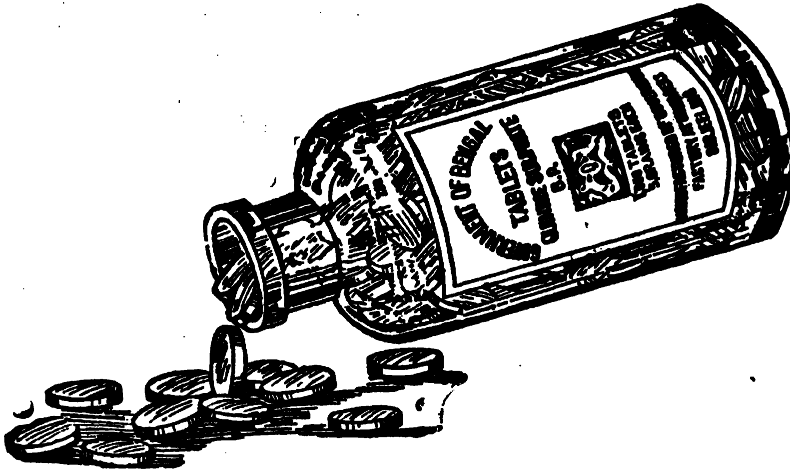
বাংলা গভর্ণমেণ্টের

কুইনাইন

— ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

সহর ও মফঃস্বলের সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।



জয়েণ্ট এজেণ্টস্—

শা, ওয়ালেস এণ্ড কোং

পোষ্ট বক্স নং ৭০, কলিকাতা

চৌধুরী এণ্ড কোং

৪ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"সাপুড়ে"

নিউ থিয়েটার্সের

নূতন চিত্র নিবেদন—



বিচিত্র ঘটনাবহুল সাপুড়ে জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী! নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে উজ্জ্বল চিত্র।

"সাপুড়ে"

ভূমিকায়ঃ কানন, পাহাড়ী, মনোরঞ্জন, রতীন, মেনকা, কৃষ্ণচন্দ্র, হুয়া, অহি সান্ন্যাল ইত্যাদি

পরিচালক ঃ দেবকী বসু

প্রথমারম্ভ ঃ ২৭শে মে, শনিবার

চিত্রা এবং নিউ সিনেমা

—ঃ চিত্র-পরিবেশক ঃ—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

১২৫ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষান্মাসিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক-খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	১	পৃষ্ঠা	প্রতি মাসে	২০৲
"	½	"	"	১১৲
"	¼	"	"	৬৲
কভার	৪র্থ	"	"	৬০৲
"	২য়	"	"	৫০৲
"	৩য়	"	"	৪৫৲

(বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট আবশ্যক।

হিমালয় হাউস
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা
ফোন: কলিকাতা ৬৩৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

এ, সি
ডি, সি



সিলিং
টেবিল

—দুই বৎসর গ্যারাণ্টিযুক্ত—

কারেণ্ট খরচ কম | দামে সস্তা
বাতাস দেয় প্রচুর | কাজে মজবুত

দেখিতে সুন্দর—গঠনেও সুশ্রী

ভারত গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক অনুমোদিত ও ব্যবহৃত

প্রস্তুতকারক ঃ—

দি এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড

অফিস ঃ
১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

টেলি— গ্রাম—"একোফ্যান্"
ফোন কলিঃ ৫৩০৮

কারখানা ও সার্ভিস ষ্টেশন
২৯৪।২।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
ফোন বি, বি, ৪৯১২



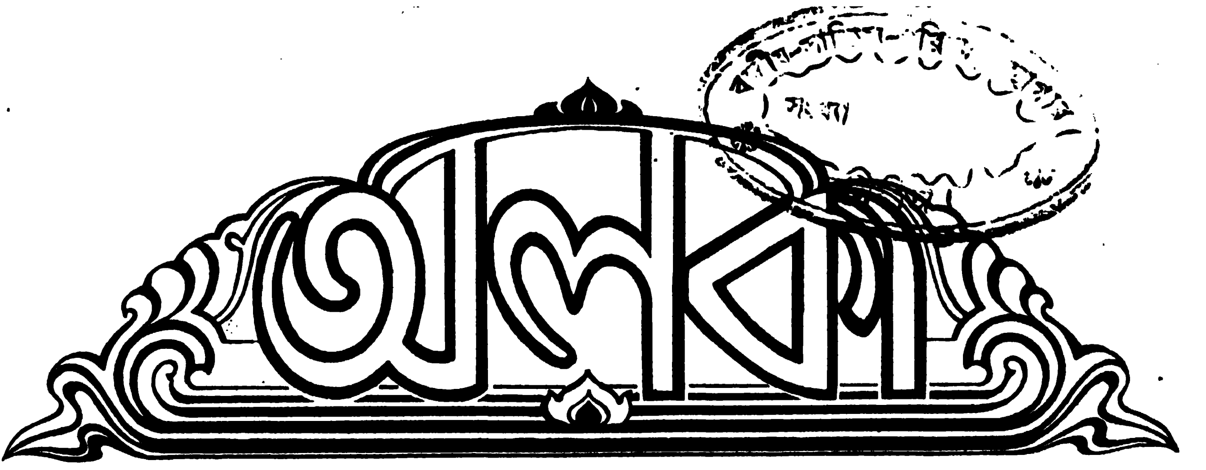
'অলকা'র পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

'অলকা' পড়িয়া যদি আপনার ভাল লাগে, তাহা হইলে অন্তত পাঁচজন বন্ধুর নিকট 'অলকা'র কথা বলিবেন।



সাঁওতাল পল্লী

শিল্পী—শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে



প্রথম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ | নবম সংখ্যা

মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার একদেশ

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন

আমাদের বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রতিভার সঙ্গে প্রায়ই চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের উপমা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ চিরকালই কল্পনায় কার্পণ্য দেখাইতে পরাঙ্মুখ; অতিশয়োক্তি আমাদের একমাত্র অলঙ্কার, তাহা কি কাব্যে, কি গল্পে, কি কল্পনায়, কি আচার-বিচারে। সুতরাং এ জাতীয় উপমার সার্থকতার প্রসঙ্গ তুলিব না। তবে এই কথাই বলিব যে, মধুসূদন দত্তের প্রতিভার উপমান যে জ্যোতিষ্ক, তাহা সূর্য্য নহে, চন্দ্র নহে, অত্যুজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্রের কোনটিই নহে, তাহা হইতেছে উল্কা। কেন যে অন্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে মধুসূদনের প্রতিভার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না, তাহার প্রধান হেতু হইতেছে, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সাধারণ জ্যোতিষ্কের নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণপথ আছে, তাহাদের দীপ্তির উদয়-অস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি আছে; অভ্যুদয়ের তমোগর্ভ হইতে উদিত হইয়া তাহারা ক্রমবর্দ্ধমান ঔজ্জ্বল্য লইয়া আমাদের গোচরে আবির্ভূত হইয়া পরে ক্রমবিলীয়মান দীপ্তি লইয়া পুনরায় অভ্যুদয়ের আশা লইয়া অস্তময়ের চিরতমিস্রায় অবলুপ্ত হইয়া যায়। উল্কার জীবনে উদয়-অস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। অকস্মাতের এক সংঘাতে সে তীব্রতম রশ্মি লইয়া আবির্ভূত হইয়া অকস্মাতের অপর সংঘর্ষে নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়; যেটুকু সময় থাকে তাহাতে তাহার ঔজ্জ্বল্য নয়ন ধাঁধিয়া দেয়, আমরা ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারি না; নির্ব্বাপিত হইলে পরে তাহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের প্রতিভা উল্কার সমশ্রেণীর। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি সাহিত্য-প্রতিভার কথা বলিতেছি, সাহিত্য-সৃষ্টির কথা নহে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টি স্রষ্টার অন্তর্ধানের পরেও সমান ভাস্বর রহিয়া যায়।

মধুসূদনের অপেক্ষা বড় কবি বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা বড় প্রতিভা এখনও আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। মধুসূদন যে প্রতিভার

অধিকারী ছিলেন তাহা সম্যক্ বিকাশলাভ করিবার কোনই সুযোগ লাভ করে নাই ; সেই কারণে তাঁহার প্রতিভার তুলনায় তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি পর্য্যাপ্ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। যাই হোক, যাহা হয় নাই, তাহার অনুশোচনা বৃথা ; যাহা রহিয়াছে, তাহাই অমূল্য।

সাধারণ কবি-সাহিত্যিকদিগের প্রতিভা সাধারণতঃ একমুখী হইয়া থাকে। মধুসূদনের প্রতিভা ছিল বহুমুখী ; তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা ইহারই একদেশ। বালক মধুসূদনের প্রতিভার সম্বন্ধে তাঁহার হিন্দু-কলেজের সতীর্থ ভূদেব বৃদ্ধ বয়সে বলিয়াছিলেন, "কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন ২০ লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখিতে পাই নাই।" বহুভাষাভিজ্ঞতা মধুসূদনের প্রতিভার আর একটি বিশিষ্ট দিক। ইংরেজী ভাষাতে তিনি ছিলেন ওতপ্রোত, সে কথা ছাড়িয়া দিই ; গ্রীক, লাতিন, হিব্রু, ইতালীয়, ফরাসী, তামিল, তেলুগু, সংস্কৃত ইত্যাদি ক্লাসিকাল ও আধুনিক ভাষা মধুসূদন অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যথার্থ কথা বলিতে কি, মধুসূদনের মত লিঙ্গুইস্ট্ বা বহুভাষাভিজ্ঞ হরিনাথ দে ব্যতীত আমাদের দেশে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই ; তামিল, তেলুগু হরিনাথেরও অজ্ঞাত ছিল।

মধুসূদনের প্রতিভা তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটা আবরণমাত্র বা ভঙ্গিবিশেষ ছিল না, ইহা ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ। সুতরাং তাঁহার জীবন এবং সাহিত্য-সৃষ্টি পরস্পর নিরপেক্ষ বা সম্বন্ধবিহীন নহে, মধুসূদনের জীবন বুঝিতে হইলে তাঁহার রচনা পড়িতে হইবে, এবং তাঁহার রচনার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে গেলে তাঁহার জীবনের কাহিনী অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের কেন, জগতের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকের বেলায় এ কথা খাটে না।

মধুসূদনের প্রতিভা-বহ্নি যে যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে অত্যন্ত অকালিক হইয়াছিল ; পারিপার্শ্বিক অবস্থার পক্ষে এ প্রতিভা ছিল নিদারুণ, মারাত্মক। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে যে বহ্নি দিবালোক সৃজন করিয়া সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিত, তাহাই বাঙ্গালীর দুরদৃষ্টক্রমে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানের বক্ষে সাহেবিয়ানার মূঢ়তাপূর্ণ দুরাশা জাগাইয়া তাঁহাতে তীব্র জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষে নির্ব্বাণলাভ করিল। কিন্তু নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে ক্ষণিকের জন্যও সেই ভাস্বর জ্যোতি বঙ্গ-সাহিত্যগগনকে উদ্ভাসিত করিয়া আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পথ চিরদিনের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া গেল।

অলঙ্কারের ভাষা ছাড়িয়া এখন যথার্থ বক্তব্যের কথা বলি। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সত্যকার আদি এবং চিরদিনের বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন। মধুসূদনের পূর্ব্বে দুই জন মাত্র কবি বাঙ্গালা কাব্যের নিরতিশয় বিরক্তিকর গতানুগতিকতার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে আধুনিকতার আমদানি করিয়াছিলেন ; ইঁহারা হইতেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন যুগের শেষ কবি—ইনি কবিগান, পাঁচালি বিস্তর লিখিয়াছিলেন, এবং প্রাচীন ধারার মত বর্ণনাত্মক কবিতা অনুপ্রাসপূর্ণ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে যথেষ্ট লিখিয়াছিলেন ; ইঁহার আদর্শ ছিল ভারতচন্দ্র। অপর দিকে ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক যুগের প্রথম কবিও বটেন। (এখানে বলিয়া রাখি, ঈশ্বর গুপ্ত কবি ছিলেন versifier বা পদ্য-রচয়িতা হিসাবে ;

সত্যকার কবিতা ইনি বিশেষ কিছু লিখেন নাই।) কেন না, ইনি কিছু কিছু ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে যে, ইঁহার কবিতার মধ্য দিয়াই স্বাজাত্যপ্রীতির প্রথম উন্মেষ দেখা দেয় আমাদের সাহিত্যে। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীর সমাজের আচার-বিচার, পাল-পার্ব্বণ সবই সঙ্গত, সবই সুন্দর—বাহ্যতঃ তাহা যতই কদর্য্য বা কুৎসিত হউক না কেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ইংরেজীনবিসের চক্ষে বাঙ্গালার সব কিছুই ছিল তুচ্ছ, ঘৃণ্য। ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাবে ইংরেজীনবিসের নাসিকা-কুঞ্চনের প্রতিক্রিয়া প্রথম দেখা দিল।

রঙ্গলালও প্রাচীন পন্থার কিছু কিছু অনুসরণ করিয়াছিলেন; গুরুর মত ইনিও কবিগান, পাঁচালির পালা লিখিতে কসুর করেন নাই। ইঁহার রচনাও মোটামুটি বর্ণনাত্মক এবং মামুলী ধরণের পয়ার-ত্রিপদীময়। কিন্তু ইঁহার কাব্যের কাঠামো ইংরেজীর ধরণে; Scott, Byron-এর কাব্য ইঁহাকে প্রচুর উদ্দীপনা দান করিয়াছিল। ইঁহার কাব্যগুলি প্রায়ই ইংরেজী রোমাণ্টিক ব্যালাড শ্রেণীর। কাব্য হিসাবে অবশ্য রঙ্গলালের রচনা মোটেই উঁচুদরের নহে। কিন্তু ইঁহার আসল বিশেষত্ব বা কৃতিত্ব হইতেছে—গুরুর স্বাজাত্যপ্রীতির উপরেও এক ধাপ অগ্রসর হওয়া। রঙ্গলালের কাব্যে স্বদেশপ্রেম এবং তৎসহজাত স্বাধীনতাপ্রিয়তা বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে সময়ে বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যের রস আকণ্ঠ পান করিয়া সবেমাত্র মত্ততা ঘুচাইয়া ধাতস্থ হইয়াছে, ইংরেজের স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং স্বদেশপ্রীতি তাহার মনে নূতন প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালীর ট্র্যাডিশন কই যে, কাব্যে তাহাকে অমরতা দেওয়া যায়? তখন সবেমাত্র টডের রাজস্থান বাহির হইয়াছে; রাজস্থানের রোমাণ্টিক অথচ প্রায়শঃই নিরর্থক বীরত্ব-কাহিনী বাঙ্গালীর ভাবতন্দ্রালু মনকে সহজেই রঙিন মাদকতায় প্রমত্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর কবি-সাহিত্যিক রাজপুত-কাহিনীর মধ্যে রচনার উপযুক্ত বিষয়বস্তু খুঁজিয়া পাইল। রঙ্গলালের সকল প্রধান কাব্যই রাজপুত-কাহিনী অথবা অনুরূপ আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। কাব্যের কাঠামো এবং কাব্যের বিষয়বস্তু—এই দুই বিষয়ে রঙ্গলাল বাঙ্গালা কাব্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়া আধুনিক কাব্যের পথ উন্মুক্ত করিলেন। তাহার পর গঙ্গাবতরণ।

বাল্যকাল হইতেই মধুসূদনের মনে কবিযশঃপ্রার্থনা জাগরূক ছিল। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার সহপাঠীদের বলিতেন, "তোমরা আমার জীবনচরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবি অপেক্ষা বড় কবি হইব।" কিন্তু সে কবিতা ইংরেজীতে। তখন যদি কেহ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিত যে, মধুসূদন বাঙ্গালায় কাব্য লিখিবেন, তাহা হইলে মধু ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে উন্মাদ ঠাওরাইত। কিন্তু সে অঘটন সত্য সত্যই ঘটিয়া গেল।

মাদ্রাজে থাকিয়া মধুসূদন দুইতিনখানি ইংরেজী কাব্য রচনা করেন; সে কাব্যগুলির প্রশংসাও হইল, ইংরেজী কাব্য বলিয়াই নহে, বাঙ্গালীর রচিত ইংরেজী কাব্য বলিয়া। Good for a non-English—এ স্তোক-প্রশংসায় মধুসূদন ভুলিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, কাব্যরচনার কাল এখনও আসে নাই।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৫৮ সালে তাঁহাদের

বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে এক সখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনেকের মত মধুসূদনও এই নাট্যশালার সংস্রবে আসিয়াছিলেন। এই রঙ্গমঞ্চে রাম-নারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকের কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় দেখিয়া এবং বাঙ্গালায় অভিনয়োপযোগী নাটকের একান্ত অভাব দেখিয়া মধুসূদনের মন হইল বাঙ্গালা নাটক রচনা করিতে। ইহাই মধুসূদনের সাহিত্য-জীবনের মোড় একেবারে ফিরাইয়া দিল; তিনি ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলনে মন দিলেন। প্রচণ্ড প্রতিভা বিস্ফুরিত হইবার পথ পাইল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম— এই সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে মধুসূদন সম্পূর্ণ নূতন ছাঁদে নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং গীতি-কাব্যের গঙ্গাস্রোত বহাইয়া দিলেন। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি (?) মাসে (১২৬৫ পৌষ) শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, তাহার পর যথাক্রমে, একেই কি বলে সভ্যতা (১২৬৬), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১২৬৬), পদ্মাবতী নাটক (১২৬৬), তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১ ? ; ১২৬৬ ?) মেঘনাদবধ প্রথম ভাগ (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), মেঘনাদবধ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬২) এবং বীরাঙ্গনা কাব্য প্রথম খণ্ড (১৮৬২ মার্চ (?); ১২৬৮ ফাল্গুন) প্রকাশিত হইল। বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড লিখিবার কবির বিশেষ ইচ্ছা ছিল এবং কয়েকটি পত্র আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর শেষ করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। এই যে প্রচণ্ড প্রতিভাস্ফুরণ, বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে এ এক অপরিসীম বিস্ময়কর ঘটনা। সাড়ে তিন বৎসর কাল তীব্র আলোক দিয়া যে প্রতিভা-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল, তাহা আর শুধু একবার মাত্র কিয়ৎক্ষণের জন্য স্বীয় অক্ষুন্ন উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল। সে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা; মধুসূদন তখন ফ্রান্সে ভের্সাই শহরে ছিলেন। এইখানে বসিয়া তিনি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। তাহার পর সে প্রতিভা-বহ্নি আর উদ্দীপিত হয় নাই, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একবার কিছু পরিমাণে দীপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অতীত তীব্রতার তুলনায় কিছুই নহে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গদ্য-কাব্য হেক্‌টর-বধ এবং মৃত্যুর পরই মায়াকানন (১৮৭৩) নাটিকা প্রকাশিত হয়। এই সময়ে মধুসূদন কয়েকটি শিশুপাঠ্য কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি যে অমিত্রাক্ষর অর্থাৎ অমিতাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ইহা শ্রেষ্ঠ এবং অমর কীর্ত্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু মধুসূদনের কবিযশঃ শুধু অমিতাক্ষর ছন্দের সৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে না। যাহা হউক, মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করেন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই ছন্দে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচিত হইল। তাহার পূর্ব্বে পদ্মাবতী নাটকে কবি চারি বার অমিতাক্ষরের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যেমন দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথমে—

আহা! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন—
সে অমূল্য ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে
ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শির? ইত্যাদি।

চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রথমে—

আমি কলি ? এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম ? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে স্বজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে। ইত্যাদি।

চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের প্রথমে—

এই ত হরণ করি আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী ?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল ?) ইত্যাদি।

এবং নাটকের শেষে ভরতবাক্যে—

সুখে সদা কর বাস অবনীমণ্ডলে,
পরাভবি শত্রুদলে, মিত্রকুলে পালি,
ধর্ম্মপথগামী যথা ধর্ম্মের নন্দন
পৌরব। ইত্যাদি।

অমিতাক্ষর ছন্দ বিলাতী আমদানি নহে, তাহা হইলে মধুসূদনের কৃতিত্ব এমন কিছু মহৎ হইত না। এই ছন্দের মূল হইতেছে বাঙ্গালা পয়ার; পয়ারেরই প্রকারভেদ অমিতাক্ষর ছন্দ। ইহারও মূলে আছে ষোড়শ মাত্রিক চতুর্দ্দশাক্ষর বৃত্তি; পয়ারের মত ইহারও যতি পড়ে আট এবং ছয় অক্ষরের পরে। তফাতের মধ্যে এই যে, পয়ারে যেমন দুই চরণে অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি অক্ষরে শেষ যতি পড়ে অর্থাৎ ছন্দের শম আসে, অমিতাক্ষরে তাহা নহে; ইহার শম যে কোন পূর্ণ যতি (আট, ছয় অক্ষরের পরে) অথবা অর্দ্ধ যতিতে (তিন অক্ষরের) পরে হইতে পারে। পয়ারে মিলযুক্ত দুই চরণের মধ্যে কবির ভাবকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, ইহাতে কবি ইচ্ছামত ভাবের বিস্তার করিয়া যাইতে পারেন। পয়ারের দুই চরণের নিগড় ভাঙিয়া মধুসূদন তাহাকে স্বাধীন ভাব প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন, ইহাই অমিতাক্ষর ছন্দের বড় কথা। বস্তুতঃ মিল থাকা বা না থাকা বড় কথা নহে, যতির স্বাধীনতাই প্রধান কথা। এইজন্য অমিত্রাক্ষর নাম অপেক্ষা অমিতাক্ষর (অক্ষর, অর্থাৎ সিলেব্‌ল) নাম অধিকতর উপযোগী।

মধুসূদন অমিতাক্ষরের সৃষ্টি করিলেন; তাঁহার হাতেই এই ছন্দের চরম বিকাশ হইল। যথার্থ কথা বলিতে কি, এই ছন্দে আজ পর্য্যন্ত কোন কবিই মধুসূদনকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। গিরীশচন্দ্র ঘোষের হাতে এই ছন্দের একটি বিশেষ রূপ নাটকের অভিনয়ে বিশেষ উপযোগিতা দেখাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও এই ছন্দে বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গীতিধর্ম্ম কবি-প্রতিভা অন্ত্যানুপ্রাস বা মিলকে সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে অধিকক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিতে

পারে নাই ; তাহাতে অবশ্য ছন্দের কমনীয়তার বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে যে ওজস্বিতার হানি হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার বিচার করা অল্প সময়ের কাজ নয়, আমার প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরের মধ্যে তাহা করাও সম্ভবপর নহে। মধুসূদনের গীতিকাব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

মধুসূদনের গীতিকাব্য বলিতে আমরা প্রধানতঃ বুঝি দুইটি কাব্য—ব্রজাঙ্গনা কাব্য এবং চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, এবং দুইটি কবিতা—আত্মবিলাপ (১৮৬১) এবং জন্মভূমির প্রতি (১৮৬২)। তাঁহার নাটক-প্রহসনগুলির মধ্যে যে গানগুলি আছে, তাহা ধরিতেছি না। কবিতা দুইটির সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি ছন্দে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছোট কবিতা সে সময়ের পূর্ব্বে তো হয়ই নাই, পরেও খুব কম হইয়াছে। কবির জীবনের গভীর নৈরাশ্য এবং ততোধিক সুগভীর, সুগুপ্ত স্বদেশপ্রেম কবিতা দুইটিকে অসামান্য মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে।

বাঙ্গালার প্রথম কবি জয়দেবের কণ্ঠে যে রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক গীতিকাব্যের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহাই বিভিন্ন রূপ ও ঐশ্বর্য্য লইয়া বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদের রচনার মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি অবিচ্ছেদে অনুরণিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার পর নূতন যুগে নূতন সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটিল, তথাপি গীতিকাব্যের এবং রাধাকৃষ্ণলীলাগীতির সুর নবসাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তকদিগের রচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে বিলম্ব করিল না, কারণ ইহাই তো বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল সুর। আধুনিক বাঙ্গালার দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, মূলতঃ গীতিকবি, এবং উভয়েই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতি রচনা করিতে ভুলেন নাই। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত মধুসূদনের বৈষ্ণব-কবিতা ব্রজবুলিতে লেখা নয়, বাঙ্গালায়। এই বাঙ্গালা কাব্যটিতে রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনীর আধুনিক একটি বিশিষ্ট রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই মধুসূদনের মন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের অমৃতরসে অভিষিক্ত ছিল ; বাঙ্গালীর সাহিত্য, বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা মধুসূদনের কাব্যে যতটা রসায়িত হইয়া উঠিয়াছে, এমন আর কোন দ্বিতীয় কবি-সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে দেখা যায় না। অথচ বাহিরের দিকে, মধুসূদনের কাব্য যতটা heterodox বা বিজাতীয়, এমন আর কাহারও নহে। তাই বলিতেছি, ধর্ম্মে খ্রীষ্টান এবং আচার-ব্যবহারে সাহেব হইয়াও মধুসূদন যথার্থ বাঙ্গালী কবির মত বৈষ্ণব-পদাবলীর রস সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তবে ইহা যে কতটা সজ্ঞান (conscious), তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় শক্ত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অপর দুই দিক্‌পাল—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—ইঁহাদের বৈষ্ণব-কবিতার সহিত ব্রজাঙ্গনা কাব্যের তুলনা করিলে মধুসূদনের বৈষ্ণব-কবিতার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বই ফুটিয়া উঠে। বঙ্কিমের যে দুই চারিটি পদ আছে, সেগুলি পূরা কবিতা নহে, খণ্ডাংশ, তাহাতে ভণিতা নাই, এবং রচনাতেও বাঁধুনির অভাব। রবীন্দ্রনাথের পদগুলি চমৎকার বটে, কিন্তু সেগুলির সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ-

ভাবে বহিরঙ্গ, ইংরেজী করিয়া বলিতে গেলে সেগুলির appeal বা আবেদন৷ বিশুদ্ধভাবে esthetic। কিন্তু মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার কবিতার সম্বন্ধে এ কথা পুরাপুরি বলা চলে না, অতি ক্ষীণ হইলেও এগুলির মধ্যে যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও ভক্তি-উদ্দীপকতা বর্ত্তমান আছে, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। রামায়ণ-কাহিনীর সীতার মত কৃষ্ণায়ন কাব্যের রাধাও কবির মনপ্রাণ চিরকাল অধিকার করিয়াছিল। বিদেশে বসিয়াও নিখিলভারতচিত্তের হৃৎপদ্মবাসিনী এই দুই মানসলক্ষ্মীর কথা মধুসূদন কখনও ভুলিতে পারেন নাই। ইহাদের স্মৃতি এবং রামায়ণ, মহাভারত ও কৃষ্ণলীলার কথা কবির মনে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়াছে এবং আমাদের পুরাণ-কাহিনীর প্রতি কবির আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তির প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে।

জয়দেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ?

সীতাদেবী কবিতায় আরম্ভ করিয়াছেন—

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি !

কল্পনা কবিতায় বলিয়াছেন—

চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরসবসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পূরি বেণুরবে দেশ !

রামায়ণ কবিতায়—

কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মন : যার তব কথা স্মরি,
নিত্যকান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে !

ব্রজ-বৃত্তান্ত কবিতায়—

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ? ইত্যাদি।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের representative কাব্য। এই কাব্যের মধ্যে মধুসূদনের ব্যক্তিগত প্রকাশ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কবি-চিত্তের এমন অকুণ্ঠিত, অনাড়ম্বর প্রকাশ অপর কোন বাঙ্গালা কাব্যে এমন ভাবে পাই নাই। এই কবিতাগুলির দ্বারায় মধুসূদন বাঙ্গালা কাব্যে সনেট জাতীয় কবিতার প্রবর্ত্তন করিলেন। ইতালীয় সনেটের সমুদায় লক্ষণ ইহাতে পুরাপুরি বর্ত্তমান নাই বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে দক্ষতা ও কারুকার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী সনেট-রচয়িতা কোন বাঙ্গালী কবির দ্বারা সম্ভব হয় নাই। মধুসূদনের সনেটের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সনেটও যেন কতকটা দুর্ব্বল এবং শ্লথবন্ধ।

বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালার সাহিত্য ও ধর্ম্ম এবং বাঙ্গালা দেশের প্রতি মধুসূদনের যে অনুরাগ ছিল, তাহা অকৃত্রিম, অথচ তাহাতে demonstration বা লোক-দেখানোর চিহ্নমাত্র ছিল না। দোষগুণ লইয়া বাঙ্গালা দেশের প্রতি এমন গভীর প্রীতি ও সৌন্দর্য্যানুরাগের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ছাড়া অন্যত্র বোধ করি দেখি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতির কথা এখানে তুলিলাম না; কেন না, তাহা বুদ্ধিমূলক, ইহা হইতে একটু স্বতন্ত্র। তবে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত মধুসূদনের কিছু পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যে বাঙ্গালা দেশকে ভালবাসিয়াছেন, তাহা অনেকটা idealistic; কবির মনের রঙিনতায় সে ছবি রঙানো। এই জন্য এ ছবি আমাদের মন মুগ্ধ করে, চিত্তকে স্পর্শ করে। মধুসূদনের দেশপ্রীতি আরও concrete বাস্তব, সেই জন্য মধুসূদনের আঁকা ছবি আমাদের প্রাণকে আঁকড়াইয়া ধরে। ভের্সাই শহরে বসিয়া মধুসূদনের মনশ্চক্ষুতে কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, বটবৃক্ষ, কপোতাক্ষ নদ, ঈশ্বরী পাটনী, বিজয়া-দশমী, শ্রীমন্তের টোপর ইত্যাদির যে ছবি ও স্মৃতি ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কবি-চিত্তের ভঙ্গি বা poseবিশেষ নহে, তাহা সত্যসত্যই সুদূরপ্রবাসীর অন্তরের ধ্যানস্বপ্ন। দেশের আকাশ বাতাস গন্ধ স্পর্শের অনুভূতির জন্য কবির অন্তর্লোকের মনোবেদনা বা nostalgia তাহারই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে ওতপ্রোত রহিয়াছে।

কবিতা হিসাবে সনেটগুলি অনবদ্য, যে কোনটি পড়িলেই মধুসূদনের অসামান্য কবিত্বশক্তির প্রমাণ মিলিবে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

শেষের কবিতাটির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। কবিতাটির নাম "সমাপ্তে"। কবি বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার অদৃষ্টের প্রতিকূল শক্তি আর তাঁহাকে কাব্যসৃষ্টির সুযোগ দিবে না। কাব্যলোকের ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়িয়া এবার তাঁহাকে জটিল সংসারারণ্যে অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। তাই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর নিকট মর্ম্মস্পর্শীভাবে বিদায় লইতেছেন—

বিবর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি!

বিদায়ের শেষ ক্ষণে কবি যে চরম বর মাগিয়া লইতেছেন, তাহাতে কবির স্বদেশপ্রীতি চরম প্রকাশ লাভ করিয়াছে—

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারতরতনে!

এ কথা এমন করিয়া ইহার পূর্ব্বে এবং পরে কেহ বলিয়াছেন বলিয়া আমি অবগত নহি।*

---

* বর্দ্ধমান-সাহিত্য-সভার মধুসূদন-স্মৃতি-অধিবেশনে পঠিত

মেঘালোক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আজিকে মেঘের একি কমনীয় কান্তি!
পৃথিবীতে ঘটাইল অলকার ভ্রান্তি।
স্নিগ্ধ ও কি আলোক,
জুড়াইয়া দিল চোখ,
একেবারে রূপ ধ'রে এল যেন শান্তি।

২

গুল্ম ও তৃণলতা সবই আজ ধন্য,
কোথা পেলে এত শোভা ভূধর অরণ্য?
রূপের পাথার এ যে,
ভূতল গগন ভেজে,
মেঘ এ কি? এ যে হেরি কেবলি লাবণ্য!

৩

ম্লান মনোহর ছবি ভাসিতেছে চক্ষে,
স্বরগের ঘরে যেন খুলিল অলক্ষ্যে
ছিল যাহা অগোচর,
'কাঙ্ক্ষিত—দৃঢ়তর
তাহাদেরি উৎসব ধরার সমক্ষে।

৪

উজ্জ্বল শ্যাম দ্যুতি—কি সুধা-তরঙ্গ,
দরশনে পরশন পুলকিত অঙ্গ।
রবি শশী নিমীলন,
কি নিবিড় এ মিলন,
লভিয়াছে সীমা আজি অসীমের সঙ্গ।

৫

দেবী কি এমনি আসে সাধনার অন্তে
দিতে দেখা শশি-লেখা ধরিয়া সীমন্তে?
সাধকের চিদাকাশ
পায় শুভ সে আভাস,
তমসা হারায় দিশা আলোকের পন্থে।

৬

ইহাকেই মেঘালোক বলে নাকি লোক রে
পুণ্যের প্রভা এ যে, প্রেমের আলোক রে!
কবি যে আনন্দে
ও আলোক বন্দে,
মনে করি বুকে বরি মুদি দুটি চোখ রে।



বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরদিন অনাদিবাবুর লোক বিপিনের একখানা চিঠি লইয়া চলিয়া গেল, তাহাতে বিপিন লিখিল, টাকা আদায় হইলেই কাল কিম্বা পরশু নাগাত সে নিজে লইয়া যাইতেছে। মানীর সঙ্গে দেখা করিবার এই উত্তম সুযোগ।

সন্ধ্যা হইল। বাদামগাছের পাতায় হাওয়া লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হইতেছে। অন্ধকার রাত্রি, জ্যোৎস্না উঠিবার দেরি আছে।

কামিনীর মৃত্যু বিপিনের মনে বিষাদের রেখাপাত করিয়াছে, পুরাতন দিনের সঙ্গে ঐ একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল চিরকালের জন্য।

আজ তাহার মনে হইল, এই প্রবাসে বৃদ্ধা তাহার সুখদুঃখ যত বুঝিত, এত আর কে বুঝিত? তাহার খাওয়ায় কষ্ট, শোওয়ায় কষ্ট হইলে কামিনীর মনে তাহা বাজিত, সাধ্যমত চেষ্টা করিত সে কষ্ট দূর করিতে। টাকার দরকার হইলে বিপিন যদি হাত পাতিত, কামিনী তাহাকে বিমুখ করিত না কখনও। গতবার যে পঞ্চাশটি টাকা সে ধার দিয়াছিল বিপিন একবার দুইবার চাওয়ামাত্র, সে দেনা বিপিন শোধ করে নাই। পুত্রহীনা বৃদ্ধা তাহাকে সন্তানের মতই স্নেহ করিত।

তাহার বাবার কথা উঠিলে বৃদ্ধা আর কোনও কথা বলিতে ভালবাসিত না। কতবার এ ব্যাপার বিপিন লক্ষ্য করিয়াছে। তরুণ মনের স্পর্দ্ধিত ঔদাসীন্যে হয়তো বিপিন এই ব্যাপারে কৌতুকই অনুভব করিয়া আসিয়াছে বরাবর, আজ তাহার মনে হইতেছে, বৃদ্ধা কি ভালই বাসিত তাহার স্বর্গগত পিতা বিনোদ চাটুজ্জেকে! আগে যাহা সে বুঝিত না, আজকাল তাহা সে ভাল করিয়াই বোঝে। মানী তাহার চোখ খুলিয়া দিয়াছে নানা দিকে।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, মানীকে সে কখনও এ ভাবে দেখে নাই। এই কয় মাসে যে মানীকে সে দেখিতেছে, সে কোন্ মানী? ছেলেবেলার সাথী সেই মানী কিন্তু এ নয়। বালক-বালিকা হিসাবে সে খেলা তো বিপিন অনেক মেয়ের সঙ্গেই করিয়াছে; অন্য পাঁচটা ছেলেবেলার সঙ্গিনী মেয়ের সহিত যেমন ভাব হয়, মানীর সহিত তাহার বেশি কিছু হয় নাই, এ কথা বিপিন বেশ জানে।

মধ্যে সে হইয়া গিয়াছিল জমিদার অনাদিবাবুর মেয়ে সুলতা।

তখন কলিকাতায় থাকিয়া কোন মেয়ে-স্কুলে মানী পড়িত। খুব সম্ভব ম্যাট্রিক পাসও করিয়াছিল—সে কথা বিপিন ঠিকমত জানে না; বাবা মারা গিয়াছেন তখন, বিপিন আর পলাশ-পুরে জমিদার-বাটিতে আসে নাই।

তবে সুলতার কথা মাঝে মাঝে বিপিনের মনে পড়িত—বাল্য-প্রীতির দিক দিয়া নয়, সুলতা সুন্দরী মেয়ে এই জন্য। না জানি সে এতদিনে কেমন সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে! সেই সুন্দরী সুলতা আবার 'মানী' হইয়া দেখা দিল তো সেদিন।

টাকা যোগাড় করিতে পারিলেই পলাশপুর জমিদারদের বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু এখনও এমন টাকা যোগাড় হয় নাই, যাহা হাতে করিয়া সেখানে যাওয়া চলে। এদিকে বেশি দেরি হইলে যদি মানী চলিয়া যায়!

কামিনী থাকিলে এসব সময়ে সাহায্য করিত।

উপায় অন্য কিছু না দেখিয়া নরহরি মুচিকে সন্ধ্যার পর ডাকিয়া পাঠাইল। নরহরি আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, লায়েব মশাই, কি জন্যি ডেকোচ? দণ্ডবৎ হই।

—এস নরহরি, ব'স। গোটা কুড়ি টাকা কাল যেখান থেকে পার দিতে হবেই। জমিদারবাবু চেয়েছেন, নিয়ে যেতে হবে।

নরহরি চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, বিষম হ্যাঙ্গামায় ফ্যাললেন যে! কুড়ি টাকা এখন কোথায় পাই! আচ্ছা দেখি। কাল বেন্‌বেলা এস্তক যদি যোগাড়যন্তর করতে পারি, তবে সে কথা বলব। হ্যাঁ, একটা কথা বলি লায়েব মশাই—

—কি?

—কামিনী পিসীর কিছু টাকা ছেল। সিন্দুক প্যাঁটরা খুলে দেখেছেলেন? ওর বেশ টাকা ছেল হাতে, আমরা যদ্দুর জানি। আপনি তো সে রাত্তিরি ওর কাছে ছেলেন, আপনাকে কিছু ব'লে যায় নি?

বিপিনের এ কথা বাস্তবিকই মনে হয় না। কামিনীর টাকা ছিল, সে শুনিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার মৃত্যুর সময়ে বা তাহার পরে এ কথা বিপিনের মনে উদয় হয় নাই যে, তাহার টাকাগুলি কোথায় রহিল বা সে টাকার কি ব্যবস্থা কামিনী করিতে চায়।

আর যদি থাকেই টাকা, তাহাতেই বা বিপিনের কি? কামিনী বিপিনের নামে উইল করিয়া দিয়া যায় নাই, সুতরাং অত গরজ নাই বিপিনের কামিনীর টাকা কোথায় গেল তাহা জানিতে। মুখে বলিল, ছিল ব'লে জানতাম বটে, তবে আমায় কিছু ব'লে যায় নি। কেন বল তো?

কথাটা বলিয়াই বুঝিল নরহরি যে প্রশ্ন করিয়াছে, তাহার বিশেষ অর্থ আছে। নরহরি বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাহার বাবার সঙ্গে কামিনীর সম্পর্ক যে কি ছিল, এ গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা সবাই জানে, কামিনীর টাকার যদি কেহ ন্যায্য ওয়ারিশন থাকে, তবে সে বিপিন। সেই বিপিন কামিনীর মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিল, অথচ টাকার কথা সে কিছু জানে না, পাড়াগাঁয়ে ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

—কামিনীর বাড়িডায় ভাল চাবিতালা লাগিয়ে দেবেন, লায়েব মশাই। রাতবিরেতের কাণ্ড, পাড়াগাঁ জায়গা। কখন কি হয়, কার মনে কি আছে, বলা তো যায় না। আচ্ছা, কাল আসব বেন্‌বেলা। এখন যাই।

নরহরি চলিয়া গেলে বিপিন কথাটা ভাবিল। সিন্দুক তোরঙ্গ একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিবে। টাকাকড়ি এ সময় পাইলে কিছু সুবিধা ছিল বটে। কিন্তু বাক্স ভাঙিয়া টাকা হাতড়াইতে গেলে শেষে কি একটা হাঙ্গামায় পড়িয়া যাইবে! যদি কামিনীর কোন দূর সম্পর্কের ভাসুরপো

বাহির হইয়া পড়ে, তখন ? না, সে দরকার নাই। বরং মানীর সঙ্গে পরামর্শ করা যাইবে। তার কি মত জানিয়া তবে যাহা হয় করিলে চলিবে।

সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল বিপিনের জীবনে।

বিপিন কখনও কাহারও জন্য চোখের জল ফেলে নাই। সে এই দিক দিয়া বেশ একটু কঠোর প্রকৃতির মানুষ, কথায় কথায় চোখের জল ফেলিবার মত নরম মন নয় তাহার। আজ হঠাৎ একা বসিয়া কামিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মনে মনে সে একটু লজ্জিত হইয়া উঠিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভাবিয়াও আশ্চর্য্য হইল, কামিনী মাসীকে সে এতখানি ভালবাসিত!

আজ সে স্নেহময়ী বৃদ্ধা নাই, যে দুধের বাটি, কি লাউটা শসাটা হাতে আসিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে, দুটা মিষ্ট কথা বলিবে।

নিঃসঙ্গ ঘরের রোগশয্যায় একা মরিল, কেহ আপনার জন ছিল না যে, একটু মুখে জল দেয়।

কে জানে, তাহার পিতা স্বর্গগত বিনোদ চাটুজ্জে পুরাতন বন্ধুর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অদৃশ্য চরণে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন কি না?

বুড়ী ভালবাসা কাহাকে বলে জানিত। বিনোদ চাটুজ্জে মহাশয় পরলোকগমন করিলে পর আর সে ভাল করিয়া হাসে নাই, ভাল করিয়া আনন্দ পায় নাই জীবনে।

তাহাকে ছুটিয়া দেখিতে আসিত এইজন্য যে, তাহার মুখে-চোখে হাবে-ভাবে স্বর্গীয় নায়েব মহাশয়ের অনেকখানি ফুটিয়া বাহির হয়। কর্ত্তা মহাশয়েরই ছেলে, কর্ত্তা মহাশয়ের তরুণ প্রতিনিধি। তাহার সঙ্গে দুইটা কথা কহিয়াও সুখ।

আজ সে বোঝে, এই যে মানীর সম্বন্ধে কথা বলিতে তাহার ইচ্ছা হয়, কাহারও সঙ্গে অন্তত কিছুক্ষণ সে কথা বলিয়াও সুখ, না বলিলে মন হাঁপাইয়া উঠে, দেখা তো হইতেছেই না, তাহার উপর তাহার সম্বন্ধে কথা না বলিলে কি করিয়া টিকিয়া থাকা যায়—এ রকম তো কামিনী মাসীরও হইত তাহার বাবার সম্বন্ধে!

অভাগিনী যে আনন্দ হয়তো পায় নাই প্রথম জীবনে, ৺বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়ের সাহচর্য্যে তাহা সে পাইয়াছিল। তাহার বঞ্চিতা নারী-হৃদয়ের সবটুকু কৃতজ্ঞতা প্রেমের আকারে ঢালিয়া দিয়াছিল তাই নায়েব মহাশয়ের চরণযুগলে। কি পাইয়াছিল, কি না পাইয়াছিল, আজ তাহা কে বুঝিবে? ত্রিশ বছর পরে কে বুঝিবে মানী তাহার জীবনে কি অমৃত পরিবেশন করিয়াছিল একদিন?

পরদিন সকালে নরহরি দাস কিছু টাকা আনিয়া দিল। বিপিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর টাকা লইয়া পলাশপুরে রওনা হইল।

একটা কথা তাহার মনে হইল, মানীর চিঠিখানা তাহার কাছেই আছে, সে মানীকে বারণ করিবে, কোন চিঠিপত্র যেন সে না পাঠায়। মানীর কোনও অনিষ্ট হইতে পারে হয়তো ইহাতে।

তাহার নিজের জন্য নয়, নিজের জন্য সে কিছু গ্রাহ্য করে না ; কিন্তু মানীর এতটুকু অনিষ্ট হইলে সে নিজেকে ক্ষমা করিবে না।

হাজার হোক, মানী মেয়েমানুষ, সংসার যে কি রকম জায়গা, তাহা কি বোঝে! তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে।

বেলা পড়িলে বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বাহিরের বৈঠকখানায় শ্যামহরি চাকর ঝাঁট দিতেছিল, বিপিন বলিল, বাবু কোথায় রে ?

—রাণাঘাট গিয়েছেন আজ সকালবেলা। সন্দের সময় আসবেন ব'লে গিয়েছেন।

—রাণাঘাটে কেন ?

—উকিলবাবু পত্তর দিয়েছেন, বলছিলেন গিন্নীমাকে—কি মামলার কথা আছে। আপনার কথাও হচ্ছিল।

—আমার কথা ?

—হ্যাঁ, বাবু বলছিলেন, ধোপাখালির কাছারি থেকে আপনি টাকা নিয়ে এলি আপনাকে রাণাঘাট পাঠাবেন। টাকার বড্ড দরকার নাকি—এই সব কথা বলছিলেন।

—বাড়িতে কে কে আছেন ?

—গিন্নীমা আছেন, দিদিমণি আছেন। দিদিমণিকে নিতে আসবেন কিনা জামাইবাবু, তাই বাবু বলছিলেন আপনার নাম ক'রে, আপনি এই সময় টাকা নিয়ে এসে পড়লে ভাল হয়, খরচ-পত্তর আছে।

—ও। তা এর মধ্যে আসবেন বুঝি ?

—আজ্ঞে, পরশু বুধবারে তো শুনছিলাম আসবেন।

—বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। জামাইবাবুর সঙ্গে দেখাটা হয়ে যাবে এখন এই সময় তা হ'লে। তুই যা দিকি বাড়ির মধ্যে। গিন্নিমাকে বল, আমি এসেছি। আর আমার সঙ্গে টাকা রয়েছে কিনা। সেগুলো কি তাঁর হাতে দোব, না বাবু এলে বাবুকে দোব, জিজ্ঞেস ক'রে আয়।

শ্যামহরি বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার একটু পরেই স্থানীয় পুরোহিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি বৈঠকখানায় উঁকি দিয়া বলিলেন, কে ব'সে ? বিপিন ? বাবু কোথায় ?

বিপিন আশা করিতেছিল এই সময় অনাদিবাবু বাড়ি নাই, মানী তাহার আসিবার খবর শুনিয়া বৈঠকখানায় আসিতেও পারে। কিন্তু মানীর পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ বটুক ভটচাজকে দেখিয়া বিপিনের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

মুখে বলিল, আসুন ভটচাজ মশাই, বাবু নেই, রাণাঘাটে গিয়েছেন মামলার তদারক করতে। কখন আসবেন ঠিক নেই, আজ বোধ হয় আসবেন না।

এই উত্তর শুনিয়া বুড়া চলিয়া যাইবে এই আশা করাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না গিয়া সে দিব্য জাঁকিয়া বসিয়া গেল। বিপিন প্রমাদ গণিল, বৃদ্ধ অত্যন্ত বকবক করে সে জানে, বকুনি পাইলে

উঠিতে চায় না—মাটি করিল দেখিতেছি! বাহিরের ঘরে অন্য লোকের গলার আওয়াজ পাইলে মানী সেখানে পা দিবে না। অনাদিবাবু বাড়ি নাই—এমন ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে, সাধারণত তিনি কোথাও বাহির হন না। মানীও চলিয়া যাইতেছে, এমন একটা সুবর্ণ-সুযোগ যদি বা ঘটিল তাহার সহিত নির্জ্জনে দুইটা কথা বলিবার, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। বটুক ভটচাজ বলিল, মামলা? কিসের মামলা?

বিপিন উদাস নিস্পৃহ সুরে বলিল, আজ্ঞে, তা ঠিক বলতে পারছি না। শুনলাম, উকিল সুরেনবাবু চিঠি লিখেছিলেন।

—সুরেন উকিল? কোন্ সুরেন? সুরেন মুখুজ্জে?

—আজ্ঞে না, সুরেন তরফদার।

—কালী তরফদারের ছেলে? সুরেন আবার কি হে! ওকে আমরা পটলা ব'লে জানি। ছেলেবেলা থেকে ওদের বাড়িতে আমার যাতায়াত, অবিশ্যি আমি ক্রিয়াকর্ম্ম কখনও করি নি ওদের বাড়ি। শূদ্রযাজক হতে পারতাম যদি, তা হ'লে আজ এ দুর্দ্দশা ঘটত না। কিন্তু আমার কর্ত্তা মশায়ের নিষেধ আছে। তিনি মরবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন, বটুক, না খেয়ে কষ্ট যদি পাও, সেও ভাল, কিন্তু নারায়ণ-শিলা হাতে শূদ্দুরের বাড়ি কখনও ঢুকো না। আমাদের বংশে ও কাজ কখনও কেউ করে নি, বুঝলে?

বিপিন বলিল, হুঁ।

—তা সেই পটলা আজ উকিল হয়েছে, কালী তরফদার মারা যাওয়ার পর হাতে কিছু টাকাও আজকাল পেয়েছে শুনেছি। তা ছাড়া টাকা জমাতে কি ক'রে হয়, তা ওরা জানে। হাড় কঞ্জুষ ছিল সেই কালী তরফদার, তার ছেলে তো? ওদের আদি বাড়ি শান্তিপুর, তা জান তো? ওর জ্যাঠামশায় এখনও শান্তিপুরের বাড়িতেই থাকে। জমিজমা আছে শান্তিপুরে। বেশ বড় বাড়ি, দোমহলা।

—ও

—অনেকদিন আগে একবার শান্তিপুর গিয়েছি রাস দেখতে, ভারি যত্ন-আত্যি করলে আমাদের। শান্তিপুরের রাস দেখেছ কখনও? দেখবার মত জিনিস। অত বড় মেলা এ দিগরে হয় না কোথাও।

—ও।

—এখানে তামাক-টামাক দেবার কেউ নেই? বল না একটু ডেকে। আর একটু চা যদি হয়, কাউকে ব'লে পাঠাও না। আমি এসেছি শুনলেই বউমা চা পাঠিয়ে দেবেন। তবে শোন, একটা রাসের মেলার গল্প করি। সেবার হ'ল কি জান—ওই যে চাকরটা যাচ্ছে—ও শ্যামহরি, শোন্ একবার এদিকে বাবা, বাড়ির মধ্যে যা তো, বলগে, ভটচাজ্যি মশাই একটু চা খেতে চাইছেন, আর এক কলকে তামাক দিয়ে যা তো বাবা। বিপিন, চা খাবে কি? ও কি, উঠছ কোথায়? ব'স, ব'স।

—আজ্ঞে, আপনি ব'সে চা খান। আমি একটু তাগাদায় যাব ওপাড়ায়, বাবু ব'লে গিয়েছেন, কিছু টাকা পাওয়া যাবে, এখন না গেলে হবে না। সন্ধ্যে হয়ে এল। আমি আসি।

বিপিন বাহির হইয়া পড়িল। বটুক ভটচাজের সঙ্গে বসিয়া গল্প করা বর্ত্তমানে তাহার মনের অবস্থায় সম্ভব নয়।

সব নষ্ট হইয়া গেল। অনাদিবাবু সন্ধ্যার পরেই আসিয়া পড়িবেন। তাহাকে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া মুখ বুজিয়া খাইতে হইবে। তাহার পর বৈঠকখানায় আসিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িতে হইবে; হয়তো সে সময়ে অনাদিবাবু গড়গড়া হাতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে জমিদারি সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিবেন, তাহাও শুনিতে হইবে। তারপর কাল সকালে আর সে কোন্ ছুতায় পলাশপুরে বসিয়া থাকিবে? তাহার তো আসার কথাই ছিল না। টাকা আনিবার ছুতায় সে আসিয়াছে। টাকা ইরশালে ধরা হইয়া গিয়াছে, তাহার কাজও শেষ হইয়াছে। যাও চলিয়া ধোপাখালির কাছারি। মিটিয়া গেল।

বিপিন উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি করিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই। হয়তো এতক্ষণ অনাদিবাবু আসিয়া পড়িয়াছেন। আচ্ছা, সে একটু দেরি করিয়াই যাইবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর-ঘোর হইতে বিপিন ফিরিল। উঁকি মারিয়া দেখিল, বটুক ভটচাজ বৈঠকখানায় বসিয়া আছে কি না। না, কেহই নাই। অনাদিবাবুও আসেন নাই, কারণ উঠানে তাহা হইলে গরুর গাড়ি থাকিত। বাড়ির গরুর গাড়ি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই ফিরিবেন।

গাড়ি উঠানে না দেখিয়া বিপিন যে খুব আশ্বস্ত হইল, তাহা নয়। আসেন নাই বটে, কিন্তু আসিলেন বলিয়া। আর বেশি দেরি হইবার কথা নয়, দুই ক্রোশ পথ গরুর গাড়ি আসিতে।

বিপিন বৈঠকখানায় ঢুকিয়া গায়ের জামাটা খুলিবার আগে একটুখানি বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় অন্দরের দিকের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল—মানী।

বিপিনের সারা দেহে যেন বিদ্যুতের মত কি একটা খেলিয়া গেল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মানী বলিল, আচ্ছা, কি কাণ্ড বল তো বিপিনদা? এলে সেই ধোপাখালি থেকে তেতে পুড়ে— শ্যামহরি চাকর গিয়ে বললে—চা ক'রে নিয়ে আসছি, এসে দেখি ভটচাজ জ্যাঠামশাই ব'সে আছেন, তুমি নেই। ভটচাজ জ্যাঠামশাই বললেন, কোথায় তাগাদায় বেরুলে এইমাত্র। তারপর দুবার এসে খুঁজে গেলাম—কোথায় কে? এলে—চা খাও, জিরোও, তারপর তাগাদায় গেলে হ'ত না কি? প্রজারা পালিয়ে যাচ্ছে না তো।

বিপিনের মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল মানীকে দেখিয়া, আমতা আমতা করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়—তা বেশ ভাল—কাকা কি রাণাঘাটে—

মানী বলিল, দাঁড়াও, আগে তোমার চা আর খাবার আনি।

মানী কথাটা ভাল করিয়া শেষ না করিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিপিন দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, মানী, শোন শোন, যাস নি, দুটো কথা বলি আগে, দাঁড়া।

মানী বলিল, দাঁড়াচ্ছি, চা-টা আনি আগে। কতক্ষণ লাগবে? স্টোভ ধরাব আর করব। আগে যে চা ক'রে দিলুম, তা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

আবার সে চলিয়া যায়। এদিকে অনাদিবাবুও আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। হঠাৎ বিপিন

বেদনাপূর্ণ আকুল মিনতির সুরে বলিল, মানী, চা আমি খাব না। তুই যাস নি, একবার আমার কথা শোন্। তুই চা আনতে যাস নি।

মানী বিস্মিত হইয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন বিপিনদা? চা খাবে না কেন? কি হয়েছে তোমার? অমন করছ কেন?

বিপিন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল, সত্যই তাহার কণ্ঠস্বরটা তাহার নিজের কানেই স্বাভাবিক শোনায় নাই। কিন্তু সে কি করিবে? মেয়েমানুষ কি কথা শোনে? চা আনিবার ঝোঁক যখন করিয়াছে, তখন চা সে আনিবেই। ধোপাখালি হইতে পথ হাঁটিয়া বিপিন এখানে চা খাইতে আসিয়াছিল?

নিজেকে খানিকটা সংযত করিয়া লইয়া বলিল, মানী, যাস নি।

মানী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—অনেকদিন তোকে দেখি নি, কথাও বলি নি, এলি আর চ'লে যাবি চা করতে? চা কি এত ভাল জিনিস যে, না খেলে দিন যাবে না। আমি যেতে দোব না তোকে। এখানে দাঁড়িয়ে থাক।

মানী শান্ত সুরে মৃদু হাসিমুখে বলিল, বিপিনদা, মেয়েমানুষের একটা কর্ত্তব্য আছে। তুমি তেতে পুড়ে এসেছ রাস্তা হেঁটে, আর আমি তোমার মুখে একটু জল দেবার ব্যবস্থা না ক'রে সঙের মত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব—এ হয় না। তুমি একটু ব'স, আমি আগে চা আনি, খেয়ে যত খুশি গল্প ক'র। আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আমারও কি ইচ্ছে নয় তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবার?

মিনিট পনরো—প্রত্যেক মিনিট এক একটি ঘণ্টা দীর্ঘ—কাটিয়া গেল। মানীর তবুও দেখা নাই।

অনাদিবাবু কি আসিলেন? বাহিরে গরুর গাড়ির শব্দ হইল না? না, কিছু নয়। অন্য গরুর গাড়ি রাস্তা দিয়া যাইতেছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে মানী আসিল। একটা থালায় খানকতক পরটা, একটু আলু-চচ্চড়ি, একটু গুড়। বিপিনের সামনে থালা রাখিয়া বলিল, ততক্ষণ খাও, আমি চা আনি। কতকক্ষণ লাগল? এই তো গিয়ে ময়দা মেখে বেলে ভেজে নিয়ে এলুম। চায়ের জল ফুটছে, এখুনি আনছি ক'রে। সব কখানা কিন্তু খাবে, নইলে রাগ করব, আস্তে আস্তে খাও।

বিপিনের সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। পরটা কয়খানা সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল।

অনাদিবাবু বুঝি আসিলেন? গরুর গাড়ির শব্দ না?

চা করিতে এত সময় লাগে? কত যুগ ধরিয়া মানী কেটলিতে চায়ের জল ফুটাইতেছে—যুগ যুগান্তর ধরিয়া চায়ের জল ফুটিতেছে।

মানী আসিল। এক পেয়ালা চা এক হাতে, অন্য হাতে একটি ছোট খাগড়াই কাঁসার রেকাবে পান।

—কই, দেখি কেমন সব খেয়েছ? বেশ, লক্ষ্মী ছেলে। এই নাও চা, এই নাও পান।

বিপিন হাসিয়া বলিল, ভারী খিদে পেয়েছিল, সত্যি বলছি। আঃ, চা-টুকু যে কি চমৎকার লাগছে!

মানী বলিল, মুখ দেখে বুঝতে পারি বিপিনদা। তোমার যে অনেকক্ষণ খাওয়া হয় নি, তা যদি তোমার মুখ দেখে বুঝতে না পারলুম, তবে আবার মেয়েমানুষ কি?

—দাঁড়িয়ে কেন, ব'স ওই চেয়ারখানায়। ভাল কথা, কাকা তো এখনও এলেন না?

—বাবা ব'লে গিয়েছিলেন কাজ সারতে পারলে আজ আসবেন, নয়তো কাল আসবেন। বোধ হয় আজ এলেন না, এলে এতক্ষণ আসতেন।

ওঃ, এত কথা মানীর পেটে ছিল, মানী জানিত যে বাবা আজ ফিরিবেন না, তাই সে নিশ্চিন্ত মনে চা ও খাবার করিতে গিয়াছিল। আর মূর্খ সে ছটফট করিয়া মরিতেছে!

ক্রমশ

দ্বৈত

শ্রীবিভাবতী দেবী

বল তো বন্ধু, শিল্পী কে বড়, কে বড় স্রষ্টা গুনি,
তুমি আর আমি দোঁহার মাঝারে কেবা হয় বড় গুণী!
তোমার রচিত নিখিল বিশ্ব অপরূপ মানি ভাই,
আমার সৃজিত তোমার ও রূপ তার তুলা কোথা পাই?
তবুও বন্ধু, তোমার সৃজনে দোষ রহিয়াছে মেলা,
ধুকু ধুকু নর-মর্ম্মেরে লয়ে খেলিছ ফাঁকির খেলা।
অন্তর-কথা বোঝ না বন্ধু, হয়ে অন্তরযামী,
নিখিলের দুখে চির অচেতন কেন নিখিলের স্বামী?
তোমার রচিত বিরাট বিশ্বে সুখ দুখ একাকার,
আমার সৃজিত স্বর্গ কখনও ধারে না দুখের ধার।
ধূলিপঙ্কিল তোমার জগৎ স্বরূপে কুরূপে ভরা,
চির-অমলিন আমার ত্রিদিব হৃদি-বিমুগ্ধ করা।
মোর দেবচোখে অশ্রুবাষ্প কখনও ফেলে না ছায়া,
মোর নন্দনে চিরবসন্ত ধরে বিমোহন কায়া।

আনন্দ লাগি গড়েছ জগৎ লোকে বলে "লীলা" তব-
রোগ শোক জরা দৈন্যের মাঝে আনন্দ অভিনব।
জড় জঙ্গম চেতনাচেতন সকলি রচিলে ভাই,
সবই নশ্বর করিতে প্রমাণ মরণ সৃজিলে তাই।
এক হয়ে বহু হইবার সাধ জেগেছিল তব মনে,
প্রতি পলে পলে মোর সনে বঁধু হার হ'ল তব রণে।
বন্ধু আমার, আমি চলিয়াছি বিপরীত পথ ধরি,
মরজগতেরে হেরে আমি তাই অমরাবতীরে গড়ি।
অচিন্ত্যনীয় তোমার স্বরূপ এমন মধুর ক'রে,
পারিতে কি তুমি গড়িতে বন্ধু, যুগযুগান্ত ধ'রে?

বহু হইবার এতটুকু সাধ কভু চিতে নাহি হয়,
সব বহু মোরা ঐ তব একে যেন হয়ে যাই লয়।

মাজুফলের রাজু ডাক্তার

শ্রীবিজয় গুপ্ত

মাজুফলের রাজু ডাক্তারকে চেনে না কে? কিন্তু পারতপক্ষে কেহ তাঁহাকে ডাকিতে চায় না। অতিবড় মন্দভাগ্য যাহার, তাহাকেই ডাকিতে হয়। লোচন কবিরাজের কটুতিক্তকষায়মিশ্রিত অভিনব পাঁচনে অথবা হারাণ হোমিওপ্যাথের জলপড়ায় উপশম হওয়া দূরে থাক, রোগ যখন ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফণাবিস্তার করিতে থাকে, তখন ডাক পড়ে রাজু ডাক্তারের, তাহার পুর্ব্বে নয়। রাজু ডাক্তার যখন আসেন, তখন হয় নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, না হয় চোখের তারা ঘোলাটে নিস্পন্দ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য লোকটার হাতযশ! অগ্রিম টাকা দেওয়া সার্থক। এক দাগ ঔষধ দিয়াছে কি, অমনই রোগের গতি ফিরাইয়া দিয়াছে। যেন ধন্বন্তরি। অথচ সামর্থ্য যাহাদের নাই, তাহারা যদি চোখের জল ফেলিয়া ডিস্পেন্সারি ঘরের মেঝে ভিজাইয়া কাদা করিয়া দেয় তো, তবু তাঁহার মন টলে না।

কঠিন হইয়া রুক্ষস্বরে বলেন, না না, যা, মেঝেটা আর কাদা করিস নি। অমন ঢের দেখেছি, ওতে মেঝেই ভেজে, মন আর ভেজে না। সামর্থ্য যাদের নেই, তাদের আবার ডাক্তার দেখানো কেন?

তবু মানুষেই পারে, যাহার ঘরে মৃতপ্রায় রোগী, সেই পারে রাজু ডাক্তারের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে।

রাজু ডাক্তার ধমক দিয়া উঠেন, তবু বিরক্ত করে! লোচন আছে, হারাণ আছে, যা, ওদের কাছে যা। দরও কম, দয়াও বেশি।

কিন্তু যাহার জন্য এত কান্নাকাটি, সে অভাগার হয়তো এই অসময়েই সময় হইয়াছে, কাহার সাধ্য ধরিয়া রাখে! তথাপি এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। সারাজীবনেও এ ক্লেশ ঘুচিবে না; মৃতদেহ ঘিরিয়া অসহায় আত্মীয়স্বজনের ক্রন্দনধ্বনি নিরুদ্দিষ্ট আত্মার সন্ধানে পিছু ডাকিতে ডাকিতে নিরুদ্দেশের পথে ছুটিয়া চলে। দুইটা টাকার জন্য রাজু ডাক্তারকে দেখাইতে না পারার শোকে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে, অভিশাপ দেয় অজস্র।

অভিশাপ বোধ হয় রাজু ডাক্তারের বেলায় লাগে না। নহিলে এত লোকের অভিশাপ কুড়াইয়া সুস্থ শরীরে কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে লোকটা!

মহাযুদ্ধের বছর কাদম্বিনী মরিল, আর পরের বছর মরিল রাধিকা ঘোষাল। তাহারই বছর দুই পরে কাদম্বিনীর স্বামী রাজু ডাক্তার শ্বশুরের পোড়ো ভিটেখানি সংস্কার করিয়া ডিস্পেন্সারি ফাঁদিয়া বসিলেন। ভালই হইয়াছে, গ্রামে তবু একটা পাস করা ডাক্তার আছে।

রাধিকা ঘোষালের জামাই আসিয়াছে শুনিয়া পাড়ার পাঁচজনে দেখা করিতে আসিল। ভূদেব মুখুজ্জে রাধিকা ঘোষালের সমবয়সী ছিল, আগ্রহটা তাহারই বেশি। টুলটার উপর চাপিয়া বসিতে

বসিতে বলিল, ভালই হ'ল, মাজুফলের মুখোজ্জ্বল হ'ল। রাধিকার ভিটেয় তবু সন্ধ্যে জ্বলবে। তা বাবাজী, নাতনীটিকে রেখে এলে কোথা, তাকে তো কই দেখছি না?

—কে? বিস্ময়ের প্রাবল্যে রাজু ডাক্তারের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

হাসিয়া ভূদেব মুখুজ্জে বলে, তোমার মেয়ে গো। সেই যে, যার অন্নপ্রাশনে আমি আর রাধিকা গিয়েছিলুম, এই তো সেদিনের কথা, বোধ হয় বছর তিন চার হবে।

—ও, তা সেও তো গত বছর—

—অ্যাঁ, বল কি! সেটুকুও গেল?

রাজু ডাক্তার অন্যমনস্কভাবে কাগজের উপর কালির আঁচড় টানিতে লাগিলেন।

ঘটনাটা কিন্তু অন্যরূপ; মেয়েটা মরে নাই, তবে সে মরারই সামিল। কাদম্বিনীর মৃত্যুর সময় তাহার বয়স ছিল তিন বছর। পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে রাজু ডাক্তারের জাগিল বৈরাগ্য, তিন বছরের মেয়েকে সঙ্গে করিয়া কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি স্থানে সাধুসঙ্গ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সঙ্গ সাধু হইলে কি হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটি বিপদজনক অঙ্গ জুটিল—গঞ্জিকাসেবন। দিবারাত্র প্রসাদ পাইয়া পৈত্রিক মাথাটা পর্য্যন্ত খারাপ হইবার উপক্রম হইল। এমনই করিয়া নেশার ঝোঁকে কোথাকার এক মেলায় মেয়েটা গেল হারাইয়া। জ্ঞান হইবার পর মেয়েটাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু রাজু ডাক্তার চিরদিনের জন্য সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিলেন। কাজেই, এসব কথা উহাদের জানাইয়া লাভ কি, মরিয়া গিয়াছে বলাই ভাল। ঘটনাটা অপযশের, এর মধ্যে সগৌরবে বিবৃত করার কিই বা আছে! সকলে বিশ্বাসও করিয়াছে তাই, আর না করিবার কারণই বা কি! নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মিথ্যা করিয়া কেহ কি মৃত্যুসংবাদ রটাইতে পারে!

তারপর, আমাদের গল্পের যখন যবনিকা উঠিল, তখন আশপাশের দশবিশখানা গ্রাম রাজু ডাক্তারের সুখ্যাতি-কুখ্যাতিতে ছাইয়া গিয়াছে। তাহাকে চেনে না, এমন লোক এ অঞ্চলে নাই। বিগত পনরো বছরের মধ্যে অন্তত একবারও রাজু ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় নাই, এমন লোক এদিকে অসম্ভব।

হঠাৎ সে বছরটা গ্রামে রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়া গেল। যা দুই একটা ছোটখাটো রোগ সবই প্রায় হারাণের জলপড়া অথবা লোচনের পাঁচনে সারিয়া যায়, বাঁকিয়া দাঁড়াইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। সুতরাং রাজু ডাক্তারের উপার্জ্জনে ভাটা পড়িয়াছে। প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিমর্ষমুখে, বিষণ্ণচিত্তে তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তবু একটা রোগীকেও ডিস্পেন্সারি-ঘরের দিকে আসিতে দেখা যায় না। রাজু ডাক্তার বসিয়া বসিয়া ভাবেন, আশ্চর্য্য, একটা রোগও কি কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে নাই! এ বছরেও আষাঢ় কাটিল, শ্রাবণ গেল, ভাদ্রও শেষ হইয়া যায়, তবু রোগের দেখা নাই। এ বছরটাও তেমনই যাইবে নাকি? উপায় না থাকিলে সঞ্চিত অর্থ ভাঙিয়া আর কতদিন খাওয়া যায়! যা হোক কিছু একটা করিতেই হইবে। বিপন্ন হইয়া রাজু ডাক্তার দেবদেবীর শরণ লইলেন। ঢ্যাঁড়া দিয়া ঢোল পিটাইয়া দশখানা গ্রামের গোচর করিয়া

কালীপূজা করিলেন। মা কালী জাগ্রত দেবী। রাজু ডাক্তারের এহেন দানপত্রের ব্যাপার দেখিয়া লোকে বিস্মিত এবং অভিভূত হইয়া পড়িল। খরচ মন্দ হইল না। তা হোক, উপচার ভাল হইলে ফলও ফলিবে ভাল।

পূজা, প্রসাদবিতরণ, ভোজন ইত্যাদি সাঙ্গ হইলে ভোররাত্রির দিকে ভেজানো দুয়ার ঠেলিয়া রাজু ডাক্তার দেবীর ঘরে ঢুকিলেন। নির্ব্বাপিতপ্রায় ঘৃতের প্রদীপটি তখনও মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। পাণ্ডুর অন্ধকারে অস্পষ্ট দেবীমূর্ত্তি ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজু ডাক্তার জানু পাতিয়া বসিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে অস্ফুটে যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাহা মানুষের পক্ষে ধারণা করাও যেমনই কঠিন, কল্পনা করাও তেমনই অসম্ভব।

কেবল শেষের কথাগুলি শোনা গেল, যেন ওলাউঠো দিস নি মা, একটা দেখতে দেখতে আর একটা শেষ হয়ে যাবে, পুরো আট চল্লিশ দিনের ভোগ দিস মা, কিন্তু মারিস নি যেন, বদনাম হবে।

মুখ তুলিতেই দেখা গেল, রাজু ডাক্তার শুধু প্রার্থনাই করে নাই, চোখের জলও ফেলিয়াছে খানিকটা। মেঝেটা ভিজিয়া কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেমন দরিদ্র রোগীদের নিরুপায় আত্মীয়-স্বজনের বেলায় হয়।

কিন্তু তাহাদের বেলায় রাজু ডাক্তারের দয়া না হইলেও দেবীর দয়া হইল।

পরদিন হইতে মাজুফলের ঘরে ঘরে রোগ দেখা দিতে লাগিল। প্রথমে সকলেই লোচন কবিরাজ ও হারাণ হোমিওপ্যাথের আশ্রয় লয়, পরে বাধ্য হইয়া আসিতে হয় রাজু ডাক্তারের দ্বারে। এমনই করিয়া আশপাশের আরও কয়েকখানি গ্রাম রোগে ভরিয়া গেল। রাজু ডাক্তারের একতিল সময় নাই। দিবারাত্র তাঁহার ডিস্পেন্সারি-ঘরে লোক হত্যা দিয়া পড়িয়া আছে।

ভিজিট বাড়িয়া গেল,—রাত্রে মাজুফলে চার টাকা, গ্রামান্তরে আট টাকা।

ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়ার ফল আছে। অধিকাংশই টাইফয়েড রোগী, পুরা আটচল্লিশ দিনের ভোগ। দেখিতে দেখিতে গ্রামের মধ্যবিত্তকে অতিক্রম করিয়া জমিদার বেণী চৌধুরীর ছেলের জ্বর হইল এবং তিন দিনের মধ্যেই টাইফয়েডে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। না হইলে চলিবে কেন? বড়লোকদের অনেক আছে। উহাদের সামর্থ্যও ঢের, অর্থও প্রচুর। প্রথম কয়টা দিন রাজু ডাক্তারের ডাক আসিতে লাগিল একদিন অন্তর। তাহার পর ঘন ঘন, দিনে দুই তিন বার করিয়া। সকলেই জানে, বিদ্যাবুদ্ধি যেমনই হোক, অথবা পাণ্ডিত্য যতই থাক, ঠেকাইয়া রাখার সাধ্য কাহারও নাই; তবু ঐ কেমন মনের ভুল, ঘন ঘন ডাক্তার আসিলে যেন বল পাওয়া যায়, আশা হয়—বিশেষ করিয়া মাজুফলের রাজু ডাক্তার।

আঠারো দিনের দিন রোগটা সঙ্গিন হইয়া দাঁড়াইল। রাজু ডাক্তারও ঠিক এই আশাই করিয়াছিলেন।

সমস্ত দিনে বেণী চৌধুরীর বাড়ি হইতেই চার বারের ভিজিট আদায় হইয়াছে, এখনও সমস্ত রাত্রিটা বাকি। সন্ধ্যার পর পরিশ্রান্ত ঘোড়াটাকে দুই আঁটি ঘাস দিয়া ডিস্পেন্সারি-ঘরের আলমারির পিছনে বসিয়া রাজু ডাক্তার আজিকার উপার্জ্জনের সমস্ত টাকাটা গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। বাইশ

টাকা উপায় হইয়াছে। মন্দ কি, দিনকতক এইরকম চলুক, তাহা হইলেই গত তুই সনের লোকসানটা উসুল হইয়া আসিবে।

বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল।

রাজু ডাক্তার যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, তাড়াতাড়ি লণ্ঠন হাতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক একটি বছর চৌদ্দ বয়সের ছেলে, নমস্কার করিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমি কল্যাণপুরের সমবায় সমিতি থেকে আসছি।

জবাব রাজু ডাক্তারের মুখে যোগানো আছে, এর জন্য তাহাকে কোন দিন ভাবিতে দেখা যায় না, বলিল, তোমরা বিনামূল্যে অনেক কিছু কর শুনেছি, কিন্তু আমি বাপু মূল্য ছাড়া এক পাও নড়ি না।

—বিনামূল্যে কেন, মূল্য দোব বইকি। আমাদের মাস্টার মশায়ের স্ত্রীর অসুখ, তেমন সুবিধে বোধ হচ্ছে না। আপনাকে একবার যেতে হবে।

—তা জানি, সুবিধে বোধ হ'লে কি কেউ আমার কাছে আসে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আবছা আবছা চিনি বটে তোমাদের মাস্টারকে—সমিতির জন্যে চাঁদা চাইতে এসেছিল। সমিতি করতে এসেছে, তা স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে কেন?

—উনি যে আমাদের পড়ান।

—পড়ান, না রান্না শেখান?

ছেলেটি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

রাজু ডাক্তার লণ্ঠনটি তুলিয়া ধরিয়া ছেলেটিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখছিল কে?

—হারাণ ডাক্তার, বেগতিক দেখে আর আসতে চাইছে না।

—বুঝেছি। টাইফয়েড তো?

—উনি তো তাই ব'লে সন্দেহ করেছেন।

—হতেই হবে—ও আমি জানি। কদিন হ'ল?

—আজ নিয়ে আঠারো দিন।

কি ভাবিয়া রাজু ডাক্তার ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে ভিজিটটা আমার জান? গ্রামান্তরে আট টাকা।

ব্যস্ত হইয়া ছেলেটি জবাব দিল, টাকার জন্যে আটকাবে না, আপনি চলুন। আট টাকাই দোব।

—দোব নয়, অগ্রিম। রাজু ডাক্তার কাঁচা কাজ করে না।

কিন্তু ছেলেটি বিপন্নকণ্ঠে বলিল, টাকা তো সঙ্গে আনি নি।

—উঁহু, তা হ'লে হবে না। তা ছাড়া এই তু পা হেঁটে বেণী চৌধুরীর বাড়ি গেলে চারটে টাকা আসবে। না বাপু, তুমি ফিরে যাও, কাল বরং টাকা নিয়ে এস।

ছেলেটির কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও উষ্মা একসঙ্গে ঘনাইয়া উঠিল, বেশ বলেছেন। রাত্রে টিকলে তবে তো আসব!

রাজু ডাক্তারের ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরা অসম্বৃত হাসি দেখা যায়। বলে, টিকবে হে, টিকবে। বয়স তো কম হয় নি, দেখলুমও অনেক। পুরো আটচল্লিশ দিনের ভোগ, এ কি সহজে হয়!

ছেলেটি ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারে না, বলিবার মত মনের অবস্থাও নয়। মাস দুই হইতে এই পরোপকারী যুবকটি বিদেশ হইতে আসিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কল্যাণপুরের যে উপকার করিয়াছে, তাহা এখানকার ছেলেরা জীবনেও ভুলিতে পারিবে না। কাজেই মাস্টার মশায়ের স্ত্রীর অসুখে ছেলেদের যত্ন ও পরিশ্রমের অন্ত নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে ছেলেটি কহিল, একটি বার চলুন ডাক্তারবাবু, বাড়ি ঢোকবার আগেই আপনার ভিজিটের টাকা দোব।

রাজু ডাক্তারের কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া উঠিল, অমন অনেক শুনেছি হে, অনেক। যাও, বিরক্ত ক'র না।

লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া লইয়া তিনি পিছন ফিরিলেন। কিছুক্ষণ একাকী দাঁড়াইয়া ছেলেটি বাধ্য হইয়া ফিরিয়া গেল।

মনে মনে রাজু ডাক্তার বলিলেন, আস্পর্দ্ধা দেখেছ, বিনা টাকায় এসেছে রাজু ডাক্তারকে ডাকতে!

অপেক্ষা করিয়া করিয়া রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল; অথচ বেণী চৌধুরীর বাড়ি হইতে ডাকও আসিল না, খবরও আসিল না। বসিয়া বসিয়া ক্লান্তি ও আলস্যে দুই চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে। রাজু ডাক্তার দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ঘুমটাকে এড়াইবার জন্য বার দুই পায়চারি করিলেন। ভাবিলেন, খবর দিবার অপেক্ষায় কাজ কি, একবার নিজেই দেখিয়া আসা যাক না কেন, একটা কর্ত্তব্য তো আছে!

জমিদারের ছেলের অসুখ, চাকর-দাসী আমলা-গোমস্তা সকলেই জাগিয়া আছে; তাহারা সসম্ভ্রমে রাজু ডাক্তারকে রোগীর ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। গিয়া দেখিলেন, রোগী নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। বিছানার পাশের চেয়ারটিতে বসিয়া নিদ্রিত রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াটা লক্ষ্য করিতে করিতে রাজু ডাক্তার ভাবিতে থাকেন, কি আশ্চার্য্য! আঠারো দিনের ভোগে এমন শান্ত নিরুদ্বিগ্ন নিদ্রা তো কোন রোগীর দেখা যায় না! কণ্ঠনালীর মধ্যে সোঁ সোঁ করিয়া শব্দ হইবে, চোখটা ঘোলাটে হইয়া আসিবে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হইবে, তবে তো আঠারো দিনের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। নতুবা এমন অবস্থা ডাক্তারি কেতাবের পাতায়ও নাই, রাজু ডাক্তারের অভিজ্ঞতার ইতিহাসেও নাই।

জমিদার বেণী চৌধুরী নিজে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে বলিতেছিলেন, আপনি যখন আছেন, তখন আর আমরা ভয় করি না।

রাজু ডাক্তার জবাব দিলেন, দেখেছেন চৌধুরী মশায়, একবার ওষুধের গুণটা, এক দাগেই স্থির হয়ে ঘুমুচ্ছে।

কথা কয়টির মধ্যে অসম্ভব রকম উত্তেজনা প্রকাশ পাইল। রোগ উপশমের আনন্দে, না নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাওয়ার উৎকণ্ঠায়, তাহা ঠিক বোঝা গেল না।

রাজু ডাক্তার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলেন। বাড়ি ফিরিয়া বুক দেখা যন্ত্রটা পকেট হইতে নামাইয়া রাখিতে রাখিতে নিজে নিজেই অস্ফুটস্বরে বলিলেন, যাক, নিশ্চিন্ত, ছেলেটা তাহা হইলে ভালই আছে। রাত্রিটা বেশ নিরুদ্বেগেই কাটিবে। চার টাকা দিয়া এত রাত্রে কে আর ডাকিতে আসিবে! প্রাণের মূল্য ও টাকার মূল্য এরা একসঙ্গে মাপে। বরং টাকার জন্য প্রাণ দিবে, তবু প্রাণের জন্য টাকা দেওয়া সহিবে না।

টং টং করিয়া সশব্দে ঘড়িটা বাজিয়া উঠিল। মাত্র বারোটা। কি আর এমন রাত্রি হইয়াছে! সামান্য অবহেলায় আট আটটি টাকা বোধ হয় ক্ষতি হইয়া গেল! কে জানিত, আঠারো দিনেও বেণী চৌধুরীর ছেলেটা এমন করিয়া নিরাশ করিবে!

ভাবিতে ভাবিতে রাজু ডাক্তার বাহিরে আসিলেন।

—ওরে চন্দন!

হিন্দুস্থানী চাকরটা দাওয়ায় বসিয়া ঢুলিতেছিল, সাড়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—ঘাসটা ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দে, আমি একবার কল্যাণপুর যাব।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বিবর্ণ গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা সঙ্গে করিয়া চাবুক হাতে তিনি ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া বসিলেন।

নদীর বাঁধের উপর উঠিয়াই ঘোড়ার গতি মন্থর হইয়া আসিল। ভাদ্রের জ্যোৎস্না-রাত্রি। আকাশ নির্মেঘ না হইলেও অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন। ডান দিকে কূলে কূলে পরিপূর্ণ রূপবিলাসী নদী আর আন্দোলিত শ্বেতশুভ্র কাশগুচ্ছ। বাম দিকে চাষ-আবাদের সুবিধার জন্য একটা অপ্রশস্ত খাল। তাহারই পরে অদূরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, তরঙ্গায়িত সবুজের বিলাস-বিহ্বলতা। আলো-ছায়ায় সবুজে-সুনীলে কি অপূর্ব্ব রাত্রি! বাঁধ ভাঙিয়া ঘোড়াটা নপাড়ার পথ ধরিল। নপাড়া, সোনাগাঁ, অশথতলা, তারপর কল্যাণপুর। রাংচিতার বেড়া দিয়া ঘেরা কাহাদের বাগানে সুগন্ধি ফুল ফুটিয়াছে, দমকা হাওয়ায় ভর করিয়া ফুলের সুবাস উড়িয়া চলিয়াছে দিগ্বিদিকে। সমস্ত পৃথিবী ঘেরিয়া মোহাচ্ছন্ন রাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশ।

সুযোগ পাইয়া ক্লান্ত ঘোড়াটার গতি ক্রমশ মন্থরতর হইয়া আসিতেছে।

রাজু ডাক্তারের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া তিনি ফিরিয়া গিয়াছেন সুদূর অতীতে, আঠারো বৎসর পূর্ব্বের একটি সংসারে—হাসি-কান্নায় ভরা, জীবনের নিয়মিত দুঃখ-সুখে। যেন সারা দিনের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মন লইয়া এইমাত্র স্নেহ-ভালবাসার উষ্ণ-কোমল পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়াছেন। বসন্তের কুসুমিত পরিতৃপ্তির মত একটি সাংসারিক পরিমণ্ডল—শান্ত, সহজ, সরল জীবন, একটানা নদীর মত বেগবান, ভাদ্রের স্রোতস্বিনীর ন্যায় কূলে কূলে পরিপূর্ণ। তখন স্বাচ্ছন্দ্য ছিল স্বতঃপ্রবাহিত, সুখ ছিল অপরিমিত। আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে স্তূপীকৃত স্মৃতির অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে কাহারা যেন জাগিয়া উঠিতে চায়। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না—এসব স্মৃতির পীড়ন, না নিষ্ঠুর রাজু ডাক্তারের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের অকস্মাৎ কল্পনা-বিলাস! হইবেও বা; যুদ্ধযাত্রী

সৈনিকও অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া এমনই করিয়া স্বপ্ন দেখে, ধূমাচ্ছন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও কাহার দুইটি অনুরাগী চোখের বিদায়-দৃষ্টির কথা মনে করিয়া কাতর হয়।

অশথতলার রাস্তায় পড়িতেই ঘোড়ার পদশব্দে একদল শৃগাল চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজু ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন, চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুগুলা জট পাকাইয়া একাকার হইয়া গেল। চাবুকের শব্দ করিয়া ঘোড়াটাকে ভয় দেখাইলেন, রেকাবের ধাক্কায় তাহার জড়তায় আঘাত করিবার চেষ্টা করিলেন। পূর্ব্বের চিন্তাগুলি বাষ্পের মত উবিয়া গেল, আবার তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন অভ্যস্ত জীবনে, ধারাবাহিক জগতের চলিষ্ণু নিয়মানুবর্ত্তিতায়।

রাজু ডাক্তার ভাবিতে লাগিলেন, প্রার্থনাটা তাহা হইলে সফল হইয়াছে। অধিকাংশই টাইফয়েড—সুদীর্ঘ আটচল্লিশ দিনের ভোগ। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, মাস্টারের পয়সার অভাব নাই শুনিয়াছি, বিবাহ-ব্যাপারে বাপের সঙ্গে কি একটা মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, কিন্তু মায়ের কাছ হইতে গোপনে গোপনে অযাচিত সাহায্য আসে। না, টাকার জন্য কোন চিন্তা নাই, এখন ভোগটা পুরাপুরি আটচল্লিশ দিনের হইলেই—

মোড় ঘুরিয়া ঘোড়াটা কল্যাণপুরের রাস্তা ধরিতেই দূরে লণ্ঠন হাতে একটি লোককে আসিতে দেখা গেল। লোকটি নিকটবর্ত্তী হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ হে, তোমাদের সমিতির মাস্টার কোথা থাকে বলতে পার?

রাজু ডাক্তারকে চেনে না কে? লোকটি নীচু হইয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

রাজু ডাক্তার কেমন যেন কঠিন হইয়া উঠিলেন, ভক্তিটা পরে দেখিও, রাস্তাটা আগে বল।

লোকটি অপ্রতিভ হইয়া গেল। একটু অগ্রসর হইয়া স্কুল-বাড়ির পিছনের একটা ঘর নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, আজ্ঞে, ঐ যে।

চাঁদের আলোয় লক্ষ্য করিয়া রাজু ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ওই ভাঙা চালাটা! শুনেছি তো, বড়লোকের ছেলে!

লোকটি নিম্নস্বরে জবাব দিল, হ্যাঁ, কেবল দিদিঠাকরুণের জন্যে; তিনি বলেন, গরিবের মত না থাকলে গরিবের দুঃখ বোঝা যায় না।

—দিদিঠাকরুণ? সে আবার কে?

—ওনারই তো অসুখ।

রাজু ডাক্তার কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বুঝেছি, কেমন আছে এখন বলতে পার?

—ভাল নয়। হারাণ ডাক্তার কিচ্ছু জানে না, ওর জন্যেই তো—

রাজু ডাক্তার ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাইলেন।

স্কুলটা পার হইয়া একটা বাঁশবাগান, তাহারই পাশ দিয়া পায়ে পায়ে গড়িয়া-উঠা অপরিচ্ছন্ন সরু একটি পথ। পচা বাঁশপাতায় বিছুটিবনে আর আগাছায় স্থানটা যেমন বিশ্রী, তেমনই অস্বাস্থ্যকর। এর নাম গরিবের দুঃখ বোঝা?

ঘোড়া হইতে নামিয়া একটা বাঁশগাছের গোড়ায় লাগামটা ফাঁস দিতে দিতে তিনি অবাক

হইয়া গেলেন। তবে কি এতটা আসা নিরর্থক হইল নাকি? সাড়াশব্দ শুনি না কেন, শেষ হইয়া যায় নাই তো?

ভাবিতে ভাবিতে খানিকটা আগাইয়া গিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিলেন, কই গো, কে আছ?

লণ্ঠন হাতে একজন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

—হ্যাঁ হে, এইটিই তো সমিতির মাস্টারের বাড়ি?

লোকটি আলো ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিল, এই যে ডাক্তারবাবু, আসুন আসুন।

—তা তোমাদের মাস্টার কই?

—আজ্ঞে আমিই। মাস্টার ঘাড় নীচু করিল।

—ও তুমিই, তা হবে, সেই কবে দেখেছিলুম, আর তো দেখি নি।

মাস্টারের পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকিয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, রুগীর অবস্থা কেমন?

বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে মাস্টার জবাব দিল, ভাল নয়। এই এতক্ষণ পরে সবে একটু ঘুমিয়েছে।

উঠানের চারিদিক চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া রাজু ডাক্তার বলিলেন, তোমার ছাত্রদের তো দেখছি না, তারা কই?

—তারা ছেলেমানুষ, যেতে চায় না, তবু জোর ক'রে খেতে পাঠিয়েছি। আসুন।—বলিয়া মাস্টার পথ দেখাইয়া ঘরে ঢুকিল।

রাজু ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিলেন না, এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন, কই হে, তোমার সে ছোকরা কোথা গেল—বাড়ি ঢোকবার আগেই যে মূল্যটা দেবে বলেছিল?

—এই যে। মাস্টার তৎক্ষণাৎ ব্যাগ খুলিয়া একখানি দশটাকার নোট দিল।

নোটখানি পকেটে পুরিতে পুরিতে রাজু ডাক্তার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তবে আর দেরি কেন, চল, চটপট কাজ সেরে নিই।

রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া অভ্যাসমত নাড়ীটা অনুমান করিতে গিয়াই তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, আলোটা তুলে ধর দিকি।

টিপয়ের উপর বসানো আলোটা তুলিয়া ধরিতেই তাঁহার হাত হইতে রোগিণীর শীর্ণ, নিস্পন্দ হাতখানি খসিয়া পড়িল।

—অ্যাঁ, দেখি দেখি।—বলিয়া বিস্ফারিত নয়নে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

—নন্‌সেন্স, আলোটা বাড়িয়ে দাও।—উত্তেজিত কণ্ঠে রাজু ডাক্তার চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে কলের পুতুলের মত মাস্টার দ্বিগুণ জোরে আলোটা বাড়াইয়া দিল। রাজু ডাক্তারের মাথাটা ধীরে ধীরে রোগিণীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল; তাহার মৃত্যুমলিন, বিবর্ণ ওষ্ঠাধরের কাছে আঙুল দুইটি রাখিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে তিনি উচ্চারণ করিলেন, উঃ, কি ঠাণ্ডা!

সমস্ত ঘরের নিরুদ্ধ স্তব্ধতায় শুষ্কপত্রের মর্ম্মরধ্বনির মত ভয়াবহ তাঁহার কণ্ঠস্বর। মাস্টার স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটা অসহনীয় ব্যথার নিদারুণ আঘাতে সমস্ত বুদ্ধি যেন তাহার আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

রোগিণীর মুখের উপর রাজু ডাক্তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। নিষ্পলক চোখ দুইটি হইতে তীব্র দ্যুতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। এ দৃষ্টি-প্রদীপে অতীতের ঘন তমসাচ্ছন্ন গহ্বরও আলোকিত হইয়া উঠে।

এ মুখ—এ যে তাঁহার চিরপরিচিত! যত বছরই কাটিয়া যাক না, একে কি ভোলা যায়? সেই চিবুক, সেই নাক, চোখের কোণে সেই কাটা দাগটা পর্য্যন্ত—ছেলেবেলায় কাদম্বিনীর অসাবধনতায় কুয়াতলায় পড়িয়া কাটিয়া গিয়াছিল। সময়ের ব্যবধান কি বিস্মৃতি দিতে পারে? অস্পষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ভোলা যায় না।

মাস্টার যেন সহসা জাগিয়া উঠিল; রাজু ডাক্তারের হাত দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবু, পারুল কি বেঁচে নেই?

মাস্টারকে সজোরে একটা ঠেলা দিয়া তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন, খবরদার, পারুল নয়, অন্নপ্রাশনের সময় কাদম্বিনী ওর নাম রেখেছিল—গৌরী।

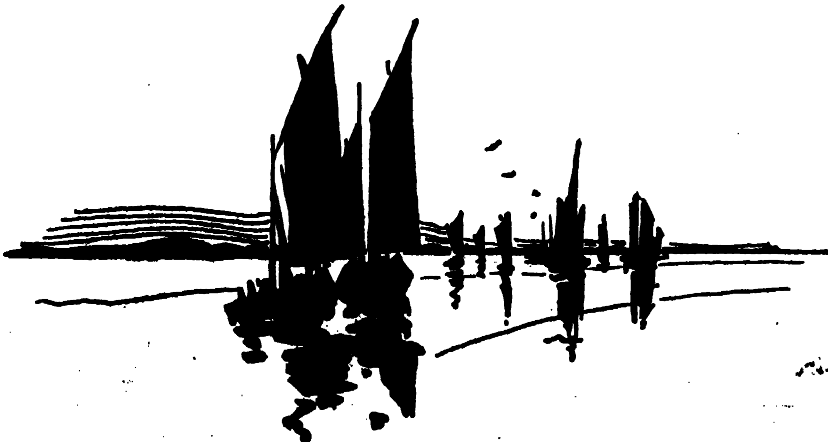
পুনরায় ব্যাকুল কণ্ঠে মাস্টার ডাকিল, ডাক্তারবাবু!

কে তাহার কথার জবাব দিবে! রাজু ডাক্তার তখন চোখ বুজিয়া আবৃত্তির মত বলিয়া যাইতেছেন, জান মাস্টার, ছেলেবেলায় ও কিছুতেই ঘুমুতে চাইত না; কাদম্বিনী ঘুম পাড়াত, চোখে হাত চাপা দিয়ে দোল দিতে দিতে বলত, ছেলে ঘুমোল, পাড়া জুড়ুল। মাস্টার, ও ঘুমিয়েছে, অনেক দিন পরে ঘুমিয়েছে।

—ডাক্তারবাবু!

অকস্মাৎ রাজু ডাক্তার খাড়া হইয়া উঠিলেন, ক্ষিপ্তের মত মাস্টারের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, রাস্কেল, তোমার নামে আমি চার্জ আনব, খুনের চার্জ। বিনা চিকিৎসায় হাতুড়ের হাতে দিয়ে তুমি ইচ্ছে ক'রে মেরেছ। কই, আমার চাবুক কই? আমি থানায় চললাম।

চাবুকটা দেওয়ালের কোণে ঠেসানোই রহিল। রাজু ডাক্তার দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। পল্লীগ্রামের নির্জ্জন রাত্রির বুকে ঘোড়ার দ্রুত পদধ্বনি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল।



রৌদ্র-বিলাস

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

ঝম্ ঝম্ করে রোদ, বৃষ্টি পড়ল নাকো, কাঠফাটা রোদ্দুরে কাজ করা চলে না,
কবিতা লিখব কি রে! রোদের বাদলে আজ কবিতার রোশনাই একবারে জ্বলে না।
উদাস ঘুঘুর ডাকে বৈরাগী হ'ল মন,
জলাঙ্গী-তীরে তাই ব'সে আছি অকারণ,
পদ্মের পাতাগুলো রাতজাগা বউ যেন, সখীরা শুধায় তবু লাজে কথা বলে না।
ওপারে আমের বনে আম পাকা পোকা সব কেঁদে কেঁদে হয়রান, রস তবু গলে না।
এমন দুপুরে সই, কবিতা কি লেখা যায়?
ছায়াময় জান্‌লাটি খস্‌খস-পর্দ্দায়
তোর পিচকারী-দেওয়া জলরেণু সুঘ্রাণ, মার্বেল মেঝেটিতে মূর্চ্ছিত চন্দন,
চারদিক নিঝ্‌ঝুম, কেউ আশপাশে নাই, তুই আর আমি আর—একলাই দুইজন।
তাও যদি নাই চাস—জলাঙ্গী-কিনারে
চারদিক ঢাকা যার তরুবীথি-মিনারে,
পাঁকাল মাটিতে যার রক্তের আদিমতা, ঘুরঘুরে পোকা সব থাকে যার গর্ত্তে,
সেইখানে খোলা গায় বসবি তো আয় সই, এমন ঠাণ্ডা আর পাবি কোথা মর্ত্ত্যে?
তাও যদি নাই চাস—আয় তবে কাছে আয়,
গান গেয়ে কাজ নাই, কাজ নাই কবিতায়,
নিঝুম নিঝুম সব—ঝম্ ঝম্ করে রোদ গম্ গম্ করে কথা আকাশের নীলে যে!
মরীচিকা স্রোত-বওয়া ঐ রোদভেজা মাটি উপরে সাঁতার কাটে শকুনি ও চিলেতে,
ঐখানে যাই সই, তুই আর আমি যাই,
রোদের বাদলে আর ঘরে থেকে কাজ নাই;
কবিতাও লিখব না, লিখব না কিচ্ছুই, ঐ মরীচিকা-নদী সাঁতরে পেরুব আয়।
পিপাসা যদিবা পায়—মৃগতৃষা, নভো নীলে—ঠাঁই ঠাঁই মেঘ-জমা ওয়েসিস শোভা পায়।
তাতেও যদিবা তোর মন উঠল না সই,
আয় তবে দুজনায় এখানেই ব'সে রই,
গভীর গভীর হবে রোদের তুফান আর বাতাস আনবে ব'য়ে বড় বড় রোদ-ঢেউ।
দুজনায় একলাই চুপচাপ ডুবে যাব, ডুবে যাব একেবারে দেখতে পাবে না কেউ!
রোদ্দুরে ডুবে গেছে ওপারের আমবন,
এপারে জলাঙ্গীও ডুবতে করেছে মন,
চিলগুলো ডুবে গেছে, ডুবে গেছে ঘুঘুপাখী, এমন রোদের বান ডুববে সবাই তো,
আদিম রোদের বান, চকচকে ঝকঝকে—আদিম পৃথিবী যাতে গা-ডুবিয়ে নাইত।
গান নয় কথা নয় কিছু নয়—আমি-তুই,
ঠাণ্ডা মেঝেতে নয়—রোদের সাগরে শুই,
রোদের বাদল আর বাতাসের ঢেউ লাগে, আমার গায়ের ঢেউ তোর গায় দিব আয়,
পদ্মের পাতাগুলো যেমন ঘুমিয়ে আছে তেমনি ঘুমিয়ে যাব রোদ্দুরে দুজনায়!

সৌরজগতের বাস্তব দশা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনীলরতন কর

বায়ুমণ্ডলের উর্ধতন স্তর বিদ্যুতের সুপরিবাহী, পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের পর্যালোচনা থেকে এই তথ্যটি প্রথম জানা গিয়েছিল। নিখুঁত পরিমাপ-কার্য দ্বারা বিজ্ঞানীগণ দেখেছেন যে, পৃথিবীর চুম্বকীয় বলের দিক (direction) এবং তীব্রতা (strength) পরিবর্তনশীল। কিন্তু সেই পরিবর্তন এত সামান্য যে, খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যতীত ধরা পড়ে না। চুম্বকীয় বলের এই পরিবর্তনগুলি প্রধানত দ্বিবিধ—একটি দৈনন্দিন ও বার্ষিক নিয়মিত পরিবর্তন, অপরটি অনিয়মিত ও সাময়িক পরিবর্তন। অনিয়মিত পরিবর্তনটি প্রবল হ'লে তাকে চুম্বকীয় ঝড় (magnetic storm) বলা হয়। পৃথিবীর স্থায়ী চুম্বকত্বের কারণ তার অভ্যন্তরে নিহিত ব'লে অনুমিত হয়, কিন্তু তার চুম্বকীয় বলের পরিবর্তনগুলি বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব স্তরের বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা সাধিত হয়। সূক্ষ্মদর্শী (sensitive) চুম্বকের কাঁটার প্রাত্যহিক দোলন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সেটি অধিকাংশ দিন একটি নিয়মিত মাত্রা বজায় রেখে বিচলিত হয়; প্রাতঃকালে সেটি তার পরিভ্রমণের একটা চূড়ান্ত সীমাতে গমনের পর, অপরাহ্নে তার বিপরীত মুখে আর একটি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে; এবং রাত্রিকালে প্রায় স্থির থাকে। এই দিনগুলি ভূচুম্বকের শান্ত দিবস (magnetically quiet days)। এ ছাড়া অপরাপর দিনে সমগ্র পৃথিবীতে চুম্বকীয় বলের অনিয়মিত আলোড়ন উপস্থিত হয়। সেই অনিয়মিত পরিবর্তনগুলি নিম্ন অক্ষাংশ (low latitude) অপেক্ষা মেরুপ্রদেশে অধিকতর তীব্র হয়। সূর্যপ্রেরিত বিদ্যুতকণার স্রোতপ্রভাবে এই চুম্বকীয় আলোড়নের উৎপত্তি।

পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের নিয়মিত ও অনিয়মিত উভয়বিধ পরিবর্তনই সৌরকলঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট। সৌরকলঙ্কগুলি সূর্যের সক্রিয়তার নির্দেশক। সূর্যের নিজ কাল্পনিক অক্ষদণ্ডে একবার সম্পূর্ণ ঘূর্ণিত হতে প্রায় ছাব্বিশ দিন সময় লাগে। দীর্ঘকালস্থায়ী সৌরকলঙ্কসমূহ এই সময়ের ব্যবধানে পুনঃপ্রকাশিত হয়। পৃথিবীর চুম্বকত্বের সহিত সৌরকলঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের একটি প্রধান সাক্ষ্য এই যে, প্রতি ছাব্বিশ দিন অন্তর তার চুম্বকীয় বিক্ষেপের পুনরাবৃত্তি হয় এবং যে বৎসর সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য দেখা যায়, সেই বৎসরে চুম্বকীয় বিক্ষেপও বৃদ্ধি পায়। আবার কোনও বিশিষ্ট সৌরকলঙ্কের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট ধরণের চুম্বকীয় বিক্ষেপ সংঘটিত হয়। কোনও বৎসরে চুম্বকের কাঁটার দৈনিক দোলনের গড় বিস্তার (average amplitude) সেই বৎসরে প্রকাশিত সৌরকলঙ্কের সংখ্যার দৈনিক গড় নির্ণয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখা যায়; সৌরকলঙ্কের প্রভাব পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের নিয়মিত পরিবর্তনগুলিকেও যে নিয়ন্ত্রিত করছে, এটি তার একটি প্রধান প্রমাণ। বিজ্ঞানীগণের বিশ্বাস, এই নিয়মিত দৈনন্দিন পরিবর্তনগুলি পৃথিবীর উর্ধ্ব অন্তরীক্ষের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার হ্রাসবৃদ্ধির উপর মুখ্যভাবে নির্ভরশীল। উর্ধ্বতন বায়ুস্তরে সূর্যের

আলট্রাভায়লেট রশ্মি বর্ষিত হ'লে বহুসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন মুক্ত হয়, তারই জন্য সেই স্থান বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয়ে ওঠে।

বেতারতরঙ্গের গমনপথ পর্যবেক্ষণফলে আধুনিক যুগে বিদ্যুৎ-পরিবাহী বায়ুস্তর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়েছে। মানুষ এখন নিজের কথা ও সুরবাহী বেতারতরঙ্গকে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ-কালমধ্যে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়ে এনে নিজের কানে শুনতে পারে। বেতারতরঙ্গের সরল-রৈখিক গতি এবং পৃথিবীর বর্তুলতা সত্ত্বেও দেশদেশান্তরের সুদূর প্রান্তে বেতারে সংবাদ প্রেরণ যে সম্ভবপর হচ্ছে, বায়ুমণ্ডলের অনেক ঊর্ধ্বে বিদ্যুৎযুক্ত অণুর স্তর বা আয়নমণ্ডলের (Ionosphere) অস্তিত্বই তার কারণ। ১৯০২ অব্দে হার্ভার্ডের অধ্যাপক এ. ই. কেনেলি এবং লণ্ডনের অলিভার হেভিসাইড উভয়ে নিরপেক্ষভাবে এই বেতারতরঙ্গ-প্রতিফলক স্তরের অস্তিত্ব প্রথম অনুমান করেন। ১৯২৪ অব্দে অধ্যাপক অ্যাপ্‌ল্‌টন ও ব্রিটিশ রেডিও রিসার্চ বোর্ডের অন্যান্য গবেষকগণ আয়নমণ্ডলের উচ্চতা পরিমাপ ক'রে স্থির করেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ষাট মাইল ঊর্ধ্বে বেতারতরঙ্গ-প্রতিফলনকারী এক বিদ্যুৎযুক্ত বায়ুস্তর আছে। অধ্যাপক কেনেলি ও হেভিসাইডের নামানুসারে তাকে কেনেলি-হেভিসাইড স্তর বলা হয়। এই স্তরটি মাঝারি ও বৃহৎ বেতারতরঙ্গকে প্রতিফলিত করতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র বেতারতরঙ্গকে প্রতিফলিত করতে পারে না। আয়নমণ্ডলের যে স্তরে গিয়ে ক্ষুদ্র বেতারতরঙ্গ প্রতিফলিত হয়, তার নাম অ্যাপ্‌ল্‌টন স্তর ; এর উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দেড় শত মাইল।

দীর্ঘ বেতারতরঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বেতারতরঙ্গ প্রতিফলিত করতে আয়নমণ্ডলে অধিকসংখ্যক ইলেক্‌ট্রনের অস্তিত্ব আবশ্যক হয়। এইজন্য বেতারতরঙ্গ প্রতিফলনের পরীক্ষা দ্বারা আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে ইলেক্‌ট্রনের সমাহরণ (concentration) নির্ণয় করা যেতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে এরূপ কম্পাঙ্কের (frequency) বেতারতরঙ্গ পাঠানো যায়, যেটি কেনেলি-হেভিসাইড স্তর এবং অ্যাপ্‌ল্‌টন স্তর উভয় স্তর থেকেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে ; বেতারতরঙ্গ প্রেরণ ও প্রতিফলনের এই নিশানাকে ক্যাথোড রশ্মি দোলনলেখ যন্ত্র (cathode ray Oscillograph) সাহায্যে উপযুক্ত ফোটোগ্রাফি ফলকের উপর চিত্রিত করা যায় এবং নিশানা পাঠানো ও ফিরে পাওয়ার অন্তর্বর্তী যৎসামান্য সময়টি পরিমাপ করা যায়। বেতারতরঙ্গের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল ; অতএব নিশানা পাঠানো ও ফিরে পাওয়ার মধ্যে যে সময়টুকু ব্যয় হয়, তা জানা থাকলে হিসাব ক'রে বলা যায়, প্রতিফলনকারী স্তরটির অবস্থান ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি সেই সময়টি এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের একাংশ হয়, তবে ভূপৃষ্ঠ থেকে বেতারতরঙ্গ-প্রতিফলক স্তরের উচ্চতা হবে ৯৩ মাইল।

দিবারাত্রির বিভিন্ন সময় এবং ঋতুভেদে বিদ্যুৎ-পরিবাহী স্তরটির ভূমি থেকে দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে নিম্নতন বিদ্যুৎ-পরিবাহী স্তরটি প্রায় অন্তর্হিত হয় ; কারণ সে সময়ে ইলেক্‌ট্রনরা আয়নসমূহের সহিত দ্রুতগতি মিলিত হয়ে যায় এবং রাত্রিতে সূর্যের আলট্রাভায়লেট রশ্মি না পাওয়াতে ইলেক্‌ট্রন পরমাণু থেকে পুনরায় মুক্ত হতে পারে না। সূর্যোদয়ের কাল থেকে আয়নমণ্ডলের ইলেক্‌ট্রন-সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমস্ত দিন তারা বহু সংখ্যায় অবস্থিতি করে। গ্রীষ্মের

দিবাভাগে আয়নমণ্ডলে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা শীতঋতুর দিবা অপেক্ষা অধিক হয়। উপরিতন বিদ্যুৎ-পরিবাহী স্তরে মুক্ত ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যার দৈনিক পরিবর্তন নিম্নতন স্তর অপেক্ষা কম নিয়মিত। উর্দ্ধতন বিদ্যুৎ-পরিবাহী স্তরের ইলেক্‌ট্রন-সংখ্যা রাত্রিতে ক'মে যায় বটে, কিন্তু সে স্থানে বায়ুর ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়ায় ইলেক্‌ট্রন-সংখ্যা হ্রাসের হার নিম্নতন স্তর অপেক্ষা বিলম্বিত হয়। হেন্‌ডার্‌সন ও তাঁর সহকর্মীগণ সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময় পরীক্ষাকার্য দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, কেনেলি-হেভিসাইড স্তরটি সূর্যের আল্‌ট্রাভায়লেট রশ্মির প্রভাবে আয়নাইজ্‌ড থাকে। কিন্তু অ্যাপ্‌ল্‌টন স্তরের বিদ্যুৎ-পরিবাহী গুণ কেবল আল্‌ট্রাভায়লেট রশ্মির দ্বারা উৎপন্ন নহে; সূর্যপ্রেরিত যে সকল বিদ্যুৎ-কণিকা চুম্বকীয় ঝড় সৃষ্টি করে, তারাই এই স্তরটিকে বিদ্যুৎযুক্ত করার অন্যতম হেতু। সূর্যনিঃসৃত এই বিদ্যুৎকণিকাগুলি আলোকের অপেক্ষা কম বেগবান। মেরুপ্রদেশের অন্তরীক্ষে তাদের প্রভাব পৃথিবীর অপরাপর স্থানের চেয়ে অধিকতর তীব্র।

চুম্বকীয় ঝড়ের সহিত মেরুজ্যোতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সাধারণত যখন চুম্বকীয় বিক্ষেপ বৃদ্ধি পায়, সেই সময়েই অতিশয় উজ্জ্বল মেরুজ্যোতির প্রকাশ দেখা যায়। নর্‌ওয়ের অধ্যাপক স্টর্‌মার (Stormer) ও তাঁর সহকর্মীগণের গবেষণাফলে মেরুজ্যোতি কোন্ উচ্চতায় উৎপন্ন হয়, তা নির্ভুল-ভাবে জানা গিয়েছে। যুগপৎ দুটি অথবা ততোধিক বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁরা মেরুজ্যোতির ফোটোগ্রাফ নিয়ে তার উচ্চতা নিরূপণ করেছেন। মেরুজ্যোতির চূড়া প্রায় ২৫০ মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় এবং তার নিম্নাংশ প্রায় ৬০ মাইল উচ্চতায় প্রকাশিত হয়। বিদ্যুৎ-পরিবাহী নিম্নতন স্তরের সহিত মেরুজ্যোতি প্রকাশের নিম্নসীমাকে প্রায় এক উচ্চতায় অবস্থিতি করতে দেখা যায়।

পৃথিবীর অন্তরীক্ষে ওজোনমণ্ডল ও আয়নমণ্ডলের অস্তিত্ব এবং মেরুজ্যোতি প্রকাশের মূলে রয়েছে সূর্যতেজ ও সৌরকলঙ্কের সক্রিয়তা। কিন্তু সূর্যতেজ ব্যতীত আর এক অদ্ভুত অদৃশ্য রশ্মি পৃথিবীর উপর দিনরাত্রি ক্রিয়া করছে; এই রশ্মির নাম কস্‌মিক রশ্মি। সূর্য ব্যতীত সমস্ত তারকা থেকে যে তেজ পৃথিবীর উপর বর্ষিত হয়, ভূপতনশীল কস্‌মিক রশ্মির পরিমাণ তার একাদশমাংশ। এই অদ্ভুত রশ্মি ভূমির নিকটবর্ত্তী প্রতি ঘন ইঞ্চি বায়ু থেকে প্রতি সেকেণ্ডে কুড়িটি পরমাণুকে ভেঙে ফেলছে এবং আমাদের শরীরের লক্ষ লক্ষ পরমাণুর বিভজন ঘটাচ্ছে। মানুষের স্নায়ুমণ্ডলী কস্‌মিক রশ্মির প্রত্যেকটি আঘাত যদি অনুভব করত, তা হ'লে জানতে পারতাম যে, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় পঁচিশটি কস্‌মিক রশ্মি আমাদের প্রত্যেকের দেহকে বিদ্ধ ক'রে চ'লে যাচ্ছে। এই রশ্মির বস্তুভেদন ক্ষমতা এত তীব্র যে, সেটি ২০০ ফিট জলের স্তর অথবা ১৬ ফিট পুরু সীসার প্রাচীর ভেদ ক'রে বেরিয়ে যেতে পারে। হেস (Hess) ১৯১৩ অব্দে বেলুনযোগে উপরে উঠে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন যে, উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে কস্‌মিক রশ্মির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর এই পরীক্ষার পরে মিলিক্যান, অ্যাণ্ডার্‌সন, কোম্‌টন, স্টর্‌মার প্রমুখ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই রশ্মি নিয়ে গবেষণা করেছেন। এঁদের অনুসন্ধানকার্যের ফলে জানা গিয়েছে যে, সাগরপৃষ্ঠের কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষেত্রের উপর প্রতি সেকেণ্ডে যত কস্‌মিক রশ্মি বর্ষিত হয়, ৪,৩০০ মিটর উচ্চতায় সেই পরিমিত ক্ষেত্রে তার চতুর্গুণ এবং স্তব্ধমণ্ডলের উচ্চতায় তার তিনশতগুণ হারে কস্‌মিক রশ্মি বর্ষিত হয়।

এক একটি কস্‌মিক রশ্মির আঘাত সময়ে সময়ে লক্ষ কোটি সংখ্যক আয়ন উৎপন্ন করে। এই অদ্ভুত রশ্মির মূল সূর্য নহে; কোথায় তার উৎস, আজও তা জানা যায় নি।

সূর্যতেজপ্রভাবে যেমন পৃথিবীর ভূমিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে, সাগরজলে বায়ুমণ্ডলে তাপের স্রোত বইছে, ঝড় মেঘ ও বিদ্যুতের জন্ম হচ্ছে এবং উর্ধ্বতন বায়ুস্তরে ইলেক্‌ট্রনের হ্রাসবৃদ্ধি, মেরুজ্যোতির প্রকাশ ও চুম্বকীয় ঝড়ের উৎপত্তি হচ্ছে, অপরাপর গ্রহতেও সেইরূপ ঘটনাসমূহ চলছে ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু এই বিচিত্র ঘটনাগুলি পৃথিবীতে যত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা যায়, সেই তুলনায় অপরাপর গ্রহ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অকিঞ্চিৎকর। গ্রহ-উপগ্রহসমন্বিত সৌরজগতের বস্তু এবং শক্তির সমাবেশের বিরাট জটিল বৈচিত্র্য কল্পনা করলে স্বতই এ কথা মনে জাগরূক হয় যে, অগণ্য নক্ষত্রখচিত মহাকাশে আমাদের এই সৌরজগতের মত আর কোনও গ্রহ-পরিবার এবং আমাদের এই পৃথিবীর মত আর কোনও গ্রহ আছে কি? দূরবীক্ষণের দৃষ্টির সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। কিন্তু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সেখানে গিয়ে নিরুত্তর, সিদ্ধান্ত এবং অনুমান সেখানে হয়তো সত্যের কিছু আভাস দিতে পারে।

জ্যোতিষীগণ গণনা ক'রে দেখেছেন যে, যে তারকা-গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের সূর্যকে অন্তর্ভূত করা হয়, সেটিতে প্রায় ১৫০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক তারকা আছে। এদের মধ্যে আমাদের সূর্য গ্রহমণ্ডলী বেষ্টিত হ'ল কি প্রকারে? সৌরজগতের উৎপত্তির আধুনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমিত হয় যে, কোনও এক আগন্তুক তারকার সহিত সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক আকর্ষণফলে আমাদের সূর্যের আদিম শরীরের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল; সেই বিচ্ছিন্ন অংশ আকাশমধ্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় বিভিন্ন হয়ে ছোট বড় গ্রহের আকার ধারণ করেছে। কিন্তু তারকারা এত দূরে দূরে অবস্থিত যে, এক তারকার সহিত অপর তারকার সাক্ষাৎকার অতিশয় বিরল ঘটনা। সূর্যের নিকটবর্তী তারকারা এক্ষণে যেরূপ দূরত্বে অবস্থিত থেকে পথ চলেছে, তা থেকে হিসাব ক'রে সার্ জেম্‌স জীন্‌স বলেছেন যে, প্রতি দশ লক্ষ তারকার মধ্যে মাত্র একটি তারকাকে সৌরজগৎসৃষ্টির সম্ভাবনাযোগ্য সান্নিধ্য লাভ করতে সাত লক্ষ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করতে হয়। কিন্তু কোনও তারকার এই প্রকার সান্নিধ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা হ'লেই আর একটি সৌরজগতের সৃষ্টি হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। এই ভাবে সন্নিহিত তারকাদের প্রতি দশটির মধ্যে হয়তো একটি তারকা থেকে সৌরজগতের উৎপত্তি হতে পারে। তারকাদের গড়পড়তা বয়স আমাদের সূর্যের বয়সের সমান ধ'রে গণনা করলে মনে হয় যে, পনরো হাজার কোটি তারকা-মণ্ডিত আমাদের এই মন্দাকিনী নাক্ষত্রিক মণ্ডলে (Gallactic System) পৃথিবীর জন্মকাল থেকে ত্রিশটির অধিক তারকা গ্রহসমন্বিত রূপ গ্রহণ করতে পারে নি।

অধিকাংশ তারকারই গ্রহ নেই। কোনও তারকার গ্রহাদি থাকলেও তাদের অধিকাংশে জীববাসোপযোগী অবস্থার অস্তিত্ব-সম্ভাবনা খুব কম। বস্তুর যে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক অবস্থার যোগাযোগে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব, তার গণ্ডি এতই সঙ্কীর্ণ যে, পার্থিব জীবসদৃশ জীবের অস্তিত্ব সৌর-জগতের আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, পৃথিবীতে যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সমবায়ে জীবদেহ রচিত হয়েছে, অপর কোনও গ্রহে

তার পরিবর্তে হয়তো সিলিকন, গন্ধকাদি মৌলিকের সম্মেলনে কোনও নূতন ধরণের জীবদেহ গড়ে উঠছে। কিন্তু পৃথিবীতে জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, এ প্রকার কল্পনায় তা স্থান পেতে পারে না।

টাইড্যাল থিওরি অনুসারে আমাদের নাক্ষত্রিক মণ্ডলে সৌরজগতের উৎপত্তির হার ষাট কোটি বৎসরে মাত্র একটি। প্রত্যেক সৌরজগতে যদি দশটি গ্রহ জীবের বাসের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে জীবের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়, তা হ'লে গড়ে ষাট লক্ষ বৎসরে একবার ক'রে কোনও গ্রহপৃষ্ঠে সভ্যতার অভ্যুদয় হতে পারে। এই গণনা অনুসারে বলতে গেলে আমাদের দশ হাজার বৎসরের পার্থিব সভ্যতা তারকা-উপনিবেশের অন্যান্য সভ্যতার বয়সের তুলনায় অত্যন্ত নবীন। জীন্‌স এই সম্পর্কে বলেছেন, কোনও অপার্থিব দর্শক যদি পৃথিবীর মানুষের গতিবিধিকে তার সভ্যতার মানদণ্ডে বিচার করে, তবে দেখবে, আমরা এখনও শিশু-অবস্থা অতিক্রম করি নি। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটাই এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করা হয় নি; পৃথিবীর ভাণ্ডারে যে সকল উপকরণ ও সামগ্রী রয়েছে, সেগুলির এখনও শ্রেণীবিভাগ করা হয় নি; এই গ্রহের উচ্চতম পর্বতশিখরে এবং ভূপৃষ্ঠের কয়েক হাজার ফিটের অধিক নিম্নে কেউ যেতে পারে নি। রোগ, মহামারী, মৃত্যু প্রায় অপ্রতিহত গতিতে আমাদের গ্রাস করছে। এখনও লোক-সংখ্যার মধ্যে কোনও স্থায়িত্ব নেই; সেটা কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। এমন কোনও সামাজযন্ত্র এখনও তৈরি হয় নি, যেটি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপায়ে আমাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত ক'রে গ্রহের সসীম সামর্থ্যের মধ্যে ধ'রে রাখতে পারে। আমাদের ইতিহাস পূর্বাপেক্ষা ক্রমেই অধিকতর জটিল, তীক্ষ্ণ ও চঞ্চল হয়ে উঠছে; আমাদের জীবনকে অধিকতর তীব্রভাবে চাপ ও টান সহ্য করতে হচ্ছে; আমাদের সামাজিক সংগঠন পূর্বের চেয়ে দ্রুতবেগে নিত্যনূতন ক্ষণস্থায়ী রূপ গ্রহণ ক'রে অন্য আকারে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।



ত্রিবেণী

"বনফুল"

এক

সে সব শুনিতেছিল।

—অত বিচ্ছিরি ওষুধ আমি খেতে পারব না।

—ডক্টর বোস তো ব'লে গেলেন মিষ্টি হবে খেতে।

—মিষ্টি না ছাই, যা বিচ্ছিরি গন্ধ!

—কোথায় গন্ধ, তোর যত অনাছিষ্টি বাপু, নে, খেয়ে নে, বিজন আবার এসে পড়বে এখুনি। ছোট বউ, কটা বাজল দেখ তো। ওরে হীরু, পিকদানিটা দিয়ে যা, কতক্ষণ ধ'রে ধুচ্ছিস?

হীরু পিকদানি দিয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে ছোট বউ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, সাড়ে দশটা বেজেছে।

—তা হ'লে তো আর দেরি নেই মোটে। নে, খেয়ে নে ওষুধটা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমি বাপু?

—কে দাঁড়িয়ে থাকতে বলছে তোমাকে, যাও না তুমি!

—ওষুধ খাবি না তুই?

—অত বিচ্ছিরি ওষুধ আমি খেতে পারব না।

—লক্ষ্মীটি।

—উঁ, তুমি খালি খালি বিচ্ছিরি ওষুধ খাওয়াবে আমাকে!

—কি করব বল মা, তখন আমার মানা তো শুনলে না, দল বেঁধে গেলে সিনেমায় ফিনফিনে ব্লাউস গায়ে দিয়ে, এখন ভোগ। ডক্টর বোস বলেছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা, চার পাঁচ দিন লাগবে সারতে।

—কিচ্ছু জানে না ডক্টর বোস, তোমাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ষোলটা ক'রে টাকা নিয়ে যায় খালি, আর যত রাজ্যের বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ওষুধ লিখতে জানে!

—বিলেতফেরত বড় ডাক্তার—সে কিচ্ছু জানে না, আর তুমি মহা পণ্ডিত হয়েছ!

—হয়েইছি তো।

—নে, খেয়ে নে শিগগির, ঠাকুর পায়েসটার কতদূর কি করলে, কে জানে! ওরে হীরু!

—আজ্ঞে মা, যাই।

—পোলাওটার চারপাশে আঙরা দিয়ে রাখতে হবে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না হ'লে। তুই কাঠকয়লাগুলো ধরা ততক্ষণ। কি করছিস তুই?

—বাসন মাজছি।

—আগে কাঠকয়লাগুলো ধরা।

—আচ্ছা।

—খেয়ে নে ওষুধটা তাড়াতাড়ি, অনেক কাজ আমার।

—কি কি রান্না হয়েছে আজ মা?

—কই আর করতে পারলুম সব, কাঁকড়া ভেটকিমাছ এসেই পৌঁছল না। কেষ্ট যত বুড়ো হচ্ছে, তত যেন ওর ভীমরতি হচ্ছে।

—গলদা চিংড়ি এসেছে?

—এসেছে।

—ফ্রাই করেছ বুঝি?

—যা মূর্ত্তিমান ঠাকুরটি জুটেছে, কি রকম যে কি করছে কে জানে! কিমাগুলো আমি না গিয়ে পড়লে তো মাটিই ক'রে ফেলত আর একটু হ'লে।

—ফাউলের কি করলে?

—রোস্ট্।

—মাটনের কোর্ম্মা করেছ বুঝি?

—কি আর করি, তুই ভাল থাকলে কাবাব করতে পারতিস। কাবাব করা আনাড়ি ঠাকুরের কর্ম্ম নয়। নে, ওষুধটা খেয়ে নে।

—কত সব ভাল ভাল রান্না হচ্ছে বাড়িতে, আর আমাকে ওষুধ গেলাচ্ছ খালি। খাব না যাও আমি ওষুধ।

—আচ্ছা, তুই কি!

—এক দাগ তো খেয়েছি।

—এক দাগে অসুখ সারলে আর ভাবনা ছিল না। নে, খেয়ে নে, আর জ্বালাস নি।

—তুমি ঢাকা দিয়ে রেখে যাও, আমি খাব এখন পরে।

—দশটার সময় খাওয়ার কথা, সাড়ে দশটা বেজেছে, আবার পরে কেন?

—ভাল লাগে না।

—আজ বাদে কাল বিয়ে হবে মেয়ের, খুকিপনা এখনও ঘুচল না।

—বিয়ে আমি করছি কিনা। আই. এ. পড়ব।

—দুবার ফেল ক'রে ম্যাট্রিক পাস করেছেন, আবার আই. এ. পড়ার সখ!

—বারে, সে কি আমার দোষ নাকি? সবাই মিলে কার্সিয়ঙে নিয়ে গিয়ে আমাকে পড়তে দিলে নাকি একটুও? খালি পার্টি আর পার্টি। তার আগের বারটা তো দিদির বিয়ের হাঙ্গামেই গেল। নিজেরা যত হাঙ্গামা জোটাবেন, আর দোষ হবে আমার!

—বেশ বেশ, সব দোষ আমাদের। এখন ওষুধটা খেয়ে নাও দেখি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—মা, পুডিং করেছ ?

—পুডিং না করলে চলে, বিজন আসছে।

—আমি পুডিং খাব একটু।

—ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস ক'রে দিতে পারি না মা।

—ডক্টর বোস তো দুধ এগ্‌ফ্লিপ সব খেতে বলেছেন। পুডিঙেও তো দুধ আর ডিম আছে। আর ভারী তো নাইন্টি-নাইন জ্বর।

—নাইন্টি-নাইন থেকে একশো পাঁচ হতে বেশি দেরি লাগে না মা। সেবার অমিতার বেলায় দেখেছি তো।

—পুডিং না দিলে আমি ওষুধ খাচ্ছি না।

—কাল খাস, রেফ্রিজারেটারে রেখে দোব।

—জামাইবাবু যা ভালবাসে তোমার হাতের পুডিং, সব শেষ করবে আজকেই। আমাকে এ—কটু দাও, তোমার জামাইয়ের ভাগে কিচ্ছু কম পড়বে না।

—তোকে নিয়ে আর পারি না বাপু। ডক্টর বোসকে ফোনে তা হ'লে জিজ্ঞেস করি ; থাম, নিজের দায়িত্বে দিতে পারব না আমি। সাউথ থ্রী ফাইভ ও প্লীজ। ইয়েস। হ্যালো, কে, ডক্টর বোস ? ও, ডক্টর বোস বাড়ি নেই, আমি মিসেস হালদার, ডক্টর বোস কখন ফিরবেন ? ঠিক নেই ? আচ্ছা, ধন্যবাদ।

—একটু দাও আমাকে, একটু খেলে কিচ্ছু হবে না।

—না মা। ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস ক'রে দিচ্ছি না আমি। সেবার অমিতার বেলায় আধখানি কেক দিয়ে সে কি কাণ্ড!

—দিদির তো টাইফয়েড হয়েছিল।

—পরে না সেটা বোঝা গেল! গোড়ায় গোড়ায় তো প্রমথ ডাক্তার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাই বলেছিল।

—বিলেতফেরত এই চালিয়াৎটার চেয়ে বুড়ো প্রমথ ডাক্তার ঢের ভাল।

—আচ্ছা আচ্ছা, কাল তোমার প্রমথ ডাক্তারকেই ডাকা যাবে জ্বর যদি না ছাড়ে, এখন তো এই ওষুধটা খেয়ে নাও।

—বড্ড বিচ্ছিরি যে।

—ছোট বউ, বেদানাগুলো ছাড়িয়ে আন তো।

—বেদানা খাব না।

—তবে আপেলটাই কেটে আন।

—আপেল বিচ্ছিরি।

—আঙুর তো ফুরিয়েছে, কেষ্টকে তখুনি বললুম আর এক বাক্স এনে রাখতে, দু বাক্সে কুলোয় কখনও! নাকটা টিপে ঢক ক'রে খেয়ে ফেল না মা, কতটুকুই বা! কি আনলে তুমি ছোট বউ ?

মৃদুস্বরে ছোট বউ বলিলেন, আপেল, বেদানা, পেয়ারা।

—ওসব চাই না আমার, চা'টি সুপুরি আর ধনেরচাল ভাজা দাও।

—ও তো বললে খাব না, তবু কেন তুমি এগুলো কেটেকুটে নষ্ট করলে! সবাই মিলে পাগল ক'রে দেবে দেখছি আমাকে।

ছোট বউ কোন উত্তর দিলেন না।

—আচ্ছা, আমি এমনই খাচ্ছি, কিন্তু তার বদলে একটা জিনিস দিতে হবে আমাকে।

—কি আবার?

—ঝুমকো।

—এই তো সেদিন দুল গড়ালে, আবার ঝুমকো?

—তা হ'লে ওষুধ খাব না, যাও।

—তোকে নিয়ে আর পারি না আমি অনি।

—উঁ, কতদিন থেকে তো বলেছ, ঝুমকো গড়িয়ে দেবে। মালতী, রুবি, ফুলু—সক্কলের গড়িয়ে পুরনো হয়ে গেল।

—বেশ বেশ মা, তুমিও গড়িও, এখন ওষুধটা খেয়ে উদ্ধার কর আমায়। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না আমি।

—এই বারটি খাচ্ছি, আর খাব না কিন্তু।

—পরের কথা পরে হবে, এবারটি তো খাও।

—তোমাকে চিনি না আমি? প্রত্যেক বারই ওই কথা বলবে।

—অনি, আর কথা বাড়াস নি, ভাল লাগছে না আমার।

—বলছি তো খাব, দাও না, কিন্তু এই বারটি।

—বাবা বাবা, এক দাগ ওষুধ খাবেন মেয়ে, তা নিয়ে কি কাণ্ড!

—জল জল, শিগগির।

—এই যে, নে না।

হীরু আসিয়া বলিল, কয়লা ধরানো হয়েছে মা।

—আচ্ছা, তুই পিকদানিটা নিয়ে পরিষ্কার ক'রে ফের দিয়ে যা।

—নাকটা ছাড়িস নি তুই অনি, চেপে থাক জোরে।

নাক-চাপা কণ্ঠস্বরে অনি বলিল, কতক্ষণ চেপে থাকব, এবার ছাড়ছি আমি।

—থাম, পিকদানিটা আসুক।

হীরু পিকদানি দিয়া গেল।

—চুপটি ক'রে শুয়ে থাক এবার, আমি রান্নার দিকটা দেখিগে একটু। ছোট বউ না হয় কাছে বসুক।

—না, কাউকে বসতে হবে না। তুমি ওই আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাও। চোখের সামনে দপদপ ক'রে জ্বলছে। মাথা আমার আরও ধ'রে গেল।

—বেশ, এটা নিবিয়ে দিচ্ছি, শিয়রের দিকের নীল আলোটা জ্বলুক।

উজ্জ্বল আলোটা নিবিয়া গেল। স্নিগ্ধ নীল আলোয় সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর জানালার কাছে আবছা একটা মূর্ত্তি দেখা গেল। অনি জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঔষধটা ফেলিয়া দিতেছে। ষোল টাকা ভিজিটওয়ালা ডাক্তারের দামী ঔষধ সমস্তটা ফেলিয়া দিল।

সে সব দেখিতেছিল।

তাহার কেবল মনে হইতেছিল, তাহার প্রথম পক্ষের মেয়েটা মরিবার সময় এক ফোঁটা ঔষধ পায় নাই। বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে মারা গিয়াছে। হাসপাতালের ঔষধ পর্য্যন্ত আনা হয় নাই। কেমন করিয়া আনিবে! সে যে নিজেও তখন শয্যাগত। স্ত্রীও ছিল না। জমিদারতনয় তাহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন।

দুই

একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল বোধ হয়। হর্ন শোনা গেল। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। বিলাতী কুকুর, গলার আওয়াজেই বোঝা যাইতেছে। অনেকগুলা পদশব্দ, জিনিসপত্র নামানোর শব্দ।

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—বিজন এল বুঝি? ওমা, সায়েবি পোষাকে চেনাই যে যায় না দেখছি! তারপর, এস বাবা, এস। থাক, আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। তারপর খবর সব ভাল তো?

বিনীত অথচ পরুষকণ্ঠে উত্তর হইল, আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানকার খবর সব ভাল?

—ভাল আর কই, অনি জ্বরে পড়েছে।

—তাই নাকি?

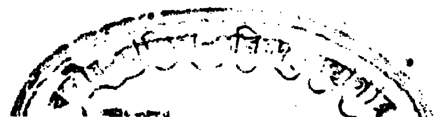
—একা মুস্কিলে পড়েছি আমি। ওঁকে টেলিগ্রাম পেয়ে বম্বে চ'লে যেতে হ'ল, ডিরেক্টার্সদের মিটিং সেখানে। যাবার দিন বার্থ রিজার্ভ নিয়ে সে আবার এক হাঙ্গামা, কেষ্টকে তো চেনই, কি ফোন করতে কি ফোন করেছে ওই জানে, বার্থ রিজার্ভ হয় নি। সে এক কাণ্ড!

—অনীতার কদিনের জ্বর?

—কাল থেকে হয়েছে। ডক্টর বোসকে ডেকেছিলাম, তিনি বললেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা। ওমা, ও বাড়ির হারাণকাকা আসছেন, আমি যাই, তুমি দেরি ক'র না বেশি।

গৃহিণীর চলিয়া যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

—বিজন ভায়া এসে পড়লে নাকি? থাক থাক, আর পেন্নামে কাজ নেই, প্যাণ্টালুনের বোতাম ছিঁড়ে যাবে। হ্যাঁ, অমিতাদির ক্ষমতা আছে বটে। সাত দিন যেতে না যেতেই—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্—



হারাণবাবু তাঁহার নিজস্ব ধরণে হাসিতে লাগিলেন।

—আমার জিনিসটা এনেছ তো ?

—এনেছি। কিন্তু রূপোর সেট, অন্য কিছু তেমন পছন্দ হ'ল না, জয়পুরী কাজ।

—ওরে বাবা, ডুবিয়েছ তা হ'লে বল।

—আপনাকে ডোবাবার মত সমুদ্র পৃথিবীতে আছে নাকি ?

—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্ এহ্।

—হঠাৎ এ সখ হ'ল যে। দিদিমার বুঝি আবার—

—আরে না না, সে সব কিছু নয়। বিয়েতে উপহার দিতে হবে একটা।

—সে কথা জানলে অন্য রকম আনতুম। দিদিমাকে লক্ষ্য ক'রেই রাশটা আলগা ক'রে দিয়েছিলুম।

—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্ এহ্।

—তারপর এখানকার খবর কি ?

—আমার মুখে তো সে সব ভাল শোনাবে না। স্বস্থানে সব শোন গিয়ে। আমি যাই এখন, অমিতাদির অভিশাপ কুড়িয়ে লাভ নেই—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্—কাল আসব আবার।

হারাণকাকা চলিয়া গেলেন। বিজনও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করিয়া একটা গুরুভার পতনের শব্দ হইল।

—কি হ'ল ?

সুটকেস ও হোল্ড্-অলের ভারে হীরু চাকরটা চকচকে মার্বেলের মেঝেতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। সুটকেস ও হোল্ড্-অলের কোন ক্ষতি হইল কি না, তাহা নিরূপণ করিতেই সকলে প্রথমটা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর নজর পড়িল হীরুর প্রতি।

—লেগেছে নাকি, ওকি, রক্ত পড়ছে যে!

বিনীতকণ্ঠে হীরু বলিল, না, বেশি লাগে নি।

—আচ্ছা জামাইবাবু, কি ব'লে আপনি আজ এলেন ?

—উৎকণ্ঠিত হয়ে আছ বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করি ছুটি পেলাম না।

—ব'য়ে গেছে আমার উৎকণ্ঠিত হতে।

—জ্বর খুব বেশি নাকি ?

—নাইন্টি-নাইন।

—এত কম জ্বরে সাধারণত লোকে ভুল বকে না।

—ভুল বকলাম কখন ?

—চির-উৎকণ্ঠিতা তুমি, অথচ বলছ, ব'য়ে গেছে আমার উৎকণ্ঠিত হতে। এ যে বড় আশঙ্কা-জনক উক্তি!

—অহঙ্কারটা একটু কমান।

—কমিয়ে দিন। সেইজন্যেই তো আসা।

—কেন আজ এলেন আপনি? নিজে বেশ মজা ক'রে নানা রকম জিনিস খাবেন, আর আমাকে শুয়ে শুয়ে ওষুধ খেতে হবে।

—সেটা কি আমার দোষ?

—না তো কি! আর দুদিন পরে এলেই হ'ত।

—দেখি নাড়ীটা?

—আপনি কি ডাক্তার?

—শালীর নাড়ী বোঝবার জন্যে ডাক্তার হওয়ার দরকার করে না।

—উঃ, উঃ, লাগছে—ছাড়ুন।

পাশের ঘরটা সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল।

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

—অমিতা, তুই বিজনের খাবার কাছে থাক একটু। আমি চান ক'রে আহ্নিকটা সেরে ফেলিগে, রাত অনেক হয়েছে। তুমি আর দেরি ক'র না বাবা, ব'সে পড়।

গৃহিণী স্নান-আহ্নিকের ছুতা করিয়া কন্যা-জামাতাকে আলাপের সুযোগ দিয়া চলিয়া গেলেন।

অমিতা বলিল, তুমি এলেই মায়ের বিপদ।

—কেন?

—তুমি এলেই উনি ফাউল আনাবেন, কারও মানা শুনবেন না, আর ফাউল ছুঁয়ে চানও করবেন রাত দুপুরে।

—তার চেয়েও বেশি মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি, আমার ক্ষিধে নেই। বর্দ্ধমানে কেল্‌নারে ঢুকে এক পেট খেয়েছি।

—কেল্‌নারে ঢুকে খেতে যাওয়া কেন আবার?

—ক্ষিধে পেয়েছিল।

—এখানেও খেতে হবে সব। একটি জিনিসও পাতে প'ড়ে থাকলে চলবে না। মা সেই দুপুর থেকে ব'সে ব'সে সব করিয়েছেন।

—তা হ'লে কি তোমার ইচ্ছেটা, জিনিসগুলো প'ড়ে না থেকে আমি প'ড়ে থাকি? এসব খেলে তো আমি আর উঠতে পারব না এখান থেকে।

—একটু একটু ক'রে খাও না।

—একটা জিনিস খেতে পারি।

বিজন চুপি চুপি কি বলিল, শোনা গেল না।

অমিতা তর্জ্জন করিয়া উঠিল, লোভীটা!

একটু পরে।

হীরু বলিল, কুকুরটা আর খেতে পারছে না·মা।

—কি আর হবে তা হ'লে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে ডাস্ট্‌বিনে ফেলে দিগে যা।

—আচ্ছা।

—আমি এবার শুতে যাচ্ছি। তুই চায়ের টেবিলটার সব গুছিয়ে রেখেছিস তো? নতুন চাকরের সঙ্গে বকতে বকতে প্রাণটা গেল।

—রেখেছি মা।

—অনির ঘরের জানালার পরদাগুলো টেনে দিয়েছিস?

—দিয়েছি।

—খিড়কির দরজাটায় বাইরে থেকে তালাটা টিপে দিয়ে যাস।

—আচ্ছা।

গৃহিণী শুইতে গেলেন।

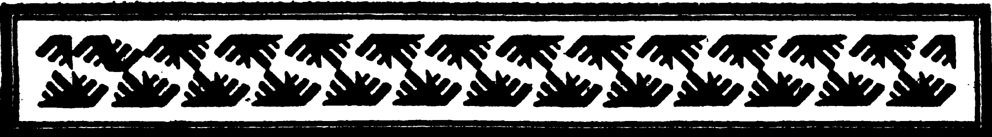
হীরু চাকরও চলিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল।

সে আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রথম স্ত্রীকে গ্রাস করিয়াছে জমিদার, দ্বিতীয় স্ত্রীকে যক্ষ্মা। ঘরে একপাল অনাহারক্লিষ্ট ছেলেমেয়ে। বাজারেও আজকাল ধার জোটে না। ডাস্ট্‌বিনটা একবার দেখিয়া আসিলে কি হয়। ভাল মন্দ জিনিস—না, দরকার নাই। অন্ধকারে গুঁড়ি মারিয়া সে আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল। অমিতা ও বিজয় যে ঘরটায় শুইয়াছিল, সেই ঘরের জানালাটার নীচে আসিয়া কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কিছু শোনা গেল না। সন্তর্পণে উঠিয়া জানালায় কান পাতিয়া খানিকক্ষণ শুনিল। না, কোন সাড়াশব্দ নাই। চাকরটাও ঘুমাইয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে সিঁধকাঠিটা বাহির করিয়া সে কাজ সুরু করিয়া দিল।

মাসখানেক পরে চোরের শাস্তি হইল।

থানার দারোগা, কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টর, কয়েকজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী, সকলের নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া মাননীয় বিচারপতি মহাশয় অকাট্য প্রমাণ পাইলেন যে, হীরু চাকরটাই চুরি করিয়াছিল।

আইন অনুযায়ী তাহার সাজা হইয়া গেল।



আমাদের সাহিত্য-সংসদ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

আকাশে চমৎকার চাঁদনি ফুটিয়াছে। তিথিটা বোধ হয় ত্রয়োদশী হইবে। প্রকৃতি যেন আজ সহসা শীতের শিশিরসিক্ত গুণ্ঠনখানি টানিয়া সরাইয়া দিয়া স্মিত উজ্জ্বল হাসির ঝরণা খুলিয়া দিয়াছে।

দোতলার উপরকার বারান্দায় একখানি বেতের ঈজি-চেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া জগদীশবাবু নব-প্রকাশিত একখানি আইন-পত্রিকা লইয়া পড়িতেছিলেন। মাথার উপরকার দেওয়ালে একটা বিজলী-আলো জ্বলিতেছিল।

হঠাৎ আকাশের পানে নজর পড়িতেই তিনি যেন চকিত হইয়া উঠিলেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার চারিদিক চাহিয়া লইলেন। হঠাৎ মনে হইল, এমন দৃশ্য বহুদিন তাঁহার চোখে পড়ে নাই। নীচে, বাগানের কলাগাছগুলির চওড়া পাতায় পাতায়, ওদিকের এক কোণে রাশি রাশি সাদা স্থলপদ্মগুলিতে জ্যোৎস্না কি অপরূপ রূপই না ঢালিয়া দিয়াছে! বাড়ির সামনে লম্বা রাস্তাটা যেন মোহাচ্ছন্নের মত পড়িয়া আছে। রাস্তার ওপারে অত্যন্ত নগণ্য ঐ বস্তিটা, উহার মাথার উপরকার ঐ ধোঁয়ার রাশি, সবই যেন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

আইন-বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া জগদীশবাবু একবার উঠিয়া বারান্দাটার এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত পায়চারি করিয়া রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন।

পিছন হইতে স্ত্রী বলিলেন, কি দেখছ গা ওখানে?

জগদীশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লইয়া বলিলেন, কিছু না। ঐ আলোটা নিবিয়ে দাও তো।

জাহ্নবী আলোর সুইচ তুলিয়া দিলেন। এবং পরে রেলিঙের ধারে স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, সত্যি, বল না, কি দেখছ?

জগদীশবাবু যেন আপনার মনেই বলিতে লাগিলেন, জ্যোৎস্না যে সুন্দর, এ কথাটা অত্যন্ত মামুলী; কিন্তু জীবনে এক একটা সময় আসে, এবং হয়তো খুব অল্পই আসে, যখন বোঝা যায়, এই অত্যন্ত মামুলী ব্যাপারগুলোই উপলব্ধি করতে মানুষের কম দেরি লাগে। দ্বিজেন্দ্রলাল এক জায়গায় জ্যোৎস্নাময়ী ধরণীকে বিবাহের কন্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পড়েছি অনেক দিন; কিন্তু আজ যেন ধরণীর ঠিক সেই রূপটাই আমার চোখে ধরা পড়েছে। পুষ্পভারনম্রা কিশোরী মেয়েটি নিজের আনন্দে-মেশা লজ্জায় যেন চকিত স্তম্ভিত হয়ে আছে।

জাহ্নবী হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো বয়েসে তোমার কবিত্বের বাতিক ধরল বুঝি?

জগদীশবাবু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, ভুল বলা হ'ল। জান, এমন একদিন ছিল, যেদিন এই জগদীশ বাগচীও কবিতা লিখত? দু-একটা কাগজে ছাপাও হয়েছিল।

—সে আমি জানি। সেই পুরনো বই আর খাতা কখানা আমি আমার দেরাজে যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি।

জগদীশবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, সত্যি নাকি? তা হ'লে তো মরবার সময় আমার চিতার সঙ্গে সেগুলোকে দিতে পারবে দেখছি।

গৃহিণী রাগ করিয়া মুখ-ঝামটা দিলেন। কিন্তু কেন যে আজ এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝখানে বসিয়া জগদীশবাবুর মনে একটা অতি করুণ বেদনার সুর উঠিতেছিল, তাহা বোধ করি তাঁহার নিজেরও অজ্ঞাত ছিল। বুকের আনাচে-কানাচে চৈতালী সন্ধ্যার বাতাসের মত কে যেন হাহাশ্বাস তুলিতেছিল।

জাহ্নবী বলিলেন, আজকের জ্যোৎস্না আবার সুন্দর হবে না? কাল থেকে দিব্যি দখনে বাতাস দিতে সুরু করেছে। মাঘী-পূর্ণিমা বোধ হয় কালই। আর সামনের পূর্ণিমাতেই দোল।

জগদীশবাবু বলিলেন, বল কি? দোল-পূর্ণিমা এরই মধ্যে এসে পড়ল বুঝি? বছরগুলো যে কেমন ক'রে যাচ্ছে, তা যেন বুঝতেই পারছি না। কবে যে বুড়ো হয়ে গেলুম, হাকিমির এই গতানুগতিক জীবনে সেটা যেন বুঝতেই পারলুম না।

জাহ্নবী বলিলেন, আচ্ছা, তুমি তো বেশ লিখতে পারতে। হঠাৎ ছেড়ে দিলে কেন?

কথাটা যেন জগদীশবাবুর কানে গেল না। তিনি আপনার মনেই বলিতে লাগিলেন, এই দোল-পূর্ণিমার স্মৃতিটা কি আমাদের কম মিষ্টি! বাবা তখন বাগেরহাটে থাকেন, আমি কলকাতায় এম. এ. আর আইন পড়ি এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাড়ি যাই। সেখানে আমরা কজনে মিলে একটা সাহিত্য-সংসদের প্রতিষ্ঠা করেছিলুম। সে আজ ঠিক কত বছর হবে কে জানে, সেও এক দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় আমাদের সাহিত্য-সংসদের উদ্বোধন হয়। বাগেরহাটের গণ্যমান্য বহু লোক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। বেশ মনে আছে, আমি একটি কবিতা লিখেছিলুম, রামজীবনও একটা কবিতা, বিনয় আর পরেশ একটি ক'রে প্রবন্ধ, এবং পৃথ্বীশ আবৃত্তি করেছিল। গান করেছিল—সেই যে কি তার নাম! কি আশ্চর্য্য, নামটা তার একেবারেই ভুলে গেছি; অথচ কি ঘনিষ্ঠ-ভাবেই না তার সঙ্গে মিশেছিলুম!

—তোমার সে কবিতা ছাপা হয় নি?

—পাগল! সে আবার ছাপা হবে কি? সে কবিতা ছাপা হ'লে আমার আজ আর লজ্জা রাখবার জায়গা থাকত না, এত রাবিশ হয়েছিল সেটা। আজ একটা লাইনও তার আমার মনে নেই।

—হ'লেই বা খারাপ! সব লেখাই নাকি সকলের ভাল হয়?

—তা সত্যি। হয়তো আজ যদি সেটা ছাপার অক্ষরে কিম্বা অন্ততপক্ষে আমার মনে মনেও বেঁচে থাকত, তা হ'লে দুঃখের মাঝেও একটা অপূর্ব্ব আরাম অনুভব করতে পারতুম, যেমন মনে হচ্ছে আজকের এই জ্যোৎস্নার পানে চেয়ে। সে কবিতাটার মধ্যে আমার সেই পুরনো দিনের সঙ্গীগুলি—সেই পরেশ আর বিনয়, রামজীবন আর পৃথ্বীশ—তারা সকলেই জীবন্ত হয়ে ছিল।

—কেন, তাদের আর খবর পাও না?

জগদীশবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিতে চাপিতে বলিলেন, সে একরকম না পাওয়াই। পরেশ, শুনেছি, কলকাতাতেই কোথায় থাকে। আর এই প্রায় বিশ বছর পরে সেদিন হঠাৎ পৃথ্বীশের খবর পেলুম। খবর তো ভারী! গেল বছর ভাগলপুরে সেই যে বিয়ে দিতে গিয়েছিলুম, সেখানে একটি ভদ্রলোক আমাদের তত্ত্বাবধান আদর-আপ্যায়নের ভার নিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। পরিচয়ের সূত্র টানতে গিয়ে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তিনি আমাদের পৃথ্বীশের জামাই।

জাহ্নবী বলিলেন, তারপর? তোমাদের সেই সাহিত্য-সভা না সংসদ, এখনও সেটা আছে?

—ক্ষেপেছ? নামটা যতই গাল-ভরা হোক, সে তো শুধু ছিল আমাদের পাঁচ-ছজনের একটা সাহিত্যিক মজলিস। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়। বোধ হয় আমি বাগেরহাট ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার পরমায়ুও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

গৃহিণী রূপার কৌটা হইতে একটা পান লইয়া গালে পুরিয়া বলিলেন, তাই বা কে বলতে পারে? হয়তো তোমাদের সেই সাহিত্য-মজলিস বেশ ভালভাবেই বেঁচে আছে, হয়তো এখনও প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমাতে তার বাৎসরিক উৎসব বেশ ঘটা ক'রেই হ'য়ে আসছে।

জগদীশবাবু যেন একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিলেন। পরে ধীরে ধীরে অত্যন্ত নিরুৎসাহের ভঙ্গিতে বলিলেন, অসম্ভব, অসম্ভব। তা যদি হ'ত, সে খবর নিশ্চয় আমি শুনতে পেতুম, নিশ্চয় পেতুম। না, কক্ষনও তা হতে পারে না।

কিন্তু কথাটা তিনি যতই জোরের সঙ্গে বলুন, তবু কেন যে ইহা অসম্ভব, তাহা তিনি নিজের মনে ভাবিয়া পাইলেন না। মুন্সেফি চাকরি পাওয়ার পর হইতে বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে ভাবে তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তাহাতে ক্ষুদ্র সেই শহরের ক্ষুদ্রতম একটি গৃহকোণে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সংসদের জীবন-প্রদীপ আজও স্তিমিত হইয়া জ্বলিতেছে কি না, সে সংবাদ তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছানো কেমন করিয়াই বা সম্ভব? হয়তো সত্যই তাহা আজও বাঁচিয়া আছে, এবং তাহার সেদিনের উদ্যোক্তারা যে বিরাট কাল্পনিকতা লইয়া তাহাকে অনন্ত-জীবনের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখিয়াছিল, ঠিক সে ভাবে না হোক, হয়তো তাহার শ্লথ চরণক্ষেপে যে পথে সে আজ এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে, তাহাকে তাহার জয়যাত্রাই

বলিতে হইবে বইকি। হয়তো সেই পরেশ, রামজীবন, পৃথ্বীশ, এরা সকলেই এখনও এই সংসদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, নয় শুধু সেই জগদীশ। শুধু সে একাই হয়তো, অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে না হইলেও, অবহেলার সঙ্গে বর্জ্জিত হইয়াছে।

ব্যাপারটা হয়তো সত্যই একেবারে তুচ্ছ, কিন্তু তুচ্ছ বস্তুমাত্রকেই সংসারে সব সময় কিছু দূরে ছুঁড়িয়া ফেলা যায় না, ইচ্ছা করিলেও বুঝি যায় না। জগদীশবাবুও ঐ কথাটাকে সহজে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। চাকরিতে তাঁহার সুনাম এবং অর্থ দুইই বেশ আশানুরূপ হইয়াছে, কিন্তু আজ মনে হইতেছে, অন্তরের ভিতর কোথা হইতে যেন একটা ক্ষুধার্ত্তের ক্ষীণ আর্ত্তস্বর শোনা যাইতেছে। তাঁহার অর্থ এবং যশ এই সহসা-প্রবুদ্ধ প্রাণীটিকে এতদিন এক কণা খাদ্য দেওয়া দূরে থাক, তাহার ভিতরকার ক্ষীণ শোণিতধারা শোষণ করিয়া করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাঁহার বিগত দিনের সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর বন্ধুবর্গ যে তাঁহাকে আজ অবজ্ঞার সহিত দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে অন্যায় তো কিছুমাত্র করে নাই, বরং ঐ অবজ্ঞাই তো তাঁহার ন্যায্য পাওনা।

মনের ভিতর যাহাই হউক, কথাটা কিন্তু যেমন অকস্মাৎ উঠিয়াছিল, তেমনই চাপা পড়িয়াও যাইত, যদি না আবার নূতন করিয়া প্রকাশ পাইত ইহারই কিছুদিন পরে গৃহিণীর একদিনের একটা কথায়। রাত্রে সেদিন জাহ্নবী কথায় কথায় হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, আচ্ছা দেখ, দোল-পূর্ণিমার তো এখনও দেরি রয়েছে, এক কাজ কর না! এবার দোল-পূর্ণিমাতে এখানে আমাদের বাড়িতে সাহিত্য-সংসদের অধিবেশন কর না কেন?

জগদীশবাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। হাসিয়া বলিলেন, তার মানে?

—মানে আবার কি? তুমি তো সেদিন বলছিলে, তোমাদেরই বাড়িতে একদিন তার উদ্বোধন হয়েছিল, তাই এবারও—

—পাগল! কাকে নিয়ে হবে সাহিত্য-সংসদের অধিবেশন? আজ যে সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

—কেন থাকবে না? শর, ঐ দিনে তোমার সেই পুরনো বন্ধুদের নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে এলে এখানে, আর এখানকার তোমার সব বন্ধুদেরও—

জগদীশবাবু কি জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। কথাটা তাঁহার অন্তরের নিশ্চল প্রশান্তির মাঝখানে হঠাৎ একটা আলোড়ন তুলিয়াছিল। মন্দই বা কি? যৌবনের প্রারম্ভে যাহারা একদিন অন্তরঙ্গের আসন দখল করিয়াছিল, আজ যদি তাহাদের সকলকে একসঙ্গে জড়ো করিয়া একদিন সেই অতীত দিনের মত সাহিত্যিক মজলিস বসানো যায়—শুধু মন্দ কি নয়, চমৎকার আইডিয়া এটি!

জগদীশবাবু মুখে কোন জবাব দিতে পারিলেন না। কিন্তু গড়গড়ার নলটিতে ছোট ছোট টান দিতে দিতে তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন, কালই বাগেরহাটে একখানা চিঠি লিখিবেন সাহিত্য-সংসদের সম্পাদকের নামে।

দিন সাতেক পরে বাগেরহাট হইতে একখানা চিঠি আসিল। লিখিয়াছে বিনয়েন্দ্র বসু। বিনয়েন্দ্র অতি সংক্ষেপে জানাইয়া দিয়াছেন, বাগেরহাট সাহিত্য-সংসদের চিঠিখানা অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে তাঁহারই হাতে পড়ে, এবং বহুদিন-বিলুপ্ত সেই সাহিত্য-সংসদ যে এখনও অন্তত একজনের মনের কোণেও বাঁচিয়া আছে, এ খবরটা কম আশা এবং আনন্দের কথা নয়। এবং তারপর কয়েকটা অত্যন্ত মামুলী কুশল-জিজ্ঞাসা।

জগদীশবাবু এজলাসে বসিয়া তখন সাক্ষীর এজেহার লিখিতেছিলেন। চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়াই তাড়াতাড়ি জামার ভিতরের পকেটে রাখিয়া আবার নিজের কাজে মন দিবার চেষ্টা করিলেন।

পরের দিন আবার চিঠি গেল বিনয়েন্দ্রের নামে। দীর্ঘ চিঠি। আগামী দোল-পূর্ণিমায় জগদীশবাবুর গৃহে সাহিত্য-সংসদের অধিবেশন। আসা চাইই। কেন না, এ অনুষ্ঠানটি শুধু সেই পুরানো সাহিত্য-সংসদের একটা অনুক্রম বই আর কিছু নয়। সেখানে বাহিরের আর

কাহারও স্থান থাকিবে না। শুধু বিনয়, পরেশ, রামজীবন আর পৃথ্বীশ, আর সেই যে ছোকরাটি চমৎকার গান গাহিত। শুধু এই কয়জন, আর কেহ নয়। এবং ইহাদের সকলকে আনিবার ভার বিনয়েরই উপর। সে যেন পত্রপাঠ ইহাদের সকলের ঠিকানা লিখিয়া পাঠায়। ঠিকানা পাইলেই তাহাদের প্রত্যেকের কাছে পত্র প্রেরিত হইবে।

দিন তিন চার পরে বিনয়েন্দ্র চিঠি লিখিল। অত্যন্ত খুশি হইয়াছে সে এ ব্যাপারে। নিজে সে নিশ্চয় আসিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, এবং অন্য সকলেরই ঠিকানা পাঠাইয়াছে, এমন কি সেই গায়ক-বন্ধু হরিহরের ঠিকানাটিও, পাঠাইতে পারে নাই শুধু রামজীবনের কোন ঠিকানা। সে যে কোথায় আছে, বাঁচিয়াই আছে কি না, তাহারও কোন সন্ধান সে জানে না।

বিনয়েন্দ্রের প্রেরিত ঠিকানাগুলিতে জগদীশবাবু পৃথক পৃথক পত্র লিখিয়া দিলেন সকলকে আসিবার জন্য, এবং প্রত্যেককেই ইহাও লিখিয়া পাঠাইলেন, যেন পত্রপাঠ তাহারা রামজীবনের ঠিকানাটা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দেয়।

হরিহরের ছাড়া সব চিঠিগুলিরই জবাব আসিল। সকলেই আসিবে বলিয়া পরমানন্দে সম্মতি জানাইয়াছে, কিন্তু রামজীবনের ঠিকানা কেহই দিতে পারে নাই। গত দশ বৎসরের ভিতর রামজীবনকে তাহারা দেখেও নাই, তাহার কোনরূপ সংবাদও কেহ পায় নাই।

জগদীশবাবুর এক দিকে যেমন আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না, অন্য দিকে রামজীবনের কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

জাহ্নবী বলিলেন, তা তাঁর খোঁজ না পেলে আর কি করবে! তুমি তো সব রকম চেষ্টাই করলে! আর সত্যিই তো, তিনি বেঁচেই আছেন কি না, তাও তো কেউ জানে না।

কিন্তু জগদীশবাবু তাহাতেই নিরস্ত হইতে পারিলেন না। হাকিম মানুষ, চট করিয়া মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল। তিনি দুইখানা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিলেন। রামজীবনকে উদ্দেশ করিয়াই লেখা। অনেক কাটাকুটির পর লেখাটা এমন দাঁড়াইল, যদি সেটা আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির নজরে পড়ে, সে না আসিয়া কিছুতেই পারিবে না।

জগদীশবাবু পরম তৃপ্তির নিশ্বাস টানিয়া আগামী দোল-পূর্ণিমার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

জাহ্নবী বলিলেন, তা আর তো দেরি নেই, চিঠি কতকগুলো ছাপতে দেবে না?

বিস্মিত জগদীশবাবু পত্নীর মুখের পানে চোখ তুলিয়া বলিলেন, চিঠি ছাপতে? কেন গো? তুমি ভেবেছ বুঝি, আমি এখানকার সব নেমন্তন্ন করব, যেমন রাণুর বিয়েতে করেছিলুম? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এটা একটা সামাজিক অনুষ্ঠানও নয়, একটা পার্টিও নয়। এ মজলিসে আর কারও জায়গা হবে না, ঐ কজন আর আমি নিজে ছাড়া।

জাহ্নবী বলিতে গেলেন, কিন্তু—

বাধা দিয়া জগদীশবাবু বলিলেন, না, কেউ না, কেউ না। এবার দোলের দুদিন ছুটি পড়েছে। এই দুটো দিন বাইরের কারও সঙ্গে আমার দেখা করা সম্ভব হবে না। যদি দরকার হয়, এমনও ব'লে দিতে পার যে, আমি বাড়িতে নেই, ছুটিতে কোথায় বাইরে গেছি। যেখানে হোক ব'লে দিও, অবিশ্যি এমন জায়গার নাম ক'র, দুদিনের ছুটিতে যেখানে গিয়ে ঘুরে আসা যায়। মোট কথা, এই দুদিন বাইরের সকল রকম অত্যাচারের হাত থেকে আমি বাঁচতে চাই। এইটুকু তুমি ক'র।

•

দোল-পূর্ণিমার আর মাত্র কয়েকদিন বিলম্ব আছে। পঞ্চমীর ফালি চাঁদ দূরের তালগাছটার মাথার ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে। জগদীশবাবু মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, ছন্দোবদ্ধ সুন্দর একটি অভিনন্দনে সাহিত্যিক-বন্ধুদের অভিনন্দিত করিবেন। নির্জনে বসিয়া গড়গড়ার রূপা-বাঁধানো নলটি মুখে লাগাইয়া তাহারই একটা খসড়া ঠিক করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভাবরাশির ভিতর হইতে কোন একটি ভাবকেই যেন তিনি রূপ দিতে পারিতেছিলেন না। খানিকটা লেখার পর আবার সেটা কাটিয়া প্যাড হইতে কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া মনে মনে বলিতেছিলেন, অসম্ভব, অসম্ভব।

এতদিন পরে আবার কবিতা লিখিতে যাওয়ার মত হাস্যাস্পদ ব্যাপার বোধ হয় সংসারে কিছুই নাই। তাহা ছাড়া, যাহাদের সামনে এই কবিতা পড়া হইবে, তাহারা সকলেই হয়তো এতদিনে তাহাদের সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। হয়তো সকলেই তাঁহার এই কবিতা শুনিয়া মুখ টিপিয়া পরিহাসের হাসি হাসিবে।

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, দোল-পূর্ণিমার এই অদ্ভুত অনুষ্ঠানের কল্পনাটা হয়তো আগাগোড়াই ছেলেমানুষি হইয়াছে। যে আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-দেবতার মন্দিরের ত্রিসীমানায় পা বাড়ায় নাই, হঠাৎ এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার আবার এই বাতিকের হয়তো কোন অর্থই হয় না।

রামজীবনকে মনে পড়ে, সেই প্রথম বয়সেই সে কি চমৎকার লিখিতে পারিত! কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, সব বিষয়েই তাহার অদ্ভুত হাত ছিল। আজ হয়তো সে—

কিন্তু আশ্চর্য্য, রামজীবনের তো কোন খবরই নাই! খবরের কাগজে নিমন্ত্রণের বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দেওয়ার মত হাস্যাস্পদ এবং অদ্ভুত ব্যাপার আর কি আছে? হয়তো সত্য সত্যই সে এতদিন বাঁচিয়া নাই। কোন্ সুদূর অতীতে তাহার সাহিত্যিকতার অঙ্কুরটির সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনটুকুও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কেই বা তাহার সন্ধান রাখিয়াছে! সেটুকু অবসরও তাহার বন্ধুদের কাহারও হয় নাই। এতদিন যাহার জন্য প্রাণ কাঁদে নাই, এতদিন যাহাকে একেবারেই মনে পড়ে নাই, পড়িলেও নিতান্ত অবহেলার সঙ্গেই সে স্মৃতিকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে, আজ এই সুদীর্ঘকালের পর সহসা একান্ত প্রিয়জনটির মত আকুলভাবে তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া থাকার হয়তো কোনও যুক্তিই নাই। জগদীশবাবুর আজ মনে হইতে লাগিল, হয়তো তাঁহার এই খেয়ালের নীচে নিজেকে জাহির করিবার একটা কুৎসিত বাসনাই সবচেয়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এবং বন্ধুরা যদি কেহ ইহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কেহই হয়তো আসিবে না।

কিন্তু একে একে সকলেই আসিয়া পৌছিল, আসিল না শুধু রামজীবন আর হরিহর। সকলের চেয়ে আগে আসিলেন পৃথ্বীশবাবু, নির্দ্দিষ্ট দিনের আগে সন্ধ্যার সময়।

পৃথ্বীশ বহরমপুরে ওকালতি করেন। বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের উপর হইবে। মাথার চুলের বেশির ভাগই পাকিয়া গিয়াছে, কাঁচাপাকা পুরু গোঁফ। গলাবন্ধ কোটের উপর ভাঁজ করা সিল্কের চাদর, পায়ে নূতন এক জোড়া অ্যালবার্ট জুতা, চলিবার সময় এখনও মস মস শব্দ করিতেছে।

জগদীশবাবু তো অভ্যর্থনা করিতে গিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, আরে, কি রকম ভারিক্কি চেহারা করেছ হে! নিতান্ত একা এসেছ তাই, নইলে বাক্সি রেখেও তোমায় চিনতে পারতুম না।

পৃথ্বীশ হাসিয়া বলিলেন, বদল আপনারও তো কম হয় নি!

জগদীশবাবু আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে বলিলেন, ও আবার কি! 'আপনি' কি হে?

পৃথ্বীশ মুখখানিকে একটু কাঁচুমাচু করিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

আহারাদি শেষ করিয়া জগদীশবাবু তাঁহার লিখিবার প্যাডখানি হাতে লইয়া বাহিরের ঘরে যেখানে পৃথ্বীশের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেখানে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, একটা লেখা আর কিছুতেই ঠিক মনোমত করতে পারছি না হে! কি করা যায় বল দিকিন?

বিস্মিতকণ্ঠে পৃথ্বীশ বলিলেন, লেখা? লেখা কিসের?

জগদীশবাবু একটু যেন আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, এই একটা উদ্বোধন বা অভিনন্দন, যা বল আর কি!

পৃথ্বীশ বলিলেন, অভিনন্দন? আমাদের অভিনন্দন? কি যে বলেন! অভিনন্দিত না করলে বুঝি আর আমরা আসতুম না? একটা খবর পাওয়াটাই তো যথেষ্ট মনে হয় আমার।

জগদীশ একটু যেন অপ্রতিভের মত বলিলেন, না হে না, ও কি আবার একটা কথা! আমাকে ঠিক আগেকার সেই জগদীশ মনে করাই তোমাদের সকলের উচিত। তা ছাড়া অন্য কিছু মনে আনাও অন্যায় হবে, আমারও, তোমাদেরও।

পৃথ্বীশ তাঁহার চশমাটি খুলিয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন, তা ছাড়া আবার কি মনে করতে পারি বলুন তো? কিন্তু

একদিন মাত্র গুটিকয়েক নক্ষত্রের মত আমরা কজন বন্ধুতে যে মজলিসের সৃষ্টি করেছিলুম, তারই ভেতর থেকে একজন যে আজ বিরাট চন্দ্রের মত আকাশকে সমুজ্জ্বল করেছেন, এ আনন্দ যে চেষ্টা করলেও চাপা যায় না।

অতিরিক্ত লজ্জায় জগদীশবাবুর মুখখানা কেমন এক রকম হইয়া গেল। প্রতিবাদ করিতে গিয়া অত্যন্ত এলোমেলোভাবে তিনি শুধু বলিতে পারিলেন, আঃ, ছি ছি, কি যে বলেন! ও রকম কথা মুখে বলা—মনে আনাও উচিত নয়।

এবং এই অসম্বৃত অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া কখন যে 'আপনি' সম্বোধনটা বাহির হইয়া দুইজনের মাঝখানের বহু-বিস্তৃত ব্যবধানটার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া গেল, সে সম্বন্ধে তাঁহার চেতনা না থাকিলেও নিজের মুখের ঐ কথাটা তাঁহার কানে অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া বিঁধিল।

পৃথ্বীশ বলিলেন, বাংলা দেশের বহু জায়গায় তো আপনি এর মধ্যে ঘুরেছেন, কিন্তু বহরমপুরে তো কই—

জগদীশ বলিলেন, না, বহরমপুরে তো কই যাওয়া হয়ে ওঠে নি। একবার ওখানে ট্রান্সফারের কথা হয়েছিল, কিন্তু তখন আমার স্ত্রীর অসুখের দরুন লম্বা ছুটি নিতে হওয়ায় সে ব্যবস্থা ক্যান্সেল করতে হ'ল।

কথার স্রোতটা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটা বিসদৃশ রাস্তা ধরিয়া ছুটিল যে, জগদীশবাবু যেন হাঁপাইয়া উঠিলেন। তাঁহার উদ্বোধন বা অভিনন্দন-পত্রের সম্বন্ধে আর কোন একটা কথাও তুলিবার তিনি অবসর পাইলেন না, এবং সে ইচ্ছাও আর হইল না।

নিজের শয়নঘরে আসিয়া তিনি তাঁহার ছোট টেবিলটির উপর লিখিবার প্যাডখানি খুলিয়া বসিলেন।

জাহ্নবী বলিলেন, তোমার লেখা এখনও শেষ হয় নি নাকি?

—এক রকম সবই হয়েছে। শুধু দুটো একটা জায়গায়—

কিন্তু লেখার দিকে একেবারেই তিনি মন বসাইতে পারিলেন না, কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল, কি আশ্চর্য্য, সেই পৃথ্বীশ হঠাৎ কতদূরে গিয়া পড়িয়াছে! মনে হয়, কোন দিন উহার সঙ্গে পরিচয়ই বুঝি ছিল না। সেই পুরানো দিনের বন্ধুত্বের এতটুকু মর্য্যাদা না রাখিয়া যে ভাবে সে তাহার প্রশংসা করিয়া গেল, তাহাকে খোশামোদি ছাড়া আর কোন আখ্যাই দেওয়া চলে না। অথচ সেই পৃথ্বীশ!

পরের দিন সকালের ট্রেনেই পরেশ ও বিনয়েন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। কাঠের চালানি-কারবার করিয়া পরেশ বেশ দুইপয়সা উপার্জ্জন করেন। বিনয়েন্দ্র বাগেরহাট হাই স্কুলের অ্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার।

অভ্যর্থনার প্রথম পর্ব্বের পরই জগদীশ ইঁহাদের সকলের নিকট রামজীবন আর হরিহরের সংবাদ জানিতে চাহিলেন। পরেশ জানাইলেন, হরিহর হয়তো বৈকালের ট্রেনে আসিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় রামজীবন? তাহার কোন খবরই তাঁহারা গত দশ বারো বছরের ভিতর পান নাই। খবরের কাগজে জগদীশবাবুর দেওয়া বিজ্ঞাপনটি তাঁহারা দেখিয়াছেন। রামজীবন যেখানেই থাকুক, যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, সেটা তাহারও নজরে পড়িয়াছে।

পৃথ্বীশ বলিলেন, ওটা দেখতে পেলে সে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে।

পরেশবাবু বলিলেন, তা তো নিশ্চয়ই। একে তো জগদীশবাবুর নাম দেওয়া আছে, তার ওপর আবার স্পষ্ট ক'রে লেখা রয়েছে ওঁর পরিচয়। ওটাই তো যথেষ্ট।

বিনয়েন্দ্র ও সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। তিনি যেন একটু বেশি মাত্রায় গম্ভীর। পৃথ্বীশ এবং পরেশের মধ্যে যে একটা চঞ্চল খুশির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, সেটাকে যেন তিনি বেশ প্রাণপণে রাশ টানিয়া সংযত করিয়া রাখিয়াছেন।

তাই জলযোগাদি সারিয়া জগদীশবাবুর গৃহসংলগ্ন বাগানে বেতের চেয়ার পাতিয়া চারিজনে বসিয়া যখন গল্প চলিতেছিল, বিনয়েন্দ্র তখন তাঁহার সঙ্গে করিয়া আনা কি একখানা চকচকে ইংরেজী পুঁথিতে অত্যন্ত নিবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন।

পরেশ পরম আনন্দের সঙ্গে জগদীশবাবুকে জানাইতে-ছিলেন, ভারী সুন্দর আয়োজন করলেন কিন্তু! এতকাল পরে আবার যে আমাদের এমন ক'রে মেলামেশার সুযোগ হবে, তা কেই বা ভেবেছিল! কই, আমাদের কারও মাথায়

তো এসব আইডিয়া একবারও আসে নি! কোথেকে আসবে! যত রাজ্যের বনজঙ্গল থেকে কাঠ আমদানি আর রপ্তানি ক'রে মাথার কি ছাই কিছু আছে!—বলিয়া নিজের রসিকতায় বেশ উচ্চৈঃস্বরে যে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া দিলেন, তাহাতে পৃথ্বীশও বেশ খুশির সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু বিনয়েন্দ্র দিলেন না। হাসির উচ্ছ্বাসটা থামিলে তিনি বইয়ের উপর মুখ রাখিয়া বলিলেন, মাথা ছাড়াও এর সঙ্গে আরও কতকগুলো বস্তুর যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন, তাদের তো অগ্রাহ্য করা চলে না।

পরেশ মাথা দুলাইয়া বলিলেন, অবিশ্যি তা তো বটেই। পয়সাটাও থাকা চাই বইকি। কিন্তু ঐটেই যে একমাত্র বস্তু নয়, সে কথা বলতে আমি বাধ্য। আসলে চাই মন, চাই সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি।

পৃথ্বীশ সায় দিয়া বলিলেন, অর্থাৎ যেটাকে আমরা আর্টিষ্টিক টেস্ট বলি।

জগদীশ বলিলেন, আঃ, কি যে বল ভাই তোমরা! বিনয়, তোমার শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে। ট্রেনের এক্‌জার্শনটা—

বিনয়েন্দ্র বইটা একপাশে নামাইয়া বেশ মামুলী একটু হাসি হাসিয়া বলিলেন, তা একটু হয়েছে। মাথাটা ভীষণ ধরেছেও। স্নানটা সেরে ফেললে হয়তো—

জগদীশ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তা বেশ তো। তোমরা ভাই, একটু ব'স, আমি ওকে নিয়ে গিয়ে স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দিইগে।

তাঁহারা চলিয়া গেলে পৃথ্বীশ বলিলেন, বিনয় তো দেখছি ইস্কুল-মাস্টারির ঝাঁজটুকু বেশ অটুট রাখতে শিখেছে!

পরেশ বলিলেন, হ্যাঁ। অর্থাৎ ভাঙে তো মচকায় না। এক কথায় যাকে বলে, সুপিরিয়রিটি-কম্‌প্লেক্স। আরে, তুই হ'লি সামান্য মাস্টার, আর এ হ'ল জেলার একটা সদরালা, লক্ষ লক্ষ টাকার বিচার ফয়সালা করছে, চাট্টিখানি কথা হে?

পৃথ্বীশ বলিলেন, হ্যাঁ, এমন সরল প্রকৃতির হাকিম সচরাচর দেখা যায় না। দেখলুম তো অনেকই।

পরেশ বলিলেন, তা আর বলতে! শুনলুম, শিগগির কলকাতায় গিয়ে পাকা জজ হয়ে বসবেন। আমার বড় ছেলেটিও যে ছোট আদালতে ওকালতি করছে কিনা, আর এদিকে মুন্সেফিরও চেষ্টা করছে। শুনছি, গ্রীভ্‌স সাহেবের সঙ্গে জগদীশবাবুর খাতিরও বেশ আছে।

পৃথ্বীশ বলিলেন, তাই নাকি? তা ভালই হ'ল। এঁর একটা সার্টিফিকেটে তা হ'লে কিছু কাজ হতে পারে।

পরেশ হাসিয়া বলিলেন, সেটা তো যোগাড় করতেই হবে। তা ছাড়া ঐ দিক দিয়ে অনেক কিছু সুপরামর্শও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, কথাটা তো এখন পাড়া যাচ্ছে না। বিশেষ ক'রে ঐ বিনয়ের সামনে।

সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ার মাঝখানে পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া জগদীশবাবু ভাবিতেছিলেন, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যাটিতেও ঠিক অমনই করিয়াই চাঁদ উঠিয়াছিল কি না কে জানে! আজ কিন্তু ঝাউগাছের শিহরণশীল পাতাগুলির আড়াল হইতে মুঠা মুঠা আবীর ছিটাইয়াও সে জগদীশবাবুর মনে এতটুকু রঙ ধরাইতে পারিতেছিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল, এ ব্যাপারটা আগাগোড়াই নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইল। যাহাদের লইয়া এই আয়োজন, তাহাদের একজনকেও যেন তিনি অন্তরের ভিতর অভিনন্দিত করিতে পারিতেছিলেন না। হয়তো রামজীবন আসিলে—, কিন্তু তাহার তো একটা খবরও পাওয়া গেল না। অন্তত একটা খবরও যদি তাহার পাওয়া যাইত, কোথায় আছে এবং কেমন আছে! সে সংবাদটুকুও যখন কাহারও কানে আসিয়া পৌঁছিল না, তখন এই সিদ্ধান্তটাই পাকা হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহজগতের সঙ্গে রামজীবনের আর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও এ খবরটুকু এমন করিয়া জানিতে পারার কিই বা প্রয়োজন ছিল আজ? এই সম্মিলনের আয়োজন না করিলে তো আর তাহার বিয়োগ-সংবাদটা এমন মর্ম্মান্তিক-ভাবে আজ প্রকাশ পাইত না!

এক সময় তিনি বন্ধুদের কাছে বলিয়াই ফেলিলেন, সত্যি, দেখ হে, রামজীবনের অভাবে আজকের এই আয়োজন শিবহীন যজ্ঞের মত লাগছে।

পৃথ্বীশ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে

বেঁচেই নেই। কিন্তু কবে যে বেচারা মারা গেল, সে খবরটুকুও যদি পাওয়া যেত!

বিনয়েন্দ্র বই হইতে মুখ তুলিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তাতে যে বিশেষ কিছু লাভ হ'ত, তা তো আমার মনে হয় না। যেটা আজ পর্য্যন্ত জানি না বা জানবার জন্যে কারও মাথাব্যথাও পড়ে নি, সেটা আজ না জানাই বরং ভাল।

জগদীশবাবু বলিলেন, তা তো বটেই।

তাঁহার মনে হইল, বিনয়েন্দ্রের কথার নীচে বেশ একটা খোঁচা রহিয়াছে এবং সেটা তাঁহারই দিকে উদ্যত করা।

বাহিরের ঘরে পুরু দামী কার্পেট বিছাইয়া ফরাশ করা হইয়াছে। সেখানে বসিয়াই আজিকার সম্মিলনের সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনা চলিবে। জানা গেল, বিনয়েন্দ্র একটি লেখা আনিয়াছেন। পৃথ্বীশ এবং পরেশ কিছুই আনেন নাই। পরেশ বলিলেন, আমার বর্ত্তমান সাহিত্য-চর্চ্চার মধ্যে কাঠের কারবারের একটা স্ট্যাটিস্‌টিক্স বড় জোর নিয়ে আসতে পারতুম।

পৃথ্বীশ বলিলেন, কিছু দরকার হবে না। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দনটাই আজকের সবচেয়ে উপাদেয় বস্তু হবে।

সন্ধ্যা সাতটার সময় সকলে আসিয়া আসরে বসিলেন। জগদীশবাবু একান্ত উৎসাহহীন চিত্তে অভিনন্দনটি পড়িবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার বড় ছেলে আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া জানাইল যে, চিঠিটা এ বেলার ডাকে আসিয়াছে। পথেই পিয়ন তাহার হাতে দিয়াছিল, কিন্তু তাহার বাড়ি ফিরিতে দেরি হওয়ায়—

খাম ছিঁড়িয়া জগদীশবাবু দেখিলেন, সুদীর্ঘ চিঠি। নীচের নাম দেখিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উৎফুল্ল স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওহে, রামজীবন তা হ'লে বেঁচে আছে, বেঁচে আছে। এই যে, সে চিঠি দিয়েছে!

পৃথ্বীশ বলিলেন, তবে আর কি, শুভেচ্ছাজ্ঞাপক তার পত্রখানি সভার প্রারম্ভেই পাঠ করা হোক।

সুতরাং জগদীশবাবু চিঠিখানি পড়িয়া গেলেন—

"ভাই জগদীশ——"

সম্বোধনটা পৃথ্বীশ এবং পরেশবাবুর কানে যেন বিসদৃশ ঠেকিল। তাঁহারা পরস্পর একবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া লইলেন।

"আজ এই সিকি-শতাব্দী পরে তোমার মনের সাহিত্যিক পোকাটা কেন যে হঠাৎ এতখানি উগ্র হয়ে উঠল, তার কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমি গলদ্ঘর্ম্ম হয়েছি। হয়তো এটা বড়লোকের বহুমুখী বিলাসের পর্য্যায়ে পড়তে পারে, কিন্তু তবু এ ধরণের বিলাসের তারিফ না ক'রে আমি পারি না। ধন্যবাদ তোমাকে।

"খবরের কাগজে তোমার পুরনো বন্ধু রামজীবনকে উদ্দেশ ক'রে যে বিজ্ঞপ্তি এবং আমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে দিয়েছ, তা আমার নজরে পড়েছে, তবু অনিবার্য্য কারণে এই চিঠিখানা লিখতে বড় বেশি দেরি হ'য়ে গেল।

"বাগেরহাট সাহিত্য-সংসদের আমার প্রিয় বন্ধুর দল কেউ আজ আর আমার কোন খবরই জানে না, তাতে বিস্ময়ের কিছুমাত্র নেই, রামজীবন ভটচাজ নামের এই মানুষটাকে খুব অল্প লোকেই চেনে, কিন্তু আমার অন্য একটা পোষাকী নাম আছে, সেটাকে হয়তো কেউ কেউ চিনবে। সে নামটা হচ্ছে—চিরঞ্জীব রায়। চিরঞ্জীব নাকি বেশ লেখে, তাই লোকে হয়তো তাকে জানে। কিন্তু রামজীবনকে কেমন ক'রে চিনবে বল? এই রামজীবন ভটচাজ আর চিরঞ্জীব রায় একই মানুষ, এ কথা যদি কাউকে বলতে যাওয়া যায়, তা হ'লে লোকে আঁৎকে উঠবে। এই আধ-ময়লা কাপড় আর টুইল-সর্ব্বস্ব যে মানুষটাকে লোকে যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখে, সেই যে প্রখ্যাত লেখক চিরঞ্জীব রায়, এ কথা যে বলতে যাবে, তাকেই লোকে পাগল ঠাওরাবে। ঐটেই হচ্ছে আমার পরম সান্ত্বনা। তাই ঐ চিরঞ্জীবকে সামনে রেখে তবু এখানে জীবনের এই ভারী গাধাবোট-খানাকে টেনে নিয়ে যেতে পারছি। নইলে হয়তো কোন্ দিন বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করতে হ'ত।

"তোমার নিমন্ত্রণের বিজ্ঞপ্তি পাঠ ক'রে আমার এক-বার উন্মাদ খেয়াল হয়েছিল, সত্যিই যাব তোমার কাছে। জীবনের সায়াহ্নে এসে মানুষ অনেক সময় অনেক অসমসাহসিক কাজ ক'রে বসে, সেই যুক্তিই আমাকে উসকে তুলতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কল্পনা কার্য্যে

পরিণত করা গেল না। অর্থাৎ উন্মাদ কল্পনার যেমন ক'রে সমাপ্তি হয়, আমারও তাই হ'ল আর কি! ভেবে দেখা গেল, ট্রেনভাড়া এবং আমার ভদ্রোচিত ফরসা জামা কাপড় আর জুতার জন্যে যে টাকাটার প্রয়োজন, তার অনেকটা আমার মত লোকের পক্ষে অসম্ভব রকমের মোটা। কিছুদিন হ'ল, একটা গল্পের বই দিয়েছিলুম পাব্লিশারের হাতে, খুব কদিন হাঁটাহাঁটি সুরু করলুম কপিরাইটের টাকাগুলোর আশায়। কিন্তু গরজ বুঝে পাব্লিশার দাঁও কষলে। যেখানে পঞ্চাশ টাকা পাবার কথা ছিল, সেখানে পঁয়ত্রিশের বেশি পাওয়া গেল না। তাই নিলুম। ভাবলুম, তোমার স্নেহের হুকুম পালন করার জন্যে ঐ থেকে পনরো টাকা খরচ করব। বাড়ি এসে কাউকে কিছু না ব'লে টাকাটা বাক্সে তুলে রাখলুম। পরের দিন যখন বাক্স খোলবার জন্যে চাবির খোঁজ করলুম, গৃহিণী তখন অত্যন্ত খুশির হাসি হেসে বললেন, তোমার নতুন বইখানার টাকাটা বুঝি? মোটে ঐ পঁয়ত্রিশ? না, আর কিছু দেবে?

"প্রশ্ন করতে হ'ল না, গৃহিণী নিজে থেকেই জানিয়ে দিলেন, সেদিন ছোট মেয়ের যে গলার হারটুকু পাশের বাড়ির বউটির কাছে বন্ধক রেখে বাড়িভাড়া মিটিয়েছিলেন, আজ আমার ঘুম ভাঙবার আগেই সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন।

"আমি শুধু হতবুদ্ধি হলুম বললে হয়তো একটু ভুল বলা হবে, উন্মাদের মত কত কি যে মনে হয়েছিল, সে-সব বিবরণ আজ তোমার কাছে দিতে যাওয়া বোধ হয় নিরর্থকই হবে।

"সুতরাং ক্ষমা ক'র ভাই। যাওয়া আমার হ'ল না। জীবনের আরও বহু আকাঙ্ক্ষাকে যেমন দুভার্গ্য, প্রাক্তন ইত্যাদি প্রলাপের বন্ধনী দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে মেরেছি, এ ইচ্ছাটাকেও তেমনই ক'রে মারতে হ'ল, উপায় নেই।

"তোমার কাছ থেকে এ চিঠির একটা জবাব পাবার প্রত্যাশাতে আমার ঠিকানাটা তোমায় জানাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু একটু ভাল ক'রে ভেবে নিরস্ত হলুম। যে দুর্দশার কাহিনী তোমার কাছে লেখার হয়তো কোন প্রয়োজন ছিল না, অথচ না লিখেও পারলুম না, সে কাহিনী জানানোর পর ঠিকানা দেওয়ার অনেক কদর্থ দাঁড়াতে পারে।

"হ্যাঁ, আর এক কথা। বাগেরহাট সাহিত্য-সংসদে আমাদের যে গায়ক-বন্ধু ছিল হরিহর, শুনলুম, আজ মাস দুই হ'ল সে ছুটি পেয়েছে।

বিদায়। তোমাদের দোল-পূর্ণিমার আয়োজন জয়যুক্ত হোক!

তোমাদের
রামজীবন"

গড়গড়ার নলটা তুলিয়া লইয়া পৃথ্বীশ বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই রামজীবনই চিরঞ্জীব রায়? তার বহু লেখা যে আমি পড়েছি!

চিঠিখানা পড়িয়া জগদীশবাবুর গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। একটা কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অসহায় দৃষ্টিটুকু জানালার বাহিরে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন, আকাশের নীলিমাকে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না বড় বেশি বিবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, উৎসবের বাঁশী সেখানে কিছুতেই আর জমিতে চাহিতেছে না।





পথের প্রান্তে

শ্রীসুপ্রভা দেবী

ভয় নাই, দ্বারে কর কর করাঘাত—
হয়তো প্রহর গণি
ক্লান্ত রাতের মন্থর অবসরে
তন্দ্রা নেমেছে চোখে।
অনেক রাত্রে বনের শিয়রে কৃষ্ণপক্ষ শশী
রাঙা জ্যোৎস্নার আলোছায়া আঁকে মায়াময় অপরূপ!
নিঝুম রাত্রি, নিশ্চল বায়ু, নির্ব্বাক বনভূমি,
ফিরে যেও নাকো তুমি।

কর মৃদু সঙ্কেত,
কানে কানে বলা এতটুকু কথা, একটি বারতা শুধু,
'আমি আসিয়াছি বঁধু'—
এতটুকু কথা হাওয়ায় হাওয়ায় হয়ে যায় বহু কথা;
তারে ভালবাসি, তাই আসিয়াছি, এসেছি অনেক পথ।
সে পথ কঠিন অতি,
সে পথ গহন বড়,
পার হয়ে এনু মরুপ্রান্তর শত,
দুর্গম কত গিরি।
শ্রান্তি ভুলেছি, শান্তি ভুলেছি, শুধু মর্ম্মের মাঝে
মর্ম্মর তানে দিবস যামিনী একটি রাগিণী বাজে,
ভালবাসি তারে, তারে ভালবাসি, আমার সুখে ও দুখে,
কাজে আর অবসরে,
আশা বাসনায়, স্বপ্নে জাগায় মর্ম্মঘাতী সে প্রীতি!

তবু ভয় ভয় লাগে,
মনে হয় যেন চারিদিকে মোর কান পেতে কারা জাগে,
কারা যেন এল শব্দবিহীন পায়ে,
মুকুলগন্ধব্যাকুল নিশীথ বায়ে,
নিশ্বাস যেন অলকে লাগিল, সজল মিনতি কার
কানে কানে মোরে কি যে ক'য়ে গেল, কিছু না বুঝিনু তার।

ভয় নাই, শুধু রাত্রি উঠেছে জাগি,
অনেক রাত্রে জেগেছে শ্রান্ত শশী;
বাতাস জেগেছে, দিকে দিকে তাই মুখরিত বনভূমি।
তৃণতলে আর পল্লবদলে, বনস্পতির ভিড়ে
লতায় পাতায় দক্ষিণ বায় পথ খুঁজে খুঁজে ফিরে।
রজনী উতলা আজি,
হাজার বাঁশীতে একতানে যেন সঙ্গীত ওঠে বাজি,
বনছায়া-মায়া-ইঙ্গিতভরা, এ মহা মহোৎসবে
দুর্গম-পথ-বিজয়ী পথিক, তুমি কি একেলা রবে?
কর মৃদু সঙ্কেত।
নিঃঝুম পুরী সাড়া দিয়ে ওঠে, কেহ কি আসিছে নেমে?
একি হাওয়া, একি চরণশব্দ! সময় গিয়েছে থেমে।
দু হাতে বক্ষ চাপি
মনে মনে বলি, একটু সময়, একটি নিমেষ আর,
ওরে ভীরু মন, কান পেতে শোন, নূপুর মুখর তার।

মরুপথতাপ সহিয়া এসেছি, অনেক দীর্ঘ দিন
পোহায়ে এসেছি যার পিছু পিছু, আজিকে পথের শেষে,
উতলা এ রজনীতে,
বনের ছায়ায়, রাঙা জ্যোৎস্নায়, বনমুখরিত গীতে
সেই শুধু পলাতকা!
পথে যে টানিল পথের প্রান্তে সে বুঝি স্বপ্ন মোর!
এ মায়া-রাত্রি এখনি তো হবে ভোর!
তার পরে আর কোন কিছু নাই, আশা নাই, গৃহ নাই;
বৃথা পথ চাওয়া নাই।
শুধু প্রসারিত সম্মুখে মম যত দূর যায় দেখা,
অনন্ত রাতি, অসীম শূন্য, আর আমি চির একা।

কারা বলেছিল প্রহর গণিয়া ঘুমে সে পড়েছে ঢুলে;
কারা বলেছিল প্রদীপ জ্বালিতে হয়েছে মনের ভুল!
নাহি ভয় আর নাহি আশা আজি, নাহি কিছু অবশেষ,
এইবার শুধু ফিরে যেতে হবে যেই পথে আসিলাম।

শব

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট পূর্ণেন্দু নিবিষ্টচিত্তে অ্যানাটমির একখানা বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া ছিল। বারোটা পর্য্যন্ত ডিউটি, এখন রাত এগারোটার এদিকে চলিয়া গেছে। বিরাট হাসপাতালটা জুড়িয়া মূর্চ্ছাতুর নিস্তব্ধতা, রোগীরাও যেন তন্দ্রার অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শুধু মাঝে মাঝে নার্স দের সতর্ক জুতার শব্দ, অস্পষ্ট দুই চারিটি কথা এবং অদূরের রাজপথ হইতে ট্র্যাফিকের ক্বচিৎ শব্দ কানে আসিতেছিল।

একটু আগেই বৃষ্টি হইয়া গেছে, হেমন্ত-রাত্রির বাতাসে স্নিগ্ধ শীতস্পর্শ, নানাজাতীয় ঔষধ এবং বাহিরের ভিজা ঘাসের সুমিষ্ট একটা মিশ্রিত গন্ধ; শীত শীত করিতেছিল, পাশের কাচের জানালাটা টানিয়া দেওয়ার ইচ্ছাও যে মনে একটু না জাগিতেছিল, এমন নয়; কিন্তু ইচ্ছা হইলেও বইয়ের পাতায় অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন মনটা উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে চাহিতেছিল না, পূর্ণেন্দু নিজের অখণ্ড মনোযোগের মাঝখানেও তাই কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল যেন।

হঠাৎ জমাদারের রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠ রাত্রির বুকের মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িল, মুর্দ্দা আয়া হ্যায়। পূর্ণেন্দুর ধ্যাননিবিষ্টতা ভাঙিয়া গেল—মড়া আসিয়াছে। অবশ্য ইহা প্রতিদিনের প্রতি প্রহরের ব্যাপার, এবং অহোরাত্র যে সমস্ত মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য হাসপাতালে আসে, তাহাদের দেখিয়া দেখিয়া চোখও অভ্যস্ত হইয়া গেছে; তবুও মৃতের এই আবির্ভাব-ঘোষণা শুনিয়া এই শীতল ভেষজ-গন্ধী রাত্রিতে পূর্ণেন্দুর মনটা কেমন ভারাতুর হইয়া উঠিল। এমনই রাত্রে যখন অসীম আলস্যভরে একটা আরাম-কেদারায় হাত পা এলাইয়া দিয়া মোটা একটা বর্ম্মা চুরুট টানিতে ভাল লাগে, একখানা রোমাঞ্চকর গল্পের বই পড়িতে পড়িতে নিজেকে অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় রকমের পরিতৃপ্ত বলিয়া মনে হয়, অথবা পাশে রেণুর ঘনীভূত সান্নিধ্য কল্পনা করিতে করিতে মনটা সুখস্বপ্নে আতুর হইয়া উঠে, তখন এমনই শান্ত বিরাম-মধুর নিশীথে পৃথিবীর সুনিশ্চিত প্রিয়জনসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহারা অনিশ্চিত মৃত্যুতরঙ্গে ভাসিয়া গেল, তাহাদের প্রতি একটা করুণ সান্ত্বনায় পূর্ণেন্দুর অন্তঃকরণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল।

শিথিল অলস দেহে, অনুগ্র কৌতূহলে পূর্ণেন্দু জানালার পাশে আসিল। উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় মার্বেল-বাঁধানো পরিচ্ছন্ন বারান্দাটা যেন ঝকঝক করিয়া জ্বলিতেছে, রেলিঙের লোহায় আলোর দীপ্তি পিছলাইয়া পড়িতেছে। সেই স্বচ্ছ আলোকে দুই তিন জন লোক এবং একজন কন্‌স্টেব্‌ল একটা মৃতদেহ লইয়া ডিসেক্‌শন-হলের দিকে চলিয়া গেল।

স্ট্রেচারের উপরে শায়িত একটি নারীদেহ, বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হইবে না। রুক্ষ চুলগুলি অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো, মুখের বিষণ্ন ক্লিষ্টতা ও কোটরগত চোখের পানে চাহিয়া সহজাত সংস্কারবশেই যেন বারাঙ্গনা বলিয়া অনুমান করা যায়। কয়েক মুহূর্ত্তের দৃষ্টি মাত্র, তাহাতেই যেন

মনে হইল, এই মৃতার মুখের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর পরিচিত কাহারও মুখের সামঞ্জস্য আছে, অতি গভীর, অতি নিকট সামঞ্জস্য।

পূর্ণেন্দু উন্মনা হইয়া উঠিল, অন্তরের ভিতর অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যেন সেই পরিচিত মুখখানাকেই স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নানাভাবে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মনটা কিছুতেই যেন একাগ্র হইয়া উঠিতেছিল না। খানিকটা শূন্য ভাবনাই শুধু মূলহীন একটা লতার মত অলস স্বাচ্ছন্দ্যে মনটাকে পাকে পাকে জড়াইতে লাগিল।

ক্লকটাতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল, এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তারাপদ ডিউটি দিতে আসিল। দরজাটা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, কি হে, এখনও ওভাবে দাঁড়িয়ে যে? যাও, বারোটা বেজেছে, শুয়ে পড়।

পূর্ণেন্দু চেয়ারের হাতল হইতে কোটটা তুলিয়া লইয়া ক্লান্তভাবে কহিল, একটা মড়া এল, না?

তারাপদ পাশের টুলটাতে বসিয়া পড়িয়া পকেট হইতে একটা রুমাল বাহির করিল এবং বেশ করিয়া চশমার কাচ মুছিতে মুছিতে জবাব দিল, হ্যাঁ, শহরের অবিদ্যা-অঞ্চল থেকে এসেছে, সুইসাইড কেস একটা। দুঃখ হয় এ স্ত্রীলোকগুলোর কথা ভাবলে। যে অসহ্য অস্বাভাবিক জীবন এদের বইতে হয়, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এই একটি ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই।

পূর্ণেন্দু অন্যমনস্কের মত মাথা নাড়িল, তারপর সামনের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। পিচ-বাঁধানো যে ছোট্ট পথটি দুই পাশের ঘাসের লনের মধ্য দিয়া হস্টেলের দিকে চলিয়া গেছে, বর্ষণসিক্ত সেই পথটি বাহিয়াই পূর্ণেন্দু ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিল।

এবার হস্টেলের দোতলায়।

ঘরের তালাটা খুলিয়া সে দরজার পাশের সুইচটা টানিয়া দিল এবং মুহূর্তে মগ্নচৈতন্য অন্ধকার ঘরটা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলিয়া ধরিয়া রূঢ় আলোকে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। বিছানাটা এলোমেলো, একটা বালিশ মাটিতে পড়িয়া, সুজনিটা কোঁচকানো। টেবিলের উপরে একগাদা বই এমনই বিশৃঙ্খলভাবে স্তূপাকার হইয়া আছে যে, তাহার মধ্যে গরু হারাইলেও বোধ করি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেওয়ালের গায়ে নরদেহের বড় বড় দুইখানি চার্ট, খোলা দরজার ফাঁকে বাহিরের বাতাস আসিয়া সে দুইখানিকে দোলাইয়া তুলিতে লাগিল, হঠাৎ মনে হইল, তাহারা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ণেন্দু জামা-কাপড় বদলাইয়া বিছানা ঠিক করিয়া লইল, তারপর সুইচটাকে অফ করিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল। বাস্তবিক, এই মৃতদেহটা দেখিবার পর হইতেই কেমন একটা অস্বস্তি যেন তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, মন ব্যাকুল হইয়া কি যেন খুঁজিয়া ফিরিতেছে, চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারিতেছে না।

সত্যই, সমাজের আবর্জ্জনা ইহারা, মানব-মনের কুশ্রী ক্লিন্ন কামনার পয়ঃপ্রণালী। এই প্রণালী-গুলি না থাকিলে হয়তো পুঞ্জিত বিষবাষ্পে আকাশ ভারী হইয়া উঠিত, গোপন পাপ ও ব্যভিচারের

ব্যাধিতে সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙিয়া পড়িত। সে হিসাবে ইহাদের প্রয়োজন কতকটা হয়তো বা আছে, কিন্তু সমাজের প্রশ্ন ছাড়িয়া ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে চাহিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

অস্বাভাবিক, অমানুষিক জীবন! মুখের উপর অন্ধকারের কালো অবগুণ্ঠন টানিয়া রাত্রির সহচরীর রূপে আসিয়া ইহারা প্রতিদিন 'ধরার নরক-সিংহদুয়ারে' সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইতেছে। অতি প্রকট অশোভন ইহাদের প্রসাধন, রঙ-মাখা পাণ্ডুর মুখ যেন চিত্রিত কঙ্কালের মত জোর করিয়া কান্না-চাপা হাসি হাসিতে চায়। অবসাদ, বেদনা এবং অসম্মানের আঘাতে যখন অশক্ত দেহ ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করে, তখন সুরাপ্রমত্ত মাতালের কদর্য্য বিকৃত প্রলাপ-চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সমান উৎসাহে ভগ্নকণ্ঠে ইহাদের গান গাহিবার প্রয়াস করিতে হয়, নৃত্যকুশলতা দেখাইতে হয়। ক্ষণিকের পদস্খলনে অথবা অবস্থাচক্রে যে সর্ব্বনাশের আলোহীন পথে ইহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া চলে, বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের চোখের দৃষ্টিও বুঝি বা সেই অন্ধকারের জগতে অবরুদ্ধ হইয়া আছে।

কিন্তু আজ এই দুর্ভাগিনীর মুখখানি যেন কাহার সুপরিচিত মুখের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সমগ্র মনটাকে একান্তভাবে একাগ্র করিয়া সেই পরিচিত মুখের সঙ্গে এই মুখটিকে সে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হঠাৎ মনের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন ভয়ানকভাবে চমকিয়া উঠিল, রাখালী? রাখালী? কৈশোরের অনেকগুলি দিন চোখের সামনে পুঁথির পাতার মত ফর ফর করিয়া উড়িয়া চলিল।

গাঁয়ের মেয়ে রাখালী। কচি আমের কুঁড়ি, কলমিদীঘির জল, পোড়ো ভিটের চারিপাশ ঘিরিয়া কাঁটানটের জঙ্গল। মাঠের বুক বাহিয়া বর্ষার জল কল কল করিয়া বহিয়া যায়, স্রোতের দোলা লাগিয়া কচুবন থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে আর তাহারই মধ্যে নামিয়া কোঁচড় দিয়া কই-মাছ ধরিবার ইতিহাস।

অত্যন্ত অকস্মাৎ যেন পূর্ণেন্দুর চিন্তাস্রোত বন্ধ হইয়া গেল, যেন সমস্ত জগতের গতিই একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া সমস্ত অনুভূতিকে একটা স্থির নির্দ্ধারিত কেন্দ্রে আনিয়া বিন্দুবৎ সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে; আর সেই বিন্দুটির মধ্যে শুধু একখানি মুখ ভাসিতেছে,—রাখালী, রাখালী!

পূর্ণেন্দু তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর যেন একেবারে শূন্যের উপর দিয়াই ভাসিয়া বাহির হইয়া আসিল। একটা অপ্রকৃতিস্থ আকর্ষণে, খালি পায়ে, ভিজা ঘাসের উপর দিয়াই সে হাসপাতালের দিকে আগাইয়া চলিল।

রাত একটা।

পৃথিবীর সচেতনতম জীবনস্পন্দটুকুও এখন মূর্চ্ছামগ্ন, চারিদিক একেবারে ঝিম ঝিম করিতেছে। পথ-ঘাট, ভিজা ঘাস, এই বিরাট হাসপাতালটা এবং দূরের ঐ জনমানব-বিবর্জ্জিত অদ্ভুত স্তব্ধতাজড়িত রাজপথ, সব কিছুই যেন ক্লোরোফর্মের নেশায় আচ্ছন্ন। কম্পাউণ্ডের সামনে ইউক্যালিপ্টাসের পাতায় মর্ম্মরশব্দ বাজিতেছে।

নিঃশব্দ চরণে পূর্ণেন্দু আসিয়া ডিসেক্‌শন-হলের দরজাটা খুলিয়া ফেলিল।

লম্বা ঘরখানা জুড়িয়া উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিকের আলো, আর সেই আলোয় সমস্ত হলটা একটা প্রেতপুরীর মত দেখাইতেছে। সারি সারি টেবিলে চার পাঁচটি মৃতদেহ, কয়েকটা টেবিল হইতে শব সরাইয়া লওয়া হইয়াছে, শূন্য টেবিলগুলির দিকে চাহিলে আরও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যেন। মৃতদেহের অস্পষ্ট দুর্গন্ধ আর সেই সঙ্গে তীব্র তেজস্কর ঔষধের ঘ্রাণ মিলিয়া নিশ্বাস যেন একেবারে রুদ্ধ করিয়া আনে। এ যেন মৃতের দেশ, পিরামিডের জনমানবহীন অন্তর্দ্দেশে সারি সারি রহস্যময় মমি।

খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল। মৃতের মুখ হইতে বস্ত্রের আবরণ সরাইয়া লইয়া পূর্ণেন্দু নিষ্পলক বিহ্বল চোখে সেদিকে চাহিয়া রহিল, আর পুঁথির পাতা উড়িয়াই চলিল, পিছন হইতে আরও পিছনে।

কিশোর-জীবনের লীলা-সঙ্গিনী, জাতি তাহাদের এক ছিল না, সামাজিক মর্য্যাদা তো কোনও অংশে নয়ই। রাখালীর বাপের গ্রামের বাজারে বেনেতী-মশলার দোকান ছিল, আর পূর্ণেন্দুরা ছিল দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, গ্রামের জমিদার। কিন্তু কৈশোর-চাঞ্চল্যে বন্ধনমুক্ত দুইটি প্রাণ সেদিন সমাজ বা জাতির কোনও অনুশাসনকেই স্বীকার করিয়া চলে নাই, এবং পূর্ণেন্দু ও রাখালীর মধ্যে যে একটা স্বতন্ত্র সম্পর্ক সেদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর যাহাই হউক, প্রভু-ভৃত্যের নয়।

সে প্রেমের মুখর রূপ ছিল না, প্রসাধনের প্রখরতায় এবং পূর্ণ আত্ম-সচেতনা লইয়া সে আবির্ভূত হয় নাই। সে আসিয়াছিল নিতান্ত অমার্জ্জিত গ্রামিক মূর্ত্তি লইয়া, সে ভাষা জানিত না, সে নিজেকে চিনিতে পারে নাই; হয়তো বা চিনিবার অবকাশও হয় নাই কোনও দিন, ছায়া-ঘেরা গাঁয়ের পথে ভাঁটফুলের গন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিজড়িত হইয়া আছে, কচুপাতায় বৃষ্টির যে জল-বিন্দু গড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বক্ষণে স্বচ্ছ একটি মুক্তাকণিকার মত টলমল করিয়া দুলিতেছে, তাহার মধ্যেই যেন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

পূর্ণেন্দুদের বাড়ির যে পুরানো মহলটা আজকাল ভাঙিয়া-চুরিয়া জঙ্গল হইয়া আছে, তাহারই পিছনে আমবাগানের মধ্যে কচুরিপানায় প্রায় মজিয়া-যাওয়া একটা দীঘি। জনমানুষ সেদিকে সাপের ভয়ে বড় একটা ঘেঁষিতে চায় না, আমের সময় ছাড়া ছেলেপিলেরাও বড় একটা সেদিকে ভিড়িত না।

পূর্ণেন্দুদের স্কুলে গোষ্ঠ বলিয়া একটা ছেলে পড়িত, তাহার এক মামা ভূত ঝাড়িয়া বেড়াইত। সকলে বলিত, মামার নিকট হইতে গোষ্ঠ নাকি নানা রকম সদ্যসিদ্ধিপ্রদ তুক-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁক আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। গোষ্ঠকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে শুধু মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে একটু একটু মাথা নাড়িত ও মুখ টিপিয়া হাসিত।

এহেন গোষ্ঠকে পূর্ণেন্দু একদিন লইয়া পড়িল, মন্ত্রতন্ত্র কিছু তাহাকে শিখাইতেই হইবে। অনেক সাধ্য-সাধনা এবং পরিশেষে নগদ আট আনা পয়সা কবুল করিতে গোষ্ঠ মুখ খুলিল। মাথায় বার-কয়েক হাত বুলাইয়া চিন্তিত স্বরে কহিল, তাই তো, ওস্তাদের আদেশ আছে, এসব

দৈবী বিদ্যে যেন অপাত্রে না পড়ে, তা হ'লেই সব গুণ-জ্ঞান নষ্ট হয়ে যাবে। তা তুমি যখন এত ক'রে বলছ, তখন আর কি করা যায়? কিন্তু একটার বেশি বিদ্যে তো শেখাতে পারি না, কি শিখতে চাও?

একটা একটাই সই। কিন্তু বিশেষ করিয়া কোন্‌টা যে শেখা প্রয়োজন, পূর্ণেন্দু তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। তাই মুখে যেটা আসিল, ফস করিয়া সেইটাই বলিয়া ফেলিল, উড়তে—আকাশে উড়তে চাই।

—আকাশে উড়তে?—গোষ্ঠ তাচ্ছিল্যভরে মুখ বাঁকাইল, ওঃ, এ আর শক্তটা কি! কিন্তু আমায় আট আনা পয়সা আগে দিয়ে দিতে হবে ভাই, শেষে যদি ফাঁকি মেরে দাও!

অগত্যা মূল্যটা আগাম দিতে হইল। গোষ্ঠ বেশ করিয়া আধুলিটা বাজাইয়া সেটাকে কাছায় বাঁধিয়া লইল, তারপর বিড়ির বিশ্রী গন্ধে ভরা মুখখানা পূর্ণেন্দুর কানের কাছে আনিয়া অত্যন্ত বিশ্বস্ত স্বরে বলিল, শনিবারের বারবেলায় একটা শোলমাছ ধ'রে—বুঝলি?

—হুঁ।

—সকলের অজান্তে কাঁচা মাটির উনুনে সেটাকে পুড়িয়ে আঁশ-কানকো সুদ্ধু তার মুড়োটা খাবি আর এক হাজার আট বার জপ করবি—

নমো নমো পবন পরী
বিস্‌মিল্লা আকাশে উড়ি।

তা হ'লেই দেখবি, যেই মনে হয়েছে অমনই পাঁই পাঁই ক'রে আকাশে উড়ে যাচ্ছিস। কিন্তু সাবধান, স্বাতী নক্ষত্রে মন্তর জপ করেছিস কি নির্ঘাৎ মিত্যু।

গোষ্ঠের নিকট হইতে অবশ্যসিদ্ধিপ্রদ এই মন্ত্র পাইয়া সাধনা করিবার পূর্ব্বেই পূর্ণেন্দু যেন উড়িতে উড়িতে বাড়ি আসিল। এবং প্রধান সাকরেদ রাখালীর কাছে তাহার মন্ত্রপ্রাপ্তির সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিল। সংবাদটা এতই শুভ যে, রাখালী প্রথমে সেটা বিশ্বাসই করিতে পারিল না, তারপর প্রচুর আনন্দে বলিল, সত্যি? তা হ'লে কি মজাটাই হবে বল দেখি?

—মজা ব'লে মজা! তা হ'লে সেজদাকে এবার থেকে একেবারে ডোণ্ট কেয়ার, বুঝলি? যেই বেত হাতে ক'রে গ্রামার জিজ্ঞেস করতে আসবে, অমনই বোঁ ক'রে আকাশে উড়ে যাব আর অ্যাই এমনই ক'রে কাঁচকলা দেখাব।

উৎসাহের আধিক্যে পূর্ণেন্দু বুড়া আঙুল নাচাইতে লাগিল।

কিন্তু থিয়োরি অপেক্ষা রাখালী প্র্যাকৃটিকাল। তাই চিন্তিত সুরে কহিল, কিন্তু শোলমাছ?

—হুঁঃ, শোলমাছের জন্যে আবার ভাবনা! আমাদের খিড়কির পুকুরটা ইয়া ইয়া শোল আর গজাল মাছে বোঝাই, আর ছিপ তো আছেই।

কিন্তু রাখালীর চিন্তা দূর হইল না, বলিল, কিন্তু শনিবারের বারবেলা তোদের খিড়কির বাগানে ঢুকলে নিশ্চয় ভূতে ধরবে।

—ভূত, যাঃ যাঃ! পূর্ণেন্দু কথাটা এমনই ভাবেই উড়াইয়া দিল যে, শুনিলে বিশ্বাসই হয়

না, সে রাত্রে মায়ের কাছ ছাড়া শুইতে ভয় পায়। বলিল, আসছে পরশুই তো শনিবার আছে, তুই আর আমি তুপুরবেলা—বুঝলি ?

ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটা তুলাইয়া রাখালী জানাইল, বুঝিয়াছে।

কিন্তু সাধনার পথে এত সহজেই যদি সফল হইতে পারা যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি !

শ্রেয়াংসে বহু বিঘ্ন। প্রথম কথা, ছিপ লইয়া বাহির হইবার সময় যদি সেজদার চোখে একবার পড়িয়া যায়, তবে ফল আদৌ প্রীতিকর হইবে না ; বাড়ির শাস্তির কথা ছাড়িয়াই দিলাম, স্কুলে সেকেণ্ড মাস্টারের কাছে একখানা চিঠি লিখিলেই আর দেখিতে হইবে না, সে তো বাঘের মত ওৎ পাতিয়া বসিয়া।

শনিবার স্কুল সকাল সকাল ছুটি হইয়া যায়, সুতরাং সুযোগ মিলিল। সাকরেদ হিসাবে রাখালীর পটুত্ব অসীম, ইতিমধ্যেই সে মাটি খুঁড়িয়া কেঁচো সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ণেন্দু ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া আসিল, একরকম রুদ্ধশ্বাসেই।

—কেউ দেখতে পায় নি তো ?

—নাঃ, তা হ'লে যে মন্তরের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

তুইজনে চুপি চুপি একেবারে পুকুরপাড়ে নামিয়া আসিল।

অনেক কালের পুকুর, এখন প্রায় শুকাইয়া উঠিয়াছে। জল আছে কি না বলিতে পারা যায় না, কলমিলতায় এবং গাঢ় সবুজ কচুরিপানায় একেবারে আচ্ছন্ন। প্রায়ই জলের মধ্য হইতে লম্বা এক ধরণের ঘাস গুচ্ছে গুচ্ছে মাথা তুলিয়াছে। কলমিলতার জটিল জাল আর পানার তুই ইঞ্চি পুরু সরের মধ্যে কোথাও কোথাও খানিকটা তরল জিনিস চোখে পড়ে, হয়তো জলের অবশেষ। লাল, তুর্গন্ধ।

তুই পাশে জঙ্গল, ছোট বড় নানা রকম ঝোপের মধ্যে চিকণ-শ্যাম কচুবন আর শুঁড় বাহির করা ঢেঁকিশাকের রাশিই খুব বেশি করিয়া চোখে পড়ে। স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা মাটিতে পা লাগিলে সমস্ত শরীর যেন শিহরিয়া উঠে। তাহারা একটা আমগাছের ঠেলিয়া উঠা মোটা শিকড়ে আসিয়া বসিল, তারপর ছিপের ডগায় কলমিলতা আর পানা সরাইয়া বঁড়শি ফেলিল।

শোলমাছ নিশ্চয়ই উঠিত, না উঠিয়া নিস্তার ছিল না, যদি না ইতিমধ্যে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়া যাইত। শাস্ত্রে আছে, মুনি-ঋষিরা যখন ধ্যান-ধারণায় বসিতেন, তখন দেবতারা, বিশেষ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র, অধিকারলোপের আশঙ্কায় নানা রকম বিঘ্ন ঘটাইয়া মুনিদের ধ্যান ভাঙাইয়া ছাড়িতেন। এক্ষেত্রে দেবতাদের তেমনই কোনও একটা তুরভিসন্ধি ছিল কি না কে বলিবে, হঠাৎ মাথার উপরে একটা লক্ষ্মী-প্যাঁচা বিশ্রী রকমের ডাকিয়া উঠিল।

গোড়া হইতেই তো রাখালীর ভয় করিতেছিল, বাপরে, বাগানটা যে রকম অন্ধকার, আর যা ভীষণ জঙ্গল ! ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনিয়াছিল, একটা তুষ্টু মেয়ে ভোরবেলায় যখন এমনই একটা বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল, তখন ভূতে তার চুল ধরিয়া গাছের উপর তুলিয়া লইয়াছিল।

ঠিক সময় বুঝিয়াই প্যাঁচার চীৎকার, আর রাখালী দুই হাতে ধরিল পূর্ণেন্দুকে জড়াইয়া, এবং টাল সামলাইতে না পারিয়া দুইজনে একসঙ্গে পড়িল গিয়া একেবারে জলের মধ্যে।

গভীরতার দিক দিয়া দেখিতে পুকুরটাকে বেশ ভদ্র বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু এতখানি পচা পাঁক যে সেখানে জমিয়াছে, তাহাই বা কে জানিত। রাখালী যদি বা জলে কাদায় ভূত হইয়া আঁকুপাঁকু করিয়া উঠিয়া আসিতে পারিল, কিন্তু পূর্ণেন্দু যতই হাত পা ছুঁড়িতে এবং উঠিতে চেষ্টা করিল, ততই ডুবিয়া যাইতে লাগিল আরও নীচের দিকে। রাখালী বেগতিক দেখিয়া প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল এবং সময়মত লোকজন না জুটিলে যে কি হইত, তাহা অনুমান করা সহজ নয়।

বলা বাহুল্য, আকাশে উড়াটা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

হাসপাতালের ঘড়িতে দুইটা বাজিল।

শবব্যবচ্ছেদের লম্বা ঘরখানায় সারি সারি মৃতদেহ—তেমনই ইলেক্‌ট্রিকের উজ্জ্বল আলো, তেমনই শব আর ঔষধের গন্ধ।

—রাখালী!

একটা ঘোড়ার ছানা ধরিয়া পূর্ণেন্দু তাহার পিঠে চাপিয়াছিল। রাখালীকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিল, উঠবি?

রাখালী চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, ওমা, মেয়েমানষে বুঝি ঘোড়ায় ওঠে?

পূর্ণেন্দু সেবার ইতিহাসের পরীক্ষায় পাস করিতে পারে নাই, কিন্তু এ যাত্রা তাহার ঐতিহাসিক জ্ঞান হঠাৎ একেবারে মন্ত্রবলেই যেন খুলিয়া গেল। মুখে একটা পাণ্ডিত্যসূচক শব্দ করিয়া বলিল, চড়ে না বুঝি? স্বয়ং রাণী দুর্গাবতী আর রাণী রিজিয়া ঘোড়ায় চ'ড়ে যুদ্ধ করেছিল, জানিস? আয় না!

অতি কষ্টে টানা-হেঁচড়া করিয়া রাখালীকে ঘোড়ার পিঠে তোলা হইল। দুইজনে বসিল দুই দিকে মুখ করিয়া—পূর্ণেন্দু সামনে আর রাখালী পিছনে।

অপরূপ দৃশ্য!

পূর্ণেন্দু অতিরিক্ত খুশি হইয়া বলিল, কি মজা! তারপর টক টক শব্দ করিয়া কহিল, এই ঘোড়া, চল, চল!

কিন্তু রাখালী মোটেই মজা বোধ করিতেছিল না, এখন নামিতে পারিলে রক্ষা পায়—এমনই দশা। ঘোড়াটা তখন ঘাস ভক্ষণে ব্যস্ত, চলিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না, কিন্তু পূর্ণেন্দুর পায়ের গুঁতায় বিরক্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া উঠিতেই ত্রস্ত রাখালী হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া সজোরে ঘোড়ার মোটা লেজের গুচ্ছটাই চাপিয়া ধরিল।

হাজার নিরীহ হইলেও পক্ষীরাজের বংশ, লেজ ধরিতেই তাহার আত্মসম্মান সচেতন হইয়া উঠিল এবং এতক্ষণের নিস্পৃহ বৈষ্ণবমূর্ত্তিটা একেবারে বদলাইয়া গিয়া চিড়বিড় করিয়া চার পা ছুঁড়িয়া এমনই একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিল যে, রাখালীর ধরাশয্যা গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর রহিল না।

ঘোড়াটা ছোট এবং ইট-পাথর বেশি ছিল না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা, কিন্তু গায়ের অনেকখানিই কাটিয়া ছড়িয়া রক্ত পড়িতেছিল এবং রাখালীর ফোঁপাইয়া কান্না আর কিছুতেই থামিতে চাহিতেছিল না। অনুতপ্ত পূর্ণেন্দু যত্ন করিয়া তাহার কাটা জায়গাগুলা ধুইয়া দিয়াছিল, সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল, কাঁদিস নি, কাঁদিস নি, বিকেলে তোকে এই এত বড় বড় পাকা পেয়ারা এনে দোব, দেখিস। আর লক্ষ্মীটি, এ কথা কাউকে বলিস নি, কাউকে নয়, বুঝলি?

তাহার পরের ইতিহাস অনেকখানি ফাঁকা। কলিকাতায় আই. এস-সি. পড়িবার সময় রাখালীর বিবাহের সংবাদ আসিয়াছিল। খবরটা মনকে দোলা দিয়াছিল, তারপর জীবনের পথে চলিতে চলিতে স্মৃতি শুধু আসিতেছিল অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া।

ইহার পর যতবার গ্রামে গিয়াছে, রাখালীর আর দেখা পায় নাই, না পাওয়াটাই সম্ভব। সে ভিন দেশে কোথায় স্বামীর ঘর করিতেছে, কে তাহার সন্ধান রাখে।

কিন্তু আজ।

রাখালীর জীবনের যে এমনই পরিণতি হইবে, আর এই ভাবে তাহার সঙ্গে আবার দেখা হইবে, ইহা কে ভাবিয়াছিল?

পূর্ণেন্দুর চোখের কোণে জল টলমল করিতে লাগিল। বুকের ভিতরে হা হা করিয়া একটা আকুল কান্না যেন আছড়াইয়া পড়িতেছে।

রাখালী, রাখালী! জীবনের উপর দিয়া প্রতি পলের এই দুঃসহ জীবন-ভার টানিয়া চলা তাহার শক্তিতে আজ আর কুলাইল না, তাই নিজের হাতেই নিজেকে এমনই করিয়া শেষ করিয়া দিল। তাহার মৃত্যুমলিন পাণ্ডু মুখের উপর যেন সেই সমস্ত অন্তর ও বাহিরের অভিঘাতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

আজ আরও, আরও বেশি করিয়া মনে পড়িতে লাগিল যে, এই মেয়েটিকে সে ভালবাসিত। সে ভালবাসা তীব্র নয়, জীবনের পথে রাখালীকে কাছে না পাইলে সে জীবনযাত্রা যে কিছুমাত্র ব্যাহত হইত, তাহাও নয়। কিন্তু মনের একটি নিভৃত নিঃসঙ্গ জগতে যেখানে আলোকের শতদল ফুটিয়া আছে, সেইখানে চিরভাস্বররূপে যে আসন লইয়াছিল, সে তো এইই। ইহার ভালবাসা নেশার মত একটা উগ্র আকাঙ্ক্ষায় দেহমনকে জড়াইয়া ধরে না, দক্ষিণ-বাতাসে বহিয়া আসা ভাঁটফুলের মিষ্ট গন্ধের মত স্মৃতির স্পর্শ-পুলক বুলাইয়া যায়।

কিন্তু স্বামীর ঘর করিতে গিয়া রাখালীকে এ পথ কেন যে বাছিয়া লইতে হইয়াছিল, কে জানে। কোন্ মুহূর্তের ভুলে অথবা কাহার অপরাধে সে নারীর পরম সার্থকতার গণ্ডি ভাঙিয়া বিশাল বিশ্বের বজ্রস্তনিত পথে ক্ষতবিক্ষত হইবার জন্য নামিয়া আসিয়াছিল, সে ইতিহাস বলিবার কে আছে।

পূর্ণেন্দুর চোখের একবিন্দু জল রাখালীর কপালের উপর ঝরিয়া পড়িল। তাহার মুখখানা নিজের অজ্ঞাতেই আসিল নত হইয়া, এতবড় পৃথিবী যাহাকে সম্পূর্ণ নিরুৎসবভাবে অসীম ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাথেয় দিয়াই বিদায় করিয়া দিল, তাহাকে এইটুকুই তাহার শেষ সম্মান।

হাসপাতালের ঘড়িতে চারিটা বাজিতেছিল।

পূর্ণেন্দু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। অন্ধকারের নিকষ-কালো রঙ জলো হইয়া আসিতেছে, ভিজে ঘাসের উপর জমিতেছে শিশির-কণা। দূরে বড় রাস্তার ইলেক্‌ট্রিক লাইটগুলি যেন থম থম করিতেছে, আর সমস্ত আকাশ বাতাস পৃথিবী ঘিরিয়া শবদেহের একটা গন্ধ, তীব্র উৎকট গন্ধ যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

পূর্ণেন্দুর হাত পা মাথা সব কিছুই যেন মাতালের মত টলিতেছিল।

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বলিলেন, আর্সেনিক এফেক্ট, কেসটা ইণ্টারেস্টিং। ওয়েল পূর্ণেন্দু, তোমার হাতই সবচাইতে ভাল, টেক আপ দ্য নাইফ প্লীজ।

কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ণেন্দু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাখালী! তাহাকেই আজ তাহার নিজের হাতে ব্যবচ্ছেদ করিতে হইবে, দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-যন্ত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে!

কিন্তু অকস্মাৎ কে যেন প্রকাণ্ড একটা ধাক্কা মারিয়া তাহার আচ্ছন্ন মনটাকে একেবারে ঠেলিয়া সোজা করিয়া দিল। কাল রাত্রি হইতে এই সব কি পাগলামি তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে! এক গণিকার শবদেহ লইয়া এমনই ভাবে কাব্য ফেনাইয়া তোলা, ইহার চাইতে রুচির অধঃপতন আর কি হইতে পারে! রাখালী এই ভাবে কেনই বা আসিবে আর আসিবার প্রয়োজনই বা তাহার কি আছে! সে হয়তো নিশ্চিন্তে ঘর করিতেছে, স্বামী পুত্র কন্যা আর আত্মীয়স্বজন লইয়া হয়তো তাহার নিশ্বাস ফেলিবারই অবকাশ নাই। তাহার জীবনে এই রকম পরিণতি হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব।

এই মেয়েটার চোয়ালের হাড় কি বিশ্রী ঠেলিয়া উঠিয়াছে, চোখ মুখ কি অস্বাভাবিক বিবর্ণ! তাহা ছাড়া গালের উপর বসন্তের ক্ষতচিহ্ন, এইই যে রাখালী হইবে, তাহার কি মানে আছে? এক রকম চেহারার দুইজন লোক বুঝি থাকিতে পারে না পৃথিবীতে?

গত রাত্রির কথা ভাবিয়া পূর্ণেন্দুর নিজের উপরে নিজেরই ঘৃণা হইতে লাগিল।

এইবার নিঃসঙ্কোচে টেবিল হইতে বড় ছুরিখানা সে হাতে তুলিয়া লইল।

স্পর্শমণি

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দূরে আছ তাই তুমি এত লোভনীয়,
স্পর্শমণিসম হায় একান্ত দুর্লভ,
প্রাণে আশা, ওষ্ঠ তবু রয়েছে নীরব,
কত যুগ সাধনায় হে আমার প্রিয়,
হবে তুমি অসঙ্কোচে মোর বরণীয়?
মালিন্যবিহীন তুমি স্বর্গীয় বিভব,
মোর কল্প-কাননের কুসুম পেলব;
তোমারে পাবার সাধ স্বপ্ন কমনীয়।

জানি তুমি আসিবে না প্রাণ-কুঞ্জতলে
সান্ধ্য-গৃহ-প্রত্যাগতা কপোতীর মত,
তবু মোর নাহি ক্ষোভ, তিতি' অশ্রুজলে
কভু কি সফল হয় আশা অবিরত?
নহ পাশে তাই তুমি ঈপ্সিত আমার,
কাছে এলে ভেঙে যাবে স্বপ্ন চেতনার।

"প্রগতি"-সাহিত্য

শ্রীসুধাংশু চৌধুরী

সাহিত্যের পূর্ব্বে "প্রগতি" কথাটা আসিয়া বসিয়াছে। ইহা আর কিছু নয়, জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা। সেই চেতনা এ দেশে নূতন বলিয়াই আস্ফালনটা তাহার বেশি। সেই আস্ফালনের পরিচয় সাহিত্যের আগে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা নূতন নয় বলিয়াই সেখানে সাহিত্যের সামনে পিছনে রাজনৈতিক ও সামাজিক খবরদারি নাই। অথচ তাহাদের সাহিত্য যে আমাদের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ, তাহা নয়।

ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি এ দেশে আসার আগের যুগটার নাম—অন্ধকার যুগ। সেই অন্ধকার যুগে সাহিত্যের দেউল-দ্বারে ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলিত। ভীত, অজ্ঞ, সেইজন্যই ভক্ত বাঙালী তাহার বাক্য-ছন্দের চকমকি জ্বালাইয়া পৌরাণিক নানা দেব-দেবীর পাদমূলে নিবেদন করিয়া দিত। যেমন বৈচিত্র্যহীন তুচ্ছ জীবনযাত্রা, তেমনই বৈচিত্র্যহীন পয়ার-ছন্দে গাঁথা দেব-দেবীর বর্ণনা, বারমাস্যা, তেমনই সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে ধার করা উপমা, অলঙ্কার, এবং তেমনই সাহিত্যের ফলশ্রুতি। বাংলা পদ্যের ক্ষেত্রে চৈতন্য-জীবনের ভক্তি-প্রেমাশ্রু-বর্ষণ ফলপ্রসূ হইয়াছিল; কিন্তু চারিদিকের অসাড়তার মধ্যে ধর্ম্মক্ষেত্রের ঐ আন্দোলন অস্বাভাবিক, এবং সেই আন্দোলন হইতে জাত সাহিত্য প্রাণহীন হইয়া পড়ে।

ইংরেজদের ধাক্কায় বঙ্গদেশের রুদ্ধ মন খুলিয়া যায়। সেই মনের প্রথম প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন করেন, এবং সম্মুখে সবচেয়ে যে বড় সমস্যা দেখিতে পান, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। বাঙালী হিন্দুর প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণীয়েরা দেশ ও সমাজকে শিক্ষিত করিবার যে ব্যবস্থা অতীতে করিয়া গিয়াছিলেন, সে ব্যবস্থা ভিত্তিসমেত ধসিয়া গিয়াছিল। পরিবর্ত্তে ইংরেজ তখন কেবলমাত্র স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে সুরু করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশে প্রথম বারের গ্র্যাজুয়েটদের অন্যতম। সুতরাং তিনি তাঁহার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহিত্য-প্রতিভা লইয়া লাগিলেন, জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা দেশবাসীর চক্ষু ফুটাইবার কাজে। প্রসন্ন সাহিত্য-রসে উদ্বুদ্ধ থাকিয়া তিনি মাত্র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেন—'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর 'বিষবৃক্ষ' তন্মধ্যে উল্লেখনীয়। কিন্তু পাঠকহীন দেশে এ শ্রম পণ্ডশ্রম, তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রয়াণ করিতে হয় বঙ্গের এবং ভারতের অতীত ইতিহাসের গহন অরণ্যে। ক্ষুব্ধ দেশপ্রেম বর্ত্তমানে ঠাঁই না পাইয়া 'আনন্দমঠে'র দুর্ভিক্ষ-অরাজকতার মধ্যে একবার 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, আর একবার 'দেবী চৌধুরাণী'তে মন্বন্তরের পরবর্ত্তী বঙ্গদেশে তিনি মহিমময়ী নারীকে 'পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' কাজে লাগাইয়া দেন। এমনই ভাবে অসীম ক্ষমতা লইয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে দীপ্ত দুই চক্ষু দ্বারা বঙ্গদেশ দর্শন করিয়াও, উপায়ান্তর না দেখিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে দূর অতীতে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে হয়। দেশ ও সমাজের মঙ্গলের তীব্রতম ইচ্ছাকে আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইয়া, বঙ্গদেশে ইংরেজ-সংঘর্ষের এই প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি প্রাচীন ভারতের গীতা-উপনিষদ-

পুরাণ-ভাগবতের অরণ্যে দাবানল হইয়া জ্বলিতে আরম্ভ করেন। ব্যাপারটা যেমনই করুণ, তেমনই হৃদয়বিদারক। অসঙ্গত দেশ-কালে পড়িলে সাধারণ মানুষের মন নিভিয়া যায়; আর বঙ্কিমের মত প্রতিভা নিজেই নিজের ইন্ধন হইয়া জ্বলিতে থাকে। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' সেইজন্যই বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। আফিমখোরের মুখোশ পরিয়া বঙ্কিম লুকাইয়া মাঝে মাঝে বঙ্গদেশে আসিয়া ঐ করুণ ব্যঙ্গ এবং আত্মভর্ৎসনা করিয়া গিয়াছেন। অলৌকিক আনন্দ বহন করিবার যোগ্যতা লইয়া যাহারা অকালে অস্থানে আসিয়া পড়ে, তাহাদের আর উপায় থাকে না, শেষ পর্য্যন্ত সমসাময়িক বাস্তবতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নিজেরা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অবাস্তব ভাবকল্পনা সেই সুযোগেই দেশে আসিয়া প্রবেশ করে।

বঙ্কিম যাহাই রচনা করিয়া যাউন না কেন, তাহার যথাযোগ্য সমালোচন ও সমাদর বঙ্গদেশে হয় নাই। বাংলা ভাষা অনাদরে অনভ্যস্ত নয়, কিন্তু 'ভাষায়াং মানবো শ্রুত্বা' যে কালে রৌরব নরকে যাইত, সে কালের একটা সুবিধা ছিল এই যে, পরাকৃত ভাষার বদলে দেবভাষা সংস্কৃত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সূত্রপাতে ইংরেজী-শিক্ষিতদের কাছে পাইয়াছিলেন অবজ্ঞা, আর অশিক্ষিতদের কাছে পাইয়াছিলেন অবজ্ঞারই উল্টা পিঠ—শ্রদ্ধা ও সম্মান। কালক্রমে শিক্ষিতদের অবজ্ঞা শ্রদ্ধা ও সম্মানে পরিণত হইল, কারণ two extremes meet; কিন্তু মানুষের যে কোনও প্রতিভাই মানুষের কাছ হইতে যাহা পায়, তাহা বঙ্কিম পাইলেন না, অর্থাৎ পাইলেন না সমালোচন। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রের এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিতে হইবে।

সমালোচনহীন বাঙালীর সাহিত্যক্ষেত্র; সুতরাং সে ক্ষেত্র যে মর্ত্ত্যলোকে কোথাও নাই, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বঙ্কিমের অমিত প্রতিভা, যাহা সাহিত্যক্ষেত্রে অপূর্ব্ব ফলপ্রসূ হইতে না হইতে দেশ-কালের সহযোগিতার অভাবে বহুদূর অতীতে প্রয়াণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাকে বাঙালী সাহিত্যরসিক আর সমালোচনা দ্বারা নিকটে—প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে আনিতে পারিল না, এবং দূরের জিনিসের প্রতি বাঙালীর যে পৌরাণিক মোহ আছে, সেই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বঙ্কিমের সাহিত্যকে বাঙালী রীতিমত পূজা-অর্চ্চনা আরম্ভ করিয়া দিল। বঙ্কিম হইলেন সাহিত্য-সম্রাট, তাঁহার সাহিত্য হইল আধুনিক বাঙালীর সাহিত্যের ভিত্তিভূমি, রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বলিয়াছেন গ্র্যানাইট-স্তর।

উপরে লিখিত প্রত্যেকটি ব্যাপারই কারণরূপে থাকিয়া শূন্য হইতে আর এক মহা শক্তিধরকে বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত করে। বলা বাহুল্য, তিনি রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিম বেদোপনিষদে পুরাণে ভাগবতে খুঁজিয়াছিলেন আধুনিক বাঙালী-জীবনের দার্শনিক ভিত্তিসমূহ। পাশ্চাত্য দর্শনের তত্ত্ব এবং তথ্যগুলিতেও তিনি সমানই অনুসন্ধানী শক্তি প্রয়োগ করিয়া আধুনিক বাঙালী জাতি গঠনের উপযোগী মালমশলা সংগ্রহ করিতেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আদাবন্তে চ মধ্যে চ কবি। তিনিও সর্ব্বত্রগ, কিন্তু তথ্যের পর তথ্যে পা ফেলিয়া তীর্থযাত্রীর মত তাঁহার বিক্রম নয়, তিনি শূন্যগামী, অনেকটা শূন্যবাদীও। তাঁহার এই শূন্যমার্গে পরিভ্রমণের কারণও তাঁহারই দেশ-কালে গোপন আছে। বঙ্কিম গিয়াছিলেন অতীতে, রবীন্দ্রনাথ গেলেন শূন্যে। বঙ্কিম সুদূর অতীতে গিয়াও বঙ্গদেশকে

ভুলেন নাই, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা তাঁহাকে অনায়াসেই বঙ্গদেশকে ভুলাইয়া দিল। পয়ারের পরে অমিত্রাক্ষর, মঙ্গলকাব্যের পরে তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ কাব্য-সমুদ্রের পথে মাথা উচাইয়া চাহিয়া দেখিল, এই বাঙালী মহাকবি শূন্যমার্গে জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন। পাশ্চাত্যদেশের কাব্যসিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে দোল খাইয়া এই মহাকবি বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন। কখনও সম্মুখে, কখনও পশ্চাতে, কখনও উর্দ্ধে, কখনও অধেঃ এই মানসগামী মহাকবি উড়িয়া উড়িয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কাণ্ড বাধাইয়া দিলেন, যাহাতে বাঙালীর স্থূল, বাস্তব সমস্যাপর্ব্বত চাহিল হইতে বৈশাখের নিরুদ্দেশমেঘ, এমন কি তরুশ্রেণী

চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশেহারা।

ইংরেজের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে যে দেশের জাগরণ হইতেছিল, সে দেশ বঙ্কিমের ইংরেজ-প্রতিস্পর্দ্ধী উপন্যাসে এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শাশ্বত বাণীর পৌনঃপুনিক আবৃত্তিতে চোখ মুছিয়া চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার আর অবকাশ পাইল না। এই top-heavy সাহিত্যের ভারে বাঙালী পাঠক দিশা পাইল না—কি করিবে, বাস্তব দুঃখ ও বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলি সম্মুখে কুরু-সৈন্যের মত দণ্ডায়মান রহিল, বাঙালীর হাতের গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল, মুহুর্মুহু অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বরূপধারী কাব্য প্রবোধ দিল বটে—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'; কিন্তু বাঙালীর নড়বড়ে মাথা, কেবল নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে-ই করিতে লাগিল, জীবনযুদ্ধের জয়পরাজয়-সমস্যা যেমন তেমনই পড়িয়া রহিল।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমৃদ্ধির মধ্যেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের একটা সঙ্কটের বীজ উপ্ত আছে; ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য যাহারা সাবধানে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই এই সঙ্কট-সন্ধিটা নির্ণয় করিতে পারে।

আমাদের দেশে ইংরেজ-সংস্পর্শে যে জাগরণ, সেটা একটা উভয়মুখী ব্যাপার। বঙ্কিমের কাল পর্য্যন্ত এই দুমুখা সাপটা ধরা পড়ে নাই, তখন বাঙালী ইংরেজের শিষ্যতা করিয়া অর্থে সম্মানে প্রতিপত্তিতে জাগিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্য-জীবন হইতে ইংরেজ-সংস্পর্শের বাস্তব দিকটা সম্বন্ধে বাঙালী সজাগ হয়। ইংরেজ বঙ্গদেশে সাগর পার হইয়া আসে কিনা, তাই রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে' তাহার আবির্ভাব হয়। ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সেই ডান হাত—যে হাতে সুধা, অথবা উহাকে দক্ষিণ মুখও বলা যাইতে পারে; রুদ্রো যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন বাঙ্গালীং পাহি নিত্যম্ এই প্রার্থনা বাঙালী আন্তরিকতার সহিত করিলেও কিছু পরেই ইংরেজের বাম হাত—যে হাতে বিষভাণ্ড, কিংবা বাম মুখ—যে মুখে ভ্রূকুটি, তাহা প্রকট হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রকটিতবামহস্ত ইংরেজের কেবলমাত্র দক্ষিণ হস্তই দেখিয়াছেন।

দেশের বাস্তব অবস্থা যখন ইংরেজের শাসন-ভ্রূকুটির তলে উত্তরোত্তর বিঘ্নবিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যকে দেখি ততই নীরত্যাগী ক্ষীরপায়ী হইয়া উঠিতেছে, ততই তাঁহার মানসগতি 'বলাকা'-ভঙ্গিতে দূর কৈলাসের পানে ছুটিয়াছে।

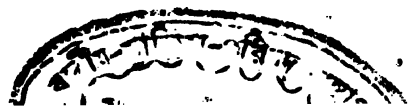
সাহিত্যের ফিলসফির ক্ষেত্রে যাঁহারা আইডিয়ালিস্ট, যাঁহারা অনির্ব্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিতে সাহিত্যিক হন এবং মানবজীবন সম্বন্ধেও 'বদন থাকিতে না পারি বলিতে, তেঁই সে অবলা নাম' বলিয়া আক্ষেপোক্তি করেন, তাঁহারা স্বভাবতই সাহিত্যের লক্ষ্যীভূত আনন্দকে ইংরেজশাসন বা পরাধীনতা বা দুঃখ-দারিদ্র্যের মুখাপেক্ষী বলিয়া মানিয়া লইতে রাজি থাকেন না। রবীন্দ্রনাথ জীবনে আইডিয়ালিস্ট, সাহিত্যক্ষেত্রেও ধর্ম্মত্যাগী ব্যক্তি নন। আরও, তিনি ব্রহ্মবাদী, সুতরাং শিল্প-সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভূমি স্পর্শ না করিয়া তিনি সার্ব্বভৌম কবি ও শিল্পী হইলেন, এবং বাস্তব দুঃখদৈন্য-পীড়িত বাঙালীর মস্তিষ্কে কবিতার সাহায্যে বেদান্তদর্শন ঢুকাইয়া দিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে সাময়িক মুক্তি ঘটাইয়া দিলেন।

যে দেশের বাস্তব সম্পদ কিছু নাই, সে দেশের ধর্ম্ম-দর্শন-কাব্য-গুরু যদি বলেন, যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই; তাহা হইলে কিছু না থাকিবার আভিজাত্য মানুষকে নেশার মত পাইয়া বসে। আমাদের দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এযাবৎ ভাল কোন সমালোচনা হয় নাই। পাঠকের অভাব এবং সাহিত্য-বিবেকহীনতাই কারণ। সমালোচনার ক্ষেত্র তৈয়ারি হইলে ইহা একদিন ধরা পড়িবেই যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাতাস বীজ, এবং ঘূর্ণবায়ু তাহা হইতে উৎপন্ন শস্য।

রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকমাত্রেই অল্পাধিক ঘূর্ণবায়ুগ্রস্ত হইত, তাহার প্রমাণ এখন হইতে দশ পনরো বৎসর আগের বাঙালী শিক্ষিত যুবকদের দেখিলেই পাওয়া যাইত; এখন বেশি পাওয়া যায় না, তাহার কারণ এই নয় যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঘূর্ণবায়ুগ্রস্ততা কমিয়াছে; তাহার কারণ এই যে, অত্যাধুনিক বাঙালী কবিম্মন্যগণ এবং মার্ক্সিজ্‌মই বাঙালী ছাত্রযুবকদিগকে আটকাইয়া রাখে, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আর পৌঁছিতে দেয় না।

বাঙালীর বাস্তব অবস্থা ইংরেজ-রাজ্যাধিকারে যতই নিম্নগামী হইল, বাঙালীর কাব্য-সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাবে এবং রবীন্দ্রনাথে খানিকটা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে ততই উর্দ্ধগামী হইল, এহেন কালে রাজনৈতিক আন্দোলনকে পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্গদেশে একটা সাহিত্যিক আন্দোলনও গর্জ্জিয়া উঠে। এ আন্দোলনের নামকরণ হইয়াছে সেদিন, কিন্তু মূর্ত্তিটা এখনও পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। প্রথমে স্থানে স্থানে কবিম্মন্য ব্যক্তিরা রাবীন্দ্রিকতার বিরুদ্ধতা সুরু করে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের নক্ষত্রলোককে জলাভূমির আলেয়া দ্বারা ভেংচাইতে থাকে। এমনই চলে অনেক দিন; এখন হইতে ১০।১২ বৎসর আগের মাসিক-সাপ্তাহিকে তাহার প্রমাণ আছে। গায়ে কাদা মাখিয়া মর্ত্ত্যপ্রেমিক কবি-সাহিত্যিকরা যেমন রবীন্দ্র-সাহিত্যকে, তেমনই নিজেদের বেকুবের স্বর্গ-লোককে আক্রমণের অভিনয় করিতে থাকে, এমনই ভাবে চলে অনেক বৎসর। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য-দেশ হইতে নূতন বিজ্ঞান, সাহিত্য ও রাজনীতির নূতন দর্শন আমদানি হয়, এবং ভারতীয় হতস্বপ্ন রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা জীবনের বাস্তব সম্বন্ধে পাঠগ্রহণ করিতে সুরু করে।

প্রগতি-সাহিত্যের মধ্যে সেই পাঠগ্রহণের প্রথম উৎসাহ, সঙ্গে সঙ্গে সেই পাঠ জীর্ণ না হওয়ার চোঁয়া-ঢেকুর-গন্ধ রহিয়াছে। মুস্কিল হইয়াছে এই যে, প্রগতি-সাহিত্য রচনা হওয়ার আগেই প্রগতি-সাহিত্যের ফিলসফিটা সকলেই, বিশেষত পড়নেওয়ালা রাজনৈতিক কর্ম্মীরা, খুব বুঝিয়া ফেলিয়াছে। ভাষার আগে তাহার ব্যাকরণ রচনা হইলে সে ভাষা আর ভূমিষ্ঠ হয় না। প্রগতি-সাহিত্য সম্বন্ধে ভয়ের কথাও এই।



জোয়ার

শ্রীঅপ্রকাশ সরকার

নদীবুকে ছুটে আসে জোয়ারের বিপুল উচ্ছ্বাস,
ফুলে উঠে, ফেঁপে উঠে, ভেঙে পড়ে উদ্দাম প্রণয়ে।
দুই তটে ভেঙে পড়ে, দুই তটে করে আলিঙ্গন,
ছল ছল কল কল অসংবদ্ধ বলে কত কথা!
তট ভেবে নাহি পায়—এই দান রাখিবে কোথায়,
এমন অজস্র প্রাপ্তি, অযাচিত, অসহ করুণা!
ভাগ্যের ইঙ্গিত-স্তব্ধ প'ড়ে থাকে বিস্ময়-বিমূঢ়—
কূলে কূলে পরিপূর্ণ ভ'রে ওঠে জোয়ারের জল।
জোয়ার নামিয়া যায়—জল-রেখা স'রে যায় দূরে,
আকস্মিক আবির্ভাব, নিষ্ক্রামণ, তাও আকস্মিক!
বিপ্লব ঘটায়ে যায় শুধু এক নিরীহের বুকে—
যে বিপ্লবে দুই তট ছন্নছাড়া, রুক্ষশ্রী, উদাসী।
তটপ্রান্ত প'ড়ে থাকে ভাগ্যস্তব্ধ বেদনা-বিমূঢ়,
বুকে তার আঁকা থাকে স্মৃতির সবল দীর্ঘ রেখা।
নিশ্বাস-প্রবাহে উড়ে রৌদ্র-শুষ্ক শুভ্র মরুবালি—
অন্ধকারে দুই তীর নদীমুখী নীরবে ঝিমায়।
তুমি এসেছিলে, সখি, মোর বুকে বহিয়া জোয়ার,
কি বিপুল কলরোল, উচ্ছ্বসিত কি গূঢ় আবেগে!
ব্যাকুল-বাসনা-ক্ষুব্ধ মোর বুকে পড়িতে আছাড়ি,
উন্মাদ করিয়া দিলে অহরহ প্রগল্‌ভ প্রলাপে।
না-বলা ও বলা কথা কত কি যে ব'লে গেলে কানে—
আমি ভেবে পাই নাই—এত ধন রাখিব কোথায়!
এ সঞ্চয় জীবনের—এ কি মহা অখণ্ড বিস্ময়!
ছিল এক অনুভূতি,—পূর্ণ হয়ে গেছি কূলে কূলে।
জোয়ার নামিয়া গেল—কেমনে সরিয়া গেলে দূরে—
আমার কামনা দিয়া পারি নি তো বাঁধিয়া রাখিতে!
রহিল অঙ্কিত শুধু হৃদি-তটে গাঢ়, দীর্ঘ ক্ষত,
সবল স্মৃতির রেখা—স্মৃতির গভীর স্পষ্ট রেখা!
এ বিপ্লবে কোন্ ফল না আসিলে শান্তির শাসন?
দৃপ্ত দ্বিপ্রহরে উড়ে দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত রুক্ষ বালি।
তারপর নেমে আসে স্পর্শ-গ্রাহ্য ঘন অন্ধকার—
মৃত্যুহিম অন্ধকার—এ আঁধার কাটিবে না বুঝি!

প্রাচীন বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

[এই প্রবন্ধের কোনও কোনও বিষয়ে শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও আমরা শ্রদ্ধার সহিত ইহা মুদ্রিত করিলাম; তথ্য ও নামের দুই চারিটি বিচ্যুতিমাত্র আমরা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।—স. অ.]

কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ কেহ বলিতেন, রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গলা গদ্যের প্রবর্ত্তক; কেহ কেহ বা রামরাম বসু, এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও এই গৌরব প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; যেহেতু আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় প্রাচীন বাঙ্গলা গদ্যের ধারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন-স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া যখন ইংরেজীকেই সেই স্থান দখল করিয়া লইতে দেওয়া হইল, তখন হইতেই বাঙ্গলা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে জনসাধারণের নাড়ীচ্ছেদ হইয়া গেল।

বাঙ্গলা সাহিত্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দান নহে। এই সাহিত্যের স্রষ্টা, পৃষ্ঠপোষক ও রসবোদ্ধা ছিল জনসাধারণ। সংস্কৃতের প্রাধান্যের যুগে জনসাধারণের এই সাহিত্য রাজদরবারে আমল পায় নাই। সেখানে ন্যায়ের পণ্ডিত, দর্শন উপনিষদ্ ও ব্যাকরণের পণ্ডিতদের মহিমান্বিত আসন একেবারে শীলমোহর করা ছিল। সেখানে বাণভট্টের দ্বিমুষ্টিচতুরাঙ্গুলিপরিমিত, সন্ধিবদ্ধ ছত্রের মধ্য হইতে চেরীবেষ্টিতা ক্ষীণপ্রাণা সীতার ন্যায় কাব্যসুন্দরীকে উদ্ধার করিতে হইলে পাণিনি, দণ্ডাচার্য্য, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের তোড়জোড় লইয়া ব্যূহভেদের চেষ্টা করিতে হইত। রাজদরবারে বাঙ্গলা গদ্যপদ্য একেবারে অপাংক্তেয় ছিল। আমরা এখানে লক্ষ্মণসেনের যুগের কথাই বলিতেছি।

কিন্তু তাই বলিয়া সে আমলেও বাঙ্গলা সাহিত্য হীনবল বা শক্তিহীন ছিল না। জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দুর্জ্জয়। বর্ষণ-মুখর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দু যখন গিরিশিখরে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে, তখন 'কে রোধে তার গতি?'

এই জনসাধারণের কাব্যমুখী প্রতিভা বঙ্গের পল্লী-গীতিকা ও মহাজনপদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিল,—ইহাদের ধর্ম্ম-প্রেম-বিলাস, ভক্তিরত্নাকর, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি প্রেমরসাত্মক কাব্যে বঙ্গীয় সমাজের ইতিহাসের ভিত গড়িয়া দিয়াছিল।

কিন্তু ইংরেজ-আবির্ভাবের প্রথম যুগে রামমোহন রায় প্রমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সাধারণের এই বিশাল সম্পত্তির কোন খোঁজই রাখিতেন না। সহজিয়াদের বিপুল গদ্য-সাহিত্য তাঁহাদের নিকট উপেক্ষিত বা অজ্ঞাত ছিল। তাঁহারা জানিতেন না যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু পরিশ্রমে রাধাবল্লভ শর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি সংস্কৃত স্মৃতিগুলির বাঙ্গলা গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র তদ্বিরচিত 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের ভূমিকায় রাধাবল্লভ শর্ম্মার এই বাঙ্গলা স্মৃতিগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে বাঙ্গলা দেশের বুড়াবুড়ীরা তাহাদের নাতি-নাতনীদিগকে বহু প্রাচীন কাহিনী শুনাইয়া আসিতেছিলেন এবং যদিও যুগে যুগে সে ভাষা মুখে মুখে কিছু রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন খুব দ্রুত বা ব্যাপক ছিল না। বঙ্গের নিভৃত পল্লীগুলি বাহিরের সমস্ত সংস্রব-মুক্ত ছিল। তথাকার ভাষা বহু শতাব্দীতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইত। সেই গদ্যপদ্যময় গল্পগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে কতকটা রূপান্তরিত হইয়া আসিলেও তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার নিজস্ব রূপটি বজায় ছিল। তাহা বাঙ্গলা বলিয়া চিনিতে কোন কষ্ট ছিল না। তথাপি এই কথা-সাহিত্যের কতকগুলি ['ঠাকুরমার ঝুলি'] যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন স্বর্গীয় অক্ষয় সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন—"মহাশয়, এ গদ্য একেবারে দুর্ব্বোধ্য, ইহা বাঙ্গলায় চলিবে না।" বাধ্য হইয়া মজুমদার মহাশয় পরবর্ত্তী সংস্করণে সেই প্রাচীন ভাষার অনেকটা পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াছিলেন। নানা কারণে বাঙ্গালীর পক্ষে তখনও রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা নিরাপদ ছিল না।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' পাওয়া যায়, চৈতন্যদেবের চির-বিশ্বস্ত অনুচর গদাধর অত্যাচারের ফলে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দের শ্বশুর গৌরী দাস পণ্ডিত নবাব-দরবারের ভয়ে গঙ্গার একটি হ্রদে দুর্য্যোধনের মত অনেকদিন লুকাইয়া থাকিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল কথা প্রচারিত হয় নাই, প্রচার করিলে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীরা আইন করিলেন, দুঃখ বা বিয়োগান্ত কোন কথা সাহিত্যে স্থান পাইবে না। এখানে স্বাধীন জাতিদের মত আমাদের গদ্যের চারিদিকে প্রসার হয় নাই। কিন্তু যেখানে মর্ম্মের রস-ধারা প্রবাহিত হইত, কিংবা ধর্ম্মমতের প্রচার হইত, সেখানে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য কতকটা প্রসার-লাভ করিয়াছিল। যেখানে যেখানে প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি পাওয়া যাইতেছে, সেখানে ছোট বড় সহজিয়া মত-সম্বলিত গদ্য-লেখা সুলভ। এই সহজিয়া এক কালে বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু কথা-সাহিত্যের এখনও উদ্ধার হয় নাই। শিক্ষিত-সমাজের উপেক্ষায় উহা পল্লীর নিভৃত কোণে শুকাইয়া মরিতেছে। এই সাহিত্যের সমধিক অংশই গদ্য। আমাদের এই ভাণ্ডার অপ্রমেয় ও অতি বিরাট। "মালঞ্চমালা", "শঙ্খমালা", "কাজলরেখা", "ধোপার পাট", "মধুমালার কথা" প্রভৃতি কয়েকটি কাহিনী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের একটির অনুবাদ পড়িয়া পাশ্চাত্ত্য একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, জগতের পল্লী-সাহিত্যে এই গল্পের সমকক্ষতা করিতে পারে, এমন কোন রচনা তাঁহার জানা নাই। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় য়ুরোপে যে সকল কাহিনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশেই বাঙ্গলা দেশের কথা কতকটা রূপান্তিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে। মৎকৃত *Folk Literature of Bengal* নামক গ্রন্থে এই সকল গল্পের আদি স্থান যে বাঙ্গলা, তাহা প্রমাণ করিবার কতকটা প্রচেষ্টা আছে। বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যে এই ভাষার শক্তি, ভাবসম্পদ ও প্রগতিশীলতার অনেক লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ লোক-উপেক্ষায় এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে দেশের এই বিপুল সম্পদ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ঢাকায় অধ্যাপক ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই কথা-সাহিত্য উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের নেতাগণের ঊর্দ্ধদৃষ্টি, তাঁহাদের নিম্নে চাহিয়া দেখিবার অবসর কোথায় ?

বহুপদচিহ্নলাঞ্ছিত বাঙ্গলা গদ্যের পথ একদা প্রায় মুছিয়া আসিল। মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ সেই বিলুপ্ত ভাষাকে সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়া এক নূতন গদ্যের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তখনকার বাঙ্গলা ব্যাকরণ হইল পাণিনি, মুগ্ধবোধ ও ক্রমদীশ্বরের নকল ও বাঙ্গলার অভিধানগুলি হইল অমরকোষের পোষ্যপুত্র। বাঙ্গলা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, তাহার বিধি-নিয়ম যে ভিন্ন, এবং তাহার কতকগুলি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গলার অভিধান ও ব্যাকরণে তাহার ব্যঞ্জনা নাই।

এক দিকে ভট্টাচার্য্যগণ বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃত রূপে রূপায়িত করিতেছিলেন, অপর দিকে রামমোহন বাঙ্গলা গদ্য ইংরেজী ছাঁচে ঢালাই করিতে চেষ্টিত ছিলেন। তিনি ইংরেজী ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়া এই সূত্র স্থাপন করিলেন যে, গদ্য লিখিতে হইলে তাহার একটা কর্ত্তা ও ক্রিয়া থাকা অপরিহার্য্য এবং এই নিয়ম রক্ষা না করিলে গদ্য রচনা অসিদ্ধ। তিনি উদাহরণস্বরূপ উদ্ভট রকমের কয়েকটি গদ্য ছত্রের নমুনা দিয়াছেন। সূত্রটি ঠিক ইংরেজীর নকল, বাঙ্গলা গদ্যে উহা খাটে না। ক্রিয়াপদ ছাড়া এদেশে বাঙ্গলার খুব ব্যবহার ছিল ও আছে, যথা—এক রাজা। তাঁহার দুই কন্যা। তাঁহাদের একটি সধবা ও একটি বিধবা। বিধবাটির বয়স ষোল এবং সধবাটির বয়স বিশ। ইহারা উভয়েই নিষ্ঠাবতী ও সরলপ্রকৃতি। এই ভাবের লেখায় কোন ছত্রেই ক্রিয়াপদ নাই। রামমোহন ঘরের কথায় নিত্যব্যবহৃত ভাষার ধারা লক্ষ্য না করিয়া ইংরেজী ব্যাকরণের মুখাপেক্ষী হইলেন, তাহাতে বঙ্গভাষার বঙ্গশ্রী কতকটা লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাশালী। বাঙ্গলার নিজস্ব রূপ তিনি কতকটা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণে তিনি লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় 'শ' যখন 'র' 'ঋ' ও 'ণ'য়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন তাহার উচ্চারণ হয় 'স' (ছ) যথা—শ্রদ্ধা, শৃগাল ও প্রশ্ন। যখন 'স', 'ত' 'থ' 'ব', 'র' ও 'ঋ'এর সঙ্গে যুক্ত হয়, বাঙ্গলার 'স' সংস্কৃত 'ছ'এর অনুরূপ উচ্চারিত হয়, যথা—স্তব, স্থান, স্রাব ও সৃষ্টি। বাঙ্গলায় সপ্তমীতে যখন শেষ

অক্ষর দীর্ঘ (আ) হয়, তখন 'তে' 'অয়' ও 'য়' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। কিন্তু যখন শেষ অক্ষর 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ', 'এ', 'ঐ' এবং 'ঔ' থাকে, তখন 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়, যথা—মৃত্তিকাতে, মৃত্তিকায়, থালাতে, থালায়, শয্যাতে ও শয্যায়। অপর সূত্রের উদাহরণ—ছুরিতে, হাতীতে ও রজনীতে। মনুষ্যাদির পক্ষে বহুবচন বুঝাইতে 'রা' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যথা,—মানুষেরা, রামেরা, শ্যামেরা ইত্যাদি। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জীব বুঝাইতে 'সকল' 'গুলি' প্রভৃতির প্রয়োগ হয়, যথা—গরুগুলি, পাখীগুলি।

সেই ঘোর সংস্কৃত ও ইংরেজীর প্রভুত্বের যুগে দীনা বঙ্গভাষার স্বরূপ চিনিবার এই চেষ্টা রামমোহনের অদ্বিতীয় প্রতিভা প্রতিপন্ন করিতেছে।

বিদেশীদেরই শিক্ষার প্রয়োজনে পরদেশের ব্যাকরণের ও অভিধানের সাহায্য লওয়ার দরকার হয়। সাহেবেরা বাঙ্গলার কর্তা এবং দেশীয় লোকের বাণিজ্যাদি নানা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইলেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন পর্ত্তুগীজ লেখক প্রথম বাঙ্গলা অভিধান প্রণয়ন করেন। দেশীয় লোকের এরূপ বাঙ্গলা অভিধান ও ব্যাকরণের তখন কোন উপকারই ছিল না।

বিপথগামী বঙ্গীয় গদ্য কখনও ইংরেজী, কখনও পারসী, কখনও সংস্কৃত ভাষার ক্রীতদাসের মত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইহার মধ্যে পর্ত্তুগীজ ও আরবী ভাষারও প্রচুর উপাদান প্রবেশ করিয়াছিল। নিম্নে এই যুগের গদ্যের কতকগুলি বিচিত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।—

সংস্কৃত প্রভাবের নমুনা :—

(১) "বারংবার জগদেক স্থিতিসংলয়াদিসাধারণ-কারণ মানসবাক্‌পথাতীত পরমাদ্ভুতিবিবিধবিচিত্রচিন্তাতীত পরাৎপরানন্ত বৈভানুক্ষণ বিস্তারক অরিবতাধ্যাত্মিকাদি বহুবিধভাণ কলাপ্রকবলিতমানস মানবসমূহনিস্তারক পরম-কারুণিক—" ইত্যাদি। এই ছত্রটি আরও ছয়টি পংক্তিতে শেষ হইয়াছে। তাহা উদ্ধৃত করিবার আমাদের ধৈর্য্য ও স্থান উভয়েরই অভাব। একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য,—রচনাটির লেখক রামমোহন রায় এবং যে সময়ের লেখা তাহা রাজা রামমোহনেরই যুগ। তবে কি পণ্ডিত-প্রবর রাজা এই ভাবেই বাঙ্গলা গদ্যে হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন ?

(২) "অনভিব্যক্তবর্ণ-ধ্বনি-মাত্র রাজ্ঞা পরানাম্নী-ভাষা প্রথমা, যেমন অভিনব কুমারদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্তবর্ণমাত্রা পশ্যান্তি নামক ভাষা যেমন প্রাপ্তষদ্‌-কিঞ্চিদ্বয়স্ক বালকবাণী।"—প্রবোধচন্দ্রিকা।

(৩) "স্বস্তি সকলদিগ্‌দন্তিকর্ণতালাস্ফালসমীরণ-প্রচলিত হিমকরহার হাসকাশ কৈলাসপ্রান্তর যশোরাশি-বিরাজিত ত্রিপিষ্টনত্রিদশতরঙ্গিণীসলিল দিক্‌কামিনী জীয়মান গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ—প্রতাপেষু।"—লিপি-মালা (রামরাম বসু)।

ইংরেজী প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা গদ্য :—

(১) "বুঝা যায় ঐ সময় যে সকল সভা একত্র হইয়াছিল, তাহা ভাবী পুরুষের হিতোপদেশের জন্য নয়, কিন্তু অধিক আপনার প্রভুত্বের নিমিত্ত।"—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭২৪ পৃঃ।

(২) "গোল্ডস্মিথ উপাধ্যায়কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত এবং অন্য এক প্রথিতপ্রজ্ঞোপাধ্যায়কর্ত্তৃক বিবরণীকৃত ফিলিপ্‌স্ কেরি-কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় কৃত শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।" ঐ, ১৭২২ পৃঃ।

(৩) "সমস্ত দেশ জয়করণের পর যিনি ইংলণ্ডীয়দের মধ্যে প্রথম কোন উত্তম পদে নিযুক্ত ছিলেন এমন যে তামসবেকট নামে যিনি খ্যাত ছিলেন, তিনি লণ্ডন নগরস্থ এক প্রজার সন্তান ছিলেন।" ঐ ১২২৩ পৃঃ।

অনুবাদক্ষেত্রে সাহেবদের প্রচেষ্টা সময়ে সময়ে একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। যথা গোপাল উড়ের যাত্রার তর্জ্জমা হইয়াছিল—"The Flying Journey of Gopal"। আর এক সাহেব Bad humours of the body কথার অনুবাদ করিয়াছিলেন—"শরীরের দুষ্ট রসিকতা।"

বাঙ্গলা অভিধান এখনও সুষ্ঠুমত লেখা সুরু হয় নাই। কারণ এই ভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গলা ভাষার যে কি অসম্ভব শক্তি, তাহা কেরি, মার্শম্যান, এণ্ডার্সন ও স্ক্রাইন প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। কেরি প্রমুখ ইংরেজগণ যখন আমাদের ভাষার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন, তখন বঙ্কিমবাবুর আবির্ভাব হয় নাই। একজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, এই ভাষায় ইটালী ভাষার লালিত্য

(mellifluousness of Italian) এবং জার্মান ভাষার জটিল ভাব প্রকাশের শক্তি (power of expressing complex ideas) এই উভয়ই পরিদৃষ্ট হয়।

কবিওয়ালাদের রচনা, দাশরথীর পাঁচালি, গ্রাম্য তর্জ্জার লড়াই, হাফ আখড়াই, সেকেলে টপ্পা ও যাত্রার গান প্রভৃতিতে বাঙ্গলার স্বরূপ যতটা প্রকাশিত হইয়াছে, বড় বড় সংস্কৃতাত্মক বাঙ্গলা গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি—

"ভাল ভাল বঁধু ভাল ত আছিলে ?
ভাল সময় এসে ভালই দেখা দিলে।"

এই দুই পংক্তিতে প্রথম দুইটি 'ভাল' শব্দের অর্থ 'বেশ বেশ', তৃতীয় 'ভাল' শব্দের অর্থ 'সুস্থ', চতুর্থ 'ভাল'র অর্থ 'ঠিক' বা 'উপযুক্ত', পঞ্চম 'ভাল'র অর্থ 'সঙ্গত' বা 'উচিত'।

"যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে", আবার "আমার মরণ সময় কাজ কি ভূষণে, এ ভূষণ কভু যাবে নাক সনে" প্রভৃতি পদে বাঙ্গলা শব্দ ও শব্দাংশ যে বিভিন্ন ও বিচিত্র ভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা প্রণিধানযোগ্য। যমক অলঙ্কারের দৃষ্টান্তগুলি খুঁজিলে আমাদের ভাষার বৈশিষ্ট্য ও শক্তির ধারণা হইবে।

"আমি যে রাধার লাগি হলাম বনবাসী, ধরা চূড়া বাঁশী কতই ভালবাসি" ছত্রদ্বয়ের 'বাসি' শব্দের পূর্ব্বে 'ভাল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই শব্দের পূর্ব্বে কখনও 'ভয়' কখনও 'লাজ' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ইহার অর্থ জটিল করা হইয়া থাকে। বাঙ্গলার শত শত শব্দ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দাংশ ভিন্ন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বাঙ্গলা অভিধানের নানারূপ উপাদান যোগাইতেছে। এখনও আমাদের দৃষ্টি এদিকে পড়ে নাই। ধরুন আর একটি শব্দ 'থাকে'। ইহার প্রয়োগ দেখুন—

হেথা থাকতে যদি মন না থাকে,
তবে যেও সেথাকে,
যদি মনে মন রত, না হয় মনের মত
কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে ?
তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে
থাকে, না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে।
যথা যে না থাকে তারে আর কোথা কে
ধরে বেঁধে রেখে থাকে ?

এইসব 'থাকে' শব্দ এক পরিবারভুক্ত কি না, এবং সূক্ষ্ম বিচারকালে ইহাদের ভিন্নার্থ স্বীকার করা দরকার কি না, ইহাও প্রণিধানযোগ্য।

বাঙ্গলার শিল্পীরা খড়কুটা ও কাদামাটি দিয়া যে ভাষা-প্রতিমা তৈয়ারি করিয়াছেন, এবং তাহার উপর নিজেদের বনজঙ্গলের গুল্মলতার রস দিয়া রং প্রস্তুত করিয়া সেই প্রতিমার যে অপরূপ রূপ দিয়াছেন, তাহা উপেক্ষিত জনসাধারণের ভাষায় পাওয়া যাইবে। সেই ভাষাকে অবজ্ঞা করিলে, বাঙ্গলার অভিধান বা ব্যাকরণ কখনও সম্পূর্ণ হইবে না।

ইংরেজ আগমনের অনতিপূর্ব্বে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত শুধু বিবিধ শ্রেণীর গানে নহে, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় যে গদ্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের প্রচেষ্টায় যে "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" প্রকাশিত হইতেছে, তাহা সেই রুদ্ধ প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে। এই নব্য গদ্যের বিরুদ্ধে আমাদের শুধু এই অভিযোগ যে, ইহা গদ্যের পূর্ব্ব ধারাকে একেবারে অস্বীকার করিয়াছিল। রামমোহন ও সেকালের শিক্ষিত-সম্প্রদায়, বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্যগণ বৈষ্ণবদের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন, এবং বৈষ্ণবেরাই সেই গদ্যের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। এজন্য উক্ত সাহিত্য বৈষ্ণব বৈরাগীর ঝুলির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। নব্য গদ্যের ধারা ইহা সত্ত্বেও প্রথম যুগে বঙ্গদেশকে যে অবদান দিয়াছিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর নহে, এই যুগের প্রধান লেখকেরা পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করিব। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় এ পর্য্যন্ত এই কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

১। কলিকাতা কমলালয়—ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়
২। কৃষ্ণচন্দ্র চরিত—রাজীব মুখোপাধ্যায়
৩। প্রতাপাদিত্য চরিত—রামরাম বসু
৪। বেদান্তচন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
৫। ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট—তারিণীচরণ মিত্র

৬। স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার

৭। নববাবুবিলাস—ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। পাষণ্ডপীড়ন—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

৯। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা—কালীপ্রসন্ন সিংহ

এই যুগের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার গুণকীর্ত্তন করার কোন প্রয়োজন নাই। আমার পক্ষে তাঁহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা ক্ষুদ্র মেটে প্রদীপ দিয়া সূর্য্যমণ্ডল দেখাইবার মত। আমেরিকার ভিষক্‌প্রবর ডাঃ বুথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"মানব-সমাজে বহু শতাব্দীতে এরূপ প্রতিভাপন্ন মহামানবের আবির্ভাব হয় নাই।···আমার ক্রমেই এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, জগতে তাঁহার মত লোক নাই ও অতীতে জন্মে নাই।" বিলাতের ইউনিটেরিয়ান (একেশ্বর-বাদী) সভার সভাপতি সার্ জন বাউরিং তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়ার উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "আজ যদি সক্রেটিস, মিল্টন বা নিউটন এইখানে আবির্ভূত হইতেন, তবে তাঁহাদিগকে জীবন্ত দেখিয়া আমাদের যে আনন্দ ও গৌরব অনুভূত হইত, আজ আপনাকে পাইয়া আমাদের সেইরূপ ভাব হইতেছে। যখন জগতের দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হইয়া পথিকগণ "বক্ত ক্রস" নামক জ্যোতি-পুঞ্জের অতি সুন্দর আলোক প্রথম দেখিয়াছিল, তখন তাহাদের মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দ হইয়াছিল, আপনাকে দেখিয়া আমাদের সেইরূপ আনন্দ হইতেছে।"

বিশ্বের এই পূজনীয় ব্যক্তি নবযুগের বাঙ্গলা গদ্যের অন্যতম কর্ণধার হইয়াছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালায় স্থান পাইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয়ের জন্ম ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দ ও মৃত্যু ১৮১৯। ইঁহার পাণ্ডিত্য অসামান্য ছিল, মার্শম্যান লিখিয়াছিলেন—"মৃত্যুঞ্জয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য আমাদের দেশের জন্‌সনের মতই ছিল, তাঁহার বিরাট বপু ও অশোভন দেহশ্রী জন্‌সনকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।" আর একজন ইংরেজ পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের আসন অতি উচ্চে। মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি ছাত্রগণ মৃত্যুঞ্জয়কে যেন বৃহস্পতির অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের রিপোর্টগুলিতে ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে, তাহা পড়িলে মনে হয়, বাঙ্গলা দেশের পণ্ডিতদের উপর এই ধুরন্ধর পাদ্রীদের কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

রামরাম বসু—ইঁহার প্রণীত 'প্রতাপাদিত্য চরিত'। ইনিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কেরি সাহেব ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"A more devoted scholar than him I did never see"—(বিদ্যার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ইঁহার অপেক্ষা কাহারও বেশি আছে বলিয়া আমার জানা নাই)। কেরি আরও লিখিয়াছেন, "ষোল বৎসরের পূর্ব্বেই ইনি পারসী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইঁহার সংস্কৃতের পাণ্ডিত্যও তুল্য-রূপ প্রগাঢ় ছিল।"

ইঁহার চরিত্র ও জীবন সম্বন্ধে লুই সাহেব তৎকৃত 'টমাসের জীবনী' নামক পুস্তকে যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে বুঝা যায়, এই ব্যক্তি বিদ্যা-বুদ্ধিতে যেরূপ অদ্বিতীয় ছিলেন, বৈষয়িক কার্য্যে ও চতুরতায়ও তিনি সাহেবদিগকে পরিচালনা করিবার যোগ্য তেমনই কুশাগ্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে "নববাবুবিলাস" ও 'কলিকাতা কমলালয়'। ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ের সংবাদপত্র-চালকদের অগ্রণী ছিলেন। এই লেখকের ছদ্ম-নামে (প্রমথনাথ শর্ম্মা) প্রকাশিত 'বাবুবিলাস' সম্বন্ধে লং সাহেব তাঁহার ক্যাটালগে লিখিয়াছেন, "এই পুস্তকের নূতন নূতন সংস্করণ ক্রমাগত বাহির হইতেছে। লেখক বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিহাস-রস-রসিক। 'নববাবুবিলাস'কে হোগার্থের 'রেক্‌স প্রগ্রেসে'র সঙ্গে তুলনা করা চলে—'কোয়াটারলি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামক ইংরেজী পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত সমালোচনা ও গুণ-বিশ্লেষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জনপ্রিয় সাংবাদিক ও লেখক সেকালে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরবর্ত্তী কালের 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভিত্তি 'নববাবু-বিলাস'ই গড়িয়া দিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এরূপ প্রতিভা-সম্পন্ন লেখকের খ্যাতি এখন লুপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ বর্ত্তমান যুগের রুচিবাগীশগণ এই পুস্তক এবং

'বিবি বিলাস' নামক লেখকের আর একখানি বইকে তাঁহাদের তীব্র দৃষ্টির বহ্নিতে পুড়াইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন পুথিকে পুলিসের খবরদারি হইতে মুক্ত করা উচিত। রঞ্জন প্রকাশালয় যদিও 'নব বিবি বিলাস'খানি ছাপাইয়াছেন, কিন্তু ভরসা করিয়া ইহা সাধারণের জন্য প্রকাশ করিতে সাহস পান নাই। ভারতচন্দ্র যে কারণে শাসন-বিভাগের খরদৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, 'নব বিবি বিলাসে' ততটা বিগর্হিত রুচির উদাহরণ নাই। অথচ এই মনস্বী লেখক তদীয় যুগের যে পটচিত্র দিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় সমাজের একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছে। পুলিসের দৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহা রুচিবিষয়ে কড়াকড়ি নিয়মের অধীন না করাই ভাল। চার্লস দি সেকেণ্ডের সময় উইচারলি প্রভৃতি নাট্যকারের রুচি অতি বিগর্হিত ছিল, কিন্তু সেগুলি সম্ভবতঃ আইনের আমলে আনা হয় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয়, 'আলালের ঘরের দুলাল' যে মূলতঃ এই বাবুবিলাসেরই ছায়া অবলম্বনে টেকচাঁদ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন, তাহা না জানিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালের ঘরের দুলাল'কে একখানি সম্পূর্ণরূপে মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সিরিজের ষষ্ঠ পুস্তক। গৌরমোহন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন; ইনি সেকালের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। এই সকল পণ্ডিতের শাস্ত্রজ্ঞান এত প্রগাঢ় ছিল যে, যাঁহারা ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারাই চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সেরূপ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। পিয়ার্স সাহেব গৌরমোহনের কার্য্যতৎপরতা ও পাণ্ডিত্যে বিস্মিত হইয়া তাঁহার রিপোর্টে ইঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুস্তকখানির অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল।

রামমোহন রায় যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার আরম্ভ করেন, গোঁড়া সমাজ হইতে তাহার ঘোর প্রতিবাদ প্রচারিত হয়। এই বিরুদ্ধ দলের নেতা ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তাঁহার নির্দ্দেশে বহু পণ্ডিত বাঙ্গলা ভাষায় প্রতিবাদ-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এই সকল পণ্ডিত সকলেই বহু শাস্ত্রবেত্তা ও অদ্ভুত মনীষাসম্পন্ন ছিলেন, সেকালের ভাষার জড়তা ভেদ করিয়া পাঠকেরা অগ্রসর হইলে তাৎকালিক বঙ্গসমাজের স্বরূপ এই সব গ্রন্থে প্রচুররূপে পাইবেন। এই লেখকদের মধ্যে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন একজন অতি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৩ সনে ইনি 'পাষণ্ডপীড়ন' নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন, এই পুস্তকে রাজা রামমোহনকে "নগরান্তবাসী" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজা তখন মাণিকতলায় বাস করিতেন, সুতরাং তিনি নগরান্তবাসী তো বটেনই। কিন্তু এই শব্দটির অপর অর্থ "চণ্ডাল"। সম্ভবতঃ শেষোক্ত অর্থের শ্লেষ এই শব্দে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল। কাশীনাথ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে (১৮২৭ সনে) জেলা জজের পদ গ্রহণ করেন। 'পাষণ্ডপীড়নে' অশেষ পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী যুগে যে সকল ব্যক্তি বাঙ্গলা গদ্য রচনা করেন, তন্মধ্যে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ধনীগৃহের একমাত্র সন্তান, রূপে গুণে অতুল্য—অথচ কলিকাতার নানা বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের পথ ছাড়িয়া ইনি দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ইনি পরলোকে গমন করেন, এই অল্প সময়ে (২৯ বৎসর) তিনি বহুক্ষেত্রের কর্ম্মীস্বরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে আবির্ভূত হয়, তখন কালীপ্রসন্নের বয়স ১৫।১৬; এই সভা দেশের প্রত্যেক দিকের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে উৎকর্ণ ও সতর্ক ছিল। শুধু কালীপ্রসন্নের ব্যয়ে নয়, তাঁহারই প্রেরণায় নানাবিধ লোকহিতকার্য্যে এই সভা নিয়োজিত হইয়াছিল। এই তরুণ সুদর্শন আঢ্য যুবক সর্ব্বদা পণ্ডিতবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই

দানবীর কত দিকে যে তাঁহার মুক্তহস্ত বদান্যতা প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। বিদ্যোৎসাহিনী সভায় প্রায়ই এতদর্থে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইত। একবার দেখিতে পাই "সুখী কে" এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য তিনি ২০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিতেছেন। আর একবার "হিন্দুধর্ম্মে শ্রেষ্ঠত্ব" প্রতিপাদক প্রবন্ধের জন্য ৩০০ টাকার অঙ্গীকার প্রচারিত হয়। ১৮৬১ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি কালীপ্রসন্নবাবুর উদ্যোগে ও ব্যয়ে এই সভা মাইকেল মধুসূদন ও জে. লং সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করেন। মধুসূদনকে একটি উৎকৃষ্ট পানপাত্র (a splendid silver claret jug) উপহৃত হয়। সকলেই অবগত আছেন, লং সাহেব 'নীলদর্পণ' ইংরেজীতে তর্জ্জমা করার অপরাধে ১০০০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হন, এই টাকা তখন তখনই কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদান করেন; অনুবাদটি কিন্তু করিয়াছিলেন স্বয়ং মাইকেল। হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য ২ বিঘা জমি ও ৫০০ টাকা কালীপ্রসন্ন দান করেন। ডেবিড হেয়ারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইনি বারংবার বহু প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। "নাটক, বঙ্গভাষা অনুশীলন ও কৃষক" প্রভৃতি তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল। লর্ড ক্যানিং দয়ার অবতার ছিলেন, এই সূত্রে কালীপ্রসন্ন তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন, তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-কল্পে কালীপ্রসন্ন ১০০০ টাকা দান করেন। এই দান কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁহার বেঞ্চে রাস্তায় ভিক্ষা করার অপরাধে এক অন্ধ উপস্থিত হইলে তিনি আইন রক্ষা করিয়া তাহার দুই টাকা জরিমানা করিলেন, কিন্তু নিজ পকেট হইতে ঐ টাকা দিয়া অন্ধের জন্য মাসিক এক টাকার একটা আজীবন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কলিকাতায় পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য ইনি ২০০০ টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও অনুশীলন কল্পে তিনি যে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে 'বেণীসংহার' 'বিক্রমোর্ব্বশী' 'সাবিত্রী সত্যবান' ও 'মালতীমাধব' নাটক অভিনীত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে 'বেণীসংহার' নাটকে কালীপ্রসন্ন নিজে অভিনয় করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (সভার মুখপত্র), 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া 'পরিদর্শক' নামক একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎকৃত 'বাবু নাটক' ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার অমর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' দেখা দেয়—কিন্তু এক হিসাবে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি বলিতে মহাভারতের বঙ্গানুবাদকে গণ্য করা যায়। এই অনুবাদে কালীপ্রসন্নের সহায়ক এবং লেখক স্বরূপ বিদ্যাসাগরের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাকে বাদ দিলে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ভুবনেশ্বর বিদ্যার্ণব, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্যের সহযোগিতা উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহাদের সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সমস্ত লেখা নিজে ভাল করিয়া দেখিয়া দিতেন, এত বড় বড় পণ্ডিতকে লইয়া কাজ করা এবং তাঁহাদিগকে স্বাভিপ্রায় অনুসারে পরিচালনা করিবার শক্তি সেই তরুণ বয়সেই তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২০ বৎসর। সভায় যখন তিনি বক্তৃতা করিতেন, তখন তাঁহার সুকণ্ঠ বীণার ন্যায় বাজিয়া উঠিত। মহাভারতের অনুবাদ তিন সহস্র খণ্ড কালীপ্রসন্ন সিংহের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। ডাকমাশুলও কালীপ্রসন্নবাবু দিতেন। এই দেশের জন্য ও বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য সত্য সত্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল; লোক-দেখানো দেশপ্রীতি বা হুজুগ তাঁহার ছিল না; বাঙ্গলা দেশমাতৃকা তাঁহাকে খাঁটি বাঙ্গালী ও খাঁটি দেশভক্ত রূপে তৈয়ারি করিয়া এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি দেশের সর্ব্বশ্রেণীর সঙ্গে এবং এই দেশের সর্ব্ব অবস্থার সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন; বঙ্গভাষার এই দরদী বন্ধুর ভাষা এইজন্য দেশের খাঁটি ভাষা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নর্দ্দামার কাদামাটি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই কাদামাটির মিশ্রণে খাঁটি জিনিসটির মূল্য কিছুমাত্র কমে নাই।

ভাষার নমুনা নিম্নে কিছু দেওয়া যাইতেছে—"টুং লা ণ্ট্যাং টুন্নুনাং ণ্ট্যাং করে রেলওয়ে ইষ্টিম ময়ূরপঙ্খী ছাড়বার

সঙ্কেত ঘণ্টা বাজছে। থার্ডক্লাসে বুকিং আফিসে লোকের ঠেল মেরেচে, রেলওয়ে চাপরাসীরা সপাসপ বেত মাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে, গুতো লাগাচ্চে—তথাপি নিবৃত্তি নাই। "শ্রীরামপুর মশাই" "বালি—বালি" "আমায় বর্দ্ধমানটা দিন না মশাই"—শব্দ উঠ্‌চে। চারিদিকে কাঠের বেড়া ঘেরা বুকিং ক্লার্ক সন্ধ্যাপূজার অবসরের মত ঝোপ বুঝে কোপ মাচ্ছেন। কারো টাকা নিয়ে চার আনা ও দুই দোয়ানী দেওয়া হচ্ছে। বাকী চাবা মাত্র 'চোপরও' 'নিকালো'—কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকেট বেরুচ্ছে। কেউ টিকেটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চীৎকার কচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই··যদি চীৎকার করে ক্লার্কবাবুর চিত্তাকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, তখনই রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেয়।"

এখন এতদিন পরেও রেল ষ্টীমারের তৃতীয় শ্রেণীর দুর্দ্দশা ঘোচে নাই, কিন্তু কালীপ্রসন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর চক্ষু লইয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহার এক দিক পরিহাস-রসোজ্জ্বল, অপর দিকে করুণার অশ্রু প্রচ্ছন্ন।

বর্ত্তমান যুগের রুচির মানদণ্ডে বিচার করিলে হয়তো এই গদ্য-সাহিত্যের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়িবে, কিন্তু এই সকল পণ্ডিত-শিরোমণির দান তুচ্ছ করিবার বিষয় নহে। এই সাহিত্য ভারগুরুত্বে, অন্তর্দৃষ্টিতে, ভাষা-সম্পদে ও পাণ্ডিত্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের এক গৌরবান্বিত অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছে। আর একটি কথা। আমাদের শিক্ষাশালায় বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে ইংরেজী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ বাঙ্গালী নিজস্ব হারাইয়া পরের দ্বারে দ্বারে ভিখারীর মত কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। এই অর্দ্ধ শতাব্দীতে জাপান তাহাদের ভাষা গড়িয়া তুলিয়া জগতের প্রগতিশীল জাতির ভাষার মধ্যে প্রথম পংক্তিতে স্থান লইয়াছে। আমরা জাতীয়তার সূত্র হারাইয়া পরের বুলি আওড়াইতেছি। মাইকেল মধুসূদন আমাদের দেশের এই দুর্গতি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

মেকলে প্রবর্ত্তিত আইন, যাহার মূল খসড়া করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন,—সেই অশুভকর বিধিতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি উল্টা হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তন, কথকতা, ছড়া, পাঁচালি, শাস্ত্রব্যাখ্যা যাহা যুগে যুগে বাঙ্গলার সংস্কৃতি প্রগতিশীল ও শ্রীমন্তশীল করিয়া রাখিয়াছিল—লোক-শিক্ষার সেই যুগ যুগ পরীক্ষিত বিশাল দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। আমাদের স্বকীয় ভাবধারার ভিতের উপর নূতন যুগের মালমশলা দিয়া এমারৎ তৈয়ারি করিলে তাহা টেকসই এবং সময়োপযোগী হইত, যেমন জাপানী ভাষার হইয়াছে।

এদিকে মূর্ত্তিপূজাবিদ্বেষী রামমোহনের দলের চেষ্টায় বাঙ্গলার ১২ মাসের ১৩ পার্ব্বণের বন্যাস্রোতে মন্দা পড়িল, তাহাতে পল্লীতে পল্লীতে আনন্দের কলরব থামিয়া গেল। কিন্তু "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র যুগেও বাঙ্গলা দেশ একবারে লক্ষ্মীভ্রষ্ট ও ছন্নছাড়া হয় নাই। সেই সময়ে যে সকল বাঙ্গলা পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুর্গোৎসব, দোল ও রথযাত্রার যে উদ্দীপনাময় বর্ণনা প্রকাশিত হইত, তাহা পড়িলে বোঝা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী আঢ্য ব্যক্তিদের প্রতিযোগিতায় এই সকল পার্ব্বণ উপলক্ষে বঙ্গের শিল্পীরা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিত। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত, তাহা দেশের লোকেরাই পাইত। হিন্দুসমাজ চারিদিকে এই সকল উৎসবের সমারোহপূর্ণ বর্ণনা দিয়া উৎসবের গুণকীর্ত্তন উপলক্ষে বাঙ্গলার শিল্পের উৎসাহ প্রদান করিত এবং সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলি তাহাদের জয়ডঙ্কা বাজাইত।

এখনকার শিক্ষিত সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি লক্ষ্মীর বাহনের মত দেবতার প্রতিমা ঘাড়ে করিয়া সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বিসর্জ্জন দিয়া আসিতেছে। সকলেই হুজুগে মত্ত, দেশ-অনুরাগের বক্তৃতা ও হাততালির চোটে কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইতেছে।

এই "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" রচনার যুগে জাতীয়তার যে লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহা আমরা ক্রমবর্দ্ধমান পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে একবারে হারাইয়া ফেলিতেছি। সুতরাং শুধু ভাষা বা সাহিত্যরসের দিক দিয়া নহে, লুপ্ত জাতীয় জীবনের রসধারার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলেও এই সুচিরনিরুদ্ধ সাহিত্যের প্রকোষ্ঠ পুনরায় মুক্ত করিতে হইবে।

ব্রজেন্দ্রবাবু ও সজনীবাবু যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন।

এখনকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো দুইটি চোরা চাহনির স্মৃতি লইয়া ২০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস ভর্ত্তি হইয়া উঠিতেছে, হয়তো এই সাহিত্যে ভ্রমরগুঞ্জন ও কোকিলকূজনের অভাব হয় নাই। কোন ষোড়শীর দাঁড়াইবার বা বসিবার বা স্নানান্তে চুলখোলা অর্দ্ধনম্রনভঙ্গি বা পৃষ্ঠে ন্যস্ত বিপুল কুন্তলের ঘটা দেখিয়া বেকার যুবক ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া ছোট গল্প রচনা করিতেছে। কিন্তু আমাদের জাতি মৃত্যুর সম্মুখীন, এই প্রাণান্তকর শীতঋতুতে বসন্তের আবির্ভাব সময়োপযোগী নহে। এখন আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তর উপাদানগুলি লক্ষ্য করিয়া নূতন সমাজ গঠনের দিনে স্বপ্নবিলাসী হইলে চলিবে কেন?

এককালে বটতলা যাহা করিয়াছে, তাহা খাঁটি জাতীয় চেষ্টার ফল। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কোন প্রতিষ্ঠানই তাহাদের কৃত কর্ম্মের শতাংশের একাংশ অবদানও দিতে পারেন নাই। তাহার পর 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী' ও 'বসুমতী'র সত্বাধিকারিগণ বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত সেবা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও প্রাচীন পুথি উদ্ধার ও প্রকাশ কল্পে উদ্যোগী হইয়াছেন।

"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" সিরিজ যদি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়া উঠে, কালে ইহা দেশের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিবে, তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই; কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকাশকগণ কেবল পুস্তক-প্রকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, ব্রজেন্দ্রবাবু ও সজনীবাবু ঐতিহ্য ও বিজ্ঞানসঙ্গত আলোচনা দ্বারা এই ক্ষেত্রে কালোপযোগী বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছেন। এখন অভাবের পীড়ন সহিতে হইবে, হয়তো ভিক্ষুকের ঝুলি কাঁধে করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এদেশে কর্ম্মীর অদৃষ্টে লোক-প্রশংসা সুলভ নহে। কর্ম্মীদিগকে বহু হিংস্র পিপীলিকার দংশন সহ্য করিতে হয়। ত্রুটি ও ভুল দেখাইবার জন্য নিষ্কর্ম্মাদের দশ অঙ্গুলি সর্ব্বদা উদ্যত। কিন্তু আশা করি, ইঁহারা টলিবেন না। এইরূপ কর্ম্মের একমাত্র পুরস্কার আত্মতৃপ্তি। সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার যাঁহাদের সঙ্কল্প, তাঁহাদের কাছে আমার নিবেদন, তাঁহারা লাগিয়া থাকুন। যে মহৎ কার্য্যে তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার জন্য মহৎ ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর তাঁহারা দেখিবেন, ধীরে ধীরে ভ্রমরের হুল বিঁধানো থামিয়া গিয়াছে, সবজান্তাদের চীৎকার শেষ হইয়াছে, এমন কি আর্থিক সচ্ছলতাও আসিয়াছে। এখনই বটতলা ও সংবাদপত্রের সত্বাধিকারীদের অনেক পুস্তক আর পাওয়া যায় না। এখন এই "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা" সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে তাহা আবার দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িবে।





একটি ফারসী নাটক

(সরগুযশ্‌ত্‌-ই-উযীর-ই-খ.ান-ই-লঙ্কুরান)

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল

ফারসী নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ফারসী ভাষায় নাটকের সৃষ্টি হয় প্রধানত ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবেই। পূর্ব্বে ঈরানে নাটক ব'লে কোন কিছুই ছিল না, যদিও কবিতা খুব সমৃদ্ধিশালীই ছিল। পারস্যের অমর কবি ওমর-খইয়াম, হ.াফিয্‌, স্ব'দী, মৌলানা রূমী প্রভৃতির নাম কে না জানে? উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই নাটক লেখা আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রথমে যে সব নাটকের সৃষ্টি হয়, তা কেবল ইংরেজী অথবা ফরাসী নাটকের অনুবাদ মাত্র।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মিরযা জ'ফর করাচ দাঘীর সাতটি নাটক একসঙ্গে তিহরান শহরে প্রকাশিত হয়। এখানেই প্রকৃতপক্ষে ফারসী নাটকের সূত্রপাত। এগুলিকেই ঈরানবাসীরা তাদের নিজস্ব ব'লে দাবি করতে পারে। কিন্তু এগুলিও প্রথমে লেখা হয়েছিল তুর্কী ভাষার আয.র-বায়জান শহরের প্রচলিত ভাষায়, এবং লিখেছিলেন মিরযা ফতহ.-'অলী আখোন্‌দ্‌ যাদ্‌হ্‌ প্রায় তেরো-চোদ্দ বৎসর আগে। এই নাটকগুলি হ'ল—(১) সরগুযশ্‌ত্‌-ই-উযীর-ই-খ.ান-ই-লঙ্কুরান (লঙ্কুরান শহরের খানের উযীরের কীর্ত্তি); (২) খি.রস-ই-কূলদুর-বাসান (চোর ধরা ভল্লুক); (৩) বুকলা-ঈ-মুরাফ'হ্‌ (উকিলদের বিবরণ); (৪) মুল্লা ইব্রাহীম্‌-খ.লীল-ই-কীমীয়াগর (যাদুগর মুল্লা ইব্রাহীম খ.লীল); (৫) মবসীব ঝু.রদান; (৬) মরদ-ই-খ.সীস (কৃপণ ব্যক্তি); (৭) ঈউসফ শাহ্‌ সর্‌রাজ (ঘোড়া-ব্যবসায়ী ইউসফ শাহা)। এগুলির লেখকদের বিষয়ে কিছু পরে লিখব। এখানের অনেকগুলি বইই আবার ইংরেজী অথবা ফরাসী ভাষায় তর্জ্জমা হয়েছে। তবে এসব তর্জ্জমা-বই আমাদের দেশে নেই।

এর পর ১৯০৮ সনে লণ্ডনের ভূতপূর্ব্ব পারস্য-মন্ত্রী প্রিন্স মলকম খ.ান তাঁর তিনটি নাটক ধারাবাহিকভাবে 'ইৎতিহ.াদ্‌' (একতা) নামক পত্রিকায় বের করেন। এই বইগুলি হ'ল—(১) সরগুযশ্‌ত্‌-ই-আশরফখ.ান (আশরফখানের কীর্ত্তি); (২) যমান-ই-খ.ান-ই-বরূজিরদ (বরূজিরদ শহরের খানের সময়); (৩) শাহকুলী মিরযা। এগুলি একসঙ্গে বার্লিন শহরের কাভিয়ানী প্রেস থেকে ডাক্তার এফ. রোজেন কর্ত্তৃক ১৯২২ সনে প্রকাশিত হয়। ঠিক ঐ সময়ে তিয়াতর (নাটক) নামক একটি পত্রিকা বের হতে থাকে। অনেক নাটক ধারাবাহিকভাবে এতে লেখা হ'ত। এইরূপে ফারসী ভাষায় নাটকের আমদানি হ'ল।

ফারসী নাটক যে কবিতার মত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারে নি, তার কারণ ফারসী কবিতা লেখা আরম্ভ হয় অষ্টম শতাব্দী থেকে, আর নাটক তো সেদিনের জিনিস। অধিকন্তু, পূর্ব্বে পারস্য-দেশে ভাষার যেমন চর্চ্চা ছিল, এখন আর তেমন নেই। তবে বর্ত্তমান রাজা রিজা খ.ান পহলবী কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজ, সব দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় এর আরও উন্নতি ক্রমে ক্রমে আশা করা যেতে পারে। এখানে নাটকের যা বর্ণনা দেওয়া হ'ল, তার কোনটাতেই গভীর ভাবের কোনও সমাবেশ নেই। সবই কেবল হাস্যরসাত্মক। তাতেও আবার নিখুঁত শিল্পের পরিচয়

নেই। তবে এগুলি লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল তখনকার দিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতির সমালোচনা করা। পারস্য-সমাজে এগুলির প্রভাব শীঘ্রই অনুভূত হয়। এবং এর প্রভাবেই, আমার মনে হয়, কন্‌স্টিটিউশনাল গভর্মেন্টের সৃষ্টি পারস্যদেশে হয়।

লেখকদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রাশিয়া ককেকায ও অন্যান্য শহর অধিকার ক'রে তাদের রাজ্য ক্রমে ক্রমে সেখানে বিস্তার করতে লাগল, সেই সময়ে (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে) তিফলীস শহরে তারা স্টেজ স্থাপন ক'রে তাদের ভাষায় অভিনয় করতে আরম্ভ করল। এসব ফতহ.-'অলী আখোন্দ্ যাদ্‌হ্‌র মনে বেশ লাগল। তিনি কেমন ক'রে এ তাঁদের দেশে চলতে পারে, তার চিন্তা আরম্ভ করলেন। কয়েকদিন পরই সুযোগ পেয়ে রাশিয়ার ফৌজে সৈন্য হয়ে ঢুকে পড়লেন। কার্য্যকুশলতার দরুন ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ ক'রে তিনি কাপ্তানের পদ প্রাপ্ত হন; এবং তিফলীস শহরে কায়েমীভাবে বাস করতে লাগলেন। এ সুযোগ তিনি নষ্ট না ক'রে বেশ পড়াশুনা আরম্ভ ক'রে দিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত নাটকগুলি তুর্কী ভাষায় লিখলেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন তাতার। আর তাঁদের বাসস্থান ছিল করাচদাঘ.। তাঁর বাবা দরবন্দ নামক স্থানে শিক্ষকতার কাজ করতেন, এজন্য তাঁকে আখোন্দ্ যাদ্‌হ্ বলা হয়।

আখোন্দ্ যাদ্‌হ্ তাঁর সব বই একত্র ক'রে প্রকাশিত করেন। আর ঠিক ঐ সময় ঈরানের সম্রাট ফতহ.-'অলী কাচারের পুত্র জলালউদ্দিন মিরযা ফারসীতে নাম্‌হ্-ই-খ.সরবান (ঈরানের রাজাদের ইতিহাস) নামক একটি বই লেখেন। আর তার এক খণ্ড তিফলীসের সাহিত্যানুরাগী ফতেহ.-'অলী আখোন্দ্ যাদ্‌হ্‌র নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনিও তাঁর বইগুলির এক এক খণ্ড শাহযাদ্‌হ্‌র নিকট পাঠান এবং ঐসঙ্গে লিখে দিলেন, এই বইগুলির ফারসীতে অনুবাদ হ'লে পারস্যবাসীদের বেশ উপকার হবে।

শাহ্‌যাদ্‌হ্‌র জলালউদ্দিন একজন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি এবং তাঁরই অধীনে কাজ করতেন আমাদের মিরযা জ'ফর। ১৮৩২ সনে তাঁর জন্ম হয়; আর তাঁর বাড়ি করাচদাঘ. শহরে। ফারসী ও তুর্কী উভয় ভাষাতেই তাঁর বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর বিয়ের অল্পকাল পরেই তাঁর স্ত্রী মারা যান—রেখে যান কেবল একটি মেয়ে। মিরযা জ'ফরের সব সময়ই প্রবল ইচ্ছা ছিল, কি ক'রে তাঁর মেয়েকে প্রকৃত শিক্ষিতা করতে পারা যায়। ঈরানের প্রচলিত শিক্ষা মোটেই তাঁর পছন্দ হ'ত না। এ বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং যে সময়ই অবসর পেতেন শাহযাদ্‌হ্‌র গ্রন্থাগারে ব'সে পড়াশুনা করতেন। হঠাৎ একদিন ফতহ.-'অলীর বইগুলির সঙ্গে তাঁর প্রেরিত চিঠি একত্রে তাঁর চোখে পড়ল। বইগুলি প'ড়ে, তাঁর বেশ পছন্দ হ'ল এবং তিনি মনস্থ করলেন ঐ বইগুলির ফারসীতে অনুবাদ করবেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুল্লা ইব্রাহীম খ.লীল-ই-কীমীয়াগর অনুবাদ ক'রে শাহযাদ্‌হ্‌কে দেখালেন। শাহযাদ্‌হ্ তাতে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আন্তরিক উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য করতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরই মবসীব ঝ.রদান্ অনুবাদ করা হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইতিমধ্যে শাহযাদ্‌হ্ মারা যান, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকরিও যায়। তিনি খুব অসুবিধায় ও আর্থিক অনটনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাতেও নিরুৎসাহ না হয়ে ১৮৭৪ খ্রীঃ সবগুলি বই একত্রে তিহরান শহরে প্রকাশিত করতে পেরেছিলেন।*

* অনূদিত নাটকটি পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

সৌন্দর্য্যোপাসক মণিপুরী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আসামের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আকৃতি-প্রকৃতি, বেশভূষা, আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সকল বিষয়েই মণিপুরী জাতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে আর্য্যদের ন্যায় চেহারা-বিশিষ্ট অনেক নরনারী দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস করেন। নবদ্বীপের গোস্বামীদের দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতে মণিপুরী সম্প্রদায়ও আদিম জাতির সহিত জ্ঞাতিত্বের কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা অনুভব করেন। কিন্তু ইহারা যে মূলত মোঙ্গোলীয় মহাজাতির কুকিচিন গোষ্ঠীর অন্তর্নিবিষ্ট, ভাষাতত্ত্ববিদ সার্ জর্জ গ্রিয়ার্স’ন, নৃতত্ত্ব-বিদ সার্ চার্লস লয়েল, ডাঃ ব্রাউন, মণিপুরী জাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ টি. সি. হড্‌সন প্রভৃতি সকলেরই এ বিষয়ে ঐক্যমত্য আছে।



মণিপুরী বালিকা
(পারিজাত সিংহের কন্যা)

কিন্তু ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, আদিম জাতি হইতে উদ্ভূত হইলেও কি উপায়ে ইহারা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং বিভিন্ন শিল্পকলার অনুশীলনে এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে একমাত্র ইহাদেরই নিজস্ব বর্ণমালা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক মণিপুরে ভ্রমণকালে পারিজাত সিং নামক জনৈক মণিপুরী ভদ্রলোকের নিকট মণিপুরী ভাষায় লেখা কতকগুলি পুরানো পুঁথি দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মণিপুরীদের ভাষার নাম মৈ-তাই ভাষা। অনুসন্ধানের ফলে মৈ-তাই ভাষায় লেখা যে সমস্ত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলিতে মণিপুরের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের বহু বীরত্ব-কাহিনী, বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সৌন্দর্য্যের ইহারা চিরন্তন পূজারী। যে বিরাট উপত্যকাভূমিতে এই সৌন্দর্য্যোপাসক আদিম জাতির বাস, তাহা নয়ন-মনোহর, শ্যামসুন্দর। চতুষ্পার্শে পাহাড়-ঘেরা, দিগন্তবিসারী হ্রদ, খাল-বিল-সরোবরে পরিপূর্ণ, বিচিত্রপুষ্পসম্ভারসমৃদ্ধ, শস্য-শ্যামল মণিপুর উপত্যকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। এই মনোরম প্রাকৃতিক আবেষ্টনই মণি-পুরীদের অন্তরে সৌন্দর্য্যানু-ভূতি এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেমের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা দিনরাত প্রকৃতির স্নেহক্রোড়েই থাকিতে ভালবাসে।

মণিপুরের লোগতাক হ্রদে কতকগুলি পাহাড় ও ভাসমান দ্বীপ আছে। হ্রদগর্ভস্থ পাহাড়গুলিতে যে সমস্ত নীচশ্রেণীর মণিপুরীদের বাস, তাহারা ‘লই’ নামে পরিচিত। শীতকালে হ্রদ যখন শান্ত থাকে, তখন লইরা অনেকে ভাসন্ত দ্বীপগুলিতে বাঁশের মাচার উপর টুঙ্গি বাঁধিয়া বাস করে। তাহাদের ঘরবাড়িসমেত এই সমস্ত দ্বীপমালা, নীল কাচের মত স্বচ্ছ, শীতের নিস্তরঙ্গ হ্রদের

বুকে দিনরাত অবিরাম স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিতে থাকে। এমনইভাবে নীলকান্তমণির মত নীল আকাশের নীচে, অনন্ত নীলাম্বুরাশির বুকে ভ্রাম্যমান অবস্থায় দিন-যাপন করিতে লইদের বড় আনন্দ। লোগতাক এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের স্বচ্ছন্দবনচারিণী, সদাহাস্যময়ী মণিপুরী তরুণীদের নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার, চোখের সরল চাহনি, যাহাকে বলা চলে 'sexless glare of infancy' ইত্যাদি দেখিয়া সভ্যজগতের সংস্রব হইতে দূরে, প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক নিয়মে আদিম নারীপ্রকৃতি কিভাবে গড়িয়া উঠে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মণিপুরীদের সহজাত সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের গৃহ-সজ্জায় এবং দেহসজ্জায়। মণিপুরী বাড়িতে নোংরামির লেশমাত্রও নাই। তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণ তকতকে ঝক-ঝকে, গৃহমধ্যে সুন্দর সুন্দর আসবাব এবং মাজা-ঘষা চকচকে তৈজসপত্র যথাস্থানে সযত্নে রক্ষিত। মণিপুরী মাত্রেই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং পরিপাটিরূপে বেশভূষা করিতে ভালবাসে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই নিত্য স্নানান্তে কপালে এবং কপোলে চন্দনের অলকাতিলকা রচনা করে। মণিপুরী মেয়েদের মধ্যে অনেকেই অনবদ্যরূপলাবণ্যসম্পন্না। মাথায় তাহাদের রেশমের মত চিকন ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ। সমর্থত্ব প্রাপ্ত হইবার পরই কুমারীদের মাথার সামনের দিকের চুল ছোট করিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছাঁটিয়া ফেলা হয়। ইহাতে তাহাদের কচি কোমল মুখগুলি বড় সুন্দর দেখায়। মিসেস গ্রিমউড তাঁহার 'My three years in Manipur' নামক পুস্তকে মণিপুরী মেয়েদের রূপলাবণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। মণিপুরী সুন্দরীরা প্রসাধনের জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করে। বর্ণাঢ্য, নয়নাভিরাম বেশভূষা ইহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে শতগুণে বাড়াইয়া তোলে। ইহাদের পুষ্প-প্রীতি এবং বিচিত্র বর্ণের প্রতি অনুরাগও অপরিসীম। তাহারা কানে পরে ফুলের দুল আর খোঁপায় বনফুলের মালা জড়াইয়া রাখে। তাহাদের পরিধেয় ফানেক, জ্যাকেট, উত্তরীয় (ইনাফি) ইত্যাদি সমস্তই রঙিন এবং জমকালো। উৎসবাদি উপলক্ষে মেয়েরা যখন বিচিত্র বসন আর কুসুম-ভূষণে সজ্জিত হইয়া উৎসব-স্থানের একধারে সার বাঁধিয়া বসে, তখন কি যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না।



মণিপুরী কুমারী

বৈষ্ণবধর্ম্মের অফুরন্ত রস-মাধুর্য্য রসপিপাসু কোমলহৃদয় মণিপুরী জাতিকে এতটা প্রভাবিত করিয়াছে যে, রাধাকৃষ্ণের লীলারসাত্মক কীর্ত্তন শুনিয়া অনেক ভক্ত মণিপুরীকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখা যায়। একটা আদিম জাতির মধ্যে এমনই ধরণের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, ভক্তি-প্রাণতা প্রভৃতি সদগুণ কিভাবে বিকাশলাভ করিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাদের এই সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিয়া মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 'সত্তর বৎসর' নামে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার আত্মচরিতের এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "তাহাদের বর্ত্তমান স্বভাব, প্রকৃতি ও রীতি-নীতি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের ভিতরে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব পুরুষ-পরম্পরায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে মহাপ্রভুর "অনর্পিতচরী" উন্নতোজ্জল রসশ্রী ভক্তিলাভে ইহাদের বিশেষ অধিকার

ছিল। রসের অনুশীলন মণিপুরীদের সহজসিদ্ধ। মনে হয় ইহারা চিরদিন, এমনই সহজ সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল।" ('প্রবাসী', আষাঢ়, ১৩৩৪)

বিপিনচন্দ্র অনুমান করেন যে, মণিপুরীরা এক সময় বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, ইমফলের যাকাইরোল (জাগরণ) নামক মণিপুরী মাসিকপত্রের সম্পাদক, স্বনামধন্য ডাঃ লৈরেন সিং নিংথৌজমও এই মত সমর্থন করেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের নিকট বলিয়াছিলেন যে, মণিপুরে এমন অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, যাহা এ দেশের অধিবাসী-দের নিকট শিবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আসলে তাহা বৌদ্ধমূর্ত্তি। হড্‌সন সাহেব কিন্তু মণিপুরে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "There is not a sign of contact with the lofty moral doctrines of Buddhism." এ বিষয়ে রীতিমত গবেষণা করিয়া প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।



মণিপুরীদের নৃত্য-উৎসব

বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবধর্ম্মকে ইহারা সমস্ত অন্তরের সহিতই গ্রহণ করিয়াছে, রাস-পূর্ণিমা, রথযাত্রা, হোলি-উৎসব ইত্যাদি বৈষ্ণবদের সকল পরবই মহাসমারোহে মণিপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের ঘরে বাহিরে অনুষ্ঠিত যাবতীয় উৎসবই মেয়েদের কল্যাণ-হস্তস্পর্শে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে। হোলি-উৎসব সাত দিন ব্যাপিয়া চলে। এই একসপ্তাহকাল ইমফলের রাস্তাঘাটের উপর দিয়া যেন রঙের স্রোত বহিতে থাকে, তরুণ-তরুণীরা রঙের খেলায় একেবারে মাতিয়া উঠে। রথযাত্রার সময় পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও প্রকাশ্য রাজপথের উপর দিয়া রথ টানিয়া লইয়া চলে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরে শৈব এবং শাক্ত হিন্দুধর্ম্মেরও প্রচলন হইয়াছে। ইমফল হইতে লোগতাক হ্রদে যাইবার পথে বিষেণপুর নামক স্থানে সিন্দুরলিপ্ত শিবলিঙ্গ, ভূপ্রোথিত ত্রিশূল ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ইমফল হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী হিয়াং থাং নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ দুর্গামন্দির আছে। মণিপুর রাজ্যে দুর্গোৎ-সবের সময় খুব ধুমধাম হয়; কিন্তু দুর্গাপূজা উপলক্ষে বলিদানের রীতি সেখানে নাই। হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার কুসংস্কার, উৎকট গোঁড়ামি প্রভৃতিও ইহাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, আমরা তো ইহাদের নিকট 'হরিজনে'রই সামিল। মইরাংএ ভ্রমণকালে আমি গোলাপ সিংহ নামক জনৈক মণিপুরী ভদ্রলোকের বাটীতে আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলাম। জাত বাঁচাইবার জন্য বাড়ির লোকেরা গৃহের বাহিরে আমার আহার এবং শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মণিপুরীরা মাংসাহার বর্জ্জন করিয়াছে। মণিপুর রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ। হিন্দুধর্ম্ম সেখানে এতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে, খ্রীষ্টান মিশনারিরা প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও একটিমাত্র মণিপুরীকেও খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু মণিপুরে আদিম ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, 'মাইবা' অর্থাৎ আদিম ধর্ম্মের পুরোহিতগণের আজও সেখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। মণিপুরীদের উপাস্য অসংখ্য লাই বা উপদেবতা আছে এবং তাহারা যে সমস্ত

উপচারে ইহাদের পূজা করে, তাহা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। খাসীয়াদের উ-থ্লেন পূজার ন্যায় ইহাদের মধ্যেও সর্পপূজার প্রচলন আছে। কিন্তু খাসীয়াদের ন্যায় মণিপুরীদের মধ্যে সর্পের প্রীত্যর্থে নরবলিদানপ্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায় না।

মণিপুরীদের সহজ সৌন্দর্য্যবোধ স্মরণাতীত কাল হইতে তাহাদিগকে বিভিন্ন কলাবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আমরা ইহাদিগকে শুধু নৃত্যকলানিপুণ বলিয়াই জানি; কিন্তু সঙ্গীতকলা এবং চিত্রকলায়ও ইহাদের দক্ষতা বড় কম নহে। মণিপুরী মেয়েদের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য অপরিসীম। তাহাদের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শুনিলে কেন যে তাহাদিগকে গন্ধর্ব্বজাতি বলা হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান কালে ক্লাসিকাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত অনেক মণিপুরী স্ত্রীপুরুষ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে পারক হইয়াছে। ইমফলে একজন মণিপুরী ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, রাগ রাগিণী, তাল লয় মাত্রা, শ্রুতি প্রভৃতি সঙ্গীতের উপপত্তিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ। বিজয়াদশমীর দিন রাজপ্রাসাদের নিকট দিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে যাইবার কালে একটি লৈছাবীর (কুমারী) মুখে মালকোষ রাগের বিশুদ্ধ আলাপ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

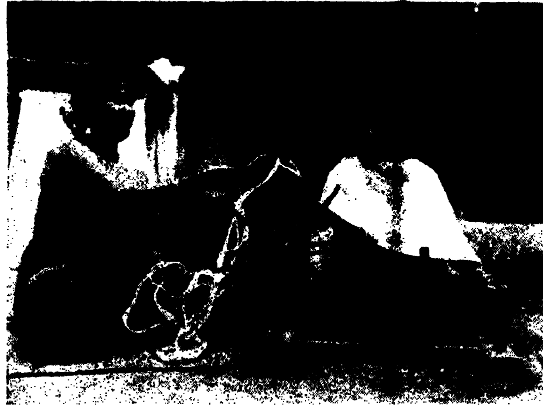
হড্‌সন সাহেবের 'The Meitheis' পুস্তকে ভদ্র সিং নামক জনৈক মণিপুরী শিল্পীর আঁকা খাম্বা ও থইবির কাহিনী সম্পর্কিত যে কয়েকটি ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা উচ্চাঙ্গের অঙ্কন-কুশলতার পরিচায়ক। শিল্পীর নিপুণ তুলিকার টানে, দিগন্তস্পর্শী পাহাড়ের পটভূমিকায় খাম্বা ও থইবির জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী যেন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, মণিপুরীদের একটা নিজস্ব অঙ্কন-পদ্ধতি আছে। নৃত্যোৎসবাদি উপলক্ষে মঞ্চসজ্জায়ও ইহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। মণিপুরীরা সুনিপুণ রূপকার। দারুশিল্প, গজদন্তশিল্প প্রভৃতি কারুকলায়ও ইহাদের নৈপুণ্য আছে। সবচেয়ে সুন্দর ইহাদের নৃত্যকলা। ইহাই এই কলানিপুণ জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বিনিময়ে ইহাদের নিকট হইতে এই অমূল্য রসসম্পদ আমরা পাইয়াছি। ইহার জন্য সভ্যজগৎ অনন্তকাল এই আদিম জাতির নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। কোন্ সুদূর অতীতে যে এই অপূর্ব্ব মনোহর নির্ম্মল নৃত্যকলা তাহাদের মধ্যে প্রথম বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। মণিপুরীরা অনেকে নিজেদের মাতৃভূমি ছাড়িয়া সিলেট এবং কাছাড় জেলা এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরার নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং বাঙালীদের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের অনেক সুন্দর সুন্দর জাতীয় প্রথা, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি বহুকালযাবৎ বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই কলাবিদ্যার সাধনায় প্রবাসী মণিপুরীরা বিমুখ হন নাই বলিয়াই ইহা রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কলারসিকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং সেইজন্যই আজ সমগ্র দেশ জুড়িয়া মণিপুরী নৃত্যের এত জয়জয়কার। প্রায় তিন বৎসরের কাছাকাছি হইল, রবীন্দ্রনাথ কথা-প্রসঙ্গে বর্ত্তমান



মণিপুরী পূজার্থিনী

লেখকের নিকট বলিয়াছিলেন যে, অনেক বৎসর আগে যখন তিনি সিলেটে যান, তখন নাকি উক্ত শহরের অধিবাসিনী মণিপুরী কুমারীদের নাচ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর আগে শিলচরের নিকটবর্ত্তী মাছিমপুর নামক স্থানের মণিপুরী কুমারীদের নৃত্যলীলা দেখিয়া বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর মুগ্ধ বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নটরাজ, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে, মণিপুর নৃত্যের সংযোজন করিয়া দেশবাসীর সমক্ষে ইহাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ প্রভৃতি কলারসিকেরা নানা প্রবন্ধে মণিপুরী নৃত্য এবং মণিপুরী কাওয়ালী তালের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

কুমারী-নৃত্য মণিপুরীদের অনেকগুলি উৎসবেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই সমস্ত নৃত্যোৎসবের বিবরণ ১৩৪১ সনের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে বর্ত্তমান লেখকের "মণিপুরী নৃত্য উৎসবের চিত্র" নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল।



মণিপুরী রমণী চরকা কাটিতেছে

কয়েক মাস আগে মণিপুর হইতে একজন নৃত্যশিক্ষক সিলেটে আসিয়া এখানকার লৈছাবীদিগকে নাচ শিখাইয়াছিলেন। এক পূর্ণিমা-রাত্রে স্থানীয় নাটমণ্ডপে তাহাদের নৃত্য-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, বিরহমিলন, মান-অভিমান ইত্যাদিই ছিল সেই নৃত্যের অবলম্বন।

মণিপুরীরা শুধু যে কলাবিদ্যার চর্চ্চাই করে তাহা নয়, দৈহিক শক্তির অনুশীলনও তাহারা করিয়া থাকে। মণিপুরী পুরুষদের দেহ সুগঠিত, বলিষ্ঠ এবং মাংসপেশীবহুল। পুরুষোচিত ব্যায়াম এবং ক্রীড়াদিতে তাহাদের যথেষ্ট আহ্লাদ। মণিপুরীরা জাত-খেলোয়াড়। অনেকেরই হয়তো জানা নাই যে, পোলো (খাঙ্গাই সা না বা) এবং হকি (থোং খাঙ্গাই) এই দুইটিই মণিপুরীদের নিজস্ব জাতীয় ক্রীড়া। ইমফলস্থ ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই দুইটি ক্রীড়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ সভ্যজগতে এগুলির এত প্রচলন হইয়াছে। মণিপুরীদের থোং খাঙ্গাই অর্থাৎ হকি ক্রীড়ার প্রতি আসক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নগ্ন শিশুদের পর্য্যন্ত মহা উৎসাহে হকি খেলায় রত হইতে দেখা যায়। সময় সময় বিরাট জনতার সমক্ষে ছেলেদের হকি প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে খগেনবার রাজত্বকালে মণিপুরে সুপ্রসিদ্ধ 'খাঙ্গাই সা না বা' অর্থাৎ পোলো খেলার প্রবর্ত্তন হয়। মণিপুরীরা বেঁটে তেজী টাট্টু ঘোড়ার উপর চড়িয়া পোলো খেলে। বিপুল জনতার সমক্ষে মাথায় পাগড়ি-বাঁধা, বলিষ্ঠদেহ মণিপুরীরা পোলো খেলায় রত হইয়া যখন বিচিত্র ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে থাকে, তখনকার দৃশ্যটি অবর্ণনীয়। পোলো খেলায় মণিপুরীরা অপরাজেয়। এই ক্রীড়ায় তাহারা যেরূপ সাহস, নৈপুণ্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা বিস্ময়কর।

বাচ খেলার রেওয়াজ মণিপুরে আজকাল আর ততটা নাই। প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ইমফলে বাচ খেলা দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। ডাঃ ব্রাউনের প্রবন্ধ হইতে এই প্রতিযোগিতার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। "সেপ্টেম্বর মাসে তিন দিন ব্যাপিয়া রাজবাটীর পিছনদিককার খাতে বাচ খেলা হয়। মণিপুরে অনুষ্ঠিত যাবতীয় উৎসবের মধ্যে ইহাতেই সবচেয়ে বেশি ধুমধাম হয়। খাতের উভয়তীরে দর্শকদের উপবেশনের জন্য অনেকগুলি মঞ্চ তৈয়ার করা হয়। তন্মধ্যে রাজার জন্য যেটি নির্ম্মিত হয়, তাহা অত্যুচ্চ এবং বিশালায়তন। দৌড়ের নৌকাগুলি আস্ত এক একটি গাছ কুঁদিয়া তৈয়ারি। দুইটি নৌকায় বিশিষ্ট জাঁকালো পোষাকে সজ্জিত প্রায়

সত্তর জন লোক দাঁড় হাতে করিয়া বসে। এক ব্যক্তি নৌকার গলুইএর উপর একটি দাঁড়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং ডান পা দিয়া নৌকার উপর ঘন ঘন প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া প্রতিযোগীদের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে থাকে। উৎসবের শেষ দিনে রাজা স্বয়ং তাঁহার নৌকায় হাল ধরিয়া প্রতিযোগীদের অনুগমন করেন। তাঁহার নৌকার অগ্রভাগে একটি হরিণের মাথা খোদাই করা এবং সেটির শিং সুবর্ণপাতে মণ্ডিত।"

বাচ খেলার পরই উল্লেখ করিতে হয় লামচেল বা দৌড় প্রতিযোগিতার কথা। ডাঃ ব্রাউন তাঁহার প্রবন্ধে ইহাও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতিযোগীদিগকে আন্দাজ আধ মাইল রাস্তা দৌড়াইতে হয়। এই প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হয়, তাহাকে সারা-জীবনের জন্য রাজসরকারে বাধ্যতামূলক শ্রম (লালুপ) হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। রাজা রাজপথের উপর নির্ম্মিত একটি তোরণের নীচে বসিয়া প্রতিযোগিতার দৃশ্য অবলোকন করেন।

মণিপুরীরা আবার ওস্তাদ কুস্তিগীরও। কুস্তির সময় বহ্বাস্ফোট ইত্যাদিও খুবই হয়।

মণিপুরী মেয়েরাও দৈহিক শক্তির সাধনায় পশ্চাৎপদ নহে। পরিপুষ্ট, নিটোল, সুগৌর দেহ তাহাদের স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। 'খাং জিং সানাবা' নামক একটি ক্রীড়ায় মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে। মিঃ হড্‌সন মণিপুরীদের সম্বন্ধে লেখা তাঁহার পুস্তকে এই ক্রীড়ার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক। চন্দ্রালোকিত রাত্রে স্বচ্ছ সুনীল উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়। একটা লম্বা কাঁচা বাঁশের এক দিকে ধরে অন্ততপক্ষে বারো জন পুরুষ এবং উক্ত সংখ্যক মেয়েরা ধরে সেটির অন্য দিকে। তারপর এক দল অন্য দলের হাত হইতে বাঁশটি ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি সুরু করে।



মণিপুরী রমণী তাঁত বুনিতেছে

মণিপুরী মেয়েরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। মইরাংএর মণিপুরী মেয়েদিগকে নৌকা বাওয়া, জাল দিয়া মাছ ধরা, ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম করা ইত্যাদি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। এমন মণিপুরী বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যেখানে চরকা বা তাঁত নাই। মণি-পুরী বস্তিতে বেড়াইতে গেলে দেখা যায়, বিরাট নাটমণ্ডপের মধ্যে সারি সারি তাঁত বসানো রহিয়াছে আর বিবাহিতা অবিবাহিতা সকল শ্রেণীর মেয়েরা নিজ নিজ জায়গায় বসিয়া ক্ষিপ্র-হস্তে কাপড়, গামছা ইত্যাদি বুনিতেছে।

মইরাংএ অবস্থানকালে একটি বিবাহ-উৎসবে আমি যোগদান করিয়াছিলাম। সেই সুন্দর উৎসবটির স্মৃতি এ জীবনে ভুলিবার নহে। সেদিন ছিল শারদ-পূর্ণিমার রাত্রি। মইরাংএর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরে বসিয়া জনকতক মণিপুরী ছেলে-ছোকরার সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় দেখি, একটি শোভাযাত্রা মেঠো পথ ধরিয়া ভিন গাঁয়ের দিকে চলিয়াছে, পুরোভাগে বিচিত্রবেশা রূপসী তরুণীরা চলিয়াছে কতকগুলি বেতের ঝাঁপি মাথায় লইয়া। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, বরকে সঙ্গে লইয়া বরযাত্রীদল কনের বাড়িতে রওনা হইয়াছে। আমি কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

শরৎকালের কুন্দশুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথিনী, পথের উভয় পার্শ্বে সুদূর-প্রসারী তৃণক্ষেত্রের মাথায় প্রস্ফুটিত থোকা থোকা অজস্র সাদা ফুলগুলি যেন জমাট-বাঁধা জ্যোৎস্নার টুকরা। উত্তর দিকে দিগন্ত-লীন পাহাড়টি যেন সুদূরের স্বপ্ন-মাখানো।

রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে মাচার উপর তৈয়ারি কুকিদের সারি সারি বাড়িঘর। দাওয়ায় উলঙ্গপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ জ্বলন্ত আগুনের চারিপাশে মণ্ডলাকারে বসিয়া শুকরের মাংস ঝলসাইয়া খাইতেছে।

কত দূরবিসর্পিত জনবিরল প্রান্তর আর গহন অরণ্যাণী পার হইয়া অবশেষে আমরা গভীর রাত্রিতে বন-নিবিড় এক বস্তিতে কনের বাড়িতে আসিয়া পৌছিলাম। আঙিনায় এক মনোরম কদলীকুঞ্জের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি জ্বলন্ত মশাল মাটিতে পোঁতা। বর কুঞ্জে প্রবেশ করিবামাত্র একটি এয়োস্ত্রী তাহার মাথায় এক-রাশ সুগন্ধি ফুল ছড়াইয়া দিল। বর তারপর নাট-মণ্ডপে গিয়া একটি প্রকাণ্ড দর্পণের সম্মুখে বসিল। এক ধারে মাথায় পাগড়ি, আদুড়-গা আন্দাজ ত্রিশ-চল্লিশজন পুরুষ অর্দ্ধবৃত্তাকারে বসিয়া খোল-করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন গাহিতেছে, মাঝে মাঝে গান থামাইয়া তাহারা উচ্চকণ্ঠে হর্ষধ্বনিও করিতেছে। আসর জমজম করিতেছে।



মণিপুরী রমণী কাপড় বুনিতেছে

একটু বাদে দুই-তিনজন বয়স্ক লোক বরকে সঙ্গে করিয়া কন্যাপক্ষের পূজনীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। বর মাটিতে লুটাইয়া প্রত্যেককেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছে; আর প্রণম্য ব্যক্তিরা মাথায় ফুল দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বিবাহের লগ্নের পূর্ব্বক্ষণে বর ঘরের এক পাশে একটি জলচৌকির উপর আসন গ্রহণ করিল। নীচে মেঝের উপর শান্তিজল ইত্যাদি লইয়া পুরোহিত বসিয়া আছেন। একটি বিবাহিতা মহিলা কনেকে সঙ্গে করিয়া বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করিল। বস্ত্রালঙ্কারের ছটায় কনে ঝলমল করিতেছে। পরণে তাহার ময়ূরকণ্ঠি রঙের মখমলী পলয়।* গায়ে ঘন সবুজ সাটিনে তৈয়ারি সোনালী-রূপালী চুমকি-বসানো জ্যাকেট। মাথায় নকল মুক্তার ঝালর-দোলানো সুন্দর মুকুট। সর্ব্বাঙ্গ তাহার বিবিধ স্বর্ণ এবং রজত আভরণে ভূষিত।

পুরোহিতের নির্দ্দেশে কনে বরের পায়ের নীচে বসিল। সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা তালে তালে মন্দিরা বাজাইয়া গান ধরিল। পুরোহিত বরের চাদর দিয়া বরকনের হাতে রাখী বাঁধিলেন। তাহাদের বদ্ধপাণির উপর একটি সরায় কিছু কদলী রাখা হইল। পুরোহিত আরম্ভ করিলেন মন্ত্রপাঠ; আর সকলে সরার উপর নানা সওগাৎ, টাকাপয়সা ইত্যাদি রাখিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের হাতের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইলে কনে একটা বেতের সাজিতে ফুল লইয়া বরের মাথায় ও পায়ে সুবলিত হস্তে অঞ্জলি দিতে দিতে মন্থরপদক্ষেপে সপ্তপ্রদক্ষিণ সুরু করিল।

মালাবদলের পালা চুকিলে পর বরকন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল। সকলে বারান্দায় পাত পাড়িয়া বসিলে বর স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিল। তার-পর ঘরের ভিতরে একটা মাদুর পাতিয়া বরকন্যা তাহাতে পাশাপাশি বসিল এবং একে অপরকে সন্দেশ ও পান-সুপারি খাওয়াইয়া দিল। বিবাহসংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাধা হইলে পর কনেকে একটি ডুলিতে করিয়া বরযাত্রীদল নিজেদের গৃহাভিমুখে রওনা হইল। ফিরিবার পথে শুনিলাম যে, ছয় দিন পরে এই বিবাহ উপলক্ষে কনের বাড়িতে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইবে।

মইরাং মণিপুরের একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান।

* এক প্রকার ঘাঘরাবিশেষ।

সেখানে বিশাল রাজপুরী এখনও বর্ত্তমান। এই স্থানের সঙ্গে রাজকুমারী থইবি আর তাঁহার প্রেমাস্পদ খাম্বার বিষাদমাখা কাহিনী বিজড়িত। ইঁহারা উভয়েই ছিলেন মইরাংএরই অধিবাসী। এখানকার থাং জিংএর মন্দিরে খাম্বা এবং থইবির পোষাক-পরিচ্ছদ আজও সযত্নে রক্ষিত। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক ধারে দুইটি প্রকাণ্ড শিলাপট্ট পড়িয়া রহিয়াছে। অমিতবলশালী খাম্বা নাকি একটা ষাঁড় এবং একটা বাঘকে এই দুইটি শিলাখণ্ডে বাঁধিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। খাম্বা ও থইবির প্রণয়-কাহিনী মণিপুরে সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। মণিপুরের চারণদল আজও গ্রামে গ্রামে 'পেনা' নামক বাদ্যযন্ত্র সংযোগে ইঁহাদের সকরুণ বিয়োগান্ত প্রণয়কাহিনী গাহিয়া গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। থইবি ছিলেন মইরাংএর অলোকসুন্দরী রাজকন্যা প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তেজোদৃপ্ত বিক্রান্তমূর্ত্তি খাম্বাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। খাম্বাও রাজকুমারীর প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। এই প্রেমের জন্য তাহাদের অদৃষ্টে লাঞ্ছনা জুটিল অপরিসীম। প্রতিদ্বন্দ্বী কঙ্গিয়াম্বা সুরু করিলেন খাম্বার সঙ্গে ঘোর শত্রুতাচরণ, যুবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া খাম্বাকে হস্তীপদতলে নিষ্পিষ্ট করিবার হুকুম দিলেন। সকল অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খাম্বা প্রিয়তমাকে লাভ করিলেন। কিন্তু মিলনের আনন্দ বেশিদিন তাঁহাদের অদৃষ্টে সহিল না। দুইটি জীবনেরই অকালে হইল শোচনীয় অবসান।



মণিপুরী ব্রাহ্মণ

মইরাংএ গেলে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্রভেদী বিরাট মহিমা উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ে গর্ব্ব অনুভব হয়। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নির্জ্জন বন-প্রান্তরে ঘনাইয়া আসে, মইরাংএর দেবমন্দির তখন শঙ্খঘণ্টার আরাবে মুখরিত হইয়া উঠে, দলে দলে মণিপুরী স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া জমায়েৎ হয়, খোল-করতালের শব্দে কানে তালা লাগিয়া যায়, আর মেয়েরা সুললিত কণ্ঠে বাংলা কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আরম্ভ করে মন্দির-প্রদক্ষিণ। শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্ম্মের শুভ্রোজ্জ্বল রশ্মিরাজি কেমন করিয়া যে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা পার হইয়া সভ্যজগতের সংস্রব হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন আসামের এই অনার্য্য-অধ্যুষিত নিভৃততম উপত্যকাভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করিল, কেমন করিয়া যে বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার কীর্ত্তন এখানে এতটা প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা ভাবিলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। *

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি লেখক এবং তাঁহার মণিপুরী বন্ধু পারিজাত সিংহ কর্ত্তৃক গৃহীত।

সাহিত্য ও সমাজ

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন সমাজ

শ্রীসুশীলকুমার বসু

সাহিত্যই প্রকৃতপক্ষে জাতির সুসম্পূর্ণ এবং নিখুঁত ইতিহাস। ঘটনার বিবরণকেই আমরা সাধারণত ইতিহাসের পর্য্যায়ভুক্ত করি বটে, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সকল শক্তির নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয়তা ঘটনাসমূহকে সম্ভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, শত সহস্র লোকের প্রতিদিনের জীবনের যে সকল শান্ত নিরীহ কাহিনী একদিন ইতিহাসের বিপুল রঙ্গমঞ্চে বিরাট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়, প্রতিকূল অবস্থার সহিত যে অলক্ষিত নিরন্তর সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব ও অসন্তোষের যে সকল ঘাত-প্রতিঘাত যুগান্তকারী আবর্ত্তনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, সাহিত্যে তাহারই চিত্র অঙ্কিত থাকে বলিয়া সাহিত্যকেই প্রকৃতপক্ষে জাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা যাইতে পারে। সাহিত্যে যদি জাতির সমগ্র জীবনধারা প্রতিফলিত না হয়, তাহা হইলে সাহিত্যকে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং এই অসম্পূর্ণতা সমসাময়িক সাহিত্যিকদের অক্ষমতার ও দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিবে।

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে এই প্রশ্নটা প্রথমেই আমাদের মনে উদিত হইবে যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র, আমাদের জীবনের সর্ব্ববিধ প্রশ্ন ও সমস্যা, আমাদের বহুমুখী চেষ্টা ও দ্বন্দ্ব, আমাদের দেশের বিশেষ আবেষ্টনের মধ্যে মানবজীবনের বিশিষ্ট রূপ সমগ্রভাবে আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে কি না। আধুনিক সাহিত্যকে এই মাপকাঠি দিয়া বিচার করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে এই দিক দিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা অধিকতর প্রাসঙ্গিক হইবে।

প্রাচীন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই ইহার দৈন্য ও অসম্পূর্ণতা চোখে পড়িবে এবং এই সময়ের সমাজের ইতিহাস সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় নাই বলিয়াই বিশ্বাস জন্মিবে। সমাজের মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান যদি নিহিত থাকে, অথচ সাহিত্যসৃষ্টি না হইয়া থাকে, অথবা সমাজের সমগ্র রূপটি সাহিত্যের মধ্যে ধরা না পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা জাতির সৃষ্টি-প্রতিভার অভাব ও মানসিক দৈন্যই সূচিত হয়। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে জাতির তৎকালীন অক্ষমতা ও অকৃতিত্বের প্রমাণ নিহিত আছে অথবা সামাজিক প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফলে এই দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয়ের জন্য এই সময়ের সামাজিক অবস্থার কথা বিশেষ-ভাবে বিচার্য্য। সমাজ যদি এতটা অসাড় ও নির্জ্জীব থাকিয়া থাকে, যেখানে কেহ কোন নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করে না, যেখানে সুনির্দ্দিষ্ট রাস্তায় কলের মত চলিতে মানুষ অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, সাহিত্যও তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় না। ইংরেজের আগমনের পূর্ব্বে অনেক দিন ধরিয়া আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যে শোচনীয় দুর্গতির যুগ গিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই আমাদের সাহিত্যিক অযোগ্যতার কারণ বিদ্যমান ছিল। ইহা আমাদের মানসিক দৈন্য বা সাহিত্যিক অক্ষমতার পরিচায়ক নহে।

বহুপ্রাচীন কালে বিবর্ত্তিত বহুবিধ বিধিনিষেধের নিগড়-বাঁধা গতিহীন, প্রাণহীন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইতেছিল। অনেক দিন ধরিয়া আধুনিক যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা কোন নূতন পথে যাত্রা করি নাই, কোন বিপদ হইতে জাতিগতভাবে আত্মরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ হই নাই, কোন সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হই নাই এবং এক ধর্ম্মোন্মাদনা ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ আদর্শ আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে নাই বা কোন নূতন কর্ম্মপ্রেরণা আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলে নাই। এক কথায়, আবর্ত্তহীন, বৈচিত্র্যহীন, অপরিচিত পথের ভয়ভাবনাহীন, শান্ত, নিরীহ, ক্ষীণ ধারায় অতিপুরাতন সংকীর্ণ খাদে আমাদের জীবনস্রোত একটানা প্রবাহিত হইয়াছে। বিপদ ছিল না এমন নহে, বরং গুরুতর বিপদের মধ্য দিয়া আমাদের জীবন অতিক্রান্ত হইয়াছে, বহু সমস্যা জাতির অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত বারবার বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, রাষ্ট্রের ও অর্থনীতিক কাঠামোর চাকা বারবার ঘুরিয়া গিয়াছে—এ সকল কথা সত্য। কিন্তু এ সকলকে ভাগ্যের দান বলিয়া আমরা বিনা প্রতিবাদে নতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছি, তিলে তিলে ইহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমাদের বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রবিহীন জীবনে ইহা কেন্দ্রীভূত আঘাতও করিতে পারে নাই—তরঙ্গও তুলিতে পারে নাই। আমাদের সামাজিক সংহতি যদি দৃঢ়তর থাকিত, এক স্থানে প্রাপ্ত আঘাত তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইত, তাহা হইলে এই সকল আঘাতের ফলে গতি সৃজিত হইত এবং তাহাতে জাতির দেহ ও মনে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইত। কিন্তু আমাদের বিচ্ছিন্ন জীবনে এই সকল আঘাত ঐশ্বর্য্য-সৃষ্টির পরিবর্ত্তে জীবনের পরিধিকেই সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কোন বৃহৎ প্রচেষ্টা, কোন মহৎ সংকল্প, কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন, অজানাকে জানিবার কোন দুঃসাহসিক আহ্বান আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে আন্দোলিত করে নাই। ধরাবাঁধা রাস্তার বাহিরে জীবনের বিকাশের কোন অবকাশ ছিল না, অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজের ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিবার জন্য পৌরুষ প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল না, মানুষের গভীরতর চিত্তের উদ্বোধনের কোন আয়োজন ছিল না—মানুষ ভাগ্যের ও পারিপার্শ্বিকের হাতে অসহায় ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজের নিম্নস্তরে রোগ শোক দৈন্যে ভুগিয়া কোন প্রকারে স্বল্পপরিসর জীবনটা লোকে কাটাইয়া দিত। জীবিকার্জ্জন, বিবাহ, ভাগ্যগঠন প্রভৃতি কোন ব্যাপারেই যে মানুষের কোন হাত থাকিতে পারে, এমন বিশ্বাস লোকের ছিল না; কাজেই সেজন্য কোন ইচ্ছা বা উদ্যমও ছিল না। অভাব দুঃখ ছিল, কিন্তু বেদনা ও অনুভূতি ছিল না—সম্মুখে প্রতিকারের আশ্বাস ছিল না, আশাও ছিল না। সমাজের উচ্চস্তরের অবস্থাও এমন বিশেষ কিছু ভাল ছিল না। সমাজের বিধিবিধান এমন ছিল, সমগ্র দেশের অর্থনীতিক কাঠামোর এতটুকু দৃঢ়তা ছিল, যাহাতে জীবন-সংগ্রামের উৎকট দুরূহতা ছিল না। অভাব ও দুঃখ ছিল, কিন্তু তাহার অনুভূতি ছিল না বলিয়া সংগ্রাম ছিল না—প্রতিকারের জন্য প্রচেষ্টার পরিবর্ত্তে ছিল বড়লোকের তোষামোদ এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা। দাবা পাশা পরনিন্দা ও গ্রাম্য রাজনীতি এবং ভালর দিকে ছড়া যাত্রাগান আসর বৈঠক প্রভৃতির বাহিরে আমাদের সামাজিক জীবনের কোন প্রসার ছিল না। এদিকে সমাজ এমন শাস্ত্র ও পৌরোহিত্য জর্জ্জরিত ছিল, বয়োজ্যেষ্ঠদিগের ইচ্ছা ও মতকে

সম্মান করিবার এমন কঠোর বিধি ছিল এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারে গোষ্ঠীপতিদের এমন অবিশ্বাস্য প্রভাব ছিল যে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের সামান্য সুযোগও ছিল না। এই সকল গোষ্ঠীপতি ও প্রধান ব্যক্তিদের মতামত আবার প্রভাবিত বা গঠিত হইত গ্রামের অথবা নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের একজন বা দুইজন ধনী ব্যক্তির মতের দ্বারা। ইঁহারা সাধারণত জমিদারশ্রেণীর লোক হইতেন, দৃষ্টির প্রসারতা বা মতের ঔদার্য্যের ধার ইঁহারা ধারিতেন না এবং নিজেদের অনিয়ন্ত্রিত খেয়ালখুশিমত চলিতেন। এই সকল লোকের অনেক বদান্যতার ও সমাজ-হিতৈষণার পরিচয় আমরা প্রাচীনকালের রাস্তা মন্দির অতিথিশালা পুষ্করিণী প্রভৃতির মধ্যে পাই বটে, তাঁহাদের অনেক অত্যাশ্চর্য্য দানের কথা, ধর্ম্মপ্রাণতার কথা শুনিয়া থাকি বটে, কিন্তু ইহা তাঁহাদের মতের ঔদার্য্যের বা ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় নহে। সচেতন সমাজপ্রীতি অথবা জীবন্ত প্রেরণা অপেক্ষা অন্ধ ধর্ম্মানুগত্য ও যশোলিপ্সাই অধিকতর পরিমাণে ইহার মূলে থাকিত। ইঁহাদেরই খুশি খেয়াল ও মতের চাপ সামাজিক-যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তিতায় সমাজের অধিকাংশ লোকের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিয়া দিত। কাজেই এ কথা অনেকটা নিরাপদে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের সমাজে এই সময় সাহিত্যিক উপাদান অতি সামান্যই ছিল, এবং এই স্বাভাবিক কারণেই কোন সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই।

সাহিত্যের উপাদানের পক্ষে যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, আমাদের সমাজে এই সময়ে তাহারও কোন অস্তিত্ব ছিল না। যৌন-সমস্যাই মানুষের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা, ইহারই ঘাত-প্রতিঘাত ও বৈচিত্র্য হইতে সাহিত্যের রসের মালমশলা সংগৃহীত হয়। সমাজের তৎকালীন অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্র যে অতিশয় সংকীর্ণ ছিল তাহা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে, স্ত্রীপুরুষের মিলনের ব্যাপারে এই ক্ষেত্র সংকীর্ণতম ছিল। বর্ত্তমানে আমাদের সামাজিক জীবনে অনেকখানি গতি সঞ্চারিত হইয়াছে, এবং এই গতির স্পন্দন আমাদের নারী-সমাজেকেও আন্দোলিত করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমাদের নারীরা এখনও আমাদের কর্ম্মজীবনের, সমাজ-জীবনের অংশ হইয়া উঠিতে পারেন নাই—এই সময়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ নেপথ্যেই ছিলেন। পুরুষের জীবনে যদিও সামান্য স্বাধীনতার সুযোগ থাকিয়া থাকে, মেয়েদের জীবনের চতুর্দ্দিকে ছিদ্রহীন বেষ্টনী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই মানুষের দাম্পত্য-জীবনে কোন দ্বন্দ্ব কোন জটিলতা, কোন সমস্যার স্থান ছিল না। মানুষের জীবনের রসের সর্ব্বপ্রধান উৎসমুখ এই ভাবে গুরুভার পাষাণচাপে অবরুদ্ধ ছিল।

এই সকল কারণে আমাদের সমাজ-জীবনকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিত না এবং এই সকল কারণেই আমাদের সমাজ-জীবনে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত হয় নাই। এই সময় যে আমাদের সমাজ-জীবনকে কেন্দ্র ও অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচিত হয় নাই, তাহার মধ্যেও, সেই শূন্যতার মধ্যেও আমাদের এই সময়ের সমাজচিত্রই প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। সমাজের মধ্যে যদি গতি ও প্রাণশক্তি থাকিত, যদি সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোড়ন মানুষের গভীর সত্তাকে জাগ্রত করিতে পারিত, তাহা হইলে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা সৃজিত হইত এবং সেই গতিশীল সমাজের ইতিহাস সাহিত্যের মধ্যে রূপ পাইত। কিন্তু

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল ক্ষেত্র ছিল, সাহিত্যের প্রচুর উপাদান সমাজের মধ্যে সঞ্চিত ছিল এবং তাহা সত্ত্বেও সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই বা তাহারা সাহিত্যে স্থান পায় নাই, তাহা হইলে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তৎকালিক সমাজে সাহিত্যিক প্রতিভার, সৃজনী শক্তির ও শিল্পীজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির নিতান্ত অভাব ছিল—জাতির নিতান্ত শোচনীয় মানসিক দৈন্য ছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই ইহা দেখানো হইয়াছে যে, প্রাচীন যুগে আমাদের সাহিত্যিক শূন্যতা আমাদের মানসিক দৈন্যের প্রমাণ নহে, ইহা সমাজের এই সময়ের গতিহীন নিশ্চল অবস্থার পরিচয় মাত্র।

যদি এই সময় আমরা সমগ্র জগৎ হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকিতাম, এবং নিজেরাও আবার যোগাযোগহীন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া ছোট ছোট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া না পড়িতাম, তবে আমাদের সাহিত্যের ও তাহার প্রভাবে আমাদের সমাজের ইতিহাস অন্য প্রকার হইতে পারিত, এবং সাহিত্য আবার তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইত।

মানুষের মনের একমাত্র মুক্তি ছিল ধর্ম্মের ক্ষেত্রে। প্রাত্যহিক সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করিয়া একমাত্র ধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদের ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনের মধ্যে মুক্তিলাভ করিত। এইজন্য প্রাক-আধুনিক যুগে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের যে প্লাবন এই সময় দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা দেশের ভাবকেন্দ্রকে, হৃদয়াবেগকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। ইহা আমাদের মনে যে প্রেমের ক্ষুধা, ভাবের আতিশয্য সৃষ্টি করে, বৈষ্ণবকবিতার অনুপম রসসৃষ্টির মধ্যে তাহাই রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, ভগবৎপ্রেম মানবপ্রেমের মহিমান্বিত রূপ পাইয়াছে। এই ভাবের আঘাত আমাদের মনে যে প্রসারতা ও চাঞ্চল্য আনয়ন করে, তাহা শুধু ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে না, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকেও তাহা প্রভাবিত করে এবং নরনারীর সম্পর্ককেও তাহা মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলে। তবে মাটির মায়াকে, রক্তমাংসের মানুষের আকর্ষণকে হয়তো ইহা মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মের বাহিরে আসিয়া ইহাকে স্বীকার করিবার সাহস সমাজে সঞ্চরিত হয় নাই। বৈষ্ণবকবিতার মধ্যেও মানবপ্রেমের এই মধুরতম অনুভূতি, অনুপম মাধুর্য্য, নরনারীর প্রেমের এই আলোছায়া, মান-অপমান ভগবৎপ্রেমের ছায়ায় আত্মগোপন করিয়া আছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতকেও অবশ্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ইহার কাব্যরস প্রাচীন বাঙালী-সমাজের রসপিপাসাকে তৃপ্ত করিয়া আসিয়াছে, এখনও করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত সৃষ্টির মধ্যেও ধর্ম্মের প্রেরণাই কাজ করিয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের উপর ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে হিন্দুদের যে ভক্তি ছিল, তাহাই এই মহাকাব্য দুইখানিকে এত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল, ধর্ম্মপুস্তক হিসাবেই লোকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। এখানেও মানবীয় ভাব ও গুণ সমূহ যে সকল চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, মানুষের স্নেহ প্রেম ভক্তি, তাহার বীরত্ব মহত্ত্ব ও ত্যাগ যে সকল চরিত্রে রূপায়িত হইয়াছে, তাঁহারাও হয় দেবতা বা দেবতাস্থানীয় অতিমানুষ। এই সকলের

পরোক্ষ প্রভাব হয়তো সেদিনের মানব-জীবনকে প্রসারিত করিয়াছে, মানুষ ও মানুষের সম্পর্ককে মধুর করিয়াছে, জীবনের শুষ্কতার মধ্যে রসের সঞ্চার করিয়াছে, জীবনকে উন্নততর ও মহত্তর করিয়াছে, তবুও ইহা যে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কথা, তাহা জনসমাজে স্বীকৃত হয় নাই। সামাজিক জীবনে এই সকল আদর্শকে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ থাকিলে তাহার ফলে সমাজদেহে নূতন প্রাণশক্তির সৃষ্টি হইত, এবং তাহাই আবার নূতন নূতন সাহিত্যের জন্মদান করিত।

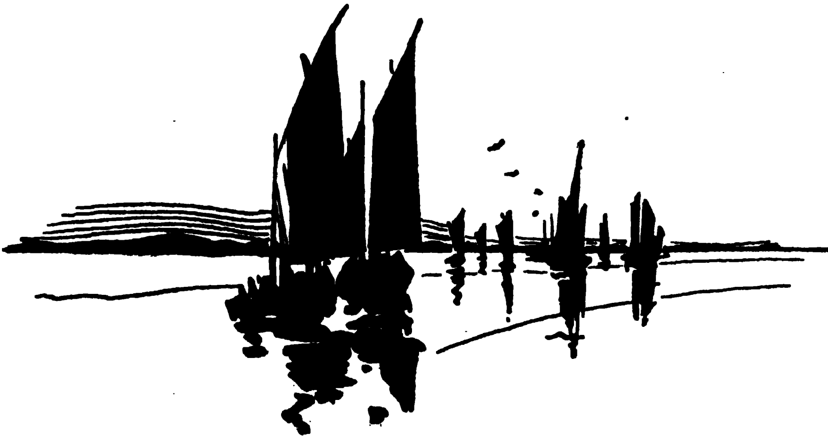
প্রাচীন সাহিত্যের বিচার-প্রসঙ্গে নানা দেবতা-উপদেবতার উদ্দেশে রচিত পুথি, কাহিনী এবং স্তবস্তুতি প্রভৃতির কথাও আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাও ধর্ম্মসাহিত্যের লৌকিক স্তর, এবং এই সময়ের সামাজিক আওতাতেই ইহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মানুষের দুঃখ-বিপদ ছিল, অভাব-অভিযোগ ছিল, ঐশ্বর্য্যনাশের ভয় ছিল, আধি-ব্যাধি মৃত্যুভয় ছিল এবং এ সকল শঙ্কা ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা ছিল। অথচ মানবীয় চেষ্টার দ্বারা এই ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তুলিবার কোন সুগম পথ ছিল না—মানুষের চেষ্টার দ্বারা এ সকল ব্যাপারে কোন সুফল ফলিতে পারে, মানুষের মনে সেদিন সে ভরসাও জাগে নাই। কাজেই মানুষের এই ইচ্ছা সাফল্যের সহজ উপায় অনুসন্ধান করিয়াছে, দৈব অনুগ্রহের মধ্যে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে অসংখ্য অলৌকিক কাহিনী। ইহারাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটা ছায়াচ্ছন্ন স্তর অধিকার করিয়া আছে। এই সময় মানুষ যে কতটা অসহায় ছিল, ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক ছিল, মানুষের উদ্যম ও শক্তি কতটা নিশ্চেষ্ট ও নিদ্রিত ছিল, এই সকল কাহিনীর মধ্যে তাহারই ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

এই যুগের গদ্য-সাহিত্যের অভাবের মধ্যেও সাহিত্যের উপর সমাজের প্রভাব সূচিত হয়। এই যুগে বাংলা গদ্যের অভাবকে কতকটা আকস্মিক বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যে ভাষা কাশীরাম দাসের মহাভারতে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কৃত্রিম আড়ষ্ট বা অপ্রচলিত ভাষা নহে। প্রয়োজন হইলে সহজেই তাহা গদ্যে ব্যবহৃত হইতে পারিত। অথচ গদ্য-সাহিত্যের যে সৃষ্টি হয় নাই, তাহা যে আধুনিক যুগের প্রারম্ভে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, তাহা কোন আকস্মিকতার জন্য নহে বা সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অকর্ম্মণ্যতার ফলে নহে। চিন্তার অপরিহার্য্য বাহনস্বরূপেই গদ্য-রচনার ব্যবহার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। হৃদয়াবেগ কবিতার মধ্যেই যথাযথভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—কাহিনী প্রভৃতির জন্যও কবিতা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে যদি চিন্তার স্থান থাকে, যদি ধরাবাঁধা রুটিনের বাহিরে কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়, স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির আলোকে যাত্রাপথ দেখিয়া লইতে হয়, যদি লোককে নিজের কথা শুনাইবার প্রয়োজন হয়, যদি অপরের কথা শুনিবার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে গদ্যের বর্জ্জন কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। আমাদের সমাজে এই প্রয়োজন ছিল না, তাই গদ্যকে বাদ দিয়াও আমাদের সেদিনের জীবনযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়াছে, সাহিত্যে গদ্যের স্থান হয় নাই।

কিন্তু একটা প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে যে, এই অন্ধকার যুগে সংকীর্ণতা ও বদ্ধতার মধ্যে

মানুষের স্বাধীন বিকাশ প্রতিহত হইয়াছে, তাহার প্রাণের স্পন্দন ও অগ্রগমনের চাঞ্চল্যের শ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারও অন্তরালে উপরের কাঠিন্যের অভ্যন্তরে তারল্যের ক্ষীণ ধারাও কি প্রবাহিত হয় নাই, মানুষ কি কোন আনন্দেরই স্বাদ পায় নাই, কোথাও কি কোন অপূর্ণ বাসনা, কোন দুরাকাঙ্ক্ষা মাথা তুলিতে চাহে নাই—মানুষের অনুভূতি, তাহার ব্যথাবোধ কি সম্পূর্ণভাবে স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল ? না, কখনই সম্পূর্ণভাবে তাহা যায় নাই এবং সাহিত্যেও যে তাহা স্থান পাইয়াছিল, পল্লী-অঞ্চলে উচ্চাঙ্গের যে গীতিকাব্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যেই সে প্রমাণ নিহিত আছে। যেদিন মানুষের এই সব অনুভূতি মঞ্চের সম্মুখভাগে ছিল না—যবনিকার অন্তরালে ছিল তাহাদের প্রকাশ, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাহারা তাই প্রবেশ করিয়াছিল পশ্চাৎদ্বার দিয়া। ছড়া এবং কবি ও যাত্রাগানও ইহারই অঙ্গীভূত ছিল। আমাদের সামাজিক জীবনে যেটুকু স্বাধীনতা, প্রাণের যতটুকু স্পন্দন বিদ্যমান ছিল, তাহা লজ্জার ও দুর্ব্বলতার বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হইত এবং উচ্চ সাহিত্যসৃষ্টির কার্য্যে ইহাদের নিয়োগের পক্ষে তাহাই বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার ঐশ্বর্য্য ও দৈন্যের মধ্যে, ইহার প্রাচুর্য্য ও শূন্যতার মধ্যে আমাদের প্রাচীন সমাজের সমগ্র রূপটি প্রতিফলিত রহিয়াছে। ইহাও দেখা যাইবে যে, ইহার দৈন্য ও শূন্যতা সমাজের তৎকালের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতার ফল নহে; সমগ্র সমাজ-দেহকে যে দুর্ব্বলতা পঙ্গু ও ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সাহিত্যিক বন্ধ্যাত্বের তাহাই একমাত্র ও প্রধান কারণ। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের আলোচনা করিলেও সাহিত্যের উপর সমাজের এই প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। এই প্রকার আলোচনায় যদি দেখা যায় যে, আমাদের আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক সমাজের সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে নাই, তাহা হইলে তাহাকে আধুনিক সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অক্ষমতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে—সাহিত্যকে অসম্পূর্ণ মনে করিতে হইবে, এবং চিন্তাশীল লেখকদিগকে এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিয়া এই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।





আধুনিক বাংলা গল্প—শ্রীপ্রমেন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত

[প্রগতি সাহিত্য ভবন, ২০+৩৩৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲]

আধুনিক বাংলা গল্পের এখন পর্য্যন্ত যতগুলি সঙ্কলন বাহির হইয়াছে, আয়তনের দিক দিয়া এইটিই বৃহত্তম এবং এই সঙ্কলন-গ্রন্থের আষ্টেপৃষ্ঠে যত্ন ও অর্থব্যয়ের ছাপ সুপরিস্ফুট। সঙ্কলনকর্ত্তা প্রেমেন্দ্র বিশ্বাসের রুচি ও বিশেষ একধরণের রসবোধ আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; পাঁচজনের পরামর্শমত অথবা হঠাৎ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে কিছু করিয়া বসেন নাই, ভূমিকা ও গল্পসংগ্রহগুলি একটু নজর দিয়া পড়িলে, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার দাম্ভিক ও ট্র্যাজেডিপ্রবণ মন তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল বলিয়া এই সংগ্রহটি এক-দেশদর্শী হইয়াছে, আধুনিক বাংলা গল্পের বহু বিচিত্র বিকাশ তাঁহার গোচরে আসে নাই, অথবা গোচরে আসিলেও তিনি অনেক বৈচিত্র্য উপেক্ষা করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্কলনের নাম 'আধুনিক ট্র্যাজিক বাংলা গল্প' দিলেই অধিকতর সঙ্গত হইত। অবশ্য শিবরাম চক্রবর্ত্তীর অতি নিকৃষ্ট হাসির গল্পটি এই সংগ্রহে এখন যেমন, তখনও তেমনই বেমানান হইত। এই প্রসঙ্গে মণীন্দ্রলাল বসুর "ভেরনল" গল্পটিরও উল্লেখ করা যায়, ইহা একটি উৎকৃষ্ট গল্প হইলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া এই সংগ্রহে খাপ খায় নাই।

বাকি প্রত্যেকটি গল্পে বৈশিষ্ট্য আছে এবং যে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া গল্পগুলি রচিত, তাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সার্থক হইয়াছে; লেখকদের ভাষা ও ভঙ্গির নিজস্বতায় প্রত্যেকটি গল্প পূর্ণবিকশিত, গল্প পড়িয়া লেখক ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। অচিন্ত্যকুমার, অন্নদাশঙ্কর, তারাশঙ্কর, প্রবোধকুমার, প্রেমেন্দ্র, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব, মনোজ, মাণিক, রবীন্দ্রনাথ, শৈলজানন্দ, সরোজকুমার আধুনিক বাংলা গল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিই যশস্বী নাম। দুঃখের বিষয়, এই তালিকায় লেখিকা একজনেরও নাম নাই; বিশ্বাস মহাশয় একটু অধিক অনুসন্ধিৎসু হইলে এই সংগ্রহে স্বচ্ছন্দে আশাপূর্ণা দেবী ও অমলা দেবীকে স্থান দিতে পারিতেন। প্রবীণতরের দিক দিয়া জগদীশ গুপ্ত এবং নবীনতরের দিক দিয়া অমলেন্দু দাশগুপ্ত, অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যায়ভাবে বাদ গিয়াছেন। আমরা এই খুঁতগুলি ট্র্যাজেডির হিসাবে ধরিলাম।

মিলনাত্মক ও হাস্যরসাত্মক গল্পের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই সংগ্রহকে অসম্পূর্ণ না বলিয়া উপায় নাই। বিস্তারিত নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভূমিকার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। লেখক অনাবশ্যক দম্ভ ও দ্বন্দ্বের মনোবৃত্তি লইয়া এই ভূমিকা লিখিয়াছেন। অকারণে একটা কল্পিত শত্রুপক্ষ খাড়া করিয়া তাহাদের সহিত তাল ঠুকিয়াছেন। যাঁহাদিগকে মনে করিয়া তিনি অকারণে খানিকটা উষ্মাজড়িত শ্লেষ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সংগ্রহপুস্তকের প্রায় অর্দ্ধেক গল্পই সেই দলের লেখকদের দ্বারা রচিত। আধুনিকতা কোনও বিশেষ দলের জন্মগত অধিকার নয়, বর্ত্তমান 'প্রগতি' নামের মধ্যেই ভবিষ্যৎ দুর্গতি লুক্কায়িত আছে; সুতরাং ভূমিকা লিখিবার কালে বিশ্বাস মহাশয় আরও কিঞ্চিৎ অনুদগ্র হইলেই শোভন হইত।

আকাশ-প্রদীপ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৭০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹]

জীবিত রবীন্দ্রনাথের নূতন-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পরিচয় লিখিবার সৌভাগ্য এখনও আমাদের হইতেছে, ইহা ভাবিলেই বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে অনেক ভরসার কথা মনে জাগে। সুদূর অতীতের এক প্রভাতে রবি-করস্পর্শে যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা এখনও শুষ্ক হইয়া যায় নাই, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাই চরমতম বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘজীবনে বাঙালী পাঠক-সমাজকে বারম্বার নানাভাবে বিস্ময়াপ্লুত করিয়াছেন, আশা করি, 'আকাশ-প্রদীপে'ই সেই বিস্ময়ের সমাপ্তি ঘটিবে না।

'আকাশ-প্রদীপ' বাইশটি কবিতার সমষ্টি, ইহার অনেকগুলিই আমরা সাময়িকপত্রে পড়িয়াছি। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

গোধূলিতে নামল আঁধার, ফুরিয়ে গেল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হোলো চেনা মুখের মেলা।
দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ বাইরে নিয়ে চলো।
মিলন রাতে সাক্ষী ছিল যারা
আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা।
পাণ্ডু আঁধার বিদায় রাতের শেষে
যে তাকাত শিশির-সজল শূন্যতা উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্ত লোকের প্রান্ত দ্বারের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ পানে—
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

কবির মনে যে স্বপ্ন অবতরণ করিতেছে, পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনেও সেই স্বপ্ন সঞ্চারিত হয়, কবিতাগুলি সম্পর্কে এইটুকু বলাই যথেষ্ট। এই সংগ্রহের "সময়হারা" ও "ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে" কবিতা দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স.

আমার বই—শ্রীশচন্দ্র দাস

[প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১০৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲]

শ্রীশবাবুর 'আমার বই'এর প্রবন্ধগুলি যখন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তখন পড়িয়াছিলাম, এখন পুস্তক আকারে আবার পড়িলাম। আত্মকথার ধরণে এই জাতীয় রসপ্রবন্ধ ইংরেজী সাহিত্যে যথেষ্ট দেখিয়াছি। বাংলায় এই প্রচেষ্টা নূতন বটে। এ কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, 'আমার বই'এর প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে বিশেষ করিয়া A. G. Gardenerএর কথা মনে হয়। সেইজন্য এই প্রবন্ধগুলি গার্ডনারের অনুকরণ মনে করিলে ভুল করা হইবে। Gardener, Lamb, Jerome K. Jerome অথবা G. K. C. এই লেখকদিগের রসপ্রবন্ধ শ্রীশবাবুকে যে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই প্রভাব শ্রীশবাবুর পক্ষে ভালই হইয়াছে। কারণ এই প্রভাব শ্রীশবাবুকে প্রভাবান্বিত না করিলে শ্রীশবাবুর প্রকাশের লজ্জা ভাঙিত না। প্রবন্ধগুলি পড়িলে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, লেখকের একটি অতি সুকুমার রসিক মন আছে, কিন্তু তাঁহার আত্মপ্রকাশের ধরণ মাঝে মাঝে লাজুকতার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে এ কুণ্ঠা ও লজ্জা ভাঙিয়াছে। অতি সাধারণ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া লেখকের কল্পনা মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব বিদ্যুৎ-দ্যুতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। অতি সামান্য বিষয়কে, নিজের একান্ত ভাল লাগা ও না-লাগাকে এমন রসসমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারা সামান্য ক্ষমতার কথা নয়।

লেখকের রসিকতা মাঝে মাঝে এত সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে যে মনে হয়, এ বুঝি মাক্স বিয়ববুমের মত একরূপ অপূর্ব্ব মানসিকতা বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছে; কিন্তু এখানে পাঠক একটু সাবধান হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিয়ববুমের মানসিকতা এ বিষয়বস্তুতে রসসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে না। ইহা একরূপ বিদ্রূপের প্রকাশ বটে, কিন্তু আসলে তাহা হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে

বেদনাস্নিগ্ধ হইয়া বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা হারাইয়াছে। বিদ্রূপের প্রকাশ যদি এত হৃদয়াবেগ লইয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে বিদ্রূপ তীক্ষ্ণতা হারাইতে বাধ্য—তাহা অনিবার্য্যরূপেই নির্ব্বিষ হইয়া উঠে।

এখানে একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। লেখকের ক্ষমতা আছে, সেজন্যই এ কথা বলিতে হইল। লেখক আপনার ভাব-প্রকাশের বাহন হিসাবে যে লঘু ভাষা-রূপের আশ্রয় লইয়াছেন, উহাতে তাঁহার নিজকে অপরের কাছে গোচর করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতেই মাঝে মাঝে তাঁহার হিউমার বেদনাস্নিগ্ধ করুণরসাশ্রিত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে, সেই ভাষা-রূপ আরও গাঢ়বদ্ধ ও শব্দব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ না হইলে সাধুভাষার পংক্তিতে স্থান পাইতে পারে না। সেই ভাষায় লেখা যায় কি না, ইহা ভাবিয়া দেখিতে লেখককে অনুরোধ করি। শ্রী

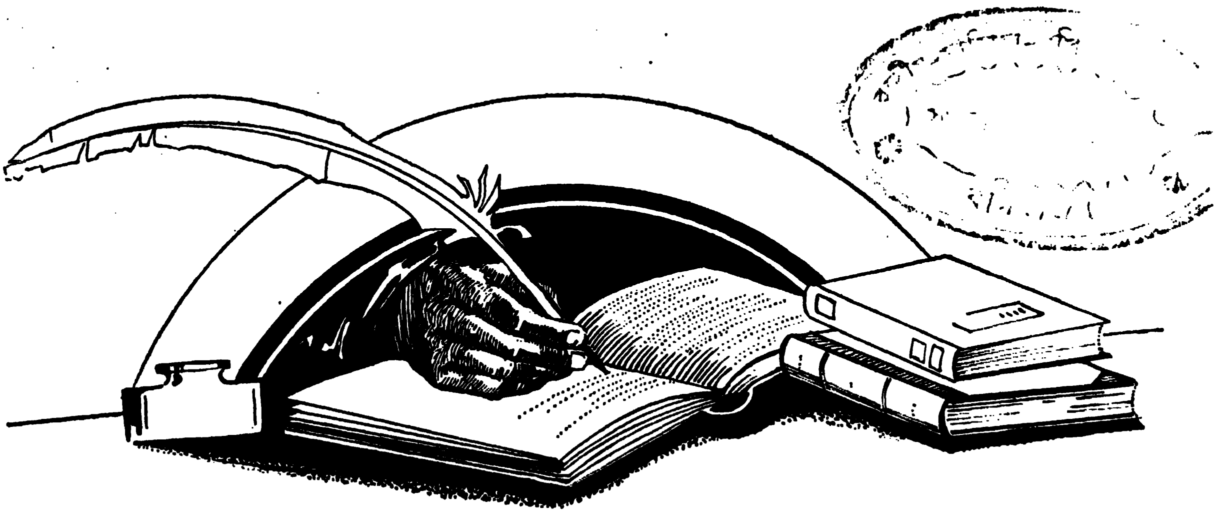
যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার—শ্রীবিধুভূষণ পাল

[৩১৫।১এ গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা হইতে শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲]

এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে যক্ষ্মা উত্তরোত্তর যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভীত হইয়া পড়িতেছেন। কেমন করিয়া এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সকলের অবহিত হওয়া উচিত। গ্রন্থকার প্রবীণ চিকিৎসক ও এই বিষয়ে শিক্ষকতা করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই বইখানি পাঠে আমাদের অজ্ঞতা ও যক্ষ্মা সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি দূর হইবে এবং যক্ষ্মা-নিবারণের সহজ উপায় প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য জানিয়া সাবধান হইয়া আমরা সহজেই এই দারুণ ব্যাধিকে এড়াইয়া চলিতে পারিব। সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এই বইখানি সাধারণে সমাদর করিলে নিজেরাই উপকৃত হইবেন। সু





সম্পাদকীয়

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল ও বঙ্গদেশে চাকুরির বাটোয়ারা

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় রুদ্রকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—

"ঐ আকাশ 'পরে আঁধার মেলে
কি খেলা আজ খেলতে এলে
তোমার মনে কি আছে তা জানব না;
আমি তবুও হার মানব না হার মানব না!"

বাংলা দেশের হিন্দুদের চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে আবার নূতন করিয়া ঐ কবিতার মন্ত্র আওড়াইবার সময় আসিয়াছে। দীর্ঘকাল বিদেশী শিক্ষা ও স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্যে শাসক ইংরেজকে নাস্তানাবুদ করার ফলে তাঁহারা বিরূপ হইয়া বাঙালী হিন্দুর অপেক্ষাকৃত রাজভক্ত প্রতিবেশী মুসলমান-সম্প্রদায়কে একটু বেশি মাত্রায় রাজকীয় প্রসাদ যদি বিতরণ করিয়াই থাকেন, সাধারণ মানবধর্ম্মবশেই তাহা করিয়াছেন। এই বিশেষ রাজদৃষ্টি লাভ করিয়া হিন্দুরা বিচলিত হইয়া থাকিলে তাহাদের যুদ্ধ ঘোষণার মূলনীতি ব্যাহত হইয়াছে। হিন্দুরা বিদ্রোহ করিয়াছে ও দলে দলে তাহার ফলভোগ করিয়াছে এবং আজও করিতেছে। এই বিদ্রোহ ও শাস্তিলাভের দ্বারা বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন ভিতরে ভিতরে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, ভবিষ্যৎকাল তাহার বিচার করিবে। বাহিরে আমরা দেখিতে পাইতেছি, পুনঃ পুনঃ শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের দ্বারা ১৯০৫ হইতে ১৯৩৯, মাত্র এই চৌত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবাসীর হাতে কিছু পরিমাণ আত্মকর্তৃত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই তথাকথিত স্বাধীনতাযুদ্ধে যে মুসলমান-সম্প্রদায় কোনও কালেই সহায়ক ছিল না, বরঞ্চ নানাভাবে ইহার বিরোধই করিয়া আসিয়াছিল, ইংরেজের সুকৌশলচালিত রাজনীতির বলে যজ্ঞশেষে চরু-বিভাগে তাহাদেরই ভাগ্যে মোটা অংশ লাভ হইয়াছে। শাসক ইংরেজের বিরোধিতা করিয়াও আমরা এই অবিচার প্রসন্নমনে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। সুতরাং বাঙালী হিন্দুরা নূতন করিয়া সংহত হইয়া দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই যুদ্ধে লক্ষ্য ইংরেজ, কিন্তু উপলক্ষ্য মুসলমান। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল ও বঙ্গদেশে সরকারী চাকুরির ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া হিন্দুসমাজে যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, আগামী যুদ্ধের সেখান হইতেই সূত্রপাত। চাকুরির ভাগ-বাটোয়ারার বেলায় সংখ্যানুপাতের জোরে শতকরা ৬০টি চাকুরি মুসলমানেরা পাইবে, অথচ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হইয়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সহিত সমান ভোটাধিকার ভোগ করিবে, নিছক মুসলমান-শাসনের সময়েও বাংলা দেশে এতখানি অনাচার হয় নাই। এই অপমান ও লাঞ্ছনার দ্বারা ঘুমন্ত জাতির যদি কথঞ্চিৎ চৈতন্যোদ্রেক হয়, তাহা হইলেই জাতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। যে একতার জোরে মুসলমানের প্রাধান্য, হিন্দুর সে একতা আসিলে এই অন্ধকারে একটা পথ নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইবে; ইংরেজের নিকট আবেদন-নিবেদনে স্থায়ী কোনও ফল হইবে না।

হের হিট্‌লার ও জার্ম্মান তরুণ

গত ১১ই মে বৃহত্তর জার্মানির প্রতিষ্ঠা-দিবসে হের হিট্‌লার জার্মানির তরুণ-সম্প্রদায়কে যে উপদেশ দিয়াছেন, আজ আমাদের দেশের যুবকদেরও সেই আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে। হিট্‌লার বলিয়াছেন—

আমি আশা করি যে, আমাদের দেশের তরুণদের চরিত্রে বীরত্ব ও তরুণীদের চরিত্রে সততার মূর্ত্ত প্রতীক

হইবে। যাহারা বীর তাহারা জানে যে, উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কোন কিছু লাভ করা যায় না এবং কোন কিছু লাভ করিতে হইলে সংগ্রামের সাহায্যেই তাহা পাইতে হয়; রক্ষা করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারিলে কোনও অধিকারই অব্যাহত রাখা যায় না। যে সকল বুলি দ্বারা অশান্তির সৃষ্টি ও জাতীয় জীবন বিষময় হইবার সম্ভাবনা, সেই সব বুলির মোহে তরুণেরা যেন আত্মবিশ্বাস না হারায়।"

বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় বদহজম

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাতের যুগ হইতেই ইউরোপীয় প্রভাব একটু বেশি পরিমাণেই লক্ষ্য করা যায়; পাশ্চাত্য সাহিত্য, এমন কি পাশ্চাত্য পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি ছন্দ ভাব বাচনভঙ্গি সমেত আয়ত্ত করিয়া দেশীয় মূর্ত্তিতে তাহার প্রয়োগের দ্বারা আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধই হইয়াছে। শেক্সপীয়র, মিল্টন, স্কট, শেলী, টেনিসন একান্ত বাংলা চেহারা লইয়াই বাংলা সাহিত্যের স্থানে স্থানে আত্মগোপন করিয়া আছেন। কিন্তু সম্প্রতি বাংলা লিখিতে বসিয়া অকারণে পাশ্চাত্য নাম ও বুলি প্রয়োগের একটা মারাত্মক প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া বাংলা দেশের চিন্তাশীল সাহিত্যিক মাত্রেই পীড়িত হইয়াছেন। পরের সম্পদ আয়ত্ত করিয়া আপনাকে শক্তিশালী করিবার লক্ষণ ইহা নয়। ১১ই এপ্রিল তারিখের একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই ভয়াবহ অভ্যাস সম্পর্কে আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—

> আমরা য়ুরোপীয় সাহিত্য এক সময়ে গভীর আনন্দ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই পড়েছিলুম। মনটা তার সঙ্গে ভাবের কারবার করেছিল কিন্তু বিদেশী নামগুলো স্বভাবতই রচনার মধ্যে এসে পড়ে না। ভাষার মধ্যে তাদের প্রসঙ্গতা সহজ হয় নি, জীবনের ব্যবসায়ে তাদের চলন নেই। পড়া বই থেকে গায়ে পড়ে লেখার মধ্যে নামগুলো টেনে আনতে পারি। কিন্তু সেটা হয় অন্তঃপুরে মেমসাহেবের আগমনের মতো। অন্য মেয়েরা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রেসিডা পাশ্চাত্য পুরাণের তর্জমা সাহায্যে আমাদের কাছে বাহির মহলে পরিচিত, তার সঙ্গে মনের এত বেশি মাখামাখি হয় নি যে ভাবের অন্তরঙ্গ মহলে যখন-তখন সে আপনি এসে চেনা জায়গা নিতে পারে। এলিয়ট-এর কবিতায় ভাষার আত্মীয়মহলে অসংকোচে বিদেশী নামের বা পুরাণের ঢুকে-পড়া দেখছি, তাঁর সেই বিশেষত্ব এত স্বকীয় যে অন্য কারো পক্ষে এটা অনুকরণের সুস্পষ্ট মুদ্রাদোষ হয়ে পড়ে। এ-রকম স্খলন যদি দৈবাৎ হয় তবে সেটাতে লজ্জিত হওয়া প্রত্যাশা করি কিন্তু বারবার যদি হয় তবে সেটাকে কী বলব। বিশেষত তুলনা ক'রে দেখলে দেখা যাবে স্বদেশীয় পুরাণ থেকে সুপরিচিত নাম কবির কাব্যে পথ পায় না।

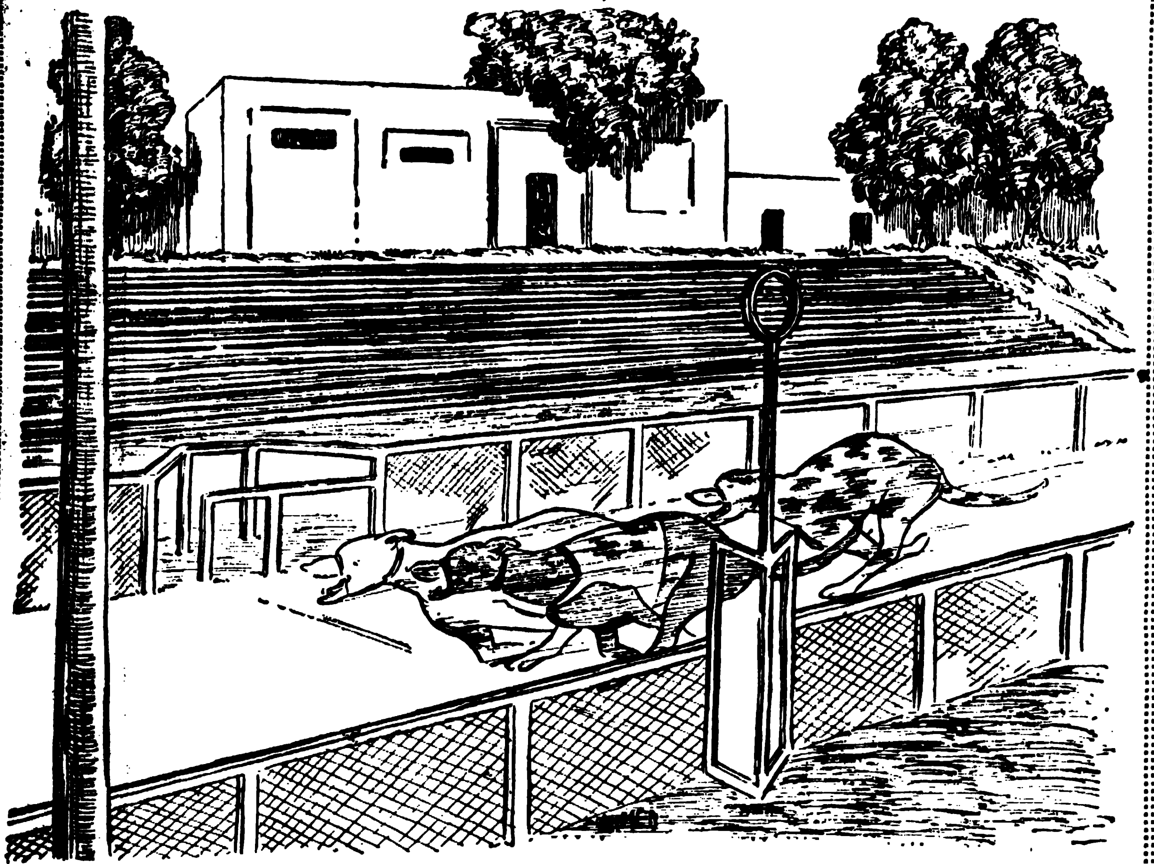
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান

ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের একজন বিখ্যাত চিন্তানায়ক ও দানবীর; তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। সম্প্রতি পুনার 'মারহাট্টা' পত্রিকায় "বাংলা দেশের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ" সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির চোখে এই সংঘর্ষ সচরাচর কোন্ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, ইহা হইতে তাহাই বুঝা যাইবে। ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলিতেছেন—

> বাংলা দেশে সমস্ত ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সূত্রপাত করে। হিন্দুদের মনে আঘাত লাগে এমন ভাবে গোহত্যা করা, ধর্ম্মমন্দির ভাঙ্গা এবং বিগ্রহ অপবিত্র করা, এবং হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে অপহরণ করা, এই সকল কারণেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ধর্ম্মোন্মত্ত মোল্লা ও মৌলবীদের প্রচার-কার্য্যের ফলে উত্তেজিত হইয়া জনসাধারণ ঐ সকল অপকার্য্য করিয়া থাকে। ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে: পীড়ায় মরণাপন্ন স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ড তন্মধ্যে অন্যতম দৃষ্টান্ত। ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ভারতবর্ষ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। হিন্দু নারীহরণ সম্পর্কে পুলিস সম্প্রতি যে রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, অপরাধীরা সকল সময়ে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হয় না বলিয়া অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুনঃ পুনঃ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত মুসলমানেরা যে হিন্দু নারী হরণ করে, তাহা আকস্মিক ব্যাপার নহে; উহাদের পশ্চাতে থাকে সঙ্গতিসম্পন্ন ও উচ্চ-শ্রেণীর মুসলমানগণ; তাহারা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে।

এই ভয়াবহ বিবৃতির টীকা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৩।১ এল্গিন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত



গ্রেহাউণ্ড রেসিং

দি ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত

আজকালকার সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য আমোদ।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিতে ভুলিবেন না—তাঁহারা আরও অধিক আনন্দ পাইবেন;

উত্তেজনাপূর্ণ উন্মাদনাকারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আনন্দ!

প্রবেশ মূল্য	এনক্লোজার "এ"	১৷০	স্পেশাল এনক্লোজার (বক্স)	৪৲
	" "বি"	৷৵০	ঐ মহিলাদের জন্য	২৲

স্থান—বেহালা (ডায়মণ্ডহারবার রোড)

ট্রাম ও বাস পাওয়া যায়।

চিত্রা এবং নিউ সিনেমা

ফোন ঃ বি, বি, ১১৩৩ ধর্ম্মতলা ঃ ফোন ঃ কলি, ৫৮১৯

৬ষ্ঠ সপ্তাহ !

নিউ থিয়েটার্সের বিচিত্র

ভিন্নতর চিত্র

সাপুড়ে

ভূমিকায় ঃ কানন, পাহাড়ী, মেনকা, মনোরঞ্জন, কৃষ্ণচন্দ্র, রতীন, অহি ইত্যাদি।



অ-সভ্য সাপুড়ে-জীবনে প্রেমের বিচিত্র লীলা দেখিয়া
সভ্য মানুষের দল বিচিত্র আনন্দ পাইবেন।

সাপুড়ে ঃ সাপুড়ে



কাহিনীর বৈচিত্র্যে—সঙ্গীতবাদ্যের নবীনত্বে—
চিত্রকলার গৌরবে উদ্ভাসিত পরম মনোহর কথাচিত্র।
আপনি সপরিবারে নিশ্চয়ই দেখিবেন॥



৪র্থ শ্রেণী ১ দিন এবং অন্যান্য শ্রেণীর টিকিট ৩ দিন পূর্ব্বে পাওয়া যায়।

টেলিফোন—
"বড়বাজার ৯০"

টেলিগ্রাম—
"গিনিহাউস"

বি, সরকার এণ্ড সন্স
"গিনি হাউস"
B.S.
লিমিটেড

১৩১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের ব্রাঞ্চ দোকান নাই কিম্বা আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।
জগদ্ব্যাপী অর্থ-সঙ্কট প্রযুক্ত আমাদের সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটালগের জন্ত পত্র লিখুন।
যে কোন প্রকার পুরাতন সোনা বা রূপা বাজার দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া নূতন গহনা দেওয়া হয়।

'অলকা'র নূতন কার্য্যালয়

হিমালয় হাউস

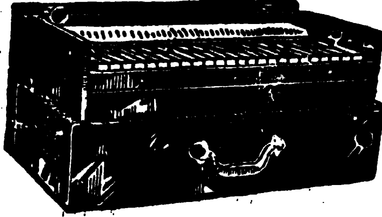
১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ

কলিকাতা

ফোন—কলিকাতা ৬৩৫৫

"বীণা অর্গান" হারমোনিয়ম

বিনা সঙ্গীতের আসর সম্পূর্ণ হয় না।



কেন ?

যিনি "বীণা অর্গান হারমোনিয়ম" একবার বাজাইয়াছেন তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন!

প্রিন্স ফ্লুট মডেল নং ১৫০৫, মুল্য মাত্র ৪৭৷৷৹ টাকা

অন্যান্য নানা মুল্যের অন্যান্য নানা মডেল আছে। দোকানে আস্থন, বাজাইয়া দেখুন কিম্বা অদ্যই তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

এম, এল, সাহা লিঃ

৫।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা



সি, সি, সাহা লিঃ

১৭০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নুতন সংযুক্ত শো-রুম—৪৫, মতি শীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সস্তায় সকল রকম দেশি ও বিলাতি কাগজ কোথায় পাওয়া যায়

জানেন কি ?



পত্র লিখুন বা ফোন করুন—

বসু ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪।২, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১২২ নং ঘর

ফোন : ক্যাল ২২৮০

ডাক্তাররা বলেন—
'লিলি'
ব্র্যাণ্ড
বার্লি
ভারতে শ্রেষ্ঠ
পানীয় খাদ্য

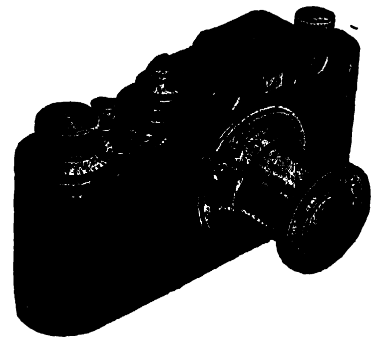
লিলি বার্লি প্রত্যহই কলিকাতায় প্রস্তুত হয়, সুতরাং ঋতুর প্রকোপ ইহার গুণ নষ্ট করিতে পারে না।
সেই কারণেই—
লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য পথ্য ও পানীয়।



ক্যামেরা ?

- লাইকা
- রোলিফ্লেক্স
- বল্‌ডিনা
- ব্রিলিয়াণ্ট

Leica



ডেভেলপিং এবং প্রিণ্টিং
আমাদের নিকট
পরীক্ষা করিয়া দেখুন—
খুসী হইবেন।

ইত্যাদি সকল প্রকার ক্যামেরা
এবং
সর্ব্বপ্রকার ফিল্ম, প্লেট, পেপার,
ফোটো কেমিক্যাল ইত্যাদি

আমাদের দোকানে ন্যায্য মূল্যে সকল সময় পাইবেন।
একবার দোকানে আসুন কিম্বা তালিকার জন্য পত্র লিখুন॥

ফোটোগ্রাফিক্ ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি কোং লিঃ

১৫৪, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: :: কলিকাতা



GOVERNMENT PRODUCTS.

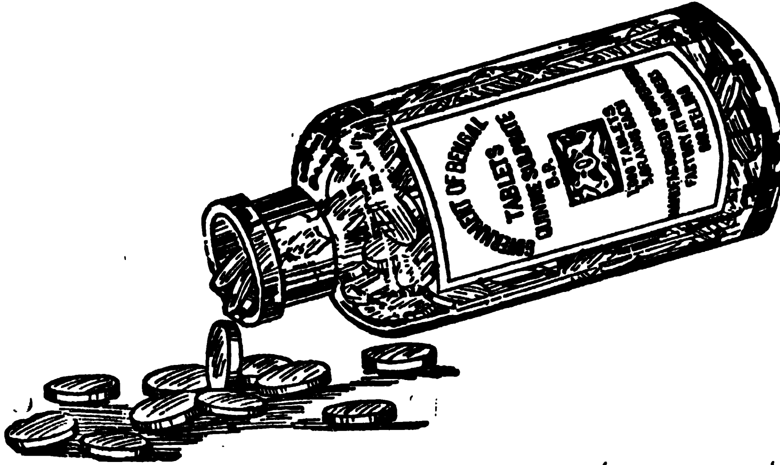
বাংলা গভর্ণমেণ্টের

কুইনাইন

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ

বিশুদ্ধ ও টাট্কা

সহর ও মফঃস্বলের সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।



জয়েণ্ট এজেণ্টস্—

শা, ওয়ালেস এণ্ড কোং

পোষ্ট বক্স নং ৭০, কলিকাতা

চৌধুরী এণ্ড কোং

৪ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"সাপুড়ে"

নিউ থিয়েটার্সের

নূতন চিত্র নিবেদন

বিচিত্র ঘটনাবহুল সাপুড়ে জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী! নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে উজ্জ্বল চিত্র।

ভূমিকায়ঃ কানন, পাহাড়ী, মনোরঞ্জন, রতীন,
মেনকা, কৃষ্ণচন্দ্র, হুয়া, অহি সান্ন্যাল ইত্যাদি

পরিচালকঃ দেবকী বসু

"সাপুড়ে"

প্রথমারম্ভ ঃ ২৭শে মে, শনিবার

চিত্রা এবং নিউ সিনেমা

—ঃ চিত্র-পরিবেশক ঃ—

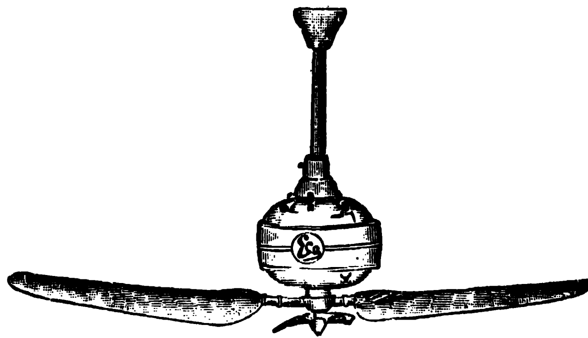
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

১২৫ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এ, সি
ডি, সি



সিলিং
টেবিল



—দুই বৎসর গ্যারাণ্টিযুক্ত—

কারেণ্ট খরচ কম — দামে সস্তা

বাতাস দেয় প্রচুর — কাজে মজবুত

দেখিতে সুন্দর—গঠনেও সুশ্রী

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও ব্যবহৃত

প্রস্তুতকারক ঃ—

দি এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড

অফিস ঃ
১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

টেলি— গ্রাম—"একোফ্যান্"
ফোন কলিঃ ৫৩০৮

কারখানা ও সার্ভিস ষ্টেশন
২৯৪।২।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
ফোন বি, বি ৪৯১২

'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষান্মাসিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক-খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	১	পৃষ্ঠা	প্রতি মাসে	২০৲
"	½	"	"	১১৲
"	¼	"	"	৬৲
কভার	৪র্থ	"	"	৩০৲
"	২য়	"	"	৫০৲
"	৩য়	"	"	৪৫৲

(বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

হিমালয় হাউস
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা
ফোন: কলিকাতা ৬৩৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক
নর-নারায়ণ
রূপবাণীতে আগতপ্রায়

রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক
দ্রৌপদী
পরিচালক : অহীন্দ্র চৌধুরী

ফিল্ম কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার
রিক্তা
পরিচালক : সুশীল মজুমদার

ফিল্ম কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার
তটিনীর বিচার
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
নাটক অবলম্বনে

নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি
রজত-জয়ন্তী
পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া

সোল্-ডিষ্ট্রিবিউটর্স্
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ
৭৬-৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
ফোন : বি. বি. ১১৩ = গ্রাম : রূপবাণী

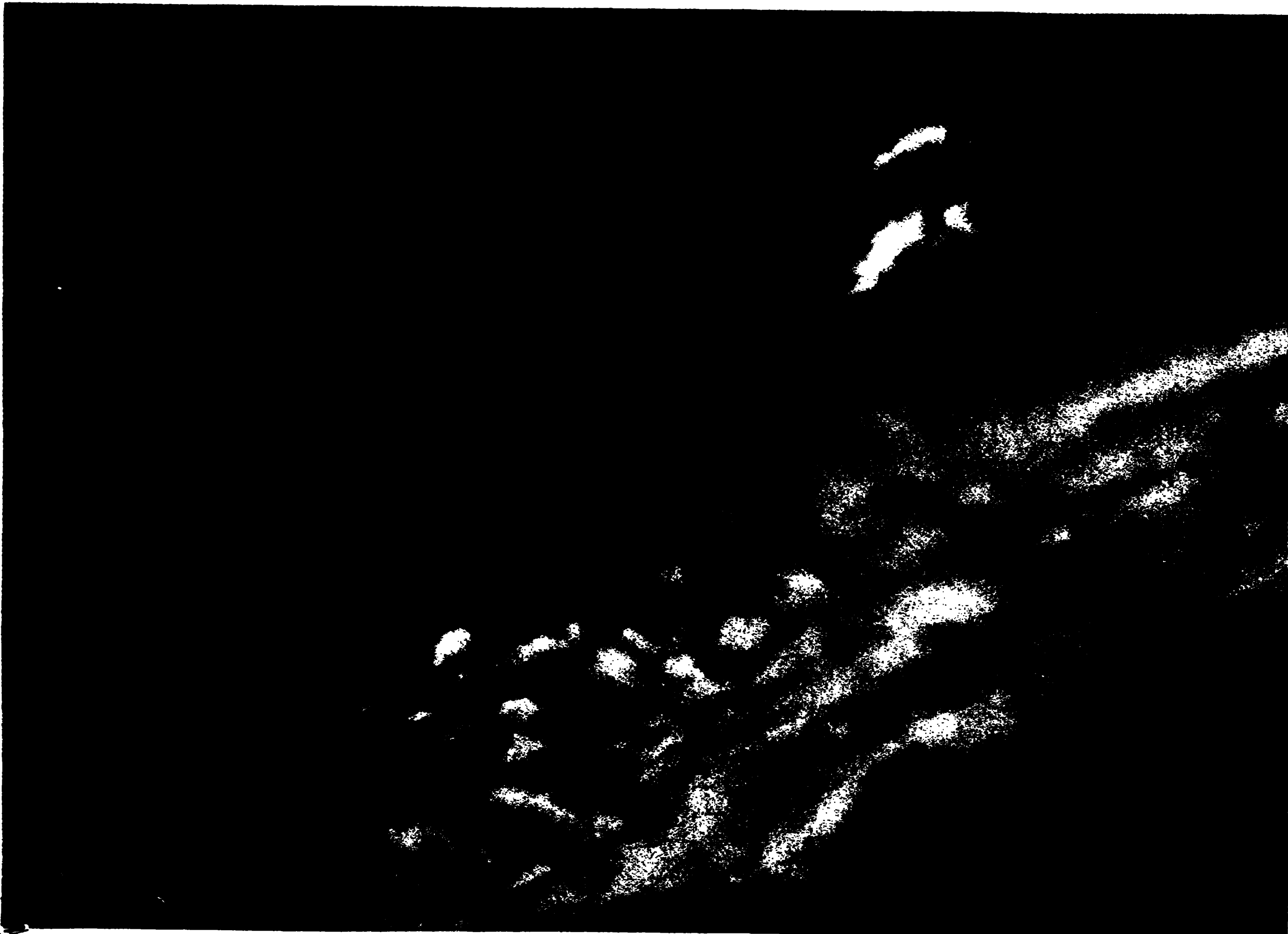
সূচী

আষাঢ় ১৩৪৬



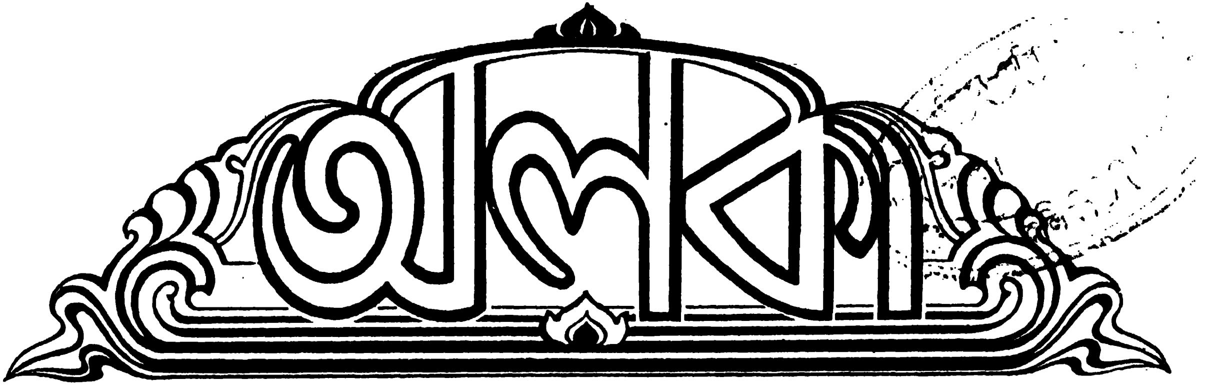
'অলকা'র পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

'অলকা' পড়িয়া যদি আপনার ভাল লাগে,
তাহা হইলে অন্তত পাঁচজন বন্ধুর নিকট
'অলকা'র কথা বলিবেন।



"আছে শুধু পাখা আছে মহা নভ-অঙ্গন"

ফোটোগ্রাফ : শ্রীপরিমল গোস্বামী



প্রথম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৬ | দশম সংখ্যা

আধুনিক মানুষ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

"The Ideal Man of the eighteenth century was the Rationalist; of the seventeenth, the Christian Stoic; of the Renaissance, the Free Individual; of the Middle Ages, the Contemplative Saint. And what is our Ideal Man? On what grand and luminous mythological figure does contemporary humanity attempt to model itself? The question is embarrassing."

প্রশ্নটা বড় নিদারুণ, কাজেই উত্তরও মর্ম্মান্তিক—হয়তো উত্তরও ঠিক ভাবে জানা নাই। আধুনিক যুগের আদর্শ মানুষ কি? বিজ্ঞ লেখক প্রশ্নটাকে ভবিষ্যতের উপরে ছাড়িয়া দিয়াছেন, আমরাও উত্তর দিতে চেষ্টা করিব না। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে আনুষঙ্গিকভাবে যে আর একটা প্রশ্ন মনে স্বভাবতই ওঠে তাহারই উত্তর দিবার প্রয়াস পাইব—হয়তো পরোক্ষভাবে প্রধান প্রশ্নের মীমাংসা তাহাতে হইতেও পারে। আধুনিক যুগের আদর্শ মানুষের কথা ছাড়িয়া দাও—এ যুগের বাস্তব মানুষ, প্রাত্যহিক মানুষ কি? খবরের কাগজের লেখক ও খবরের কাগজের পাঠক।

পাদ্রী সাহেবের সেই গল্প মনে পড়িতেছে, নরকের ভয়াবহতা প্রকাশ করিবার জন্য যিনি বলিয়াছিলেন, নরক এমন এক দেশ যেখানে খবরের কাগজ নাই। সত্য কথা বলিতে হইলে বলা উচিত ছিল, নরকে খবরের কাগজ ছাড়া আর কিছুই নাই। পাদ্রী সাহেব একথা জানিতেন না—বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এমন শুভ সংবাদ দিলে খ্রীষ্টীয় জনগণ দলবদ্ধ হইয়া নরকে চলিয়া যাইবে—এমন একটা ভীতি তাঁহার মনে ছিল; কাজেই আসল কথাটা তিনি চাপিয়া গিয়াছেন। অথবা অন্যত্র যাইতে হইবে কেন? সংবাদপত্রের বাহুল্যে পৃথিবীই নরকে পরিণত হইয়াছে।

বার্নাড শ' এক স্থানে স্বর্গ ও নরকের নূতন সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—স্বর্গে বাস্তব মানুষের দাস, আর নরকে মানুষ বাস্তবের দাস। বর্ত্তমান পৃথিবীটা নরকের বড় সন্দেহজনক কাছে গিয়া পড়িয়াছে, আমরা বাস্তবের দাস হইয়া পড়িয়াছি। এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রধান দায়িত্ব সংবাদ-

পত্রের। কিংবা ইহা একটা দুরতিক্রম্য বিষচক্রমাত্র। মানুষের মনের বিশেষ একটা অবস্থা সংবাদ-পত্র সৃষ্টি করিয়াছে, আবার সেই সংবাদপত্র মানুষের মনকে বিষাইয়া তুলিতেছে এবং ফলে আমরা মাধ্যাকর্ষণের লোলুপ আকর্ষণে নারকীয়তার পথে দিব্য গড়াইয়া চলিয়াছি—বাস্তবের দাসত্বের চিহ্ন মানুষের চোখে মুখে ক্রমঃস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মানুষ আজ আর রেনেসাঁসের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নয়; সে সপরিবারে বাস্তবের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ আধুনিকতম 'লাওকুন'।

প্রত্যেক যুগ একটা বড় আইডিয়ার মধ্যে আপনাকে সার্থক করিয়া তোলে, সেই আইডিয়াকে সেই যুগের মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে; এমন কয়েকটি মেরুদণ্ডের উল্লেখ উদ্ধৃত ইংরেজী কয়েক পংক্তিতে আছে। লেখক মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক যুগের মেরুদণ্ডের উল্লেখ করিতে করিতে অষ্টাদশ শতকে আসিয়া থামিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতকের কোন আইডিয়ার সন্ধান যেখানে তিনি দিতে পারেন নাই, সেখানে বিংশ শতকের কথাই ওঠে না।

সত্য কথা বলিতে কি, গত এক শতাব্দী ধরিয়া মানবসমাজ কোন বিরাট আইডিয়ার মধ্যে আপনার স্বরূপ দর্শন করিতে পারে নাই; দেশগত আইডিয়া আছে, স্থানগত আছে, কালগত আছে, বিভিন্ন সমাজ ও জাতিগত আইডিয়া আছে, কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের একাধারে নির্ভর ও স্বরূপ, এমন কোন আইডিয়া আছে কি?

মানুষের ইতিহাসে আজ যে দারুণ অশান্তি ও অনিশ্চয়তা যুগপৎ কালনাগিণী ও কালো মেঘের মত ফণা ও ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহার কারণ মানুষের অন্তরে আজ ঐক্য নাই—যে ঐক্য একমাত্র মহৎ আইডিয়ার দ্বারাই সম্ভব হইয়া থাকে।

ইউরোপের ইতিহাসই আজ পৃথিবীর ইতিহাস। কাজেই ইউরোপের ইতিহাস একটু তলাইয়া বুঝিলেই সমস্যাটা পরিষ্কার হইবে। বর্ত্তমান ইউরোপের অবস্থা একখানা অর্দ্ধদগ্ধ পাঁউরুটির মত; উপরটা বেশ শক্ত হইয়াছে, ভিতরটা কাঁচা। ভিতর ও বাহির সমান ভাবে উত্তাপ পায় নাই—এই তাপবৈষম্যে ইউরোপের ইতিহাসে এমন ভাববৈষম্য—ইহা আকস্মিকতা ও সচেতন প্রয়াসের মিশ্র সৃষ্টি।

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রসারের পর হইতে ইউরোপের ইতিহাস এক বিশিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছিল—সে বৈশিষ্ট্য এমনই প্রবল যে, রোমক সাম্রাজ্যও তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই, বরঞ্চ সেই ধারার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া রোমক ভাব ও খ্রীষ্টীয় ভাব এক হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ইহা খাঁটি রোমক ভাব বা খাঁটি খ্রীষ্টীয় ভাব আর ছিল না, কিন্তু যাহাকে আমরা ইউরোপীয় মধ্যযুগ বলিয়া থাকি, তাহা ইহারই সৃষ্টি। সুবিধার জন্য ইহাকে আমরা মধ্যযুগের আইডিয়া বলিতে পারি। এই আইডিয়া ইউরোপকে এক ভাবে গড়িয়া তুলিতেছিল। ইউরোপে তখন তিনটি সত্তা ছিল,—স্টেট, চার্চ ও গিল্ড, অর্থাৎ রাজা, ধর্ম্ম ও সাধারণ লোক। এই সাধারণ লোককে প্রলিটারিয়েট বলিলে ভুল হইবে, কারণ তৎকালীন ইউরোপে প্রলিটারিয়েট বা সর্ব্বহারা বলিয়া কোন শ্রেণী ছিল না। সর্ব্বহারা শ্রেণী ক্যাপিট্যালিজ্‌মের প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, আর ক্যাপিট্যালিজ্‌ম মধ্যযুগের আইডিয়া নয়; ইহার জন্য রেনেসাঁস ও রিফর্‌মেশন দায়ী।

এই যে তিনটি সত্তার কথা বলিলাম—রাজা, ধর্ম্ম ও গিল্ড, এই তিনটি সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনই ছিল মুখ্যত মধ্যযুগের আদর্শ। ইংরেজ লেখকদের গ্রন্থে যে মধ্যযুগের চিত্র আমরা দেখিতে অভ্যস্ত, যাহাতে চার্চ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে ফিউড্যাল সামন্তগণ সাধারণ লোককে পীড়ন করিতেছে, যাহাতে সামন্তরাজচক্রের সঙ্গে রাজচক্রবর্ত্তীর নিরন্তর লড়াই চলিতেছে, তাহা মধ্যযুগের পতনের সময়ের দৃশ্য—এবং এই পতনের প্রধান কারণ উপরিউক্ত তিন সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের ব্যর্থতা। যেখানে বিচার্য্য বিষয় আইডিয়া, বাস্তব নয়, সেখানে এই চিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে চলিবে না। মধ্যযুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন আইডিয়া ছিল না, ইহাও ক্যাপিট্যালিজ্‌মের মত রেনেসাঁস ও রিফর্‌মেশনের সৃষ্টি।

মধ্যযুগের ইউরোপে এই তিন সত্তার,—রাজা, ধর্ম্ম, গিল্ডের, সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতেছিল; ইহা ইউরোপীয় ইতিহাসের সচেতন প্রয়াস; এমন সময়ে আকস্মিকতা উত্তর হইতে নর্থম্যানদের আকারে ও দক্ষিণ হইতে সারাসেনদের আকারে আসিয়া দেখা দিল। মধ্যযুগের সমস্যায় জটিলতর গ্রন্থি পড়িল। মধ্যযুগের ইতিহাসে যে দুইটি অবস্থা বা ঘটনা সর্ব্বথা নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছে, তাহাদের সৃষ্টি এই আকস্মিকতার দরুণ। 'ইনকুইজিশন' ও 'ফিউড্যাল' তন্ত্র। সারাসেনদের বাধা দিবার জন্যই মূলত ইনকুইজিশনের সৃষ্টি, আবার নর্থম্যানদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই ফিউড্যাল প্রথার উদ্ভব; এ দুটির একটিও মধ্যযুগের মৌলিক প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল না, অথচ বিচার করিতে বসিয়া আমরা মধ্যযুগকে এই দুটির জন্যই সবচেয়ে বেশি দায়ী করি।

মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্রমবিকাশের অন্তরায় স্বরূপ আর দুটি আকস্মিকতার উল্লেখ করা যাইতে পারে—ক্রুজেড ও কনস্তান্তিনোপলের পতন। প্রথম দুটি মধ্যযুগের ইউরোপকে ভিতর হইতে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, শেষের দুটি বাহির হইতে তাহাকে আঘাত করিয়াছে—ফলে অসমাপ্ত মধ্যযুগের আইডিয়া ব্যর্থ হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

ইউরোপের মডার্ন বা নবযুগের মূলে রেনেসাঁস ও রিফর্‌মেশন; এই যুগের প্রধান লক্ষণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জাগরণ; মধ্যযুগ ছিল সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সমন্বয়ের সময়; এই যুগ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, স্টেট ও চার্চ বিচ্ছিন্ন, কাজেই বাদী বিবাদী হইয়া উঠিয়াছে; আর 'গিল্ড' প্রথা ভাঙিয়া গিয়া ব্যক্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ফলে ক্যাপিট্যালিজ্‌মের সৃষ্টি, আর ক্যাপিট্যালিজ্‌মের প্রভাবে 'গিল্ড' নষ্ট হইয়া গিয়া প্রলিটারিয়েট বা সর্ব্বহারার সৃষ্টি করিয়াছে। যে সব দেশে ক্যাপিট্যালিজ্‌ম উগ্র মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, সেখানে কৃষককুল নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, যেমন ইংলণ্ডে; সেখানে অষ্টম হেনরির লুটতরাজের ফলে আজ হইতে বহুকাল পূর্ব্বে কৃষকশ্রেণী বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইউরোপের উত্তরাংশের দেশসমূহে প্রটেস্টাণ্টধর্ম্ম বদ্ধমূল—কাজেই সেই সব দেশে ক্যাপিট্যালিজ্‌ম প্রবল—যেমন ইংলণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া; দক্ষিণাংশের দেশে ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রবল—সেই সব দেশে ক্যাপিট্যালিজ্‌মের মূর্ত্তি তেমন উগ্র নয়; জার্মান দেশসমূহে দুই ধর্ম্ম বিরাজমান—কাজেই উত্তরাংশ প্রুশিয়ার নেতৃত্বে প্রটেস্টাণ্ট; দক্ষিণাংশ অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে ক্যাথলিক। ফ্রান্সে ও জার্মানিতে দুই ধর্ম্মের উপাদান সমান সমান

প্রবল—সেই জন্য এই দুই দেশে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব ইউরোপের সব দেশের চেয়ে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহার ফলে হইয়াছে, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ঐক্য, যাহা এক-আইডিয়ার ঐক্য ছাড়া আর কিছু নয়, তাহা চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে—আর এই দুই আইডিয়ার দুই নৌকায় পা রাখিবার জন্য ইউরোপের অবস্থা এমন অশান্ত ও অর্দ্ধপরিণত; তাহার কতক মধ্যযুগীয়, কতক নবযুগীয়; কতক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রবল, কতক সমষ্টিবাদ প্রবল; কতক অংশে ক্যাপিট্যালিজ্‌ম প্রধান, কতক অংশে 'গিল্‌ড' প্রথা রূপান্তরিত ভাবে রহিয়া গিয়াছে।

কাজেই আজিকার ইউরোপ কোন একটি মহৎ আইডিয়ার সূত্রে আর গ্রথিত নয়; তাহার সমস্ত সাধনা, সমস্ত শুভ বুদ্ধি, সমগ্র ব্যক্তিত্বই যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, খণ্ড ছিন্ন, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রচেষ্টার স্তূপ; শান্তির মূলে যে ঐক্য, যে সমাধির ভাব, তাহা না থাকায় আধুনিক ইউরোপে এত অশান্তি ও অনাচার। আর আগেই বলিয়াছি, ইউরোপের ইতিহাসই এখনকার পৃথিবীর ইতিহাস, কাজেই পৃথিবীতেও সেই অশান্তি ও অনাচার।

প্রবন্ধের প্রথমেই যে ইংরেজী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে সায় দিতে পারিতেছি না। কারণ মধ্যযুগের পরে নিখিল-ইউরোপীয় আদর্শ বলিয়া কোন একটি আদর্শকে গ্রহণ করা যায় না। মধ্যযুগের সাধকের অংশ বাদ দিলে আর যে সমস্ত আদর্শের কথা লেখক বলিয়াছেন, তাহা দেশ বিশেষের আদর্শ—নিখিল-ইউরোপীয় আদর্শ নয়। কোনটা বা ফ্রান্সের পক্ষে সত্য, কোনটা ইংলণ্ডের পক্ষে, কোনটা ইটালীর পক্ষে, কিন্তু কোনটাই সমগ্র ইউরোপের পক্ষে সমান-ভাবে সত্য নয়।

উনবিংশ শতকের পক্ষে তাহা আরও অধিক অসত্য; এই দুই শতাব্দীতে, ইউরোপের পক্ষে তো দূরের কথা, কোন বিশেষ দেশের পক্ষেও সত্য এমন একটি আদর্শ আছে কিনা সত্য! আমরা অকস্মাৎ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবে দেশীয়, স্থানীয়, কালীয় ও সম্প্রদায়গত হইয়া পড়িয়াছি। দেশ, কাল, স্থান, জাতির মহত্ত্বের দ্বারা নয়, অতি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার দ্বারা আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি—মানবের সমগ্রতার ধারণা আমাদের ধ্যানেরও অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। আর ইহাকেই বলে, ইতিহাস বিধাতার পরিহাস। কেবল মাত্র রেল, টেলিগ্রাফ ও যাতায়াতের সুবিধার উপরে নির্ভর করিয়া, বাহ্যত পৃথিবীটাকে করতলগত ভাবিয়া, আমরা নিজেদের হঠাৎ বিশ্বের অধিবাসী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলাম; কিন্তু বিশ্বের মহত্ত্ব বিশ্বের বাহ্যরূপ নয়, পৃথিবীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ নয়; তাহার ধারণা কেবলমাত্র অনায়াসে এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাতায়াত করিলেই উপলব্ধি হয় না; তাহা একটি ভাবরূপ; তাহা বিস্তৃতি নয়, গভীরতা; বাহ্য পদার্থ নয়, অন্তর্নিহিত আইডিয়া; তাহার সন্ধান টমাস কুকের অফিসে নাই; পি. এণ্ড ও. কোম্পানির জাহাজ তাহার দিগ্‌দর্শন জানে না; তাহা ধ্যানের সামগ্রী, কল্পনার ধন। কাজেই যখন আমরা 'বিশ্বজনীন' হইয়াছি বলিয়া উল্লাস করিতেছি, তখন উপকথার নির্ব্বোধ কুম্ভীরের মত শৃগালের পা ধরিয়াছি মনে করিয়া বটের শিকড় মাত্র কামড়াইয়া পড়িয়া আছি।

এক কথায় আমরা আইডিয়া ছাড়িয়া তথ্যের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি ; আর তথ্যের তো অন্ত নাই, কাজেই এক তথ্য হইতে তথ্যান্তরে বিভ্রান্তের মত ঘুরিয়া মরিতেছি। আমাদের প্রাতঃকালের উদ্বোধন খবরের কাগজ দিয়া ; যে খবরের কাগজ তথ্যের হরির লুঠের আখড়া মাত্র—আমরা একবার এদিকে, একবার ওদিকে, একবার সেদিকে, ইতস্তত বাতাসা কুড়াইয়া ফিরিতেছি। আমাদের কাছে মেক্সিকোর আলুর চাষ ও বাংলা দেশে ক্ষ্যাপা কুকুরের উপদ্রব সমমূল্য ; ইংলণ্ডের শ্রমিক ধর্ম্মঘট ও মিসিসিপির প্লাবন ; হিট্‌লারের হুমকি ও মাজদিয়ার সংঘর্ষ ; চেম্বারলেনের চাতুরি ও কুমার ডাঙার হরিসভা ; সবই আমাদের কাছে সমান। আমরা তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মত ইতস্তত মাথা কুটিতে কুটিতে প্রবল অবশ্যম্ভাবীর মুখে ভাসিয়া চলিয়াছি। এইসব তথ্যের সঞ্চয়ের দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া আমরা ভাবিতেছি—আমরা বিশ্বের অধিবাসী, তাই বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু মূল কথাটা ভুলিয়া গিয়াছি যে, বিশ্ব তথ্যস্তূপ নয় ; তাহা একটি আইডিয়া। আমরা মহাকাব্য ছাড়িয়া সংবাদপত্র ধরিয়াছি, অথবা সংবাদপত্রই আমাদের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে ; সংবাদপত্রই আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, আমাদের ইলিয়াড, ওডিসি, আমাদের ফাউস্ট ও ডিভাইন কমেডি।



মৃত্যুভয়

ডঃ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ডি. টি. এম.

মানুষের মৃত্যু কি অবশ্যম্ভাবী আর অনিশ্চিত হ'তেই হবে? আমাদের মনে থেকে থেকে এই প্রশ্ন জেগে ওঠে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সেদিনকার একটা ঘটনা মনে প'ড়ে যাচ্ছে।

আজকাল অতিরিক্ত গরম পড়েছে ব'লে রোজ সকালে আমি গঙ্গায় স্নান করতে যাই। সেদিন স্নান করতে করতে দেখি, একজন ভদ্রলোক জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন। শুনলাম তাঁকে হাঙ্গরে কামড়েছে। লোকে তাঁকে জল থেকে টেনে তুললে। দেখা গেল পায়ের অনেকখানি কেটে গেছে, খুব রক্ত বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তারপর শুনতে পেলাম ক্ষত স্থান সেপ্‌টিক হয়ে তাঁর শরীরের রক্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। হাসপাতালেই তিনি মারা গেলেন। সেদিনকার ঘটনাটা যারা প্রত্যক্ষ করেছে, তারা সকলেই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে। অনেকে গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। মৃত্যুকে আমরা সকলেই অত্যন্ত ভয় করি। আমরা জানি যে, ওর ওপর কারো কোন হাত নেই।

তবু কিন্তু মন একথা একেবারে নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে চায় না। কেনই বা মানুষের মৃত্যু হবে, কেনই বা তাকে এমন করে অকস্মাৎ লুপ্ত হয়ে যেতে হবে? বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান দেখতে দেখতে কতই উন্নতি ক'রে ফেললে, কত অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুললে, কিন্তু যে দিক দিয়ে যত উন্নতিই করুক, মানুষের বিজ্ঞান তার নিজের মৃত্যুকে নিবারণ করতে পারেনি। তাই যদি না পারে তো বিজ্ঞানের সার্থকতা কোথায়?

এই রকম অনেক কথাই আমরা মনে মনে ভাবি। মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের দারুণ বিভীষিকা। এই যে আমি সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এতটা বড় হয়ে উঠলাম, চারিদিকে মায়ামমতার শিকড় বিস্তৃত ক'রে দিয়ে নিজকে শক্ত ক'রে স্থাপনা করলাম, অনেক কাল ধ'রে গ'ড়ে ওঠা আমার এই পুরানো অস্তিত্বটা মৃত্যুর আক্রমণে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে, একথা আমি কিছুতেই স্থির চিত্তে ভাবতে পারি না। কাতর হয়ে বৈজ্ঞানিকের কাছে ছুটে যাই; তাকে জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি আমায় অভয় দিতে পার? সে বলে, মৃত্যুকে ভাল ক'রে জান, তা হ'লেই ভয় ঘুচে যাবে। অতএব মৃত্যুকে আমরা জানতে চাই। বৈজ্ঞানিক তখন বলে, আগে জীবন কাকে বলে তা জান, তারপর মৃত্যু কাকে বলে তা জানতে পারবে।

বৈজ্ঞানিক বলে, বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম থেকেই জীবনের অস্তিত্ব সুরু হয়নি। প্রাণ এবং প্রাণীজগৎ এই পৃথিবীর উপর চিরকাল ধ'রেই বিরাজ করছে না। আমাদের এই পৃথিবীটাই চিরকালের জিনিস নয়। কোটি কোটি সৌরজগৎ এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে রয়েছে, আমাদের সৌরজগৎ ঐ কোটি কোটির মধ্যে একটি মাত্র। আমরা আকাশে যে অগণিত নক্ষত্র দেখি, তার প্রত্যেকে এক এক সূর্য, এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে আমাদের মত এক এক সৌরজগৎ আছে। কিন্তু সবগুলিই নিদারুণ উত্তপ্ত অগ্নিপিণ্ড

মাত্র, তার মধ্যে কোনখানেই জীবনের কোনো অস্তিত্বই সম্ভব নয়। কেবল এই অগণিত সূর্য্যের মধ্যে দৈবক্রমে একমাত্র আমাদেরই সূর্য্য হতে প্রায় দুই শত কোটি বছর পূর্ব্বে এক টুকরা বাষ্পময় জলন্ত অগ্নিপিণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র গ্রহরূপে প্রদক্ষিণ করতে লাগল, এবং সেইটেই হ'ল আমাদের পৃথিবী। কালক্রমে এই অগ্নিগোলক ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল, তখন এর ওপর ছাল পড়তে লাগল, এবং ক্রমে ক্রমে এর ওপর মাটী ও জলের সৃষ্টি হ'ল। তখন ঠাণ্ডা জায়গা পেয়ে এর উপর প্রথম জীবনের সূত্রপাত হ'ল। সেও অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের কথা, প্রায় ত্রিশ কোটি বৎসরের বেশি নয়। জীবনের যখন একবার সূত্রপাত হ'ল, তখন থেকেই তার ধারাবাহিকতা আর উন্নতি চলতে লাগল। প্রথমে হ'ল জলচর প্রাণী, তার থেকে হ'ল স্থলচর, তার থেকে স্তন্যপায়ী জীব, তার থেকে শেষকালে হ'ল মানুষ। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব তিন লক্ষ বছরের বেশি নয়। তবে এ সমস্তই আনুমানিক।

জীবনের এইটুকু ইতিহাসও আমরা জানতাম না, এখন সবেমাত্র জানতে পেরেছি। মানুষের জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছে চার পাঁচ হাজার বছর মাত্র এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে মাত্র তিন চার শত বৎসর। কালের পটভূমিতে আমরা সদ্যোজাত শিশুর মত সবে মাত্র চোখ মেলে চেয়েছি। জীবনের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট। বারো শত বৎসর আগে জ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবনকে তুলনা করতেন দুর্য্যোগ রাত্রের উড়ন্ত পাখীর সঙ্গে। এই পাখী যেন অন্ধকার দুর্য্যোগের রাত্রে উড়ে এসে ঢুকে পড়েছে এক আলোকিত গৃহের মধ্যে। যতক্ষণ এখানে রইল ততক্ষণ সে আলো আর উত্তাপ আর আশ্রয় পেল, মাত্র ততক্ষণের জন্যেই সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারপর আবার সে উড়ে চ'লে গেল ঐ দুর্য্যোগের অন্ধকারের মধ্যে। কোথা থেকে সে এসেছিল আর কোথায় চ'লে গেল, তা কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু জীবনের প্রহেলিকার কথা ছেড়ে দিয়ে তার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলতে পারি। আমরা জানি, জীবনের লক্ষণ কি কি! জীবনের প্রথম লক্ষণ সে নড়ে বেড়ায়, স্থির হয়ে থাকে না। দ্রুতই হোক কিংবা মন্থরই হোক, কিছু চাঞ্চল্য তার থাকবেই। দ্বিতীয়ত জীবন মাত্রেরই কিছু খোরাক চাই, এই খোরাক বাহির থেকে ভিতরে গিয়ে হজমের দ্বারা নিত্য নূতন নূতন তেজে পরিণত হবে। আর তৃতীয়ত জীবনের লক্ষণ সে একাই স্বপ্রধান হয়ে থাকবে না, তার নিজের মধ্য থেকে আরও নূতন জীবনকে সে প্রসব করবে। জীব মাত্রই এক থেকে বহুর জন্ম দেবে, এই তার এক ধর্ম্ম। কেবল তাই নয়, জীব মাত্রই পরস্পর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন, প্রত্যেক জীবই নিজ নিজ সন্তান উৎপাদনের দ্বারা তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে আপনার বংশপরম্পরা বজায় রেখে যাবে। আর একটা মস্ত কথা এই যে, জীবনহীন পদার্থ থেকে কখনও জীবনের উৎপত্তি হতে পারে না।

তবে জীবশূন্য পৃথিবীতে প্রথম জীবের সৃষ্টি সম্ভব হ'ল কেমন ক'রে? সেই ত্রিশ কোটি বৎসর আগে যখন এখানে জীবনের অস্তিত্বই ছিল না, তখন প্রথম জীবের আবির্ভাব ঘটল কেমন ক'রে? সে কথার জবাব দেওয়া যায় না। মাত্র এই কথাই বলা যায় যে, দৈবক্রমে একবার মাত্র সেটা ঘটে গেছে। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হতে হতে কতকগুলো অণুপরমাণু

একত্র সন্নিবেশ হয়ে এমনই কতকগুলো অদ্ভুত বস্তু গড়ে উঠল, যার আভ্যন্তরিক কার্য্যপরম্পরা সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়ে জীবনের মেশীন হঠাৎ চলতে সুরু ক'রে দিলে, যেমন ঘড়ির কলকব্জাগুলো একত্র সন্নিবেশ ক'রে তাতে দম দিয়ে দিলে ঘড়ি চলতে সুরু ক'রে দেয়। ঐরকম ভাবে কৃত্রিম উপায়ে অণুপরমাণুর সন্নিবেশের দ্বারা জৈব পদার্থ গড়তেও পারা গেছে সুতরাং ওর মধ্যে জীবনের অনেক রকম লক্ষণ আরোপ করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ একটি জীবের সৃষ্টি করতে পারেনি।

বিজ্ঞান তাও এখনো পারেনি, আর জীবের মৃত্যুকেও বিজ্ঞান এখনো রোধ করতে পারেনি। জীবনের আর সমস্ত লক্ষণই মোটামুটি ভাল, কেবল এইটাই তার সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ যে, যদিও সে নতুন জীবনের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু তবু নিজেকে সে চিরস্থায়ী ভাবে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু কেনই বা এমন হয়? তবে কি জীবের দেহটা আর তার জীবনটা দুটো স্বতন্ত্র জিনিস, যতক্ষণ জীবনটা তার মধ্যে থাকে ততক্ষণ সমস্ত কাজগুলোই তার বেশ চলতে থাকে, আর জীবনটা তার ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেই সমস্ত থেমে যায়?

লোকে এই কথাই বলে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান এখন এ কথা আর বলছে না। বিজ্ঞান বলছে, Life is the expression of the working of a delicate machine which works because it is marvellously attuned to the environment. অর্থাৎ যেমন আমরা ঐ ঘড়ির কলকব্জার কথা বলছিলাম, তেমনি আমাদের দেহের মেশীনগুলো বাইরের আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমনি সূক্ষ্মভাবে সুরে বাঁধা হয়ে আছে, যে সেইজন্যেই সে চলতে থাকে, এবং জীবন বলতে আমরা যা বুঝি তা ঐ সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলারই অভিব্যক্তি মাত্র। এই মেশীনের মধ্যে মেরামতিরও অনেক রকম ব্যবস্থা করা আছে। যাতে সামঞ্জস্য সহজে নষ্ট না হয় তারও অনেক রকম উপায় করা আছে। সুতরাং হাতখানা কিংবা পা খানা যদি কাটা প'ড়ে যায় তা হ'লেও জীবন নষ্ট হবে না, যদি খানিকটা রক্ত বেরিয়ে যায় কিংবা কোন একটা যন্ত্র বিকল হয়ে যায়, তা হ'লেও জীবন সহজে নষ্ট হবে না,—কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক কিছু ঘটলেই মেশীনটা থেমে যাবে।

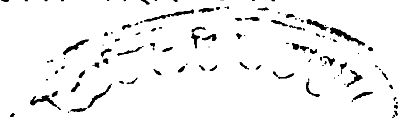
এ রকম কথা বলবার অনেক কারণ আছে। জীবের মৃত্যু ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গীন মৃত্যু ঘটে না, তার শরীরের অনেকগুলো অংশ তখনও বেঁচে থাকে। আপনারা জানেন যে জীবদেহের প্রত্যেকটা অংশ, তার প্রত্যেকটা টিসু এবং প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবকোষ, সমস্তই জীবন্ত এবং এই সমস্ত জীবকণিকার একত্র সমাবেশ নিয়েই একটি বৃহত্তর প্রাণীর জীবন সামঞ্জস্যের সঙ্গে গঠিত। কোন একটা মারাত্মক জায়গায় এর কোন একটা বিশেষ আবশ্যকীয় ক্রিয়া যখনই হঠাৎ থেমে যায়, তখনই এর সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, তখনই হয় মৃত্যু। দেখা গেছে যে, রোগের কারণেই হোক কিংবা দুর্ঘটনার কারণেই হোক, মৃত্যু প্রথমে সাধারণত তিন রকম ভাবেই ঘটে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে হয় হার্টফেল করে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থেমে যায় (যাকে বলে Syncope), না হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া থেমে যায় (যাকে বলে asphyxia), না হয় মস্তিষ্কের পরিচালনা ক্রিয়া থেমে যায় (যাকে বলে coma)। সুতরাং মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ যাই থাকুক

মৃত্যু ঘটবার পূর্ব্বে দেহের মেশীনটার চলা ঐ তিন জায়গার এক জায়গায় থেমে যাওয়া চাই। সেই জন্য পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয় ঐ সকল ক্রিয়াগুলো থেমে গেছে কিনা, তবেই বুঝতে পারা যায়—মৃত্যু ঘটেছে কি না।

কিন্তু মেশীন চলা থামলেও তখনও তার মৃত্যু হয়নি, আবার যদি কোন রকমে মেশীনটা চালাতে পার তবে আবার গোটা মানুষটাই বেঁচে উঠবে। তার টিস্যুগুলো তখনও মরেনি, সব বেঁচে আছে। সুতরাং এই যে মৃত্যু, এ তখন সম্পূর্ণ মৃত্যু নয়, একে তখন বলা হয় somatic death; অর্থাৎ ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া মাত্র, তারপরে ক্রিয়াও নেই, সামঞ্জস্যও নেই; তখন জীবন্ত সত্ত্বেও টিস্যুগুলো এবং কোষগুলো প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে আর বেঁচে থাকতে পারে না, তখন ধীরে ধীরে তাদেরও মৃত্যু ঘটে, তখন হয় molecular death। জীবদেহের মেশীন একেবারে থেমে গেলে পুনরায় তাকে চালিয়ে দেবার কৌশলটা এখনও আমরা জানি না, তাই somatic deathএর পর molecular death অনিবার্য্য হয়। যারা সুস্থ দেহে হঠাৎ গুরুতর শক্ পেয়ে ম'রে যায় তাদের শরীরে কোন যন্ত্রই বিকল হয় না, কেবল থেমে যাওয়া মেশীনকে আমরা চালিয়ে দিতে জানি না ব'লেই তারা বাঁচে না, নইলে তারা আবার বহু কাল বাঁচতে পারে। সুতরাং মৃত্যু মানেই যে জীবের সর্ব্বাঙ্গীণ মৃত্যু—এ কথা ঠিক নয়।

এ কথার প্রমাণ এই যে, সদ্য মৃত জীবের কোনো টিস্যু বিচ্ছিন্ন ক'রে যদি তাকে অনুকূল অবস্থায় যত্ন করে রাখা যায় তবে সে টিস্যু স্বতন্ত্রভাবে আবার অনেককাল বাঁচবে। বস্তুত বিজ্ঞান এখন বলছে যে জীবকোষ মাত্রই potentially immortal, অর্থাৎ স্বভাবত অবিনশ্বর, কেবল অনুকূল অবস্থায় থাকতে পায় না ব'লেই কোষগুলি মরে যায়। বিজ্ঞান একথা কার্য্যত প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছে। Strangeways নামক এক বৈজ্ঞানিক জীবকোষকে অনুকূল অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখবার এক রকম উপায় আবিষ্কার করেছেন, তার নাম টিস্যু কাল্‌চার। এতে জীবন্ত কোষগুলিকে কোন সদ্য মৃত জীবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে এক রকম ইন্‌কিউবেটরের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, তাতে খাদ্য এবং উত্তাপ নিত্য সরবরাহ করা হতে থাকে, এবং বাইরের থেকে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের দ্বারা ঐ সকল কোষের কার্য্যাবলি পর্য্যবেক্ষণ করতে পারা যায়। এই উপায়ে যে কোন জীবের কোষকেই জীইয়ে রেখে দেওয়া যায়, সে কোষ অনেক কাল পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। আমেরিকার রক্‌ফেলার ইন্‌ষ্টিট্যুটে ১৯১১ সালে একটি মুরগীর বাচ্চার হার্ট খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে টিস্যু কাল্‌চার ইন্‌কিউবেটরের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল, এখনও পর্য্যন্ত সে কালচার নষ্ট হতে দেওয়া হয়নি। দেখা যাচ্ছে যে আজও পর্য্যন্ত সেই কোষ বংশ-পরম্পরায় বেঁচে রয়েছে, তার মধ্যে থেকে কোন কোষই আপনা আপনি মরেনি। কিন্তু সেই মুরগীটা যদি তখন বেঁচে থাকত, তবে এত বৎসর কাল কি তার বাঁচা সম্ভব হ'ত? কতদিন আগেই সে মরে যেত।

বিজ্ঞান বর্ত্তমানে এতটা পর্য্যন্ত এগিয়েছে। অন্তত জীবদেহের অংশবিশেষকে নিয়ে সে অনেক কাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তাই যখন সম্ভব হয়েছে তখন মানুষের বুদ্ধি মৃত্যুকেও একদিন জয় করতে পারবে। মানুষের জীবনের এখনও শৈশব অবস্থাই চলেছে। এর পর তার জ্ঞানের



উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকবে। তার বিজ্ঞান উত্তরোত্তর সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে। মানুষ এই অল্পকালের মধ্যেই অনেক রোগকে জয় করতে পেরেছে, অনেক অকাল মৃত্যু নিবারণ করতে পেরেছে অনেক সমস্যার মীমাংসা করতে পেরেছে। এর আরো পাঁচ হাজার বছর পরে মানুষের অবস্থার কথা ভাবা যাক। তখনকার জীবন রোগশূন্য নিশ্চয়ই হবে, হয়তো মৃত্যুশূন্যও হতে পারে। তখনকার সেই নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চিত জীবনের দিনে মানুষ কল্পনাই করতে পারবে না যে, এখনকার দিনের মানুষ এমন বিপন্ন জীবন নিয়ে কেমন ক'রে বাস করত, এবং রোগের দ্বারা কিংবা অপঘাতের দ্বারা অথবা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের দ্বারা কেমন ভাবে টপ টপ ক'রে মরে যেত।

এটাও যদি আশা না করা যায়, তবু অন্তত এটুকু বলা যায় যে, মানুষ চিরকাল এমনি অসহায় ভাবে যখন তখন মরবে না, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানুষের মৃত্যু সম্বন্ধেও নিশ্চয় কিছু উন্নতি হবেই। তখন হয়তো প্রত্যেক মানুষ সম্পূর্ণ পরিপক্ক বয়সে জেনে শুনে ধীরে সুস্থে প্রস্তুত হয়ে মরবে, এখনকার মত আর মৃত্যুভয় থাকবে না। জ্ঞানের অভাবই মৃত্যুভয়ের একমাত্র কারণ। বর্ত্তমানে মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের মনে যে বিভীষিকা আছে তা অনেকটাই আমাদের কল্পনার তৈরি, মৃত্যু দেখে আমাদের মনে যে আতঙ্ক জাগে তার থেকেই ওটার সৃষ্টি। তা ছাড়া পাঁচ রকম লোকের কথায় এবং নানা রকম নাটক নভেল থেকেও মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের একটা ভুল ধারণা জন্মে গেছে। কিন্তু সত্যিকার মৃত্যুতে প্রায়ই কোন কষ্ট থাকে না; কোন অনুভূতি থাকে না, জানতে পারা যায় না যে, আমি মরছি। যারা সত্যিকার মৃত্যুমুখ থেকে দৈবাৎ ফিরিয়া আসে তারা এই কথাই বলে, খুব যে কষ্ট পেয়েছে কিংবা কিছু জানতে পেরেছে এ কথা তারা কখনই বলে না। রোগে অবশ্য যন্ত্রণা হয়, কিন্তু মৃত্যুর রোগ আর সেরে উঠবার রোগ, দুইয়ের যন্ত্রণাই সমান। বরং সেরে উঠবার রোগেই লোকে বেশি যন্ত্রণা পায় এবং সেইগুলোতেই ভয় পেতে থাকে যে ম'রে যাবে। আসল মৃত্যুর রোগে সে ভয়টা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না, কল্পনা অত দূরে যেতে পারে না, রোগীর মন তখন প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের কষ্টগুলোর কথা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকে। তারপর মরবার কিছুক্ষণ আগে থেকেই তার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে যায়, তার অনুভব শক্তি অসাড় হয়ে যায়, তখন আর কোন কষ্টই সে টের পায় না। তখন যা কিছুই সে করে, তা কলের পুতুলের মত অজানিতভাবে করে। ক্লোরোফরম করলে যেমন লোকে অজানিতে উত্তেজিত হয় এবং অজানিতে অনেক কথা কয় এও কতকটা সেইরকম। ক্লোরোফরমের ক্রিয়ার মত মৃত্যুর আসবার ঐ রকমই একটা পদ্ধতি আছে, একটা পর্য্যায়ক্রমিক পন্থা আছে। লোকে বলে নিভবার আগে প্রদীপের মত মানুষের জ্ঞানচক্ষু মরবার আগে একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু এ কথাও ঠিক নয়। অচৈতন্য উত্তেজনার ফলে যেটা দেখা যায় এবং শোনা যায়, সেটাকেই লোকের ঐ রকম মনে হয়।

মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের ভয় অনেকটা মিথ্যা, অনেকটা কাল্পনিক। এ সম্বন্ধে লোকে পূর্ব্বে যা বলত, তাই আমরা বিশ্বাস ক'রে এসেছি। কিন্তু আগে লোকে এ রকম কথা বলে, পরে আবার অন্য রকম কথা বলে, কারণ আগে লোকে যেটা অস্পষ্টভাবে জানে, পরে সেটা বিশেষ ক'রে জানে।

এই বিশেষ ক'রে জানার নাম বিজ্ঞান। সুতরাং আগে লোকে যেটা বলত সেটা বিশ্বাস করার চেয়ে পরে বিজ্ঞান যেটা বলছে সেটাকেই বেশি বিশ্বাস করা উচিত।

আমার বক্তব্য শেষ হ'ল। কিন্তু শেষকালে একটা কথা সংশোধন ক'রে নেওয়া দরকার। আগে আপনাদের যে গল্পটা বলেছিলাম এবং যার থেকে এতগুলো প্রশ্নের সৃষ্টি হ'ল, পরে ভাল ক'রে খবর নিয়ে জানা গেল যে, গল্পটা অধিকাংশ মিথ্যা। গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে সেই ভদ্রলোকটির পা সত্যই কেটে গেছে এবং সত্যই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে যাতে তার পা কেটেছে সেটা আসলে হাঙ্গর নয়, হয়তো সেটা ধারালো গাছের ডাল কিংবা ভাঙা বোতল। আর লোকটা মোটেই মরেনি, বেঁচেই রয়েছে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। যাই হোক, এখন আপনারা দেখছেন তো, সত্য যতটুকু তা মিথ্যার আবরণে জড়িয়ে কত বড় বিরাট আকার ধারণ করে? মানুষের কল্পনা এমনিই সত্যকে মিথ্যা দিয়ে জড়ায়। মৃত্যু বিষয়েই হোক, আর যে কোনো বিষয়ই হোক, কল্পনাকে বরাবরই একটু কম ক'রে বিশ্বাস করবেন।

পাশব

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

এখনো হল না শেষ
সন্দেহ সংশয় দ্বিধা আজও তব হল না নিঃশেষ,
বুঝিলে না আজও তুমি বুঝি
মিটাতে তোমার দাবি নিঃশেষিত হয়ে গেছে
　　　　যত মোর পুঁজি।
তোমার তুষ্টির তরে শুধু আরাধনা,
অবহেলা করিয়াছি জীবনের অন্যান্য সাধনা।
বৃথা বারে বারে
তীব্রতম ব্যগ্রতায় হানিয়াছি করাঘাত রুদ্ধ তব
　　　　অন্তরের দ্বারে।
আজিও অর্গল বদ্ধ রহিয়াছে তোমার দুয়ার
প্রতীক্ষায় তবু বল, রহিব অপেক্ষা করি কত কাল আর?
হে জড় মৃত্তিকা, বল কত আর বাকি,
একনিষ্ঠ প্রেমমন্ত্রে চিত্তের প্রতিষ্ঠা বল
　　　　আজিও তোমাতে হবে না কি?
প্রাণের চাঞ্চল্য মোর প্রবাহিত রক্তবাহী শিরায় শিরায়
সে উষ্ণ শোণিত আজও সঞ্চালিত হবে নাকি নিশ্চল
　　　　অসাড় শুষ্ক জড় মৃত্তিকায়।
যৌবন বুভুক্ষা মোর উন্মত্ত অধীর
ব্যর্থ ক্ষোভে ভাবিয়াছ বিরলে ফেলিবে বসি শুধু অশ্রুনীর?
প্রেমের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় হোক শঙ্কা নাহি তাতে,
পাশব শক্তির হিংস্র মত্ততার ক্রুদ্ধ পদাঘাতে
লৌহের অর্গল তব চূর্ণ হয়ে যাবে,
সুদৃঢ় পেষণে মোর আত্মহারা মুহূর্তেই সম্বিৎ হারাবে।
নিমিষে বিলীন হবে প্রেমের সে মূল্যহীন ভীরু কুজ্ঝটিকা,
ক্ষুধিত বুভুক্ষু বক্ষে উঠিবে প্রোজ্জ্বল হয়ে কামনার
　　　　তীব্র বহ্নিশিখা,
মনোহীন তনু তব, মনোরমা তবুও আমার
প্রদীপ্ত বাসনানলে মুহুর্মুহু দগ্ধীভূত হবে অনিবার।

"চুড়্কী"

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

মাঝারি গোছের একটি কয়লাকুঠী,—সাহেব কোম্পানির অতি আধুনিক কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম কিছুরই অভাব নাই। রাণীগঞ্জটালির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুলী-ধাওড়া—ধাওড়ার প্রত্যেক ঘরে, একটি করিয়া জানালা ও সামনে ছোট্ট একটু ঘেরা বারাণ্ডা। অনতিদূরে কুলীদের হাত পা ধুইবার সুবিধার জন্য চারিদিকে সিঁড়িবাধানো প্রায় পুকুরের মতন প্রকাণ্ড চৌচাচ্চা; কিন্তু এত সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাঁওতালেরা বিশেষ কেউ সেই ধাওড়ায় থাকে না।

সাঁওতালেরা স্বভাবতই একটু নির্জ্জনতাপ্রিয়, আড়াল খুঁজিয়া বেড়ায়, একেবারে হাটের ভিতর বাস করিতে ভালবাসে না, তা ছাড়া একটু গাছ-পালার আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিতে না পারিলে হাঁপাইয়া উঠে। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, যেখানেই দুচার ঘর সাঁওতালের বাস সেখানে কিছু না কিছু গাছপালা আছেই। এক কালে উহারা ছিল প্রকৃতির দুলাল,—অধুনা কয়লাখাদের দূষিত পরিমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পূর্ব্ব প্রকৃতি অনেকটা নষ্ট হইয়া গেলেও মজ্জাগত সংস্কার সব একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই। ফলে কুলী-ধাওড়া হইতে বেশ খানিকটা দূরে ঝাঁকাল এক জোড়া বট-অশ্বত্থগাছের তলায় দেখা যায়—একটি সাঁওতাল পল্লী। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এই সাঁওতাল পল্লীতে বড়ই গোলমাল বাধিয়াছে। পরিবার বৃদ্ধিহেতু প্রয়োজনানুযায়ী স্থানের অকুলান হওয়াতে নানারূপ কলহ বিবাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া একদল তরুণ-তরুণী অন্যত্র নীড় বাঁধিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

এই দলের প্রধান পাণ্ডা হইল চুড়্কী, তাহারই মাথায় আসিয়াছে এই পরিকল্পনা। সমস্ত সাঁওতাল পল্লীর মধ্যে এই মেয়েটিই সব দিক দিয়া সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিটোল স্বাস্থ্যভরা সুন্দর গঠন, চমৎকার মুখশ্রী একমাথা কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে টানা টানা ভুরুর নীচে উজ্জ্বল দুটি চোখ, কাজে কর্ম্মেও তাহার জুড়ী মেলা ভার। গোবর মাটির প্রলেপ দিয়া সুন্দর ভাবে ঘর নিকাইতে, ঘরের দেওয়ালে নানারূপ কারুকার্য্য করিতে এবং অন্য সর্ব্ববিধ কার্য্যে চুড়্কীর সমান আর কেহই ছিল না। রূপে গুণে চুড়্কীই ছিল সাঁওতাল পল্লীর শ্রী ও ঐশ্বর্য্য।

ওর মধ্যে যেমন একটি সহজ সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল, তেমনিই একটি সহজাত মর্য্যাদাবোধ ও প্রকৃত অভিজাত্য ওর চরিত্রকে ঘিরিয়া রাখিত, অন্য সাধারণ পাঁচজনের চেয়ে এইখানে ছিল ওর আসল্ পার্থক্য। এইখানে ছিল ও সকলের চেয়ে দূর। সাংসারিক খুঁটি-নাটি বিষয় লইয়া তুচ্ছ কলহবিবাদ ওর মনকে অত্যন্ত পীড়া দিত। সর্ব্ব প্রকার হীনতা ও নীচতা হইতে দূরে থাকিবার জন্য ও প্রাণপণ চেষ্টা করিত। সুতরাং স্থানাভাব লইয়া সাঁওতাল পল্লীতে যখন অশান্তি ও বিরোধ

ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, চুড়্‌কী অতিষ্ঠ হইয়া শেষে প্রস্তাব করিল যে, এইরূপ গোলমাল অপেক্ষা কয়েকজন অন্যত্র যাইয়া বাস করিলেই হয় ভাল।

চুড়্‌কীর স্বামী বুধন ছিল নেহাৎ সাধাসিধা ধরণের মানুষ, অপরিমিত দৈহিক শক্তির জোরে সে সারাদিন অক্লান্ত ভাবে খাদে খাটিত আর অবসর সময় বাঁশী বাজাইত। সংসারের অন্য যাবতীয় ভার ছিল চুড়্‌কীর উপর। সে অনায়াসেই চুড়্‌কীর প্রস্তাবে রাজী হইল। আরও পাঁচ সাতজন তরুণ-তরুণীও তাহাদের সঙ্গী হইতে সম্মত হইল। দলের প্রবীণ প্রবীণারাও সানন্দে মত দিলেন। সাঁওতাল-দের ভিতর এরূপ ভাবে পুরাতন আবাস ত্যাগ করিয়া নববাসস্থান নির্ম্মাণ করা এমন কিছু নূতন বা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। এইরূপ উহারা প্রায়ই করিয়া থাকে, চুড়্‌কী ইতিমধ্যে একটি স্থান বাছিয়া রাখিয়াছে। উহাদের পল্লী হইতে মাইলখানেক তফাতে ছোট একটি ডোবার ধারে কয়েকটি কদম গাছে ঘেরা গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী সুন্দর সেই স্থান। হাটে যাওয়া আসা করিবার পথে দেখিয়া ঐ জায়গাটি চুড়্‌কীর ভারি ভাল লাগিয়াছে, অন্য সকলেও ঐ জায়গাটিতে অপছন্দের কিছু পাইল না। মানুষের তো পচ্ছন্দ হইল, এইবার দেবতার মনোনীত হইলেই আর কোন বাধা থাকে না; গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইতে পারে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় চুড়্‌কীরা সদলবলে যাইয়া প্রথানুযায়ী কদমগাছের ডালে একটি মুরগী বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল, পরদিন প্রত্যূষে যখন দেখা গেল মুরগীটা সেইখানেই রহিয়াছে কেহ লইয়া যায় নাই—মরিয়াও যায় নাই, সকলেরই খুব আনন্দ হইল, তখন ডাক পড়িল বৃদ্ধ রূপা মাঝির 'তেলপাত' করিবার জন্য। 'তেলপাত' হইল এক প্রকার সাঁওতালী অনুষ্ঠান, কোন স্থানে বসবাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেবতার সম্মতি আছে কিনা জানিয়া লওয়া হইল এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সাঁওতালী পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পূজা করেন। পূজা শেষে তাঁহারই মুখ দিয়া দেবতার আদেশ নিঃসৃত হয়, চুড়্‌কীর মনোনীত স্থান এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইল। তখন আর কোনই বাধা রহিল না, পরদিন হইতেই বাঁশ খড় মাটি আনিয়া গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া গেল, কিছুদিনের ভিতরেই ঘর বাঁধা শেষ হইয়া গেল, শুভদিনে শুভলগ্নে চুড়্‌কীরা তাহাদের বাসন-কোসন বিছানা-পত্র পোঁটলা-পুটলী সব লইয়া আসিয়া নূতন জায়গায় কায়েমী হইয়া বসিল, দেখিতে দেখিতে সেই নির্জ্জন প্রান্তর জনকোলাহলমুখরিত লোকালয়ে পরিণত হইল। চুড়্‌কী অতি আগ্রহে পরম যত্নে নূতন ঘরের পারিপাট্য বিধান আরম্ভ করিল, গোবরের সহিত মাটি মিশাইয়া সে সমস্ত ঘরের দেওয়াল এমন সুন্দরভাবে লেপন করিল যে, দেখিলে কে না বলিবে উহা কালো সিমেণ্ট দিয়া তৈয়ারি, যেমন মসৃণ তেমনই নিবিড় কৃষ্ণ, সোনালী রংয়ের নূতন খড়ের চালের নীচে কালো মাটির ঘরখানি দূর হইতে সত্যই ভারি সুন্দর দেখাইত, সেই কালো দেওয়ালের গায়ে চুড়্‌কী সাদা রং দিয়া নানা বিচিত্র ফুল লতা পাতা আঁকিয়া দিল। শীতের শেষে ঘর বাঁধা আরম্ভ হইয়াছিল, এই সব করিতে করিতে গ্রীষ্ম কাটিয়া বর্ষা নামিল। চুড়্‌কী এইবার মন দিল ফুলগাছ সংগ্রহ করিতে, নানান স্থান হইতে সে জোগাড় করিল বেল, যুঁই, জবা ও করবীর ডাল এবং গোটাকয়েক রজনীগন্ধার চারা, দু একটি তরুলতা ও দোপাটির চারাও সে ক্রমে পাইয়া গেল, মহানন্দে সেগুলি সে ঘরের চারিপাশে পুঁতিয়া দিল, তখন তাহার আনন্দ দেখে কে? ক্রমে বরষা নিবিড় হইয়া আসিল, চারিপাশে উঁচুনীচু ছোট ছোট ধানের ক্ষেত—চাষারা

ভিজা জমিতে লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, মাঝে মাঝে ছু একটি ক্ষেতে ধানের চারা জন্মাইয়াছে। চারিদিকে কর্দ্দমাক্ত ধূসরতার মাঝে তাহাদের শ্যামল-হরিৎ অতি চমৎকার দেখাইতেছে, চুড়্‌কীদের বাড়ীর নিকটস্থ কদমগাছগুলিতে অসংখ্য কদম ফুটিয়া মিষ্ট মধুর সৌরভে বাতাস ভরিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় কালের বিচিত্র গতি—চুড়্‌কীর জীবনে একটু দোলা দিয়া গেল। ঘটনার এইরূপ সমাবেশ হইল যাহা চুড়্‌কীর জীবনপথে টানিয়া দিল একটি গভীর রেখা।

কুঠীতে এই সময় একজন পশ্চিমী ফিটার মিস্ত্রি আসিল, এই মিস্ত্রির দক্ষতার খ্যাতি শুনিয়া কর্ত্তৃপক্ষ উহাকে আনাইয়াছিলেন। পশ্চিমী মুসলমান বেশিদিন কয়লা কুঠীতে আসে নাই ; সে স্ত্রীকে লইয়া সকলের সহিত ধাওড়ায় থাকিতে রাজী হইল না, চুড়্‌কীদের ঘরের সম্মুখে যে ডোবাটি আছে তাহার ওপারে একটু দূরে একটি 'হাসপাতাল ঘর' অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া আছে, অন্যত্র নূতন হাসপাতাল ঘর তৈয়ারী হওয়াতে এইটির আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন এইটিকেই পরিষ্কার করিয়া ফিটার মিস্ত্রির বাসস্থান করিয়া দেওয়া হইল, চুড়্‌কীরা সকৌতূহলে ঘর পরিষ্কার করা, ফিটার মিস্ত্রির আগমন সকলই দেখিল, মিস্ত্রির পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্র। ছু একদিন বাদে একদিন ছুপুরে পুকুর ঘাটে চুড়্‌কীর সহিত মিস্ত্রির—স্ত্রী রহিমার দেখা হইয়া গেল, রহিমা বাসন লইয়া ঘাটের ওপারে বাসন মাজিতেছিল, এমন সময় চুড়্‌কী আসিল ঘাটে কাপড় কাচিতে, রহিমা মুখ তুলিয়া চাহিতেই চুড়কীর সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল, কোন লগ্নে—কোন গ্রহের শুভ বা অশুভ দৃষ্টির প্রসাদে যে ছুটি লোকের মধ্যে অনুরাগ বা বিরাগের সৃষ্টি হয় তাহা কে নির্ণয় করিবে ? না জানি কোন্ অনুকূল মুহূর্ত্তে চুড়্‌কী আর রহিমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল—সেই সময় হইতেই যেন উহাদের অন্তরে অন্তরে পরিচয়ের ছায়াপাত হইয়া গেল, যেন উহারা তখনই বুঝিয়া লইল যে, এইবার হৃদয়ের সমব্যথী প্রকৃত দরদী সাথীর সন্ধান পাওয়া গেল।

চুড়্‌কী সাঁওতালের মেয়ে হইলেও—তাহার জন্ম কয়লা কুঠিতে—আশৈশব সর্ব্বজাতির মধ্যে বাস করিবার ফলে সে সামান্য বাংলা বলিতে পারিত—কাজচলাগোছ হিন্দিও জানিত। কাজেই তাহার পক্ষে রহিমার সহিত আলাপ করা কঠিন হইল না। রহিমার বিবাহ হইয়াছে বহুদিন, কিন্তু স্বামীর সহিত কয়লাকুঠীতে আগমন তাহার এই প্রথম, এতদিন সে দেশে-বাপের ঘরে কিম্বা শ্বশুরঘরে থাকিত, মধ্যপ্রদেশের নিভৃত পল্লীর শান্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত রহিমা কয়লাকুঠীর এই হট্টগোলের ভিতর আসিয়া বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, চুড়্‌কীর বন্ধুত্বের আবহাওয়ায় আসিয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। চুড়্‌কীরও রহিমার এই ভীত সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়াই তাহার উপর বেশি মায়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে উহাদের বন্ধুত্ব নিবিড় হইয়া উঠিল।

চুড়্‌কীর দিক দিয়া রহিমার সহিত সখিত্বের আরও একটি বড় আকর্ষণ ছিল—সে রহিমার আট মাসের ছেলে হামিদ। গোলগাল গড়ন, মোটা সোটা ছেলেটি এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, গলায় রূপার হাঁসুলী, পায়ে মল, হাতে মোটামোটা রূপার বালা। ঠাকুর্দ্দা ও দাদামহাশয় উভয়ে মিলিয়া নাতিকে সাজাইয়াছেন, ছেলেটি সবে হামা দিতে শিখিয়াছে, কলহাস্যে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে থামিয়া একটি হাত উপরের দিকে

তুলিয়া এমন ভাবে চোখ বড় করিয়া মায়ের সন্ধানে চারিদিকে তাকায় যে দেখিলেই ইচ্ছা করে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে। ছেলেটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া চুড়কীর নিঃসন্তান মাতৃহৃদয়ে সুপ্ত অপত্যস্নেহ জাগিয়া উঠিল। চুড়্কীর নিজের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না, কিন্তু সে সেজন্য এতদিন কোন অভাব বোধ করে নাই। স্বামীর প্রেমে আর ঘর-দুয়ার সাজানো গোছানো এবং গাছপালার তদারক করা লইয়া হাসিয়া খেলিয়া বেশ আনন্দেই তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। সহসা ভিন-দেশী সখীর এই ছেলেটি তাহার অবচেতন মনের সুপ্ত মাতৃত্বকে সজাগ করিয়া তুলিল। গভীর স্নেহে সে হামিদকে বক্ষে টানিয়া লইল, চুড়্কী ও রহিমার বন্ধুত্ব দিনে দিনে গভীরতর হইয়া উঠিল। চুড়্কী মাঝে মাঝে খাদে খাটিতে যাইত, রোজ যাইত না। বুধন চুড়্কীকে খুব বেশী ভালবাসিত, বদখেয়ালে মজুরীর পয়সা উড়াইয়া দিবার মত স্বভাব ছিল না। তাহাদের স্বল্প প্রয়োজন তাহার একার উপার্জ্জনেই মিটিয়া যাইত। চুড়্কীর খাটিবার প্রয়োজন হইত না, বুধন চুড়্কীকে খাটিতে দিতেও চাহিত না। চুড়্কী নিজেই সখ করিয়া মাঝে মাঝে খাদে যাইত। আর রহিমার দিক দিয়াও খাদে যাইবার প্রশ্নই উঠিত না। সুতরাং প্রায়ই দুই সখীর মিলন হইত। নির্জ্জন কদম্বতল দুইটি তরুণী ও একটি শিশুর কলহাস্যে মুখর হইয়া উঠিত।

এমনি করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতেছিল, এমনই সময় অতর্কিত দুর্ব্বিপাকে রহিমার সুখের ঘর ভাঙিয়া গেল। মানুষের হাতে গড়া সুন্দর একটি আনন্দময় পরিবেশ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

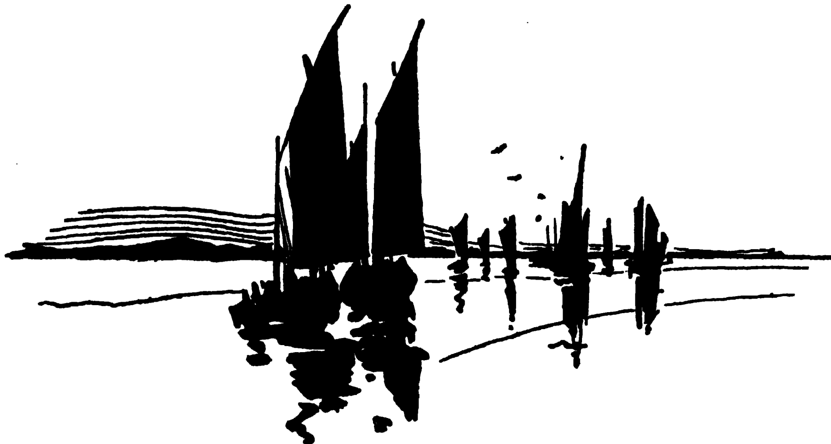
কিছুদিন যাবৎ খাদে জল বাড়িয়া যাওয়ার নূতন একটি পাম্প বসানো হইতেছিল, রহিমার স্বামী সেখানে কাজ করিতেছিল, অনবরত জলের ভিতর দাঁড়াইয়া কাজ করিবার দরুণ তাহার খুব সর্দ্দি হইল, কিন্তু নূতন কাজের উৎসাহে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া সে প্রত্যহই খাদে নামিতে লাগিল। ফলে দু একদিন বাদে একদিন প্রবল জ্বর লইয়া খাদ হইতে উঠিয়া আসিল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিবার দরুণ নিউমোনিয়া হইয়াছে। কয়লাকুঠীর ডাক্তার যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রহিমা চুড়্কীর নিকট ছেলে রাখিয়া প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সকলের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রহিমাকে কাঁদাইয়া, বৃদ্ধ পিতামাতার বক্ষে শেল হানিয়া, সে ইহলোক পরিত্যাগ করিল। শোকবিহ্বলা সখীকে চুড়্কী যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া রহিমার পিতা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল, কাঁদিতে কাঁদিতে সখীর নিকট বিদায় লইয়া রহিমা পুনরায় সুদূর মধ্যপ্রদেশের সেই নিভৃত পল্লীতে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় চুড়্কী হামিদকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, হামিদও চুড়্কীকে ছাড়িতে চাহিতেছিল না। শেষের কয়েক দিন প্রায় সব সময়ই চুড়্কীর নিকট থাকার দরুণ পরস্পরের প্রতি টান আরও বাড়িয়া গিয়াছিল।

চুড়্কীর দিন কাটানো এবার হইতে ভার হইয়া উঠিল। যে সব অভাববোধ ইতিপূর্ব্বে কখনও উহার মনে জাগে নাই, এখন সেই সব অভাবের বেদনা উহাকে সর্ব্বদাই পীড়া দিতে লাগিল।

বেশ ছিল চুড়্‌কী, যেন একখানি মূর্ত্তিমতী আনন্দ প্রতিমা, আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া সারাদিন নানা কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত; কলস্বনা ঝরণার মত নিজের মুখর গতিচ্ছন্দে ছিল পরিতৃপ্ত। কোথা হইতে আসিল বিদেশিনী নারী তাহার মনে জাগাইয়া তুলিল নানা বিক্ষোভ। এখন আর কোন কাজেই তাহার মন লাগে না, ফুলের গাছগুলি অনাদরেই শুকায়, গৃহ প্রাচীরের আর সে সুন্দরশ্রী নাই, সব সময়ই মনে পড়ে হামিদের কচি মুখের সুন্দর হাসি আর বিদায় বেলায় রহিমার সেই সকরুণ ক্রন্দন ও ব্যাকুল আলিঙ্গন। তাহারও যে ক্ষণস্থায়ী স্বামীসহবাসসুখের স্মৃতির মধ্যে চুড়্‌কীর সাহচর্য্য একটি প্রধান অঙ্গ। এমনই ভাবে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সখীবিচ্ছেদবেদনা ও মাতৃত্বের তৃষা চুড়্‌কীর মনকে সর্ব্বদাই উন্মনা করিয়া রাখিত। এতদিন বহু অনুরোধ, উপরোধ, নিষেধ সত্ত্বেও ভিনজাতের সহিত এত মেলামেশা করায় সাঁওতাল পাড়ায় আর কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না, তাহার সহিত মিশিতও না। নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে গৃহসংলগ্ন কদমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া প্রায়ই সে অশ্রুসজল নয়নে রহিমাদের ঘরের দিকে তাকাইয়া থাকিত।

বুধন কিন্তু চুড়্‌কীর দুঃখ বুঝিত। যেদিন যেদিন সে চুড়্‌কীর মন বেশি চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিত, কোন কথা না বলিয়া নিজের মনে বাঁশী লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিত। চুড়্‌কী তখন ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া বসিত।

বুধনের জীবনের একমাত্র নেশা ছিল বাঁশী। উন্মাদের মত সে বাঁশী বাজাইতে ভালবাসিত। এই বাঁশীর প্রতি অপরিসীম অনুরাগের জন্যই হয়তো সে অন্য নেশার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। বুধন বাজাইতও অতি চমৎকার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বিভোর হইয়া বাজাইয়া যাইত। বহুক্ষণ বাদে যখন থামিত তখন দেখা যাইত, চুড়্‌কী কখন তাহার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মৃদু চাঁদের আলোয় বুধন দেখিত তাহার চোখের কোণে মুক্তাবিন্দুর মত এক ফোঁটা জল টল টল করিতেছে।



বিপিনের সংসার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—মানী, প্রথমেই একটা কথা বলি। তুই অমন ভাবে চিঠি আর আমায় পাঠাসনে। পাড়াগাঁ জায়গার ভাব তুমি জান না, থাক কলকাতায়, যদি কেউ দেখে ফেলে বা জানতে পারে, তাতে নানা রকম কথা ওঠাবে। তোমার সুনাম বজায় থাকে এটা আমি চাই। কেউ কোন কথা তোমাকে এই নিয়ে বললে আমি তা সহ্য করতে পারব না মানী।

মানী বলিল, আমাদের চাকরের হাতে দিয়েছিলুম, সে নিজে চিঠি পড়তে পারে না। তার কাছ থেকে নিয়েই বা কে পড়বে পরের চিঠি, আর তাতে ছিলই বা কি ?

—তুমি আমায় আসতে বলছ এ কথাও তো আছে। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, ওর অনেক রকম মানে বার করত। দরকার কি সে গোলমালের মধ্যে গিয়ে ?

মানী চুপ করিয়া শুনিল, তারপর গম্ভীর মুখে বলিল, শোন বিপিনদা, আমিও একটা কথা বলি। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, তার কি মানে বার করত আমি জানি। তারা বলত, আমি তোমায় দেখতে চেয়েছি, তোমায় নিশ্চয়ই ভালবাসি তবে। এই তো ?

বিপিন অবাক হইয়া মানীর মুখের দিকে চাহিল। মানী এমন কথা মুখ ফুটিয়া কোনদিন বলে নাই। কোন মেয়ে কখন বলে নাই। 'তোমাকে ভালবাসি' অতি সংক্ষিপ্ত, অতি সামান্য কয়েকটি কথা, কিন্তু এই কথা কয়টির কি অদ্ভুত শক্তি, বিশেষত যখন সেই মেয়েটির মুখ হইতে এ কথা বাহির হয়, যাহাকে মনে মনে ভাল লাগে। প্রণয়পাত্রীর মুখে এই স্পষ্ট সহজ উক্তিটি শুনিবার আশ্চর্য্য ও দুর্লভ অভিজ্ঞতা বিপিনের জীবনে এই প্রথম হইল।

মানীর উপরে সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরণের স্নেহ ও মায়াও হইল। এতদিন যেন সেটা মনের কোণেই প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু বাহিরে ফুটিয়া প্রকাশ পায় নাই। ওগো কল্যাণী, এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তোমারই দান, বিপিন সেজন্য চিরিদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মানী বলিল, বিপিনদা, কথা বললে না যে ? ভাবছ বোধ হয়, মানীটা বড্ড বেহায়া হয়ে উঠেছে দেখছি, না ?

বিপিন তখনও চুপ করিয়া রহিল। সে অন্য কথা ভাবিতেছিল, মানীর বিবাহিত জীবন কি খুব সুখের নয় ? স্বামীকে কি তাহার মনে ধরে নাই ?

খুব সম্ভব। বেচারী মানী! অনাদিবাবু বড় ঘরে বিবাহ দিতে গিয়া মানীর ভাল লাগা না-লাগার দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, মেয়েকে ভাসাইয়া দিয়াছেন হয়তো ধনীর সহিত কুটুম্বিতার লোভে !

মানী মৃদু হাসিমুখে বলিল, রাগ করলে বিপিনদা ?

বিপিন বলিল, রাগের কথা কি হয়েছে যে রাগ করব ? কিন্তু আমি ভাবছি মানী, তোর মত

মেয়ে আমার ওপর—ইয়ে—একটুও স্নেহ দেখাতে পারে, এর মানে কি? আমার কোন্ কথা তোর কাছে না বলেছি! কি চরিত্রের মানুষ আমি ছিলাম, তুই তো সব জানিস। সে হীনচরিত্রের লোককে তোর মত একটা শিক্ষিতা ভদ্র মেয়ে যে এতটুকু ভাল চোখে দেখতে পারে, সেইটেই আমার কাছে বড় আশ্চর্য্য মনে হয়।

মানী বলিল, থাক ও কথা বিপিনদা।

বিপিনের যেন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছিল, সে আপন মনে বলিয়াই চলিল, না মানী, আমার মনে হয়, আমার সব কথা তুই জানিসনে। কি ক'রেই বা জানবি, ছেলেবেলার পর আর তো দেখা হয়-নি! তোকে সব কথা বলি। শুনেও যদি মনে হয়, আমি তোর স্নেহের উপযুক্ত, তবে স্নেহ করিস, ধন্য হয়ে যাব। আর যদি—

মানী বলিল, আমি শুনতে চাইছি বিপিনদা?

—না, তোকে শুনতে হবে। তুমি আমাকে ভারী সাধুপুরুষ ভেবে রেখেছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারব না। রাণাঘাটে বা বনগাঁয়ে এমন কোন কুস্থান নেই, যেখানে আমি যাতায়াত করিনি। মদ খেয়ে বাবার বিষয় উড়িয়েছি, স্ত্রীর গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে অন্য মেয়েমানুষের আবদার রেখেছি। যখন সব গেল, মদ জোটেনি, তাড়ি খেয়েছি, হয়তো চুরি পর্য্যন্ত করতাম, কিন্তু নিতান্ত ভদ্রবংশের রক্ত ছিল ব'লেই হোক বা যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত করা হয়নি। তাও অন্য কিছু চুরি নয়, একখানা শাড়ি। শামকুড় পোস্ট-আপিসের বারান্দায় শাড়িখানা শুকুতে দেওয়া ছিল, বোধ হয় পোস্ট-মাস্টারের স্ত্রীর। আমার হাতে পয়সা নেই, শাড়িখানা নতুন আর বেশ ভাল, একজনকে দিতে হবে। সে চেয়েছিল, কিন্তু কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। চুরি করবার জন্যে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরলাম, পাড়াগাঁয়ের ব্রাঞ্চ পোস্ট-আপিস, পোস্ট-মাস্টার আপিস বন্ধ ক'রে স্কুলে পড়াতে গিয়েছে। কেউ কোন দিকে নেই! একবার গিয়ে এক দিকের গেরো খুললাম—

মানী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, তুমি চুপ করবে, না আমি এখান থেকে চ'লে যাব?

—না শোন, ঠিক সেই সময় একটা ছোট মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা বাঁধানো পুকুর ঘাট। মেয়েটাকে দেখে আমি ডাকঘরের রোয়াক থেকে নেমে বাঁধাঘাটে গিয়ে বসলাম। মেয়েটা চ'লে গেল, আমি আবার গিয়ে উঠলাম রোয়াকে। এবার কাপড় নেবোই এই রকম ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, ছিঃ, আমি না বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে? আমার বাবা কত গরিব দুঃখী লোককে কাপড় বিলিয়েছেন আর আমি কিনা একখানা অপরের পরনের কাপড় চুরি করছি? তখন যেন ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেল, ঠিক সেই সময় বাড়ির মধ্যে থেকে একটা ছেলে বার হয়ে এসে বললে, কাকে চান? বললাম, খাম কিনতে এসেছি। খাম পাব? ছেলেটা বললে, না, ডাকঘর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন চ'লে এলাম সেখান থেকে।

মানী বলিল, বেশ করেছিলে, খুব বাহাদুরি করেছিলে। নিজেই আর নিজের গুণ ব্যাখ্যায় দরকার নেই, থাক। আমার দেওয়া বইগুলো পড়েছিলে?

—ওই যে বললাম, সব পড়া হয় নি। 'দত্তা'খানা পড়েছি, বেশ চমৎকার লেগেছে।

—'শ্রীকান্ত' পড়নি ?

—সময় পাইনি। সেখানা আনিওনি সঙ্গে, এর পর পড়ব ব'লে রেখে এসেছি কাছারিতে। 'দত্তা'খানা ফেরত এনেছি।

—তোমার কাছে সবই রেখে দাও না, মাঝে মাঝে প'ড়। একলাটি থাক কাছারিতে। আমার সঙ্গে আরও যে সব বই আছে, যাবার সময় তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি সেখানে প'ড় ব'সে ব'সে। আচ্ছা, বল তো বিজয়া কে ?

বিপিন হাসিয়া বলিল, ও ! এগজামিন করা হচ্ছে বুঝি ? মাস্টারনী এলেন আমার।

মানী কৃত্রিম রাগের সুরে অথচ ঈষৎ লাজুক ভাবে বলিল, আবার ! উত্তর দাও আমার কথার।

—বিজয়া তোমার মত একটি জমিদারের মেয়ে।

—তারপর ?

—তারপর আবার কি ? নরেনের সঙ্গে তার ভালবাসা হ'ল।—কথাটা বলিয়াই বিপিনের মনে হইল মানী পাছে কি ভাবে, কথাটা বলা উচিত হয় নাই, মানীও তো জমিদারের মেয়ে! 'তোমার মত' কথাটা না বলিলেই চলিত। কিন্তু মানীর মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না। সে বেশ সহজ ভাবেই বলিল, মনে হচ্ছে, পড়েছ। ভাল, পড়লে মানুষ হয়ে যাবে। এইবার রবি ঠাকুরের 'চয়নিকা' ব'লে কবিতার বই আছে, সেখানা থেকে কবিতা মুখস্থ কর। খুব ভাল ভাল কবিতা।

বিপিন খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, কবিতা আবার মুখস্থও করতে হবে! উঃ, তুই হাসালি মানী, পাঠশালায় ইস্কুলে যা কখনও হ'ল না, উঃ, এই বুড়ো বয়সে বলে কি না, হি-হি, বলে কি না—

—হাঁ, মুখস্থ করতে হবে। আমার হুকুম। শুনতে বাধ্য তুমি। মানুষ বলে যদি পরিচয় দিতে চাও তবে তা দরকার। যা বলি তাই শোন, হাসি খুশি তুলে রাখ এখন—

কিন্তু অত্যন্ত কৌতুকের প্রাবল্যে বিপিনের হাসি তখনও থামিতে চায় না। মানী তাহাকে মাস্টারনী সাজিয়া কবিতা মুখস্থ করাইতেছে—এই ছবিটা তাহার কাছে এতই আমোদজনক মনে হইল যে, সে হাসির বেগ তখনও থামাইতেই পারিল না।

এবার মানীও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বড্ড হাসির কথাটা কি যে হ'ল তা তো বুঝিনে। আমার কথাগুলো কানে গেল, না গেল না ?

—খুব গিয়েছে। আচ্ছা, তোর কবিতা মুখস্থ আছে ?

—আছেই তো। 'চয়নিকা'র আদ্ধেক কবিতা মুখস্থ আছে।

—সত্যি ? একটা বল না ?

—এখন কবিতা বলবার সময় নয়। আর বললেই বা তুমি বুঝবে কি ক'রে, হয়েছে কি না ? তুমি তো জান ঢেঁকি, কি ক'রে ধরবে ?

—তাতেই তো তোর সুবিধে, যা খুশি বলবি, ধরবার লোক নেই।

মানী মুখে কাপড় দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ওমা, কি দুষ্টু বুদ্ধি!

—তবে বল একটা শুনি।

—শুনবে? তবে শোন। দাঁড়াও কেউ আসছে কি না দেখে আসি, আবার বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে কবিতা বলছি শুনলে কে কি মনে করবে!

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া মানী স্কুলের ছাত্রীর কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া সুরু করিল—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ও গো মরণ হে মোর মরণ!

বিপিন হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি! মানীর কি চোখ মুখের ভাব, কি হাত পা নাড়ার কায়দা! যেন থিয়েটারের অ্যাকটো করিতেছে। অথচ হাসিবার জো নাই, মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে শান্ত ছেলেটির মত। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! মানীটা চিরদিনই একটু ছিটগ্রস্ত।

কিন্তু খানিকটা পরে মানীর আবৃত্তি বিপিনের বড় অদ্ভুত লাগিতে লাগিল।—

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন, ও গো মরণ হে মোর মরণ!

এই জায়গাটাতে যখন মানী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন বিপিনের হাসিবার প্রবৃত্তি আর নাই, সে তখন আগ্রহের সঙ্গে মানীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাঃ, বেশ লাগিতেছে তো পদ্যটা! মানী কি চমৎকার বলিতেছে! অল্পক্ষণের জন্য মানী বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার চোখে মুখে অন্য এক রকমের ভাব। কবিতা যে এমন ভাবে বলা যাইতে পারে, তাহা সে জানিত না, কখনও শোনে নাই।

—বাঃ, বেশ, খাসা! চমৎকার বলতে পারিস তো?

মানী যেন একটু হাঁপাইতেছে। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে, বড় কষ্ট হয় পদ্য আবৃত্তি করিতে, বিশেষত অমনি হাত পা নাড়িয়া। ভারী সুন্দর দেখাইতেছে মানীকে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে, একটু রাঙা হইয়াছে মুখ, বুক ঈষৎ উঠিতেছে নামিতেছে। এ যেন মানীর অন্য রূপ, এ রূপে কখনও সে মানীকে দেখে নাই।

—নেবু খাবে বিপিনদা?

—কি নেবু?

—কমলানেবু, সেদিন কলকাতা থেকে এক টুকরি এসেছে। দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

—যাস নি মানী, তুই চ'লে গেলে আমার নেবু ভাল লাগবে না।

মানী যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাজে কথা ব'ল না বিপিনদা।

বিপিন হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, বাজে কথা কি বললাম?

—বাজে কথা ছাড়া কি? যাক, দাঁড়াও, নেবু আনি।

মানী একটু পরে দুইটি বড় বড় কমলানেবু ছাড়াইয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া যখন হাজির করিল, বিপিনের তখন নেবু খাইবার প্রবৃত্তি আদৌ নাই, অভিমানে তাহার মন বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে।

সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, নেবু আমি খাব না। নিয়ে যা।

—কি, রাগ হ'ল অমনিই? তোমার তো পান থেকে চুন খসবার জো নেই, হ'ল কি?

—না না, কিছু হয় নি, তুই যা। মিটে গেল গণ্ডগোল।

—কেন, কি হয়েছে বল না?

—আমার সব কথা বাজে। আমার কথা তোর কি শুনতে ভাল লাগে? আমি যখন বাজে লোক তখন তো বাজে কথা বলবই। তবে ডেকে এনে অপমান করা কেন?

মানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে বলিল, দেখ বিপিনদা, আমি যা ভেবে বলেছি, তা যদি তুমি বুঝতে পারতে, তবে এমন কথা ভাবতে না বা বলতেও না। তোমার কথাকে কেন বাজে কথা বলেছি, তা বুঝবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তোমার ঘটে থাকলে কথায় কথায় অত রাগও আসত না।

বিপিন চুপ-করিয়া থাকিবার পাত্র নয়, বলিল, জানিস তো আমার মোটা বুদ্ধি, তবে আর—

মানী পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে বলিল, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই এখন আমার, তুমি বস। কমলানেবু এই রইল, খাও তো খেও, না খাও রেখে দিও, শ্যামহরি এসে নিয়ে যাবে, আমি চললুম।

কথা শেষ করিয়া মানী এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না।

বিপিন কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের তাহার মনের সে আনন্দ আর নাই, জগৎটা যেন এক মুহূর্ত্তে বিস্বাদ হইয়া গেল। মানী এমন ধরণের কথা কখনও তাহাকে বলে নাই। মেয়েমানুষ সবই সমান, যেমন মানী তেমনই মনোরমা। মিছামিছি মনোরমার প্রতি মনে মনে সে অবিচার করিয়াছে। মানীও রাগী কম নয়, এখন দেখা যাইতেছে। স্বরূপ কি আর দুই একদিনে প্রকাশ হয়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়। যাক। ওসব কথায় দরকার নাই। সে আজই—এখনই ধোপাখালি কাছারিতে ফিরিবে। কত রাত আর হইয়াছে! সাতটা হয়তো। দুইঘণ্টা জোর হাঁটলে রাত নয়টার মধ্যে খুব কাছারি পৌঁছানো যাইবে। কমলানেবু খাওয়ার দরকার নাই আর, মাথায় থাক কমলানেবু।

কিন্তু একটা মুস্কিল হইয়াছে এই, অনাদিবাবু এখনও রাণাঘাট হইতে ফিরিলেন না। সঙ্গে যে টাকা আছে, তাহা ইরশাল না করিয়া কি ভাবে যাওয়া যায়? সে আসিয়া কেন চলিয়া গেল হঠাৎ, না খাইয়া রাত্রিবেলাতেই চলিয়া গেল, একথা যদি অনাদিবাবু জিজ্ঞাসা করেন, তখন সে কি জবাব দিবে? তাঁহার মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—একথা তো বলিতে পারিবে না!

বিপিন ঠিক করিল, আর একটু অপেক্ষা করিয়া সে দেখিবে অনাদিবাবু আসেন কিনা। দেখিয়া যাওয়াই ভাল। বাড়ির মধ্যে মানীর মায়ের কাছে টাকা দেওয়া চলে না, তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন এত রাত্রে সে না খাইয়া কেন কাছারি ফিরিবে? যাইতে দিবেন না, পীড়াপীড়ি করিবেন। সব দিকেই বিপদ।

মানী কেন ও কথা বলিল? বড্ড হেঁয়ালির ধরণের কথাবার্ত্তা বলে আজকাল। কি গূঢ় অর্থ না জানি উহার মধ্যে নিহিত আছে! আছে থাকুক, গূঢ় অর্থ মাথায় থাকুক, সে এখন চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও অনাদিবাবু আসিলেন না। রাত নয়টা বাজিয়া গেল, পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে খাওয়া দাওয়া চুকিয়া যায়। একবার শ্যামহরি চাকর আসিয়া বলিল, মা ব'লে পাঠালেন আপনি একা খেয়ে নেবেন, না বাবু এলে খাবেন ?

বিপিন বলিল, বলগে বাবু এলে খাব এখন একসঙ্গে। কিন্তু রাত দশটা বাজিয়া গেল, তখনও অনাদিবাবুর দেখা নাই। অগত্যা সে বাড়ির মধ্যে একাই খাইতে গেল।

মানীর মা পরিবেশন করিতেছিলেন, মানী সেখানে নাই। বিপিনের মন ভাল ছিল না, সে অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল। যেন খাওয়া শেষ করিতে পারিলে বাঁচে।

মানীর মা বলিলেন, বিপিন, টাকাকড়ি কিছু এনেছ নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ খুড়ীমা, কাকাবাবু তো এলেন না রাণাঘাট থেকে, আমি কাল খুব ভোরে চ'লে যাব ধোপাখালি কাছারি। টাকা আপনি নিয়ে রাখুন। খেয়ে উঠে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—কাল সকালেই কাছারি যাবে কেন ? কর্ত্তার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না ? তিনি ব'লেই গিয়েছিলেন, আজ যদি না আসেন, কাল নিশ্চয়ই আসবেন সকালে আটটার মধ্যে।

—আমার থাকা হবে না খুড়ীমা, কাজ আছে।

—কাল জামাই আসবেন মানীকে নিতে, এদিকে দেখ বাবা, মেয়ের কি হয়েছে সন্ধ্যের পর থেকে। ওপরে শুয়ে আছে, খাইনি দাইনি। ওর আবার কি যে হ'ল! এদিকে কর্ত্তা নেই বাড়ি, তুমি যাচ্ছ চ'লে, আমি আথান্তরে প'ড়ে যাব তা হ'লে।

বিপিন ভাতের গ্রাস হাতে তুলিয়াছিল, মুখে না দিয়া সেই অবস্থাতেই মানীর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইতে বলিল, কি হয়েছে মানীর ?

—কি হয়েছে কি জানি বাবা। দুবার ওপরে গেলাম, বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে, উঠলও না। বললে, আমার শরীর ভাল না, রাত্তিরে খাব না কিছু। বললুম, একটু গরম দুধ খাবি ? বললে তাও খাবে না। কি জানি বাবা, কিছুই বুঝলুম না। একালের ধাতের মেয়ে, ওদের কথা আদ্ধেক থাকে পেটে, আদ্ধেক মুখে, কি হয়েছে না হয় বল, তাও বলবে না।

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল বটে কিন্তু নিদ্রা যাইবার এতটুকু ইচ্ছা মনে জাগিল না। মানীর মনে নিশ্চয়ই সে কষ্ট দিয়াছে, মানীর অসুখবিসুখ কিছুই নয়, বাহিরের ঘর হইতে গিয়াই সে উপরের ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। কেন ? কি বলিয়াছিল সে মানীকে ? সে চলিয়া গেলে নেবু ভাল লাগিবে না—এই কথার মধ্যে প্রেমনিবেদনের গন্ধ পাইয়া কি মানী নিজেকে অপমানিতা মনে করিয়াছে ? কিন্তু এ ধরণের কথা সে তো ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার মানীকে বলিয়াছে, তাহাতে তো মানী চটে নাই !

বিপিনের মন বলিল এ কারণ আসল কারণ নয়। অন্য কোনও ব্যাপার আছে ইহার মধ্যে। তা ছাড়া মানীর অত যত্নে দেওয়া নেবু সে খাইতে চাহে নাই, রাগের মাথায় অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মানীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল। ছিঃ ছিঃ, কি অন্যায় সে করিয়া বসিয়াছে! মানীর মত তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিনী জগতে খুব বেশি আছে কি ?

রাত তিনটা পর্য্যন্ত বিপিনের ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে যদি এখনই একবার দেখা হইত! সত্যই, সে বড় আঘাত দিয়াছে মানীর মনে। মানীর নিকট ক্ষমা না চাহিয়া সে ধোপাখালি যাইতে পারিবে না। কে জানে হয়তো এই মানীর সঙ্গে শেষ দেখা। এ চাকরি কবে আছে, কবে নাই। আজ সে অনাদিবাবুর নায়েব, কালই সে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। মানী হয়তো কতদিন এখন আর আসিবে না। অনুতাপের কাঁটা চিরদিন ফুটিয়া থাকিবে বিপিনের মনে।

সকাল হইলে যে-কোন ছুতায় মানীর সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। না হয়, দুপুরে আহারাদি করিয়া কাছারি রওনা হইলেই চলিবে এখন। মানীর মনের কষ্ট না মুছাইয়া সে এ স্থান ত্যাগ করিবে না।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। শেষরাত্রের দিকে বিপিনের ঘুম আসিয়াছিল, কাহাদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মুছিতে মুছিতে উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানা গরুর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান একটা হারিকেন লণ্ঠন উঁচু করিয়া হাঁকডাক করিতেছে, অনাদিবাবু ছইয়ের ভিতর হইতে নামিতেছেন।

শ্যামহরি চাকরও বৈঠকখানায় শোয়, বিপিন তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। অনাদিবাবু বিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে বিপিন! তোমার কথাই ভাবছিলাম। বড্ড জরুরি কাজে রাণাঘাট যেতে হবে তোমাকে কাল সকালেই। আজ রাত্রেই তোমায় কাগজপত্র দিয়ে দিই, কাল বেলা আটটার মধ্যে উকিল-বাড়ি দাখিল ক'রে দিতে হবে। ভাবছিলাম কাকে দিয়ে পাঠাই। তুমি এ সময়ে এসে পড়েছ, খুব ভাল হয়েছে। ব'স, আমি আসছি ভেতর থেকে। সেখান থেকে বেরিয়েছি রাত দশটার পরে। নতুন গরু, চলতে পারে না পথে, এখন রাত তো প্রায় ভোর। আঃ, কি কষ্টই গিয়েছে সারা রাত!

বাড়ির ভিতর হইতে তখনই ফিরিয়া অনাদিবাবু বিপিনকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি, তুমিও শোও। এখনও ঘণ্টা দুই রাত আছে। ভোরে উঠে চ'লে যেও। যদি উকিলবাবু ছেড়ে দেন, তবে কালই ওখানে খাওয়াদাওয়া ক'রে বিকেল নাগাৎ এখানে চ'লে এস। কাল আবার আমার মেয়েকে নিতে জামাই আসছেন কলকাতা থেকে, পার তো কিছু মিষ্টি এন সাধুচরণ ময়রার দোকান থেকে। এই একটা টাকা নিয়ে যাও।

খুব ভোরে উঠিয়া বিপিন রাণাঘাট রওনা হইল। যাইবার সময় সারাপথ খুব ভোরে উঠিয়া চাষারা জমি নিড়াইতেছে। এবার বৈশাখের প্রথমে বৃষ্টি হইয়া ফসল বুনিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, এখন বৃষ্টি আদৌ নাই, জমিতে জমিতে নিড়ানি দেওয়া চলিতেছে। হয়তো এবার জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বর্ষা নামিবে—এই ভয়ে চাষারা শীঘ্র শীঘ্র ছাঁটার কাজ শেষ করিতে চায়। সারাপথ দুইধারে মাঠে ধান-পাটের ক্ষেতে চাষারা জমি নিড়াইতেছে।

ভোরের অতি সুন্দর মিষ্ট বাতাস। মাঠে ও পথের ধারে ছোট বড় গাছে সোঁদালি ফুলের ঝাড় ঝুলিতেছে, বিশেষ করিয়া কানসোনার মাঠে। রেলের ফটক পার হইয়া আবাদ তত নাই, ফাঁকা মাঠের মধ্যে চারিধারে শুধুই সোঁদালি ফুলের গাছ।

কলাধরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বিপিন একবার তামাক খাইবার জন্য বসিল। প্রতিবার রাণাঘাট হইতে যাতায়াতের পথে এইটা তাহার বিশ্রামের স্থান। বিশ্বাসদের বাড়ির সকলেই বিপিনকে চেনে। বিশ্বাসদের বড়কর্ত্তা রাম বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পাটের দড়ি পাকাইতে ব্যস্ত ছিলেন। বিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে আসুন চাটুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। আজ যে বড্ড সকালে রাণাঘাট চলেছেন, মোকদ্দমা আছে না কি? উঠে বসুন ভাল হয়ে। একটু চা ক'রে দিক?

—না না, চায়ের দরকার নেই। একটু তামাক খাই বরং।

—আরে, তামাক তো খাবেনই, চা একটু খান। অত সকালে তো চা খেয়ে বেরোননি? এখন সাতটা বাজে, আমিও তো চা খাব। বসুন, চার ক্রোশ রাস্তা হেঁটেছেন এর মধ্যে, কষ্ট কম হয়েছে? একটু জিরোন। এখান হইতে রাণাঘাট আরও তিন ক্রোশের কম নয়। বেলা নয়টার কমে পৌঁছানো যাইবে না যখন, তখন বিপিন চা খাইয়া লইতেই মনস্থ করিল। বিশ্বাস মহাশয় বাড়ির মধ্যে চায়ের কথা বোধ হয় বলিতে গেলেন।

মানীর সঙ্গে ফিরিয়া আজ দেখা হইবে কি? আর দেখা হওয়া সম্ভবও নয়। দেখা হইলেও কথাবার্ত্তা তেমন ভাবে হইবে না। জামাইবাবু আসিবেন, কর্ত্তা বাড়ি রহিয়াছেন। তবুও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিশ্বাস মহাশয় চা ও মুড়ি আনিয়া দিলেন। বিপিন খাইতে খাইতে বলিল, এবার পাট ক বিঘে বুনলেন বিশ্বেস মশায়?

—তা ধরুন, প্রায় বারো চোদ্দ বিঘে হবে। বুনলে কি হবে, খরচা পোষায় না, দশ টাকা করে দুটো কৃষাণ, তা বাদে জোনমজুর তো আছেই। পাটের দর তো উঠল না। ওই দেখুন ছত্রিশ সালে পাটের দর ভাল পেয়ে উত্তরের পোঁতায় বড় ঘরখানা তুলতে গিয়েছিলাম, আদ্ধেক গাঁথুনে হয়ে দেখুন প'ড়ে আছে, আর দর পেলাম না, তা কি হবে?

—আপনার বড় ছেলে কোথায়?

—সে ওই বীজপুরে কারখানায় ত্রিশ টাকা মাইনেয় ঢুকেছে, রং মিস্ত্রী। আমি বলি, ও কেন, বাড়িতে এসে ফলাও ক'রে চাষ-বাস লাগা। মেসে খায়, একটু দুধ ঘি পেটে যায় না, শরীর মাটি। ওমাসে বাড়ি এসেছিল, আমার স্ত্রী এক বোতল ঘরের গাওয়া ঘি সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে আবার। ঐ খাটুনি, দুধ ঘি না খেলে শরীর থাকে? উঠলেন? ফিরবার পথে পায়ের ধূলো দিয়ে যাবেন। না হয় এখানেই ফিরবার সময় দুটো স্বপাকে আহার ক'রে যাবেন এখন।

—না না, আমি সেখানেই খাব। উকিলের কাজ মিটতে বেলা এগারোটা বাজবে। তারপর হয়তো একবার কোর্টেও যেতে হবে স্ট্যাম্পভেণ্ডারের কাছে। ফিরতে তো তিনটের কম হবে না। আচ্ছা, আসি।

—আজ্ঞে আসুন, প্রণাম হই। তা বিকেলের দিকে চা খেয়ে যাবেন অন্তত এখান থেকে।

রাণাঘাট কোর্টে বিপিনের স্বগ্রামের নিবারণ মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা। নিবারণ মুখুজ্জে বিপিনকে দূর হইতে দেখিয়া কাছে আসিলেন, বিপিন প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

—কে বিপিন? কোর্টে কাজে এসেছিলে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকা। আপনি?

—আমিও এসেছিলাম একবার একটা কাগজের নকল নিতে। আমার আবার একটু ব্রহ্মোত্তর জমি নদীয়ার এলাকায় পড়ে কিনা? সেজন্যে রাণাঘাট ছুটোছুটি করতে হয়। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে বাবা। দেখা হ'ল ভালই হ'ল। একটু আড়ালের দিকে চল যাই, গোপনীয় কথা।

বিপিন একটু কৌতূহলী হইয়া নিবারণ মুখুজ্জের সহিত লোকজন হইতে একটু দূরে গেল।

—বাবা, কথাটা খুব গুরুতর। তোমার বাড়ির সম্বন্ধেই কথা। তুমি থাক বারো মাস বিদেশে, নিশ্চয়ই তোমার কানে এখনও ওঠেনি। বড্ড গুরুতর কথা আর বড় দুঃখের কথা।

বিপিন আশঙ্কায় উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল। বাড়ির সম্বন্ধে কি গুরুতর, আর কি দুঃখের কথা! প্রথমেই তাহার মুখ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া গেল—কাকাবাবু, বলাই বেঁচে আছে তো?

তাহার বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস ধড়াস করিতেছে, জজের মুখে ফাঁসির হুকুম শুনিবার ভঙ্গিতে সে আকুল ও শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিবারণ মুখুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রমশ

আষাঢ়ের কবিতা

কুমারী উমা দেবী

আষাঢ়ের জল-ধারা ঝরে আজ সন্ধ্যায়
এক সুরে ঝম্‌ঝম্‌ ছন্দ,
কি জানি কি ব্যথা আসে আজ ভ'রে মনটায়,
কোথাকার দ্বার যেন বন্ধ!
ব'সে আছি বাতায়নে—আবছায়া দেখি দূর
বনানীর শিহরিত অঙ্গ,
দিগন্তে আঁখি কার ছলছল সুমধুর,
কে বিরহী পেল প্রিয়-সঙ্গ?
কি যে হ'ল আজি মোর—মনে পড়ে স্মৃতি কার,
কার যেন বিদায়ের দৃষ্টি,
মনে পড়ে আবছায়া কতদিন আগেকার
এইরূপ আষাঢ়ের বৃষ্টি।

ভাবি যেন—মোর ছিল খেলিবার সাথী কোন্
কত যুগ-যুগান্ত পূর্বে
যত দিন রব আমি পৃথিবীতে, আজীবন
তার স্মৃতি সাথে সাথে ঘুরবে।
সে কি গেছে এইরূপ কোন এক আষাঢ়ের
বর্ষণ-আকুলিত সন্ধ্যায়!
তার স্মৃতি ভরা আছে বুকে কেয়া-কুসুমের
জ্যোৎস্নার—কত নিশি-গন্ধায়!
চমকিয়া উঠি, যেন ভাসিতেছে ঘরময়
বরষার বীথি ভেজা গন্ধ!
বাহিরেতে ঘোর-রবে ঝঞ্ঝার বায়ু বয়
বৃষ্টির ঝমঝম ছন্দ!

আমাদের প্রিয়া

শ্রীবিনয় ঘোষ

রুদ্ধ ঘরে ক্রমবিলীয়মান দীপশিখা সুদীর্ঘ অবসরের কথা স্মরণ করিয়া অপূর্ব্ব আলস্যে ও বিলাসিতায় ধীরে ধীরে নিভিয়া যায়।

কামেলিয়া সেনেটোরিয়ামের ফ্রী ওয়ার্ডের এগারোটি সীটের মধ্যে একটিও শূন্য পড়িয়া নাই। আমরা এগারো জন যক্ষ্মা রোগী জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছিয়া শুইয়া শুইয়া ধুঁকিতেছি।

অস্তমান জীবনের ধূসর আলোয় আমাদের মুখচোখ উদ্ভাসিত। প্রত্যূষে পূব দিকের জানালা দিয়া সূর্য্যোদয় দেখা যায়। কালো একখানি খণ্ডমেঘের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে সূর্য্য ওঠে, টুকটুকে লাল। সদ্যোদগারিত তাজা রক্তের রঙের সঙ্গে নবারুণের রঙের সাদৃশ্য দেখিয়া শয্যাশায়ী আমরা সকলে শিহরিয়া উঠি। দুই একটি রশ্মি সার্শির ভিতর দিয়া হলুদবরণ চামড়া ভেদ করিয়া একেবারে শুকনা পাঁজর স্পর্শ করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিক্ষত ফুসফুস দুইটিও বিস্ফারিত হইয়া ওঠে। চোখের সামনের কুয়াশাপুঞ্জও কাটিয়া যায়। মৃত্যুর দিকে নিষ্প্রভ চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া আমরা সকলে মনে মনে মুচকি হাসি। সে হাসির অর্থ এই—যেন আমরা কেহ মৃত্যুকে ভয় করি না।

চমৎকার আমাদের জীবন! ভয় নাই, ভরসাও নাই। দিন দিন জীবনের কোলাহল নীরব হইয়া আসিতেছে, যেন বিরাট একটি জনতার হট্টগোল মিলাইয়া যাইতেছে দিগন্তবিসর্পিত পথের বাঁকে। তবু আশার আর অন্ত নাই। নূতন করিয়া জীবনারম্ভের কল্পনা তখনও সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি এই যক্ষ্মা-বীজাণুর!

অনিরুদ্ধ খেয়াল আমাদের। দেহের উত্তাপ একটু বৃদ্ধি পাইলে আমরা সকলে দিশাহারা হইয়া যাই, আবার একটু কমিলেই অনর্গল কথা বলিয়া, হাসিয়া, গানের সুর ভাঁজিয়া, নূতন আশার স্পর্শে সকলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠি এবং কিছুক্ষণ পরে অবসন্ন হইয়া ঝিমাইয়া পড়ি।

একজন কাসিতে আরম্ভ করিলে আমাদের সকলের গলা খুসখুস করিয়া ওঠে। একসঙ্গে এগারো জন আমরা কাসিতে সুরু করি।

কেউ উঠিয়া বসিয়া হাত দিয়া শীর্ণ বুকখানি চাপিয়া ধরিয়া হাঁপাইতে থাকি। জিলজিলে বুক হাঁফরের মত ফুলিয়া উঠিয়া আবার কুঁচকাইয়া যায়। ঝরঝরে ফুসফুস দুইটি হঠাৎ এক দম হাওয়া টানিয়া লইয়া আবার ছাড়িয়া দেয়।

কেউ এক ঝলক রক্ত বমি করিয়া তপস্বীর মত ধ্যাননিমীলিত চক্ষে নিঝুম নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া পড়িয়া থাকি। পালকের মত শরীর হালকা হইয়া যায়। ঘরের রুদ্ধ বাতাসের সঙ্গে মজ্জাশূন্য অস্থির বোঝা যেন মিলাইয়া যায়।

কেউ নিজের মাথার চুল ধরিয়া প্রাণপণে টানিতে থাকি, কেউ বা অসহ্য যন্ত্রণায় বনমানুষের মত বড় বড় বিষাক্ত ধারাল নখের ডগা দিয়া বালিশের ওয়াড় ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলি।

বারান্দায় কার জুতার দ্রুত খট খট শব্দ শুনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়।

ঝড়ের মত ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া মায়া সোজা টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া থার্মোমিটার ঝাড়িতে ঝাড়িতে ঝঙ্কার দিয়া বলে, কি হচ্ছে কি? এইটুকু সময় গা-ঢাকা দিইছি, অমনই এর মধ্যে সকলের সব উপসর্গ বুঝি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে? না, আর পারা যায় না দেখছি—

ভৎর্সনা করিলেও মায়ার ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু আমাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

আমাদের মধ্যে একজন ব্যস্ত হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ ফুসফুসের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া সজোরে কাসিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে প্রত্যেকের পাশে বসিয়া থার্মোমিটার দিয়া টেম্পারেচার লইয়া মায়ার খাতাতে নোট করা হইয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য্য আমাদের স্পর্শ-কাতরতা!

মায়া যখন আমাদের পাশে আসিয়া বসে, তখন পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত্ত বন্যজন্তুর মত আমাদের মুখচোখ দিয়া আগুনের হল্‌কা বাহির হয়। বুকের ভিতর তোলপাড় করিতে থাকে। শরীরের উত্তাপ দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। গলিত ফুসফুসের দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘরের ভিতর তিষ্ঠানো যায় না।

এই ক্লিন্ন কদর্য্য পরিবেষ্টনে মায়ার শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত শুকাইয়া যায়। কেউ সরু লিকলিকে আঙুল দিয়া মায়ার হাত সজোরে চাপিয়া ধরি জোঁকের মত। শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত শুষিয়া লইতে ইচ্ছা করে। মায়া অতিকষ্টে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া উঠিয়া যায়।

কেউ তার আঙুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে হাতখানি মুখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরি। চর্ব্বণার্ত্ত দাঁতের তীক্ষ্ণ ডগা তার নরম আঙুলের গায়ে কাটিয়া বসিয়া যায়। মায়া 'উঃ' বলিয়া চীৎকার করিয়া জোরে ঝাপটা দিয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া টেবিলের কাছে যাইয়া হাসিতে হাসিতে বলে, ছেলেমানুষি স্বভাব এখনও গেল না? আজ ডাক্তারবাবুকে বলব তিন নম্বর বেডের রুগীর জন্যে একটা চুষিকাঠি কিনে দিতে।

কেউ মায়ার হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে খুব জোরে ভাল্লুকের মত নখ দিয়া আঁচড়াইয়া দিই। মায়া মুখ বুজিয়া নীরবে সব সহ্য করিয়া যায়।

কোনদিন হয়তো মায়া গম্ভীর হইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া ঔষধের শিশি, চামচ, গ্লাস, নাড়াচাড়া করিতে থাকে। কেমন যেন একটি নির্ম্মম রুক্ষতায় সমস্ত মুখমণ্ডল আবৃত। দৃষ্টি উদাসীন, নিরুদ্বেগ। স্নেহ বা করুণার এতটুকু চিহ্ন নাই কোথাও।

এদিকে একসঙ্গে আমাদের এগারো জনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। রোগের যাবতীয় লক্ষণ শত গুণ বৃদ্ধি পায়। হাঁপানিতে, গোঁঙানিতে, কাসিতে আর কাতরানিতে ঘরের ভিতর সরগরম হইয়া ওঠে। আমরা যেন সকলে ধনীর প্রাসাদ-ফটকের সম্মুখে এক টুকরা রুটি-প্রত্যাশী ভিক্ষুকের দল।

জীবন-সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে নির্জ্জন ঘরের ভিতর আমরা প্রত্যেকে যেন আমাদের অন্তরতম প্রিয়াকে শেষবারটির মত সুনিবিড়ভাবে পাইতে ইচ্ছা করি।

রাতে যখন সকলে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ি, মায়া তখন বাহিরের রেলিঙের ধারে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়ায়। দূরে দেবদারুগাছের মাথার উপর সারবন্দী খণ্ড মেঘের ভিড় জমে। মায়া সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে।

কিন্তু আমরা যতদূর বুঝিয়াছি মায়ার হৃদয়ে এককণাও কাব্যরস নাই।

শুকনা ফাঁপা বাঁশের নলের ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে যেমন শব্দ হয় তেমনই ঘরের ভিতর এগারো জনের শ্বাসপ্রশ্বাসের সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে। কেউ মাঝে মাঝে খুক খুক করিয়া কাসিয়া উঠি। মায়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া এগারো জনকে পা হইতে গলা পর্য্যন্ত মোটা রাগ দিয়া ঢাকিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সকলে আমরা হয় নিঃঝুম হইয়া পড়িয়া থাকি, না হয় ঘুমাই। এতক্ষণে মায়া একটু অবসর পায়।

মায়া যেন এই এগারোটি দুরন্ত অবাধ্য শিশুর স্নেহময়ী মা।

আমরা? এই এগারো জন মৃত্যুতীর্থের সহযাত্রী?

আমাদের প্রত্যেকের হাড়সার সঙ্কীর্ণ বুকখানি মায়ার পায়ের শব্দে ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার কোমল হাতের স্পর্শে ধুক ধুক করিয়াছে, আবার তার অন্যমনস্কতায় গুমরাইয়া উঠিয়াছে।

মায়ার জীবনেতিহাস আমাদের জানা নাই। যাহা শুনিয়াছি তাও সত্য কি না মায়ার কাছে কোনদিন পরখ করিয়া দেখিয়া লইবার সুযোগ হয় নাই। শুনিয়াছি, মায়ার পিতা একজন কর্ম্মকার ছিল। তাহার পিতা অল্প বয়সেই মারা যায়। কিছুদিন পরে দুর্ব্বিষহ দারিদ্র্যের তাড়নায় তাহার মা তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যে পলায়ন করে কেহই বলিতে পারে না। তারপর মায়ার জীবন কাটিয়াছে অনাথ আশ্রমে। সেখানে থাকিয়া মায়া রোগী-পরিচর্য্যা শিখিয়াছে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য।

সংক্ষেপে এইটুকুই মায়ার জীবনী। সত্য কিনা জানি না, তবে দ্বিতীয় কোন কাহিনী আমরা শুনি নাই।

মায়ার রূপ? নির্জ্জন স্টুডিও ঘরে মায়ার দেহ কোন নিপুণ ভাস্কর যেন বাটালির ঘা মারিয়া মারিয়া গড়িয়াছে। সমস্ত দেহে শুধু তরঙ্গোচ্ছ্বাস। টানাটানা চোখদুইটি দ্বীপের মত দুইদিকে ভাসিতেছে। ঝড়ের রাতের মেঘের মত মুখের উপর সকরুণ স্তব্ধতা। ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু মেঘের বিদ্যুদ্বিলাসের মত।

জীবনের তীরপ্রান্তে পৌঁছাইয়া যাহারা এখানে আসে, পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতর দিয়া তাহাদের চোখের সামনে মায়া নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়ায়। মুমূর্ষুদের প্রাণে নূতন জীবনের আশা অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে। অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তরে পথহারা কোন পথিক যে আলেয়ার পিছু পিছু ছুটিয়া যায়, মায়া যেন সেই আলেয়া।

মায়া যেন নিশীথ রাতের স্বপ্ন; মাঘ-রজনীর কুয়াশা। যেমন সুন্দর, তেমনই সুদূর। তাহার এতটুকু পরিচয় সে ইঙ্গিতেও আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও জানায় নাই। সমস্ত প্রাণটুকু নিঃশেষ করিয়া আমাদের মত হতভাগাদের সেবা করিয়াই তার অগাধ তৃপ্তি।

হাসপাতালের চারিদিকে অসংখ্য ফুলবাগান। কোন দিন সন্ধ্যায় মায়া একগোছা ফুল হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। ফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়া যায়। সুগন্ধি ফুল উপহার পাইয়া এগারো জনের খুশির আর সীমা থাকে না।

কোন দিন মায়া সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য গল্প বলিতে থাকে, আবার কোন দিন ঘরে ঢুকিয়াই বলে, একমাস ছুটিতে আমি চ'লে যাচ্ছি, দেখা শোনার ভার আর একজন নেবেন।

সকলের মুখের দিকে আড় চোখে মায়া একবারটি চাহিয়া দেখে। তাহারই মুখের উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সকলেই নীরব।

কিছুক্ষণের মধ্যে কাসির প্রতিশব্দে ঘর কাঁপিয়া ওঠে। বালিশ ছেঁড়া, চুল ছেঁড়া, কাতরানি, গোঙানি সুরু হয়। মায়া আবার হাসিতে হাসিতে পরদিন ঘরে ঢুকিবার সময় বলে, না, যাওয়া আর হ'ল না, উপরওয়ালা ছুটি মঞ্জুর করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে সকলের রোগের যাবতীয় উপসর্গ মাথা চাড়া দিয়া ওঠে।

আজ মাত্র সপ্তাহখানেক হইল এগারো নম্বর বেডের রোগীটি ভর্ত্তি হইয়াছে। লম্বা চওড়া দেহের গঠন, বক্ষের বিস্তৃতি দেখিয়া বিশ্বাস হয় না যে, এর মধ্যেও যক্ষ্মা-বীজাণু বাসা বাঁধিতে পারে। যেন সুন্দর একখানি বই উইপোকায় কাটিয়াছে।

প্রথম রাত্রে মায়া ঘরে ঢুকিতেই সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়াছিল, বাঁচব তো?

মায়া স্বাভাবিক হাসি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, যেমন করিয়া সকলকেই দিয়া থাকে, কেন বাঁচবেন না, নিশ্চয়ই বাঁচবেন।

রোগীটি উৎকণ্ঠিত হইয়া আবার বলিল, আমার বাঁচবার খুব ইচ্ছে, আমাকে বাঁচান।

তাহার এই কাতর অনুনয় শুনিয়া মায়া বলিল, আপনি অত উতলা হচ্ছেন কেন? বাঁচবেন বই কি? শিগগির সেরে উঠবেন আপনি, ভয় কি?

আমরা বাকি দশ জন একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলাম। মায়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ের উপর চাদরখানি টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি গভীর হইয়াছে।

রোগীরা সকলে অকাতরে ঘুমাইতেছে।

চুপ করিয়া রেলিঙের পাশে দাঁড়াইয়া মায়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। তারাগুলি যেন তাহার চোখের সামনে কাঁপিতেছে। একখানি খণ্ডমেঘ আসিয়া তাহার সামনে দেবদারুগাছের মাথার উপর থমকাইয়া দাঁড়াইল।

যক্ষ্মারোগীর মত পাণ্ডুর মেঘখণ্ড ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্ধান করিল।

কয়দিনের মধ্যে মায়ার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। তাহার মুখে বিনিদ্র রজনীর কালিমা। পর পর তিন চারিটি সুদীর্ঘ রাত্রি সে এই রোগীর পাশে বসিয়া কাটাইয়াছে।

আমাদের ফুসফুসের আগুন তখন মাথায় উঠিয়াছে।

মায়া তার নিত্যকার কর্ত্তব্য নিখুঁতভাবে করিয়া যায়, মুমূর্ষুদের কাতর মন তাহাতে সাড়া দেয় না।

দশ জন মিলিয়া অভিযোগ করিল মায়ায় বিরুদ্ধে। নানা রকম দৌরাত্ম্যের মধ্য দিয়া অভিযোগের অভিব্যক্তি হইল।

মায়া নির্লিপ্ত রহিল।

সেদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া এগারো নম্বর বেডের রোগীকে জবাব দিয়া গেল। ঘন ঘন রক্তবমি করিয়া তার সমস্ত শরীর প্রায় নিস্পন্দ হইয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণের জন্য মায়াকে আর হাসপাতালের মধ্যে দেখা গেল না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে মায়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বেড খালি পড়িয়া রহিয়াছে। মায়ার হাতে এক তোড়া ফুল, আর এক ছড়া মালা। মায়া সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মৃত রোগীর আপাদমস্তক একখানি সাদা চাদর দ্বারা আবৃত। মাথার কাছে একটি ছয় সাত বছরের ছেলে, চুলগুলি রুক্ষ, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পায়ের কাছে একজন স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে।

মায়া চুপ করিয়া ফিরিয়া আসিল রোগীদের ঘরে। ফুলগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল মেঝের কোণে।

আমাদের মধ্যে একজন মায়ার দিকে ফিরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, আহা! ওর ঐ একটা ছেলে, আর স্ত্রী, আর কেউ নেই। মরবার আগে ওদের দেখার জন্যে ভীষণ কাতর হয়েছিল বেচারা, কিন্তু ওরা এসে পৌঁছাতে পারে নি। রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে আমার সঙ্গে কত দুঃখের কথাই না ও বলত! ওদের আর দুবেলা দুমুঠো খেতে দেবার কেউ নেই।

মায়া কথার উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কাল রাতেও তবে যে সে আমাকে বললে, তার কেউ নেই, সে একা, অসহায়, আরও কত কি?

কথা বলিবার সময় মায়া তার রুদ্ধ কণ্ঠস্বর গোপন করিতে পারিল না। ত্বরিৎপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর।

সকলে ঘুমাইতেছে।

আজ আর কাহারও শান্তিতে ঘুম নাই। নানা রকম বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিয়া কেহ গোঙাইয়া উঠিতেছে, কেহ মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাপা কান্নার ফঁস ফঁস শব্দ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

জানালার ফাঁক দিয়া আবছা আকাশ দেখা যাইতেছে। সারা আকাশ জুড়িয়া যেন ঐ চাপা কান্নার প্রতিশব্দ, ঘরের চারি কোণে ঐ চাপা কান্নার প্রতিধ্বনি।

পাশ ফিরিয়া শুইতেই হঠাৎ আমার নজরে পড়িল বাহিরে বারান্দার উপর কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মায়া?

এগারো নম্বর বেডের রোগীর মুখখানা হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।—হ্যাঁ, মায়াই তো।

রেলিঙের উপর মাথাটি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। রেলিঙের পাশে চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘন ঘন তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিতেছে।

মায়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

বহুদূরে নির্জ্জন দেবদারুগাছের মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের একটি পাশ অনেকখানি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যেন যক্ষ্মারোগীর একখানি বিক্ষত ফুসফুস।

চাঁদের ভিতর নিজের ক্ষীয়মান ফুসফুসের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়া আমার নির্জীব দেহ একবার কাঁপিয়া উঠিল।

আকাশের সেই নিঃসীম নীলিমা যেন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ক্ষয়রোগীর মত পাণ্ডুর আকাশ, ফ্যাকাসে।



পট ও পটুয়া

শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস.

সংস্কৃত ভাষায় 'পট্ট' বা 'পট' বলিতে মূলত কাপড় বুঝায়। প্রাচীন ভারতে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিবার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিত হইত, পট বলিতে বিশেষ করিয়া সেই কাপড়টিকেই বুঝাইত। কালক্রমে পটের এই অর্থ অধিকতর প্রচলিত হইল। এইজন্য 'পটকার' বা 'পট্টীকার' বলিতে চিত্রকর সমাজকে বুঝাইতে লাগিল। * 'পটকার' হইতেই 'পটুয়া' শব্দের উৎপত্তি। পটুয়ারা নিজেদের 'চিত্রকর' জাতি বলিয়া উল্লেখ করে।

বাংলা দেশে 'পটুয়া' জাতি ছাড়াও অপর কোন কোন জাতির লোক চিত্র লিখিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য্য-ব্রাহ্মণ ও কুম্ভকার সমাজের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহারা জাতিতে চিত্রকর সংজ্ঞার অন্তর্গত নয়।

এখন কাপড়ের উপর চিত্র লিখিবার রীতি প্রায় লোপ পাইয়াছে। কাগজের উপরেই সাধারণত চিত্র লিখিত হয়; কিন্তু 'পট' নামটি রহিয়া গিয়াছে। কাপড়ের উপর অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র এখনও দুই চারিটি পাওয়া যায়; আমার সংগ্রহেও উহা রহিয়াছে।

বাংলা দেশের পটগুলিকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।—(১) এক চিত্র সম্বলিত ছোট ছোট 'চৌকা' পট, (২) পর পর অঙ্কিত বহু চিত্র সম্বলিত 'দীঘল পট' বা 'জড়ানো পট'। এই বহুচিত্র দীর্ঘ পটগুলি অবলম্বন করিয়াই পটুয়াগণ গীতিকাব্য রচনা করে এবং তাহা সুরসহযোগে আবৃত্তি করে। বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াগণ আট দশ হাত হইতে কুড়ি পঁচিশ হাত দীর্ঘ কাগজের উপর এই শ্রেণীর বহুচিত্র দীর্ঘপট প্রস্তুত করিয়া উহার উপর এক একটি কাহিনীর বিবৃতিসূচক পর পর অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত করে † এবং বাংলার নানা জেলায় ঘুরিয়া ছবি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাহিনীগুলি সুরসহযোগে আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রত্যেক দীর্ঘ পটের দুই প্রান্তে দুইটি বাঁশের দণ্ড লাগানো হয়; শেষ প্রান্তের দণ্ড হইতে জড়াইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পটটি গুটাইয়া রাখা হয়। সুতরাং দীর্ঘ পটের প্রথম চিত্রের উপরিভাগে সংলগ্ন দণ্ডটি বাহিরে থাকে। পট দেখাইবার সময় জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোট চারপায়ার উপর রাখা হয়; প্রদর্শক পটুয়া বাঁ হাতে উপরি-ভাগের দণ্ডটি তুলিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রথম চিত্রটি খুলিয়া দেখায় ও ডান হাতে চিত্রে অঙ্কিত বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার কাহিনী সুরসহযোগে বিবৃত করে। তার পর উপরের দণ্ডটি ঘুরাইয়া প্রদর্শিত প্রথম পটটি তাহার উপর জড়াইয়া দ্বিতীয় পটটি উন্মোচন করে এবং তাহার কাহিনী এইরূপভাবে বিবৃত করে। এই প্রকারে দীর্ঘপটে অঙ্কিত সমস্ত চিত্রগুলি প্রদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিষয়-বস্তুগুলি গীতিকাব্যে বিবৃত করা হয়।

বাংলা দেশে আজকাল পটুয়া-শিল্পের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে, উহা বাংলার গণ-সঙ্গীত, গণ-নৃত্য ও গণ-শিল্পের প্রতি নব অনুরাগের ইতিহাসেরই একটি অঙ্গস্বরূপ। এই নব অনুরাগ সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯২৯ অব্দের নভেম্বর মাসে আমি যখন মৈমনসিংহ জেলার কালেক্টার ছিলাম, তখন সেখানে সেই জেলার হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বাউল-সঙ্গীত ও বাউল-নৃত্য এবং মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত জারি-সঙ্গীত ও জারি-নৃত্য ইত্যাদি মূল্যবান গণ-সংস্কৃতির প্ররক্ষণ ও পুনঃপ্রচলের উদ্দেশ্যে একটি 'গণগীতি ও গণ-সঙ্গীত সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৩০ অব্দে আমি বীরভূম জেলায় বদলি হই; এবং সেখানে রায়বেঁশে নৃত্য, কাঠি নৃত্য ও গীত, ঝুমুর নৃত্য ও গীত প্রভৃতি মূল্যবান পল্লী-সংস্কৃতির এবং তৎসহ পল্লীর অন্যান্য গণ-শিল্পের, যথা—প্রাচীর-চিত্রের,

* পটকার বা পট্টীকার বলিতে তন্তুবায়ও বুঝাইত; কিন্তু ঐ অর্থ এখন অপ্রচলিত।

† আনুষঙ্গিক চিত্রখানি এইরূপ একটি জড়ানো পটের অংশ।



বৃন্দাবনে গোষ্ঠলীলা

বীরভূমের পটুয়া অঙ্কিত প্রাচীন পট হইতে

এবং কাষ্ঠ-ভাস্কর্য্যের পুনরাবিষ্কার করি। লোক-সমক্ষে সেগুলির মূল্য যথাযথভাবে বুঝাইবার জন্য এবং পল্লী-সংস্কৃতির সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে গবেষণা করিবার জন্য আমি ১৯৩১ অব্দের জানুয়ারি মাসে 'বঙ্গীয় পল্লী-সম্পদ রক্ষা-সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করি।

এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া ১৯৩১ সনে বীরভূমের নানা গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই জেলার পল্লী-সংস্কৃতির অন্যান্য নিদর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় লাভ হয়। পশ্চিম-বাংলার রাঢ় প্রদেশের পটুয়াদের অঙ্কিত রঙিন বহু-চিত্র দীর্ঘ পটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান বাংলার দুই এক জন শিল্পী ও শিল্প-রসিক তখনও অবগত ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের চিত্র-শিল্পের প্রকৃত মূল্যের সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই তখন ধারণা ছিল; এবং এই চিত্র-শিল্পের ব্যাপক প্রসারের সম্বন্ধেও শিক্ষিত সমাজের অতি অল্প লোকই অবগত ছিলেন। বিশেষ করিয়া এই পটুয়াগণ পট-চিত্র অঙ্কন ছাড়াও যে কাব্য রচনা করিয়া সেগুলি গাহিয়া চিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকে, এবং সেই কাব্যগুলির যে সাহিত্য-হিসাবে সবিশেষ মূল্য আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

১৯৩২ অব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর আনুকূল্যে সেই সমিতির ভবনে আমি একটি গণ-শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করি। শিল্প-ইতিহাসে ইহাই প্রথম গণ-শিল্প-প্রদর্শনীর বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান। এই প্রদর্শনীতে বাংলার নিজস্ব আলপনা-শিল্প, কাঁথা-শিল্প, মৃৎ-শিল্প ও কাষ্ঠভাস্কর্য্য-শিল্প প্রভৃতি নানা পল্লী-শিল্পের সঙ্গে পটুয়াদের অঙ্কিত বহুসংখ্যক রঙ্গিন বহু-চিত্র দীর্ঘ পট প্রদর্শিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনীর পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান ও তৎসম্পর্কিত গবেষণার ফলে পশ্চিম-বাংলার পটুয়াদের ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে ও তাহাদের অঙ্কিত চিত্রশিল্প ও তাহাদের দ্বারা রচিত গীতি-কাব্যের শিল্প-হিসাবে মূল্য-সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা আমি একটি কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করি এবং ইংরেজীতে তাহার পদ্যানুবাদ করি। এই বাংলা ও



সিন্ধু-বধ—প্রাচীন পটের অংশ

ইংরেজী উভয় কবিতাই উল্লিখিত লোক-শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভায় পঠিত হয়। এই কবিতার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

খ্যাত এরা পটুয়া নামে পেশায় চিত্রকর ;
শীর্ণ এদের শরীরগুলি, জীর্ণ এদের ঘর।
গ্রামের সকল দরিদ্রদের চেয়েও এরা দীন ;
এদের পাড়া গ্রামের ভিতর সবচেয়ে মলিন।
হয় না এদের আহার যোগাড় ভিক্ষা-বৃত্তি বিনা ;
মুসলমান ও হিন্দু দুয়েই এদের করে ঘৃণা।

মুসলমান কি হিন্দু এরা—সেটাও বুঝা ভার ;
এদের কাছে দুয়েই করে রুদ্ধ তাদের দ্বার।

* * *

নমাজ পড়ে মুসলমানের, নাম ধরে হিঁদুর,
পুরুষ গড়ে দেবদেবী, আর স্ত্রী পরে সিঁদুর।

* * *

এরাই ছিল প্রাচীন যুগে বিশ্বকর্ম্মার জাত ;
রাজার চিত্রশালায় ছিল এদের শুধু হাত।

* * *

এদের রচা দেবদেবীদের হিন্দু করে পূজা ;
তবুও এদের ছোঁয় না তা'রা—যায় না সেটি বুঝা।

* * *

আজব তাই এ দৃশ্য—এরা বাংলা দেশের মাঝে ;
অনশনে বেড়ায় পথে অকিঞ্চনের সাজে।
দেশবাসীরা বিদেশ-কলার অনুকরণ রত ;
দেশের যারা কলা-রসিক ভিক্ষা তাদের ব্রত।
শীর্ণ এদের শরীরগুলি জীর্ণ দেশের ঘর ;
মুসলমানে করে ঘৃণা, হিন্দু ভাবে পর।
ধিক সে দেশের এদের যেথায় আদর নাহি আজ ;
ধিক্ সে দেশের এমন গুণীর নাই রে যেথায় কাজ।
ইচ্ছে করে আমার এদের কোলে টেনে ল'য়ে ;
ক্ষমা মাগি আমার মূঢ় জাতির পক্ষ হয়ে।
আসবে কবে সেদিন, যবে খুলবে মোদের চোখ ;
হে ভগবান, সেই প্রভাতের অরুণোদয় হোক !



শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ—আধুনিক পট

নেয় প্রতিমা এদের গড়া, দেয় না গুণের দাম ;
হায় ! ভারতের হিন্দুয়ানির এমনি পরিণাম।

* * *

অনাদৃত হয়ে এরা আজ এ বাংলা দেশে ;
পেটের দায়ে বেড়ায় পথে জন মজুরের বেশে।

* * *

হিন্দুর অধিক হিন্দু আরো আজও এদের প্রাণ ;
এদের ছুঁতে হিন্দু তবু করে হেয় জ্ঞান।
আজও এদের তুলির টানে ইন্দ্রধনু লাজে ;
অদ্বিতীয় আজও এরা চিত্রকরের কাজে।

মানুষের পরিকল্পিত যাবতীয় রসকলার প্রতিভা-গৌরবে বাঙালী জাতির স্থান জগতে যে অদ্বিতীয়, ইহার উপলব্ধি আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত শহুরে বাঙালীর নাই। তাই সে আজ বিশ্বের সভ্যতার আসরে তাহার কল্পিত আত্মনিকৃষ্টতা-লজ্জায় অবনত-মস্তক ও সঙ্কুচিত। অথচ বাঙালীর জাতিগত সেই মহিমময় প্রতিভার প্রতিনিয়ত-প্রবাহিত ফল্গুধারা আজও ইতিহাসের দুর্ভাগ্যময় পরিবর্ত্তনে লাঞ্ছিত ও দীনতাপন্ন বাঙালীর সমাজের গভীরতম অন্তস্তলে মন্দাকিনীর অনুপম লীলাময় শাখার ন্যায় আধুনিক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বহিয়া চলিয়াছে।

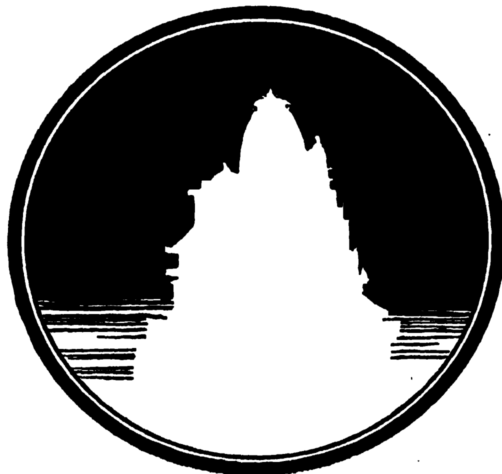
চিত্র-রসকলায় বাঙালী প্রাচীন যুগে যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষকে নয়, সমগ্র এশিয়াকে অনুপ্রাণনা বিতরণ করিয়াছে, তাহার উপলব্ধি আজকালকার শিক্ষিত বাঙালীর নাই। নিজস্ব সম্পদবিহীনতার ভ্রান্তবিশ্বাসের দৈন্যে প্রপীড়িত শিক্ষিত বাঙালী আজ বিশ্বের চিত্র-রসকলার হাটে, দীন ভিখারীর বেশে, অজন্তার ভগ্ন গুহাদ্বারে, মোগল ও রাজপুত প্রাসাদপ্রাঙ্গণে, চীন, জাপান, ইতালি ও ফ্রান্সের রঙ বেরঙের বিপণির দ্বারদেশে ভিক্ষুক।

বাংলার নিজস্ব রসকলা-প্রবাহিনীর যে গৌরবময় মন্দাকিনী-শাখা হইতে এই সকল দেশ প্রাচীন যুগে অনুপ্রাণনা সংগ্রহ করিয়াছিল, বর্ত্তমান বাংলার পল্লীর অবজ্ঞাত ধূলাবালিস্তরের গভীর নিম্নদেশে সেই মন্দাকিনী-শাখার বিচিত্র লীলাময় ফল্গুধারা যে এখনও অফুরন্ত অনুপ্রাণনাময় মাধুরী-হিল্লোলে প্রবাহিত, তাহা আজকালকার শিক্ষিত বাঙালী জানে না।

সেই ফল্গুধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে—বর্ত্তমান বাংলার অবজ্ঞাত নির্য্যাতিত, পদ-দলিত, দীন-দুঃখী পটুয়াদের পুরুষানুক্রমিক অনুপম চিত্রকলা-কৌশল-প্রতিভায়। যাহাদের তুলিকা-স্বষ্ট চিত্রলেখা-সুন্দরীর ভুবনমোহিনী প্রতিভার ঐশ্বর্য্য বাংলাকে আবার পৃথিবীর রসকলার আসরে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন দান করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলার অবজ্ঞাত পল্লীতে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় চিত্রলেখা-সম্পদ এখনও অবগুণ্ঠনের আড়ালে লোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া আছে, তাহার সেই সলজ্জ অবগুণ্ঠনের ঈষদুন্মোচন করিবার সৌভাগ্য-লাভের গৌরবে আজ আমার জীবন ধন্য।

ভ্রান্ত-শিক্ষা-বিমূঢ় বাঙালী তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আজ পরিচয় করুক; এবং যে গভীর নির্য্যাতন-প্রপীড়িত পল্লীবাসী পটুয়াগণ প্রাচীন বাংলার এই অদ্বিতীয় চিত্রকলা-প্রতিভার বাহক, তাহাদিগকে স্নেহালিঙ্গনে তুলিয়া লইয়া শিক্ষকের আসনে বরণ করুক; বাঙালীর আত্ম-নিকৃষ্টতা-বিশ্বাস অরুণালোক-সংস্পর্শে কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় অচিরে দূর হইয়া যাইবে; বাঙালীর আত্মবিশ্বাসহীনতা-দুর্ব্বল অবনত মস্তক আবার সমুন্নত হইয়া উঠিবে; বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব প্রাচীন রসকলা-প্রতিভার ঐশ্বর্যে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া পৃথিবীর রসকলা মন্দিরে পুনরায় শ্রেষ্ঠ পূজারীর আসন গ্রহণ করিবে।



নিগ্রহ

"সম্বুদ্ধ"

বিবাহের রাত্রে কুমুদিনীকে সকলে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, স্বামীর প্রিয়া হও। সে সময়ে বিধাতাপুরুষ কৌতুকভরে ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন।

কুমুদিনী সুন্দরী। সুন্দরী বলিয়াই দরিদ্রের কন্যা হইয়াও সে ধনীগৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। আত্মীয়স্বজনের আশীর্ব্বাদও ফলে নাই এমন নয়, স্বামীর প্রেম সে পাইয়াছিল। এবং সেইজন্যই বিবাহের পর একে একে ছয়টি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে বাইশ বৎসরে পদার্পণ করিল এবং তাহার ক্রোড়ে শিশুর আবির্ভাব হইবার আশা যখন সকলে প্রায় ছাড়িয়াই দিলেন, তখনও তাহার স্বামীকে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে কেহই সম্মত করিতে পারিলেন না।

অবশ্য কুমুদিনী নিজেও এতটা চাহিত না। অটুট স্বাস্থ্যের গৌরবে দেহ তাহার যতই কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল, একটি ক্ষুদ্রকায় শিশুর সুন্দর কমনীয় মুখ বুকের মধ্যে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অন্তর তাহার ততই আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল। সে ঔষধ খাইল; তাগা তাবিজ মাদুলি পরিল; মনে মনে ছোট বড় সমস্ত দেবতার কাছে সহস্র রকমের সম্ভব ও অসম্ভব মানত করিল; অবশেষে স্বামীকে ধরিয়া পড়িল, তুমি আবার বিবাহ কর।

কুমুদিনীর স্বামী নরেন্দ্র স্বভাবত অল্পভাষী। সে কহিল, সে হয় না।

কুমুদিনী কহিল, আমার মাথা খাও। আমি দুর্ভাগিনী, তাই বলিয়া তুমি কেন নিঃসন্তান হইবে?

নরেন্দ্র কহিল, আমার যদি পুত্রভাগ্য থাকেই, তবে সে পুত্র তোমার কোলেই আসিতে পারিবে। সেদিন ইহা লইয়া আর কথাবার্ত্তা অগ্রসর হইল না।

কুমুদিনীর শাশুড়ী ব্রজসুন্দরী তাহাকে স্নেহ করিতেন, কিন্তু ইদানীং তাঁহারও মন বিরূপ হইয়া উঠিতেছিল। হউক সে সুন্দরী, তবু বন্ধ্যা বধূর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহার আদরের পুত্র নিঃসন্তান থাকিবে, ইহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। রূপসী বলিয়া কুমুদিনীকে তিনিই জিদ করিয়া ঘরে আনিয়াছিলেন; এখন তাহার সেই রূপের প্রাচুর্য্যই তাঁহার চক্ষে অন্যায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এবং কুমুদিনীর প্রতি তাঁহার এই সদ্যোজাত বিদ্বেষের বহ্নিকে সহানুভূতির অঞ্চলবীজনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার মত শুভানুধ্যায়িনীরও অভাব ঘটিল না। পুত্রের অসন্তোষের ভয়ে ব্রজসুন্দরী মুখ খুলিয়া কুমুদিনীকে স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বলিতেন না, কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তায় আচরণে তাহার প্রতি একটা বিরাগের ভাব ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। স্পষ্ট কথা বলিবার অক্ষমতা এই বক্রদংশনের বিষ আরও বাড়াইয়া তুলিত। তাঁহার সখীরা কুমুদিনীকে আঘাত করিতে তাঁহার অপেক্ষাও কম সঙ্কোচ করিতেন। গৃহকলহের ভয় তাঁহাদের ছিল না।

কুমুদিনী সবই বুঝিল। স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধও করিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

নরেন্দ্র কহিল, তুমি হঠাৎ এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলে কেন বল তো?

কুমুদিনী হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কেন আবার কি! মার একটি নাতি কোলে লইতে সাধ যায় না? আমি সকলকে কেন বঞ্চিত করিয়া রাখিব?

নরেন্দ্র কহিল, তাঁহার আরও নাতি আছে। কিন্তু তুমি সত্য কথা বলিতেছ না। কেহ তোমাকে কিছু বলিয়াছে?

নালিশ করা কুমুদিনীর স্বভাব নয়। সে কহিল, আমাকে আবার কে কি বলিবে! কিন্তু আমারও তো অন্যের দিকটা দেখা উচিত।

নরেন্দ্র কহিল, আচ্ছা, সে কথামালার উপদেশ লইয়া আলোচনা এখন দুপুর রাত্রে নাই হইল।—বলিয়া পাশ ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

এইরূপে একদিকে সকলের তাচ্ছিল্য ও বিরাগের ইঙ্গিত ও আর একদিকে স্বামীর দৃঢ়তার চাপে পড়িয়া কুমুদিনী যখন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় একদিন অতর্কিতে বিধাতার বজ্র তাহার মাথায় আসিয়া পড়িল।

কুমুদিনীদের বাড়ির অনতিদূরে গ্রামের জমিদারবাড়ি। পূজার পরে সে বাড়িতে তিন রাত্রি যাত্রা হয়, ইহাদেরও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হয়। প্রতি বৎসরই কুমুদিনী শাশুড়ী ও জায়ের সহিত যাত্রা শুনিতে গিয়াছে। এবারও গিয়াছিল। মধ্যরাত্রে যাত্রা ভাঙিল। প্রথম আসর ভাঙার ভিড় কমিলে তাহারা বাড়ি রওয়ানা হইল। রাত্রিকাল হইলেও পাড়ার মধ্যে সামান্য পথ, এইটুকু যাইতে গ্রামের লোক পালকিও ব্যবহার করে না, ভয়ও কিছু নাই। কুমুদিনীর বালক দেবর লণ্ঠন লইয়া আগে আগে চলিতেছিল আর পিছনে মেয়েরা আসিতেছিল। কুমুদিনী ছিল সকলের পশ্চাতে।

পথের মধ্যে এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছ পথের উপরে ডালপালা ছড়াইয়া দিয়াছে, এবং তাহার গায়েই কয়টা চোখ-উঠানি ও বামুনযষ্টির গাছ হইয়া জায়গাটাকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা এইখানটাতে আসিতেই অতর্কিতে জনকয়েক লোক ইহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং ভয়ার্ত্ত মেয়েরা চীৎকার করিয়া উঠিতে না উঠিতে কুমুদিনীর মুখে কাপড় জড়াইয়া তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার পর যথারীতি কোলাহল হইল, বাড়ির ও পাড়ার যুবকেরা দল বাঁধিয়া আশেপাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া ফিরিল, কিন্তু সে রাত্রিতে আর তাহার সন্ধান হইল না।

কুমুদিনীর ভাসুরের মেয়ে শান্তির বয়স বছর ছয়েক। মেয়েটা পেটরোগা এবং অত্যন্ত লোভী। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সে একবার ঘরের সবগুলা আয়ত্ত স্থান হাতড়াইয়া আসে এবং যাহা পায় মুখে পুরিয়া দিনের যাত্রারম্ভ করে। পরদিন ভোরের আবছায়া আলোকে বারান্দায় বাহির হইয়া সে দেখিল বারান্দার একপাশে কে একজন জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া আছে। কৌতূহলভরে এক পা এক পা করিয়া কাছে যাইতেই কুমুদিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। দুই চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ ও শূন্যদৃষ্টি, বস্ত্র

ছিন্নভিন্ন, কবরী বিশৃঙ্খল, সর্ব্বাঙ্গে সংগ্রামের চিহ্ন। বহু ক্লেশে আততায়ীদের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া সে অভয় খুঁজিতে তাহার একমাত্র পরিচিত আশ্রয়ে ছুটিয়া আসিয়াছে।

শান্তি তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা সে কিছুই জানে নাই। ছুটিয়া ঘরে গিয়া মাকে ঠেলিয়া তুলিয়া কহিল, মা, কাকীমা কাঁদে কেন ?

তাহার মা বিস্মিত হইয়া কহিল, কে ?

শান্তি কহিল, কাকীমা। তুমি এস।—বলিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল।

মুহূর্ত্ত পরে বাড়ির ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ সকলে আসিয়া তাহার চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। কুমুদিনী মুখ তুলিল না, দুই বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তেমনই নিথর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। শিশুরা পর্য্যন্ত মুখে আঙুল পুরিয়া পরম চিন্তান্বিতের মত একদৃষ্টে চাহিয়া শুধু তাহাকে দেখিতে লাগিল। দুর্বৃত্তের করস্পর্শে কুমুদিনী এখন দর্শনীয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সকলে শুধু চাহিয়া দেখিতে চায়; কোন কথা বলিয়া তাহার মৌন ভাঙিবার উৎসাহ কেহ দেখাইল না।

ক্রমে প্রতিবেশীরাও একজন দুইজন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে এক আধটুকু অস্ফুট মৃদু কথা শোনা যায়, তখনই আবার অন্য কেহ ইঙ্গিতে তাহাকে নিরস্ত করিয়া দেয়। এমনই করিয়া বহুক্ষণ কাটিবার পর সহসা একবার এই মৌনের প্রাচীর টলিল। শান্তির দুই বৎসর বয়স্ক ভাই টুনু কুমুদিনীর পরম ভক্ত। সে হঠাৎ "কাকীমা" বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া তাহার কোলে পড়িতে গেল। কুমুদিনী চমকিয়া মুখ তুলিয়া, যন্ত্রচালিতের মত দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া দিল; কিন্তু টুনু তাহার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ব্রজসুন্দরী ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইয়া তাহাকে টানিয়া সরাইয়া লইলেন। কুমুদিনী বিহ্বলের মত এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল, তারপর আবার মুখ নত করিল।

বেলা বাড়িতে লাগিল। দর্শকদের কৌতূহল তৃপ্ত হইলে একে একে তাহারা যে যাহার কাজে প্রস্থান করিল। ভিড় যখন অনেকটা হালকা হইয়া আসিয়াছে, তখন কুমুদিনীর শ্বশুর কালীকিঙ্কর খড়মের শব্দ তুলিয়া রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কালীকিঙ্কর প্রভাতে একবার কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে চলিয়া গিয়াছিলেন, এতক্ষণে সেখানে শাস্ত্রীয় আলোচনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েরা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। কালীকিঙ্কর কুমুদিনীর সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, নরেন, ওকে বলিয়া দাও—এ বাড়িতে আর ওর স্থান হবে না।

কুমুদিনীর কানে এই দণ্ডাজ্ঞা পৌঁছাইবার জন্য ইহার পুনরাবৃত্তি করার আবশ্যক ছিল না। নরেন্দ্র মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কালীকিঙ্কর পুনরায় কহিলেন, ওকে বুঝাইয়া দাও, গৃহস্থের ঘরে পতিতার স্থান হইতে পারে না।

কুমুদিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া আরক্ত স্থির দুই চক্ষে শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, আমি কোথায় যাইব ?

কালীকিঙ্কর কহিলেন, তোমার ভাইকে সংবাদ দিতেছি, সে আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে। আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিয়া সমাজে পতিত হইতে পারিব না।

কুমুদিনী এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর সহসা উপুড় হইয়া পড়িয়া নরেন্দ্রের দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, আমাকে বাঁচাও, এমন করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিও না। আমার কি অপরাধ?

নরেন্দ্র প্রস্তরবৎ শুধু চাহিয়া রহিল।

কালীকিঙ্কর গর্জ্জিয়া কহিলেন, না, অপরাধ যত আমারই। নরেন, তোমাকে যাহা বলিলাম কর।—বলিয়া খড়ম খটখট করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কুমুদিনী বিভ্রান্ত কণ্ঠে কহিল, আমার যাইবার জায়গা কোথায় আর আছে! আমি অশুচি, আমাকে গ্রহণ তুমি করিও না, কিন্তু এমন করিয়া মরণের মুখে আমাকে ঠেলিয়া দিও না। তোমার বাড়িতে কত জীবজন্তুরও তো স্থান আছে, তাহাদেরই সঙ্গে এককোণে আমাকে একটু জায়গা দাও।

ব্রজসুন্দরী মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, কেন, যাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলে, সেখানে জায়গা হইল না?

নরেন্দ্র দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, মা!

ব্রজসুন্দরী কথা কহিলেন না।

নরেন্দ্র কহিল, এ বাড়িতে ওর যদি স্থান না হয় তবে আমারও হইবে না।

কুমুদিনীর অশ্রুহীন চক্ষে এতক্ষণে জলের প্লাবন ভাঙিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া আসিল। নরেন্দ্রের পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কুমুদিনী আশ্রয় পাইল। বধূরূপে নয়, অন্ত্যজা আশ্রিতারূপে। তাহাতেই সে কৃতার্থ হইয়া গেল।

কালীকিঙ্কর বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি জানিতেন, সংসারে সকল ব্যাপার ও সকল বস্তু হইতেই যথাসাধ্য কাজ আদায় করিয়া লইতে হয়, হাঁড়ি ভাঙিলে খোলামকুচিগুলা লোককে ছুঁড়িয়া মারিতেও কাজে লাগে। ইহা না জানিলে তিনি কয় বৎসরে পৈতৃক সম্পত্তি চতুর্গুণ করিয়া তুলিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্রের আপত্তি ঠেলিয়া কুমুদিনীকে এখনই তাড়াইয়া তিনি দিলেন না। তিনি জানিতেন, নরেন্দ্রকে আপাতত প্রসন্ন রাখাই সঙ্গত, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে বেগ পাইতে হইবে না। কুমুদিনীর প্রতি নরেন্দ্রের আকর্ষণটুকু নববধূ ঘরে আসিলে স্বতই কমিয়া আসিবে, তাহার পর আর তাহাকে বিদায় করিবার কোন অন্তরায় থাকিবে না। এই কয়দিন যদি কুমুদিনীকে আশ্রয় দিতেই হয়, ক্ষতি নাই। বরং সে হাতে থাকিলে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্যদিকেও কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ আছে। ব্রজসুন্দরীকে তিনি কথাটা খুলিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সকল শুনিয়া বুদ্ধিমতী ও পতিপরায়ণা ব্রজসুন্দরীও আর আপত্তি করিলেন না।

পাশের গ্রামের গফুর শেখের সহিত একটা জমি লইয়া কালীকিঙ্করের বিবাদ চলিতেছিল। গফুরের দুই পুত্র—গহর ও জহর অতিশয় বলবান্‌ ও দুর্দ্দান্তস্বভাব, বহু উচ্ছৃঙ্খল দুর্বৃত্ত লোক তাহাদের হাতে আছে বলিয়া এ অঞ্চলের সকলেই বিশ্বাস করে।

বিচক্ষণ কালীকিঙ্কর দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, কুমুদিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া বিধাতা তাঁহার হাতে শত্রুনিপাতের ব্রহ্মাস্ত্র আনিয়া দিয়াছেন।

এমন সুবর্ণসুযোগ ছাড়িতে নাই। কালীকিঙ্কর তৎপর হইলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার গোমস্তা রোহিণী দাস সংবাদ আনিল, ঘটনার রাত্রিতে গহর ও জহর বাড়িতে ছিল না, ইহার সাক্ষী পাওয়া গিয়াছে। তারপর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কালীকিঙ্কর রোহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। অতি প্রত্যূষে রোহিণী কয়েকখানি ভারী অঙ্কের টাকার নোট ট্যাঁকে লইয়া থানার দিকে রওয়ানা হইল।

কালীকিঙ্করের বাড়ির সম্মুখেই ছোট নদী, গ্রামের প্রান্ত ঘুরিয়া নদী গিয়া বড় নদীতে পড়িয়াছে। অচিরে কালীকিঙ্করের বাঁধা ঘাটে দারোগার নৌকা আসিয়া লাগিল। বুড়া গফুর ও তাহার দুই পুত্রকে হাতকড়ি লাগাইয়া লইয়া আসিয়া কালীকিঙ্করের বৈঠকখানায় দারোগা বার দিয়া বসিলেন। গ্রামের লোক তামাসা দেখিতে জড়ো হইল।

কুমুদিনীর সেইখানে ডাক পড়িল। ঘরে পা দিয়াই কুমুদিনী চমকিয়া উঠিল। রাত্রির অন্ধকারে যাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাকে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, প্রখর দিবালোকে অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসিল, দ্বারের চৌকাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে কোন রকমে মূর্চ্ছার বেগ সংবরণ করিল। দারোগা বৃদ্ধ মুসলমান, অতিশয় ভদ্রলোক। গৃহের দ্বারে জানালায় বহু কৌতূহলী দৃষ্টি কুমুদিনীর প্রতি উদ্যত হইয়াছিল, তাঁহার ইঙ্গিতে কন্‌স্টেব্‌লরা সকলকে হঠাইয়া দিল। দারোগা কুমুদিনীকে কহিলেন, মা লক্ষ্মী, আপনি চাহিয়া দেখুন তো ইহারা সেই লোক কিনা!

এই অপরিচিত বৃদ্ধের মুখে এমন সদয় সম্ভাষণ শুনিয়া কুমুদিনী শিহরিয়া উঠিল, তারপর অকস্মাৎ তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইল, এমন স্নেহের ডাক সে যেন কত যুগ ধরিয়া শোনে নাই।

দারোগা আবার কহিলেন, মা লক্ষ্মী, লজ্জা করিলে তো হইবে না। দেখুন, ইহাদের আপনি চিনিতে পারেন?

বৃদ্ধ গফুর আর্ত্তনাদ করিয়া কুমুদিনীর সম্মুখে আছড়াইয়া পড়িল। কাঁদিয়া কহিল, মা ঠাকুরাণী, আপনি আমাকে বাঁচান।

একজন কন্‌স্টেব্‌ল তাহার পাঁজরে বুটজুতার ঠোক্কর দিয়া কহিল, এই বদমায়েস, সিধা হইয়া ব'স।

কুমুদিনী একবার ভূলুণ্ঠিত বৃদ্ধের শীর্ণ মুখের পানে চাহিল, তারপর মাথা নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, না।

কালীকিঙ্কর পূর্ব্বাহ্নেই কুমুদিনীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে 'হাঁ' বলিতে হইবে। তিনি গর্জ্জিয়া কহিলেন, 'না' কি ?

দারোগা তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিয়া কুমুদিনীকে কহিলেন, ভাল করিয়া দেখুন। আপনি সনাক্ত না করিলে আমি আসামী চালান দিই কি করিয়া !

কুমুদিনী স্পষ্ট মৃদুস্বরে কহিল, আমি কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারিব না।

কালীকিঙ্কর আর একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দারোগা কহিলেন, মা লক্ষ্মী, আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কি ইহাদের সনাক্ত করিতে চান না ?

কুমুদিনী মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না।

দারোগা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তাহার অর্থ ?

কুমুদিনী কহিল, আমার দেবতা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। এখন আমি অপরকে ক্ষমা করিতে না পারিলে বিধাতার কাছে অপরাধী হইব।

দারোগা বুঝিলেন না, কহিলেন, তাহা হইলে আপনি ইহাদের সনাক্ত করিতে পারিতেছেন না ?

কুমুদিনী একবার গফুরের দিকে চাহিল, একবার শ্বশুরের রোষরক্ত চক্ষের দিকে চাহিল, তারপর তেমনই দৃঢ় অথচ মৃদু কণ্ঠে কহিল, না। ইহাদের আমি কখনও দেখি নাই।—বলিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দারোগা কালীকিঙ্করকে কহিলেন, উনি সনাক্ত না করিলে আমি ইহাদের চালান করিতে পারি না।

কালীকিঙ্কর রুদ্ধস্বরে শুধু কহিলেন, হুঁ।

মাঘ মাসে নূতন বধূ ঘরে আসিল। বধূর নাম প্রতিমা। কুমুদিনীর মত সে রূপসী নয়, কিন্তু তাহার শ্যামল লঘু দেহটিকে ঘিরিয়া, তাহার শান্ত আয়ত দুইটি চক্ষে একটা অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতার ছায়া বিরাজ করিত।

বিবাহের কোলাহল শেষ হইলে সে কুমুদিনীর সঙ্গে ভাব করিতে আসিল। প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই কুমুদিনী সন্ত্রস্ত হইয়া পিছাইয়া গেল, কহিল, ছি বোন, আমাকে প্রণাম করে না।

প্রতিমা জোর করিয়া পদধূলি লইয়া কহিল, মা বলিয়া দিয়াছে, সতীনের কথা কখনও শুনিতে নাই।

দুই সতীনে বন্ধুত্ব হইতে সময় লাগিল না। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে প্রতিমা কুমুদিনীর ঘরে আসিয়া জুটিত এবং সহানুভূতি ও স্নেহের অঞ্চল দিয়া তাহার মনের বিষণ্ণতাকে মুছিয়া লইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত।

কুমুদিনী সঙ্কুচিত হইয়া বলিত, তুমি যাও ভাই, এত ঘন ঘন আমার কাছে আসিও না। মা জানিতে পাইলে রাগ করিবেন।

প্রতিমা বলিত, করিয়া দেখুন না। রাগ আমরা করিতে জানি না ? জান, ইস্কুলে আমি

ঝগড়া করার জন্য বিখ্যাত ছিলাম। তারপর দুই হাতে কুমুদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, সত্যই ভাই দিদি, তুমি একেবারে অপদার্থ। এমন করিয়া বিনা অপরাধে ইহারা তোমাকে নির্যাতন করিল, আর তুমি কি বলিয়া তাই চুপ করিয়া সহিলে?

কুমুদিনী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিত, অমন কথা বলিতে নাই। তাঁহারা নির্যাতন করিবেন কেন, তাঁহারা তো আমার প্রতি সদয় ব্যবহারই করিয়াছেন। আমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে, তাহা কে খণ্ডাইবে!

প্রতিমা রাগিয়া বলিত, অদৃষ্ট চাহিয়াই তুমি মরিলে। কিন্তু অদৃষ্ট যাহাই হউক, মানুষের কাণ্ডজ্ঞানও তো একটা থাকে। শ্বশুরের কথা ছাড়িয়াই দিই, তাঁহার ছেলে কি বলিয়া তোমাকে এত জানিয়া শুনিয়াও বিনা দোষে ত্যাগ করিলেন? কাল আমি এই লইয়া ভারী ঝগড়া করিয়াছি। শেষে মুখ হাঁড়ি করিয়া মুনিঠাকুর হইয়া রহিলেন, আমার আবার সাধিয়া মান ভাঙাইতে হইল।

কুমুদিনীর চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত, সস্নেহে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিত, ছি, শুধু বাহিরটা দেখিয়া মানুষকে বিচার করিস না। তুই তাঁহাকে এখনও চিনিস নাই, কিন্তু আমি জানি, তিনি দেবতা।

প্রতিমা বিস্মিত হইত, পরক্ষণেই সকৌতুক ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিত, হুঁ, দক্ষিণরায়। দেবতা বলিয়াই এমন নিঃসঙ্কোচে তোমার মুণ্ডটা চিবাইয়া খাইতে পারিয়াছেন, না?

কুমুদিনী বলিত, ওরে, তিনি আমার মুণ্ড খান নাই, তিনিই আমাকে বাঁচাইয়াছেন, সে কথা তুই বুঝিবি না। তিনি আমাকে দয়া করিয়াছেন বলিয়াই তো আজও বাঁচিয়া আছি। না হইলে এতদিন আমার কি দশা হইত!

প্রতিমা বলিত, বুঝি না বাবু দেবত্ব। তোমাকে দয়াই যদি করিয়াছেন, তবে আবার বিবাহ করিলেন কেন? দয়ার নমুনাটা বেশ।

কুমুদিনী তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত, এ তোর কি রকম কথা? আমাকে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই সমাজের ভয়ে। তাই বলিয়া তাঁহাকে অপরাধী করিব, আমি কি তাঁহাকে চিনি না?

প্রতিমা বলিত, কিন্তু তুমিই বা চুপ করিয়া এই অবহেলা সহিলে কেন? আমি তো কক্ষনো সহিতাম না।

কুমুদিনী ম্লান হাসিয়া বলিত, অবহেলা তো তিনি আমাকে করেন নাই। আর তিনি আমাকে আবার গ্রহণ করুন—এমন কামনা আমিই বা করিব কি বলিয়া? ছেঁড়া ফুলে কি দেবতার পূজা হয়?

—নাঃ, তোমার মাথাই খারাপ।—বলিয়া প্রতিমা রাগ করিয়া উঠিয়া যাইত। কুমুদিনী অঞ্চল ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বসাইত, বলিত, পাগলী মেয়ে, রাগ করে না। দেখ, আমি তাহাকে যত চিনি এমন আর কেহ চেনে না। এই কথাটি আমার মনে রাখিস, ভুলেও কখনও তাঁহাকে আঘাত করিস না। অনেক পুণ্যের বলে এমন স্বামী পাইয়াছিস।

প্রতিমা বলিত, হুঁ, দক্ষিণরায়। তারপর কুমুদিনীকে ভ্যাংচাইয়া ছুটিয়া পলাইত।

সংবাদ পাইয়া কুমুদিনীর দাদা যোগেশ তাহাকে লইতে আসিল। কুমুদিনী কহিল, আমি যাইব না।

সেই স্বল্পপরিসর গৃহের দিকে, কুমুদিনীর আভরণহীন শীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া যোগেশের চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, তোকে এমন অবস্থায় রাখিয়া কি করিয়া আমি ফিরিয়া যাইব! চল, সেখানে অন্তত তোকে অনাদর কেহ করিবে না।

কুমুদিনী কহিল, না।

যোগেশ কহিল, কিন্তু ইহারা যখন আর তোকে গ্রহণ করিবেই না, তুই এমন অবহেলা সহিয়াও এখানে পড়িয়া থাকিতে চাস কেন?

কুমুদিনী কহিল, সে কথা তুমি বুঝিবে না। তুমি যাও, আমার যদি এখানে থাকিতে কখনও কষ্ট হয়, তখন আমি নিজেই তোমাকে সংবাদ দিব, কথা দিলাম।

যোগেশ ফিরিয়া গেল।

প্রতিমা কহিল, দিদি, গেলে না কেন?

কুমুদিনী কহিল, তবু তো দিনান্তে একবার তাঁহার মুখখানা দূর হইতেও দেখিতে পাই। আমার এই স্বর্গ ছাড়িয়া আমি যাইব কোথায়?

প্রতিমা কহিল, তোমার যাইবার যোগ্য স্থান একটিমাত্র আছে—যমের বাড়ি।

বৈশাখের প্রথম প্রতিমার মাতা তাহাকে লইতে লোক পাঠাইলেন।

যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে প্রতিমা কুমুদিনীর কাছে বিদায় লইতে আসিল। সজল চক্ষে কহিল, দিদি, আমার ঘরসংসার সমস্ত রহিল, তুমি দেখিও।

কুমুদিনী হাসিল। মনে মনে কহিল, ওরে অবোধ মেয়ে, আজ ছয় বছর ধরিয়া এই ঘরসংসার আমার মজ্জায় মিশিয়া আছে, আর তুই দুই দিন আসিয়াই ইহার সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দিতে আসিলি! মুখে কহিল, দেখিব।

মাসের মধ্যে প্রতিমার ফিরিবার কথা। কিন্তু সময়ে তাহার ফেরা হইল না।

কালীকিঙ্করের নিকটে পত্র আসিল, প্রতিমার পিতামহী অসুস্থ, এখন তাহার ফেরা দুঃসাধ্য।

প্রতিমার পিতা ধনবান।

কালীকিঙ্কর উত্তর দিলেন, তাঁহার আপত্তি নাই।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। পূর্ণিমা আসন্ন। মধ্যরাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত সমস্ত পৃথিবী সুপ্তিমগ্ন, কিন্তু নরেন্দ্রের চক্ষে নিদ্রা আসিতেছিল না। বহুক্ষণ সে শয্যার উপরে এপাশ ওপাশ করিল। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

নীচে তাহার ক্ষুদ্র ঘরে কুমুদিনী ঘুমাইতেছিল। শীতল করস্পর্শে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল, শঙ্কিত স্বরে কহিল, কে ?

নরেন্দ্র কহিল, আমি।

কুমুদিনী ত্রস্তে শয্যার অপর প্রান্তে সরিয়া গেল, কহিল, তুমি এখানে কেন ?

নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, আমি এখানে কেন !

কুমুদিনী কহিল, যাও, চলিয়া যাও। আমাকে তুমি স্পর্শ করিও না, আমি অশুচি।

নরেন্দ্র সবলে তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া কহিল, চুপ। আমি তোমার স্বামী।

কখন যে নরেন্দ্র চলিয়া গেল, কুমুদিনী তাহা জানিতেও পারিল না। বিবশ দেহে বহুক্ষণ সে শয্যার উপরে পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল তাহার সকল চৈতন্য লোপ পাইতেছে, দেহের সমস্ত রক্ত তাহার মাথার মধ্যে গিয়া সঞ্চিত হইয়া চক্ষু মুখ কান দিয়া ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে।

রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন কুমুদিনীর চমক ভাঙিল। ধীরে ধীরে শয্যা ছাড়িয়া সে নীচে নামিল। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া একবার তাহার শ্বশুরের ভিটাকে প্রণাম জানাইল, তারপর নিঃশব্দে বাড়ির বাহির হইয়া আসিল।

চতুর্দ্দশীর চন্দ্র তখন দিগন্তে বনান্তরালে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জোয়ারের স্ফীত নদী কূলে কূলে ভরিয়া ঘাটের প্রথম সোপান স্পর্শ করিতেছে। সেই ঘাটের উপরে নক্ষত্রের স্তিমিত আলোয় কুমুদিনী আসিয়া দাঁড়াইল। একবার সে মুখ তুলিয়া আকাশে চাহিল, একবার কাঁদিয়া কহিল, ভগবান, মানুষের প্রাণ দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলে, তাহার চেয়েও কি আমার দেহটাই সত্য হইল ?

তারপর সেই স্ফীত নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না। শুধু আকাশে শত লক্ষ তারা নিস্তব্ধ চক্ষু মেলিয়া এই অভিমানিনীর বেদনার মূক সাক্ষী হইয়া রহিল, আর জোয়ারের জল শত ব্যগ্র অঙ্গুলি বাড়াইয়া সোপানের উপরে তাহার শেষ চরণচিহ্নটুকু মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া লইতে লাগিল।

তারপর আর একবার দারোগা পুলিস আসিল, আর একবার বৃদ্ধ গফুর ও তাহার দুই পুত্রকে বাঁধিয়া আনা হইল ও তাহারা আর একবার শপথ করিয়া কহিল, তাহারা ইহার কিছুই জানে না; এবং সেই দুর্বৃত্তা কুলত্যাগিনীর পাপের কথা স্মরণ করিয়া গ্রামসুদ্ধ নরনারীর সনিষ্ঠ ঘৃণায় বারংবার শিহরিয়া উঠিল। সে যে নিজের দুষ্প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্যই এমন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বিষয়ে গৃহে ও বাহিরে কাহারও মনে তিলমাত্র সংশয় রহিল না।

অস্ফুট

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন

বহু বেদনার ব্যর্থতা ভার গুমরি মরে
বহু-লাঞ্ছিত শতেক পীড়িত এ অন্তরে।
সেদিন যখন এ ধরার আলো পশিল চোখে,
প্রথম পরশ দিয়ে গেল মোর মর্ম্মলোকে,
বহু বাসনার শতদল ভার হৃদয়মাঝে
ফুটিয়া উঠিল নানা ছন্দের হর্ষে-লাজে।
—যত দিন গেল একে-একে সব পাপড়ি খসে
পরাণে আমার সর্ব্বনাশার বহ্নি শ্বাসে ॥

অন্ধকারার মাঝখানে আজ পরাণ কাঁদে,
কোথা হ'তে যেন ধরা পড়িয়াছি ব্যাধের ফাঁদে!
চারিদিকে দেখি অভাব-ক্ষতির মুক্ত মেলা,
তার মাঝে, হায়, কোথায় বা গান, কোথায় খেলা,
হাসি নাহি সেথা, বাঁশি বাজে নাকো, ফোটে না ফুল,
সাদা জ্যো'স্নার রূপালী আলোক করে না ভুল।
বদ্ধ প্রাচীর, রুদ্ধ প্রাকার, ক্ষুব্ধ বায়ু
আনে ক্লিন্নতা, হরে জীবনের বাঁচার আয়ু ॥

জগতের হাটে, বড় আশা ছিল, বেসাতি করি,
অকালে আশার অস্ফুট-কলি গেল যে ঝরি।
সবাকার হ'তে আড়ালে আমার ছোট এ বুকে
অনেক ছন্দ-গন্ধ কাঁদিল সুখে ও দুখে;
কোথা হ'তে এল উত্তরবায় শুষ্ক তাপে,
সর্ব্বহারার ছবি চোখে দেখি হৃদয় কাঁপে ॥
—ফুটিবার আগে, দেখি, কাছে এল ঝরার বেলা,
সুরু হ'তে হ'তে শেষ হ'তে চলে ধরার খেলা ॥

ধূ-ধূ-মরুভূমি যতদূর চাই, শ্যামশষ্পের
নাহিকো চিহ্ন,—লতাবিটপীর পাইনে টের।
তারি মাঝখানে পথিক-ভুলানো মরীচিকায়
দুর্জ্জয় প্রাণ দুর্দ্দম বেগে ব্যাকুলি ধায়।
তপ্ত-বালুর উষ্ণতা ক্ষত ফুঁসিয়া ওঠে,
'জল, ওরে জল',—শুষ্ককণ্ঠে কাতরে ফোটে;
—শুধু ঝিকিমিকি করে আঁখি আগে বালুর কণা,
খর-রৌদ্রের রশ্মি মেলে যে লক্ষ ফণা ॥

কত কথা ছিল বলিবার, কত ছিল যে সুর,
কত গান ছিল হৃদয়-আসর করিয়া পুর।
কত স্বপনের সুখ-স্মৃতি ছিল মরমে গাঁথা,
কত পূজনের আশায় আসন আছিল পাতা!
ভরা-পসরায় ছিল যে অনেক দেবার-ধন,
হাতে ছিল রাখী বন্ধন লাগি অনুক্ষণ!
—হায় রে, আমার সোনার স্বপন, হায় রে মেলা,
ফুটিবার আগে কাছে আসে ঐ ঝরার বেলা ॥

একটি আধুনিক গল্প

শ্রীপরিমল গোস্বামী

রামশরণ তাহার স্ত্রী পার্ব্বতীকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়াও তৃপ্তি পাইল না, প্রহার শেষে অকথ্য ভাষায় গাল দিতে লাগিল।

পার্ব্বতী এই অত্যাচার কিছুক্ষণ সহ্য করিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার সহ্যের সীমা ভাঙিয়া যাওয়াতে সেও রামশরণকে মারিয়া ধরাশায়ী করিল, এবং সেও তাহাকে গাল দিতে লাগিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলিবার পর উভয়েই কাবু হইয়া পড়িল; রামশরণ নেশা করিয়াছিল, তাহার নেশা ছুটিয়া গেল, এবং এই অপকার্য্যের জন্য তাহার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল।

রামশরণ পার্ব্বতীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। পার্ব্বতী কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া রহিল, কিন্তু ক্রমে তাহার-মন ভিজিয়া উঠিল; শেষে তাহার মনে অনুকম্পা জাগিল।

রামশরণ সুযোগ বুঝিয়া পার্ব্বতীর নিকট একটি টাকা চাহিল, পার্ব্বতীও তৎক্ষণাৎ একটি টাকা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। রামশরণ একটি ভজনের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে টাকা লইয়া মদের দোকানে চলিয়া গেল।

রামশরণ সপরিবারে বস্তীতে থাকে। বস্তীর বাড়িগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। বস্তীবাসী সবাই মিলিয়া একটি বৃহৎ পরিবারের মত। ইহারা প্রায় সবাই স্থানীয় চটের কলের মজুর। মজুরেরা সপ্তাহে একটি দিন মাত্র ছুটি পায়, কিন্তু এই ছুটি পরিশ্রমের অনুপাতে যথেষ্ট নয়। এক সপ্তাহে তাহাদের যে কাজ করিতে হয়, তাহাতে তাহার পর এক বৎসর ছুটি পাইলে তবে তাহা যথেষ্ট মনে হইতে পারে, কাজেই এই একটি দিনের ছুটিকে তাহারা কৃত্রিম উপায়ে এক বৎসরের ছুটিতে পরিণত করিতে চাহে, এবং হয়তো তাহাতে সফলও হয়। বস্তীর প্রায় সকল স্বামী-স্ত্রীই রামশরণ এবং পার্ব্বতীর মত উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম এবং স্বাধীন। তাহারা ছুটির দিনে সকলেই বেপরোয়া হইয়া ওঠে, কেহ কাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। বিবাহিত জীবনে ইহাদের কোন নির্ভরতা নাই, কোন নিশ্চিন্ততা নাই, এবং নিষ্ঠাও নাই। সেদিক দিয়া ইহারা প্রায় হলিউডের সমধর্ম্মী। ইহারা যে বস্তীতে থাকে, সেই বস্তীতে মাত্র তিনজন ব্যক্তি আজিও অবিবাহিত। পুরুষদের মধ্যে ভজুয়া আর মেয়েদের মধ্যে লছমী এবং কৃষ্ণকুমারী। ইহাদের কথা যথাসময়ে বর্ণিত হইবে।

রামশরণ টাকা লইয়া চলিয়া গেলে পার্ব্বতী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার প্রধান সম্পত্তি টিনের বাক্সটি খুলিয়া তাহা হইতে একখানা জীর্ণ খাতা বাহির করিয়া পেন্সিলের সাহায্যে তাহাতে কি লিখিতে বসিল। দেখিলে মনে হয় পার্ব্বতী সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছে। মুখের ভাব সাহিত্যিকের মতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তদুপরি চোখে জল।

—কাঁদছিস ভাই?

পার্ব্বতী চমকিয়া চাহিয়া দেখে লছমী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। পার্ব্বতীর পিঠে তখনও ব্যথা করিতেছিল, সেইখানটায় হাত দিয়া সে বলিল, না ভাই কেঁদে আর কি করব।

লছমী আপন মনেই বলিতে লাগিল, কাঁদিসনে ভাই, এমনি অসহায়ের মত কেঁদে কেঁদেই আমরা পুরুষকে এত প্রশ্রয় দিয়েছি; কিন্তু আর নয়, এইবার একটা কিছু করতে হবে।

পার্ব্বতী সহজভাবেই বলিল, পুরুষও তো আমাদের হাতে কম শাস্তি পাচ্ছে না।

লছমী বলিল, ও তোর ভুল ধারণা। পুরুষ মেয়েদের হাতে শাস্তি পাচ্ছে এ নিশ্চয়ই পুরুষের কথা। তারা আমাদের কথা এখনও শোনেনি, কিন্তু সেই কথাটাই তাদের শোনাতে হবে। তুই কি দেশের কোন সংবাদই রাখিসনে, খবরের কাগজও পড়িসনে?

পার্ব্বতী বলিল, স্টেটস্‌ম্যান একখানা আসে বটে, কিন্তু পড়বার সময় পাইনে, সংসারের কাজ শেষ ক'রে আর কি কিছু করা যায়?

লছমী বলিল, কিন্তু তা হ'লে তো চলবে না। তুই কি আজকাল তবে ডায়েরিও লিখছিস না?

ইহাদের ব্যক্তিগত কথা হঠাৎ সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় পরিণত হইল।

পার্ব্বতী বলিল, মাঝে মাঝে লিখি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে সব ফাঁকি। আমাদের জীবন কি লেখবার মত?

লছমী জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

—কেন, তা কি তুই বুঝিসনে? যে জীবনে এত বৈচিত্র্য তার ছবি আঁকতে কোন নৈপুণ্যের প্রয়োজন নেই, শুধু একটানা বর্ণনা ক'রে গেলেই হ'ল।

—কিন্তু ভজুয়াও তো আমাদের জীবন নিয়েই সাহিত্য রচনা করেছে। সে যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছে, তা তো আমাদের বস্তী-সাহিত্যে অমর হয়ে আছে! বস্তীর দুঃখ, বস্তীর আনন্দ তার বইয়ের পাতায় পাতায়। পড়লে মনে হয় এরা বস্তীর আবহাওয়ায় মানুষ বটে, কিন্তু এরা চিরকালের মানুষ, আর কি সুন্দর সেই মানুষ। পার্ব্বতী—পার্ব্বতী—

—বল না।

—ভজুয়া মহৎ। বলিয়া লছমী চুপ করিল।

পার্ব্বতী তাহার মনের ভাবটি বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাস্য করিল। তারপর লছমীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, চল, ঘরের বাইরে যাই, রামশরণ হয়তো এখুনি এসে পড়বে, সে গেছে আরও মদ খেতে।

দুইজনে বাহির হইয়া একটি ডোবার ধারে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা নাই, দুইজনেই নীরব। পার্ব্বতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, একটা বিড়ি দে।

লছমী আঁচল হইতে বিড়ি ও দেশালাই বাহির করিয়া পার্ব্বতীকে একটা দিল, নিজে একটা ধরাইল। পার্ব্বতী বিড়ি টানিতে টানিতে বলিল, ভাই লছমী, সাহিত্যকে এবারে তার অভিজাত আসন থেকে নামতে হবে। ভজুয়ার সাহিত্য আর চলবে না।

লছমী বলিল, যাঃ, তুই ঠাট্টা করছিস। যা জীবন্ত তা কি কখনও অচল হয়? আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ভজুয়ার সাহিত্য চিরদিন বেঁচে থাকবে।

পার্ব্বতী বলিল, তুই বুঝতে পারছিসনে। আমাদের জীবন নিয়ে সাহিত্য হ'তে পারে, কিন্তু

শুধু সাহিত্যে তো চলবে না! শুধু সাহিত্য কখনও বেঁচে থাকবে না। আমাদের এখন সাহিত্য গড়তে হবে সর্ব্বহারা প্রলেটারিয়েটদের নিয়ে, যারা দুঃখের চরম প্রান্তে আছে প'ড়ে, যাদের কেউ নেই, যারা নিষ্পেষিত, নির্যাতিত, নিরুপায়। সেই সাহিত্যের নাম হবে—প্রগতি সাহিত্য।

লছমী বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল, বলিস কি আমাদের চেয়েও দুঃখী এ সংসারে কেউ আছে?

পার্ব্বতী প্রায় উত্তেজিত ভাবে বলিল, আমাদের দুঃখ! আমাদের দুঃখ কোথায়? এটা তো দুঃখের বিলাসিতা! কাজ করছি, প্রচুর ঘি রুটি খাচ্ছি, মদ খাচ্ছি, মারামারি করছি, আবার সব ভুলে হেসে খেলে সাহিত্য রচনা করছি—এটাকে তুই দুঃখ বলিস? লছমী, তুই জানিসনে এই দুর্দ্দাম জীবনের মিথ্যা আভিজাত্য—এ আমার বুকে পাষাণের মত চেপে ধরেছে। যে ভজুয়া একদিন ছিল আমার স্বপ্ন, আজ তাকেও খুঁজে পাচ্ছি না আমার মনের মধ্যে। লছমী, লছমী, আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব—এই অবস্থা আমি আর সহ্য করতে পারছি না—আমার মন ছুটে যাচ্ছে সেই সর্ব্বহারা প্রলেটারিয়েটদের দিকে।

লছমী পার্ব্বতীকে জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল, পার্ব্বতী, ভাই, বৃথা উত্তেজিত হ'সনে। তুই আমাকে বল্ কারা সেই সর্ব্বহারার দল, যারা তোকে পাগল করেছে, অথচ আমি যাদের চিনি না।

পার্ব্বতী বলিল, দৃষ্টিটা একবার নীচের দিকে নিক্ষেপ কর তা হ'লে দেখতে পাবি—তারা শুধু আছে তাই নয়—তাদের মত সত্য কেউ নেই। তারা মিথ্যার মাটিকে আশ্রয় ক'রে আছে ব'লেই তারা আমার চোখে আজ এতখানি সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। লছমী, তুই শুধু একবার নীচু দিকে দৃষ্টি ফেরা।

লছমী বলিল, পার্ব্বতী, তুই নেশা করেছিস।

পার্ব্বতী আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল, লছমী তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। পার্ব্বতী বলিল, লছমী, সুখে আছিস তাই তোর হৃদয় আজ পাষাণ হয়ে গেছে—নইলে এত নিষ্ঠুর তো তুই ছিলি না।

লছমী কোনও কথাই কহিল না।

পার্ব্বতী বলিতে লাগিল, তুই বিদ্রূপ কর, ওতে আর আমাকে আঘাত দিতে পারবিনে। আমার হৃদয়ও পাষাণ হয়ে আসছে।

লছমী বলিল, আমি অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তুই বুঝতে পারছি না, তুই সর্ব্বহারা কাকে বলছিস। তারা কি ভিক্ষুকের দল?

—না।

—তারা কি মুটের দল?

—না।

—তারা কি তবে চাষী?

—না, না, না।

—তবে তারা কে ?

—তারা বাংলা দেশের লেখক। ওদের চেয়ে দুঃখী এ পৃথিবীতে আজ কেউ নেই।

—বলিস কি !

—হ্যাঁ ঠিক বলছি। ওরা আজ সর্ব্বহারা প্রলেটারিয়েট, ওরা না পায় ভাল খেতে, না পারে যা খায় তা হজম করতে। ওরা নিঃস্ব, নির্যাতিত, ওরা শুধু পয়সার ভিখারী তা নয়, ওরা কল্পনার ভিখারী, প্রেমের ভিখারী, ওরা—

লছমী বাধা দিয়া বলিল, এটা তোর একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ? প্রেমের ভিখারী তো সবাই।

পার্ব্বতী বলিল, সে কথা ঠিক, কিন্তু বস্তীর ছেলে প্রেম ভিক্ষা করলে প্রেম পায়, কিন্তু ওরা এমনি হতভাগ্য যে ওদের সমাজে কোন মেয়ে ওদের ভালও বাসতে পারে না।

—বলিস কি !

—হ্যাঁ, আমি তাদের সম্বন্ধে যেটুকু জানি তাতে আমার মনে হয় আমি ঠিকই বলছি। আমাদের লেখার দ্বারা এখন ওদেরই ফুটিয়ে তুলতে হবে, ওদের ব্যথা, ওদের দারিদ্র্য রূপ পাবে আমাদের সাহিত্যে।

—কিন্তু আমরা যে ওদের চিনি না।

—চিনতে হবে।

—একটা নতুন সম্প্রদায়কে চট ক'রে চেনা যাবে, এটা তোর গায়ের জোরের কথা।

হয়তো সম্পূর্ণ চেনা যাবে না, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। আয়, আমরা নতুন দৃষ্টি, নতুন উৎসাহ নিয়ে কাজে নামি, এ আমার বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা, তুই দূরে থাকিসনে। তা ছাড়া ভজুয়াকে আমাদের সঙ্গে চাই।

—কেন চাই ?

উভয়েই পুরুষ কণ্ঠে চমকিয়া চাহিয়া দেখে ভজুয়া স্বয়ং তাহাদের পিছনে।

পার্ব্বতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, চাই প্রগতি সাহিত্য গড়বার জন্য। ভজুয়া, তুই আয় আমাদের সঙ্গে।

—না, ভজুয়া প্রগতি সাহিত্যের মধ্যে নেই, কারণ তার প্রবৃত্তি নেই।—ভজুয়া নিষ্ঠুরের মত কথাটি উচ্চারণ করিয়া হাসিতে লাগিল।

পার্ব্বতী আহত হইয়া বলিল, ভজুয়া তুই ভুল করছিস।

ভজুয়া বলিল, সাহিত্যের গায়ে প্রগতির ছাপ মারা আমার দ্বারা চলবে না। তা ছাড়া প্রগতি সাহিত্যের অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

পার্ব্বতী বলিল, তুই যে সাহিত্য করছিস তাতে গতি নেই, সে কেবল আমাদেরই জীবনচরিত হচ্ছে, আমাদের অর্থাৎ যাদের জীবনটা গতিহীন। সুতরাং তোর সাহিত্যের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

—কাদের জীবনে গতি আছে ?—ভজুয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

পার্ব্বতী বলিল, বাঙালী লেখকের। তারা আজ সর্ব্বহারা, তারা আজ ঘোর নৈরাশ্যবাদী,

তাদের মধ্যে আশার বাণী প্রচার করতে হবে। তারা মূক—তাদের লেখার বিরাম নেই, কিন্তু সে লেখার মধ্যে কোন অর্থ নেই। সুতরাং তাদের মাটিতে আমাদের নেমে আসতে হবে—আমাদের আভিজাত্য ভুলে তাদের কম্‌রেড ব'লে কাছে টানতে হবে। তারা যেদিন দেখবে আমরা তাদের ছোট ব'লে আর ঘৃণা করি না, সেইদিন তাদের জীবন আর আমাদের সাহিত্য হবে সার্থক। ভজুয়া, ভেবে দেখ, আমি ঠিক কথাই বলছি।

ভজুয়া খৈনি টিপিতে টিপিতে বলিল, লছমী, তুইও কি তাই চাস? তুই কি চাস আমার সবগুলো চরিত্র মানুষ না হয়ে হোক সর্ব্বহারা বাঙালী লেখক? সত্যিই কি তুই তা চাস?

—না, আমি তা চাই না।

—তবে কি চাস?

লছমী বিহ্বল দৃষ্টিতে ভজুয়ার চোখের দিকে চাহিল। ভজুয়া সে দৃষ্টি বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না, সে লছমীর হাত ধরিয়া সেখান হইতে নীরবে চলিয়া গেল। পার্ব্বতী একা ডোবার ধারে পড়িয়া রহিল।

—সামনেসে হঠ যাও—সামনেসে হঠ যাও—বলিতে বলিতে রামশরণ সেই পথে ফিরিতেছিল, তাহার পা টলিতেছিল। পার্ব্বতী তাহাকে দেখিয়া বলিল, তোর সঙ্গে আমি আর থাকব না—আমি চললাম।

রামশরণ জড়িতস্বরে কহিল, বহুৎ আচ্ছা।—বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহের দিকে চলিল।

পার্ব্বতী স্থির করিল, সে একাই নব সাহিত্যের পাণ্ডা হইবে। রামশরণের সঙ্গে স্ত্রীহিসাবে তাহার একটা চুক্তি ছিল। সে রামশরণকে বিবাহের সময় বলিয়াছিল, আমরা এক সঙ্গে ঘর করব বটে, কিন্তু সাহিত্য সাধনার জন্যে যখনই দরকার হবে তখনই তোকে ছেড়ে যাব।

রামশরণ তাহাতে রাজি হইয়াছিল। কারণ সাহিত্য-সেবিকার পতিরূপে সে এটুকু বুঝিয়াছিল যে, সাহিত্যের টান পড়িলে সে পার্ব্বতীকে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

এইবার পার্ব্বতী কৃষ্ণকুমারীর শরণাপন্ন হইল। তাহাদের বস্তীর মধ্যে এই তরুণীটি ছিল তাহার ভক্ত এবং বন্ধু। পার্ব্বতী ইহারই সাহায্যে সর্ব্বহারা বাঙালী লেখকদের চরিত্র অধ্যয়নে রত হইল। তাহারা দুইজনে বস্তী হইতে শহরের এক হোটেলে আসিয়া উঠিল। হোটেল হইতে তাহারা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিয়া বাহির হইয়া যায় এবং সমস্ত দিন বাঙালী লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া রাত্রে ফিরিয়া আসে। বাঙালী লেখকের গল্প পড়িয়া তাহাদের প্রথমত মনে হইয়াছিল, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি বৃহৎ হইবে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দুই এক দিনের মধ্যেই তাহাদের সে ভুল ধারণা দূর হইল। প্রথমে তাহাদের ধারণা হইয়াছিল বালীগঞ্জের মেয়েরাও সর্ব্বহারার দলে। কিন্তু কয়েকদিনের অনুসন্ধানের পরেই বুঝিতে পারিল, বালীগঞ্জের মেয়ে নামক কোন বিশেষ জাতীয় মেয়ে কলিকাতায় বা কালীঘাটে বা বালীগঞ্জে নাই—ইহারা সর্ব্বহারা বাঙালী লেখকদের ক্ষুধার্ত্ত কল্পনার সৃষ্টি। এই আবিষ্কারের পর ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইল এবং সেজন্য তাহাদের কাজও সহজ হইয়া আসিল।

কৃষ্ণকুমারী তো ইতিমধ্যেই উৎসাহভরে সর্ব্বহারাদের হইয়া এক গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। একদিন পার্ব্বতী বলিল, তোর গল্পটা শোনা।

কৃষ্ণকুমারী গল্পটি কিছুদূর পড়িতেই পার্ব্বতী বলিল, থাম থাম, আর পড়তে হবে না, গল্প লেখার সময় এখনও আসেনি।

কৃষ্ণকুমারী হতাশভাবে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল।

পার্ব্বতী বলিল, তুই যে লিখেছিস—সুধীন রায় এম-এ পাস, গল্প লেখে, বেকার, ছ'বেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না। অথচ তার পরেই লিখছিস—সন্ধ্যাবেলা সে তার আড্ডায় ব'সে ঢোলক বাজিয়ে ভজন গান করছে আর তাড়ি খাচ্ছে; এ তুই করেছিস কি? সর্ব্বহারাদের কথা লিখতে গিয়ে তুই তাদের একেবারে আমাদের বস্তীর আবহাওয়ায় টেনে এনেছিস! ঐখানেই তো তোর হার হ'ল। প্রগতি সাহিত্য মনে করলেই লেখা যায় না রে, এর জন্যে অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

কৃষ্ণকুমারী লজ্জিত হইয়া বলিল, তা হ'লে আর এখন লিখব না।

পার্ব্বতী বলিল, সেই ভাল। তা ছাড়া আমরা এদের মধ্যে এদের সঙ্গে মিশে একটু ফূর্ত্তি করতে এসেছি, প্রথম প্রথম এর বেশি আর কিছু হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমরা সর্ব্বহারাদের মধ্যে মেশবার একটা ট্র্যাডিশন গ'ড়ে তুলব। প্রথমেই ঘনিষ্ঠভাবে মেশায় বিপদ আছে। আর, আর যদি এই উপলক্ষে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আসে মন্দ কি?—ধর যদি মনের মত পাওয়াই যায়—

কৃষ্ণকুমারী নির্ব্বোধের মত জিজ্ঞাসা করিল, কি পাওয়া যায়?

পার্ব্বতী হাসিয়া বলিল, এও বুঝলি না?

কৃষ্ণকুমারী বুঝিতে পারিল।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। পার্ব্বতী পরেশ নামক এক সর্ব্বহারা যুবকের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে। স্থান—হোটেল, কাল—সন্ধ্যা। কৃষ্ণকুমারী তখনও ফেরে নাই।

পরেশ। আমাকে নিয়ে যাও তোমাদের মধ্যে।

পার্ব্বতী। সে হয় না পরেশ। তুমি যে শিক্ষা পেয়েছ, যে সাহিত্য সৃষ্টি করছ, তা আমাদের সমাজে মেশবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে সংস্কৃতি আমাদের, তার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, আমাদের কাছে তোমরা অস্পৃশ্য। সেই জন্যে তোমরা যাতে নিজেরা নিজেদের চিনতে পার আমরা সেই চেষ্টাই করছি। আমরা এসেছি তোমাদের মধ্যে আত্মবোধ জাগাতে, আর সেই সঙ্গে তোমাদের দুর্দ্দশার কথা আমাদের মধ্যে প্রচার করতে।

পরেশ। কিন্তু তুমি কেন এমন ক'রে আমাকে লোভ দেখালে? কেন বললে আমাকে ভালবাস? কেন আমাকে পথে বের করলে? করলেই যদি, তবে কেনই বা পায়ে ঠেলছ? পার্ব্বতী, নিষ্ঠুর, তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

পার্ব্বতী। আচ্ছা, তোমাকে গোটাকত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। তুমি মারামারি করতে পার?

পরেশ। না।

পার্ব্বতী। তুমি রুটি খেয়ে হজম করতে পার?

পরেশ। না।

পার্ব্বতী। মদ খেতে পার?

পরেশ। সামান্য পারি।

পার্ব্বতী। আমি দুঃখিত পরেশ, তুমি আমাদের সমাজে অচল।

পরেশ। কিন্তু কোন রকমে চালিয়ে নাও, আমি যে সব দিকে নিরুপায় পার্ব্বতী।

—তা হয় না।—বলিয়া পার্ব্বতী উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া ঘড়ি দেখিল এবং বাহির হইয়া গেল। পরেশ তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল।

পথে আসিয়া পার্ব্বতী দেখে পরেশ তাহার পিছনে।

পার্ব্বতী বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, তুমি আবার আমার সঙ্গে আসছ, তোমার লজ্জা নেই?

পরেশ কহিল, আমরা যে সর্ব্বহারা।

পার্ব্বতী কহিল, সে তো জানি। কিন্তু আপাতত আমি সিনেমায় যাচ্ছি, এখন আর বিরক্ত ক'র না।—বলিয়াই পার্ব্বতী দ্রুত গিয়া সিনেমায় প্রবেশ করিল।

সিনেমা দেখা শেষ করিয়া পার্ব্বতী যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে। হঠাৎ 'পার্ব্বতী' আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া দেখে পরেশ গেটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

পার্ব্বতী বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি আবার এসেছ?

পরেশ বলিল, আবার আসিনি, আমি এইখানেই বসেছিলাম।

উভয়ে পথে চলিল।

পরেশ বলিতে লাগিল, হায় নিষ্ঠুর, এখনও দয়া হ'ল না? বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছোটলোক ব'লেই কি আমরা এত অবহেলার পাত্র? আমাদের কি সুখ দুঃখ নেই?

পার্ব্বতী চলিতে চলিতে কহিল, না তোমাদের কিছুই নেই। দুঃখও নেই, সুখও নেই, তোমরা যে সর্ব্বহারা! তোমরা যে মেরুদণ্ডহীন মজুরের জাত! আমার কাছে যে জীবনের পরিচয় পেলে সে জীবনের তুলনায় তোমরা যে মৃত। ধীরে ধীরে তোমাদের এই মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে।...

পরেশ আগ্রহের সঙ্গে বলিল, তাই কর, তাই কর পার্ব্বতী, আমাকে বাঁচাও।

পার্ব্বতী বলিল, লিখব না ব'লে দু চারটে স্ট্রাইক কর, কিছুকাল সম্পাদকদের দুয়ারে সত্যাগ্রহ কর, জেলে যাও, তারপর ধীরে ধীরে তোমাদের মধ্যে আত্মবোধ জাগ্রত হবে, আমরা তোমাদের পিছনে আছি।

পরেশ বলিল, পিছনে নয় পার্ব্বতী, একেবারে সামনে এস, নইলে আমাদের প্রেরণা আসবে কোত্থেকে?

পার্ব্বতী ও পরেশ হোটেলে আসিয়া পৌঁছিল।

ঠিক সেই সময় কৃষ্ণকুমারী আর এক বাঙালী যুবকের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে এবং টলিতে টলিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। বাঙালী যুবকের নাম সুধীন রায়। তাহার কঙ্কালের মত চেহারা দেখিয়া পার্ব্বতী চমকিয়া উঠিল। কৃষ্ণকুমারীর পশ্চাতে সে যেন এক মৃত্যুর ছায়া!

পার্ব্বতী পরেশকে কহিল, তুমি এখন যাও।

পরেশ করুণ দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণকুমারী পার্ব্বতীকে কহিল, মনের মত পেয়েছি ভাই, আমি এঁকে বিয়ে করেছি। এ একজন সর্ব্বহারা লেখক।

পার্ব্বতী বিরক্তভাবে কহিল, তুই মরেছিস। তা হ'লে তো আর তোর ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তোদের মত কাঁচা লোককে নিয়ে বিপদ তো ঐখানেই। একেবারে বিয়ে ক'রে বসলি?

—কি করব ভাই, জীবনের সঙ্গে পরিচয় করতে হ'লে—

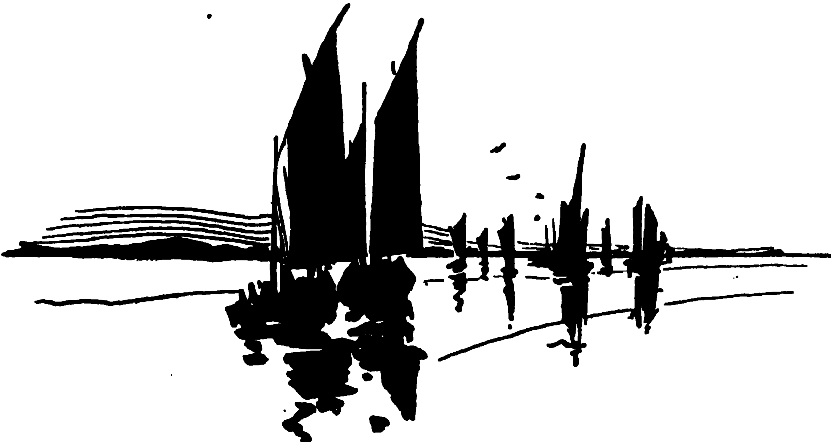
পার্ব্বতী কথাটা পূরণ করিয়া বলিল, জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া দরকার? বেশ, তোরা স'রে যা, আমি একাই রইলুম সাহিত্য নিয়ে। প্রগতি সাহিত্যের ভার পড়ল আমার একার উপর। আমার রামশরণ গেল, ভজুয়া গেল, শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বহারা পরেশ ছোঁড়াটাকেও তাড়িয়ে দিলাম!

কৃষ্ণকুমারী প্রশ্ন করিল, তাকে আর ডাকা যায় না?

—আমি যাইনি পার্ব্বতী, দরজার বাইরে ব'সে আছি।

পরেশের কণ্ঠ!

পার্ব্বতী ছুটিয়া বাহিরে গেল। কৃষ্ণকুমারীও কৌতুক অনুভব করিয়া পার্ব্বতীকে অনুসরণ করিল। পার্ব্বতীর দুর্দ্দশায় খুশি হইয়া কঙ্কাল শূন্য ঘরে একা হাসিতে লাগিল।



সরগুযশ্‌ত্‌-ই-উযীর-ই-খান-ই-লঙ্কুরান

(লঙ্কুরান শহরের খানের উযীরের কীর্ত্তি)

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল

প্রথম অঙ্ক

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী লঙ্কুরান নামক শহরে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিরযা হবীবের বাসস্থান। তিনি অন্দরমহলের মিরযা হবীবের নিকটবর্ত্তী এক কোটায় ব'সে আছেন এবং হাজী স্বালিহ্‌ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

উযীর। হাজীস্বালিহ্‌, শুনলাম তুমি রশ্‌ত যাচ্ছ, এ কি সত্যি ?

হাজীস্বালিহ্‌। হাঁ, হুজুর, আমি যাচ্ছি।

উযীর। হাজীস্বালিহ্‌, আমি তোমার উপর একটা কাজের ভার দেব। এবং আমার ধারণা যে তুমি আমার কাজটি সম্পন্ন করবে। এ জন্যই আমি তোমাকে ডেকেছি।

হাজী। আদেশ করুন হুজুর, হুজুরের আদেশ সম্পন্ন করতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত।

উযীর। হাজীস্বালিহ্‌, আজ পর্য্যন্ত লঙ্কুরানে দেখা যায় নি, এমন একটি পাতলা জরীর কাজ করা জ্যাকেট রশ্‌ত হ'তে প্রস্তুত করাবে। জ্যাকেট প্রস্তুত হ'লে মুরগীর ডিম থেকে ছোট কিন্তু পায়রার ডিম হ'তে বড়, ২৪টি সোনার বোতাম স্বর্ণকারের কাছ থেকে গড়িয়ে জ্যাকেটের গলাবন্ধনীর চারদিকে সেলাই করাতে দেবে। এবং ফিরবার পথে জ্যাকেটটি নিয়ে আসবে। এই ৫০টি সোনার টুকরা। (কাগজে মোড়া সোনার টুকরাগুলি তার সামনে রাখলেন) খরচ খরাব। যদি এতে না হয়, ফিরে এলে পূরণ ক'রে দেওয়া যাবে। শীগগিরই ফিরবে তো ?

হাজী। এক মাসের মধ্যে ফিরব। বিশেষ কোন কাজ নেই। নগদ টাকা নিয়ে যাচ্ছি। সিল্কের কাপড় কিনে নিয়ে আসব। কিন্তু হুজুর, যদি আমি জ্যাকেটের মাপটা জানতে পারতাম, তা হ'লে বিশেষ ভাল হ'ত। কারণ সেখানে প্রস্তুত হ'লে হয়তো তা বেশি আঁট অথবা ঢিলে, কিম্বা লম্বা বা খাটো হতে পারে। তা হ'লে হুজুরের নিকট আমি দোষী বলে গণ্য হব।

উযীর। কোন অন্যায়ই হবে না। কিছু লম্বা ও ঢিলে করাবে। যদি ঠিক মত না হয়, তা হ'লে এখানে ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে।

পরিচয়

মীরযাহবীব—লঙ্কুরান শহরের খানের উযীর।
হয়দর—উযীরের আরদালী বা পিয়ন।
করীম—উযীরের কচোয়ান।
আকা বশীর—উযীরের নাযির।
যীবা খানম্‌—উযীরের বড় স্ত্রী।
গুল্‌জুয়ানর্‌—উযীরের ছোট ও প্রিয় স্ত্রী ও নিসাখানামের বড় বোন।
নিসাখানম—উযীরের শালী ও তয়মুর আকার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী।
পরীখানম—উযীরের ছোট স্ত্রীর মা, মেয়ে নিসাখানমকে নিয়ে উযীরের বাড়িতে থাকেন।
আকা মসউদ্‌—উযীরের খাজহ্‌।
খান—লঙ্কুরানের শাসনকর্ত্তা।
অযীয আকা—খানের বেয়ারা।
সলীম বেগ—রাজসভার নাযির
কদীর বেগ—রাজসভার নাযির
স্বমদ বেগ—চাকরদের সর্দ্দার।
তয়মুর আকা—খানের বড় ভাইয়ের ছেলে।
রিদ্বা—তয়মুর আকার শিওভাই।
হাজী স্বালিহ্‌—একজন ব্যবসায়ী।
হকীম্‌—লঙ্কুরাণের বাসিন্দা।
চাকর, আসামী, ফরিয়াদি ইত্যাদি।

হাজী। জ্যাকেটের কাপড় কিনে ও সোনার বোতাম তৈরি ক'রে এখানে নিয়ে এলে হয় না কি? যিনি পরবেন, তার আন্দাজ মত ক'রে নিলেই হবে।

উযীর। (বিরক্তির সহিত) হে খুদার বান্দা, তোমার যে দেখছি বড় আশ্চর্য্য স্বভাব, বেশি কথা ব'লে নিজের বুদ্ধির বাহাদুরী দেখাতে চাও। তোমার মতলবটা কি? তুমি কি চাও যে আমার গোপন ইচ্ছাটা আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার নিকট প্রকাশ ক'রে দি। তুমি এর কি জানবে, আমি যদি এখানে কাপড় এনে তৈরি করাই, তা হ'লে কত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে এবং আমাকে কত অশান্তি ভোগ করতে হবে?

হাজী। আচ্ছা হুজুর, আমি এর কি জানি?

উযীর। তা হ'লে তুমি কি বল যে, আমার মতলবটি তোমার নিকট প্রকাশ করি ও তুমি বাজারের যেখানে যাবে ও যার সঙ্গে দেখা হবে, বলবে যে উযীর আমাকে এই কাজের ভার দিয়েছেন। এ কারো কাছে বলবে না ব'লে আশ্বাস দিলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। বন্ধু, আমার মতলবটি এই যে, দুই মাস পরে নববর্ষ এবং আমার ইচ্ছা নববর্ষের দিনে গুলহখানমকে একটি সুন্দর জিনিস উপহার দিই। যদি এখানে তৈরি করাতে দিই, তা হ'লে যীবাখানমও এরূপ একটি জিনিস চাইবে এতে কেবল খরচান্ত হওয়া। জীবাখানমের এখন এসব মানায় না। অধিকন্তু কথা কাটাকাটিতে রেহাই পাব না এবং সারাক্ষণ অশান্তি ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পেতে হবে।

হাজী। হুজুর, যখন আপনি তৈরি জ্যাকেটটি গুলহখানমকে দেবেন তখন যীবাখানমও ঐটির মত আর একটি চাইবেন না কি?

উযীর। হা আল্লা, তুমি যে আমাকে একেবারে অবাক করলে। হে অধম, এতে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? তোমাকে যা বলেছি তাই কর। দেবার সময় আমি বলব, রশ্‌ত শহরের বাসিন্দা, আমার বোন হিদায়েত খানের স্ত্রী, এই জ্যাকেটটি গুলহখানমের জন্য উপহার পাঠিয়েছে। তা হ'লে যাবাখানম আর আমাকে কোন উপদ্রব করতে পারবে না। খবরদার, এসব কথা কাকেও বলো না যেন।

হাজী। আচ্ছা হুজুর, আপনার গোপনীয় বিষয় প্রচার ক'রে আমার কি লাভ?

উযীর। খুদা তোমায় দোয়া করুন। এখন তা হ'লে যেতে পার।

(হাজিসালিহ উযীরকে সম্মান দেখিয়ে কোঠা হতে বের হ'ল—তার বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই যীবাখানম জোরে কোঠার দরজা ধাক্কা দিয়ে চীৎকার করতে করতে উযীরের সামনে উপস্থিত হলেন)

যীবাখানম। আদরের বিবির জন্য জ্যাকেট ও সোনার বোতাম যুক্ত গলাবন্ধনীর ফরমাইস দেওয়া হচ্ছে। হা আল্লা, তোমার বাহাদুরীকে ধিক! তুমি কি বলতে চাও, হিদায়েত খানের স্ত্রী, তোমার বোন গুলহখানমের জন্য এই উপহার পাঠিয়েছে? হা আল্লা, তোমার বোনকে কি আবার নূতন ক'রে চেনাবে! তোমার বোন যে ইস্পাহানের কৃপণ সদাগরের মত। বোতলের মধ্যে পনীর রেখে, বোতলের তলায় রুটী লাগিয়ে খায়। বিষয়টা তো এইরূপে সাজিয়েছ যে ৫০।৬০ তুমান (১ তুমান=৭ টাকা) মূল্যের একটি জ্যাকেট তোমার বিবির জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি কি এ রকমই আহাম্মক যে এগুলো বিশ্বাস করব!

উযীর। নীচমনা, তুমি যে আমাকে একেবারে ঘাবড়িয়ে দিলে। কি সব অদ্ভুত কথা বলছ? জ্যাকেট উপহার আবার কি? পাগল হ'লে না কি?

যীবা। বাজে কথা ব'ল না। এখন আর কথা ঘোরাবার দরকার নেই। যে সব কথাবার্ত্তা হাজীস্বালিহের সঙ্গে হয়েছে তার প্রত্যেকটি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি শুনেছি। যে মুহূর্ত্তে তুমি হাজীস্বালিহ্‌কে ডেকে পাঠালে, তখনই আমার খেয়াল হ'ল এবং আস্তে আস্তে একটি দরজার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনতে পেয়েছি। দেখলাম যে যা ভেবেছি, ঠিক তাই। খুদাকে ধন্যবাদ, প্রিয় বিবির জন্য সোনার বোতামের জ্যাকেট; কিন্তু তাতে তো তয়মূর আকার আশাই পূর্ণ হবে। প্রকৃত পক্ষে তার প্রিয়ার জন্যই এ নূতন জ্যাকেটের ফরমাইস যাচ্ছে। তয়মুর আকার সামনে পরলে বেশ মানাবে।

উযীর। হতভাগী, এ সব কি বাজে বকিস? কতকক্ষণ

আর এ সব বাজে কথা চলবে ? আর অশান্তি টেনে এনো না। তোমার কি লজ্জা সরম ব'লে কিছুই নেই ? আমার সামনে আমার স্ত্রীর ওপর দোষারোপ করছিস ! আমার ইজ্জতের হানি করছিস ! দুনিয়ায় লজ্জা ব'লে কি কোন জিনিস নেই ? কি আফশোষের কথা।

যীবা। আমিও যদি এই অমায়িক সুন্দর যুবা পুরুষটির সঙ্গে মাখামাখি ক'রে তোমার সম্মানের হানি করতাম, তা হ'লে কেমন হ'ত ? কিন্তু তোমার আদরের বিবি যে তয়মুর আকার সঙ্গে সব সময় গলাগলি ক'রেই আছে এবং এবারে ইজ্জত বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার দাসী কবারই তো নিজের চোখে দেখেছে।

উযীর। তোমার ও দাসীর কথায় আমি বিশ্বাস করি নে।

যীবা। আমিই তো কেবল একা বলি নে। লঙ্কুরান-বাসী সব্বাই এ জানে ও বলাবলি করছে। তুমিই কেবল তোমার চোখ খেয়ে ব'সে আছ। তুমি দেখছি বাজপাখীর মত নিজের মাথা বরফের নীচে রেখে অর্থাৎ তোমার ভালমন্দর কোন চিন্তা ক'রে মনে করছ, আর কেউই তোমার বিষয়ে কিছু মনে করছে না।

উযীর। এ সব কি বলছ ? গুলহ তয়মুর আকাকে জানে ? সে তাকে কোথায় দেখেছে ?

যীবা। তুমি যে নিজেই তাকে দেখিয়েছ ?

উযীর। (উচ্চস্বরে) আমি তাকে দেখিয়েছি ?

যীবা। হাঁ, তুমিই দেখিয়েছ। তবে কি আমি দেখিয়েছি ? হাঁ, তুমি তোমার আদরের বিবির কাছে ঈদ উৎসবের দিন এসে বলেছিল, 'খান দুর্গের বাইরে সমস্ত নাম-করা কুস্তীগীরদের একত্র করেছেন। দুর্গের প্রাচীরের পাশে রাস্তায় ফরাস বিছানো হয়েছে, নিসাখানম ও তুমি সেখানে ব'সে তামাসা দেখতে পারবে।' তারা ঐ দিন হেঁটে সেখানে যায়। সেখানে পঁচিশ বছরের সুপুরুষ ও শক্তিমান তয়মুর আকা সমস্ত কুস্তীগীরদের পরাজিত করেন। গুলহখানম মনে প্রাণে তার প্রেমের বন্ধনে আটকে গিয়েছে, অন্যে এর কি জানবে এবং কি প্রকারেই বা এমন অবস্থা হ'ল তার কি বুঝবে ? যদি সে এক দিন তাকে না দেখে, তা হ'লে মনে শান্তি পায় না। তোমাকে পূর্ব্বে বলি নি যে, এই বুড়ো বয়সে এই পূর্ণ যৌবনাকে বিয়ে করা তোমার সাজে না ? আমার কথায় কান দাও নি। এখন এর শাস্তি ভোগ কর।

উযীর। ভালই হয়েছে। কিন্তু তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। আমায় এখন অবসর দাও বিশেষ কাজ আছে।

যীবা। (বিরক্তির সহিত বকতে বকতে চ'লে যেতে লাগলেন) আমি কেন লজ্জিত হব ? তোমার আদরের প্রিয়া ও তার ওই প্রিয়তম লজ্জিত হোক। তোমার জন্য এ বেশ ভালই হয়েছে।

উযীর। (একাকী) আমি বুঝতে পারি না যে গুলহ্‌খানম এমন কার্য্যে অগ্রসর হয়েছে। খুব সম্ভব সে তয়মুর আকার জোর ও শক্তি দেখে বেশ আনন্দিত হয়েছে ও নির্ব্বুদ্ধিতা বশত অবিবেচনার সঙ্গে সকলের নিকট তয়মুর আকার প্রশংসা করেছে। ঐ দুষ্টা যীবাখানম হিংসা ক'রে ঐ কথাগুলিকে প্রেমাসক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রে নিয়েছে ও আমাকে তার প্রতি অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করাতে চায়। যা হোক গুলহখানমের এই ধারণা থেকে তাকে সরিয়ে আনব। এবং সে বুঝতে পারবে ঐদিন যাদের সে পরাজিত করেছিল, তারা ছিল একেবারে ছেলেমানুষ। এরূপেই হয়তো তার মন থেকে তয়মুরের প্রশংসা দূর হয়ে যাবে এবং অন্যের নিকট আর তার প্রশংসা করবে না। আচ্ছা, উঠি এখন, প্রথম যাব খানের কাছে এবং ফিরবার পথে তার ঘরে যাব। দেখব, এর কি করা যায় ! (বের হবার জন্য উঠলেন।)

যীবাখানম। (ঘরে ঢুকে) আজ দুপুর ও রাতের খাবারের জন্য যা ইচ্ছে হয় তা ব'লে দাও, সেই মতে পাক করবে।

উযীর। সাপের বিষের ন্যায় যে নরকের যক্কুম গাছ, তাই তো আমাকে খাইয়ে দিয়েছ, তাতে আর এখন এক মাস অন্তত খাবার দরকার হবে না। এখন আবার কি খাব ! (যাবার জন্য উঠেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি ছিল দরজার দিকে, ঘরের মধ্যে যে একটা চালনী পড়ে ছিল, তা দেখেন নি, চালনীর ঘেরা অংশের এক কোণে তাঁর পা লাগে, তা উল্টে

গিয়ে তাঁর হাঁটুতে লাগে। হাঁটু ধ'রে তিনি ব'সে পড়েন ও মুখ বিকৃত করে চীৎকার আরম্ভ করেন) আঃহাঃ দুষ্টের দল, চালনী আবার এখানে কি করতে এল? তোদের বাপ জহান্নমের আগুনে পুড়ে মরুক।

যীবা। (আশ্চর্য্য হয়ে) আমি এর কি জানি? চালনী এখানে কি ক'রে এল, তার আমি কি বলব? যখনই তুমি এখানে আস, আমাদের জন্য কেবল ঝগড়াঝাটি নিয়ে আস। আর অন্যে পরে জ্যাকেট, আমরা আছি কেবল তিরস্কার শোনবার জন্যেই।

উযীর। পিয়ন!

(হয়দর পিয়ন দেউড়ির নিকট থেকে ঘরে এসে করযোড়ে মাথা নুইয়ে উযীরকে সম্মান দেখাল। যীবাখানম ঘোমটা টেনে ঘরের এক কোণে স'রে দাঁড়ালেন।)

(রাগান্বিত হয়ে) এই চালনীর ঘরের মধ্যে কি কাজ?

হয়দর। হুজুর, খুব সকালে আমি এ ঘর ঝাঁট দি। করীম সঈস চালনী হাতে ক'রে এখানে আসে এবং অনেকক্ষণ কথা বলে, তারপর চ'লে যায়। আমার মনে হয় সেই এটা এখানে ফেলে গিয়েছে।

উযীর। পাজি সাঈসকে ডাক দে। তারপর দেখা যাবে।

(হয়দর সঈসের অনুসন্ধানে গেল।)

হায় খুদা, সঈসের আমার ঘরে কি কাজ? এবং চালনীরই বা এই ঘরের মধ্যে কি দরকার? আজ সকল দিক দিয়েই দেখি, আমার জন্য বিরক্তি ও দুঃখ অপেক্ষা করছে। যখনই আমি এ পাপ ঘরে আসি, দুঃখ না নিয়ে ফিরতে পারি না।

যীবা। ঠিকই তো, শুলহ্‌খানম যে এখানে নেই। এখন এরকম যখন হয়েছে, এখানে আর কেন আসবে? সব সময় শুলহ্‌খানমের ঘরেই যেও।

(পিয়ন ও সঈস ঘরে ঢুকল)

উযীর। (রাগান্বিত হয়ে) পাজি করীম, তোর আমার ঘরে কি কাজ? তোর যায়গা হ'ল আস্তাবলে। তুই কি সাহস ক'রে আমার ঘরে ঢুকলি?

সঈস। হুজুর, আপনি আজ বেড়াতে যাবেন কিনা তা হায়দারের নিকট জানতে মুহূর্ত্তের জন্য এখানে আসি। জেনেই তো তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাই।

উযার। তা হলে তুই চালনীটা এখানে রেখে গেলি কেন?

সঈস। চালনী আমার হাতে ছিল, ঘোড়াকে খাওয়াবার জন্য ছোলা চালছিলাম। আমি নিতে ভুলে যাই, সেজন্যই এখানে র'য়ে গিয়েছে।

উযীর। তা হ'লে নিয়ে যাবার জন্য ফিরে এলি না কেন?

সঈস। আমার একেবারেই মনে ছিল না যে, এটা এখানে র'য়ে গিয়েছে তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত আমি চালনীই খুঁজছি।

উযীর। হরামযাদ্‌হ্‌, তোর মন কোথায় ছিল? নাযির আক্কাবশীরকে ডাক্‌, এখনই যেন সে এখানে আসে। কাষ্ঠদণ্ডটিও তুই নিয়ে আসবি; আর বাবরের তিনটি চাকরকে এখানে আসতে বলবি।

(পিয়ন বাইরে গেল)

সঈস। (কাঁদতে কাঁদতে, কাঁপতে কাঁপতে) দোয়াই হুজুর, আমাকে এবার মাপ করুন।

উযীর। (রেগে) চুপ কর কুকুরের বাচ্চা।

সঈস। (কাঁদতে কাঁদতে) আমি তো আপনার কোরবান। আমার ভুল হয়েছে। আমি মাটি খেয়েছি। আপনার বাবার কবরের দোয়াই, এবার আমাকে মাপ করুন। মা বাবার শপথ ক'রে বলছি, আমার ভুল হয়েছে। আর আমি এখানে পা ফেলব না।

উযীর। চুপ কর গাধার বাচ্চা।

(এই সময় নাযির আক্কা বসীর ও হয়দার কাষ্ঠখণ্ড ও কতকগুলি বেত্র বগলে ক'রে এবং তিন জন লোককে সঙ্গে ক'রে নিয়ে হাজির হল তারা সকলেই মাথা অবনত ক'রে উযীরকে সম্মান দেখাল।)

(চাকরদের) নাযিরকে কাষ্ঠদণ্ডে দাঁড় করিয়া বাঁধ।

(চাকররা নাযিরককে দাঁড় করিয়ে পা বাঁধল।)

উ। বেত মারতে আরম্ভ কর। (চাকররা মারতে আরম্ভ করল।)

নাযির। হুজুর, আমি আপনার হুকুমের দাস, কিন্তু আমার কি ত্রুটি হয়েছে যে, ওরা আমাকে মারছে?

উযীর। (চালনী দেখিয়ে) এ চালনীর ঘরের মধ্যে কি দরকার?

নাযির। চালনীর কথা কি বলছেন?

উযীর। বেতের ঘা খেলেই বুঝতে পারবে কি চালনী ?

(চাকরদের বেত্রাঘাত চলতে লাগল)

নাযির। ধর্ম্মাবতার, আমি আপনার হুজুরের দাস, কিন্তু হুজুর, আমার দোষ কি ? আমি আপনার কোরবান। আমার ত্রুটিটা অনুগ্রহ ক'রে বলুন, তারপর, যত ইচ্ছা আমাকে মারুন।

উযীর। (চাকরদের প্রতি) থাম। আক্কা বশীর, তোমার ত্রুটি হ'ল এই, এই বাড়ির চাকররা তাদের কর্ত্তব্য করে নি, এদের সবাই তোমার কথামতই কাজ করবে। আর তোমারও কর্ত্তব্য হ'ল এদের প্রত্যেকের কোথায় কি কাজ তা দেখিয়ে দেওয়া, আর ঐ সব অবস্থার খেয়াল ও চিন্তা করা। সঈসের কাজ হ'ল আস্তাবলে, সে আস্তাবল ছাড়া কোথাও পা ফেলবে না। এ কখনই উচিত নয় যে, চালনী ঘরের মধ্যে প'ড়ে থাকবে। আজ করীম সঈস চালনী হাতে নিয়ে আমার ঘরে আসে ও এটা এখানে রেখেই চ'লে যায়। ঘটনাক্রমে চালনীর ঘেরা অংশের মধ্যে আমার পা লেগে যায় এবং তা উল্টে গিয়ে আমার হাঁটুতে এমনি লেগেছে যে, এর ব্যথায় আমি আর পা ফেলতে পারছি না। আমি এত বড় রাজ্যের মন্ত্রিত্ব করছি ও সমস্ত সুচারুরূপে চালাচ্ছি। আর তুমি একটা বাড়ির চাকরদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পার না ?

নাযির। হাঁ হুজুর, খুদা আপনার বুদ্ধি ও দক্ষতা বেশি ক'রে দিয়েছেন। আমি কেমন করে আপনার সামিল হব ?

উযীর। (চাকরদের) বেত লাগাও।

নাযির। হুজুর, এবার আমার ত্রুটি ক্ষমা করুন। আর এমন হবে না।

উযীর। যথেষ্ট হয়েছে, সর্ত্ত যখন করল, ওর বাধন খুলে দে। আক্কা বশীর, এবার তোমাকে মাপ করলাম। এর পর আবার যদি চালনী আমার ঘরে দেখা যায় তা হ'লে জেনো তোমায় খুন করা হবে।

নাযির। (দাঁড়িয়ে) হাঁ হুজুর, ঠিক বুঝে নিয়েছি।

উযীর। আচ্ছা, তোমরা যাও।

সঈস। (আস্তে) খোদা, তোমার শুকুর ধন্যবাদ।

(সকলের আগে সঈস চালনী তুলে রওনা হ'ল, তার পেছনে সব্বাই প্রস্থান করল।)

(পর্দ্দা পড়ল)

ক্রমশ





[চলন্তিকা প্রতি মাসে বাহির হইবে। লেখকের বক্তব্য প্রতি মাসেই সম্পূর্ণ হইবে, অর্থাৎ "ক্রমশ" প্রকাশ্য হইবে না। লেখক কি বলিবেন তাহার স্থিরতা নাই—অনেক সময় নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিবেন, অনেক সময় কথার কোনো অর্থ থাকিবে না, কিন্তু পড়িয়া হঠাৎ মনে হইবে যেন অর্থ আছে। চিন্তার কোনো পরিচয় থাকিবে না, অথচ মনে হইবে চিন্তা করিয়া লেখা। কখনও দিবসকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিবস করিবার চেষ্টা থাকিবে, লেখার কোনো অবিরাম ধারা থাকিবে না। এক কথা হইতে আর এক কথায় চলিয়া গেলেও পাঠকের কোনো ক্ষতি হইবে না, না গেলেও হইবে না। যাঁহারা অতিরিক্ত কর্ম্মব্যস্ত কিংবা যাঁহাদের আদৌ কোনো কর্ম্মব্যস্ততা নাই চলন্তিকা তাঁহাদের জন্যই লেখা।—ইতি, চলন্তিকার লেখক।]

ইংরেজী অপ্‌টিমিজ্‌ম্ এবং পেসিমিজ্‌ম্ কথা দুইটির পরিব বাংলায় যথাক্রমে আনন্দবাদ ও দুঃখবাদ কথা দুইটি ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই দুইটি বাদেরই আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। আনন্দবাদের রূপান্তরে আশাবাদ, বিশ্বাসবাদ, দুঃসাহসবাদ, বেপরোয়াবাদ প্রভৃতি এবং দুঃখবাদের রূপান্তরে নৈরাশ্যবাদ, সন্দেহবাদ, সাবধানতাবাদ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই দুই প্রকার বাদের মধ্যে বাছাই করিবার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতে দুঃখবাদীর সংখ্যাই প্রায় পনের আনা। তাহার কারণ পৃথিবীতে প্রায় পনের আনা লোকই রক্ষণশীল বা কন্‌জারভেটিভ্। আমরা একজাতীয় লোককে জানি যাঁহারা অযথা প্রাচীনকালের গুণগান করেন। ইঁহারাই দুঃখবাদী বা সন্দেহবাদীর দলে। ইঁহারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে সন্দেহের চোখে দেখেন, কারণ ইঁহারা বর্ত্তমানের সম্পূর্ণ পরিচয় ও ভবিষ্যতের কোন পরিচয় জানেন না। এবং যাহাকে ইঁহারা জানেন না, তাহাকে ইঁহারা দূরে পরিহার করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান। অতীতের নাড়ীনক্ষত্র ইঁহাদের পরিচিত বলিয়া অতীত বিষয়ে ইঁহাদের কোথাও কোন সন্দেহ নাই। সন্দেহবাদীর বাড়িতে চোরও সহজে চুরি করিতে পারে না, কারণ ইঁহারা অপরিচিত ভদ্রলোককেও প্রথমেই চোর বলিয়া ধরিয়া নেন।

*

পৃথিবীতে আসলে দুঃখবাদীই সুখী। দুঃখবাদী হইয়া তাঁহারা সহজেই জীবন হইতে দুঃখটাকে বাদ দিয়া চলিবার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা নৈরাশ্যবাদী, কাহারও নিকট হইতে কিছু আশা করেন না বলিয়া জীবনে কদাচিৎ ঠকেন। দাতার কাছে গিয়া আশাবাদী পাঁচ শত টাকা চাঁদা আদায়ের আশা করিয়া পাঁচ টাকা পাইলে আহত হন; কিন্তু নৈরাশ্যবাদী দাতার নিকট গিয়াও একটি পয়সা আশা করেন না, উপরন্তু নিজের পকেট সাবধান করেন, সুতরাং অক্ষত

পকেটে ফিরিবার আনন্দ হইতে তাঁহাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না। সুতরাং নৈরাশ্যবাদী বা সন্দেহবাদীই যে মোটের উপর বেশি সুখী এ কথায় একমাত্র সন্দেহবাদী ছাড়া আর আর কাহারও সন্দেহ নাই।

*

আমাদের কংগ্রেসপন্থীদের ভিতরে যে দুইটি পক্ষ আছে, দক্ষিণপক্ষ এবং বামপক্ষ, ইঁহাদিগকেও আমরা নৈরাশ্যবাদী এবং আশাবাদী এই দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। দক্ষিণপক্ষ নৈরাশ্যবাদী বা সন্দেহবাদী, বামপক্ষ আশাবাদী বা বেপরোয়াবাদী। নৈরাশ্যবাদীর মতে—একপক্ষ-কংগ্রেস এতদিন ছিল দেশের মাটিতে এখন দক্ষিণ ও বাম পক্ষ বিস্তার করিয়া সে আকাশে উধাও হইল, আবার আশাবাদীর মতে কংগ্রেস এতকাল একপক্ষের দৌর্ব্বল্যে ছিল অচল, এখন দুইপক্ষই সবল হওয়াতে সচল হইয়া উঠিয়াছে। কোন তৃতীয় পক্ষ থাকিলে বলিতে পারিতেন কংগ্রেসের পক্ষ দুইটি বিবাহসম্পর্কিত প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের মতই জটিলতাপূর্ণ, সুতরাং প্রশংসাযোগ্য নহে। অর্থাৎ পক্ষ যতই বাড়িবে পক্ষপাতিত্বও ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং পক্ষগুলি সম্পূর্ণরূপে পাত না হওয়া পর্য্যন্ত এই পক্ষপাত কোন দিনও ঘুচিবে না।

*

কিন্তু মজা এই যে সন্দেহবাদীর দল আসলে নিজেদের পন্থাতেই সন্দেহ করেন। অর্থাৎ সন্দেহবাদী নিজের যুক্তি নিজেই খণ্ডন করিয়া চলেন, এবং সেই চলাটাই তাঁহাদের কাছে অগ্রগমন বলিয়া বোধ হয়, এবং এইখানেই তাঁহাদের সত্যকার পরাজয়। অন্যদিকে আশাবাদী আশাভঙ্গে ক্রমাগত নিরাশ হইতে হইতেও আশা ছাড়েন না, এবং এই আশাই তাঁহাদিগকে চালিত করে। আশাবাদীর পরাজয় এইখানে। গত কলিকাতার কংগ্রেস সভায় যখন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলেন তখন আশাবাদীর আশাভঙ্গ ঘটিবে ইহা নিশ্চিত, কিন্তু ফলে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের নৈরাশ্যবাদী ঘড়িটি ভঙ্গ হওয়াতে প্রমাণ হইল আশা তাঁহারা এখনও ছাড়েন নাই। সেই আশার পরিণাম ফরোয়ার্ড ব্লক। কিন্তু এই নামটিতে আমাদের আপত্তি আছে। কারণ ফরোয়ার্ড ব্লক যে কিরূপ মারাত্মক জিনিস তাহা যাঁহারা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার ফরোয়ার্ড কাগজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁহারাই জানেন। বিহার ভূমিকম্পের সংবাদ চিত্রে সমৃদ্ধ করিবার জন্য ফরোয়ার্ড পুরাতন ব্লক লইয়া যে খেলা খেলিয়াছিলেন তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিবার কথা। তাহার পর হইতে ফরোয়ার্ড ব্লকের উপর আমাদের আস্থা নাই। কিন্তু আস্থা যেখানে নাই, সেইখানে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার কাজ আস্থাবাদীর বা আশাবাদীর।

*

কিন্তু আশাবাদী কাহারা? যাহারা নিঃসম্বল হইয়া পথে বসিয়াছে, যাহাদের ভবিষ্যতের কোন আশা নাই তাহারাই আশাবাদী। যাহাদের পকেট শূন্য, তাহারা শূন্য পকেটে হাত দিয়া আশা করিতে থাকে একদিন সেই শূন্য পকেট পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাহাদের সে আশা সফল হয় না বলিয়াই এবং চিরদিন শূন্য পকেটে হাত দিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকে বলিয়াই তাহারা

আশাবাদী। পূর্ণ পকেটে হাত দিবার অবসর বা সুযোগ তাহাদের যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই হাতে কাঁচি আছে এবং পকেটটা অপরের।

*　　*　　*　　*

সুতরাং পথাশ্রয়ীই আশাবাদী। পথাশ্রয়ী যে আশাবাদী তাহার একটি দৃষ্টান্ত যাহারা পথে বসিয়া লোকের হাত দেখে। ইহারা শুধু যে নিজেরা আশাবাদী তাহা নহে, ইহারা নৈরাশ্যবাদীর মনে আশা জাগাইয়া তোলে। যে আশাবাদী ভবিষ্যতের পরম আশায় লেকে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিল, সে যাইবার পথে একবার গণৎকারের কাছে বসিল। ভাবিল দেখা যাউক না গণৎকার আত্মহত্যার কথা ঠিক বলিতে পারে কি না। গণৎকার বলিল, পনের দিন পরে তাহার ভাগ্য ফিরিবে! লোকটা ছিল আশাবাদী, হঠাৎ ঘোর নৈরাশ্যবাদী হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল, আত্মহত্যা করা আর হইল না। বেপরোয়াবাদীর মনে সন্দেহ জাগিল ঃ হয়তো লেকে ডুবিয়া কিছু লাভ নাই। যে সুখ, যে আনন্দ সে আশাবাদের ভিতর দিয়া পাইবে আশা করিয়াছিল, সন্দেহবাদী হওয়ায় সেই সুখ এবং আনন্দ তাহার ভাগ্যে আর জুটিল না, সে এখন নৈরাশ্যবাদের পরিমিত সুখ ভোগ করিয়া জীবন কাটাইবে।

*

যাহারা আনন্দবাদী তাহাদিগকে আমি বেপরোয়াবাদীর সমশ্রেণীভুক্ত করিয়াছি। বাংলা দেশের যে তরুণ তরুণী জগৎকে আনন্দময় বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তাহারাই ঢাকুরিয়া লেকে গিয়া আত্মহত্যা করে। এই যে অত্যন্ত পরিচিত পৃথিবী, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুজনপরিবেষ্টিত সমাজ, ইহাকে ছাড়িয়া অজানার উদ্দেশ্যে ঝাঁপাইয়া পড়া, ইহা আশাবাদী ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। যে লোকটি সন্দেহবাদী সে ইহজগৎ বা পরজগৎ সকল জগৎ বিষয়েই আস্থাহীন তাই সে আত্মহত্যা করিতে ভয় পায়। সে প্রেমে ব্যর্থ হইয়া হয় কবিতা লেখে, না হয় ব্যাপক প্রেমের সমুদ্রযাত্রা করে, কিন্তু আত্মহত্যা করিতে পারে না। যদি বা করে তবে সে আত্মহত্যার মধ্যে গৌরব বা রব কিছুই থাকে না।

*

কলিকাতার একপ্রান্তে একটি লেক রচনা করিতে হইবে এইরূপ সদিচ্ছা যাঁহার প্রথম হইয়াছিল তাঁহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেমন আলো হাওয়ার জন্য দরজা জানালা প্রয়োজন, শহর তৈরি করিতে হইলে তেমনি তার সঙ্গে একটি লেক রচনা করা প্রয়োজন। দরজা জানালার ভিতর দিয়া গৃহের মানুষ যেমন মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে, লেকের ভিতর দিয়া তেমনি শহরের লোক মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করে। একটি শহরের লোকের রুদ্ধ আবেগ এবং অজানার উদ্দেশ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে একমাত্র লেক। অবশ্য ষোল আনা আশাবাদীই যে একই উপায়ে বৃহত্তর মুক্ত জীবনে পৌঁছাইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। কাহারও উপায় অহিফেন, কাহারও পটাসিয়াম্ সাইয়ানাইড, কাহারও দড়ি। কিন্তু ইহার

একটি উপায়ও লেকের মত উদার, বিস্তীর্ণ এবং সরস নহে। তবে ইহার সাহায্যে মুক্তিকামীর জাতি নির্ণয় সহজ হয়।

*

যাহারা সন্দেহবাদী তাহারা পটাসিয়াম সাইয়ানাইডের গৌরবহীন পথ অবলম্বন করে। কারণ মৃত্যু হইবে কিনা এরূপ সন্দেহ যাহারা করে তাহারা মৃত্যুতে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখিতে চাহে না। সুতরাং মৃত্যুর আনন্দ ইহাদের কম, তবে মৃত্যু নিশ্চিত হইবে এই ধারণাজনিত যে আনন্দ, সে আনন্দ একমাত্র তাহাদেরই।

*

আশাবাদী যে কোন পন্থাকেই বরণ করে। অহিফেন, লেক, দড়ি ইহা তাহার বিশেষ উপায় হইলেও সে মাঝে মাঝে পটাসিয়াম্ সাইয়ানাইডও ব্যবহার করে। কেরোসিনের পথটা নৈরাশ্যবাদী নারীর বিশেষ পথ, এ পথে পুরুষ কখনও পা দিয়াছে কি না জানি না। কেরোসিনের পথ ভারতবর্ষে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন রামায়ণে বর্ণিত সীতা। তিনি প্রথমত ছিলেন আশাবাদী, কিন্তু সন্দেহবাদী সমাজের পাল্লায় পড়িয়া ক্রমে নিজে নৈরাশ্যবাদী হইয়া পড়েন। কিন্তু কেরোসিন পৌরাণিক বলিয়াই হউক কিংবা বহুদিন রাবণের অগ্নিবিকিরণকারী দৃষ্টিতে অভ্যস্ত হইয়া চামড়া ফায়ারপ্রুফ হইয়া যাওয়াতেই হউক—সীতা আগুন হইতে অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসেন। এই বিস্ময়কর ব্যাপারে তিনি পুনরায় ঘোর আশাবাদী হইয়া পড়েন। এবং দ্বিতীয়বার তিনি আশাবাদীর পন্থা অবলম্বন করিয়াই কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন। লোকে প্রচার করে, তিনি ধরিত্রী মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া গিয়াছেন।

*

কলিকাতার প্রান্তে যিনি লেক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তিনি রামায়ণের এই কহিনীটির মূল অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সীতা যে কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, উহাই লেকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আদি রূপ। সীতা সাবিত্রীর দেশে সীতাই যে মেয়েদের অন্যতম আদর্শ হইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

*

আনন্দবাদীর আর একটি রূপ আছে। লোকে সাধারণত সংসারে থাকিতে থাকিতে ক্রমশ ঘোর দুঃখবাদী হইয়া পড়ে, কিন্তু সংসারী লোকের মধ্যেও এমন দুই একজনের দেখা মেলে যাহাদের মনের উপর দুঃখবাদ স্থায়ী আসন বিছাইতে পারে না। এই রকম লোক দুঃখের গুরুভারে একদিন বিদ্রোহ করিয়া বসে। দুঃখবাদীর আনন্দ তাহাকে পীড়িত করিয়া তোলে, তাহার মন ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে থাকে, এবং হঠাৎ একদিন দেখা যায় সে সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

*

কিন্তু সেদিন একখানি ইংরেজী কাগজে একটি সংবাদ পাঠে চিন্তামূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র বিবাহাদির পর একদিন সংসার বিষয়ে উদাসীন হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া যায়। বহুদিন তাহার কোনো সন্ধান নাই, তাহাকে মৃতজ্ঞানে তাহার স্ত্রী যথারীতি বৈধব্য পালন করিতে থাকে, কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহার এক বন্ধু তাহাকে গঙ্গার ধারে সন্ন্যাসী বেশে রন্ধনরত অবস্থায় আবিষ্কার করে। বন্ধু তাহাকে বলে, তুই বাড়ি ফিরে চল্। সন্ন্যাসী বলে, না, সংসারে আর আমি ফিরব না। বন্ধু অনেক অনুরোধ করে, কিন্তু সন্ন্যাসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে কিছুতেই বৈরাগ্য ত্যাগ করিবে না। কিন্তু বন্ধু হতাশ হইয়া যখন বিদায় লইবে তখন তাহাকে ডাকিয়া সন্ন্যাসী শুধু একটি প্রশ্ন করে: আচ্ছা ভাই, বলতে পার, লক্ষ্ণৌতে এখন কোন্ কোন্ সিনেমা ছবি দেখানো হচ্ছে?

*

এই সন্ন্যাসী অপ্‌টিমিস্ট না পেসিমিস্ট? আনন্দবাদী না দুঃখবাদী? প্রথম অংশ পড়িলে আনন্দবাদী বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু শেষ অংশটিতে বিশুদ্ধ দুঃখবাদীর চিহ্ন বর্ত্তমান। আমার মনে হয় এই সন্ন্যাসী একই জীবনে আনন্দবাদ এবং দুঃখবাদ—এই উভয়বিধ বাদের সমন্বয় করিতে চাহিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত একই লোকের জীবনে যুগপৎ দুঃখবাদ এবং আনন্দবাদের সমন্বয় ঘটে নাই, তাই ইনি গঙ্গার ধারে কুটীর বাঁধিয়া একদিকে সিনেমা-জগৎ, অন্যদিকে সিনেমাতীত জগৎ চিন্তা করিতেছেন। এই দুই জগৎ তাঁহার সমুখস্থ গঙ্গার দুই তীরে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, তিনি এপারে বসিয়া ওপারের সঙ্গে মিলন কামনা করিতেছেন। কিন্তু হায়, তাঁহার এই আশা কখনও পূর্ণ হইবে না, ওপার কখনও এপারের সঙ্গে মিলিবে না। এপার ওপার যাহারা মিলাইতে পারে না তাহারাই মরীয়া হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বলে, 'হয় এস্পার না হয় ওস্পার'। শেষ পর্য্যন্তও যদি তিনি এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে এপার ওপারের মাঝামাঝি স্থানে ডুবিতে হইবে।

*

কিন্তু আনন্দ এবং দুঃখকে মিলাইতেই হইবে। আনন্দ যেদিন দুঃখের সঙ্গে গলাগলি করিয়া একসঙ্গে পথে বাহির হইবে সেইদিন মন আনন্দ এবং দুঃখের অতীত রাজ্যে বিচরণ করিবে। সেদিন গৃহী এবং গৃহত্যাগীর মধ্যে কোনো ভেদ থাকিবে না; সেদিন গঙ্গার তীরে বসিয়া সন্ন্যাসীকে আর লক্ষ্ণৌএর সিনেমার কথা চিন্তা করিতে হইবে না। সেদিন তিনি গঙ্গার ওপারে গিয়া সিনেমা-ঘরের সম্মুখে মারামারি করিয়া টিকিট কিনিলেও কেহ কিছু মনে করিবে না!

*

আসলে আমরা তো সকলেই সন্ন্যাসী। কিন্তু আমাদের বৈরাগ্য বেপরোয়া বৈরাগ্য নহে। অন্তর আমাদের ভোগের জন্য লালায়িত, বাহিরে আমাদের উদাসীনের পোষাক। আমরা হাফ্ প্যাণ্ট পরিয়া ভিড় টপকাইয়া সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট কিনিবার জন্য উন্মুখ—অথচ হাফ্ প্যাণ্ট পরিবার মত মনের জোর নাই। কাজেই আমরা রঙ্গমঞ্চের সন্ন্যাসী। ভোগীর পোষাক পরিয়াও

আমরা ভোগ করিতে পারি না। এমনকি ভোগীর অভিনয় করিতেও বাধা পাই। যে লোকটি রঙ্গমঞ্চে ভোগী রাবণ সাজিয়া সীতা হরণ করিতে আসিয়াছে সেও সীতাকে রাবণের মত হরণ করিতে পারে না—কারণ সীতার নিকট হইতে সে বহু টাকা ধার করিয়াছে, শোধ দিতে পারে নাই ; তাই সীতাকে দেখিলেই তাহার দেনার কথা মনে পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এ ভোগী অচল। সন্ন্যাসীকেও আনন্দবাদী হইতে হইবে—আনন্দমঠের সন্ন্যাসীও আনন্দবাদী ছিল।

*

কিন্তু এই দৌর্ব্বল্য কাটাইতেই হইবে। কলিকাতার পথের বাস্ ড্রাইভারের মত আনন্দবাদী হইতে হইবে, রেস্ খেলিয়া যাহারা সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দেয় তাহাদের মত বেপরোয়াবাদী হইতে হইবে, মনে প্রাণে দেউলিয়া হইতে হইবে—হয়তো তাহা হইলেই আমরা বাঁচিব। আনন্দ এবং দুঃখকে একসঙ্গে মিলাইব বটে কিন্তু মিলাইবার পর আমরা যেন সেই আনন্দ এবং দুঃখের উর্দ্ধে উঠিতে পারি। উর্দ্ধে না উঠিতে পারিলে আনন্দ বা দুঃখ কিছুই আমরা পাইব না। আলো এবং অন্ধকার মিলাইলে যেমন আমরা আলো কিংবা অন্ধকার পাই না, পাই প্রদোষ অর্থাৎ এমন আলো যাহা অন্ধকারের দোষে দুষ্ট। পাঁচ কোটি বাঙালীর মধ্যে প্রায় তিন কোটি বাঙালী ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত (স্বাস্থ্যবিভাগের হিসাব) কিন্তু তবু আমরা ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে উদাসীন। যথার্থ বৈরাগ্যের ইহা একটি নিশ্চিত প্রমাণ। সুতরাং এখনও আশা আছে। এবং বাঙালীর মধ্যে যে সম্পূর্ণ বেপরোয়াবাদীও আছে ইহাতেও সন্দেহ নাই। সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি—লণ্ডন ম্যাজিশিয়ান্স্ ক্লাব বাঙালী ম্যাজিশিয়ান পি, সি, সরকারের নিকট হইতে চ্যালেঞ্জ পাইয়াছেন। সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি লণ্ডনে গিয়া প্রসিদ্ধ দড়ির ম্যাজিক দেখাইবেন, জ্বলন্ত লৌহশলাকা ভক্ষণ করিবেন, সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত ঔষধ এবং অ্যাসিড ভক্ষণ করিবেন, ভাঙা কাঁচ, আলপিন, সূচ, বিষাক্ত সাপ এবং তরল সীসা ভক্ষণ করিবেন এবং আগুনের উপর দিয়া হাঁটিবেন।

*

আদর্শ বাঙালী। কিংবা সমস্ত বাঙালীকে আমি যে পথে চলিতে বলি, ইনি সেই পথের অগ্রদূত। ইনি চরম আনন্দবাদী—সুতরাং চরম বেপরোয়াবাদী। ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনো চিন্তা নাই, কোনো সাবধানতা নাই, জীবন এবং মৃত্যু কোনো দিকেই ইঁহার কোনো আকর্ষণ নাই—ইনি জীবন এবং মৃত্যুর উর্দ্ধে উঠিয়া সমগ্র বাঙালীকে ইঁহার এই চরম পথে আহ্বান করিতেছেন। এই পথ কেহ দেখিল না বলিয়া হতাশ হইতে হইবে না—কারণ ইনি যে পথে হাঁটিবেন সে পথ আলোর পথ। রবীন্দ্রনাথ এই পথ সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—

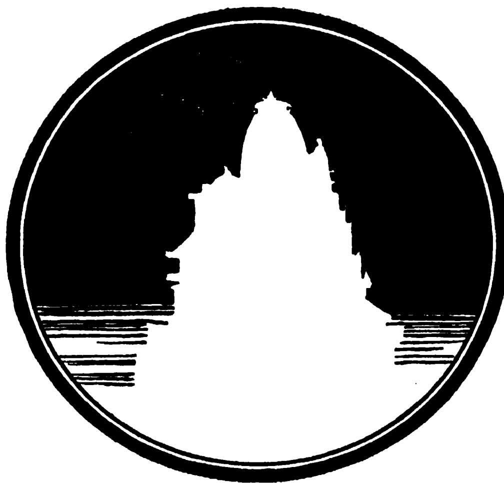
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ।

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্ব্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা।

যাদুকর, প্রকাশ্য গুপ্ত সব রকম কণ্টক এবং সর্প ভক্ষণ করিতে করিতে পথ চলিবেন। হে বাঙালী, এ পথ ম্যাজিকের পথ হইলেও ইহাই তোমার বর্ত্তমানের একমাত্র লজিকের পথ। সুতরাং এই পথেই চল।

*

দুইটি বিপরীত শক্তির ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা এতদিন যে ভুল করিয়াছি—সেই ভুল যেন এবারে সংশোধন করিতে পারি। আমরা প্রাচীন এবং নবীনকে এক সঙ্গে রাখিতে গিয়া দুইটিকেই হারাইতেছি—সেই জন্যই আমাদের যাহা কিছু প্রকাশ সমস্তই দুর্ব্বল। কাজেই সন্দেহবাদী বেপরোয়াবাদীর দিকে এবং বেপরোয়াবাদী সন্দেহবাদীর দিকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া আছে। সন্দেহবাদীর সাধ বেপরোয়াবাদী তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করুক, বেপরোয়াবাদীর সাধ সন্দেহবাদী তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করুক। ইহার প্রমাণ ওয়েলিংটন স্ট্রীটের সন্দেহবাদী ঘড়িটি আজিও ভগ্ন অবস্থাতেই আছে; তাহার আশা বেপরোয়াবাদী একদিন নিজের খরচে তাহাকে জোড়া লাগাইবে; আর বেপরোয়াবাদী ভাবিতেছে ঘড়িটি নিজগুণেই সুস্থ হইয়া উঠিবে এবং পূর্ব্বেকার মনান্তর ভুলিয়া যাইবে। ফলে শূন্য ঘড়ির স্থান চিরদিন শূন্যই রহিয়া যাইবে। তবে দৈবাৎ যদি কোনো তৃতীয় পক্ষের দেখা মেলে তাহা হইলে কি হয় বলা যায় যায় না। সেই তৃতীয় পক্ষ বাহির হইতে আসিবে না, উভয়ের মিলনের ফলে জন্মলাভ করিবে।



জরা

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

তরুণ বয়সে মিসেস দাশ যদি আমার প্রতিবেশিনী হইত, তাহা হইলে জীবনের সুর আমার কোন্ পর্দ্দায় ধ্বনিত হইত, তাহাই গবেষণা করিতেছিলাম, এমন সময় সহসা মিসেস দাশের একাধারে বাবুর্চ্চি-খানসামা-চাকর ও বয়-রূপ জীবটি আমার বৈঠকখানার দরজায় আসিয়া সেলাম জানাইল এবং মুখে বলিল, মেমসাহেব ভেজা, চা তৈয়ার।

আর বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। একপ্রকার প্রস্তুতই ছিলাম, শুধু ডাকের অপেক্ষা করিতেছিলাম। অধুনা মিসেস দাশের চায়ের আসরে আমার উপস্থিতি অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার নিজের দিক হইতেও একটা গরজ আছে, আবার মিসেস্ দাশেরও বিশেষ গরজ আছে। কাজেই মিসেস দাশের চায়ের আসরে আমাকে তুইবেলা প্রায়ই হাজিরা দিতে হয়। শরীর নিতান্ত অসমর্থ না হইলে উহার ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটে না।

আমরা তুইজনেই এখন পেন্‌শনভোগী এবং বছর তুই পূর্ব্বে পাশাপাশি বাড়ি করিয়াছি। বাড়ি নির্ম্মাণকালেই পরস্পরের সহিত আলাপ—ক্রমে প্রতিবেশী হিসাবে ঘনিষ্ঠতা—এখন তো রীতিমত সৌহার্দ্দ্যেই তাহা পরিণত হইয়াছে। মিসেস দাশ ছিল হেড মিসট্রেস এবং জীবনের বেশি সময়ই তাহার কার্সিয়াং, দার্জ্জিলিং ও শিলং-এ কাটিয়াছে, আর বাকী জীবনটা কলিকাতা শহরেই কাটিবে বলিয়া মনে হয়। আমারও চাকুরি-জীবন বাংলার নানা জেলা ও শহরে কাটিয়াছে এবং শেষ আলিপুরে আসিয়াই হইয়াছে। এখন কলিকাতার একপ্রান্তে মিসেস দাশের প্রতিবেশী হইয়া নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনযাপন করিতেছি।

মিসেস দাশ আমাকে কখনও ডিপটি সাহেব, কখনও কখনও আবার মিস্টার ব্যানার্জি বলিয়া অভিহিত করে। ডিপটি সাহেব বলিলে আমি আপত্তি করি না, কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি বলিলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠি, মিস্টার ব্যানার্জ্জি নয়, বরং বাঁড়ুয্যে মশাই বলুন মিসেস দাশ। মিস্টার ব্যানার্জ্জি আমার বরদাস্ত হয় না।

মিসেস দাশ মুহূর্ত্তে নিজেকে শুধরাইয়া লইয়া বলে, ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন থেকে বাঁড়ুয্যে মশাইই বলব, নিদেন পক্ষে ডিপটি সাহেব।

কিন্তু আজিও মিসেস দাশের ড্রয়িংরুমের পর্দ্দা ঠেলিয়া পাপোষের উপর পা রাখিতেই মিসেস দাশ মোলায়েম ও দরদীকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।

বলিলাম, আবার সেই—

সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস দাশ আমাকে বাক্য সম্পূর্ণ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, সো সরি। কিছুতেই মনে থাকে না। নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই। শরীর আজ কেমন? নতুন উপসর্গ কিছু দেখা দেয়নি তো?

বলিলাম, না, পুরানো উপসর্গের ঠেলাতেই প্রাণ অস্থির। নতুন উপসর্গ কিছু জুটলে আর রক্ষে আছে! শয্যে নিতে হবে।

মিসেস দাশ বলিল, বাত বড় বেয়াড়া রোগ, কি বলেন বাঁড়ুয্যে মশাই? আমারও কদিন ধ'রে গা-হাত-পায়ে বেদনা, শেষে কি আপনারই রোগে ধরবে নাকি?

একটু যেন খুশী হইয়াই বলিলাম, তা আপনারও তো যোগ্য বয়েস হয়েছে মিসেস দাশ, আর এ তো বয়েসেরই রোগ কিনা। তা ধরতে পারে, কিছুই বিচিত্র না। কিন্তু খুব সাবধান থাকবেন। হতচ্ছাড়া রোগ, একবার ধরলে পরে জীবন অতিষ্ঠ ক'রে ছেড়ে দেবে। অতি ন্যাস্টি রোগ।

মিসেস দাশ মৃদু হাসিয়া বলিল, আহা, দাঁড়িয়ে রইলেন যে ডিপটি সাহেব, বসুন।

মিসেস দাশের মুখোমুখি হইয়া সোফায় বসিতেই সে আবার বলিতে লাগিল, দেখুন বাঁড়ুয্যে মশাই, যত রোগ দুনিয়ায় আছে তার মধ্যে বার্দ্ধক্যই বোধ করি সব চেয়ে ন্যাস্টি রোগ, তাই না কি? আর সেই রোগেই যখন আমাদের ধ'রে বসেছে তখন বৃথা দুশ্চিন্তা। জরাগ্রস্তের পক্ষে বাত-ব্যাধির দুশ্চিন্তা অনর্থক। এখন শুধু অপেক্ষায় ব'সে থাকা, কি বলেন? সেদিন এলেই যেন বাঁচি।

—তা যা বলেছেন মিসেস দাশ।

মিসেস দাশের বয়-বেয়ারা-বাবুর্চ্চি-খানসামা—চিন্তামণি নামধেয় জীবটি আমাদের সামনের কাচের গোল টেবিলটির উপরে চায়ের লিকার সমেত টী'পট ও আনুষঙ্গিক পেয়ালা-প্লেট প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার নিপুণহস্তে সাজাইয়া দিয়া গেল। পরে এগ্‌পোচ ও রুটি-মাখনও যথারীতি ধরিয়া দিল। মিসেস দাশ রুটির স্লাইস্-গুলিতে ছুরি লইয়া মাখন মাখাইতে লাগিল, আর আমি মিসেস দাশের কাজ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। রুটিতে মাখন মাখাইয়া আমার সামনে একটা প্লেটে তাহা সাজাইয়া দিয়া মিসেস দাশ বলিল, সুরু করুন মিস্টার ব্যানার্জ্জি—সো সরি—বাঁড়ুয্যে মশাই।

আচ্ছা, হচ্ছে—গোছের একটা ভঙ্গী করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। মিসেস দাশ চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। এতক্ষণে মিসেস দাশের মুখের প্রতি নজর করিয়া বুঝিলাম যে, সে আজ একটু যেন অতি মাত্রায় কস্‌মেটিক ব্যবহার করিয়াছে। মুখের শিথিল চর্ম্মে তাহা যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিতে পারে নাই। আতিশয্যদোষে মুখখানা কিঞ্চিৎ রূঢ় দেখাইতেছে। মিসেস দাশ একটু বেশবিলাসী যে তাহা প্রথম পরিচয়ের সঙ্গেই বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু অধুনা যেন তাহার বিলাস একটু বাড়িয়াছে। এবং আজ সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হইলাম। মিসেস দাশের জন্য সহসা মনে মনে করুণার সঞ্চার হইল।

অকপটে তাই বলিয়া ফেলিলাম, আপনার কিন্তু মিসেস দাশ, বয়সের সঙ্গে মনের কোনই পরিবর্ত্তন হয়নি। আর আমাদের মত লোকের মন বয়সের সঙ্গে ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে। তাই না?

মিসেস দাশ আমার দিকে চায়ের পেয়ালা আগাইয়া দিয়া বলিল, আমার নিজের জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারি না বাঁড়ুয্যে মশাই, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমারও সেই ধারণা। আপনাকে

দেখলে কেউ এখন ভাবতেও পারবে না যে, আপনি কোনকালে আবার একটা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

বলিলাম, কিন্তু আপনি যে মিসেস দাশ, তা আপনাকে দেখলেই লোকে বুঝবে এবং আপনি যে হেড মিস্ট্রেস এককালে ছিলেন, তাও সহজে অনুমান করতে পারবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

মিসেস দাশ খুশীর হাসিই হাসিল। এবং ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বলিল, আপনার কথা মিথ্যা নয় বাঁড়ুয্যে মশাই। তবে আমার অতীত দিন তো আপনি দেখেননি কিনা, একটা অনুমান ক'রে হয়তো আমার আজকের দিনের সঙ্গে মিল খুঁজছেন। এক সময় কি দুরন্ত জীবনই না আমার কেটেছে, কিন্তু আজ তো অবসাদের পালা ; এক রকম প্রাণহীন এক প্রান্তে নিরালা প'ড়ে আছি বললেই চলে। একদিন বহুর মধ্যে নানা আকর্ষণের ঘূর্ণাবর্ত্তে অস্থির চঞ্চল জীবন কেটেছে আমার, কিন্তু আজ তো শান্ত মৃত প'ড়ে আছি বললেই চলে।

বলিলাম, তা কিন্তু আপনাকে এখনও দেখে মানুষ অনুমান ক'রে উঠতে পারে ব'লে আমার বিশ্বাস। আর সেইজন্যেই বোধ করি আপনার সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলও জাগে বেশি। আপনার আজকের চেহারা, হাব-ভাব-ভঙ্গি, বেশ-ভূষা, পরিবেষ্টন সব কিছু মিলে আপনার অতীত সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা ইঙ্গিত সহজেই পেঁাছে দেয়—আর সেইটেই বোধ করি আপনার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ।

মিসেস দাশ মৃদু একটু হাস্য করিল। পরে এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে বলিল, আপনি একটা ঝানু ডেপুটি—বিচিত্র মানুষের আমদানি হয়েছে নিত্য আপনার এজলাসে—অনেক দেখেছেন আপনি বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনার অভিজ্ঞতার সত্যিকারের দাম আছে। মানুষ দেখে আপনি অনুমান প্রায়ই নির্ভুল করেন ব'লে আমার বিশ্বাস। অন্তত, আমার সম্বন্ধে আপনার অনুমান নির্ভুল। আর ইঙ্গিত কথাটা বোধ করি সৌজন্যেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা না করলেও আমি ক্ষুণ্ন হতাম না বাঁড়ুয্যে মশাই। আমার নির্ভুল পরিচয় লোকে পেলে আমি খুশীই হই। আর আমিই যখন আমার শেষ পরিচয়, তখন লোকে আমার নির্ভুল পরিচয় পেলে ক্ষতি বৃদ্ধি তো কিছুই আমার নেই। অন্য কাউকে এ কারণে ক্ষতিগ্রস্তও হতে হবে না। কাজেই আমি যা—আমি তাই। এণ্ড লেট্ পীপ্‌ল্ নো ইট···চায়ের দিকেও একটু নজর রাখবেন বাঁড়ুয্যে মশাই, নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—ও, তাই তো !—বলিয়া একটু অসাবধান হইয়া পড়িয়াই চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া চুমুক বসাইলাম।

মিসেস দাশ অমনি হেই হেই করিয়া উঠিয়া বলিল, না, আপনি একটুতেই বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন ডিপটি সাহেব। রুটি পোচ প'ড়ে রইল, চা সুরু ক'রে দিলেন। আপনার সত্যিই বয়েস হয়েছে।

নীরবে হাসিয়া ভুল শুধরাইয়া লইলাম।

দুনিয়ায় আর নূতন আকর্ষণ কিছু খুঁজিয়া পাই না। সব কিছুরই প্রতি দিন দিন কেমন যেন নিস্পৃহ হইয়া উঠিতেছি। স্থবিরতা ক্রমেই যেন গ্রাস করিয়া নিতেছে—স্নায়ু মণ্ডলী দুর্ব্বল হইয়া

পড়িতেছে। শুধু বাতের ব্যথাটা আর ব্যাধিটা যেন সর্ব্বগ্রাসী হইয়া আমাকে নিষ্কর্ম্মা জড় পদার্থে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিয়াছে। এতদিনে বাড়িতে লোকজনের নিদারুণ অভাব অনুভব করিতেছি। কেন যে এত বড় বাড়ি জীবনের এই সামান্য কয়টা বৎসরের জন্য নির্ম্মাণ করাইলাম তাহা এখন আর তো বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এতবড় বাড়িতে আমরা তিনটি প্রাণী মাত্র বাস করি এবং চাকর ও ঠাকুর ধরিলে পাঁচজন মাত্র। একজন আমার দূরসম্পর্কের বিধবা ভগিনী এবং ততোধিক দূরসম্পর্কের একটি ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহাদের দুনিয়ায় আপনার বলিতে বা রক্ষা করিতে কেহ নাই বলিয়াই আমার আশ্রিত। ফলে, তাহাদের প্রতি সামান্য কর্ত্তব্য বোধ ভিন্ন আমার প্রাণের কোন অনুরোধ নাই। নিতান্তই আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার সম্পর্ক। কাজেই গৃহের শয্যার প্রতি আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কোন আকর্ষণই নাই। তবু মিসেস দাশের ড্রয়িংরুমের প্রতি অধুনা একটা আকর্ষণ জাগিয়াছে। সেখানে বসিয়া যতটুকু সময় গল্প-গুজবে কাটে, তাহাই যেন জীবনের পরম লাভ বলিয়া জ্ঞান হয়।

মিসেস দাশের আহ্বানের অপেক্ষাও অধুনা আর করিতে হয় না। দুই বেলা এখন মিসেস দাশের ওখানেই চায়ের আসর জমাইতেছি। তবে সকালের দিকে মাঝে মাঝে বাতের দরুণই শয্যা ছাড়িয়া আর যাইতে পারি না। মিসেস দাশ খবরাদি করিয়া ক্ষুণ্ণ হয়; পরে দেখা হইলে অনুযোগও করে। মিসেস দাশেরও সেদিনটা নিতান্ত নিরুৎসাহেই কাটে। মিসেস দাশের আত্মীয় পরিজনের কোন বালাইই নাই। সে একা এবং সহকারী তাহার চিন্তামণি—ভৃত্য মাত্র।

পরস্পরের প্রতি তাই আমাদের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ জাগিয়াছে। তরুণ বয়সে হইলে হয়তো উভয়ে উভয়ের গভীর প্রেমে পড়িতে পারিতাম।

সেকথা মিসেস দাশই সেদিন বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা ডিপটি সাহেব, এই যে আমাদের পরস্পরের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ, সহানুভূতি, সমবেদনা আজ আমরা উপলব্ধি করছি—তরুণ বয়সে আমাদের এ জিনিস দেখা দিলে একেই তো প্রেম বলা হ'ত, নয় কি?

কথাটা মিসেস দাশ যত সহজে বলিয়া ফেলিল তত সহজই সন্দেহ নাই, কিন্তু মিসেস দাশের বেডরুমে বসিয়াই আমাদের কথা হইতেছিল—যেহেতু অসুস্থতা নিবন্ধন মিসেস দাশ আজ আর নীচে নামিতে পারে নাই; আমাকে উপরেই ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে, কাজেই অবস্থাটা কেমন যেন একটু অদৈনন্দিন বলিয়া অনুভব করিলাম। তবে কোনকিছুতেই লজ্জা পাওয়ার বয়স আর নাই, তাই রক্ষা। বলিলাম, হঠাৎ এ কথা আপনার মনে হ'ল কেন মিসেস দাশ?

মিসেস দাশের মুখে সহসা যেন তাহার তরুণ বয়সের চাপল্য আবার জাগিয়া উঠিল, একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, আপনি কি এ কথায় খুব নার্ভাস ফীল করছেন বাঁড়ুয্যে মশাই? আপনি যেন কেমন চমকে উঠলেন ব'লে আমার মনে হচ্ছে।

আমিও চেষ্টা করিয়া মৃদু একটু হাসিয়া বলিলাম, চমকাবার কথাই মিসেস দাশ। কারণটা আপনাকে বলি তবে শুনুন। চাকরি পেয়েই বিয়ে করলাম—সেই প্রথম স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার নিবিড়ভাবে মেশা—তাও মাত্র বছর পাঁচেকের জন্যে। মারা যেতে আর দ্বিতীয় বারের জন্যে বিয়ে

করিনি। সে-ই জীবনে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেশা শেষ। আর কারও সঙ্গে জীবনে মেশার সুযোগও হ'ল না, সারাটা জীবন চুটিয়ে চাকরিই করলাম, কিন্তু কত বড় একটা ফাঁক কেবল ফাঁকি দিয়ে বোঝাই ক'রে রেখেই জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, বুঝুন। কাজেই চমকে ওঠা খুবই স্বাভাবিক আমার পক্ষে, তাই না কি? স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আজও নিজেকে তাই দুর্ব্বল ব'লে মনে করি। নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেওয়া হয়নি ব'লেই হয়তো এত ভয়।

মিসেস দাশ চমৎকার একটু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছি ডিপটি সাহেব, তবু পুরুষের সান্নিধ্য আজও দেহে মনে কেমন একটা মোচড় দেয়, কেন দেয় বলতে পারেন?

মিসেস দাশের এ ধরণের কথায় বিস্মিত হওয়াই আমার উচিত ছিল, কিন্তু হইলাম না; কারণ মিসেস দাশের অতীত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কিছু কিছু পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই তাহার নিজের মুখ হইতেই পাইয়াছি। কাজেই বলিলাম, রাশ চিরকাল ছেড়ে দিয়েই বসেছিলেন ব'লেই বোধ হয় এখন টানাটা অভ্যাসের বাহিরে চ'লে গেছে। অবাধ জীবনযাত্রার অভিশাপই বোধ হয় এইখানে।

মিসেস দাশ তরুণীসুলভ হাসি হাসিয়া বলিল, খুব বাঁধাবাঁধির যে জীবন সে জীবনের অভিশাপও তো সমানই দেখতে পাই। আপনার সঙ্গে আমার তফাৎ তো আমি কিছু দেখতে পাই না আজ।

একপ্রকার লজ্জিত হইয়াই বলিলাম, জীবনটাই আমাদের মস্ত অভিশাপ মিসেস দাশ, মরণটাই বোধ হয় বড়। আচ্ছা, আজ উঠি তবে মিসেস দাশ।

মিসেস দাশ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ওকি, আপনি যে পালাচ্ছেন ডিপটি সাহেব। না, দেহের তারুণ্য আপনার কেটে গেলেও মনের তারুণ্য এখনও আপনার কাটেনি দেখতে পাচ্ছি। নইলে পালাবার মত কিই বা হয়েছে!

বলিলাম, না না, সে কিছু না। তবে অনেকক্ষণই বসেছি কিনা—এখন দেহের তাগিদেই ওঠা দরকার ব'লে মনে করছি। আবার ও-বেলা আসব 'খন। আচ্ছা, আসি তা হ'লে মিসেস দাশ।

সারা দুপুর অশান্তিতেই কাটিল। কেবল ঘর আর বারান্দা করিয়াছি। ঘরে এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারি নাই। অতীত জীবনের পানে যতদূর দৃষ্টি চলে চালাইয়া দিয়া দেখিলাম, বিরাট ফাঁক পড়িয়া রহিয়াছে, শুধু জীবনের চার পাঁচটা বছর বেশ ঠাসবুনানি—সেই কয়েকটা বছরেই যেন শুধু কত কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাও বিস্মৃতপ্রায়। শুধুই একটানা বৈচিত্র্যবিহীন চাকুরি-জীবন—কেবলই স্থানান্তর দৃশ্যান্তর, কিন্তু ঘটনান্তর আর নাই, কোন আকর্ষণও নাই।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মিসেস দাশের ভিতর-বাড়ির খানিকটা অংশ চোখে পড়িতেছিল, একটা ডালিম না বেদানার গাছ যেন মিসেস দাশের উঠানে দেখিতে পাইতেছিলাম, তাহাতে কুঁড়ি ধরিয়াছে—ফুল ফুটিয়াছে। তাহাই অবাক হইয়া দেখিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, মিসেস

দাশ এখন কেমন আছে কে জানে! একবার গিয়া দেখিয়া আসিলে পারিতাম। জীবনে কোন প্রতিবেশীর জন্য এতটা চিন্তা করি নাই, কাহারও জন্য কখনও মন খারাপ হয় নাই। মিসেস দাশের শারীরিক কুশল সংবাদের জন্য মন আজ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অসময়ে মিসেস দাশের সংবাদ নিতে গেলে সেই বা ভাবিবে কি? যৌবনে যে কৌতূহল জাগিলে বে-মানান হইত না, সে প্রকারের কৌতূহল আজ বার্দ্ধক্যে জাগায় নিজেই কেমন বিস্মিত হইয়া যাইতেছিলাম। আজ কেবলই তাই মনে হইতেছিল যে, ফাঁক শুধু ফাঁকি দিয়াই বোঝাই করিয়া আসিয়াছি, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত যেন করিতে বসিয়াছি।

মিসেস দাশকে যেন বহুদিন দেখি নাই। কবে একদিন যেন তাহাকে অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছিলাম, আর কোন খবর পাই নাই। মন খুবই খারাপ হইয়া গেল। মিসেস দাশ যেন আমার পরম আত্মীয়—তাহার জীবন-মরণের উপর যেন আমার ভবিষ্যৎ নিবিড়ভাবে নির্ভর করিতেছে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ অস্থির হইয়া উঠিলাম।

মিসেস দাশের ড্রয়িংরুমের দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইতেই চিন্তামণি ছুটিয়া আসিল। দরজা খোলাই ছিল, আমাকে পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া চলিল। সহসা কেন জানি লজ্জা আসিয়া গেল। কেমন যেন একটু অন্যমনা হইয়া পড়িলাম। এই তারুণ্য-সুলভ ভাব-বৈচিত্র্য সহসা যেন সারা দেহে মনে একটা প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল। আমি যেন অতীত কোন যুগের রাজকুমার, রাজকুমারী সন্দর্শনে চলিয়াছি।

ছিঃ—লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলাম। মানুষের চিন্তাধারা মানুষের জীবনে কতবড় বিশ্বাসঘাতকতাই না করিতে পারে! তরুণ প্রেমিকের চিন্তাধারা অবাধে আমার মধ্যে কেমন করিয়া যে প্রবেশলাভ করিল তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছি না।

বহুযুগের বিশুষ্ক মরুতে তৃষ্ণা তাহা হইলে সমানই জাগিয়া থাকে। একটা নূতন দৃষ্টি লাভ করিলাম।

মিসেস দাশ শয্যায় পাশ ফিরিয়া বলিল, জ্বরে ম'রে যাচ্ছি ডিপটি সাহেব, কিন্তু একটা লোক নেই যে পাশে বসিয়ে দুটো কথা কই। অথচ, একদিন আমার চারপাশ ঘিরে লোক থাকত। আপনি এসে গিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছেন।

চিন্তামণি ঘরের এক কোণ হইতে একটা চেয়ার মিসেস দাশের শয্যার কাছাকাছি আনিয়া দিতেছিল, মিসেস দাশ তাহার কাজে বাধা দিয়া বলিল, থাক, চেয়ার আর টানতে হবে না। আপনি উঠেই বসুন ডিপটি সাহেব। একান্ত কাছে কাউকে না পেলে আজ ম'রে যাচ্ছি। চেয়ার টানাটানির আর দরকার নেই।

মিসেস দাশের অনুনয়ের সুরে কাতর হইয়া তাহারই পাশে শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। মিসেস দাশের শীর্ণ দুর্ব্বল দেহ একখানি বহুরঙা প্রজাপতি, ফুল ও লতাপাতার নক্সা করা চাদর দিয়া আবৃত ছিল। শুধু শীর্ণ রোগবিবর্ণ উষ্ণ মুখখানি ও বিপর্য্যস্ত রুক্ষ কেশদাম অনাবৃত পড়িয়া ছিল। মিসেস দাশের মুখে নিদারুণ হতাশা জাগিয়াছে—যেন বহু ক্ষতি জীবনে তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

হঠাৎ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলাম। নিজের দুর্ব্বলতা ধরা যাহাতে না পড়ে তাহারই জন্য সজাগ রহিলাম।

বলিলাম, এখন জ্বরটা বেড়েছে নাকি মিসেস দাশ? মুখ দেখে তো আমার তাই মনে হচ্ছে!

মিসেস দাশ বলিল, কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। সারা দেহে বেদনা, জ্বরও আছে বোধ হয়, নইলে চোখ মুখ পুড়ে যাচ্ছে কেন? দেখুন তো, কপালে হাত ঠেকিয়ে, বুঝতে পারবেন নিশ্চয়।

কেমন যেন একটা লজ্জা আসিয়া গেল। এ বয়সে এ ধরণের লজ্জা সত্যই অস্বাভাবিক। কিন্তু লজ্জা ঢাকিবার জন্যই ক্ষিপ্রতাসহকারে মিসেস দাশের কপালে হাত রাখিয়া তাহার শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। মিসেস দাশ অসহায় রোগীণীর মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মিসেস দাশের তখন রীতিমত জ্বর। কাজেই একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, একজন ডাক্তারকে কল দি, কি বলেন মিসেস দাশ? আজ দুদিন ধ'রে জ্বর, এখন তো রীতিমত জ্বর রয়েছে দেহে, ফার্দার কম্প্লিকেশন্সের আগে একজনকে ডাকাই দরকার ব'লে আমি মনে করি।

মিসেস দাশ বলিল, তা বেশ ডিপটি সাহেব, আপনি দরকার বোধ করলে একজনকে ডাকতেই হবে। আপনার চেয়ে আমার দরদী বন্ধু আর কেই বা আছে বলুন? আপনার উপরেই তো ভরসা ক'রে আছি।

নিজেকে কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করিলাম। কিন্তু উপায়ই বা আর কি আছে! রোগাক্রান্ত মিসেস দাশকে আমি ভিন্ন কেই বা আর দেখিবে? তাহার তত্ত্বাবধান আমারই করিতে হইবে।

কাজেই ডাক্তার ডাকাইয়া আনিলাম। মিসেস দাশকে দেখাইলাম। ওষুধের জন্য টাকা দিয়া চিন্তামণিকে পাঠাইয়া দিলাম। এ সমস্তই নিজের খরচে করিতে হইল। মিসেস দাশ এ সবের দরুণ টাকা দিতে চাহিল, কিন্তু নানা কৌশলে তাহাকে বিরত করিলাম। বলিলাম, ডাক্তার আমার পরিচিত বন্ধু, কোন ফী দিতে হবে না। ওষুধের দাম মাত্র দশ আনা—সেজন্য দুর্ভাবনার কিছু নাই। ইত্যাদি।

চিন্তামণিকে দিয়া ফলও কিছু কিনাইয়া আনিলাম। মিসেস দাশের রোগ সামান্যই—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। এসব অনায়াসে শেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ি ফিরিয়া গেলাম। তার পরেই যেন কেমন লাগিতে লাগিল। সামান্য কর্ত্তব্য শেষ করিয়া কেমন যেন লজ্জা পাইয়া গেলাম। একটু যেন বাড়াবাড়ি কি করিয়া বসিয়াছি। বয়সের সঙ্গে ঠিক যেন সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া কাজটা করিয়া উঠিতে পারি নাই। মহা দুর্ভাবনা দেখা দিল।

রাত্রে আর একবার দেখিয়া আসাও দরকার মনে হইতেছিল, কিন্তু লজ্জা কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। হঠাৎ চিন্তামণি আসিয়া খবর দিল, মেমসাহেব ডাকিতেছে।

ফস করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, মেমসাহেবকে গিয়া বল যে, বাতের ব্যথাটা আমার সুরু হয়েছে, যেতে পারব ব'লে ভরসা হচ্ছে না।

চিন্তামণি চলিয়া গেল। নিজের মিথ্যা অজুহাতে নিজেই কেমন যেন লজ্জিত হইয়া উঠিলাম। একবার গেলেই যেন ভাল ছিল।

নিজের উপর কোন আস্থা নাই, বল ভরসা নাই। যাহা করিব না ভাবি তাহাই হয়তো করিয়া বসি, আর যাহা করিব ভাবি তাহাই হয়তো করি না।

গড়িমসি করিতে করিতে রাত দশটা বাজিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত না গিয়াও কেন জানি পারিলাম না। মিসেস দাশের দরজায় গিয়া কড়া নাড়িলাম। চিন্তামণি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া মিসেস দাশের ঘরে নিয়া গেল। মিসেস দাশ আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, এই অসময়ে যে! ভাবলাম, বাতের ব্যথায় আর বোধ হয় আসতেই পারলেন না। কিন্তু আপনি না এলে আমি বিপদেই পড়তাম। চোখ এক মুহূর্ত্তের জন্যে আজ আর বুজতে পারছি না।

বলিলাম, হ্যাঁ, এলাম। না এসেই বা করি কি!

মিসেস দাশ বলিল, তা এসেচেন যখন উঠেই বসুন, একটু গল্প করি। রাত একটু হয়েছে, না? তা হোক। আপনি চ'লে গেলে বড্ড একা মনে হবে।

বলিলাম, আমরা সত্যিই কৃপার পাত্র মিসেস দাশ। মানুষের যৌবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। বার্দ্ধক্য যেন যৌবনের বোঝা বইতেই শুধু পারে—তার নিজস্ব কিছু নেই। এর চেয়ে বড় দুঃখ বার্দ্ধক্যের আর যেন কিছুই নেই।

মিসেস দাশ একটু উঠিয়া বসিয়াই বলিল, না, আপনি উঠে বসুন আগে ডিপটি সাহেব, বার্দ্ধক্যের অংশ অপরিসীম। তা নিয়ে সারারাত আলোচনা চলতে পারে।

মিসেস দাশের শয্যাপার্শ্বে উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, সারারাত চলতে পারে ঠিকই, কিন্তু সারারাত আলোচনা চালাবার সামর্থ্য কোথায় মিসেস দাশ? জীবনের বৃত্তটা কেমন দিনের পর দিন ছোট হয়ে আসছে চোখের সামনেই বলুন তো? অর্থাৎ সব দিকের স্কোপ কি পরিমাণ লিমিটেড হয়ে এসেছে খেয়াল করেছেন?

মিসেস দাশ আবার শয্যায় কাত হইয়া বলিল, সবই খেয়াল করেছি ডিপটি সাহেব, নইলে তো উই উড হ্যাভ বীন লাভার্স বাই দিস্ টাইম। তাই না কি?

সমস্ত চেতনা মুহূর্ত্তে যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। মিসেস দাশের বাক-সংযমের অভাব ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মিথ্যা সে কিছুই বলে নাই। নীরবে তাই বসিয়া রহিলাম। কথার খেই খুঁজিয়া পাইলাম না।

কি যে ঘটিয়া গেছে নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কেমন যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম। স্বপ্নের মধ্যেই হয়তো পাখীর ভোরের কল-কাকলি শুনিয়া ঘুম ভাঙিল। স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন, ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই দেখি, মিসেস দাশের শয্যাপার্শ্বে আমি শায়িত, আমার সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া মিসেস দাশের সেই নক্সাকরা চাদর দিয়ে আবৃত। এ অবস্থা যে কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। আমি ভয়ে ভয়ে নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেই মিসেস দাশও আমার পাশ হইতেই শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, রাত্রে গল্প করিতে করিতে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লেন ডিপটি সাহেব, জাগাতে কেমন মায়া হ'ল। এখনও ছেলেমানুষের মত ঘুম কিন্তু আপনার। সারারাত অচৈতন্য হয়ে ঘুমুলেন আপনি, আর একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি আমার চোখের পাতা

বুজতে পারলাম না। সারারাত জেগে জেগে আপনাকে পাহারা দিলাম, আর আপনার ঘুম দেখে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরলাম।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, বলেন কি ?

মিসেস দাশ হাসিতে লাগিল।

তারপরেই শয্যায় উঠিয়া বসিলাম, শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইলাম। স্বপ্ন কি এত সত্য হয় কখনও ? মুহূর্ত্তে স্বপ্নের স্বপ্ন আমার কাটিয়া গেল। বাস্তব-জগতে যেন চৈতন্যসম্পন্ন হইয়া জাগিলাম। মিসেস দাশের হাসিই আমাকে সচেতন করিয়া তুলিল।

—আচ্ছা, আসি তবে মিসেস দাশ।—বলিয়া যেন ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে চাহিলাম। দরজার কাছে আসিয়া দেখি, খিল দেওয়া। খুলিলাম। দরজা খুলিয়াই মনে হইল, হায়! এতই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।

সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি চিন্তামণি ডাকিয়া বলিল, সাব, চা তৈয়ার, যাবেন না এখন।

চিন্তামণিও যেন আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। আর দাঁড়াইলাম না। রাস্তায় আসিয়া নামিলাম। মনে হইল, বার্দ্ধক্য বিদ্রূপেরই সামগ্রী। বার্দ্ধক্য আমাকে চমৎকার বিদ্রূপাত্মক প্রহসনে নামাইয়া ছাড়িয়াছে। নিজের জন্য তাই একটু হাসিলাম—নিতান্ত করুণায়।



আধুনিক অতি-প্রাকৃত ভাস্কর্য্য

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

সভ্যতা যখন প্রাচীন ও পরিপক্ক হয়ে ওঠে তখন অতিরিক্ত আয়োজন ও অলঙ্করণ আর চিত্তহরণ করতে পারে না। বৃদ্ধা নটীর গলিত শ্রীর উপর মুক্তাভরণ যেমন যবনিকা নিক্ষেপ করতে পারে না, তেমনি অতিরিক্ত আসবাব ও অত্যুক্তি দ্বারা পীড়িত বর্ত্তমান সভ্যতা বিগত শতাব্দীর রুগ্ন ঐশ্বর্য্যকে বার বার প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

এদেশেও এক সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ সভ্যতার উপকরণ উষ্ণ ও রুদ্ধ নাগরিক জীবনের বহুমুখী প্রবাহে উৎসারিত হয়েছিল। মৃচ্ছকটিকের প্রতি স্তরেই সে জীবনের দাহকর ক্ষুধা, তৃপ্তি ও সীমাহীন আয়োজন দেখে বিস্ময় জন্মে। অজন্তার চিত্রকলায় গুপ্তশীলতার চরম দান ফলিত হয়েছে, তা অতিরিক্ত মাধুর্য্যে ভারাক্রান্ত ও নত হয়ে পড়েছে। উচ্ছ্বসিত মদিরার মত সে শীলতার ফেনপুঞ্জ একটা তন্দ্রা জড় আবেশ উপস্থিত করে। অতিরিক্ত তৃপ্তির ভিতর দিয়ে তাতে অবসাদ ও ক্লান্তি উপস্থিত হয়। এ দেশে লোককলার (Folk Art) বলিষ্ঠ নগ্নতা ও অর্দ্ধস্ফুট আবেগ চিরকাল এ শ্রেণীর দুর্ব্বল ও সুসভ্য সৃষ্টির পক্ক পরিণামের ক্ষতিপূরণ ক'রে এসেছে। ভারতবর্ষে চিরকালই নাগরিক জীবনের পশ্চাতে একটা বিরাট ও বলিষ্ঠ পল্লী সভ্যতা জাগ্রত ছিল। তা ছাড়া একটা আরণ্যক প্রতিষ্ঠানও ছিল ঋষিদের। কাজেই একান্তভাবে নাগরিক ঐশ্বর্য্য ও অনুষ্ঠান সমস্ত দুর্ব্বলতা ও ক্লেদ নিয়ে মানুষের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করতে পারে নি। এজন্য এখানকার পল্লীকলার প্রতিষ্ঠা প্রতিযুগেই জাগ্রত ও জীবন্ত। তীর্থ-কেন্দ্রগুলিতে পল্লীপ্রসাধনের আদর্শে রচিত মাটির মূর্ত্তি। রঙিন ছবিগুলি এজন্য একাল পর্য্যন্ত জীবন্ত হয়ে আছে।



'Oracle' শিল্পী—চিরিকো

ইউরোপে বাস্তববাদের চর্চ্চা হয়েছে বহুকাল হতে। বৈজ্ঞানিক আয়োজনে হুবহু রচনা যেন প্রকৃতির গর্ব্বকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। গ্রীকমূর্ত্তিগুলি হুবহু আদর্শের একটা উন্নত মডেল হতে সৃষ্ট হয়েছে। রোমক মূর্ত্তিগুলির স্বভাববাদ বিস্ময়জনক। সমুত্থান যুগের সৃষ্টিতে প্রত্যেক মূর্ত্তির মাংসপেশীগুলি পর্য্যন্ত নকল করা হয়েছে। মিচেল এঞ্জেলোর যীশু একটা পুষ্ট পালোয়ান।

ক্রমশ এ পথে অগ্রসর হয়ে প্রতিমূর্ত্তি রচনা একেবারে নকল করার প্রেরণা পেল। তাতে পাওয়া গেল শরীরের বার্ত্তা যা ডাক্তারী বিদ্যাচর্চ্চার অনুকূল। কিন্তু মানুষ বলতে তো একটা মাংসপিণ্ড বোঝায় না। তা ছাড়া মাংসপিণ্ডের ভিতর দিয়ে কোন একটা ভাব বা আইডীয়া

নর্ত্তকীর চেহারাই খুঁজে পাওয়া যায় না। বিষয়ের স্থূল বস্তুবাদ বর্জ্জন ক'রে একটা অবস্তুতন্ত্র ছন্দের সাহায্যে নৃত্যের ভাবটি প্রকাশ করাই হ'ল এর লক্ষ্য। বস্তুত এটা হ'ল ইউরোপের রম্যকলার ইতিহাসে একটা বিপর্য্যয়ের অবতারণা। আধুনিক Sur-real বা অতি-প্রাকৃত রূপ-ধ্যানে এই প্রেরণা চরম প্রান্তে এসেছে। কলাবিদ্যার বিষয়টি প্রধান ব্যাপার নয় ওটা একটা আলম্বন মাত্র। ওটাকে আশ্রয় ক'রেই কলালীলাকে বিকশিত করতে হবে—এই হ'ল উদ্দেশ্য।

কাজেই রোদ্যাঁ যখন বিরূপ রূপের অবতারণা করেন তখন লোকে রচনার দৃঢ় সঙ্কল্প, বলিষ্ঠ সঙ্কেত ও অভিভাবী অপ্রাকৃত নিবেদনেরই দিকেই চোখ ফেরাল—কঙ্কালশাস্ত্রের (anatomy) বই হাতে ক'রে আর তাকে প্রদক্ষিণ করল না। এতে ইউরোপের অধ্যাত্ম মুক্তি ঘটল সন্দেহ নেই। কারণ তার পরই শিল্পীগণ বেপরোয়া এমন সব মূর্ত্তি রচনা করল যা আরব্য রজনীর গুহা, রূপকথার জঙ্গল ও দান্তের নরকে (Inferno) শোভা পায়—বাস্তব জগতের ভিড়ে নয়।

ইদানীং Epstein এই রকমের অপ্রাকৃত অথচ রসপূর্ণ



'মা' শিল্পী—মেষ্ট্রোভিক্‌স্

প্রকাশ না করলে তা নেহাৎ বড় রকমের পুতুলের মত হয়ে পড়ে। এজন্য শিল্পীকে একটা ভাবের বাহন ক'রে মূর্ত্তি রচনা করতে হয়।

অথচ শরীরের হুবহুত্বের দিকে নজর রাখলে ব্যাপারটি বস্তুবাদের একটা নক্সা মাত্র হয়, একটা রূপোজ্জ্বল আবেদন হয় না।

ইউরোপে এই জন্য হুবহুত্ব বা নকলনবিশীর বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। জাপানী কলার সহিত পরিচয় হয়ে ইউরোপীয় শিল্পীরা নিজেদের ভ্রান্তি বুঝতে পারে। ফলে ইউরোপের আভাসপন্থী (Impressionist) রচনা স্থরু হয়, তাতে details, সূক্ষ্ম বা খুঁটিনাটি হুবহুত্ব রচনা বর্জ্জিত হয়। মোটামুটি কয়েকটা তুলির টান বা massএর নানা রুক্ষ ও অসম্পূর্ণ স্তর সন্নিবেশের সাহায্যে রচনা করা স্থরু হ'ল।

এর পরে এল ঘনপন্থীদের (Cubist) রচনা। এরা পুরাতন সমগ্র ভঙ্গীই বর্জ্জন করলে। Archipenko এদের ভিতর একজন প্রধান শিল্পী। তাঁর 'নৃত্য' মূর্ত্তিতে



কুন্তী (গাদিয়ে ব্রাজোয়কা)

রচনায় মাতোয়ারা হয়েছেন। এইরূপ মানসিক অবস্থা প্রাচ্য বিশেষতঃ ভারতীয় রচনা, চৈনিক ছন্দ ও মিশরীয় রূপপ্রসঙ্গ ইউরোপে সম্ভব ক'রে তুলেছিল। এক সময় ইউরোপের আদর্শ ছিল Graeco-Roman বস্তুবাদ বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে এসে তা বজ্জিত হ'ল। এই পরিবর্ত্তনের মূলে কোন অধ্যাত্ম বিপর্য্যয় বা তুরীয় সংস্পর্শ কাজ করে নি। কারণ ইউরোপ রূপরচনার প্রসঙ্গে নিগ্রো কলার সহিতও সামাজিকতা করেছে। ইউরোপের দৃষ্টি বহিরঙ্গ; বাইর দেখে ওরা ভিতরের অনুসরণ করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ ও দৃষ্টির সাহায্যে ওরা সত্যের অসীম উপকূলে উপস্থিত হতে সাধন করেছে। নিগ্রো কলার বিরূপবজ্রে ইউরোপ পেয়েছে এক বলিষ্ঠ ও অখণ্ড আয়োজন, এক অক্ষত রূপকুহেলির অভঙ্গলীলা। নিগ্রো সঙ্গীতের বিপুল ঝঞ্ঝা মত্ত ঝটিকার মন্ত্র নিয়ে এসেছে তা সকল বাঁধন ভেঙ্গেছে এক আলুলায়িত মত্ততায়। রুক্ষ, অভূষণ, উল্লোল,



মা　　শিল্পী—হেনরিমুর



যন্ত্রশক্তি　　শিল্পী—এপষ্টাইন

ঝঙ্কার নিয়ে আসে দিগন্তের উগ্র অট্টহাস্য, চকিতে তা ছন্দের আবর্ত্তে পুঞ্জীভূত ধূম্রদেহ দৈত্যের মত সভ্যজগতকে বিস্মিত ক'রে দেয় রক্তকদম্বের অর্ঘ্য নিয়ে। চিত্রকলায় মাতিস (Matiss) ও ভাস্কর্য্যে মেস্ট্রোভিক্স, যাকে জীবিত প্রতাচ্য ভাস্করদের শ্রেষ্ঠতম বলা হয়, এই আরণ্য নিগ্রো-ছন্দকে বশীকরণের মন্ত্রে আয়ত্ত করেছে। তাতে লঘু লালিত্য নেই, একটা গভীর অতলস্পর্শ আবেশে তা মঞ্জরিত হয়েছে; তরল অলঙ্করণ হতে এসব বজ্জিত—আছে শুধু রেখার বায়বীয় মায়া এবং অবয়বের উদ্বেলিত আবর্ত্তন। এই শিল্পীর 'মাতৃমূর্ত্তি' ইউরোপের মূর্ত্তিশিল্পের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব দান।

এসব ইউরোপের আধুনিকতম রূপচর্চ্চার অধ্যায়। শিল্পী হেনরি মুরের মা, মেস্ট্রোভিকসের মা এবং এই শ্রেণীর ভাস্কর্য্যের অতি-প্রাকৃত রূপে ইউরোপের কলারসিক ইদানীং মুগ্ধ হয়েছে।

চোরের পাঁচালী ও কবি কৃষ্ণহরিদাস

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪৫শ ভাগের ৪র্থ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিত "চোরের পাঁচালী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচালীকর্ত্তা চোর চক্রবর্ত্তীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া পুঁথিশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, পাঁচালীকর্ত্তার আসল নাম কবি কৃষ্ণহরিদাস। ফুটনোটের আকারে তিনি যে দুইটি অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা আমরা উক্ত রূপ ধারণা করিতে প্রয়াস পাইতেছি। আমরা এস্থলে অংশ দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি।—

বাছিঞা রাখিল মোর নাম কৃষ্ণহরি ॥
শিশুকাল হইতে আমি হইলাউ (?) সন্ন্যাস।
অযোধ্যাতে ঘর মোর নাম কৃষ্ণদাস ॥

কবি অপেক্ষা কবির কাব্যকেই আমরা বড় করিয়া ধরি—সেজন্য কবির সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ খুব কম দেখা যায়। কিন্তু কবি ও কাব্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া আমরা কাব্যের মূল সূত্র হারাইয়া ফেলি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে কার্পণ্য করিলে, তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ না করিলেও তাঁহার কাব্যই তাঁহাকে টানিয়া আনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে।

প্রাচীন বাঙ্গালার পুঁথি-ক্ষেত্র বিশেষ কণ্টকাকীর্ণ—সে স্থানে আলোচনার পথ সুগম করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কোন পুঁথিতে কবির নাম গোপন করিয়া নকল কর্ত্তার নাম জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—কোন পুঁথিতে প্রসিদ্ধ লেখকের নাম বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সবের মধ্যে আমরা যেটুকু আলোর সন্ধান পাই, তাহাই বড় বলিয়া মনে করি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় "চোরের পাঁচালী"র বিবরণ প্রদান করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমরা আরও কিছু আশা করিতে পারি। শ্রদ্ধাবনত হইয়া তাহাই দাবী করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

চোর চক্রবর্ত্তী বলিয়া খ্যাত কবি কৃষ্ণহরিদাস সম্বন্ধে প্রাচীন পুঁথিতে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তর-বঙ্গে প্রচলিত সত্যপীরের পাঁচালী গানে কবি কৃষ্ণহরিদাসের উল্লেখ আছে। সন তারিখ বিষয়ে কবি কিছুই রাখিয়া যান নাই; পূর্ব্বেকার সেই মামুলী রীতি অনুসারে কবি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

বামদেব নাম পিতা, পঞ্চমী নামেতে মাতা,
কৃষ্ণহরি তনয় তাঁহার।
লিখি পদ অনুপম, আমার গুরুর নাম
তাহের মহম্মদ সরকার ॥

আছিল নিবাস যথা, শুন কহি তার কথা,
জন্মভূমি সাখারিয়া গ্রাম।
সেই গ্রাম ছেড়ে আসি, নিবাস যে করিয়াছি,
মইপুর সে গ্রামের নাম ॥

কেহ কেহ বলেন, কবির পরবর্ত্তী কালের বাসস্থান মইপুর গ্রাম রঙ্গপুর জেলার অতর্গত।* কবি নাকি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহের মহম্মদকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। কবি কেন নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণই কি তাহার স্বগ্রাম ত্যাগের কারণ? যাই হউক, কবি যে সময়ে পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতির ভাবসূত্র সুগ্রথিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, তাহের মহম্মদ কবির গানের গুরু, তাঁহার নিকট হইতে তিনি সত্যপীরের পাঁচালী-গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও বাঙ্গালার পল্লী-অঞ্চলে গানের গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে সাম্প্রদায়িকতার ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। হিন্দুর সত্যনারায়ণ পরবর্ত্তী কালে যে সত্যপীররূপে দেখা দিয়াছিলেন, তাহা ধারণা করিবার অনেক কারণ আছে। সত্যপীরের পাঁচালীতে এক স্থানে আছে।—

আমারে চিন না আমি পরিচয় দেই।
সত্যনারায়ণ আমি সত্যপীর হই ॥

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "সত্যপীরের কথা" পাঠ করিলে উপরি-উক্ত বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। এজন্য অবশ্য রামেশ্বরকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয় নাই। রামেশ্বরের "সত্যপীরের কথা"য় উর্দ্দু ভাষা প্রবেশ করিয়াছে, সত্যপীরের পাঁচালীতেও তাহা স্থান পাইয়াছে—সেরূপ উর্দ্দু ভাষার প্রচলন "চোরের পাঁচালী"তে পরিলক্ষিত হয়। পুঁথি তিনখানি যে সময়েরই হউক না কেন, তখন উর্দ্দু ভাষা যে রাজভাষা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ধারণা করা চলে। তখনকার যে পুস্তকই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে উর্দ্দুর ছাপ ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণহরিদাসের বিবরণ আমরা এত পাই যে, আসল কৃষ্ণহরিকে চিনিয়া লওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। লালদাস বাবাজী কৃত ভক্তমাল গ্রন্থের বহুস্থানে ভক্ত কৃষ্ণহরিদাসের বিবরণ আছে। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম-সুধা বিতরণ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের এক স্থানে তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

বামদেব নামে সাধু ছিপি কর্ম্ম করি।
কাল গুজুরান করে কৃষ্ণ মন করি ॥
বাল্যেতে বিধবা এক কন্যা মুখ চাই।
অন্তরে দুঃখিত কিছু মনে উপজাই ॥
* * *
সেবা পরিচর্য্যা আদি করিতে করিতে।
কৃপা লেশ হৈল হরি চাহে বর দিতে ॥
প্রসন্ন হইয়া ভগবান বর দিলা।
বিনা পুরুষের সঙ্গে গর্ভিনী হইলা ॥

* উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন, ১৩১৮, আমনতউল্লা আহম্মদ লিখিত, সত্যপীরের পাঁচালী।

কালেতে কন্যার গর্ভে পুত্র জনমিল।
নামদেব নাম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-ভক্ত হইল ॥

ভক্তমাল-গ্রন্থের বামদেব সাধুর নামের সহিত সত্যপীরের পাঁচালীকর্ত্তা কবি কৃষ্ণহরিদাসের নামের সাদৃশ্য আছে। শেষোক্ত নামদেবই কৃষ্ণদাস নামে বিদিত। কবি কৃষ্ণহরিদাসের সত্যপীরের পাঁচালীতে সত্যপীরের জন্মবৃত্তান্তে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ভক্তমাল-গ্রন্থের কৃষ্ণদাসের জন্মবৃত্তান্তের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এ স্থলে সত্যপীরের জন্মকথা উল্লেখ করা যাইতেছে। সত্যপীরের মাতা সন্ধ্যাবতী বলিতেছেন :—

প্রিয়াবতী রাণীমাতা, মৈদনব রাজা পিতা,
মালঞ্চা রায়েতে খেতি মতি।
আমি ত অপতি নারী আছিনু মায়ের পুরী,
গন্ধর্ব্বরূপে গর্ভ হৈল স্থিতি ॥

*   *

ঈশ্বরের কিবা লীলা, হৈলা রক্তের দলা,
ফেলাইয়া বেগবতীর কাছে।
তুমি দেহধারী হইয়া, আমারে করিলে দয়া,
পুনর্বার আইলে মোর কাছে ॥

উপরি-উক্ত জন্মবৃত্তান্তাংশে "আমি তো অপতি নারী .....গন্ধর্ব্বরূপে গর্ভ হৈল স্থিতি" ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ভক্তমাল-গ্রন্থের "বিনা পুরুষের সঙ্গে গর্ভিনী হইল" ইত্যাদি উক্তির সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। তবে, ভক্তমালের কৃষ্ণদাস ও সত্যপীরের কর্ত্তা কৃষ্ণহরিদাস এক ব্যক্তি কিনা তাহা বিচারসাপেক্ষ।

সত্যপীরের পাঁচালীতে প্রিয়াবতী, মালাবতী, লীলাবতী, বেগবতী, সন্ধ্যাবতী প্রভৃতি নামের অন্ত নাই। চোরের পাঁচালীতেও সেরূপ চম্পাবতী, লীলাবতী, মালাবতী, গুণবতী প্রভৃতি "বতী"-যুক্ত নামের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বেকার সংস্কৃত, কিংবা অসংস্কৃত কবির মধ্যে "বতী" প্রত্যয়ান্ত নামের বাহুল্য থাকিলে আলোচ্য "পাঁচালী" দুইখানির নামের মধ্যকার সামঞ্জস্য উপেক্ষার নয়।

"চোরের পাঁচালী" উত্তর-বঙ্গ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ, তাহার মধ্যে উত্তর-বঙ্গের ভাষা অনেক আছে। সত্যপীরেব পাঁচালীও সেইরূপ উত্তর বঙ্গের নিজস্ব। উভয় পুঁথিই তথাকথিত (?) মুসলমানী পুঁথির আকারে দক্ষিণ দিক হইতে পড়িতে হয়। উভয় পুঁথির রচয়িতা কবির বাসস্থান উত্তর-বঙ্গের কোন এক স্থানে স্থির করিতে বাধা নাই। এখন উভয় কবির মধ্যের সাদৃশ্য হইতে তাহাদিগকে "এক" করা যায় কিনা তাহাই জিজ্ঞাস্য।

এ রকম কতকগুলি বিষয় মাথায় জট পাকাইয়া আছে। গবেষণার ইচ্ছা না থাকিলেও সাধারণ কৌতূহল চরিতার্থ করিতে যাইয়া অনেক গ্রন্থাগার হইতে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। কারণ, অনেক নিয়মকানুনের মধ্য দিয়া হাত বাড়াইতে হয়। অধ্যাপক মহাশয় এ বিষয়ে সৌভাগ্যবান; আমরা তাঁহার নিকট উপরি-উক্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রার্থনা করিতেছি।

উমার তপস্যা

কুমার-সম্ভব : পঞ্চম সর্গ

শ্রীগণেশচরণ বসু

হরের ক্রোধে সমুখে তার দগ্ধ দেখি স্মরে
লজ্জা পেয়ে, আপন মনে গভীর ব্যথাভরে
রূপের করে নিন্দা দেবী, ভগ্ন-মনোরথা—
প্রিয়ের প্রীতি বিহনে কোথা রূপের সফলতা ? ১ ॥

'কঠিনতম তপস্যাতে নিয়ত তাঁরি ধ্যানে
সার্থকতা মিলা'ব রূপে',—ইচ্ছা হ'ল প্রাণে ;
এ ব্রত ছাড়া লভিতে, বল, পন্থা কিবা আর
এমন প্রেম, এমন পতি, তুলনা নাহি যার ! ২ ॥

তনয়া তাঁর গিরীশে হেন হয়েছে প্রেমবতী,
কঠোর তপ করিতে চায় লভিতে তাঁরে পতি,—
শুনি সে কথা উমারে ডাকি বক্ষে বাঁধি মেনা
বুঝায়ে কন, 'তপের ক্লেশ তোমারে সহিবে না ;—
ঘরেতে আছে দেবতা কত, বৎসে, কিবা কাজ
তপের তাপে, শকতি কোথা তোমার দেহ মাঝ ?
কোমল-দল শিরীষ-ফুলে ভ্রমর-ভর সহে,
বহিবে ভার বিহঙ্গেরও ?—নহে সে কভু নহে !' ৩, ৪ ॥

মায়ের কথা তোলে না কানে, মেয়ে যে দৃঢ়মতি,
করেছে পণ, হবেই সে যে কঠিন ব্রতে ব্রতী ;
যে মন ছোটে একের পানে, যে জল ধায় নীচে,—
কে পারে তার ফেরাতে গতি, চেষ্টা সে যে মিছে। ৫ ॥

জানেন মনোবাঞ্ছা পিতা, তবুও ত্বরা করি
পাঠায়ে উমা তাঁহার পাশে আপন সহচরী
আজ্ঞা মাগে মনস্বিনী,—'বরিব বনবাস
তপের লাগি, যাবৎ নাহি পূরিবে অভিলাষ। ৬ ॥

যেমন মেয়ে, যোগ্য তারি আগ্রহ ত হবে,—
উদার পিতা তুষ্ট চিতে আদেশ দিলে, তবে
গেলেন দেবী শিখরে সেই শিখীতে অভিরাম,
তাঁহারি তপে 'গৌরী-চূড়া' পেল যে পরে নাম। ৭ ॥

চন্দনেরে মুছিয়া বুকে দুলিত যেই হার,
তাহারে আজি কঠিন মনে করিল পরিহার ;
কপিশ-কটা বাকলে ঢাকে পেলব তনুলতা,
শীর্ণ করে তন্তু তার স্তনের পীবরতা। ৮ ॥

অলকদামে শোভিত যথা আননখানি আগে,
বাঁধিল জটা, তবুও মুখে তেমনি শোভা জাগে ;
কমলে ঘেরি ভ্রমর-পাঁতি যেমন করে শোভা,
শেহালা যদি জড়ায়, তবু তেমনি মনোলোভা ! ৯ ॥

মুঞ্জময়ী মেখলাখানি, ত্রিগুণ করি তায়
প্রথম যবে পরিল উমা তপেতে স'পি কায়,
সকল দেহ কণ্টকিয়া উঠিল খনে খনে,
রাঙিয়া ওঠে চারু সে কটি পরুষ পরশনে। ১০ ॥

অলক্তক-লেপন-কাজ অধরে ছিল যার,
কন্দুকেরি ক্রীড়ায় ছিল চপল ব্যবহার,
এখন সেই বরাঙ্গুলি কুশাঙ্কুরে ক্ষত,
অক্ষমালা-সূত্র সাথে প্রণয় অবিরত। ১১ ॥

কোমল মৃদু শয্যাতলে নিদ্রাসমাকুল,
ফিরিতে পাশ পড়িত খসি চুলের কত ফুল ;
পেলব সেই পুষ্পে যার বাজিত গায়ে ব্যথা,
এখন ভূমি-শয্যা তারি, মাথায় বাহু-লতা। ১২ ॥

তপের শেষে ফিরায়ে লবে,—এমনি ভাবি মনে,
পরের কাছে রাখিল তার দুইটি নিজ ধনে ;
লতারে দিল অঙ্গভরা ভঙ্গি মনোহর,
হরিণীদলে বিলোল দিঠি চকিত সকাতর। ১৩ ॥

দিবসনিশা ঘটের বারি স্তন্য-সুধাদানে
বাড়িয়া ওঠে আদরে যত তরুরা সেইখানে ;
প্রথম পাওয়া তনয় সম তাদের প্রতি স্নেহ
ঘুচাতে পরে পারেনি নিজ সন্তানেরা কেহ। ১৪ ॥

নীবার-ধানে লালিত সেথা বন্য মৃগ যত,
বিশ্বাসেতে তাহার ছিল এমনি অনুগত,
সখীর আগে তাদেরে বালা জড়ায়ে ধরি গলে,
নামায়ে মুখ আঁখিতে আঁখি মাপিত কুতূহলে। ১৫ ॥

উষাতে উঠি স্নানের পরে আহুতি করি দান,
অঙ্গে ধরি বাকল-বাস করিত স্তব-গান।
শুনিয়া দেখা করিতে আসে ঋষিরা তারি সনে,
ধর্ম্মে হ'লে প্রবীণ, তার বয়স কেবা গণে? ১৬ ॥

বিরোধ যত পরস্পরে ছাড়িল প্রাণী-দল,
অতিথি তরে তরুরা দিত ইচ্ছামত ফল;
হোমের লাগি কুটিরে করে অনল-আহরণ,
পাবন হ'ল পুণ্যে তারি সকল তপোবন। ১৭ ॥

বিফল দেখি সকল ব্রত ভাবিল উমা মনে,
এ লঘু তপে পাব না কভু বাঞ্ছিত সে জনে;
বরিল শেষে, না গণি নিজ নবনী-নিভ কায়া,
দারুণতর নিয়মবিধি পাসরি সব মায়া। ১৮ ॥

কন্দুকেরি ক্রীড়ায় আগে ক্লান্ত হ'ত কত,
সেই দেহে সে আরম্ভিল কঠোর ব্রত যত;
তনুটি যেন সোনায়-গড়া উজল শতদল,
ভিতরে সার, যদিও তাহা বাহিরে সুকোমল! ১৯ ॥

নিদাঘ-দিনে অনল জ্বালি, চতুর্দ্দিকে তারি
রহিত চেয়ে সবিতাপানে তন্বী সুকুমারী;
দৃষ্টি তার বন্ধ করি তাহারি পরে বালা,
হাস্যমুখে সহিত সেই নেত্রঘাতী জ্বালা। ২০ ॥

শূন্যে চাহি করিছে তপ, রবির খর করে
ঊর্দ্ধমুখী আননখানি কমল-শোভা ধরে;
ফুল্লমুখ পুষ্পসম তেমনি রহে ফুটি
কালিমা শুধু তুলিল ভরি আঁখির কোল দুটি। ২১ ॥

যাচ্ঞা বিনা আপনি মেঘে ঝরিত যেই জল,
চন্দ্র দিত সুধায় ভরা আলো যে নিরমল,
এই ত শুধু তপের কালে পারণা-বিধি তার,
জীবনোপায়ে তরুর সাথে বিভেদ নাহি আর। ২২ ॥

ভূমিতে জ্বলে অনল, নভে সূর্য্যকরজাল,
তাহারি তাপে তপ্ত হয়ে কাটিল কতকাল;
গ্রীষ্ম শেষে মেঘের জলে সিক্ত হ'লে কায়,
ধরারই মত অঙ্গ থেকে বাষ্প ওঠে হায়! ২৩ ॥

বরষা-মেঘে প্রথম জলবিন্দুগুলি ঝরে,
ক্ষণেক থাকি পক্ষ্মজালে অধর-তটে পড়ে;
চূর্ণ হয়ে কঠিন ঘাতে উচ্চ কুচ শিরে,
ত্রিবলি বাহি পড়ে সে গিয়ে নাভিতে ধীরে ধীরে। ২৪ ॥

ঝঞ্ঝাঘন প্রাবৃটে যবে বরষে বারিধারা,
বাহিরে শিলা-শয়নে কাটে রজনী আঁধিয়ারা;
রাত্রি যেন এ ঘোর তপে সাক্ষী রহিবারে
তড়িৎ-আঁখি মেলিয়া মুহু চাহিয়া দেখে তারে। ২৫ ॥

শীতের রাতে বাতাসে যবে তুষার-কণা ঝরে,
জলেতে বাস করিত উমা নিয়ম-বিধি-তরে;
সারাটি নিশা কাঁদিয়া ডাকে বিরহী চখাচখী,
ভাবিত উমা, 'ঘুচিবে আহা, এহেন বিরহ কি?' ২৬ ॥

হিমের দিনে কমলহীন সরসীজলতল,
উমারই মুখ করিল তারে আবার স-কমল;
পদ্মসম গন্ধ তার, পদ্ম-মুখ মাঝে,
তুহিনে কাঁপা ওষ্ঠ দুটি পাপড়ি হেন রাজে। ২৭ ॥

ঝরিয়া পড়া পত্রে শুধু ধারণ করি কায়
যে তপ চলে, সকলে জানে দুরূহতম তায়;
তাহাও ত্যজি সাধনা ঘোর করিলে নিরাহারে
পুরাণবিদে 'অপর্ণা' যে আখ্যা দিল তারে। ২৮ ॥

মৃণালসম কোমল দেহে দিয়ে সে বহু ক্লেশ
পালিত সেথা কতই ব্রত, নাহি যে তার শেষ ;
আপন পণে এমনি বালা কৃচ্ছ্রে থাকি রত
কঠিন-দেহী মুনিরে তপে করিল পরাহত। ২৯ ॥

একদা এল তাপস যুবা, মুরতিখানি তার
জ্বলিছে যেন ব্রহ্মতেজে তপেরই অবতার ;
মাথায় জটা, দণ্ড হাতে, অজিন কটি তটে,
ব্রহ্মচারী হ'লেও কিছু প্রগল্‌ভ সে বটে ! ৩০ ॥

অতিথি দেখি গৌরী তারে করিয়া বহুমান
স্বাগত করি পূজিয়া নিজে অর্ঘ্য করে দান ;
চিত্ত যার সাম্যে রত সমান দেখে সবে,
তাহারো কাছে বিশেষ জনে বিশেষ পূজা লভে। ৩১ ॥

গ্রহণ করি উমার হাতে সেবা সে যথাবিধি
ক্ষণেক শুধু ক্লান্তি দূর করিয়া তপোনিধি
উমার মুখে রাখিয়া তাঁর সরল বিলোকন,
যথাক্রমে আরম্ভিলা কুশল আলাপন। ৩২ ॥

তপের লাগি পাও কি হেথা সমিধকুশদল ?
স্নানের তরে এখানে তব মেলে তো ভাল জল ?
শকতি নিজ বুঝিয়া তবে আছ ত তপে রত ?
—দেহই আদি, ধর্ম্ম লাভে সাধন আছে যত। ৩৩ ॥

তোমারি স্নেহে লালিত যত পল্লবিনী লতা,
তাদের দেহে রহে ত ফুটে সুচির শ্যামলতা !
ওই যে তব ওষ্ঠদুটি অলক্তকহীন,
উহারি মত পাটল পাতা বিকশে অনুদিন ? ৩৪ ॥

নীলোৎপল নেত্রে তব চটুল দিঠিখানি
মৃগেরা যেন করেছে চুরি, এমনি অনুমানি ;
দর্ভ যবে সমুখে ধর, বাড়ায়ে তারা মুখ
খায় সে তৃণ তোমার হাতে, পাও তো প্রাণে সুখ ? ৩৫ ॥

'রূপ ত নহে পাপের লাগি'—জ্ঞানীরা হেন কয়,
তোমার মাঝে তাই যে দেখি সত্য অতিশয় ;
উদার তব মুরতিখানি, চরিতও সেই মত,
কঠিনতপা তাপসও তাহে শিক্ষা পায় কত ! ৩৬ ॥

সপ্তঋষি ছড়ায় ফুল স্বর্গে যার নীরে,
জনক তব ধরেন সেই গঙ্গাধারা শিরে ;
তাতেও তাঁর নির্ম্মলতা বাড়ে না তত, জানি,
পাবিত হন তোমার পূত চরিতে যতখানি। ৩৭ ॥

এ সংসারে ধর্ম্ম বড়—অর্থ-কাম নয়,
—তোমায় দেখে সেই কথা যে, সত্য মনে লয় ;
ধর্ম্ম একা চিত্তখানি করেছে অধিকার,
অর্থ কামে ত্যজিয়া সেবা করিছ শুধু তার। ৩৮ ॥

অতিথি জেনে অর্ঘ্যদানে করিয়া সমাদর
উচিত নহে, এখন যদি আমারে ভাব পর ;
জান ত সব সজ্জনেরি সখা সদা হয়
পরস্পরে সাতটি কথা করিলে বিনিময়। ৩৯ ॥

সেই সাহসে (জানি যে তব ক্ষমার নাহি শেষ,
দ্বিজাতি নারে চাপিতে কথা, তুমিও জান বেশ)
এ জন চাহে করিতে কিছু প্রশ্ন নিবেদন,
গোপন যদি না হয়, তার পূরাও আরাধন। ৪০ ॥

জনম তব বিধির কুলে, প্রধান জানি যারে,
তোমার দেহে ত্রিলোক-শোভা উদিত একাধারে ;
বয়স নব, বিভব-সুখ ঘরেই আছে কত।
আরো কি ফল চাহিয়া হ'লে তপস্যাতে রত ? ৪১ ॥

অনেক নারী তেজস্বিনী বিবাগী হয় বটে,
ঘরেতে যদি অসহ কোন বিড়ম্বনা ঘটে ;
বিচারি বহু হেরি না তবু ইন্দুনিভাননে,
তেমনতর সম্ভাবনা তোমার আচরণে। ৪২ ॥

এমন মুখে দুখের ছায়া পড়িতে কভু পারে ?
কাঁদাবে কেবা পিতার ঘরে মন্দ ব্যবহারে ?
লাঘব করে তোমার মান আছে বা কোন পর,
মণির লোভে ফণীর শিরে বাড়ায় কেবা কর ? ৪৩ ॥

যুবতী তুমি, খুলিয়া ফেলি' সকল আভরণ,
ধরেছ কেন বাকলবাস—জরতী-সুশোভন ?
চন্দ্রতারা-উজল সাঁঝে নবীনা বিভাবরী
বল ত, যদি ধূসর-আলো অরুণে লয় বরি ? ৪৪ ॥

স্বরগ চাহ ?—বৃথাই তপ করিছ তবে তুমি,—
পিতার তব দেশের সবে কহে যে দেবভূমি।
যোগ্যবর লভিতে আশ ?—মরিছ বৃথা যুঝে,
রতনে খোঁজে সবাই, সে তো মরে না কারে খুঁজে ! ৪৫ ॥

গভীর শ্বাসে ইচ্ছা তব করেছ নিবেদন,
সন্দেহেতে তবুও মম আন্দোলিত মন,
এমন করে দেখি না যারে চাহিতে হবে তব,
চেয়েও তারে পাও না তুমি, এ যে গো অভিনব ! ৪৬ ॥

কপোল শোভা কমল-কলি কর্ণে নাহি আর,
দুলিছে যেন ধানেরি শীষ কপিশ জটাভার ;
এমন দশা দেখেও যার অটল রহে মন,
কত না জানি নিঠুর সেই তোমার যুবাজন ! ৪৭ ॥

তপের তাপে কঠিন ব্রতে হয়েছে তনু ক্ষীণ,
দিবসে যেন উঠেছে চাঁদ পাণ্ডু প্রভাহীন ;
রৌদ্রে কালো পড়েছে দাগ, গহনা ছিল যেথা,
এ সব দেখে প্রাণেতে বল, কার না বাজে ব্যথা ! ৪৮ ॥

সুভগ বলি গর্ব্ব বুঝি করে সে প্রিয় তব,
নিজেরে করে বঞ্চিত সে, মূর্খ তারে কব ;
নতুবা হেন চতুর-দিঠি আঁখির কালো জালে
ধন্য মানি দিত যে ধরা সে যুবা এতকালে ! ৪৯ ॥

যুঝিবে কত গৌরী তুমি, সহিবে কত ক্লেশ ?
অনেক মম তপ রয়েছে,—শোন গো উপদেশ,
অর্দ্ধ তার গ্রহণ করি ইষ্ট জনে লভ,
স্বরূপ শুধু প্রকাশি বল বাঞ্ছিতের তব। ৫০ ॥

আসিয়া সেথা এমনি যদি সুধাল দ্বিজ তারে,
প্রাণেরি যাহা ইচ্ছা, মুখে কহিতে নাহি পারে ;
আপন প্রিয় সখী যে ছিল দাঁড়ায়ে সেইখানে,
কাজলহীন নয়নে উমা চাহিল তারি পানে। ৫১ ॥

কহিল সখী, বলি গো তবে, শুনিতে যদি মন,
কোন সে মনোবাঞ্ছা-লাভে করিয়া সখী পণ
প্রখর তপে সমর্পিল কোমল দেহটিরে,
সূর্য্যকর নিবারে যেন কমল ধরি শিরে ! ৫২ ॥

ঋদ্ধিযুত ইন্দ্র-আদি দিগীশ আছে যত,
মদনে বধি সবারে যেবা করেছে অবনত,
দেহের রূপে ভুলাতে যারে পারে না কোন জন,
শিবেরে সেই লভিতে পতি করেছে উমা মন। ৫৩ ॥

ভস্ম হ'ল পুষ্প-ধনু, বাণটি তবু তার
হরের সেই হুঙ্কারেতে মানিল যবে হার,
ফিরায়ে মুখ উমার বুকে হানিল আসি বলে,
গভীর ক্ষত করিল তার কোমল হৃদিতলে। ৫৪ ॥

তাপসী সেজে ভালেতে সতী পরেছে ললাটিকা,
অলক হ'ল ধূসর লেগে চন্দনেরি লিখা ;
পিতার ঘরে রয়েছে উমা অনলে তবু জ্বলে,
শান্তি নাহি তুষার-ঢালা শীতল শিলাতলে। ৫৫ ॥

গায়িকা যত কিন্নরীরা হয়েছে সখী বনে,
সবাই রত হরের যশোগীতের আলাপনে ;
গাহে যে উমা সজলস্বরে স্খলিত কথা তার।
সে গান শুনে সকলে তারা কেঁদেছে কতবার। ৫৬ ॥

রজনী যবে ত্রিযাম-শেষ, কি জানি বালা খুঁজে
সহসা জেগে উঠিয়া বসে, চক্ষু দুটি বুজে,
মিথ্যা কার কণ্ঠে চাহে জড়াতে বাহু-ডোর,
কাঁদিয়া কহে, 'কোথায় নীলকণ্ঠ, প্রিয় মোর ! ৫৭ ॥

শিবের ছবি আঁকিয়া উমা একাকী নিরজনে
চিত্রে চাহি তিরস্কার করে যে নিজ মনে,
সকলি নাকি জানিতে পার,...জ্ঞানীরা সবে কহে,
তোমারি পায়ে বিকানু আমি,.. অজানা কেন রহে ? ৫৮ ॥

চিন্তি যবে মর্ম্মে বোঝে, পন্থা নাহি আর
জগৎপতি শিবের সনে মিলন ঘটিবার,
পিতার কাছে আজ্ঞা লয়ে সঙ্গে সখিগণ
ব্রতের তরে গৌরী চ'লে এসেছে তপোবন। ৫৯ ॥

আপন হাতে যত্নে বালা রোপিল তরুসারি,
বাড়িল হেথা, তাহারা সবে সাক্ষী তপে তারি ;
বিশাল কত তরুর শাখে ধরিল নানা ফল,
নিজের সাধে জন্মে না তো অঙ্কুরেরও দল ! ৬০ ॥

নিদাঘে যথা নীরস ধরা মেঘের পথ চাহি,
শীর্ণ হ'ল তেমনি উমা শিবের দেখা নাহি ;
স্নিগ্ধ করে বরষা-ধারে ইন্দ্র তৃষাধীনে,
শিবের দয়া জানি না হায়, হবে সে কতদিনে ! ৬১ ॥

বিবরি যবে কহিল সখী উমার সাধু পণ,
দেখাল না তো একটু খুশি দ্বিজের বরানন ;
উমারে পুছে, যে কথা সখী করিল পরকাশ,
সত্য, কিবা সকলি তাহা মিথ্যা পরিহাস ? ৬২ ॥

মুকুল-করা আঙুলে রাখি অক্ষমালাখানি,
বহুক্ষণ নীরব বালা, সরে না মুখে বাণী ;
বলিতে যায়...বচন লাজে চাহে যে যেতে ফিরে,
সংক্ষেপিয়া তাহারে সতী কহিল ধীরে ধীরে। ৬৩ ॥

'সত্য সবই, সখী যা তোমা করেছে নিবেদন,
উচ্চ পদে করেছে লোভ আমার মূঢ় মন ;
সামান্য এ তপে কি সেই কাম্য কেহ পায় ?
তবুও মন-ইচ্ছা বল, কোথায় নাহি ধায় ? ৬৪ ॥

জানি তো সেই মহেশে আমি...কহিলা তপোধন,
সদাই তার অশুভ যত কার্য্যে রত মন !
কেমন কথা শিবেরে তুমি লভিতে চাহ পতি,
বুঝিতে আমি পারি না বালা তোমার কি যে মতি ! ৬৫ ॥

এত যে ক্লেশ সহিছ সে তো অসার কামনাতে ;
বিবাহে শুভ রাখীটি যবে বাঁধিবে তব হাতে
সহিবে বল কেমনে উমা ভূষিত সেই কর
জড়িত-ফণী-বলয় হাতে ধরিবে যবে হর ! ৬৬ ॥

যদিও বালা মন্দ ভাবি নিন্দিবে এ দ্বিজে
তবুও বলি বারেক তুমি ভাবিয়া দেখ নিজে
হংস-আঁকা দুকূলখানি পরিলে শুভ দিনে
মানাবে তাহা শোণিত-ধারা লোহিত গজাজিনে ? ৬৭ ॥

পুষ্পে ঢাকা হর্ম্ম্য তলে অলক্তকে লাল
কোমল-মৃদু চরণ তব ফেলেছ চিরকাল ;
চলিবে এবে ছড়ান কেশ পরেত-ভূমি পরে
এহেন দশা শত্রুতেও কামনা নাহি করে ! ৬৮ ॥

শিবের বুকে তোমার ঠাঁই সুলভ তাহা জানি,
তবু সে কত যুক্তিহীন দেখ ত অনুমানি...
চন্দনেরি চিত্র-আঁকা ফুল্ল দুটি স্তন
আলিঙ্গনে মাখিবে চিতা-ভস্ম বিলেপন। ৬৯ ॥

আরো যে এক বিপদ দেখি.. তোমায় শুধু সাজে
রাজার মেয়ে...পতির গৃহে যাত্রা গজ-রাজে ;
কিন্তু যবে বৃদ্ধ বৃষে করিয়া আরোহণ
চলিবে তুমি মুচকি হেসে চাহিবে কত জন ! ৭০ ॥

দুয়েই হ'ল ধ্বংস চাহি' মিলন তারি সনে
দৈন্য হেন দেখিয়া বড় দুঃখ হয় মনে ;
কান্তিমতী চন্দ্রকলা আগেই গেছে জানি
তুমিও গেলে সবার চোখে জ্যোৎস্না রেখাখানি। ৭১ ॥

জন্ম তার কেই বা জানে, তিনটি মরি, চোখ
দিগম্বরই ফেরেন তিনি এমনি বড় লোক !
যেমনটিরে কন্যা ভাবে মনের মত বর
শিবের নাহি কিছুই তার, এমনই গুণধর ! ৭২ ॥

অহিত হেন ঈপ্সিতেরে ক'র না আরাধনা
সুলক্ষণা তুমি বা কোথা, কোথা বা সেই জনা !
অর্ঘ্য যেই করিবে দান পুণ্য যূপমূলে
ভ্রমেও তাহা সঁপে কি কেহ শ্মশানে গাঁথা শূলে ? ৭৩ ॥

দ্বিজের মুখে শুনিয়া হেন অমনোমত কথা
উমার ঠোঁটে কাঁপিয়া উঠে…নীরব ক্রোধে কথা ;
বিকল্পিত যুগল ভুরু অরুণ আঁখিকোণ
চাহিয়া রহে বাঁকায়ে দিঠি রুধিতে নারে মন। ৭৪ ॥

কহিল উমা, তোমার কথা শুনিয়া মনে হয়,
জান না তুমি হরের কভু আসল পরিচয় ;
বুঝিতে নারে যাহার হেতু মেলে না কারো সনে
মহান্ সেই চরিতে গালি দেয় যে মূঢ় জনে। ৭৫ ॥

মাঙ্গলিকে সেবিয়া লোক বিপদে পায় ত্রাণ
কিম্বা তারি প্রসাদে মেলে প্রচুর ধনমান ;
জগৎ-জন-শরণ্য যে আপনি উদাসীন
তাঁর কি সাজে আশায়-হত বৃত্তি যত হীন ! ৭৬ ॥

অকিঞ্চন হয়েও তিনি ধনের অধিপতি,
ত্রিলোক-স্বামী, যদিও তাঁর শ্মশানে শুধু গতি ;
ভয়ঙ্কর হ'লেও তাঁরে সকলে বলে 'শিব',
যথার্থ কি স্বরূপ তাঁর, জানে না কোন জীব। ৭৭ ॥

ভূষণ দেহে, কিম্বা সেথা ভুজগ রহে লীন,
দুকূলধারী, অথবা তাঁর বসন গজাজিন ;
কপাল-মালা গলায়, কিবা ললাটে শশি-লেখা,—
বিশ্বরূপ-বপুরে ধরে কোন্ সে রূপ রেখা ? ৭৮ ॥

চিতার ছাই অঙ্গে শিব মাখেন তাহা জানি,
তবুও তাঁর পরশে তারে শুদ্ধ ব'লে মানি,
কারণ দেখ, নৃত্যে যেই ভস্ম পড়ে ঝরি
সব দেবতা যত্নে তাহা ধরেন শিরোপরি। ৭৯ ॥

বলেছ ঠিক, শিবের নাহি বিত্ত ধন মান,
কিন্তু তিনি বৃষেরি পিঠে চড়িয়া যবে যান
ইন্দ্র ছাড়ি ঐরাবতে, চরণ শিরে তুলি
মন্দারেতে রাঙায় কেন পায়ের নখগুলি ? ৮০ ॥

নিন্দা তুমি করেছ শিবে অনেক কিছু ব'লে
একটি শুধু সত্য কথা ঘোষিলে দোষ ছলে,
ব্রহ্মা যারে জন্ম-হেতু বলেছে আপনারি,
সাধ্য কি যে সঠিক কেহ বলিবে মূল তারি ? ৮১ ॥

থামাই কথা, কি কাজ তুলি বিবাদ-কলরব,
সত্য হোক, দেখেছ যাহা, শুনেছ যাহা সব ;
লগ্ন আছে মগ্ন মন একই সে ভাব-রসে,
প্রেমে যে মজে কি কাজ তার যশে বা অপযশে ? ৮২ ॥

নিবার' ওরে নিবার' সখী, আরো কি বলে বটু,
নীচের ঠোঁট নড়িছে যেন, কহিবে আরো কটু ;
মহৎকে যে মন্দ বলে পাপ তো তারি বটে,
নিন্দা যার কর্ণে পশে পাতক তারো ঘটে। ৮৩ ॥

'চলিনু'…বলি তখনি বালা গমনে করে মন,
স্তনের ভারে ভিন্ন হ'ল বাকল সেইক্ষণ ;
স্বরূপ ধরি অমনি শিব অধরে মৃদু হাসি,
পার্ব্বতীরে ধরিলা নিজে সমুখে স'রে আসি। ৮৪ ॥

হেরিয়া শিবে সরস তনু কাঁপিল থরথরি,
তোলা সে পদ ফেলিতে নারে তেমনি রহে ধরি ;
আকুল নদী…উপলে যদি নিরোধে তারি গতি,
চলেও না সে, থামেও না সে, তেমনি রহে সতী। ৮৫ ॥

উমারে তবে কহিলা শিব, পূরিল তব আশ,
অদ্যাবধি তপেতে কেনা রহিনু কৃতদাস ;
সিদ্ধি এলে সকল ক্লেশে শান্তি করে দান,
উমারও হ'ল তপের যত দুঃখ অবসান ! ৮৬ ॥

তুমি আমি কে !

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দপ্তর-বিখ্যাত নসীরাম-পালিত পরম-মান্য সাহিত্য-সম্রাট স্বয়ং শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বলিয়া গিয়াছেন, মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার নিজের লিখিত প্রবন্ধের পাতা মাসিক পত্রিকার অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জুতার অঙ্গ মোড়াইবার মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং হে সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক বা লেখক, তুমি আমি কে !

তুমি কি চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ? যদি সাহিত্য-সম্রাট হইবার সাধ থাকে, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত বা শরৎচন্দ্রের মত এই চট্টোপাধ্যায় বংশই বাছিয়া লইয়া বাংলায় জন্ম লইতে হইবে। এই কুলে জন্মিলেও আবার হয় না। বিখ্যাত রাঢ়ী ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া আমরণ কঠোর সাধনার ফলেই এই দুই সম্রাট সাহিত্যের সাম্রাজ্য জয় করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং হে অ-চট্টোপাধ্যায়-কুল-জাত সাহিত্যসেবী, তুমি আমি কে !

তুমি কি রায় বংশে বা ভাদুড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ? যদি নাট্য-রচনায় বা অভিনয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমাচ্ছন্ন বঙ্গ-রঙ্গভূমিতে বহু-শতাব্দী-স্থায়ী যশ অর্জ্জন করিতে হয়, তবে ডি. এল. রায়ের মত বা শিশির ভাদুড়ীর মত এই দুই বংশই বাছিয়া লইতে হইবে। এই দুই বংশের কোনও একটায় জন্মিলেই আবার চলিবে না। বিখ্যাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া আজীবন কঠোর তপস্যার ফলেই দ্বিজেন্দ্রলাল আর শিশিরকুমার বাংলার নাট্যকার ও অভিনেতৃগণের মধ্যে শাশ্বতী কীর্ত্তি অধিগত করিয়াছেন। সুতরাং হে নাটক-রচনা-লিপ্সু ভ্রাতঃ, হে অভিনয়-যশো-লিপ্সু বন্ধু, তুমি আমি কে !

কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইবার সাধ করিয়াছ ? হায় রে, পোড়াকপাল ! আ-যুগান্ত-কাল-প্রতিষ্ঠিত-কীর্ত্তি মহামহোপাধ্যায়-কুল-চূড়ামণি-মল্লিনাথাখ্য-বৈয়াকরণ-নিষেবিত শ্রীমন্মহাকবি স্বয়ং কালিদাস রঘুবংশ প্রণয়নের প্রাক্কালে ঘাবড়াইয়া গিয়া করুণ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলেন,—কোথায় বা সেই সু···চ্চ বিমান-বিহারী ভাস্বর ভাস্করের নিম্ন-বংশগ নন্দন-পরম্পরা আর কোথায় বা আমি ঘোর-কৃষ্ণ-কায়া মায়ের চরণাহত চাকর—ধুলিধূসরিত দীন মূঢ় ! সুতরাং এমতাবস্থায় আর্ষ-প্রয়োগের চূড়ান্ত-কারিন্ হে উদীয়মানম্মন্য কবে, তুমি আমি কে !

এক বিষয় এক সঙ্গে না ধরিয়া বহু বিষয় লইয়া বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া প্রতিভাবান্ পুরুষগণের নাম গণনার প্রথমেই তোমার নামে কঠিনীপাতের বন্দোবস্ত করিয়া একটা সুবিধা করিয়া লইবে ভাবিয়াছ—কেমন ? শরীরে আর পরমায়ুতে কুলাইবে তো ? এটা অন্ন-সমস্যার যুগ—এ কথা নিশ্চিত মনে রাখিও। আজিকার এই ভারতে পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের মধ্যে হয়তো মাত্র পঁয়ত্রিশ জনই কুবেরের তুল্য ধনপতি আছেন। যদি বিধাতাকে বলিয়া কহিয়া এই পঁয়ত্রিশ জনের কাহারও ঘরে জন্ম-পরিগ্রহের সুবিধা করিয়া লইতে পার এবং জীবনের দশ বৎসর বয়স হইতে নব্বই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই বেলা হাসিয়া খেলিয়া ডিম-দুধ আর মাখন-রুটি অনায়াসলব্ধ জলযোগরূপে

চালাইয়া যাইতে পার, তবে তোমার আশা আছে। মনে রাখিও, আমি তোমার আশার কথাই বলিতেছি, সিদ্ধির কথা মোটেই না।

কে না জানে, এক দিকে কাব্যকলার বিশ্বে বিশ্ববিজয়-ঘোষণাকারী সপ্ত-স্বর্গভেদী শাশ্বত স্তম্ভের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং অপর দিকে নব্য বঙ্গে হাল বাংলার প্রচলন করিয়া যিনি বাংলায় অমর হইয়া রহিলেন তাঁহার সহস্র রশ্মি বিশ্বের চতুর্দ্দিকে বিকিরণ করিতে উচ্ছ্বাস-বিহ্বল তরুণ বয়সের বিংশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া আজি ধ্যান-গম্ভীর অশীতির শান্ত কোঠায় আগমন পর্য্যন্ত কি কঠিন কৃচ্ছ্রতায় বহু-বিস্তৃত গাঢ়-কৃষ্ণ মেঘরাজি প্রতিভা-বাত্যায় দিগ্দিগন্তে উড়াইয়া সরাইয়া দিতে হইয়াছে! আজ বাংলার চতুর্দ্দিকে আলো আর আলো, শুধুই রবির আলো—দিনের আলো!

আজি এই বাংলায় আহারে সম্বলহীন পোষাকে রুচিহীন তপস্যায় প্রবৃত্তিহীন প্রতিভা-প্রদর্শনেচ্ছু আয়াসী বাঙ্গালী, তুমি আমি কে! দুর্ব্বোধ্যতার জনপ্রিয়তার অভূতপূর্ব্বতায় স্তম্ভিত হে বঙ্গবাসী, ভাবিয়া দেখ, তুমি আমি কে!

কঠিন সংস্কৃত বাঙ্গালা অর্থাৎ সাধু বাঙ্গালা লিখিয়া আমাদের সাহিত্যে কিছু দান করিয়া যাইবে? আরম্ভেই বলিয়া রাখি, এ দানের চেষ্টা নিরর্থক। জান না কি, বাঙ্গালায় সাধু বাঙ্গালা আজ হতাদরা লাঞ্ছিতা পলায়মানা ম্রিয়মাণা!

আজ কে বুঝিবে, নারিকেল কৈশোর-যৌবন-বার্দ্ধক্য সর্ব্বাবস্থাতেই পরম স্বাদু, পুষ্টিকর, তেজো-বীর্য্য-বর্দ্ধক? নারিকেলের ছোবড়াটাই লোকের চক্ষে ঘৃণ্য আবর্জ্জনার প্রতীতি জন্মায়। আর কঠিন মালাটা যেন কারাকক্ষের লৌহদ্বার! কে অস্ত্র দিয়া ছোবড়া ছাড়াইবে? কে বল দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া মালা ভাঙ্গিবে? কে অত কষ্টে ভিতরে ঢুকিবে?

এ যে রম্ভার যুগ! আহা অমরাবতীর রম্ভা! আঙ্গুলে ছুঁইতে না ছুঁইতেই খোসা খুলিয়া পড়ে! নগ্না রম্ভা কী মনোলোভা! ওষ্ঠে ঠেকিতে না ঠেকিতেই প্যারাফিন-পিচ্ছিল-পথে একেবারে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে। আহা, আহা, এ যুগের কোমল কলা!···অয়ি ডাবের জল ভুলানো কলা···ওলো মর্ত্তমান কলা, চিনি-চাঁপা কলা, অনুপম কলা!

যেখানে বঙ্কিমেরই টেঁকা দায় হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে বিদ্যাসাগরী ভাষার দুর্গতি স্মরণ করিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে কেন? উঃ কি ভীষণ! উর্দ্ধাধঃ উভয় দশন-পংক্তি স্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের স্ফোটনের ভয়ে শরীরে বেপথুর সঞ্চার হয়! সতত-সঞ্চরমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিবিড়-নীলিমায় অলঙ্কৃত—উঃ, কি ভয়াবহ! না, না, না,—এ টিকিতে পারিল না, পারিবে না। এ সনাতন, এ অচল, এ বিশাল, এ স্থাণুবৎ!

বিদ্যাসাগরই যদি উড়িয়া যায়, তবে হে সতী-বাঙ্গালা-প্রণয়িন্ বিদ্যা-পুষ্করিন্, তুমি আমি কে!

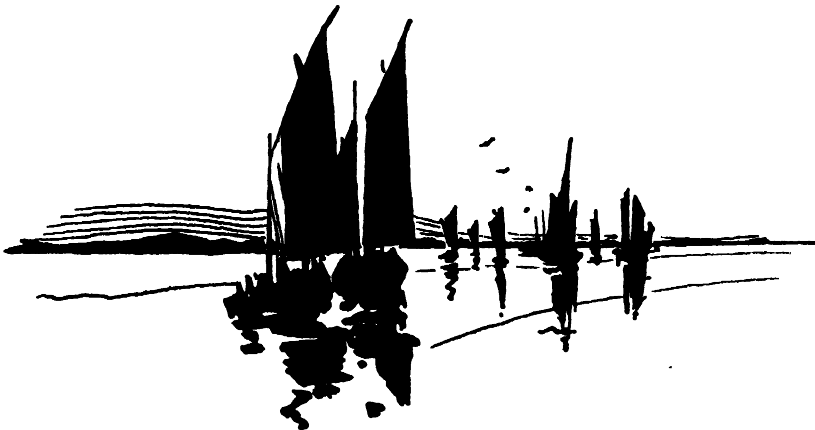
ফলতঃ বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া কোনও ফল আছে বলিয়া আমি আদৌ অনুভব করিতেছি না। ফলই যদি থাকিত, তবে তৎকালপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন ঘোষের এ কালে কোনও পাত্তা পাওয়া যাইত না কি? প্রভাতে নিশীথে নিভৃতে এত চিন্তা করিয়া, প্রেত বা জীবিত আত্মার পিছনে এত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, ব্যাকরণ-বন্দিতা সাধ্বী বাণীর চরণ-পদ্মে এত এত অর্ঘ্য ঢালিয়া 'বিদ্যাসাগর' বর

পাইয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন,—মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি, কিছুই হয় নাই। বিদ্যাসাগর বলিতে ঘোষকে কে চেনে ? ঈশ্বরচন্দ্র ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহই যেন বিদ্যাসাগর হইতেই পারে না। বিদ্যার এমন সফল আরাধনাতেও যদি এই গতি, তবে এ জগতে তুমি আমি কে !

এক উপায় আছে। পর-কার্য্যের সমালোচনায় চট করিয়া প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। হেঁজি-পেঁজির সমালোচনা করিয়াই আমরা অনেক সময়ে বন্ধু-মহলে খ্যাতি লাভ করিতে পারি। আর বড়দের সমালোচনায় তো কোন কথাই থাকিতে পারে না। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্। বড়র সমালোচনাতেই তাহার হস্তক্ষেপ বিধেয়। আমার এই সমালোচনার প্রসঙ্গ কিছুতেই হালকা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। কেন না, ইহার বিলাতী নজির আছে। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে এডিনবারোতে সাময়িক পত্রের কর্ত্তারা এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া একটা স্থায়ী নাম রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বন্ধু, তোমার সমালোচনার তীব্র বিষাক্ত তীক্ষ্ণ তীরের সম্মুখে ঐ দেখ সাতঙ্কে দাঁড়াইয়া আছেন—গান্ধী-সুভাষ-জহরলাল......লেনিন-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্-মুসোলিনী-হিট্‌লার......শ-রবি-কুড়ী-নোগুচী-নোবেল-পার্ল্‌বাক ! এবার পথিক ! তুমি পথ পাইয়াছ ? সে কি ! পাও নাই ?...সবুজ পর্ণ-স্তূপের শৌর্য্য ! একটি অশিথিল হাতে মাসিক কাগজের নিরবচ্ছিন্ন আটত্রিশ বৎসর !

হায়, হায়, তবে এই উত্তাপ-সন্তাপ-প্রতাপ-পরিতাপময়ী পৃথিবীতে তুমি আমি কে !

এস, এস, চলিয়া এস, এবার আমরা নিরুপায়ের সন্তান উপায়হীনেরা সাহিত্যের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের আসরে অবতীর্ণ হই। এ জগতে প্রেমই একমাত্র সার, প্রেমই একমাত্র সম্বল। প্রিয় আর প্রিয়া, কি মজা ! এখানে বলিবার উপায় নাই, তুমি আমি কে ! এখানে কেবলই তুমি আর আমি।





সম্পাদকীয়

নূতন তাজমহল

গত ১২ই আষাঢ় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা দেন। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দাসকে সমর্থন করিয়া বলেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া যে ভাবে তাড়াহুড়া করিয়া উভয় পরিষদে বিলটি পাস্ করাইয়া লওয়া হইতেছে তাহাতে যে বিলটি বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি-প্রসূত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ডঃ মুখার্জ্জি আরও বলেন, বাংলাই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রদেশ যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে দেশ শাসিত হইতেছে। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে বলেন যে তিনি যেন বিস্মৃত না হন যে তিনি কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নেতা নহেন, তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির নেতা, এবং ইহা মনে রাখিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সহজ কথাগুলি পরিষদ-গৃহে জমে নাই। যে কথাগুলি জমিয়াছে, তাহা খান বাহাদুর আবদুল করিমের মুখনিঃসৃত। তিনি উপমা প্রয়োগে কিরূপ পটু তাহা দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন, তাজমহলের প্রত্যেকটি রত্নের মতই এই বিলের প্রত্যেকটি ধারা অপরিবর্ত্তনীয়। 'সম্রাট-কবি' পরিকল্পিত তাজমহলের সহিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোঅ্যালিশন দলের নায়ক-কবি খান বাহাদুর আবদুল করিম, প্রধান মন্ত্রী পরিকল্পিত ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের তুলনা করিয়া তাজমহলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সম্রাট শাজাহান জীবিত থাকিলে হয়ত তিনি আজ নিজেকে নিজের কীর্ত্তির চেয়ে মহৎ মনে করিতে পারিতেন না। মহত্ত্বের প্রধান অংশ বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রীর প্রাপ্য।

ভারতবর্ষে বিমানবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন

আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদ এবং অভিশাপস্বরূপ এই বিমান বিষয়ক জ্ঞানলাভের কোনো ব্যাপক আয়োজন ভারতবর্ষে এতদিন ছিল না। সম্প্রতি এলাহাবাদে বিমান-বিদ্যা শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছে জানিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতেছে। অনেক দেশীয় রাজা, মন্ত্রী ও শিক্ষাব্রতী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বাংলা দেশ হইতে বর্দ্ধমানের মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজা প্রভৃতি এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য কামনা করিয়া পত্র দিয়াছেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নিম্নোক্ত শিক্ষা তালিকা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে :—বিমানচালনার ইতিহাস, বিভিন্ন ধরণের বিমানপোত উড্ডয়নের প্রণালী, গ্লাইডার ও এরোপ্লেনের নির্ম্মাণ প্রণালী, উড্ডয়নের মূলসূত্র, স্থায়িত্ব ও সামঞ্জস্য ও নিয়ন্ত্রণ, ধাতুর সম্প্রসারণ ও তাহাদের পরীক্ষা, নক্সা ও বিমানপোত নির্ম্মাণের চার্ট মানচিত্র ও মানচিত্র পাঠ, যন্ত্রপাতি, আবহাওয়ার অবস্থা, উড্ডয়ন ও অবতরণ,

কাঠ সম্পর্কে গবেষণা, বিমানবিদ্যা সম্পর্কিত ইঞ্জিনিয়ারিং, পদার্থবিদ্যা, গণিত।

পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালবিয় এলাহাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রাথমিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য আরও একমাস এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, আগামী ৪ মাসের মধ্যেই প্রথম ছাত্রদলের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। প্রথম দলে ৪০ জন ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। প্রথমেই বিদেশ হইতে তিনটি গ্লাইডার আমদানীর জন্য অর্ডার দেওয়া হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীদল ৪ মাসে তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিবে এবং তাহার পর তাহাদিগকে অন্যান্য কেন্দ্রে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিমান শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে তিন বৎসরের মধ্যে ২৫ হাজার যুবককে বিমানরক্ষীদলে কাজ করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলা যাইবে।

যে সমস্ত শিক্ষানবিশ বিমানবিদ্যাশিক্ষায় সাফল্য লাভ করিবে তাহাদের প্রত্যেককে লাইসেন্স দেওয়া হইবে।

স্মৃতি-বার্ষিকী

বর্ত্তমান মাসে কলিকাতায় অনেকগুলি স্মৃতি-বার্ষিকী সম্পন্ন হইল। বঙ্গগৌরব মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং পঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিং। মহৎ ব্যক্তির স্মৃতিপূজায় প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা নাই, তাই বাঙালী হইয়াও শিখগুরুর স্মৃতিপূজায় যোগ দেওয়া যেমন সম্ভব তেমনি হিন্দু হইয়া খ্রীষ্টান কবি মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজাতেও তাহার লেশমাত্র দ্বিধা নাই। যাঁহারা আপন প্রতিভাবলে তাঁহাদের সমসাময়িক দেশকালের মধ্যে নূতন কিছু সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারাই আমাদের পূজনীয়। গঠনমূলক কাজই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে—গঠনমূলক কাজ যাহা একটা জাতিকে জড়তা হইতে জাগায়—যাহার আলো নূতন পথের সন্ধান দেয়—তাহাই আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পদ হিসাবে গণ্য করিয়া থাকি। ইহাই আমাদের চলিবার পথের পাথেয় এবং শক্তি। কিন্তু বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িক অভিসম্পাতের দুর্নিবার স্রোতে পড়িয়া আমরা আমাদের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারি এরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অতঃপর হয়ত সম্প্রদায় হিসাব করিয়া মহত্ত্বের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে—হয়ত সূর্য্য কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত তাহার বিচার করিয়া সূর্য্যালোকের গুণগান করিতে হইবে।

জাতীয় আন্দোলনে নারীর কর্ত্তব্য

গত ২৪শে জুন চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে চন্দননগরের মহিলা-সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় মহিলাদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নারীর কর্ত্তব্য প্রায় সব দিকেই পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। কিন্তু সেই আমাদের দেশেও যে নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে নারী নিজেই আলোচনা করিবে এবং নিজের দায়িত্ববিষয়ে সচেতন হইবে ইহা বিংশ শতাব্দীতেও কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে পরিবর্ত্তনের মুখে নারী-স্বাতন্ত্র্যের প্রথম অবস্থায় এই কর্ত্তব্যের সীমা ঠিকমত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সকল পরিবর্ত্তনের বেলাতেই পরিবর্ত্তনকামীকে একটা অব্যবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হয়। তারপর কালক্রমে সেই অব্যবস্থা ব্যবস্থার সংহতি এবং সংযমের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। তাই নারী আজ তাহার স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলনকে জীবনের নানা দিকের কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জ্জনের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ভিতর ইহার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ নয়—শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও সেবা প্রভৃতি গঠন-মূলক কার্য্যের ব্যবস্থাও করা হইবে। অতঃপর ট্রেড ইউনিয়ন ও কংগ্রেসের অন্যতম মহিলা-নেত্রী শ্রীযুক্তা সুধা রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন

> যে দেশে যখন সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায় নিজেদের দাবী দাওয়াকে ভিত্তি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে, তখন দেশের মহিলাদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার আছে। নারীর সমস্যা আজ বহুবিধ।...মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের ক্রমে ক্রমে দেশের দীন দরিদ্র চাষী মজুরের মেয়েদিগকে নিজেদের আন্দোলনে টানিয়া

আনিতে হইবে। পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য এই অভিযান নয়, নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য এই চেষ্টা।...

"মন্দিরা"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, জ্ঞানগরিমায় সমৃদ্ধ হইয়া নারীশক্তিকে দাঁড়াইতে হইবে, তবেই জাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। জীবনের সকল দিকেই শক্তির প্রকাশ প্রয়োজন।

পুনরায় ট্রেন দুর্ঘটনা

গত ২৭শে জুন শেষ রাত্রি ২-৩০ মিনিটের সময় ৩৩নং আপ্ দিল্লী-দেরাদুন মিক্সড্ বর্ষায় ভাঙা বাঁধের মুখে আসিলে ৩খানি ওয়াগন ও ৩খানি বগী গাড়ি ইঞ্জিনসহ পড়িয়া যায়—ফলে প্রায় ১০ জন নিহত ও ২১ জন আহত হইয়াছে। ই. আই. আর এবং ই. বি. আর লাইনে পরপর অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটিল। ইহা দুঃখের বিষয়। দুর্ঘটনা যাহাতে কমে সেদিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কিন্তু একথাও ঠিক যে যে-কোন যন্ত্র—যাহাকে বাঁধা পথে বাঁধা নিয়মে চলিতে হইবে, তাহার পরিচালক হিসাবে মানুষ কখনই সেই যন্ত্রের মত বাঁধা পথে চলিতে পারে না। মানুষ যতই সতর্ক থাকুক সে কখনই নির্ভুল হইতে পারে না—ভুল সে করিবেই—সুতরাং দুর্ঘটনাও ঘটিবে। তদ্ভিন্ন দুর্ঘটনা কখন কোন্ পথে আসিবে তাহা পূর্ব্বাহ্নে অনুমান করা মানুষের পক্ষে এক রকম অসম্ভব। দুর্ঘটনার জন্য শুধু মানুষ দায়ী নহে, প্রকৃতিও দায়ী। মানুষ শত চেষ্টা করিলেও দুর্ঘটনার হাত হইতে বাঁচিতে পারিবে না—তবে সতর্ক হইলে দুর্ঘটনার সংখ্যা কিছু কমাইতে পারে বটে। সুতরাং আমরা যন্ত্রের কৃত্রিম পথে যতদিন চলিব ততদিন আকস্মিক মৃত্যুর জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আমাদের আর কিছুই করিবার নাই।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ও তাহার পর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর কলেজসমূহে দলে দলে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইতেছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিবার পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আর্টস্ বা সায়ান্স কলেজ। ছাত্রগণ আই. এ বা আই. এস সি পড়িবার উপযুক্ত যাহাতে হইতে পারে ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকা সেইভাবেই প্রস্তুত। তারপর বি. এ বা বি. এস সি ক্লাসে প্রবেশলাভ করিবার যোগ্যতা যাহাতে লাভ হয় আই. এ বা আই. এস সি ক্লাসের পাঠ্যতালিকা সেইভাবে প্রস্তুত। এই সব স্কুল বা কলেজ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের লোকের অর্থ শুভেচ্ছা এবং আত্মত্যাগের ফল। এই শিক্ষার আদর্শ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সহজ ব্যবস্থার বাহিরে আর কোনো বিভাগের শিক্ষালাভ সুলভ বা সহজ নহে। মেডিক্যাল, এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ক্ষেত্রও অতি সঙ্কীর্ণ। এই সব প্রতিষ্ঠানে দলে দলে ছাত্র ভর্ত্তি হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমানে অন্য কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও এমন নাই যেখানে ছাত্রেরা দলে দলে ভর্ত্তি হইতে পারে এবং দলে দলে পাস করিয়া কাজের উপযুক্ত হইতে পারে। সেদিক দিয়া বিচার করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু তবুও অনেকে কলেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক কথা তুলিয়া থাকেন। যে শিক্ষা সহস্র সহস্র ছাত্র লাভ করিতেছে—সেই শিক্ষার অকারণ ত্রুটি ধরায় কোনো লাভ হয় না। ইহাতে শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধার অভাব ঘটে। ফলে শিক্ষার সঙ্গে তাহার চিত্তের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশি হয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অকারণ নিন্দার আমরা বিরোধী। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যেটুকু শিক্ষাই লাভ হউক, তাহাই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন।

নারীরক্ষা সমিতি

গত ১৭ই জুন শনিবার ৬নং কলেজ স্কয়ারে নারীরক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সমিতির ইতিহাস উদ্দেশ্য ও কার্য্যধারার সঙ্গে দেশবাসী মাত্রেই পরিচিত। তাহা এই—

(১) প্রত্যেক জিলার প্রধান প্রধান স্থানসমূহে সমিতির কেন্দ্র স্থাপন; (২) সরকারী সহযোগিতায় নারীনিগ্রহের ঘটনাসমূহের বিবরণ সংগ্রহ; (৩) যেসমস্ত স্থানে নিরাশ্রয়দের নিগৃহীত হইবার আশঙ্কা আছে

তথায় রক্ষীদল নিয়োগ; (৪) বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে মহিলাদের জন্য ব্যায়াম-কেন্দ্র স্থাপন; (৫) অপহৃতা ও নিরুদ্দিষ্টা নারীদের উদ্ধারকল্পে লোক নিয়োগ এবং ঐ ব্যাপারে পুলিসকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা; (৬) প্রয়োজনবোধে লাঞ্ছিতাদিগকে অর্থ-সাহায্য ও তাহাদের মামলার ব্যাপারে সাহায্য; (৭) লাঞ্ছিতাদিগকে যাহাতে তাহাদের স্ব স্ব পরিবারে ফিরাইয়া লওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং তাহা সম্ভব না হইলে তাহাদিগকে আশ্রয়দান ও তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থাকরণ; (৮) এই ব্যাপারে জনসাধারণকে তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিতকরণ; (৯) এই জাতীয় অপরাধ নিবারণকল্পে কঠোরতর বিধান প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট দাবী পেশ।

সমিতির উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য আলোচ্য বর্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেকের এইরূপ ভ্রান্তধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, নারী-রক্ষা সমিতি একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। এই ধারণা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গত ১৯শে আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতা এলবার্ট হলে এক সভা হয়। তাহাতে বেশ কাজও হয় এবং সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, বাঙ্গলার লাঞ্ছিতা নিগৃহীতা নারীদিগকে জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সাহায্য করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। হাওড়া টাউন হলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আর একটি জনসভায়ও সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়। তথায় সমিতির অধীনে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

নারীরক্ষা সমিতির মত প্রতিষ্ঠান যে দেশের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা বর্ত্তমান সময়ে আরও বেশি করিয়া উপলব্ধি করা যাইতেছে। নারীহরণ এবং নারীর প্রতি অত্যাচার এক শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাংলা দেশে জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান আছে, আমাদের মতে সেই সব প্রতিষ্ঠানেরও অংশত নারীরক্ষা সমিতির কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। কেননা যে দেশে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই হীনতম বৃত্তি অসঙ্কোচে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে সে দেশের প্রধানতম সমস্যা হওয়া উচিত কি করিয়া ইহা সম্পূর্ণ বন্ধ হইতে পারে। দেশের সকল রকম আন্দোলনের মধ্যে এই আন্দোলনটিকেই তীব্রতম করিয়া তোলা উচিত, না হইলে কোনো আন্দোলনেরই সার্থকতা হইবে না।

ফিল্মের সাহায্যে ভারতবর্ষের অবমাননা

ভারতবর্ষকে জগতের চোখে হেয় প্রমাণ করিবার জন্য বিদেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক সিনেমা ছবি প্রস্তুত হইয়া নানা দেশে প্রদর্শিত হয়। এই জাতীয় ছবি যখনই ভারতবর্ষে আসে তখনই ভারতবর্ষে তাহা দেখান বন্ধ করা হউক এইরূপ আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু এইরূপ আন্দোলনের মধ্যে কোনো বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান কারণ, এরূপ ছবি ভারতবর্ষে দেখান বন্ধ হইলেও বিদেশে দেখান বন্ধ হইবে না। সুতরাং আন্দোলনের ফলে আমাদের সম্বন্ধে বিকৃত চিত্র আমরা দেখিতে পাইব না, বিদেশীরা দেখিবে। তাহা হইলে আমাদের কি লাভ হইল? বরঞ্চ ইহাতে আমাদের ক্ষতিই হইবে। আমাদেরই উহা দেখা উচিত। কিন্তু যদি বন্ধ করিতেই হয় তবে কোনো বিশেষ এক বা দুইখানা ছবি নয়, যে প্রতিষ্ঠান ঐ ছবি প্রস্তুত করিয়াছে সেই প্রতিষ্ঠানের কোনো ছবি যাহাতে এদেশে আসিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে তাহাদের কিছু শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে না। কারণ আমাদের দেশে বন্ধ হইলেও পৃথিবীর আর সকল দেশের লোকে তাহাদের ছবি দেখিবে। সিনেমা ছবিই হউক বা গ্রন্থই হউক (যেমন মাদার ইণ্ডিয়া) তাহাতে ভারতবর্ষের নিন্দা থাকিলে তাহা প্রধানত অভারতীয়ের জন্যই প্রস্তুত হয়, ভারতবাসীর জন্য হয় না। তবে এরূপ চিত্র বা গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষের নিকট হইতেও তাহারা অর্থলাভ করিবে ইহা স্পর্দ্ধা বটে। একমাত্র সেই দিক দিয়াই প্রতিবাদের সার্থকতা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতেও আমাদের সম্পূর্ণ কল্যাণ নাই। অথচ এই ধরনের প্রতিবাদই আমাদের দেশে এতদিন চলিতেছিল। সুখের বিষয় প্রতিবাদকারীগণ তাঁহাদের ভুল এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন।

সম্প্রতি ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি

শ্রীযুক্ত বাবুরাও প্যাটেল ইউরোপ এবং আমেরিকায় গিয়া যাহাতে ভারত-দূষণ কোনো ছবি প্রস্তুত না হয় সেইরূপ আন্দোলন চালাইতে মনস্থ করিয়াছেন। এইরূপ করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কারণ অনেক ছবি ভারতবাসীকে হেয় প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই যে প্রস্তুত হয় তাহা নাও হইতে পারে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতাও হয়ত ইহার কারণ। সুতরাং বিদেশে গিয়া জোর আন্দোলন চালাইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

নিউজীল্যাণ্ডে ডেকামেরন সমস্যা

ডেকামেরন গ্রন্থখানি অশ্লীল কিনা ইহা লইয়া সম্প্রতি নিউজীল্যাণ্ডে একটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। অকল্যাণ্ডের সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ডেকামেরন অশ্লীল নহে। নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক লণ্ডন বুক ক্লাবের হাওয়ার্ড কে. সাম্প্‌টার নামক জনৈক কর্ম্মকর্ত্তা ডেকামেরন রাখার অপরাধে নিউজীল্যাণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছে এই যে, কোনো গ্রন্থের কোনো অংশ বিশেষ অশ্লীল হইলেই সমগ্র গ্রন্থকে অশ্লীল বলা যায় না। অকল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ ডবলিউ এ. সিউয়েল বলিয়াছেন, ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে ডেকামেরনের মূল্য দ্বিবিধ প্রথম, রেনেসান্স যুগের একটি চিত্র হিসাবে; দ্বিতীয়, ইংরেজী সাহিত্যের উপর ইহার প্রভাব হিসাবে। ইহা আদি নভেল এবং ইহা চসার, শেক্সপীয়ার, কীট্‌স্ এবং টেনিসন প্রভৃতি কবিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ইহার রচনা বিশুদ্ধ আর্টের পর্য্যায়ে পড়ে। বিচারক এই প্রফেসরের সঙ্গে একমত হইয়া হাওয়ার্ড কে. সাম্প্‌টারকে মুক্তি দিয়াছেন।

নূতন দেশ নিউজীল্যাণ্ডে সাহিত্যের ট্র্যাডিশন এখনও গড়িয়া ওঠে নাই বলিয়াই হয়ত এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে!

ওম্ মণ্ডলী ও অনশন

গত কয়েক মাস ধরিয়া করাচীর ওম্ মণ্ডলী নামক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যেরূপ গুরুতর অভিযোগ শুনা গিয়াছে, তাহাতে উহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়া ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু একটি সংবাদে প্রকাশ যে উক্ত প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও উহার আপত্তিজনক কার্য্যকলাপ যথারীতি চলিতেছে। এবং প্রায় ২০ জন মেয়ে পুনরায় ওম্ নিবাসে ফিরিয়া আসিয়াছে। ওম্ মণ্ডলীর বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে সিন্ধু সরকারের অক্ষমতা কেন প্রকাশ পাইল তাহা বুঝা যায় না। আইনভঙ্গকারী প্রকাশ্যভাবে এবং নিরাপদে বসিয়া সর্ব্বসাধারণের আপত্তিজন কাজে লিপ্ত; এবং ইহারই প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস মীরচন্দনী গত ১লা জুলাই হইতে আমরণ অনশন অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রধান মন্ত্রী আল্লা বক্সকেও তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা জানান হইয়াছে। পরস্ত্রী এবং পরকন্যা লইয়া ধর্ম্মসাধনার কাজ এদেশে খুব সম্ভব বামাচারী তান্ত্রিক সাম্প্রদায়ের তিরোধানের পর আর কোন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এরূপভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু একটি মাত্র লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই সাধনা-কর্ম্মকে আইনের দ্বারাও ব্যর্থ করা সম্ভব হইতেছে না ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় ইহার জন্য প্রতিবাদকারীকে অনশনব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অনশনব্রত এদেশে আড়ম্বর করিয়া গ্রহণ করিতে হয় না, জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে অনশন এদেশের অধিকাংশ লোক আপনিই মানিয়া লইয়াছে, সুতরাং অনশনব্রত আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ নহে, ক্লীবত্বের লক্ষণ। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে দাদা লেখরাজকে পূর্ণোদরে কাবু করিবার মত লোকের অভাব, সে সম্প্রদায়ের কেহ অনশনের দ্বারা তাঁহাকে কাবু করিবে, ইহা দুরাশা ভিন্ন আর কিছু নহে।

কলিকাতার পথে বাস্

অনশনে যদি সত্যই উদ্দেশ্য সফল হয় তাহা হইলে কলিকাতার বাস্-চালককে সংযত করিবার জন্য কাহাকেও অনশনব্রত গ্রহণ করিতে হয়। দৈনিক পত্রে প্রায় প্রতিদিন বাস্-চালকের অশিষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা অভিযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরাও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার দাবী রাখি। যন্ত্রশক্তিকে যেমন শাসনে না রাখিলে উহা মানুষের অনিষ্ট করে বাস্-চালককেও তেমনি শাসনে রাখা প্রয়োজন। কারণ বাস্-চালক মানুষ নহে, তাহার চিন্তা-

শক্তি বা অনুভব-শক্তি নাই, সে দিবারাত্র বাস্ চালাইয়া যন্ত্রবৎ হইয়া পড়িয়াছে। অনাহারে বা অল্পাহারে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা করিয়া বিরামহীন ভাবে এবং সর্ব্বদা মাথা ঠিক রাখিয়া পথ চলিবার জন্য মস্তিষ্ককে সাধ্যের অতিরিক্ত খাটাইয়া তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং বাস্-চালকরূপ এই মনুষ্যযন্ত্রকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিতে হইবে। গত ২৯শে জুলাই কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে আট বৎসরের একটি স্কুলের ছাত্রী যে ভাবে বাস্-এর নীচে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে কেবল তাহা দেখিয়াই বাস্-চালনা বিষয়ে কিছু বলা চলে না, কেন না, উক্ত দুর্ঘটনা কাহার দোষে ঘটিয়াছে তাহা এখনও স্থির হয় নাই; কোনো বিশেষ দুর্ঘটনা দেখিয়া বাস্-চালনা সম্বন্ধে মন্তব্য না করিয়া বাস্-চালনার সাধারণ অনুসৃত রীতিকেই বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। কোনো শহরে এরূপ অসভ্য রীতি নিয়মিতভাবে অনুসৃত হইতে পারে ইহা কল্পনা করা যায় না।

শিক্ষার আদর্শঃ ছাত্রদের দাবী ও দায়িত্ব

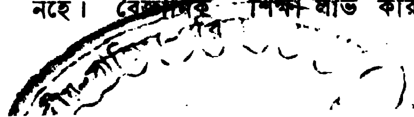
মানভূম জেলা ছাত্রসম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার তাঁহার অভিভাষণে অনেক সত্যভাষণ করিয়াছেন। এযুগে ছাত্রদেরও যে দাবী আছে, একথা আমাদের দেশেও পুরাতন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার দাবীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, এবং সেই জন্যই তাহার দায়িত্ব বোধও সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই। তাহার দাবীকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে নিজগুণেই দায়িত্ববোধসম্পন্ন হইতে বলা অযৌক্তিক। অভিভাষণের এক অংশের মূল বক্তব্য ইহাই। ইহা ভিন্ন শিক্ষানুষঙ্গিক বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে যাহা যেমন সময়োপযোগী তেমনি সুযুক্তিপূর্ণ। সভাপতি এক স্থানে বলিয়াছেন—

> একালের শিক্ষাবিজ্ঞান আজ আবিষ্কার করেছে যে, শিক্ষার পথ শাসন নয়; বরং এক দিকে দেহ-মনের উপর শাসনের ভার কমিয়ে তার সর্ব্ববিধ স্ফুরণের পথ সহজ করে তোলা, অন্যদিকে এইরূপ বাধামুক্ত মনকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐকত্রিক চেষ্টায় সংযুক্ত করে তার সামাজিক চেতনাকে মুক্ত করে দেওয়া। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি হয়েছে একেবারে আমলাতান্ত্রিক,—সেখানে শিক্ষক গুরুও নয়, মানুষও নয়,—মাইনে-করা এজুকেশনাল্ দারোগা, আর ছাত্র বেত্রচালিত জীব। কিন্তু ছাত্রদের খেলা-ধূলা, তাদের বিতর্ক আলোচনা, নানা আয়োজন অনুষ্ঠান, তাদের নিজেদেরকে চালাবার অধিকার দিলে ছাত্রদেরই শক্তিকে বিকাশ করে তোলবার সুযোগ দেওয়া হয়। ইয়ুরোপের অনেকখানে ছাত্রদের এসব শুধু অধিকার নয়, কর্ত্তব্য বলেই বিবেচিত হয়। আর রুশ দেশে এবং ইউরোপেরও কোথাও কোথাও ইস্কুল-পরিচালনায় ছাত্র-শিক্ষকের একযোগে পরামর্শ করার নিয়ম আছে।

ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা যে আধুনিক বিজ্ঞানবর্জ্জিত শিক্ষা এবং এ শিক্ষা যে পরিপূর্ণ নয়—সুতরাং আদর্শও নয়, এই কথাপ্রসঙ্গে সভাপতি বলিতেছেন—

> এ যুগের ছাত্র যে শিক্ষাদর্শ চায় তাতে অবৈজ্ঞানিকতার স্থান নেই, তা সর্ব্বরকমে প্রগতিবাদী ও বাস্তববাদী হওয়া বাঞ্ছনীয়, তার কাছে কংগ্রেসের আর্থিক প্ল্যানিং কমিটির এই উক্তিটিই সত্য—কল-কারখানার প্রসার ব্যতীত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে না…এই হিসাবেই ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা হবে শিক্ষাক্ষেত্রে তার মানসিক বিকাশের পক্ষে ও তার দৃষ্টি-প্রসারতার পক্ষে এক নতুন বাধা। সমাজ-বিকাশের যে স্তরে আমরা এসেছি তাতে যন্ত্রযুগের পত্তন এদেশে যুদ্ধশেষে সুরু হয়ে গেছে; আর দিনের পর দিন তার গতিবেগ এখন বেড়েই চলবে। আর তার ফলে আমরা মধ্যযুগের সঙ্কুচিত দৃষ্টি ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব বিসর্জ্জন দিয়ে এ যুগের তীব্র, উদ্দাম, উদ্যোগী জীবন-যাত্রার মধ্যে ক্রমশই অংশ গ্রহণ করতে অগ্রসর হব।

এই কথাটি সত্য। কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ শিক্ষা আদর্শ শিক্ষা, কোন্ শিক্ষায় কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা লাভ হয়, এবং কোন্ শিক্ষায় মানুষ হওয়া যায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া সেই শিক্ষায়



কলকারখানা চালান সম্ভব। কিন্তু ইহাতেও বেকার সমস্যা সমাধান হইবে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিলেও হইবে কিনা সন্দেহ। পল্লীর শিক্ষায় শহরে বাস করা অসম্ভব এবং শহরের উপযুক্ত শিক্ষায় পল্লীতে বাস করা অসম্ভব। শহর যদি রাখিতে হয় তাহা হইলে শিক্ষাকেও দুই ভাগে ভাগ করিতে হইবে। দেশের প্রয়োজন দেশের কলকারখানায় এবং কৃষিতে যদি মেটে তাহা হইলেও বেকার সমস্যা মিটিবে না। এক ধনসাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে কৃত্রিম অভাব কমাইয়া দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে জীবনযুদ্ধে অপটু লোককে জীবন-যুদ্ধে পটু করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সকলের মূলে রহিয়াছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। পৃথিবীর সকল দেশের পক্ষেই এই কথাটা সত্য।

জীবন বীমার নূতন আইন

গত ১লা জুলাই হইতে ১৯৩৮ সালের নূতন জীবনবীমা আইন চালু হইল। যে দেশে সকল পলিসিই প্রায় ল্যাপ্‌স্‌ড্‌ পলিসি, সে দেশে নূতন বীমা আইন প্রচলন হওয়াতে ল্যাপ্‌স্‌ড্‌ পলিসি হোল্ডারগণের অনুতাপ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু লাভ হইবে না। তবুও যাঁহাদের পলিসি দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে অদ্যাবধি চলিতেছে তাঁহাদের পক্ষে ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই। ভবিষ্যৎ বীমাকারীও পলিসি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বিনা সঙ্কোচে বীমা করিতে পারিবেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইল বীমার এজেণ্টদের। তাঁহাদের বন্ধুর পথ অপেক্ষাকৃত মসৃণ হইল। নূতন আইনগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি এইরূপ—

(১) ১৯৩৯ সালের ১লা জুলাই হইতে এক বৎসরের মধ্যে পলিসি হোল্ডারগণ নিজ নিজ কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের এক চতুর্থাংশ নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

(২) পলিসি হোল্ডারগণ যে কোন ব্যক্তিকে 'নমিনী' করিতে পারিবেন এবং কোন পলিসি হোল্ডারের পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে ঐ পলিসি হোল্ডারের টাকা উক্ত নমিনী পাইবে। ইহাতে অন্য কোনরূপ সাক্ষ্যাদির প্রয়োজন হইবে না।

(৩) যদি কোন পলিসি হোল্ডার সময়মত প্রীমিয়ামের টাকা দিতে না পারেন তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিন মাসের মধ্যে কোম্পানীকে উক্ত পলিসি হোল্ডারকে পলিসি সম্বন্ধীয় যাবতীয় নিয়মাদি জানাইতে হইবে।

(৪) যদি কোন পলিসি হোল্ডার তিন বৎসর যাবৎ নিয়মমত প্রীমিয়ামের টাকা দেওয়ার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে আর প্রীমিয়ামের টাকা দিতে না পারেন তাহা হইলে উক্ত পলিসি স্বাভাবিকভাবেই "পেড আপ পলিসিরূপে" গণ্য হইবে অথবা উহা বাতিল না হইয়া জমা থাকিবে।

(৫) প্রীমিয়ামের টাকায় কোনরূপ কমিশন গ্রহণ করা দণ্ডনীয়। উহাতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ-দণ্ড হইতে পারে।

এই নূতন জীবনবীমা আইন সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহের জন্য ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট একটি নূতন বিভাগ খুলিয়াছেন। যাঁহারা এই নূতন আইন সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানিতে চান তাঁহারা এখানে আসিয়া সমুদয় তথ্যাদি জানিতে পারিবেন।

জাতীয় পতাকা, বন্দে মাতরম্ ও মহাত্মা গান্ধী

গত ১লা জুলাইয়ের হরিজন পত্রে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, জাতীয় পতাকা নানাভাবে তাহার পূর্ব্ব গৌরব হারাইতে বসিয়াছে। ইহা এখন সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রতীক হিসাবেও ব্যবহৃত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার মত এই যে ইহা সাধারণ সভাসমিতি হইতে অপসারিত হউক এবং জনসাধারণ যে পর্য্যন্ত ইহার অভাব অনুভব না করিবে এবং ইহাকে স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিবার দাবী না করিবে সে পর্য্যন্ত যেন ইহা উত্তোলিত না হয়। কিন্তু যে সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী এই পতাকার আশ্রয়ে থাকিয়া বহু লাঞ্ছনা এবং আনন্দ-বেদনার স্মৃতির সহিত ইহাকে জড়িত করিয়াছেন তাঁহারা হয়ত বিনা কারণে ইহাকে পরিত্যাগ করিবেন না, সুতরাং গান্ধীজি প্রস্তাব করেন, মিশ্র জনমণ্ডলীর সম্মুখে জাতীয় পতাকায় কেহ আপত্তি করিলে উহা উত্তোলিত হওয়া

উচিত নহে। একজন সদস্য বিরোধিতা করিলেও পতাকা উত্তোলনের জন্য জেদ করা উচিত নহে। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত সম্বন্ধেও গান্ধীজি একই মত পোষণ করেন।

চালক মহাত্মা গান্ধী, চালিত-গাড়ির শব্দে চমকিত হইয়া সম্প্রতি পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছেন, যে গাড়িখানা তিনি চালনা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল সে গাড়ি নানা দিক দিয়া অচল হইয়া পড়িয়াছে। চাকা দুই একখানি পথে খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, যেগুলি আছে তাহা ঘুরিতেছে না, গাড়িখানা জীর্ণ, জোড়গুলি শিথিল হইয়া গিয়াছে, কখন ভাঙিয়া পড়ে! গাড়ির দিকে যতই মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে ততই তাঁহার মন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। হয়তো কবে স্বীকার করিবেন এ গাড়ি আর চলিবে না। কথাটা বহু পূর্ব্বেই তাঁহার বুঝা উচিত ছিল, এবং যখন বুঝিলেন তখনও তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করা উচিত ছিল। মনে প্রাণে সাধু হইয়া রাজনীতিক হওয়া যায় না তাহা মহাত্মাজি নিজের জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন। রাজনীতিতে বিরোধ চাই, সঙ্কীর্ণতা চাই, সত্য গোপন করা চাই, লোভী হওয়া চাই, তবেই রাজনীতি চলিতে পারে। দুইটি পরস্পরবিরোধী নীতিকে মিলাইতে গিয়া গান্ধীজি আজ বিপন্ন। তিনি নিজেই যদি এখন নিজেকে উদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলেই মঙ্গল—এবং সব দিকে।

সরকারী চাকুরিয়া ও বিবাহ

সংবাদপত্রে 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখা যায় পাত্রটি সরকারী চাকুরিয়া হইলে ভাল হয় কন্যাপক্ষের এইরূপ ইচ্ছা। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে সরকারী চাকুরিয়ার সংখ্যা যেরূপ হ্রাস হইতে চলিল তাহাতে প্রার্থিতরূপ পাত্র পাওয়া ক্রমশই ভার হইয়া উঠিবে। যাহারা সরকারী চাকুরিয়া তাহারা এই সুযোগে তাহাদের বিবাহ-মূল্য বাড়াইয়া দিতেও পারে এরূপ আশঙ্কা আছে। মনে হয় মুমূর্ষু পণপ্রথা এই উপলক্ষে আবার মাথা তুলিবার সুযোগ পাইল।

অন্ধজনে দেহ আলো

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় লালবিহারী শাহ কবির এই কথাটিকে জীবন দিয়া সার্থক করিয়াছেন। তিনি এদেশের চিরঅন্ধকার কোণে অনুকম্পার আলো জ্বালাইয়া গিয়াছেন। ডঃ হো যে দরদপূর্ণ হৃদয়ে অন্ধ বালিকা লরা ব্রিজম্যানকে অন্ধত্বের গ্লানি হইতে মুক্তি দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, স্নেহময়ী মিস্ আন্ সালিভান যে অসীম ধৈর্য্য ও ত্যাগ দ্বারা হেলেন কেলারকে বিশ্বের নিকট এবং বিশ্বকে হেলেন কেলারের নিকট পরিচিত করাইয়াছিলেন, লালবিহারীর অন্তরে অন্ধজনে আলো দিবার জন্য ঠিক সেই পরিমাণ স্নেহ মমতা এবং অনুকম্পাই ছিল। গত ১লা জুলাই এই মহৎ হৃদয়ের একাদশ মৃত্যু-স্মৃতি-বার্ষিকী সম্পন্ন হইয়াছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি মিঃ এ. সি. ব্যানার্জি যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

> রেভাঃ লালবিহারী শাহের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, স্বর্গীয় লালবিহারী যে একজন মধুর স্বভাবের ও দয়ার্দ্রহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহা যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। যেখানে নীতির প্রশ্ন উঠিত সেখানে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প ও একান্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। এক ভগবান ভিন্ন তিনি কাহাকেও ভয় করিতেন না এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী হইতেন না। দরিদ্র অন্ধদের সাহায্য ও আশ্রয় দান করিতে গিয়া তাঁহাকে কত দুর্ল্লঙ্ঘ্য অসুবিধার সম্মুখীনই না হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের উচ্চে ছিলেন; তাই সেই সমস্ত বাধাই তিনি অতিক্রম করিয়া তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে হইতেই লালবিহারী শাহ মহাশয়ের হৃদয় অসহায় ও একান্ত পরনির্ভরশীল অন্ধদের দুঃখে কাঁদিত। এই সব অন্ধ বালক-বালিকাদিগকে তিনি পরে নিজের বাড়ির সন্তানগণের মতই জ্ঞান করিতেন। এবং নিজের সংসারে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এমন দিনও গিয়াছে যখন লালবিহারীকে এই মহান ব্রত উদযাপনের জন্য নিজের পত্নীর গহনা পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভিতরকার দৈব অনুপ্রেরণা তাঁহাকে এই ব্রত উদযাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া তুলিয়াছিল।

সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মহৎ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। অন্ধ বালক বালিকাদের জন্য পরে বেহালায় একটি সুন্দর আধুনিক বিভিন্ন রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা-সম্বলিত একটি অন্ধ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার স্মৃতিকে চির-উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, বর্ত্তমান ইউরোপ ও ভারতবর্ষ

অধ্যাপক সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে পৌছিয়া ইউরোপের আসন্ন সঙ্কট সম্পর্কে এবং ইংলণ্ডে সম্পর্কে ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে "পৃথিবীতে যে কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে।" তিনি বলেন, "শান্তির জন্য আগ্রহ নয়, যুদ্ধের ভীতিই সহসা যুদ্ধে বাধা দিতেছে।"

কিন্তু তবু মনে হয় যুদ্ধ বাধিবেই। এবং বাধাই উচিত। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে আমাদের দেশে আমরা যে পরস্পর-ধ্বংসকারী কলহে মত্ত হইয়াছি তাহার অবসান ঘটিবার সম্ভাবনা। পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসের আয়োজন চলিতেছে, আমরা শুধু সেই দিকেই চাহিয়া আছি। ইউরোপের যুদ্ধ উপলক্ষে যদি ভারতবর্ষের উপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব বা পশ্চিম যে কোন দিকের আকাশ হইতে কিছু বোমা বর্ষিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষেব স্থায়ী কল্যাণ হইবে।

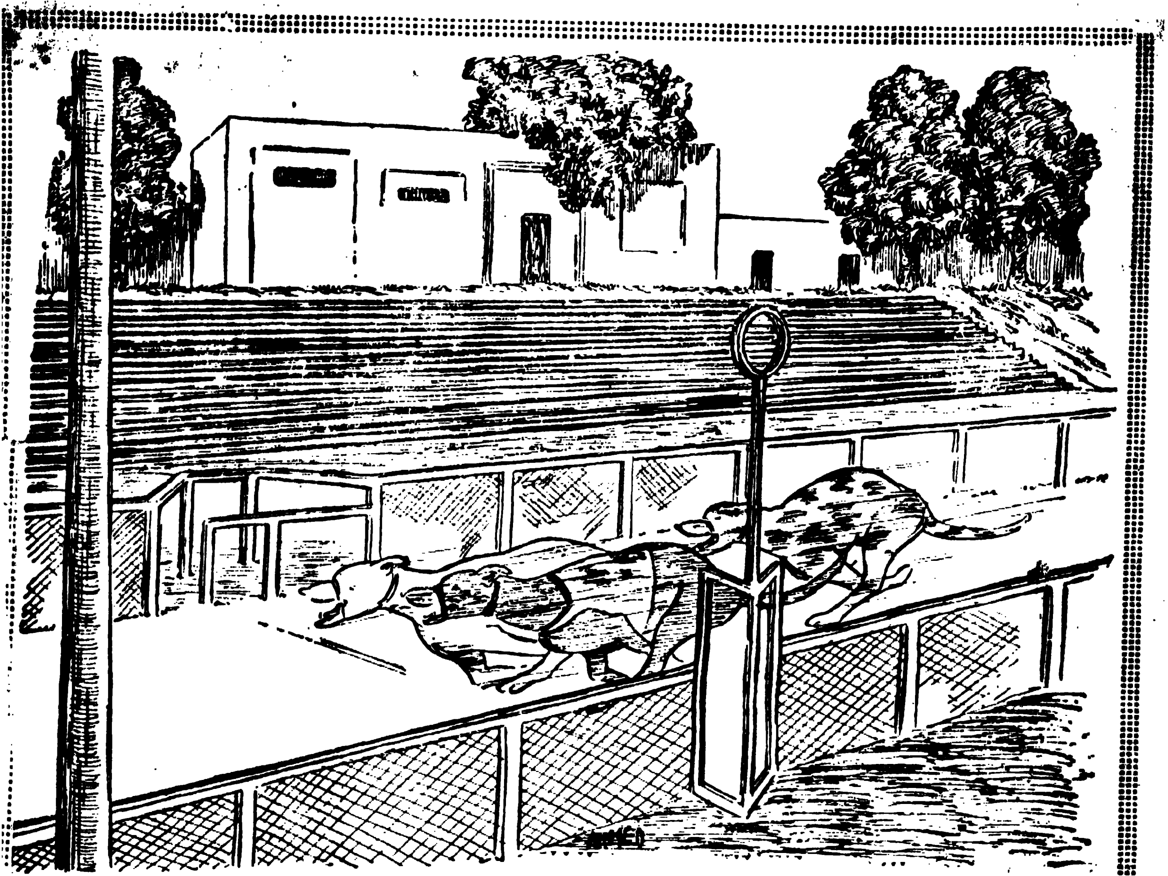
আমাদের প্রধান সমস্যা সাম্প্রদায়িক সমস্যা। সাম্প্রয়ায়িক কাড়াকাড়ির ফলে ভারতবাসী ক্রমশই হীন হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে প্রেরণা, যে মহৎ ভাবাবেগ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছিল বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। এখন শুধু হিংসা, কলহ, অবিশ্বাস, পরস্পরকে দোষী করা, পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলা—পরস্পরের মুণ্ডপাত করা ইহারই মধ্যে জাতীয় প্রাণ এবং সেই সঙ্গে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একটা সম্পূর্ণ জাতি যখন ছোটলোক হইয়া যায় তখন সে জাতির শীর্ষে বোমা বর্ষিত হওয়াই উচিত।

সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন—

"আমাদের অন্তর্দ্রোহের ফলে আমরা আমাদের শত্রুদের হাতের মুঠার মধ্যে চলিয়া যাইতেছি। অজ্ঞতার পরিণতি ধর্ম্মোন্মাদনা। শিক্ষিত শ্রেণী অশিক্ষিত শ্রেণীর সুযোগ লইয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ধর্ম্মগত বিরোধ নহে। সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক বিরোধ যে বেশী তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, উহার সহিত ধর্ম্মের কোনও সংশ্রব নাই। চাকুরী ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্যই সাম্প্রদায়িক বিরোধ। রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের মুখে যে গোলযোগ দেখা দেয়, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা। পরস্পরের প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের উদারতা ও সম্প্রীতির দ্বারা এই গোলযোগ দূর করা যাইতে পারে।"

কিন্তু আমরা ইহা বিশ্বাস করি না। কারণ উদারতা এবং সম্প্রীতি কাহারও মধ্যেই আর অবশিষ্ট নাই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৬।১ এলগিন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত



গ্রেহাউণ্ড রেসিং

দি ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত

আজকালকার সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য আমোদ।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিতে ভুলিবেন না — তাঁহারা আরও অধিক আনন্দ পাইবেন।

উত্তেজনাপূর্ণ উন্মাদনাকারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আনন্দ!

শ মুল্য	এনক্লোজার "এ"	১।০	স্পেশাল এনক্লোজার (বক্স)	৪৲
	" "বি"	॥৶০	ঐ মহিলাদের জন্য	২৲

-বেহালা (ডায়মণ্ডহারবার রোড)

ট্রাম ও বাস পাওয়া যায়।



নিউ থিয়েটার্সের

আর একটি আগামী

মনোহর কথা-চিত্র

জীবন-মরণ

ইহাতে অভিনয় করিতেছেন :—

লীলা দেশাই, সায়গাল, ভানু, ইন্দু মুখার্জ্জি,

অমর মল্লিক, নিভাননী, মনোরমা



পরিচালনা :

নীতীন বসু।

সুরশিল্পী :

পঙ্কজ মল্লিক।



টেলিফোন

টেলিগ্রাম

বি, সরকার এণ্ড সন্স

"গিনি হাউস"

B.S.

লিমিটেড

১৩১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের ব্রাঞ্চ দোকান নাই কিম্বা আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।
জগদ্ব্যাপী অর্থ সঙ্কট প্রযুক্ত আমাদের সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
যে কোন প্রকার পুরাতন সোনা বা রূপা বাজার দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া নূতন গহনা দেওয়া হয়।

'অলকা'র নূতন কার্য্যালয়

হিমালয় হাউস

১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ

কলিকাতা

ফোন—কলিকাতা ৬৩৫৫



বেশী দাম দিলেই

জিনিষ ভাল হয় না,

আমাদের নিকট ন্যায্য মূল্যে

সকল উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র পাইবেন

"বীণা অর্গান" হারমোনিয়ম, সেতার, বেহালা, এসরাজ, রেডিও, গ্রামোফোন, ইত্যাদি সব কিছুই।

দোকানে আসুন বা পত্র লিখুন।

এম, এল, সাহা লিঃ

৫/১ বর্দ্ধতলা ষ্ট্রীট

পি, সি, সাহা লিঃ

১৭০ বর্দ্ধতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

সস্তায় সকল রকম দেশী ও বিলাতি কাগজ

কোথায় পাওয়া যায়

জানেন কি ?



পত্র লিখুন বা ফোন করুন—

বসু ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪।২, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১২২ নং ঘর

ফোন : ক্যাল ২২৮০

ডাক্তাররা বলেন—

‘লিলি’

ব্র্যাণ্ড

বার্লি

ভারতে শ্রেষ্ঠ পানীয় খাদ্য



লিলি বার্লি প্রত্যহই কলিকাতায় প্রস্তুত হয়, সুতরাং ঋতুর প্রকোপ ইহার গুণ নষ্ট করিতে পারে না।

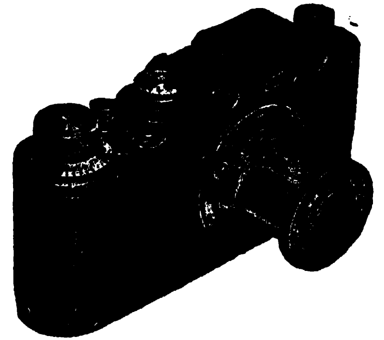
সেই কারণেই—

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য পথ্য ও পানীয়।

ক্যামেরা ?

- লাইকা
- রোলিফ্লেক্স
- বল্‌ডিনা
- ব্রিলিয়াণ্ট



ডেভেলপিং এবং প্রিণ্টিং

আমাদের নিকট

পরীক্ষা করিয়া দেখুন—

খুসী হইবেন।

ইত্যাদি সকল প্রকার ক্যামেরা

এবং

সর্ব্বপ্রকার ফিল্ম, প্লেট, পেপার,

ফোটো কেমিক্যাল ইত্যাদি

আমাদের দোকানে ন্যায্য মুল্যে সকল সময় পাইবেন।
একবার দোকানে আসুন কিম্বা তালিকার জন্য পত্র লিখুন ॥

ফোটোগ্রাফিক্ ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি কোং লিঃ

১৪৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ঃঃ ঃঃ কলিকাতা



GOVERNMENT PRODUCTS.

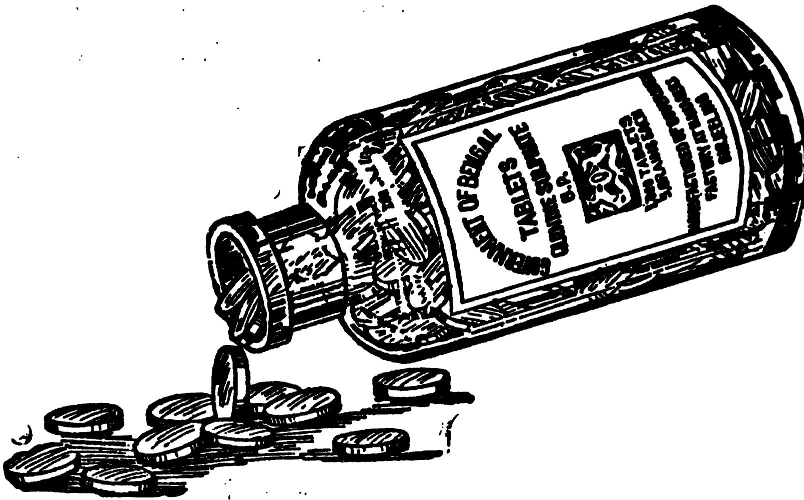
বাংলা গভর্ণমেণ্টের

কুইনাইন

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

সহর ও মফঃস্বলের সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।



জয়েণ্ট এজেণ্টস্—

শা, ওয়ালেস এণ্ড কোং

পোষ্ট বক্স নং ৭০, কলিকাতা

চৌধুরী এণ্ড কোং

৪ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"সাপুড়ে"

নিউ থিয়েটার্সের

নূতন চিত্র নিবেদন

বিচিত্র ঘটনাবহুল সাপুড়ে জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী! নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে উজ্জ্বল চিত্র

ভূমিকায়ঃ কানন, পাহাড়ী, মনোরঞ্জন, রতীন, মেনকা, কৃষ্ণচন্দ্র, ভুয়া, অহি সান্ন্যাল ইত্যাদি

পরিচালকঃ দেবকী বসু

"সাপুড়ে"

প্রথমারম্ভঃ ২৭শে মে, শনিবার

চিত্রা এবং নিউ সিনেমা

—ঃ চিত্র-পরিবেশক ঃ—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

১২৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রূপবাণীতে
মুক্তি প্রতীক্ষায়

ফিল্ম কর্পোরেশন
অব ইণ্ডিয়ার বাঙলা ছবি

রিক্তা
রিক্তা

পরিচালক : সুশীল মজুমদার
ভূমিকায় : ছায়া, অহীন্দ্র, রতীন্, তুলসী, দেববালা, মোহন, সত্য প্রভৃতি।

চিত্রা ও
নিউ সিনেমায়
মুক্তি-প্রতীক্ষায়

রজত—জয়ন্তী

নিউ থিয়েটার্সের
কৌতুকরস মধুর বাণীচিত্র—

হাসির তুফান!

পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া
ভূমিকায় : মেনকা, মলিনা, প্রমথেশ, পাহাড়ী, শৈলেন, ইন্দু, দীনেশ দাশ, পণ্ডিত শোর প্রভৃতি

রাধা ফিল্মসের আগতপ্রায়
পৌরাণিক চিত্রকাহিনী

বামনাবতার
পরিচালক : হরি ভঞ্জ

দ্রৌপদী
পরিচালক : অহীন্দ্র চৌধুরী

সাগর মুভিটোনের

কুঙ্কুম (লাইফ অব এ ড্যাঞ্জার)
শ্রেষ্ঠাংশে : সাধনা বোস
পরিচালক : মধু বোস

ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার

তটিনীর বিচার

সোল্-ডিষ্ট্রিবিউটার্স :
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

গ্রাম : রূপবাণী—ফোন : বি, বি, ১১৩
৭৬-৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষাণ্মাসিক দুইটাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষাণ্মাসিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষাণ্মাসিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	১	পৃষ্ঠা	প্রতিমাসে	২০৲
"	½	"	"	১১৲
"	¼	"	"	৬৲
কভার	৪র্থ	"	"	৬০৲
"	২য়	"	"	৫০৲
"	৩য়	"	"	৪৫৲

(বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

হিমালয় হাউস
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা
ফোন: কলিকাতা ৬৩২৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

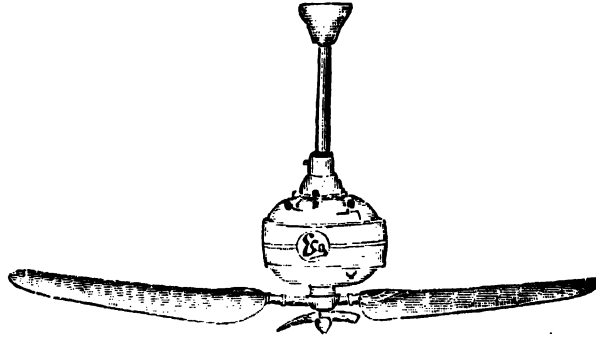
অলকা শ্রাবণ ১৩৪৬

সূচীপত্র

এ, সি
ডি, সি



সিলিং
টেবিল



—দুই বৎসর গ্যারাণ্টিযুক্ত—

কারেণ্ট খরচ কম — দামে সস্তা

বাতাস দেয় প্রচুর — কাজে মজবুত

দেখিতে সুন্দর—গঠনেও সুশ্রী

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও ব্যবহৃত

প্রস্তুতকারক ঃ—

দি এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড

অফিস ঃ
১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

টেলি— গ্রাম—"একোফ্যান্"
ফোন কলি: ৫৩০৮

কারখানা ও সার্ভিস ষ্টেশন
২৯৪।২।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
ফোন বি, বি, ৪৯১২

খোকা মাকেও ছাড়িয়ে উঠেছে!

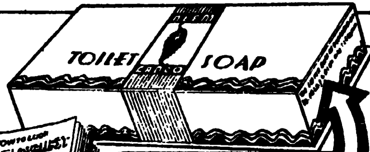


খোকা ধূলা-বালিতে গড়াগড়ি দেওয়া সত্ত্বেও ল্যাড্‌কোর নিম টয়লেট সাবান ব্যবহারে তাহার সৌন্দর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণ এই সাবানে নিমের বীজাণু-নাশক শক্তি বর্ত্তমান—

ল্যাড্‌কোর নিম টয়লেট সাবান

শুধু বীজাণু-নাশক নহে ইহা প্রসাধনের উৎকৃষ্টতম উপাদান সমন্বয়ে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল খোকা নয়, মায়ের পক্ষেও সাবানটি বিশেষ উপযোগী

গ্রীষ্মকালের প্রকৃষ্টতম সাবান





প্রসাধন, ব্যায়াম, মেক-আপ প্রভৃতি বিষয়ে সচিত্র ইংরাজী পুস্তকের জন্য এক আনা টিকিট পাঠান।

কুপন আঁটা চারিটি খালি বাক্সের বিনিময়ে এক বাক্স সাবান বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

দি লিষ্টার এণ্টিসেপ্টিক্‌স এণ্ড ড্রেসিংস কোং (১৯২৮) লিঃ
কাশীপুর কলিকাতা

"কপুরচাঁদ লিমিটেড"এর পরিবেশনায়

আগতপ্রায় কয়েকখানি বাণীচিত্র

রুক্মিণী

পুরাণের অদ্বিতীয় চরিত্র
বর্ত্তমানের অতুলনীয় চিত্র

পরিচালক ঃ
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ
পান্না, প্রতিমা দাশগুপ্তা, দেববালা, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু, জহর গাঙ্গুলী, রাধিকানন্দ, রতিন বন্দ্যো

দেবদত্ত ফিল্ম লিঃ

পথ ভুলে

হাসি-কান্নার নব রসায়ন
সামাজিক চিত্রের নূতন পরিকল্পনা

পরিচালক ঃ
ধীরেন গাঙ্গুলী

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ
প্রতিমা দাশগুপ্তা, পান্না, কুমারী মনিকা গাঙ্গুলী, সুলেখা চ্যাটার্জ্জী, ডি জি, রঞ্জিত রায়, সত্য মুখার্জ্জী

জীবন মরণ

এক হৃদয়গ্রাহী সামাজিক করুণ কাহিনী

পরিচালক ঃ
নীতিন বসু

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ
সায়গল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, লীলা দেশাই, ইন্দু, দেববালা, শৈলেন চৌধুরী

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

?

পরিচালক ঃ
হেমচন্দ্র

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ
কানন বালা
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

একমাত্র
—ঃ চিত্র পরিবেশক ঃ—

কপুরচাঁদ লিমিটেড

৩৯, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

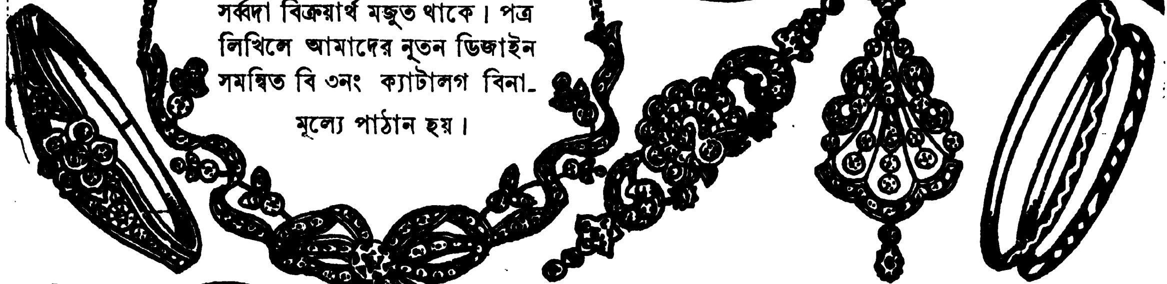
সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অফ লেট্

বি, সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা।

ফোন বড়বাজার ১৭৬১

নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পত্র লিখিলে আমাদের নূতন ডিজাইন সমন্বিত বি ৩নং ক্যাটালগ বিনা-মূল্যে পাঠান হয়।



টেলিগ্রাম ব্রিলিয়্যান্টস্

১২৪-১২৪/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট্

কলিকাতা

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

MEGAPHONE RECORDS

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

'সাপুড়ে'র শ্রেষ্ঠ গান দুটি

শ্রীমতী কানন দেবী

JNG 5380	কথা কইবে না বউ	'সাপুড়ে'
	আকাশে হেলান দিয়ে	ঐ

"রজত জয়ন্তী" চিত্রের অপূর্ব্ব সুন্দর গান দুটি শ্রীমতী মলিনা কর্ত্তৃক গীত হইয়া শীঘ্রই নিউ থিয়েটার্স মেগাফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হইবে



শ্রীমতী কানন

মেগাফোন কোম্পানী

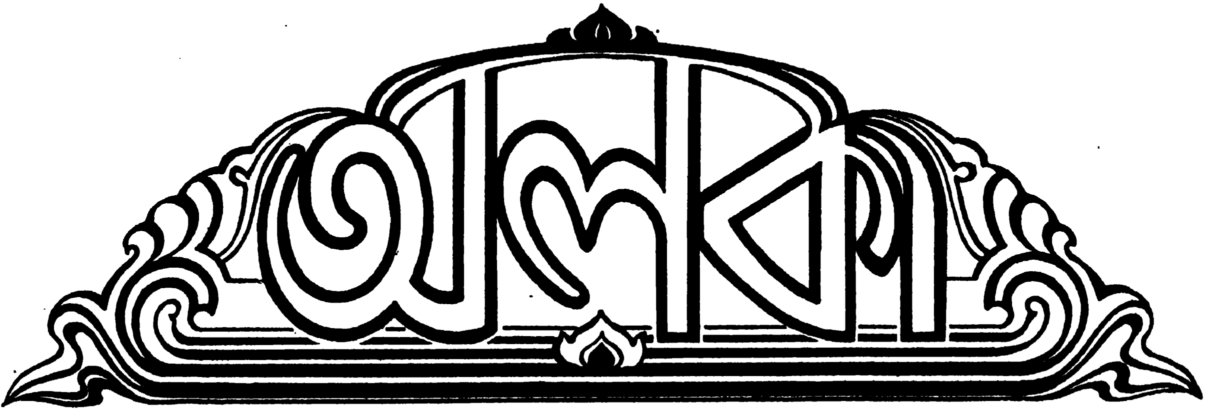


কলিকাতা



বধূ বরণ

শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী



প্রথম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪৬ | একাদশ সংখ্যা

ভারতীয় কৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

ভারতীয় জাতি ও ভাষা সমূহের তুলনামূলক আলোচনা হতে অতীতের অন্ধকারে যে ক্ষীণ আলোক রেখা পাত করা যায় তার সাহায্যে অনুমান করা চলে যে এ দেশের আদিম অধিবাসীরা ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায় এবং এদেশের জল বায়ু ও মাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত। তাদের কোন উন্নত ধর্ম্ম, সাহিত্য বা শিল্প ছিল বলে জানা যায় না, কিন্তু পঞ্চনদ হতে আরম্ভ করে গঙ্গানদীর মোহানা পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথই ছিল তাদের করতলগত।

কালক্রমে তাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ দ্রাবিড় জাতি বেলুচিস্তানের পথে বোলান গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উন্নত ধর্ম্ম ও শিল্পে তাদের অধিকার ছিল বটে কিন্তু আদিম অধিবাসীদের চাইতে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল বলেই তারা উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর না হয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তদেশ দিয়ে দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ বিস্তার করেছিল।

এই দুই জাতি যে ভারতীয় সভ্যতার সংগঠনে বহু উপাদান দিয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের কোন সাহিত্য বা শিল্পের নির্দ্দিষ্ট নিদর্শনের অভাবেই ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে আমরা তাদের প্রকৃত স্থান নির্দ্ধারণ করতে পারি নাই। সিন্ধু প্রদেশে মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় জাতির কীর্ত্তি। একথা কতদূর সত্য তা নির্ণয় করা যায় নি এবং প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ স্থান অধিকার করে তাও স্থির করা সম্ভব হয়নি। শুধু ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে এই দুই জাতির কথ্য ভাষার প্রভাব ধরা পড়ে। দাক্ষিণাত্যে যে চারটি দ্রাবিড় ভাষা আছে, তামিল, তেলেগু, মালায়লম্ ও কানারী, তাদের মধ্যে বহু পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব থাকলেও তারা তাদের দ্রাবিড় রূপ

হারায়নি। পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, হিমালয়ের নানা উপত্যকায়, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভারতের আদিম অধিবাসীদের প্রাচীন ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় এ সমস্ত জাতির অবদান থাকলেও সে সভ্যতা যে মূলতঃ আর্য্য সভ্যতা তাতে সন্দেহ নাই। ভারতীয় আর্য্য জাতি আর্য্য নামক একটি বিরাট জাতি গোষ্ঠীর শাখা মাত্র। এই মূল আর্য্যজাতি প্রথমে কোন্ দেশে বসবাস করত তা আমরা সঠিক জানি না। তবে গ্রীক, লাতিন, ইউরোপের অন্যান্য প্রাচীন ভাষা, ইরানী, শক প্রভৃতি ভাষা এই মূল আর্য্যভাষা হতে উদ্ভূত বলে মনে হয় যে এ জাতি বহু প্রাচীন কালেই নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তন্মধ্যে ভারতীয় শাখা খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল।

অবশ্য ভারতবর্ষ এ যুগে উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে যে দেশকে আফগানিস্তান বলি তার পূর্ব্বাংশ ছিল ভারতবর্ষের অন্তর্গত। আর্য্য জাতি ছিল নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত। এই সমস্ত শাখার ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল, সিন্ধু নদের পশ্চিমে যে সমস্ত আর্য্যেরা বাস করতেন তাদের নাম ছিল পক্থ, ভলান, অলিন, শিব, গন্ধারী ইত্যাদি। এ সমস্ত নাম সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। পক্থেরা খুব সম্ভব বর্ত্তমান যুগের পাঠান, ভলান নাম হতেই বোলান গিরিপথের বর্ত্তমান নামের উদ্ভব। গন্ধারী পেশোয়ার অঞ্চলের প্রাচীন নাম।

সিন্ধুনদের পূর্ব্বে পঞ্চনদে যে আর্য্যেরা বসবাস করতেন তাঁদের অনেকের নাম প্রাচীন সাহিত্য হতে পাওয়া যায়, যেমন ত্রিৎসু, ভরত, পুরু, কুরু, অনু, যদু, তুর্বশ ইত্যাদি। এই আর্য্যদের শক্তি ছিল অনেক বেশী এবং অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধ প্রণালী ছিল অনেক উন্নত। সেই কারণে তারা অতি সহজেই আদিম অধিবাসীদের হঠিয়ে দিয়ে প্রায় সমস্ত পঞ্জাব করতলগত করতে পেরেছিলেন। এই ভূমিভাগের পশ্চিমাংশ, অর্থাৎ সরস্বতী নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানের আর্য্যেরা ক্রমশঃ অধিকতর শক্তি সম্পন্ন হয়ে অন্যান্য আর্য্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করলেন। এবং অল্পকালের মধ্যেই একটি পরাক্রমশালী জাতিসংঘ গঠন করলেন। এই নূতন জাতির নাম কুরু। এই কুরুদের নাম হতেই সরস্বতী নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হল। বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত এই কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী নদী ভারতীয় সভ্যতায় যে প্রভাব বিস্তার করে আসছে তা হতে মনে হয় যে এ অঞ্চলের আর্য্যগণ এবং বিশেষতঃ কুরুবংশ এই আর্য্যসভ্যতার সংগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্য হতে আমরা জানতে পারি যে এই কুরুক্ষেত্রই ছিল ধর্ম্মক্ষেত্র, সরস্বতী নদীর তীরে যে সমস্ত যাগ যজ্ঞ হত প্রাচীন জগতে তার তুলনা ছিল না, সেখানকার ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সদাচার সম্পন্ন এবং সেই জন্যই কুরুক্ষেত্রের একটি বিশিষ্ট অংশের নাম ছিল ব্রহ্মাবর্ত্ত, উপরন্তু কুরুদের কথ্য ভাষা ছিল শিষ্ট ভাষা এবং সে যুগের সাহিত্যের প্রধান বাহন।

পূর্ব্বেই বলেছি যে আর্য্যেরা অনুমান খৃষ্টপূর্ব্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই সময় হতে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরে ইতিহাসের যে যুগ চলেছিল তাকে আমরা বৈদিক যুগ বলতে পারি। এ যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস অঙ্কন করবার

কোন উপাদান নাই বললেই চলে। তবে এ যুগের ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতির যথেষ্ট পরিচয় প্রাচীন সাহিত্য হতে পাওয়া যায়।

এ যুগের সাহিত্যকে আমরা সাধারণতঃ বৈদিক সাহিত্য বলি। বৈদিক সাহিত্য চার ভাগে ভাগ করা হয়, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখা হলেও বস্তুতঃ সেগুলি একই জাতীয় রচনা। অনেক সময় একই গ্রন্থের নানা অংশ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদের প্রধান কার্য্য ছিল যাগ যজ্ঞ, এই যাগ যজ্ঞের জন্য প্রধানতঃ চার শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রাহ্মণ। হোতা ছিলেন সর্ব্বপ্রধান, তিনি বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করে পথ প্রদর্শন করতেন, ও যজ্ঞের কার্য্য আরম্ভ করবার আদেশ দিতেন। উদ্গাতা সেই মন্ত্রগুলিকে স্বুর সংযোগে গান করতেন, অধ্বর্য্যু মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ করতেন এবং ব্রাহ্মণ যজ্ঞকে নানা উৎপাত হতে রক্ষা করতেন।

এই চার শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের হাতে ক্রমশঃ চতুর্ব্বেদ গড়ে উঠল। হোতার প্রয়োজনের জন্য ঋগ্বেদ, উদ্গাতার জন্য সামবেদ, অধ্বর্য্যুর জন্য যজুর্ব্বেদ এবং ব্রাহ্মণের জন্য অথর্ব্ববেদ। কিন্তু বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণ সমাজ একটি অখণ্ড সমাজ ছিল না, এবং আর্য্যগণ ক্রমশঃ সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যোগসূত্রও শিথিল হয়ে পড়েছিল। সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা নানা স্থানীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এই সম্প্রদায়গুলির নাম ছিল শাখা এবং এই শাখার সংখ্যাও ছিল বহু। প্রত্যেক শাখারই চতুর্ব্বেদ ছিল, এবং সে সমস্ত শাখার চতুর্ব্বেদ মূলতঃ এক হলেও তাদের মধ্যে বৈষম্যও ছিল অনেক।

অনেক শাখাই কালক্রমে তাদের বেদ সহ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটি প্রধান শাখার সংহিতা হতেই আমরা সর্ব্বপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় পাই। বর্ত্তমান কালে যে চতুর্ব্বেদ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তা মোটামুটি হচ্ছে শাকল শাখার ঋগ্বেদ সংহিতা, কৌমুদীশাখার সামবেদ, তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী শাখার যজুর্ব্বেদ, এবং শৌনক শাখার অথর্ব্ববেদ। এই চতুর্ব্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সংহিতাই প্রধান, কারণ অন্য বেদগুলি হয় এর অনুকরণ না হয় সঙ্কলন।

ঋগ্বেদে ১১০টি মন্ত্র আছে। এক একটি মন্ত্র কতকগুলি ঋক্ বা শ্লোকের সমষ্টি। এই ঋক্গুলি ছন্দে রচিত, সেই কারণে বেদের আর একনাম ছান্দস। ছন্দ নানা রকমের, ত্রিষ্টুপ, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, জগতী ইত্যাদি। গায়ত্রী মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দে রচিত। এই সব মন্ত্রের রচয়িতাদের ঋষি আখ্যা দেওয়া হত। ঋগ্বেদে আমরা বহু ঋষির নাম পাই, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কান্ব, অত্রি, দীর্ঘতমা ইত্যাদি।

এই সকল ঋষিদের আমরা বর্ত্তমানকালে মন্ত্ররচয়িতা বলি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যাঁদের আস্থা ছিল বা আছে তাঁরা তাঁদের মন্ত্রদ্রষ্টা বলেন। মন্ত্র তাঁদের চিত্তাকাশে উদ্ভাসিত হত, সেই কারণে তাঁরা ছিলেন দ্রষ্টা মাত্র, কর্ত্তা নয়। সেইজন্য বেদের আর এক নাম আগম, আগম হচ্ছে সেই সত্যবাণী যা দেবতাদের মুখনিসৃত, মানুষের রচনা নয়। সেই কারণেই বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে।

সে যাহোক্, ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় নি। প্রাচীন হলেও এ গ্রন্থ কোন আদিম সভ্যতার নিদর্শন নয়। যে সব ঋষিরা এ সব মন্ত্র রচনা করেছিলেন তাঁদের ছন্দ, ভাষা ও

ধর্মে যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। অনেক মন্ত্রে প্রভূত কবিত্ব শক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ হতে এ কথা স্পষ্ট হবে। উষা হচ্ছেন বৈদিক ঋষিদের এক উপাস্য দেবতা। এই উষাকে যে ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তা আজও আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারে—

"শুভ্রবাস পরিহিতা যৌবন সম্পন্না দেবদুহিতা উষা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্যশালিনী হে সৌভাগ্যবতী উষা আজ আমাদের উপর তোমার আলোক বর্ষণ কর। আকাশের পথ উদ্ভাসিত করে দেবী অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন করেছেন। অরুণাভ অশ্বে আগমন করে দেবী সমস্ত জীবজগতকে আবার সচেতন করেছেন। তিনি তাদের উপর কত না কৃপা বর্ষণ করেছেন, নিজের উজ্জ্বল আভা হতে কত না কিরণ বর্ষণ করেছেন, কত অসংখ্য প্রভাত চলে গেছে, কিন্তু উষা প্রতিদিনই তাঁর প্রথম সৌন্দর্য্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ওগো তোমরা ওঠ, আমরা পুনরায় প্রাণ ফিরিয়ে পেয়েছি। অন্ধকার বিগত হয়েছে, নূতন আলোকরশ্মি দেখা দিয়েছে, উষা সূর্য্যের পথ প্রস্তুত করেছেন, আমরা পুনরায় সেই স্থানে পৌঁছেছি যেখানে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।"

আমরা এ মন্ত্রকে উষার সৌন্দর্য্য বর্ণনা মনে করলেও তা বৈদিক ঋষির মনে অন্যভাবের উন্মেষ করত। বৈদিক যুগে ঋষিরা দৌস্‌পিতর্‌, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, উষা প্রভৃতি দেবতাকে উপাসনা করতেন। বর্ত্তমান যুগের হিন্দুদের মত তাঁরা সে সব দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়ে ফুল, ফল, নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করতেন না। মন্ত্রপূত করে যজ্ঞের বেদী নির্মাণ করতেন, আর সেই বেদীর নির্দ্দিষ্টস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করে সেই অগ্নিতে ঘি, সোমরস প্রভৃতি আহুতি দিয়ে দেবতাদের উপস্থিত হবার জন্য আবাহন করতেন। তাঁদের চোখে অগ্নিই ছিল পৃথিবীতে দেবতাদের একমাত্র প্রতিনিধি, সেই কারণে তাঁরা এই অগ্নিকে অবলম্বন করে দেবতাদের নিমন্ত্রণ করতেন। এইরূপে যখন তাঁরা দেবতার সান্নিধ্য লাভ করতেন তখন পৃথিবীতে যে দৈবী শক্তির আবির্ভাব হত তার দ্বারা যাজক ব্রাহ্মণের, যজমানের এবং সমস্ত জগতের ইষ্ট সাধিত হত। দেবতার সান্নিধ্য লাভ করলে ঋষির মনে যে ভাবের উদয় হত সেই ভাবাবেশেই বৈদিক মন্ত্রের সৃষ্টি। সুতরাং বৈদিক যুগে ঋষিদের চোখে দেবতারা ছিলেন মানুষের আত্মীয়, এবং সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই তাঁদের পৃথিবীতে টেনে আনা সম্ভব ছিল। পরবর্ত্তীকালের হিন্দুদের চোখে সে সব দেবতা হলেন স্বর্গবাসী, সে দেবতাদের করুণা ভিক্ষা করা ছাড়া আর তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার সাহস ছিল না। বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড বোঝাবার জন্য ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদের উদ্ভব। কিন্তু এই ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচনা করতে গিয়ে বৈদিক ঋষিদের মধ্যে অনেকে এমন একটা পথে গিয়ে উপনীত হলেন যাকে বলা হয় জ্ঞান কাণ্ড। তাঁদের মতে যজ্ঞ শুধু বহির্যজ্ঞই নয়। অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করে সে বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা এবং দেবতাদের আহ্বান করাই একমাত্র যজ্ঞ নয়। অন্তর্যজ্ঞও আছে। অর্থাৎ মানুষের অন্তর দিয়েও এমন সাধনা সম্ভব যাতে দেবতাদের সেই সান্নিধ্যই লাভ করা যায়। এই অন্তর্যজ্ঞই হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান অঙ্গ।

এই নূতন পথে ঋষিরা বহুদূর গিয়ে পৌঁছলেন। প্রথমে নানা দেবতার মধ্যে একটি ঐক্যের সন্ধান পেলেন এবং সেই ঐক্য অবলম্বন করে তাঁরা ব্রহ্ম আবিষ্কার করলেন। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবাদই উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ তত্ত্বের সন্ধান ঋষিরা মন্ত্রের যুগেই পেয়েছিলেন। উপনিষদ

মূলতঃ ব্রহ্মবাদ হলেও তার মধ্যে অন্তর্যজ্ঞ ও বহির্যজ্ঞ এ দুয়েরই অনেক কথা আছে। উপরন্তু উপনিষদ ভাব ও ভাষায় এত চিত্তাকর্ষক যে তাকে অনেক স্থলে কাব্য বলা চলে।

উপনিষদই বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগ, সেইজন্য তার অন্য নাম বেদান্ত। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগ উপনিষদ হলেও আর এক শ্রেণীর রচনা আছে যা বৈদিগযুগের পরবর্ত্তী কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত। এই জাতীয় রচনাকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ছ'টি, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ।

'শিক্ষা'য় বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা করবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে মন্ত্রগুলি আবৃত্তি ও গান করা হত। সেই কারণে শব্দগুলিকে বিশেষ বিশেষ ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করতে হত এবং সে ঝোঁকের হিসাব রাখবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হত। কল্প নামক বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয় ছিল একাধিক সে জন্য এ বেদাঙ্গের বিশেষ বিশেষ শাখা ছিল—ধর্মসূত্র যার দ্বারা সমাজবন্ধন নিয়ন্ত্রিত হত এবং গৃহ্য সূত্র যার দ্বারা পারিবারিক আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হত, এ ছাড়া শ্রৌত সূত্রে যজ্ঞের নিয়মাবলী এবং শুল্বসূত্রে যজ্ঞের বেদীনির্মাণের হিসাব নিকাশ। এই শুল্বসূত্র জ্যামিতি বিশেষ এবং সে জ্যামিতি ইউক্লিডের জ্যামিতির চাইতে অনুন্নত বিজ্ঞান নয়। তৃতীয় বেদাঙ্গ "ব্যাকরণ", আর এই ব্যাকরণ বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ। বেদের ভাষা ছিল ভারতীয় আর্য্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষা, আর তা ছিল পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষা হতে পৃথক। নিরুক্তে বৈদিক শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ, ছন্দে ছন্দসম্বন্ধীয় আলোচনা এবং জ্যোতিষে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিচার করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ ছটি বেদাঙ্গ বৈদিকযুগের কৃষ্টির বিশ্বকোষ বা Encyclopædia বিশেষ।

এই সামান্য পরিচয় হতেই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বৈদিক যুগ ছিল ভারতীয় কৃষ্টির একটি প্রধান যুগ। পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় সভ্যতার যা কিছু নূতন সৃষ্টি তা এই বৈদিক কৃষ্টিকে অঙ্গীকার করে নিয়েছে। কোন যুগেই তাকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই।

বৈদিকযুগের সমাজের রূপ পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের মধ্যেই পাওয়া যায়। তবে সে যুগে নানাশ্রেণীর মধ্যে গণ্ডী অনতিক্রমণীয় ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণের নাম পাওয়া যায় বটে তবে বেদের মধ্যে সামাজিক যোগসূত্র ছিল অতি ঘনিষ্ঠ, ব্যবধান ছিল শুধু করণীয় কর্মে। যে সমস্ত আদিম অধিবাসী আর্য্যদের আনুগত্য স্বীকার করেছিল বৈদিক সমাজে তারাই ছিল খুব সম্ভব শূদ্র, কিন্তু নীচকর্ম্মরত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রপদবাচ্য হতেন।

এই আর্য্য সমাজে ক্ষত্রিয়ই ছিলেন রাজা হবার উপযুক্ত, কারণ তাঁর প্রধান বিদ্যা ছিল অস্ত্রশস্ত্র চালনা। কিন্তু পরামর্শের জন্য তাঁকে ব্রাহ্মণের এবং অর্থের জন্য বৈশ্যের প্রাধান্য স্বীকার করতে হত। বৈদিকযুগে সমস্ত আর্য্যদেশ এইরূপ কতগুলি রাজবংশের মধ্যে বিভক্ত ছিল তা পূর্ব্বেই বলেছি।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্ব্বেই আর্য্যেরা ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার করেন এবং কোশল, বিদেহ ও মগধ অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের বিহার প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। বিন্ধ্য অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানও তাঁরা হস্তগত করেছিলেন। সুতরাং খৃষ্ট

পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে, নূতন যুগের প্রারম্ভে, যখন ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তন ঘটল তখন আমরা একটি নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সন্ধান পেলাম।

সমস্ত উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চলে নানা ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, এ সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য বা জনপদের মধ্যে কোশল ও মগধ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মগধের রাজবংশের নাম ছিল শৈশু নাগ, কারণ সে বংশের প্রথম রাজা ছিলেন শিশু নাগ। বিম্বিসার, অজাতশত্রু সকলেই এই বংশের রাজা, তাঁরা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে রাজত্ব করেছিলেন। তখন মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহে। অজাতশত্রু রাজনৈতিক শক্তি প্রসারের জন্য পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পাটলিপুত্র শোণ এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল বলে রাজগৃহ অপেক্ষা অনেক বেশী সুরক্ষিত ছিল। অজাতশত্রু ক্রমশঃ নিজের রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করলেন এবং অচিরেই নিকটবর্ত্তী বৈশালী, কোশল প্রভৃতি জনপদ অধিকার করে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ-প্রদর্শক হলেন।

শৈশুনাগ বংশের পর নন্দ রাজবংশ মগধে রাজত্ব করেন এবং এই বংশের প্রধান রাজা মহাপদ্ম নন্দ মগধ রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত করেছিলেন, এবং অনেকে অনুমান করেন যে হয়ত সমস্ত উত্তরাপথই তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল। সে যাহোক্ এঁদের পরেই মৌর্য্যবংশের অভ্যুদয়। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে নন্দবংশের সঙ্গে মৌর্য্যদের সম্পর্ক ছিল, এবং মৌর্য্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত উত্তরাপথের এবং দক্ষিণাত্যেরও অনেকাংশের অধীশ্বর ছিলেন। এ হতে মনে হয় যে নন্দবংশীয় রাজারা এই বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম করে রেখে গিয়েছিলেন।

মৌর্য্যবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই ভারতীয় কৃষ্টি নানা বিভিন্ন ধারার সন্ধান পেয়েছিল। এই সমস্ত ধারা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল যাদের হাতে তারা ঠিক কোশল ও মগধের লোক না হলেও তার নিকটবর্ত্তী বৈশালী এবং কপিলাবস্তুর লোক। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন কপিলাবস্তু নগরে আর জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন বৈশালীতে। কিন্তু উভয়েই মগধ এবং কোশলেই প্রায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন।

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গেই বৈদিক যুগের পরিসমাপ্তি। তার কারণ, এ দুই ধর্ম প্রধানতঃ উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হতে উদ্ভূত হলেও নূতন সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিতে এমন একটি অনুপ্রেরণা দিয়েছিল যাতে নূতন লোকের প্রবর্ত্তন হতে পারে। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্টশতকে বর্ত্তমান ছিলেন। উভয়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মধ্যে ঐক্যও ছিল বহু পরিমাণে। বুদ্ধ এবং মহাবীর কেহই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিশ্বাস করতেন না, উভয়েই সংসার ত্যাগী ভিক্ষু ছিলেন, ভিক্ষুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি বিভাগ নাই। সেই কারণে বুদ্ধ এবং মহাবীর কেহই বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস করতেন না।

উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সারমর্ম হচ্ছে ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা। প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগৎ ও জীবের পেছনে কোন আত্যন্তিক সত্য নাই। জীব ও প্রকৃতি শুধু প্রতিভাস মাত্র, কল্পলোকের সৃষ্টি। আত্যন্তিক সত্য হচ্ছে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই জীবাত্মার একমাত্র অস্তিত্ব। বুদ্ধ ও অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রথম অংশ গ্রহণ করলেন অর্থাৎ তিনিও স্বীকার করলেন যে জীব ও জগৎ প্রতিভাস মাত্র। কল্পলোকের 'অনিত্য' বা অস্থায়ী রচনা বুদ্ধের ভাষায়, জীব ও জগৎ কতকগুলি সংস্কারের প্রবাহ মাত্র;

জগৎ অনিত্য বলেই দুঃখময়, সেই দুঃখ হতে নিষ্কৃতি লাভ করাই হচ্ছে চরম সত্য। সেই চরম সত্য হচ্ছে নির্বাণ।

মহাবীর জগৎকে সত্য বলেই মেনে নিলেন, উপনিষদের ভাষায় তিনি ব্রহ্ম এবং জগৎ উভয়কেই সত্য বলে স্বীকার করলেন, কিন্তু সংসারের দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি "অজীব" বা অব্রহ্ম পদার্থ মনকে কলুষিত করে সুতরাং তার প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে কৈবল্য লাভ করাই হচ্ছে তার মতে মানুষের প্রধান কাম্য। কঠিন তপস্যার দ্বারাই এ কৈবল্য বা কেবল জ্ঞান লাভ করা যায়।

এই দুই ধর্মকে অবলম্বন করে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যের নাম হল ত্রিপিটক কারণ তা সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামক তিনটি ভাগে বিভক্ত জৈনসাহিত্য আদি উপাঙ্গ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। এই উভয় ধর্মের গ্রন্থাবলীর মধ্যে, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, উপাখ্যান, কাব্য প্রভৃতি সমস্তই আছে। বৌদ্ধধর্ম খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক হতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। জৈনধর্ম কোন দিনই বৌদ্ধধর্মের মত বিপুল আকার ধারণ করে নাই, সে প্রভাবও বিস্তার করতে পারে নি।

পূর্বেই বলেছি যে মৌর্য্যবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বেই এই দুই ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই দুই ধর্মের প্রতিষ্ঠার সময় সাহিত্যের ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে। বৈদিক যুগ শেষ হবার পূর্বেই বৈদিক ভাষা সাধারণের অবোধ্য হয়ে পড়েছিল, এবং নানাপ্রদেশের কথ্য ভাষা প্রসার লাভ করেছিল। মথুরা অঞ্চলে যে কথ্য ভাষা ছিল তা কোশল ও মগধের ভাষা হতে পৃথক ছিল। বুদ্ধ এবং মহাবীর কোশল মগধের ভাষায় ধর্মপ্রচার করলেন, এবং তাঁদের ধর্মকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য রচিত হল তার বাহনও হল সেই কথ্য ভাষা।

বৈদিক ভাষা অবোধ্য হয়ে পড়বার জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নূতন ভাষার প্রয়োজন হল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র রচয়িতারা কথ্য ভাষা না নিয়ে যে সাধুভাষার প্রবর্তন করলেন তার নাম হল সংস্কৃত, আর এই ভাষার সাধুত্ব অটল রাখবার জন্য খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বা তার কিছু পূর্বেই পাণিনি তাঁর প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ রচনা করলেন। এই সংস্কৃত সাধুভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার ব্যবধান ছিল অনেক, কিন্তু তবুও সে ভাষা শিষ্ট সম্মত বলে পণ্ডিতদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমস্ত উত্তরাপথে ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থায় এই যুগে একটি বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছিল। প্রতি প্রদেশের অধিবাসীদের দৃষ্টি প্রসারতা লাভ করে যেমন একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনায় সহায়তা করছিল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতিতেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ মানুষের মন প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করে উঠে একটি ভারতীয় মনের সৃষ্টি করছিল।

এই সময়ে আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দর শাহ গ্রীস হতে পারস্য পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করে ভারতবর্ষের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হলেন। আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৭ সালে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করে আফগানিস্তানের অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে পঞ্জাবে উপনীত হন। বিতস্তা নদীর তীরে প্রাচীন পুরুবংশীয় রাজার সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ হয় তাতে পুরু পরাজিত হন এবং আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তার পর সিন্ধুপ্রদেশে নানা স্থান জয় করবার পর তিনি পারস্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আলেকজাণ্ডারের এই আক্রমণ ভারতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা, এ ঘটনা হতে এ কথা বোঝা যায় না যে গ্রীকরা ভারতীয় যোদ্ধাদের চাইতে বেশী বীর ছিলেন, কারণ মগধের রাজাদের সামরিক শক্তির গল্প শুনে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরা বিপাশা নদী অতিক্রম করে নাই। তবে এ ঘটনা এই কারণে স্মরণীয় যে গ্রীকযোদ্ধারা স্বদেশে ফিরে যাবার পর ভারতীয়েরা ভারতের বাইরে যে বিশাল জগৎ তার সংবাদ পেয়েছিল এবং সে জগতের সঙ্গে নানা ভাবে যোগ সূত্র স্থাপন করেছিল। ভারতবর্ষ জয় করাই যে আলেকণ্ডারের উদ্দেশ্য ছিল তা মনে করবার কোন কারণ নাই। তিনি ভারতীয় পণ্ডিতদের জ্ঞান গরিমার সংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সব সময়েই একদল গ্রীক পণ্ডিত থাকতেন বিদেশের জ্ঞান ভাণ্ডার হতে যথাসম্ভব উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য।

হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে বাহ্লীক প্রদেশে আলেকজাণ্ডার একটি গ্রীক উপনিবেশ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। এই উপনিবেশ ক্রমশঃ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয় এবং সে দেশের রাজারা ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে নাই। তারাও যেমন ভারতবর্ষের খবর বাইরে নিয়ে যেত, বাইরের সংবাদও তেমনি ভারতবর্ষে নিয়ে আসত। এই যোগাযোগের ফলে ভারতীয়দের দৃষ্টি অল্পকালের মধ্যেই প্রসারতা লাভ করে।

ইসারা

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

পাণ্ডু আকাশে ফুটেছে নীলের ভাষা,
সবুজ প্রাণের সাড়া পিঙ্গল মাঠে ;
এ কি বিস্মৃতি, কি আবেগ স্পন্দন
গুঞ্জন করে বিভল স্বপ্নাবেশে।

স্বপ্ন-আবেশ মুঞ্জরে কাছে দূরে :
কি যে পেতে চাই, কোথা যেতে চাই আজ ;
তন্দ্রার মতো কি কথার আনাগোনা—
তন্দ্রা-গহনে জাল বুনে বুনে চলা।

জাল বুনে চলে আবছা সে কোন সুর :
আবছা গোধূলি—নিবে-আসা হাসিমুখ ;
দিনের কিনারে আলো-আঁধারির খেলা,
অন্ধকারেতে রূপালী পাখীর মায়া।

রূপালী পাখীর অভিসার চলে মনে,
সেদিনের ডাক হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে :
বিস্মৃত স্মৃতি হাতছানি দিয়ে ডাকে,
নহে সে তো দূর—তবু যে দূরান্তর।

সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

অবশেষে সিন্ধবাদ তাহার অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী আরম্ভ করিল। সে বলিতে লাগিল যে আমি ও আমার ভাই হিন্দবাদ দুইখানি জাহাজ সাজাইয়া যাত্রা করিলাম। বসোরা নগর ত্যাগ করিয়া আমরা পারস্যোপসাগরে পড়িলাম, এবং ক্রমে আরব সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আরব সাগর দিয়া ক্রমাগত কয়েক দিন দক্ষিণ দিকে চলিবার পরে একটি নারিকেল কুঞ্জের মত সিংহল দ্বীপ চোখে পড়িল। সিংহল অতিক্রম করিয়া ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোত্তরে চলিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় একমাস চলিবার পরে হিন্দুস্থানের উপকূল দৃষ্ট হইল। আমি সর্ব্বদা নাবিকের কাছে বসিয়া থাকিতাম এবং কোন নূতন দেশ দেখা গেলেই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতাম। এইরূপ ভাবে জানিলাম যে পশ্চিমে উৎকল, কলিঙ্গ ও অঙ্গদেশ, আর পূর্ব্বে নাপ্পিভোজী ব্রহ্মদেশ—আর যে দেশে আমাদের জাহাজ চলিয়াছে, তাহা এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী রঙ্গদেশ। এরূপ অদ্ভুত নাম কখনো শুনি নাই; নাবিক বলিল—সে দেশের লোকেরা আরো অদ্ভুত! সে আরও বলিল যে ঐ দেশে গেলে লাভের সম্ভাবনা খুব বেশি কারণ তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য জানে না! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তবে তাহারা কি করে? সে বলিল তাহারা পত্নীচর্চ্চা ও প্রত্নচর্চ্চা করিয়া জীবন ধারণ করে। আমি এই দেশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

কয়েক দিন পরে আমাদের জাহাজ দুইখানি একটি বৃহৎ নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই দেশের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তীরে নামিয়া বুঝিলাম সত্যই এমন দেশে কখনো ইহার পূর্ব্বে আসি নাই।

আমরা সকলে অবাক্ হইয়া গেলাম, ইহারা কি মানুষ না অন্য কোন জাতীয় জীব! হিন্দবাদ ও আমি শহরে প্রবেশ করিলাম। এ দেশের অধিবাসীদের দেখিতে মানুষের মতই; হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মুখ মস্তক সবই আছে; মস্তিষ্ক আছে কিনা তাহা সব সময়ে মস্তক দেখিয়া বুঝা যায় না বলিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু ইহাদের গাত্র আগা গোড়া ভেড়ার চামড়া দিয়া আচ্ছাদিত; কাজেই একটা ভেড়া দুই পায়ে ভর দিয়া হাঁটিলে যেমন দেখিতে হয় ইহারও অনেকটা তেমনি।

আমি হিন্দবাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরে হিন্দা—ইহারা মানুষ না ভেড়া?

হিন্দা বলিল—বোধ হয় মানুষ, কিন্তু শীতের তীব্রতার জন্য ভেড়ার চামড়া গায়ে দিয়াছে। আমি বলিলাম—সে কি রে, গরমে আমরা ঘামিয়া মরিতেছি, শীত কোথায়?

ইহা শুনিয়া হিন্দা বলিল—তাও তো বটে!

সে আরও বলিল—উহাদের জিজ্ঞাসা করা যাক্ না!

তখন আমরা অগ্রসর হইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয় আপনারা কি মানুষ?

সে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিল এমন অপমান আমাদের এ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই! আমরা মানুষ নই!

আমরা নরম হইয়া বলিলাম যে আমরা বিদেশী মানুষ, কাজেই ভুল করিয়া ফেলিয়াছি।

সে খানিকটা শান্ত হইয়া বলিল আমরা মানুষ নই। তোমরা ঐ প্রশ্ন এ দেশের কাহাকেও করিও না—কারণ এ দেশের সব চেয়ে বড় গালি হইতেছে কাহাকেও মানুষ বলা। শুনিয়াছি এই রঙ্গদেশের বাহিরে যে ভূখণ্ড আছে তাহাতে একপ্রকার অসভ্য জীব বাস করে তাহাদেরই নাম মানুষ। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, সাহিত্য, সভ্যতা, রাজনীতি নামে কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহারা ঈশ্বর নামে এক উপদেবতায় বিশ্বাস করে; অন্যের স্ত্রীকে তাহারা সম্মান করে; পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করা তাহাদের মধ্যে নিন্দনীয়, এমন কি কোন বস্তু বলিয়া লইলেও তাহা আবার ফিরাইয়া দিতে হয়। আমরা ঐরূপ অসভ্য নই, আমাদের মধ্যে যাহারা গর্হিত আচরণ করে তাহাদের আমরা 'মানুষ' বলিয়া গালি দিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রগতিপন্থী শুনিয়াছি তাহারা অত্যন্ত গোপনে মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিয়া থাকে।

আমরা বিনীত ভাবে বলিলাম যে এতক্ষণে আমাদের বোধোদয় হইল, কিন্তু আপনাদের সম্যক্ ইতিহাস জানিতে বাসনা; কোথায় গেলে জানিতে পারিব?

সে বলিল এই পথ ধরিয়া সোজা চলিয়া প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকা দেখিতে পাইবে—উহা এ দেশের কেতাবখানা—সেখানে খোঁজ করিও, এ দেশের পুরাতত্ত্ব জানিতে পারিবে। আমরা দুই জনে কেতাবখানার উদ্দেশে চলিলাম।

২

কেতাবখানায় গিয়া রঙ্গদেশের ইতিহাস ঘাঁটিয়া যাহা উদ্ধার করিলাম, তাহা এইরূপ।

খৃষ্ট জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে হিন্দুস্থানে নবাগন্তুক জাতি সমূহ আশ্রয় স্থান অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একদল রঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া এক অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। প্রায় একমাস এই জটিল অরণ্যের গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরিয়া যখন তাহারা অনাহারে, অনিদ্রায়, পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে তাহারা একদল ভেড়ার সাক্ষাৎ পাইল। তখন তাহারা এই গড্ডালিকাকে অনুসরণ করিয়া সেই বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা মলয়জ শীতলা রঙ্গ ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেহেতু তাহারা ভেড়ার দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাণে বাঁচিল ও এমন স্বর্গতুল্য দেশে আসিয়া পৌঁছিল, সেইজন্য এই মেষপালের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ভেড়াগুলিকে মারিয়া নিজেরা সেই চর্ম্ম পরিধান করিল। (বাহুল্য হইলেও বলিয়া রাখি, ভেড়ার মাংস তাহারা নষ্ট করিল না, আহার করিয়া ফেলিল; রঙ্গদেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইহা প্রধান লক্ষণ।) তারপর হইতে এই মেষ চর্ম্ম আর কখনো তাহারা ছাড়ে নাই। ফলে হইল এই যে কালক্রমে, বহু সন্তান সন্ততি পরম্পরায় এই মেষ চর্ম্মকেই তাহারা নিজেদের চর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে লাগিল; তাহারা নিজেদের এক জাতীয় ভেটক (ভেড়া) ভাবিতে লাগিল; এক সময়ে যে

তাহারা মানুষ ছিল তাহা ভুলিয়াই গেল। এখন তাহাদের এই মেষ চর্ম্মের প্রতি এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠা যে কেহ তাহাদের মানুষ বলিলে বিষম অপমানিত বোধ করে। আমি হিন্দবাদকে বলিলাম, দেখ ইহারা মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

হিন্দবাদ বলিল—দাদা, এই মেষ চর্ম্ম অত্যন্ত মূল্যবান্, এবারকার বাণিজ্য যাত্রায় এই বস্তু সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হইবে। ইহাতে অত্যন্ত মূল্যবান্ পাদুকা হইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহা কিরূপে সম্ভব!

সে বলিল—চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? চল না চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্।

তখন আমরা পরামর্শ করিতে করিতে শহরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

(৩)

ক্রমে শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা উজীর, কেহ বা নাজির, কেহ বা কোটাল! একদিন তাহারা ধরিয়া বলিল, তোমাদের দেশের কথা আমাদিগকে বল।

একজন প্রশ্ন কহিল—আচ্ছা মানুষ কি রকম জীব? তাহারা কি তোমাদের মতই দ্বিপদ জীব না চতুষ্পদ?

আমি বলিলাম—মানুষ শৈশবে চতুষ্পদ, যৌবনে দ্বিপদ ও বার্দ্ধক্যে ত্রিপদ (লাঠি একখানা পা) বিশিষ্ট জীব। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ তাহাদের আদিপুরুষ ভেড়ার কৃপায় অতি সহজেই তাহারা চতুষ্পদ।

আর একজন প্রশ্ন করিল—শুনিয়াছি তাহারা সকলেই সমান, ইহা কিরূপে সম্ভব?

আমি বলিলাম কেন সম্ভব নয়? মানুষের মধ্যে কেহ বা গাড়ীতে চাপে, আর কেহ বা সেই গাড়ী চাপা পড়িয়া মরে। অসাম্য কোথায়?

পুনরায় প্রশ্ন হইল—সাম্য কাহাকে বলে?

উত্তর—ধনীর গাড়ীতে চাপা পড়িয়া মরিবার অধিকারকে সাম্য বলে।

তাহাদের মধ্যে একজন লেখক ছিল (লেখক মাত্রেই সাহিত্যিক) সে আমার উত্তর লিখিয়া লইতে লাগিল।)

প্রশ্ন—মৈত্রী কাহাকে বলে?

উত্তর—ধনীর বিলাসের জন্য দরিদ্রের খাজনা দিবার অধিকারের নাম মৈত্রী!

প্রশ্ন—স্বাধীনতা কি? কোন প্রসাধন দ্রব্যের নাম, না, মুদ্রা বিশেষের নাম?

উত্তর—(মনে মনে) মূর্খ, স্বর্গীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানো না। তাই তোমাদের এ দশা! (উচ্চস্বরে) রাজনীতিকদের খেয়ালে ও মূঢ়তায় পর রাজ্যের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়া উঠিলে, অকাতরে, নির্ব্বিচারে, অকারণে, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া মরিবার যে মৌলিক অধিকার তাহারই নাম স্বাধীনতা।

আমার উত্তর শুনিয়া তাহারা মাঝে মাঝে কড়ি-মধ্যমে ব্যা-ব্যা (মানব ভাষায় বাঃ বাঃ) করিতে লাগিল।

প্রশ্ন :—সত্য কি ?

উত্তর :—সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন :—সংবাদ পত্র কি ?

উত্তর :—মূর্খ যাহার লেখক, ধূর্ত্ত যাহার সম্পাদক, গুণ্ডা যাহার প্রকাশক, শঠ যাহার স্বত্বাধিকারী, রাত্রে যাহা বিছানার চাদর, দিনে যাহা সংগ্রামের ধ্বজা (কপিধ্বজ) ; চুল ছাঁটিবার সময়ে যাহা জামা, ভাত খাইবার সময়ে যাহা টেবিল ক্লথ, বিজ্ঞাপনের দ্বারা যাহা যৌন তত্ত্ব শিক্ষা দেয়, মিথ্যা যাহার বারো আনা এবং ভুল যাহার চার আনা তাহাই সংবাদ পত্র।

প্রশ্ন :—কবিতা কে ? অবশ্যই কোন বারাঙ্গনার নাম ? তাহার বয়স কত ?

উত্তর :—মানসিক কণ্ডুয়নের কাগজিক আত্ম-প্রকাশের নাম কবিতা।

প্রশ্ন :—তবে তাহার জন্য লোক এত পাগল কেন ?

উত্তর :—আমরা যে মানুষ।

প্রশ্ন :—মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে ?

উত্তর :—সংবাদ পত্র দিয়া জাগরণ ; আহারের কালে বাড়ীর শিশু, মহিলা ও দাস দাসীদের বঞ্চিত করিয়া শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি ভক্ষণ ; ব্যবসায়িক সততার নামে প্রবঞ্চনা, বিকালে খেলা, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি মহৎ প্রতিষ্ঠানে গমন, সেগুলি বন্ধ থাকিলে দেশের কাজ করিবার জন্য সভা সমিতিতে যোগদান, কিন্তু চাঁদার খাতা বাহির হইলেই পলায়ন এবং মহৎ সঙ্কল্প লইয়া নিদ্রাগমন ; সংক্ষেপে ইহাই মনুষ্যত্ব।

প্রশ্ন :—বিশ্বপ্রেম কি ?

উত্তরঃ—প্রতিবেশীর বিপদে সাহায্য না করিবার চিত্তাকর্ষী অজুহাত।

প্রশ্ন :—মিথ্যা কাহাকে বলে ?

উত্তর :—নিজের মুখে যাহা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা, এবং পরের মুখে যাহা শুনিলে ধিক্কার ও ঘৃণার ভাব মনে জাগ্রত করে—তাহাই মিথ্যা।

প্রশ্ন :—রাজনীতি কি ?

উত্তর :—রাত্রের ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য বাক্ ব্যায়াম। এই জন্যই অধিকাংশ রাজনৈতিক সভা সন্ধ্যাবেলা আহূত হয়।

প্রশ্ন :—ধর্ম্ম কি ?

উত্তর :—নৈশ-ব্যসনের ক্লান্তি দূর করিবার উপায় ; এইজন্য অধিকাংশ ধর্ম্ম-চর্চ্চা পূজা, সন্ধ্যা, আহ্নিক ও উপাসনার সময় প্রাতঃকাল।

আমার উত্তর শুনিয়া তাহারা এক বাক্যে বলিল—আহা আমরা যদি মানুষ হইতাম।

আমি বলিলাম—ইহাতেই এত উৎসাহ ! মনুষ্যত্বের দুটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কথা তো এখনো বলি নাই।

তাহারা বলিল—শীঘ্র বল।

আমি বলিলাম—সে দুটি গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ।

প্রশ্ন :—সে কি ?

উত্তর :—কোন পুরুষের গাঁঠে টাকাকড়ি আছে সন্দেহ করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে নিপুণ আঙ্গুলে তাহা খসাইয়া ফেলিয়া অর্থ সংগ্রহের নাম গ্রন্থিচ্ছেদ।

প্রশ্ন :—আর নীবীচ্ছেদ ?

উত্তর :—টাকাকড়ি না থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে (জ্ঞাতসারে হইলে অন্য নাম আছে) বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্র বিমোচনের নাম নীবীচ্ছেদ। এই দুইটি মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ। যে মনুষ্য জাতি এ দুটিতে অনভ্যস্ত অন্য সব জাতি তাহাকে অসভ্য, অমানুষ, সংস্কৃতিহীন, সেকেলে, প্রাচ্য ও পরাধীন বলিয়া থাকে।

তখন তাহারা এক যোগে বলিল – তুমি আমাদিগকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দাও, আমরা গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ করিতে শিখিব—মনুষ্যত্ব যে এত লোভনীয় জানিতাম না। এমন কি এক একবার তাহা মেষত্বের অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া মনে হইতেছে।

আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আমি গ্রন্থিচ্ছেদ শিখাইতে পারি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাদিগকে মেষ চর্ম্ম ছাড়িতে হইবে।

তাহারা শিহরিয়া উঠিল। সে কি কথা। আমরা রঙ্গিলা জাতি, আমাদের আদিপুরুষ মহা মেষ—এই মেষ চর্ম্মের জন্যই আমরা টিকিয়া আছি ; হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতির মধ্যে আমাদের যে বৈশিষ্ট্য তাহা এই মেষ চর্ম্ম প্রসূত, আমাদের মহাকবি জাতীয় সঙ্গীতে এই গণমনোভাবকে রূপ দিয়া গিয়াছেন—"মানুষ আমরা নহিতো, মেষ।" সেই চর্ম্ম পরিত্যাগ করিব ?

আমি বলিলাম তাহা হইলে গ্রন্থিচ্ছেদ শিখিতে পারিলে না। কারণ গ্রন্থিচ্ছেদ বিদ্যা বিশেষ ভাবে মানুষেরই বিদ্যা, মেষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

কি আশ্চর্য্য ! গ্রন্থিচ্ছেদের এমনই মহিমা যে তাহারা কিছুক্ষণ আলোচনার পরে এক দিনের জন্য মেষ চর্ম্ম ছাড়িতে স্বীকার করিল।

আমি বলিলাম—মানুষের সঙ্গে তোমাদের ঐক্য ঘনিষ্ঠ, কাজেই এক দিনেই তোমরা গ্রন্থিচ্ছেদ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহারা সুখী হইয়া মেষ চর্ম্ম ছাড়িতে গেল। আমি হিন্দবাদকে চোখ টিপিলাম, সে বলিল—তুমি ইহাদিগকে শিক্ষা দাও, ততক্ষণে আমি চর্ম্মগুলি জাহাজে তুলিয়া ফেলিব। শেষে আমার সঙ্কেত পাইলে তুমি গিয়া জাহাজে উঠিবে।

৪

কিছুক্ষণ পরে তাহারা মেষচর্ম্ম ছাড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল ; এখন আর তাহাদের মানুষ ছাড়া কিছু মনে করিবার উপায় নাই। তাহারা বলিল—কই আমাদের গ্রন্থিচ্ছেদ শিক্ষা দাও।

আমি বলিলাম মনে কর—খাজাঞ্চী সাহেবের গাঁঠে টাকা আছে, তুমি উজীর সাহেব, এমন ভাবে তাহা বাহির করিয়া লও, যেন সে বুঝিতে না পারে। (আমাদের দেশে খাজাঞ্চি সাহেব অন্যের গাঁঠ কাটে, তাহাকে মনে মনে জব্দ করিবার জন্য তাহার গাঁঠ কাটিতে বলিলাম।) উজীর সাহেব তাহার গাঁঠে হাত দিতেই খাজাঞ্চি ধরিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম—হইল না। ধরা পড়িলে চলিবে না। আবার চেষ্টা কর। উজীর সাহেব আবার চেষ্টা করিল। কখনো বা নাজির সাহেবকে বলিলাম যে তুমি কোটাল

সাহেবের গাঁঠ হইতে অজ্ঞাতসারে টাকা বাহির করিয়া লও! তাহারা গ্রন্থিচ্ছেদ শিখিয়া মানুষ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি তাহাদের উৎসাহিত করিয়া বলিলাম—যদিও তোমাদের হাত এখনো কাঁচা, বারংবার ধরা পড়িয়া যাইতেছ, কিন্তু অচিরে তোমরা সাফল্য লাভ করিবে। এই অল্পকালের মধ্যে তোমরা যে দক্ষতা লাভ করিয়াছ, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় বাহিরের প্রভেদ সত্বেও তোমরা মূলত মানুষ! প্রতিদিন তোমরা যদি এক প্রহর ধরিয়া এইরূপে মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিতে থাক—তবে একমাসের মধ্যেই গ্রন্থিচ্ছেদে, নীবীচ্ছেদে, বিশ্বাস ঘাতকতায়, কৃতঘ্নতায়, মিথ্যা ভাষণে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। তাহারা আমার আশ্বাস বাণীতে আনন্দিত হইয়া গ্রন্থিচ্ছেদের মহড়া দিতে লাগিল—এমন সময়ে হিন্দবাদের সঙ্কেত ধ্বনি বাজিয়া উঠিল—আমি তাহাদের অগোচরে পলাইয়া আসিয়া জাহাজে উঠিলাম, দেখিলাম হিন্দবাদ ভায়া কাজের লোক, বহু চর্ম্ম জাহাজে তুলিয়াছে। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

তাহারা আমাকে না দেখিতে পাইয়া প্রথমে চামড়াগুলির সন্ধান করিল; দেখিল চামড়া নাই; তখন তাহারা বুঝিল চামড়াগুলি অপহরণ করিয়া আমরা মনুষ্যত্বের একটা জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়াছি; তাহারা ছুটিয়া আসিয়া জাহাজ ঘাটায় দাঁড়াইল—কিন্তু জাহাজ তখন মাঝ নদীতে।

তাহারা ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ওগো, এ কি করিলে, শেষে আমাদের মানুষ করিয়া রাখিয়া গেলে—আমরা কি করিয়া রঙ্গদেশে মুখ দেখাইব। মেষ চর্ম্মই ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য, জগতে রঙ্গিলাজাতির বিশিষ্ট 'অবদান', তাহা গেলে আমাদের কি লাভ, তাহা গেলে মরিয়াও যে আমাদের সান্ত্বনা নাই। হায় হায় শেষে তোমার মিথ্যা বাক্যে ভুলিয়া আমরা মানুষ হইলাম!

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—দুঃখিত হইও না! তোমরা মানুষ হও নাই। বাহিরটা মানুষের মত হইলেই মানুষ হয় না—তাহা হইলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাকিত না। তোমরা চুরি জানো না, বাটপাড়ি জানো না, কাজেই তোমরা অর্থনীতি জানো না; তোমরা পরস্ত্রী হরণ জানো না, অন্যকে হনন করিতে জানো না, কাজেই রাজনীতি জানো না; তোমরা মনোভাব গোপন করিতে জানো না, মিত্রকে বিপদে ফেলিতে জানো না, কাজেই তোমরা ধর্ম্ম জানো না; তোমরা গাড়ী-চাপা দিয়া দরিদ্রকে মারো না—তোমাদের মধ্যে সাম্য কই! তোমরা দরিদ্রের গলা টিপিয়া শিশুর দুধের কড়ি অপহরণ করিতে পারো না, তোমাদের মধ্যে মৈত্রী কই! তোমরা অসহায়কে নিজেদের খেয়ালের জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কচুকাটা করিতে পাঠাও না, তোমাদের মধ্যে স্বাধীনতা কই! সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, বায়ু পিত্ত কফের মত মানব দেহকে সজীব করিয়া রাখে, তাহা না থাকায় তোমরা মানুষ কিরূপে! আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি তোমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই, তোমরা মানুষ নও, এবং কখনো হইতে পারিবে না। মানুষ যে কাহাকে বলে হাতে হাতে তাহার প্রমাণ তো পাইলে, কেমন কৌশলে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া চামড়াগুলি লইয়া পলাইলাম!

তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমাদের মহা কবি যে বলিয়া গিয়াছে—

মানুষ আমরা নহিতো, মেষ!

তাহার কি হইবে? লোকে বুঝিবে কেন? তাহারা আমাদের আকার দেখিয়া মানুষ বলিয়া ঠাহর করিয়া রাখিবে। আর আমাদের জাতীয় সঙ্গীতই বা কোন্ মুখে গাহিব।

আমি বলিলাম—জাতীয় সঙ্গীতের জন্য ভয় করিও না, কবি অত্যন্ত কৌশলে উহা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে দৈবক্রমে মানুষ হইলেও তোমরা উহা অনায়াসে গাহিতে পারো, কেবল ঐ ছত্রটির মধ্যে যে 'কমা' আছে, তাহাকে একটু ঠেলিয়া আগের দিকে বসাইয়া দাও, তখন ছত্রটি হইবে—

মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।

আমার এই পরম সান্ত্বনা বাক্যেও তাহারা শান্ত হইল না;—মেষ চর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া তাহারা ঐক্যতানে কাঁদিতে থাকিল। কিন্তু জলের কল্লোলে, বাতাসের নিঃস্বনে তাহা আর শ্রুতি গোচর হইতেছিল না। হিন্দবাদ আসিয়া বলিল—দাদা, এ যাত্রায় আমাদের বাণিজ্য ভালই হইল—এ সব চামড়া বেচিলে মোটা মুনাফা হইবে।



ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আমরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সঙ্গীতের দুইটি বিভিন্নমুখী ধারার সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হই,—এক ভারতীয় এবং দুই ইউরোপীয়। এই দুই ধারার মধ্যে বিভিন্নতা কোথায় তাহা বুঝাইতে গিয়া নানা জনে নানা কথা বলিয়াছেন। এই সব কথার মধ্যে যে কথাটি সর্ব্ববাদিসম্মত তাহা হইতেছে এই,—ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসমূহ একটির পর একটি ব্যবহৃত হয়, আর ইউরোপীয় সঙ্গীতে অধিকাংশ সময় দুই তিন বা ততোধিক স্বর একসঙ্গে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা এই দুইটি সঙ্গীতের শুধু ধ্বনিমূলক পার্থ্যক্যই বুঝিতে পারি। যাঁহারা স্বর চেনেন না বা স্বরের ব্যবহার কৌশল বুঝেন না তাঁহারা এই ব্যাখ্যার সাহায্যে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ একটীর পর একটী স্বর ব্যবহার শুধু যে ভারতীয় সঙ্গীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, অধিকাংশ প্রাচ্য সঙ্গীত পদ্ধতিতে, এমন কি প্রাচীন ইউরোপীয় সঙ্গীতেও আমরা এই প্রণালী দেখিতে পাই; কাজেই শুধু ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই দিক দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া ত চলেই না, এমন কি এভাবে বুঝাইতে গেলে এ সম্বন্ধে সবচেয়ে দরকারী কথাগুলিই হয়ত বাদ পড়িয়া যায়।

আমাদের মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীতের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে শুধু উপরোক্ত দুইটী ধারা নিয়া আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। আমাদের বিচার করিতে হইবে তিনটী বিষয়:—(১) বর্ত্তমান ইউরোপের স্বরসংবাদমূলক সঙ্গীত বা Harmonic Music, (২) প্রাচীন ইউরোপের স্বরপরম্পরামূলক সঙ্গীত বা Melodic Music এবং (৩) ভারতীয় সঙ্গীত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতীয় সঙ্গীত ও স্বরপরম্পরামূলক বা Melodic প্রাচীন ইউরোপের সঙ্গীত আলোচনা করিলেই ভারত-বহির্ভূত অন্যান্য দেশের স্বরপরম্পরায় গঠিত সঙ্গীতের একটা মোটামুটী ধারণা করিতে পারা যাইবে এবং তাহাদের সহিত ভারতীয় সঙ্গীতের পার্থক্য ধরা যাইবে। কারণ ভারতের বাহিরে, কি প্রাচীন ইউরোপে, কি অন্যান্য দেশে, সর্ব্বত্রই প্রায় একই ধরণের প্রেরণা সঙ্গীত কলার বিকাশ সাধনে সাহায্য করিয়াছে।

প্রথমে প্রাচীন ইউরোপের সঙ্গীত সম্বন্ধে দুই একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। প্রাচীন ইউরোপীয় সঙ্গীত বলিতে আমরা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সঙ্গীত বুঝি। গ্রীসেই প্রথমে নিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে সঙ্গীতের আলোচনা ও বিকাশ সাধিত হইয়াছিল; পরে রোম গ্রীসের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বয়ং তাহাতে আরও নূতনত্ব লাগাইবার চেষ্টা করে। এর ফলে তখনকার সঙ্গীতবিদদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় তাহাতে বিদ্যাহিসাবে সঙ্গীতে এত বেশী পরিমাণে জটিলতা ও সূক্ষ্ম হিসাবের আমদানি হইতে থাকে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় যাঁহাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে খুব উৎসাহী হইবার কথা তাঁহারাও ভয়ে ভয়ে আর সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে আসিতে সাহস করিতেন না। এইভাবে সঙ্গীত ক্রমে ক্রমে যখন দুর্ল্ভ এবং দুর্জ্জ্যেয় হইয়া পড়িল, তখন খ্রীষ্টান উপাসনা মন্দিরের আশ্রয়ে আবার সুলভ এবং সহজবোধ্য সঙ্গীত আত্মপ্রকাশ করিল। ক্রমে নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এই উপাসনা সঙ্গীত এবং তাহার সংস্পর্শে পুনরুজ্জীবিত সহজবোধ্য বৈঠকী সঙ্গীত সমাজের আদরে বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত ইউরোপের সঙ্গীত স্বরপরম্পরামূলকই ছিল। এই সময়ের পর হইতে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সঙ্গীতের ধারা ক্রমে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়া এখন একেবারে পরিণত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এই হইল দুই এক কথায় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ক্রম পরিবর্ত্তনের ইতিহাস। এই ইতিহাসের মোটামুটি তিনটি

যুগ পাওয়া যাইতেছে :—(১) খ্রীষ্টান উপাসনা সঙ্গীতের আমদানির পূর্ব্বেকার যুগ, (২) উপাসনা সঙ্গীতের যুগ ও (৩) ত্রয়োদয় শতাব্দীর পরের যুগ।

আমরা এই তিন যুগের ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের মিল অমিল সাধারণভাবে আলোচনা করিব।

প্রথম যুগের সঙ্গীতের ঠিক কি অবস্থা ছিল তাহার নির্ভরযোগ্য কোন লিখিত ইতিহাস নাই। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিলে এইটুকু বুঝা যায় যে শুধু শ্রোতার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তখনকার পাশ্চাত্য সঙ্গীত স্রষ্টারা সাতটি স্বরের সাহায্যে নানারকমের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই স্বর পরীক্ষার ফলে স্বরের অনেকগুলি করিয়া সূক্ষ্ম অংশের সন্ধানও তাঁহারা পাইয়াছিলেন। সূক্ষ্ম স্বরসমূহের আবিষ্কারে এবং সঙ্গীতে তাহাদের প্রয়োগব্যাপারে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সঙ্গীতবিদগণ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয়ও দিয়াছিলেন,—এ বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই এই কারণে অনেকে মনে করেন প্রথম যুগের ইউরোপীয় সঙ্গীত আর আমাদের সঙ্গীতে মূলতঃ কোন বিভিন্নতা ছিল না। গ্রীক সঙ্গীতের বিকাশে যাঁহাদের দান প্রসিদ্ধ তাঁহাদেরই একজন, পিথাগোরাস্ স্বয়ং নাকি ভারতে আসিয়া হিন্দুদর্শনের সঙ্গে হিন্দু সঙ্গীতও শিক্ষা করেন এবং স্বদেশে গিয়া ভারতবর্ষ হইতে আহরিত জ্ঞানের সাহায্যে বিখ্যাত Pythagorian Scaleএর প্রবর্ত্তন করেন ; ইহা প্রাচীন গ্রীক সঙ্গীতের ছয়টি বিশিষ্ট স্বরসপ্তকের একটি।

এই স্বর সপ্তকগুলি হইতেছে যে কোন স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর সাতটি স্বরের অবস্থিতি। এই সব স্বর সপ্তক রচনার উদ্দেশ্য হইল পরপর অবস্থিত স্বরগুলির মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান অর্থাৎ কোন্ স্বর অপেক্ষা কোন্ স্বর কতটা উচু বা নীচু তাহাই নির্দ্ধারণ। একটা হারমোনিয়ম যন্ত্রে যে কোন পর্দাকে এক এক বার সা ধরিয়া ক্রমে সা রে গা মা পা ধা নি সা বাজাইয়া গেলে এই ব্যবধানগুলি ধরা পড়ে। অনেক যন্ত্রের সাহায্যেই এই ধরণের বিভিন্ন স্বর সপ্তক বা scale নিয়া অতি সহজে পরীক্ষা করা যায়। কাজেই শুধু এরূপ একটা scale বা স্বর সপ্তক রচনার মধ্যেই পিথাগোরাসের মত মনীষীর ভারতীয় সঙ্গীত সাধনার ফল পর্য্যবসিত হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। হয়ত তিনি তাঁহার ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক জ্ঞানআরও অনেক বেশী প্রয়োজনীয় কাজে লাগাইয়াছিলেন, কিন্তু ইউরোপ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। ইউরোপ ঐ scale রচনার কাজটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছে এবং তাহা বড় হরফে ইতিহাসের পাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে কোন সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত পিথাগোরাসে এই আবিষ্কারে কেন মুগ্ধ হন না আর ইউরোপ কেন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারিলেই আমাদের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

প্রাচীন ইউরোপে বিভিন্ন সপ্তকের স্বরগুলিকে নানা ভাবে সাজাইয়া শুধু স্বরবৈচিত্র্যের সহায়তায় লোকের মনে আনন্দ যোগাইবার বন্দোবস্ত করা হইত। যিনি যত নূতন উপায়ে এই কাজ করিতে পারিতেন তিনি তত বড় সঙ্গীতস্রষ্টা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাহাতে কথার দাম বেশী ছিল না। কাব্যে যে সব রসের পরিবেশন করা হয়, সঙ্গীতেও স্বরবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া সেইসব রসই নিবেদন করা হইত। মানুষের আটপৌরে জীবনের সুখ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদিই ছিল সঙ্গীতের বিষয়বস্তু।

ইউরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে যখন দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল, তখন সঙ্গীত বিশেষভাবে প্রার্থনা সঙ্গীতে পরিণত হইল। এ সঙ্গীতে আমরা পাই স্বরবিন্যাসে জটিলতার পরিবর্ত্তে সহজ সরল গঠন প্রণালী এবং তার সঙ্গে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ বিষয়ক ভাব ও ভাষাসম্পদ। এই ধরণের সঙ্গীতকে ঠিক সঙ্গীত না বলিয়া সুরসংবলিত আবৃত্তি বলাই ঠিক। আমাদের দেশের কোন কোন ব্রহ্ম সঙ্গীত এই পর্য্যায়ে পড়িবার উপযুক্ত। কীর্ত্তনকেও কোন কোন হিসাবে আমরা এই পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি। কেহ কেহ বিবেচনা করেন আমাদের প্রাচীন বেদগান এই ধরণের জিনিষ,—আমরা পরে দেখাইব যে এ ধারণা ঠিক নহে।

বর্ত্তমান ইউরোপের সঙ্গীতে আমরা প্রাচীন ইউরোপের আদর্শকেই ভিন্নরূপে দেখিতে পাই। প্রথম যুগের

সঙ্গীতের যে স্বরূপের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি তাহার নাম absolute music। বর্ত্তমান ইউরোপেও ইহার যথেষ্ট সমাদর আছে। ইহাকে আমাদের ভাষায় মৌলিক সঙ্গীত বলিতে পারি। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার সঙ্গীত বর্ত্তমান ইউরোপে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার নাম programme music। সঙ্গীতকে যদি মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত অন্যতম ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে programme music কে আমরা কোন গল্পের বা ঘটনার সঙ্গীতানুবাদ বলিতে পারি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অপেরা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র ঘটনা-মূলক সঙ্গীত এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর সঙ্গীত এখনও আমাদের দেশে প্রায় অপরিচিত। এই কারণে ফিল্‌মে ও অন্যান্য অনুরূপ ক্ষেত্রে সঙ্গীত প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের দেশের সঙ্গীতস্রষ্টারা পাশ্চাত্যের সঙ্গীতস্রষ্টাদের তুলনায় অনেক পিছনে পড়িয়া আছেন।

আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের সঙ্গীতের এই অভাব আমাদের দৈন্যের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু এদেশের ও ওদেশের আদর্শ বিচার করিতে গেলে সে দৈন্যের কথা আর মনে পড়িবে না।

ভারতীয় সঙ্গীত মৌলিক সঙ্গীত, এবং তাহা রাগমূলক বা স্বরপরম্পরা মূলক। এই পর্য্যন্ত প্রাচীন ইউরোপের সঙ্গীতের সঙ্গে এর মিল আছে। কিন্তু প্রকাণ্ড অমিল রহিয়াছে আদর্শে। কোন প্রকারে স্বর যোজনার সাহায্যে শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করাই ভারতীয় সঙ্গীতের উদ্দেশ্য নহে; কাব্যের আদি করুণ বীরাদি রসের নিবেদনেও তাহা পর্য্যবসিত হইতে নারাজ। প্রাচীন আদর্শ অনেক পরিমাণে হারাইয়াও আমাদের সঙ্গীত যতটুকু বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে তাহারই সাহায্যে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, কাব্যের নয়টি রসের বাহিরে এমন একটা রসের সন্ধান আমাদের সঙ্গীতে পাওয়া যায়, যার কোন সংজ্ঞা দেওয়া চলে না, কোন বর্ণনা করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। উত্তমরূপে গীত কোন রাগ শুনিয়া আজ পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্নিহিত রসের পরিচয় কেহ দিতে পারেন নাই। যাঁহারা সে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতে শুধু করুণ এবং শান্ত রসের সন্ধান পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আর কিছু না পাইয়া ঠকিয়াছেন।

ভারতীয় সঙ্গীত ধ্যানমূলক। সকলেই জানেন আমাদের শাস্ত্রসম্মত রাগ রাগিণীগুলির ধ্যান এবং ধ্যানের অনুরূপ চিত্র আছে। লিখিত ধ্যানে আমরা রাগ রাগিণীর বর্ণনা পাই,—তার অর্থ এই নয় যে গীতের মধ্য দিয়া রাগ রাগিণীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিত্রগত রূপের বর্ণনা আপনা আপনি হইতে থাকিবে। চিত্রলিখিত রূপ ঠিক রাগের বা রাগিণীর রূপ নহে। কোন বিশেষ রাগ বা রাগিণীতে ভাবগত যে আদর্শ আছে এবং যে আদর্শকে ধ্বনির সাহায্যে ফুটাইবার চেষ্টা করা হয় সেই আদর্শকেই চিত্রকর তুলির সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিবার ফলে আমরা রাগ রাগিণীর চিত্র পাইয়াছি। চিত্র বা রূপ বর্ণনার পিছনে যে আদর্শ আছে তাহাই রাগ রাগিণীর আদর্শ।

একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মনে করুন ভৈরব একটি রাগ। এই রাগের ধ্যানে এবং চিত্রে আমরা শিবের বর্ণনা পাই। শিব আদর্শ যোগী, আদর্শ সন্ন্যাসী,—তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবটি কি চিত্রে কি ধ্যানে কি সঙ্গীতে কি নৃত্যে আজ পর্য্যন্ত কেহ সমগ্রভাবে ধরিতে পারেন নাই, ভবিষ্যতেও পারিবেন না। যিনি যে-ভাবেই চেষ্টা করুন না কেন, কোন চেষ্টাই সেই আদর্শে পৌছিবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না। বর্ণনায় জটা, ব্যাঘ্রচর্ম, ডমরু, সর্প, কুণ্ডল, বিভূতি সব কিছুই থাকিতে পারে, অথচ ইহাদের কোনটাই শিব নহে,—এই সব জিনিষ শিবের শিবত্বকে অত্যন্ত আংশিকরূপে বুঝাইবার পক্ষে সহায়ক মাত্র। শিবের শিবত্ব যদি সমগ্রভাবে বর্ণনার এবং বুঝাইবার যোগ্য হইত তবে আদর্শ হিসাবে শিবের কোন মূল্যই থাকিত না। কিন্তু সম্যকভাবে বুঝিবার এবং বুঝাইবার যোগ্য নহে বলিয়াই বৃদ্ধ শিব আজ পর্য্যন্ত চির নূতন আছেন এবং বোধ হয় চিরকালই থাকিবেন। অনুরূপ কারণে ভৈরব রাগ কখনো তার চির নবীনত্ব হারাইবে না একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

এই ধরণের জোর করিয়া বলিবার কোন বস্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নাই। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে হয়ত ভৈরব রাগের অন্য কোন নাম ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান ভৈরব রাগের গঠন যে অতি প্রাচীন ইহা প্রমাণ করা শক্ত নহে।

শত শত বৎসর পরেও আজ কাহারো কাছে ভৈরব রাগ পুরানো হয় নাই। কোন আসরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যদি এই একই রাগের গান চলে তাহা হইলেও কোন শ্রোতার সহিষ্ণুতা নষ্ট হইবে না। কিন্তু বেটোফেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিম্ফনিটিও যদি পর পর কয়েকবার শোনা যায় তবে ধৈর্য্য রক্ষা করা যাইবে কি না সন্দেহ। ইউরোপের লোক সাধারণ বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া নূতনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস পায় এবং তাহাতেই যথেষ্ট বাহবা পাইয়া থাকে; তবে সে নূতনত্ব টেকসই হয় না। এ সব নূতনত্ব অনেকটা বাজারের নিত্য নূতন জামাকাপড়ের ছাঁটকাটের নূতনত্বের মত রোজই গজাইতেছে আবার দুই দিন পরেই পুরানো হইয়া যাইতেছে।

সাধারণ বুদ্ধির সহায়তায় নিত্য নব সৃষ্টির বিরুদ্ধতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, বরং এরূপ সৃষ্টির নিন্দা না করিয়া আমরাও প্রশংসাই করিয়া থাকি। কিন্তু অন্ধভাবে এবং অতিমাত্রায় প্রশংসা করিতে গেলে অনেক সময় উন্নততর সৃষ্টি সমূহ তাহাদের প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে, ইহাই ভয়ের এবং দুঃখের কথা। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনেক অনুরাগীদের মুখেই শোনা যায় যে হিন্দু সঙ্গীতে মৌলিক সৃষ্টির চেষ্টাও নাই, স্থানও নাই, কারণ বাঁধাধরা রাগ রাগিণীর কাঠামোর মধ্যেই তাকে আবদ্ধ থাকিতে হয়। বস্তুতঃ যুগের পর যুগ ধরিয়া বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন রাস্তায় একই রাগ বা রাগিণীর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন; এই সব রাস্তার আবিষ্কারে যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে এবং এইসব শিল্পীরা শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার আসন লাভের উপযুক্ত, আর যে মনীষা এবং শিল্পবুদ্ধি সর্ব্বপ্রথম এইসব রাগ রাগিণীর আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে তাহার তুলনা ভারতের বাহিরে বোধ হয় নাই।

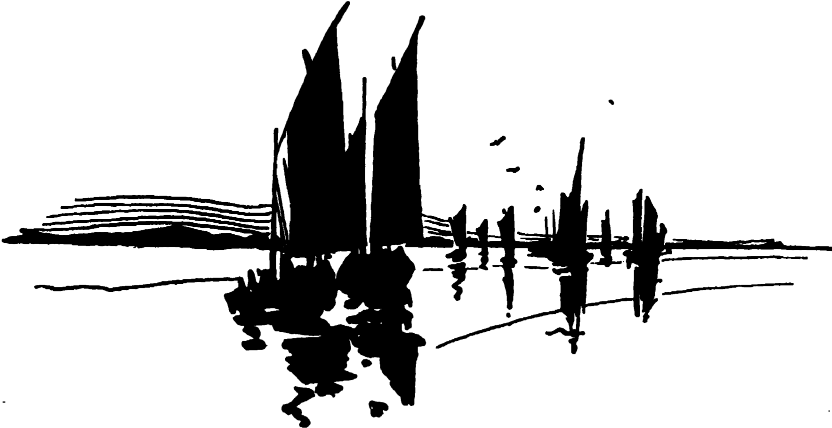
মোটকথা ভারতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টারা আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছাচারিতার আশ্রয় লইবার অধিকার পান নাই, অথচ কৃতিত্ব দেখাইবার অবসর পাইয়াছেন অনন্ত। আর ইউরোপের সঙ্গীতস্রষ্টাগণ কতকগুলি বাঁধাধরা ধ্বনিমূলক নক্সা বা প্যাটার্ণকে আদর্শ হিসাবে পাইয়াছেন এবং তাহারই ভিতরে নূতনত্ব বাহির করিতে গিয়া হয়রান হইয়া পড়িতেছেন। তাহাদের কেহ কেহ গণিতের সাহায্যে কেহবা বিজ্ঞান পরীক্ষাগৃহের আশ্রয়ে সঙ্গীত সৃষ্টির চেষ্টা দেখিতেছেন; ফলে ইতিমধ্যেই নিরাশ হইয়া কেহ কেহ ভাবিতেছেন প্রথম যুগের সঙ্গীতকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহারই উপর নূতনত্ব ফলাইবার চেষ্টা করিলে কেমন হয়?

ইউরোপের স্বরপরম্পরামূলক এবং স্বরসমবায়মূলক এই উভয়বিধ সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শগত যে বিভিন্নতার কথা বলা হইল তাহা ব্যবহারিক সঙ্গীতের সাহায্যে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝানো চলে এবং পারিভাষিক শব্দের প্রচুর ব্যবহারে লিখিয়াও কতকটা বুঝানো যায়; কিন্তু তাহা পাঠকদের অনেকের কাছেই দুর্ব্বোধ্য হইবে বলিয়া সে চেষ্টা এখানে করিলাম না। তবে ঘটাকাশের উপমায় জীবাত্মার স্বরূপ বুঝানোর মত দুই একটা কথা উল্লেখ করিলে আশা করি এখানে তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ধ্যানী বুদ্ধের ছবিতে বা মূর্ত্তিতে আমরা প্রায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক মাপ পাই না; প্রাচীন ভারতীয় চিত্রে দৈহিক গঠনের স্বাভাবিক অবস্থা প্রায় কোথাও নাই। মাপ জোকের বদলে ভাব এবং ভঙ্গি প্রকাশের দিকেই এই সব শিল্পের স্রষ্টারা মনোযোগ দিয়াছেন। প্রাচীন ইউরোপের অনুরূপ শিল্পে আমরা পাই দৈহিক এবং স্বাভাবিক পরিমাপ ইত্যাদি ঠিক ঠিক বজায় রাখিয়া তার উপর ভাব প্রকাশের চেষ্টা। ভাবপ্রকাশের অনুরোধে স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করার কথা সেখানকার শিল্পীরা চিন্তাও করিতে পারেন নাই।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই। স্বরপ্রয়োগের কৌশল লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরগুলি যেন যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অচল হইয়া বসিয়া আছে; আর আমাদের সঙ্গীতে আদর্শানুযায়ী সৃষ্টির অনুরোধে তাহারা একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিতে এমন কি অনেক সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানের আশে পাশে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেও রাজী। এই কারণে আমাদের সঙ্গীতের স্বরগুলির মধ্যে অনেক সমস্যা ঢুকিয়াছে। এই সব সমস্যাকে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ শ্রুতি ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব শ্রুতি আর প্রাচীন ইউরোপের সূক্ষ্মস্বর এক বস্তু নয়। আমাদের বেদগানেও আপাত দৃষ্টিতে সহজবোধ্য সপ্তস্বর এই সব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইত

বলিয়া, বেদগান মধ্যযুগের ইউরোপীয় উপাসনা সঙ্গীত অপেক্ষা অনেকগুণে বেশী দুরায়ত্ত এবং সঙ্গীতগুণ বিশিষ্ট ছিল।

যে সব কারণে ভারতীয় সঙ্গীতে এই ধরণের স্বর প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহাদের একটি হইতেছে আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা। দ্বিতীয় কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি। সকলেই জানেন, আমাদের সঙ্গীত প্রাতে এক রকম আবার সন্ধ্যায় অন্য রকম। এই ব্যাপার বোধ হয় আর কোন দেশে নাই। প্রায় একই ধরণের স্বর বিন্যাসকে শুধু স্বর প্রয়োগের কৌশল্যের বিভিন্নতায় বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী করিয়া তুলিবার উপায় এবং ব্যবস্থা ভারতীয় সঙ্গীতে আছে। এই দুইটী ছাড়া আর একটী মস্ত বড় কারণ আছে,—দুর্ভাগ্য ক্রমে সে কারণের কথা আজ কাল আমাদের সঙ্গীতজ্ঞদেরও অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন ;—সেটি হইতেছে, আমাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত শ্রোতার মনস্তুষ্টিবিধানের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল আত্মশুদ্ধির জন্য। যদিও শাস্ত্রে 'রাগঃ' শব্দের সংজ্ঞায় পাওয়া যায়, "রঞ্জকায় ইতি রাগ", তাহা হইলেও স্পষ্টভাবে বলা আছে "সঙ্গীতমাত্মশুদ্ধ্যর্থং ন তু রঞ্জকায়।" এখনো দেখিতে পাওয়া যায় যে-যন্ত্র ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী, সেই সারস্বত বীণার বাজনা শুধু বীণা বাদক নিজে যথাযথ শুনিতে পান, সামান্য দূরে উপবিষ্ট শ্রোতাকেও তাহা কানে চশমা লাগাইয়া শুনিতে হয়। 'রঞ্জকায় রাগঃ' ঠিক কথাই, কারণ যিনি গাহিবেন বা বাজাইবেন তিনি ঠিক ভাবে গাহিতে বা বাজাইতে পারিলে নিজের মনে রঙ ফলাইতে পারিবেন, আর তখন যদি শ্রোতা কাছে থাকেন তবে তিনিও আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই ; তবে অপরকে শোনানোটাই গায়ক বা বাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে না। আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনি গান বাজনা করেন তিনিই জানেন ও রকম গান বাজনা কত বেশী আনন্দ দায়ক হয়। তেমন গান বাজনা শোনা যদি কাহারো ভাগ্যে ঘটে তবে সেই শ্রোতাও অকুণ্ঠভাবে বলিতে বাধ্য হইবেন যে সে ধরণের আনন্দ তিনি আর কোথাও পান নাই।



প্রতিযোগিতা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুস্তফী

ইহাকেই বলে ভাগ্য! কারণ আমারই স্ত্রী কমলা নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে নিজের পায়ে বেড়ি বাঁধিয়া বসিল!

কেমন করিয়া তাহাই বলিতেছি।

আমাদের পাশের ঘরটি বহুদিন যাবৎ খালি পড়িয়া থাকার পর একঘর ভাড়াটিয়া আসিল। লোক খুবই কম—স্বামী আর স্ত্রী। তবে আমাদের মত নবীন নয়, কারণ একদা বিবাহের বছর দুই পর নাকি পাশের ঘরের ভদ্রলোকটির স্ত্রী সাত মাসের একটি মৃত শিশু প্রসব করে। তাহার পর দশটি বছর ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়াছে আর কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। ভদ্রলোক কোন এক কারখানায় কাজ করে—খুব ভোরেই বাহির হইয়া পড়ে, মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রাণধারণের জন্য কোন প্রকারে নাকেমুখে দুটি ডাল ভাত গুঁজিয়া পুনরায় চলিয়া যায়। রাত্রি এগারটা নাগাদ বাজার হাট করিয়া আসে দিবসের কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া। রবিবারে ছুটি। কিন্তু সেদিনও তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যই বাড়ীতে দেখা যায়। ভাবিয়াছিলাম হয়তো সারা সপ্তাহ খাটিয়া খাটিয়া ঐ দিনটি কোথাও বিশ্রাম লয়। কিন্তু পরে তাহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা অন্য প্রকার।

একদিন রাত্রে স্ত্রীকে কহিলাম, সঙ্গীটি কেমন হল কমল?

কমলা আমাকে ভাত দিতে দিতে কহিল, সাত জন্মের পাপ না করলে অমন সঙ্গী জোটে না।

আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, অর্থাৎ?

স্ত্রী কহিল, খালি ছুঁই ছুঁই।

—শুচিবায়ুগ্রস্ত বল।

—ও মা! সে কথা কি বলবার জো আছে? বলে তারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তা বলে শুচিবেয়ে নয়।

—বড়ই বিপদ তা হলে বল!

স্ত্রী ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, ইস্‌, বিপদ না আরও কিছু! উনি এসেছেন পরিষ্কার দেখাতে আমায়! ওঁর কাছে আমায় হাতে খড়ি দিয়ে শিখতে হবে, না?

কহিলাম, এমন পতন তোমার হয় নি নিশ্চয়।

স্ত্রী কহিল, দশবার কলের মাথা ধোয়া আর ডিঙ্গি মেরে মেরে চলাকেই পরিষ্কার বলে না। কথায় আছে 'আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত।'

কহিলাম, পরিষ্কার আমাদের কমলমণি, কি বল?

স্ত্রী এবারে শাসনের সুরে কহিল, ভাল হচ্ছে না বলছি। সব কথাতেই তোমার ইয়ারকি!... মা গো, হাত পায়ে হাজা থুক্ থুক্ করছে....চান, ক'রে ক'রে মাথার চুল উঠে গিয়ে একটি শিঁটকিতে

ঠেকেছে তাই কম্‌সে কম বিশবার ধোয়া চাই। পায়ের হাজা ঢাকবার জন্য তো দিন রাত আলতা লেপে আছে। হাজা আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে করে নখের ভিতর পর্য্যন্ত ধোয়া চাই, নইলে নাকি শুদ্ধ হওয়া যায় না! মাথার ওপরটায় টাক হয়ে গেছে। মাথায় থাক্ আমার পরিষ্কার।

কথার মাঝখানেই স্ত্রী হাত জোড় করিয়া মাথার দেবতাকে নমস্কার করিল। পুনরায় বলিতে লাগিল, ওঠেন বেলা নটায়। তারপর উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখেন কলতলা পরিষ্কার হয়েছে কি না। ভাড়া আমরাও দিই, কিন্তু কলতলা পরিষ্কার কর্‌তে হবে শুধু আমাদের, মেথর গেলে সিষ্টি জল দিয়ে ধুতে হবে তবে নবাব নন্দিনী দয়া করে কলে নামবেন। সেদিন বললুম, দিদি এত দেরীতে ওঠ যে? —বললে, আমার তো আর তাড়া নেই দিদি, আপিসের ভাত দিতে হয় না। উনি খেতে আসেন দুপুর বেলা, তাই রক্ষে; নইলে এই নোঙ্‌রায় কি যে করতুম তা ভগবানই জানেন। সকাল বেলা তো কলতলা রিরি করে। না থাকে বাসন ধোবার জায়গা, না থাকে একটু দাঁড়াবার জায়গা। গরজ যত আমাদের, কারণ আমরা অফিসের ভাত রাঁধি।

কাহিনী ফুরায় না।

এই ঘটনার পর হইতে কমলা আমার নিকট প্রতিদিন ঐ শুচিবায়ুগ্রস্ত অসহায়া বধূটির খুঁটি-নাটি কার্য্যাবলীর সুতীব্র সমালোচনা করিতে লাগিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে আমার নিকট প্রমাণ করিতে লাগিল যে বধূটি নাকি পরিষ্কার আদৌ নয়। যাহারা শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাহারাই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা নোংরা। উহা এক প্রকার রোগ বিশেষ কিংবা কোন এক প্রেতযোনী উহাদের স্কন্ধে চাপিয়া থাকে। শীত গ্রীষ্ম তাহারা জলের কীটের মত কেবল জলে জলে ঘুরিয়া মরে, মিথ্যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দোহাই পাড়িয়া। বহু জন্মার্জ্জিত পাপরাশি না থাকিলে নাকি এ রোগে মানুষকে ভুগিতে হয় না। স্ত্রী কহিল, কি রকম পরিষ্কার জান? ধোবার বাড়ীর ধোওয়া কাপড়ও নাকি কেচে পরতে হয়।

আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, তাই নাকি?

স্ত্রী উৎসাহ পাইয়া বলিয়া চলিল, শুধু কি তাই? ঝিয়ের বাসন মাজা ওঁর পছন্দ হয় না। ঝি চলে গেলে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সমস্ত বাসন আবার মেজে নেবেন।

কহিলাম, তবে ঝি রাখার মানে?

স্ত্রী নীচেকার ঠোঁটখানি ঈষৎ বাহির করিয়া কহিল, কি করে জানব বল? এই মাঘ মাসের দারুণ শীতে কি করে যে তিন চার ঘণ্টা একভাবে গামছা পরে কাজ করে তা দেখলে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। ওর কি একটু জ্বর জ্বালা করে না?

—মন্তর ফন্তর জানে নিশ্চয়।

স্ত্রী হাসিয়া কহিল, হবে হয় তো। আমরা একমিনিট গামছা পরলে কোমড় কেটে যাবার জো হয়। আর ও তিন ঘণ্টা ধরে শুধু কলের মাথা ধুচ্ছে আর গামছা ভেজাচ্ছে, পাছে গায়ের তাপে গামছা শুকিয়ে যায়। আমাদের ঘরে আসতে ওঁর ঘেন্না হয়, যদিও মুখে তা বলে না। ডাকলে কাজের ছুতো দেখায়।

—তোমাকে তো ওদের ঘরে ঢুক্‌তে দেয়?

—আমার বয়ে গেছে ঢোকবার জন্যে। ওঁর ও মন্দিরে না গেলে আমরা তো আর শুদ্ধ্ হব না? পরিষ্কার কাকে বলে আমরাও জানি, আমরাও ডিঙ্গি মেরে চলতে জানি, আমরাও কলের মাথা ধুতে জানি, আমরাও রবিবারে নটার সময় উঠতে জানি। ঝিয়ের মাজা বাসন ধুয়ে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না, ধোপার কাপড় কেচে পরতে আমরাও পেছপাও হই না।

বলিলাম, মানলুম তুমি সব পার, কিন্তু ঐ তিন ঘণ্টা গামছা পরা, ওটাও কি পার?

স্ত্রী হাসিয়া কহিল, ইচ্ছে থাকলেই পারা যায়। একখানা লাল ছালের কাপড় কিনেছি দেখেছ? তা পরে যা কিছু করি না কেন, সেটা কিছুতেই অশুদ্ধ্ হবে না। সে কাপড় কখনও কাচবার কিংবা ভেজাবার দরকার হয় না।

আমার এই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ইচ্ছাময়ী বুদ্ধিমতী পত্নীরত্নটির উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অতঃপর কমলা নবোদ্যমে ঐ সর্ব্বংসহা পরিষ্কার বধূটির সহিত পাল্লা দিয়া কাজ করিতে সুরু করিল। এক তলা বাড়ী, চারখানি ঘর। থাকি আমরা এবং বিজয় বাবুরা (শুচিবায়ু গ্রস্ত বধূটির স্বামী দেবতা)—দুটি পুরুষ ও দুটি স্ত্রী। প্রতিবাদ করিতে কেহই নাই। বিজয় বাবুকে বাড়িতে দেখা যায় না সুতরাং দুই সখীতে মিলিয়া গৃহ মধ্যে নির্ব্বিবাদে পরিচ্ছন্নতার প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া দিল। সারা উঠান ও দালান ভিজাইয়া ভিজাইয়া শেওলায় ভরাইয়া ফেলিল, কলের মাথা মুছিয়া মুছিয়া চকচকে করিল, ডিঙ্গি মারিয়া মারিয়া পা প্রায় খোঁড়া করিয়া ফেলিল, স্নান করিয়া মাথায় দুর্গন্ধ হইয়া গেল, দোষের মধ্যে আমি বেচারা পাঁচতরকারির পরিবর্ত্তে কোন প্রকারে বহু তাড়নায় আলুভাতে ভাত খাইয়া আপিসে ছুটিতে লাগিলাম। স্ত্রীর সহিত দুদণ্ড যে কথা কহিব সে সুযোগ পর্য্যন্ত হারাইলাম। তথাপি নীরবে এই শাস্তি সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না যেহেতু প্রথমত আমি পুরুষ মানুষ এবং দ্বিতীয়ত আমার বুদ্ধি নাই বলিয়া আমার নিপুণা গৃহিণী আমার কোন কথা শোনেন না ও আমার সকল কথাই হাসিয়া উড়াইয়া দেন।

একদিন স্ত্রী কহিল, হাজার একটু ওষুধ এনে দাও না গো।

সবিস্ময়ে কহিলাম, হাজা! হাজা তো তোমার কখনও ছিল না। হবে না?—যা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ।

—থাক্ আর তোমার সমালোচনা করতে হবে না। বল ওষুধ কিনে পয়সা নষ্ট করবে না।

—না সেকথা হচ্ছে না। বলছি কি না দোষটা তোমারই।

স্ত্রী রুখিয়া আসিল, দোষ আমারই, না? উনি যে এসেছেন আমায় বিচার দেখাতে সে দোষটা দেখতে পাবে কেন? বিচার কি আমরা জানি? বিচার জানেন উনি—ওরে আমার বিচারী! বলে কি, এ তো বাড়ী নয় নরককুট। সব তাতেই আমায় টেনে টেনে কথা বলে। আমি নোংরা আমি অপরিষ্কার।

—জানি তুমি নোংরা নও, তুমি অপরিষ্কার নও, তবু এ কি পাগলামী সুরু করেছো? এ সব কি ভাল?

স্ত্রী হাসিয়া কহিল, ভাল মানে? আমি তো ওর মত শুঁচিবেয়ে নয়। ওকে দেখাবার জন্যেই—

তবু রক্ষা আমার স্ত্রী শুচিবায়ু গ্রস্ত নয়। শুধু অভিনয় করিতেছে।

একদা অযাচিতরূপে বিজয়বাবুর সহিত দেখা। ভদ্রলোকের জ্বর হইয়াছিল, হাঁসপাতাল হইতে ঔষধ লইয়া গৃহে ফিরিবার মুখে পথের মধ্যেই দেখা। বলিলাম হবে না অসুখ, যা খাটেন।

ভদ্রলোকের রোগশীর্ণ মুখখানি ম্লান হাসিতে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল, খাটুনি মানে ?

—রবিবারে পর্য্যন্ত ছুটি নেই।

—না-না রবিবারে তো আমি কাজে নাই না।

ভাবিলাম ভদ্রলোক নিশ্চয় ছুটির দিনে স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়। সেই জন্য রবিবারে তাহাকে বাড়ীতে দেখা যায় না। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, তবে ?

ভদ্রলোক হাসিতে লগিল, বলিল, সত্যি কথা শুনতে চান ?

আমি নির্ব্বাক হইয়া ব্যাকুল আগ্রহে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। ভদ্রলোক বলিল, ব্যাপার কি জানেন ?...বাড়ী আমায় থাকতে দেয় না।

অর্থাৎ ?

—অতিষ্ঠ হয়ে গেছি দাদা। এটা ছুঁয়ো না, ওখেনে বসো না, কাপড় ছাড়, হাত ধোও, পা ধোও, ওদিকে যেয়ো না, এই সব আদেশ মত কাজ করতে করতে ঝালাপালা হয়ে যাই। না করলে কেঁদে রসাতল করে দেবে, পাথর পর্য্যন্ত গলে যাবে। তাই রবিবারে বাড়ী থাকি না, এর বাড়ী ওর বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়াই, দুপুর বেলা রোজ কারখানায় খানিকটা ঘুমিয়ে কাটাই। জীবনটা বিষিয়ে তুললে দাদা ! আমি বলে তাই এখনও পাগল হয় নি। বাড়ী কি আর সাধে থাকি না !

ভদ্রলোকের কাহিনী শুনিয়া আমার চিত্ত বিগলিত হইল। তাহার এই অভিশপ্ত জীবনের জন্য সান্ত্বনা দিবার ভাষা হারাইয়া ফেলিলাম। একবার আমার কমলার কথা মনে পড়িল। না, ভয়ের কোন কারণ নাই। সে তো কেবল অভিনয় করিতেছে,ইচ্ছা করিলেই সে অক্লেশে পুনরায় সেই পূর্ব্বের মানুষটি হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক মনে যে একটু খট্‌কা লাগিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ ঘটনার দুইদিন পর দুই সখীর পরিচ্ছন্নতার প্রতিযোগিতা চরমে উঠিল। কিংবদন্তি আছে, তিল হইতে তালের উৎপত্তি। এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল। সামান্য জলের কলের ব্যাপার লইয়া সেদিন সারা সকাল তুমুল কলহ হইল। দুইটি প্রাণী প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া সারা গৃহ মুখর করিয়া তুলিল। উভয়েই উভয়কে উঠিয়া যাইতে আদেশ করিল—সকলেই ভাড়া দেয়। লাভের মধ্যে আমাকে না খাইয়া আপিস যাইতে হইল। বিপদ গণিলাম। জতুগৃহে বাস করা আমার বিবেচনায় আদৌ মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হইল না। অগত্যা বাড়ী ছাড়িতেই মনস্থ করিলাম। কিন্তু রেহাই দিল বিজয়বাবু। ভদ্রলোক বলল, আপনাকে যেতে হবে না দাদা, আমিই বরং যাচ্ছি। এমনি বাড়ী বদলানো আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে, কোথাও আমরা এক বছরের বেশি থাকতে পারি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর থেকে ও অমন হয়েছে। সে মরেছিল অপরিষ্কারের দরুণ।

ভদ্রলোকের চোখদুটি অশ্রু সজল হইয়া উঠিল, গণ্ড বাহিয়া কয়েকবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, বেদনা বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, সেইজন্যেই তো কিছু বলতে পারি না। বেচারা ঐ নিয়ে নিজের খেয়ালে মেতে আছে।

আমি ব্যথিত চিত্তে কহিলাম, না, আপনাকে যেতে হবে না।

ভদ্রলোক আমার হাতদুটি ধরিয়া বলিল, রামো! আপনি হচ্ছেন পুরোন ভাড়াটে, আপনারই দাবী বেশি। আমার তো এমন যাওয়া নতুন নয়।

অগত্যা আমরা রহিয়া গেলাম। পরের রবিবারে বিজয় বাবুরা গেল, স্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাবা! আপদ বিদেয় হল।

কলিকাতা শহরে ঘর কখনও খালি পড়িয়া থাকে না। বিজয়বাবুদের ঘরে আর একজন সংসার পাতিয়া বসিল, স্বামী স্ত্রী দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। স্ত্রীকে কহিলাম, এবার কেমন সঙ্গী হল?

স্ত্রী কহিল, মা গো! এমন নোংরাও পৃথিবীতে আছে? কিছু বাছ-বিচার নেই। সকাল বেলা বাসি কাপড়েই মাগী মিন্সে চা গিলছে—ইষ্টিদেবতার পূজো করা নেই—সন্ধ্যে বেলা তুলসী তলায় পিদিম দেওয়া নেই—সকাল বেলা সদর দরজার একটু জল ছিটোনো নেই—ওদের আবার গোবরের গন্ধ নাকে যায়। শুধু খেতেই জানে, খাওয়ার পোকা! অলক্ষ্মী আর কাকে বলে! তাতে আবার বামুন! বললে পাপ হয় হাতের খেতে ঘেন্না করে।

বলিলাম, বরাত তোমার মন্দ।

স্ত্রী কহিল, কেন গা আমার বরাত মন্দ হতে যাবে? আমার অতিবড় শত্রুর বরাত মন্দ হোক্ জন্ম জন্ম।

সেই অতি বড় শত্রু আমি স্বয়ং। কারণ বরাত আমারই মন্দ।

একদা নবাগতা বধূটি তাহার স্বামীকে বলিল, আগে জানলে কি আসতুম? এই শুচিবেয়ের সঙ্গে আমি ঘর করতে পারব না! আমায় ছেলেপিলে নিয়ে থাকতে হয়, অত ছুঁই ছুঁই করলে আমার চলবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটি আমার কানে আসিল। শুনিয়া আমরা সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গেল। ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে চলিলাম। এই পৌষ মাসের শীতে কমলা অর্দ্ধোন্মুক্ত শরীর কোন প্রকারে একখানি ভিজা গামছা দিয়া আবৃত করিয়া শয়ন ঘরে গোময় লেপন করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া কহিল, ফিরে এলে যে? বাজারে গেলে না?

কহিলাম, পয়সা নিতে ভুলে গেছি।

—আচ্ছা ভুলো মন বাপু!

—সর, পয়সা বার করি।

স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, বলিহারী মানুষ তুমি। ঐ রাস্তার কাপড় পরে ঘরে ঢুকবে? সিষ্টি মাড়িয়ে আসছ না?

তথাপি গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য একবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলাম। স্ত্রী হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, আমার মাথা খাও, তুমি ওখানে দাঁড়াও, আমি পয়সা বার করে দিচ্ছি।

স্ত্রী দূর হইতে অতি সাবধানে আমার হাতে পয়সা ফেলিয়া দিল। দিনের পরিষ্কার আলোয় তাহার হাজা হাতখানি দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। বহু দিনের পর লক্ষ্য করিলাম তাহার মাথার চুল বিরল হইয়া গিয়াছে।

মরীয়া হইয়া কহিলাম, কমলা, তোমার বিচারী দিদি তো চলে গেছে। আর কেন? এবার তোমার ভোল ফিরিয়ে ফেল!

কমলা কহিল, কি যে বল তার ঠিক নেই।

বলিলাম, সব জিনিষের একটা সীমা আছে। এ বাড়াবাড়িকে কি বলে জান?

স্ত্রী পুনরায় ঝঙ্কার দিয়া কহিল জানি গো জানি, আমাকে আর শেখাতে হবে না, এখন বাজারে যাও।

অগত্যা তাহাই করিলাম। প্রতিবাদ করিবার আর সাহস হইল না, তখনও না পরেও না।

সবই সহিয়া গিয়াছে, এখন মাঝে মাঝে কেবল বিজয় বাবুর কথা মনের উপর ভাসিয়া ওঠে। বেচারা বিজয় বাবু!

বরনারী

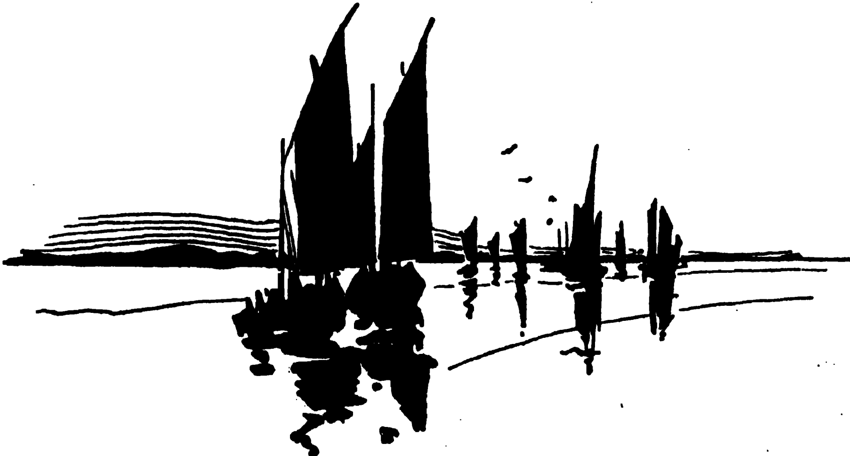
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শূন্য কুম্ভ সম
শূন্য জীবন মম
কাঁখে তুলে' নদীকূলে এলে বরনারী;—
কেন নামিলে না নীরে?
বেলা প'ড়ে এল ধীরে,
চলিয়াছ ঘরে ফিরে ভরি' আঁখিবারি।
না মোরে ডুবালে জলে,
না ভাসালে লীলাছলে,
বুকে চাপি' কুতূহলে দিলে না সাঁতার।
কেঁদে' কেঁদে' গলা ধোরে'
ভরিয়া তুলিলে মোরে,
ঢালিলে এ খালি বুকে অশ্রু পাথার।
পল্লীবধূর সারি
আসে হাসে ভরে বারি,
বাতাস ভরিল জল ভরণের সুরে,—
কূলে বসি' অধোমুখ
তোমারি ফুলিছে বুক,
কি দুখে ও কালো আঁখি সারাবেলা ঝুরে!

এখন চ'লেছ ফিরে,—
সমুখে আঁধার ঘিরে,
পিছনে সজল হাওয়া বহে ঝর ঝর্,
ঝিল্লীরা ঝঙ্কারে,
জোনাকী ঝলক্ মারে,
বাঁকা কাঁকালের তালে নূপুর মুখর।
আঁধারে বুঝিতেছি না—
এখনো কাঁদিছ কিনা,
ভরা এ কলস ভারে ঘন বহে শ্বাস;
তোমারি চলন-ঘায়,
মোর জল ছলকায়,
ভিজিয়া ভিজাই হায় তব কটিবাস।
পদতলে পথরেখা
যায় কি না যায় দেখা,
এ পথে চলিতে একা তনু কেঁপে উঠে,
নাছোড়্ লতার বেড়ে
অপথে পড়িছ ফেরে,
না জানি কোমল পায়ে কত কাঁটা ফুটে

আঁধারের বাঁকে বাঁকে
মেঘেদের ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদের কলসী কাঁখে চলে বিভাবরী ;
বন বায়ু ফিরে পাশ,
ছাতিমের ছুটে বাস,
বকুল ফেলিয়া শ্বাস ধীরে পড়ে ঝরি'।
শুনি ও নূপুর ধ্বনি
পথ ছেড়ে দেয় ফণী,
পেচক উড়িয়া বসে পাশের শাখায় ;
শ্বাপদ দাঁড়ায় সরি'
দু'চোখে প্রদীপ ধরি',
বাদুড় ঝুলিয়া ডালে ঘুরিয়া তাকায়।
সুন্দরী, বল বল—
এ পথে কোথায় চল ?
গহন এ অরণ্যে কারে মনে পড়ে ?
তোমারি কাঁদনে-কাঁদা
তোমারি বাঁধনে-বাঁধা
কলস নামাতে বল চল কার ঘরে ?
চির দিবসের চেনা
সে ঘরে কি ফিরিবে না ?
সন্ধ্যা কাঁদিয়া গেল কুটীরে যে তব ;

কাহার চরণে ঢালি'
আমারে করিবে খালি ?
আজি রাতে ডাকে তোমা কোন্ অভিনব ?
যে তব আঁখির জল
এই বুকে টল টল,
সে জলে মিটিবে বল কাহার তিয়াস ?
চলিয়াছ, বাঁধি' মোরে
কটিতটে বাহু ডোরে
কাঁকন্ বাজায়ে কোন্ নূতনের পাশ ?
যদি সে নূতন ঘরে—
ও আঁখি আবার ঝরে,
যদি ও-বিম্বাধরে কাঁপে ক্রন্দন ;—
তবে নারী মাথা খাও
মোরে হেথা ফেলে যাও,
পথমাঝে খুলে নাও ভুজবন্ধন।
ভাঙা ফুটো শূন্যে হই,
যেথা সেথা প'ড়ে রই,
হে মোর বেদনাময়ি, সহিতে তা পারি।
তোমার অশ্রুভার
বার বার বহিবার,
শকতি নাহি যে আর—শোন বরনারী।



কলিকাল

শ্রীসীতা দেবী

কলিকাতার নিকটেই একটি ছোট শহর, তাহাকে বড় গ্রাম বলিলেও কোনো অন্যায় হয় না। আসল কথা ইহার বাঁশবন, পানাপুকুর, দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত দেখিলে পাড়াগাঁই বলিতে ইচ্ছা করে, আবার বাঁধান রাস্তা, রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক বাতি, ফ্যাক্টরির হুইসিল্‌এর শব্দ, এ সবগুলি বিবেচনা করিতে গেলে শহর না বলিলে চলে না।

ভাঙা পাকা বাড়ী, টিনের চাল দেওয়া ঘর, একেবারে খড়ে ছাওয়া পাড়াগেঁয়ে মাটির ঘর, কিছুরই অভাব নাই। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, এবং কতকাংশে প্রৌঢ়বয়স্করাও সনাতনী চালে চলিতে ব্যস্ত, আবার তরুণের দল অধীর আগ্রহে আধুনিক যুগের দিকে তাকাইয়া আছে, তবে একেবারে বাঁধন ছিঁড়িয়া অকূলে ভাসিতে ভরসা পায় নাই। হাজার হউক, এখনও অনেককেই ঐ বুড়াবুড়ীর হাততোলায় খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইতেছে ত? যা বেকারের যুগ!

মুখুজ্জ্যেদের বাড়ী বৌ-ভাতের ঘটা লাগিয়াছে। একে শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যা, তাহার উপর মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ভাঙাবাড়ীতে বিজলীর বাতি নাই। বড় রাস্তায় আছে বটে, কিন্তু দুই একজন সঙ্গতিপন্ন মানুষ ছাড়া ঘরে ইলেক্‌ট্রিক জ্বালাইবার সখ কাহারও হয় নাই। তাহার উপর মুখুজ্জ্যেদের খালি বৈঠকখানা ঘরখানি পাকা, আর সব মাটির ঘর, সেখানে বিজলী জ্বালাইবে কে?

গোটাকয়েক অ্যাসিটিলিনের আলো বাড়ীর সদরের অন্ধকার দূর করিতেছে, ভিতরের দিকে হারিকেনের মিট্‌মিটে আলোই সম্বল। বৈঠকখানাঘরে বৌকে বসান হইয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া অভ্যাগতারা সভা জমাইয়া বসিয়াছেন। সামনের খোলা জমিতে ডবল্ হোগলার মেরাপ বাঁধিয়া বাবুদের বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, বর্ষার উৎপাতে কলিকাতা হইতে চেয়ার টেবিলও সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। শুক্‌নো দিন হইলে শতরঞ্চ আর কুশাসনেই কাজ চলিয়া যাইত, কিন্তু এই ভরাবর্ষায় কাদার ভিতর ত লোককে ডাকিয়া আনিয়া বসাইয়া দেওয়া যায় না? বৌ কলিকাতার মেয়ে, তাহার আত্মীয়স্বজনও আসিয়াছে, নূতন কুটুম্বের কাছে ত আর খাটো হওয়া যায় না? বিশেষ যে ক্ষেত্রে বিবাহের খরচ এবং পণ মিলাইয়া দু হাজার টাকা নগদই লওয়া হইয়াছে।

বৈঠকখানাঘরের ভিতর শতরঞ্চি পাতা, শতরঞ্চির উপর ফরাশ। ফরাশের দু এক জায়গা ছেঁড়া, দু এক জায়গায় দাগ লাগা। ছোট একখানা গালিচা ঠিক ঘরের মধ্যে পাতা হইয়াছে, সেইখানে মোটা তাকিয়া ঠেশ দিয়া অবনতমুখে নূতন বৌ বসিয়া আছে। তিন চারটি কিশোরী মেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া আছে, একজন তালপাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে, আর একজন বৌয়ের হাত ধরিয়া অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। বাতাস করিতেছে যেটি সে সম্পর্কে ননদিনী, বাক্যবিন্যাস করিতেছেন যিনি তিনি বৌয়ের মামাতো বোন, বৌভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।

ফুল পাতা, রঙীন কাগজের চেন্ দিয়া বাড়ী ও বাহিরের উৎসবমণ্ডপ সাজাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা

হইয়াছে। অভ্যাগতাদের অঙ্গরাগের সুগন্ধ, ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া ঘরের হাওয়াটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঘরের দেওয়ালে চারটি দেয়ালগিরি এবং ছাদ হইতে ঝুলিতেছে পুরাকালের মস্ত এক ঝাড় লণ্ঠন। অ্যাসিটিলিনের দুর্গন্ধ সহ্য করিতে মেয়েরা রাজী হন নাই।

অতিথির দল এখনও সকলে আসিয়া জোটেন নাই, এক এক করিয়া হাঁটিয়া বা ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া আসিতেছেন। সদর রাস্তার উপর খানদুই প্রাইভেট্ কার, ও খানদুই ট্যাক্সি আগাগোড়া পরদা টানিয়া ভিজিতেছে, চালকেরা বোধ হয় ভিতরে নিদ্রাগত।

কাদা ছিটাইতে ছিটাইতে, ঘড় ঘড় শব্দ করিতে করিতে আর একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা খুলিয়া দিতেই ভিতর হইতে একজন অতিকায় প্রৌঢ়, তাঁহারই উপযুক্ত অঙ্গসৌষ্ঠববতী একটি প্রৌঢ়া, একটি তরুণী বধূ ও গুটিতিনচার বালকবালিকা নামিয়া পড়িল। "সাবধানে পথ দেখে হাঁট সব, আঃ কি দুর্যোগই পড়েছে!" বলিতে বলিতে প্রৌঢ় অগ্রসর হইয়া গেলেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া মহিলা ও বালকবালিকাদের ভিতরে লইয়া চলিল।

বৌয়ের শাশুড়ী আসিয়া নবাগতার হাত ধরিলেন, "আসুন বেয়ান আসুন, বড় ভাগ্যি আমার তাই আপনার পায়ের ধুলো পড়ল আমার বাড়ী।"

গরীয়সী বেয়ান বলিলেন, "রোসো ভাই আগে তোমার বৌয়ের মুখ দেখি, তারপর অন্য কথা। একমাস ধরে যা তার রূপের ব্যাখ্যা শুনছি, তা চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন না করলে আর চলে না।"

গৃহিণী নববধূর আনত মুখটা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই যে দেখুন না, প্রণাম কর বৌমা, ইনি আমার রাধুর শাশুড়ী।"

অভ্যাগতা গরদের শাড়ীর আঁচল হইতে চারটি টাকা খুলিয়া বৌয়ের হাতে দিয়া মুখ দেখিলেন। একটু যেন অপ্রসন্নস্বরেই বলিলেন, "তা বেশ বৌ হয়েছে বেয়ান, নিন্দের কিছু নয়। তবে আজকালকার মেয়েদের রকমই যা, ডিগ্‌ডিগে রোগা দেহ, লম্বা মুখ। আমরা সেকেলে মানুষরা গোলগাল গড়ন, পুরন্ত মুখই ভালবাসি।"

তাঁহার সঙ্গে যে বৌটি আসিয়াছিল সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। পাশেই সমবয়সী একটি মেয়েকে দেখিয়া বলিল, "আমার শাশুড়ীর ভাই নিজের চেহারা ছাড়া কারো চেহারাই পছন্দ হয় না। দেখছ না কেমন গড়ন? শরিলে আর পদার্থ নেই।"

আ মর! নিজের শাশুড়ীর ব্যাখানা করে দেখ না," বলিয়া দ্বিতীয়া যুবতী তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

নূতন বৌ দেখিতে বাস্তবিকই সুন্দরী। রং বেশ ফরসা, সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত দেহযষ্টী। খুঁতের ভিতর নাকটি একেবারে বাঁশীর মত নয়, ঈষৎ চাপা। চোখ দুটি সুন্দর ভাসা ভাসা, মুখের গড়নটিও পানের মত। নীলাভ বারাণসী শাড়ী, আর অল্প কয়েকখানি গহনায় তাহাকে ভারি সুন্দর মানাইয়াছে।

তাহার মামাতো বোন বলিতেছে, "আচ্ছা ভাই রেণু, সত্যি কথা বল দেখি, তোর বর এখন অবধি তোর সঙ্গে কথা কয়নি?"

রেণু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে বর এখনও কথা বলে নাই। খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া রসিকা মৃণালিনী বলিল, "বাবাঃ, বড় কড়াকড়ি দেখি যে, আজকাল আবার এসব কেউ মানে নাকি?"

ঘর ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছে, বালিকা ও কিশোরীরা বৌয়ের ধার ছাড়িয়া নড়িতে চায় না, কাজেই নূতন যাঁহারা আসিতেছেন, বৌয়ের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই তাঁহারা পারিতেছেন না। গৃহিণী বলিতেছেন, "এবার পাতা টাতা কর বাপু, রাত ত বেশ হতে চল্‌ল, একবারে ত সব হবে না, দুতিন বারে বসাতে হবে।"

গৃহিণীর ভাগ্নে পটলা বলিল, "পাত ত ঐ ঘরেই করতে হবে মামীমা, মেয়েদের আগে ওঠাও তবে ত?"

গৃহিণী কন্যা সহ মেয়েদের তুলিতে অগ্রসর হইলেন। এমনি ডাকিলে কেহই নড়ে না, অগত্যা হাত ধরিয়া টানিয়া নূতন কনে বৌকেই তিনি তুলিয়া ফেলিলেন। তখন অভ্যাগতার দল ঝাঁক বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ছেলের দল শতরঞ্চি ও গালিচা গুটাইয়া সারি সারি কুশাসন পাতিয়া খাইবার জায়গা করিতে লাগিল।

জায়গারই অভাব, লোকের অভাব নাই, একদল ছেলে ছুটিয়া গেল পরিবেশন করিবার জন্য, একটা অ্যাসিটিলিনের আলো আনিয়া দরজার সামনে রাখা হইল, ভিতরটাও যেন কিছু উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

তাহার পর প্রবল কোলাহল। "সবাই লাইন ভরে বসুন। এই যে এখানে তিনখান পাত খালি। ও দিদি, এই ছোট ছেলেটাকে কোথায়ও বসিয়ে দাও না, ওর বাড়ীর সবাই বসে গেছে। আহা, নূতন বৌকে এখনি বসাচ্ছ কেন গা, ঘটে বুদ্ধি বলে কি কিছু নেই? ওকে মিষ্টি দিতে হবে না সবার পাতে? তবে আর বৌভাত বলেছে কেন?"

যাহা হউক, গুছাইয়া গাছাইয়া ঘর জুড়িয়া মেয়েরা ত বসিয়া পড়িলেন। "এদিকে লুচি। ওমা ভাজাটা আগে দাও, আগেই ছ্যাঁচ্‌ড়া দিচ্ছ কেন? নিরামিষ লাইনে একজনও লোক নেই, সবাই এখানে এসে জুটে গেছ ত?" চীৎকারে ঘর সরগরম হইয়া উঠিল, খাওয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। ফেলা-ছড়া যথেষ্ট হইল, কেহ একটা জিনিষ চাহিয়া আর একটা পাইল, ফুটা গেলাসের জল গড়াইয়া ঘরের মেঝে পিছল হইয়া উঠিল, দু একজন পরিবেশনকারী মেয়েদের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতে পড়িতে কোনও মতে সামলাইয়া গেল। বৌকে সঙ্গে করিয়া তাহার বড় ননদিনী রাধারাণী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে মস্ত বড় রসগোল্লার হাঁড়ি। "সবাইকে দুটো করে দিয়ে যাও ভাই বৌদি, নিতান্ত কচিগুলোর পাতে একটা।"

একদলের খাওয়া হইয়া গেল, তাহারা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। এঁটো-কাঁটা পরিষ্কার করিয়া আবার পাতা করা হইতে লাগিল। অভ্যাগতারা কেহ বা বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন, কেহ বা আরো একটু উৎসবানন্দ উপভোগ করিবার জন্য দেওয়ালে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাহিরের মণ্ডপে বাবুরা কেরোসিন কাঠের টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাইতে বসিয়া গিয়াছেন। এখানে কলরব আরো প্রচণ্ড, কারণ ভোক্তারাও চীৎকারে সমানে যোগ দিতেছেন। "লুচি, এখানে চপ্‌ আর একখানা, আরে মশাই মাংসটা এ লাইনে মোটে যে পড়লই না।" কোলাহলে কান পাতা যায় না, তবে খাওয়ার কাজ মোটের উপর ভালই চলিতেছে।

বাড়ীর দুই ছেলে নবীন আর সুরেন। নবীনেরই বিবাহ হইয়াছে, তবে জলে কাদায় তাহার যা মূর্ত্তি হইয়াছে, তাহাতে চট্ করিয়া তাহাকে বর বলিয়া বুঝিবার কোনো উপায় নাই। মুখের লজ্জিত হাসিটা সকলের চোখে অত ধরা পড়িতেছে না। সুরেন মালকোঁচা মারিয়া পরিবেশন করিতেছে এবং আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছে। পট্‌লাকে বকিতে তাহারই উৎসাহ সব চাইতে বেশী।

একদলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল, টেবিল পরিষ্কার হইবে, গঙ্গাজল দিয়া মোছা হইবে, তাহার পর আর একদল খাইতে বসিবে। মুখুজ্জ্যেদের আচার-বিচারের ঘটা একটু বেশী, টুলো পণ্ডিতের বংশ কি না! এক নবীন খানিকটা আধুনিকতার পক্ষপাতী, বাড়ীর আর সব ক'জন মানুষ, এমন কি সুরেনও অতিশয় সনাতনপন্থী। সুরেন ত হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে বলিলেই চলে।

অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলের দল টেবিল পরিষ্কার করিতেছে, সুরেন এই ফাঁকে কপালের ঘাম মুছিয়া একখানা ভাঙা তালপাতার পাখায় খানিকটা হাওয়া খাইয়া লইল। হঠাৎ পাশ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "কই হে বৌ দেখালে কই? শুধু কি খাইয়েই বিদায় দেবে?"

সুরেন ফিরিয়া দেখিল তাহার কলেজ জীবনের সহপাঠী গৌরীপতি দাঁড়াইয়া আছে। একসঙ্গে গোটাতিন পান মুখে পুরিয়া দেওয়াতে কথাগুলা কিছু অস্পষ্ট শুনাইতেছে।

সুরেন বলিল, "নিশ্চয় দেখাব, তবে দেরি হবে ভাই, যা মেয়েদের ভীড়, ওর ভিতর এখন ঢোকাই যাবে না। একটু হাল্কা হোক, তারপর ভিতরে যাওয়া যাবে। খেয়েছ ত পেট ভরে?"

গৌরীপতি বলিল, "আজ তাহলে থাক ভাই, আর একদিন এসে দেখে যাব। এসেছি সেই কলকাতার থেকে, তার উপর এই বর্ষার রাত। একটু তাড়াতাড়িই ফিরতে হবে, যাতে ট্রামটা অন্তত পাই। তা কেমন বৌদি হল?"

সুরেন গম্ভীর ভাবে বলিল, "কেমন আর হবে, দাদার যেমন পছন্দ তেমনই হয়েছে।"

পান চিবাইতে চিবাইতে গৌরীপতি জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম পছন্দ খানা তাঁর শুনি?"

সুরেন বলিল, "এই বেশ সুন্দরী, লেখাপড়া জানা, বয়সেও কচি খুকী নয়, প্রসাধনেও খুব আধুনিক।"

গৌরীপতি বলিল "তা এর ভিতর কোনোটাই ত মন্দ শোনাচ্ছে না, তুমি এত গম্ভীর হয়ে গেছ কেন শুনি? তোমার নিজের পছন্দটা কি রকম?"

সুরেন বলিল, "সেটা সামনের অঘ্রাণ মাসে দেখতেই পাবে।"

গৌরীপতি হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিল, "বেশ, বেশ! তাহলে শীগ্‌গিরই আর একদিন নেমন্তন্ন খাচ্ছি বল?"

সুরেন বলিল, "তা সেরকম আশা করতে পার বটে।"

আর একবার পাতা করা হইয়াছে। পরিবেশনের কোলাহলও সুরু হইল বলিয়া। সুরেন কাজের তদারক করিতে চলিয়া গেল, গৌরীপতিও বাড়ীর পথ ধরিল।

অভ্যাগতদের খাওয়া দাওয়া চুকিতেই প্রায় রাত সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আবার ফুলশয্যা করানোর পালা। এখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ, নেহাৎ বাড়ীর দু একটি ছেলে ছোক্‌রা ছাড়া। সুরেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সে এসবের ধার দিয়াও ঘেঁষিল না, পট্‌লা কাজের ফাঁকে

ফাঁকে দুচারবার উঁকি মারিয়া গেল। বয়স্কা মহিলারাও আমল পাইলেন না, ইহা নিতান্তই তরুণীদের ব্যাপার।

ফুলশয্যা করাইয়া সবাই লোক দেখান ভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু বর কনে কেহই নিতান্ত কচি নয়, চারিদিকে আড়িপাতার আভাস তাহারা ধরিতেই পারিল। এখানে একটু ফিশ্‌ ফাশ্‌ ঐ জান্‌লার পাশে রেশমী কাপড়ের খশ্‌ খশ্‌, কোথাও বা দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ। বর বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একবার বৌয়ের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রেণু, এখানে এসে তোমার মন কেমন করছে না ত?"

বৌ নীচু গলায় বলিল, "না।"

বর আবার বলিল, "প্রথম প্রথম একটু হোম-সিক্‌ ত লাগতেই পারে। একদিনেই ত পর আপন হয় না! কিন্তু ক্রমেই সয়ে যাবে।"

বৌ কিছু বলিল না। বাহিরে কে যেন খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বর সেটা গ্রাহ্য করিল না। আবার বলিল, "আমার বাড়ীর সকলেই একটু সাবেকী চালের পক্ষপাতী বিশেষ করে মা এবং আমার ছোট ভাই স্থরেন। অপ্রিয় সমালোচনা কিছু কিছু শুনতে হতে পারে, সেগুলো আমার মুখ চেয়ে হয় ক্ষমা করো, নয় উপেক্ষা করো। মানিয়ে চলতে চেষ্টা করো, যতটা পার।"

আড়িপাতার দল একটু ক্ষুণ্ণ হইল। রসাল প্রেমালাপের পরিবর্ত্তে এরকম বক্তৃতা শুনিতে তাহাদের ভাল লাগিতেছিল না। সশব্দে হাই তুলিয়া একে একে তাহারা প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। বরবধূও অল্পক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

রেণুকা ফুলশয্যার রাত্রে বরের রসালাপের অভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল কিনা জানি না, তবে দুই একদিন যাইতে না যাইতে সে মনে মনে স্বীকার করিল, নবীন তাহাকে আগে থাকিতে সাবধান করিয়া দিয়া ভালই করিয়াছে। এ বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে হইলে তাহাকে যথেষ্ট সাবধান হইতে হইবে। দেবরটিও মস্ত বড় সমস্যা। তাহার হাঁড়ি মুখে কোনো সময়েও হাসি ফোটে না। হাসি ঠাট্টাকে সে পাপ বলিয়া গণ্য করে। ছোট ননদ প্রভৃতি দেবর ও বৌদিকে লইয়া রসিকতা করিতে গিয়া তাড়া খাইয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছে। শাশুড়ী বেশ জাঁদরেল গোছের, তবে হাজার হউক মেয়েমানুষ ত। সারাক্ষণ অমন মানোয়ারী মূর্ত্তি ধরিয়া থাকিতে পারেন না, দু এক সময় সাধারণ মেয়েলী কথাবার্ত্তাও বলেন।

রেণুকার বাপের বাড়ী আধুনিক না হইলেও সনাতন পন্থী একেবারেই নয়। মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে, জুতা মোজা, ব্লাউস, পেটিকোট পরে, দরকার মত পাউডার স্নো মাখে। থিয়েটার বায়োস্কোপে গেলে 'লেডিজ' টিকিট কেনে না। টাকাকড়ি খুব বেশী নাই, কাজেই মেয়েদের বিবাহ ইচ্ছানুরূপ ঘরে ও বরে দিতে পারেন নাই। রেণুকার অবশ্য বর খুব পছন্দ হইয়াছে, তবে শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারিবে কিনা, সেই চিন্তায় এখন সে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এবারে মাত্র সে সাতদিন থাকিবে। তাহার পর বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে, আবার আসিবে

মাস দুই পরে। সাতদিনের তিনদিন ত মানে মানে এক রকম কাটিয়া গিয়াছে, আর চারদিন কাটিলেই হয়। সমালোচনা নানারকম ইহারই ভিতর সুরু হইয়া গিয়াছে।

শাশুড়ী থাকেন বৌয়ের পাশের ঘরেই। এই দুইখানা ঘরের চাল টিনের, মেঝেটাও শান বাঁধান। ছেলের বিবাহের আগে, একখানায় কর্ত্তা গৃহিণী থাকিতেন, আর একটায় দুই ছেলে থাকিত, এখন সুরেন বৈঠকখানা ঘরে আশ্রয় লইয়াছে।

গৃহিণীর গলাখানা মৃদু নয়, তিনি প্রাণ খুলিয়া কথা কহিলে পাশের ঘর কেন, বাহিরের ঘর হইতেও শুনা যায়।

দুপুর বেলা, সকলে খাইয়া দাইয়া একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছে। কেহ বা শুইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা বসিয়া গল্প করিতেছে। রেণুকা নিজের ঘরে বসিয়া মাকে চিঠি লিখিতেছে, নবীন সেই ঘরে ঘুমাইতেছে।

হঠাৎ পাশের ঘরে গৃহিণী রাজলক্ষ্মীর গলা শুনা গেল, কুটুমবাড়ীর তত্ত্বের সমালোচনা হইতেছে, শ্রোতা যে কে তাহা রেণুকা বুঝিল না। গৃহিণী বলিতেছেন, "খালি লোক দেখান ঘটা বই ত না! কল্‌কাতার মানুষের ধরণই ঐ। জিনি পত্তরের ভিতর আসল বস্তু কি আছে বল দেখি? খালি ফুল পাতা, গন্ধতেল, সাবান, এসেনের ঘণ্ট! ও নিয়ে কি ধুয়ে খাব? বাসনগুলো কেমন দিয়েছে দেখ না, যেন ফন্‌ফন্ করছে। দুমাসে সব ফুটো না হয়ে যায় ত আমার নামে কুকুর পুষ। জোড়া খাট দিতে বল্‌লাম ত একখানা ধ্যাবড়া খাট দিয়ে নিশ্চিন্দি হল, তারই বা কি ছিরি। আসবাবগুলো সব অল্পদামে সেরেছে। আবার বাজনা পাঠান হয়েছে ঢং করে। বৌ কি থিয়েটারের দল খুলবে নাকি?"

ছোট ননদ বীণা বলিল, "তা বাপু তোমরা খালি নগদ টাকা বেশী নেবার জন্যে চেঁচাতে লাগলে, কাজেই তারা জিনিষ পত্রে কম করেছে।"

মা তাড়া দিয়া উঠিলেন, "নে নে থাম্, বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। কেন চাইব না টাকা? আমার এম্ এ, পাস ছেলে, এরই মধ্যে শোওয়াশ টাকা উপায় করছে, পরে কত মাইনে বাড়বে। আজকাল রোজগারী ছেলে পথে ঘাটে বসে আছে কি না! দু হাজার টাকা এমন কি বেশী দিয়েছে? তেমনি গহনা ত কিছু দেয়নি বল্‌লেই হয়। দান সামিগ্রী, তত্ত্বের জিনিষ, কেন ভাল দেবে না? মেয়ের রংটা একটু ফ্যাকাশে, সেই গরবেই আর বাঁচে না।"

বীণা বলিল, "দিদির বিয়েতে ত তুমি ওর অর্দ্ধেক জিনিষও দাওনি।" মেয়েটা বড় ঠোঁট কাটা।

মা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় নবীন এবং জামাইয়ের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বড়মেয়ে রাধারাণী আসিয়া পড়াতে থামিয়া গেলেন। খালি বলিলেন, "বড় মুখফোঁড় মেয়ে। এর বুদ্ধি শুদ্ধি হবে কবে? বৌয়ের ফরশা মুখ দেখে একেবারে ভুলে গেছে।

মায়ের সিংহনাদে পাশের ঘরে নবীন তখন উঠিয়া বসিয়াছে। অবনতমুখী রেণুকার দিকে চাহিয়া বলিল, "বীণার আর তার দাদার ধাত ঠিক এক রকম দেখছি।

রেণুকা বিবর্ণমুখে একটুখানি হাসিল মাত্র। তাহার বুকের ভিতর তখন টিপ্ টিপ্ করিতেছে। চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া সে খামে বন্ধ করিয়া ফেলিল। বাহিরের আকাশ মেঘে মলিন, তাহার মনের ভিতরটাও যেন অন্ধকার হইয়া গেল।

নবীন তাহার কাছে আসিয়া বসিল। তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ছুটো কথায়ই অত মুষ্ড়ে যেতে আছে? অমন মাঝে মাঝে শুনতেই হবে। মনকে শক্ত কর, আমি ত জন্মাবধি গাল খাচ্ছি অনাচারী বলে, আমার এখন এক কান দিয়ে ঢোকে ত আর এক কান দিয়ে বেরয়।

রেণুকা বলিল, "এমন বাড়ীতে জন্মে তুমি অনাচারী কি করে হলে?"

নবীন বলিল,"প্রহ্লাদকুলের দৈত্য আর কি! দাও চিঠিখানা আমাকে, বিকেলে যখন বেড়াতে বেরব, তখন ডাকে দিয়ে দেব।"

রেণুকা চিঠিখানা স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "এঁরা গান বাজনা একেবারেই ভাল বাসেন না বুঝি?"

নবীন বলিল, "মেয়েদের গান বাজনা সম্বন্ধে সাবেক কালের ধারণা ভাল ছিল না জানই ত। এঁরা এখনও সেটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।"

রেণু বলিল, "আর্গ্যান্টা কলকাতায়ই রেখে দেব তা হলে, এখানে থাকলে শুধু শুধু নষ্ট হবে।"

নবীন বলিল, "তাই রেখ, গলাখানাও রেখে এস না যেন।

বাহির হইতে হেঁড়েগলায় সুরেন ডাকিল, "দাদা, ঘোষালদের তিনকড়ি তোমায় ডাকছে।" নবীন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রেণু রাইটিং প্যাড্, ফাউণ্টেন্ পেন প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিতে না রাখিতে তাহার ছুই ননদ এবং পাড়ার আরো গুটি ছুই তিন মেয়ে হুড়মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

রাধারাণী বলিল, "এস ভাই বৌদি, তোমার চুলটা বেঁধে দিই, বেলা গেছে।"

রাধারাণীর চুলবাঁধা রেণুকার মোটেই পছন্দ হয় না, কিন্তু কিছু বলিবার জো ত নাই, সহ্য করিতেই হইবে। কাজেই সুদর্শন চক্রের মত খোঁপা বাঁধিতেও হইল, সিঁথির ছুই তৃতীয়াংশ জুড়িয়া সিঁদূরও পরিতে হইল। ইহারা অনেকেই পুকুর ঘাটে গা ধুইতে যায়, দয়া করিয়া তাহাকে এবারের মত অন্তত নিষ্কৃতি দিয়াছে তাই রক্ষা। সে কলঘরেই গা ধোয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার এখানে নিবিড়, হারিকেনের মৃছু আলোয় তাহা অল্প তরল হয় মাত্র। রেণুর কেমন যেন গা ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে। রাত্রি কাটিয়া ভোর হইলে সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। দিনের বেলায়ও অবশ্য উৎপাত আছে। স্নানের আগে ননদের হাতে তেল মাখিতে বসা তাহার ভিতর প্রধান। প্রায় পোওয়া খানেক তেল মাখাইয়া তবে রাধারাণী সন্তুষ্ট হয়। ও কি মেমসাহেবী চাল, চুল যেন ফুর্ফুর্ করিতেছে, ও সব তাহাদের বাড়ী পোষাইবে না।

দেবর সুরেন বেশী কথা বলে না, তবে খোঁচা একেবারেই যে ছু একটা দেয় না, তাহা নয়। একদিন বলিল "ঘরে যে বৌদি এলেন তাঁর রাঙা হাতের পরিবেশন একদিনও ত জুট্‌ল না। হাতে হাঁড়ির কালি লেগে যাবার ভয় আছে বুঝি?"

বীণা বৌদির মহা ভক্ত এবং স্পষ্টবক্তাও বটে। সে বলিল "তা রাঙা হাতে হাঁড়ির কালি খারাপ দেখায়ই ত। তোমার যা বৌ আসবে ছোড়দা, তার কোনো অসুবিধা হবে না, গায়ের রং আর হাঁড়ির কালিতে একাকার হয়ে যাবে।"

মা কাছে ছিলেন না কাজেই বীণাকে তাড়া খাইতে হইল না। সুরেন খালি বলিল, "থাক্ আর বেশী জ্যাঠামি করতে হবে না।"

রাত্রে রেণুকা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপোর কি খুব কাল বৌ পছন্দ নাকি?"

নবীন বলিল, "হ্যাঁ তোমাকে দেখে ওর সংকল্প আরো দৃঢ় হয়েছে।"

রেণু বড় চোখ দুটি বিস্ময়ে আরো বড় করিয়া বলিল "তার মানে?"

নবীন হাসিয়া বলিল, "সুন্দরী স্ত্রীরা স্বামীকে বড় বেশী অভিভূত করে ফেলে, তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়, এইজন্য ভায়া আমার স্থির করেছেন এমন বৌ ঘরে আনবেন যে যাকে দেখলে পিলে শুদ্ধ চম্‌কে যায়।

রেণু মনে মনে বলিল, "আচ্ছা ঈডিয়ট ত।" তাহার কলিকাতা ফিরিবার দিন আসিয়া পড়িল। স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইল বটে, কিন্তু বাপের বাড়ী যাওয়ার আগ্রহ ত আছে! তাহা ছাড়া নবীনের সঙ্গে তাহার প্রায়ই দেখা হইবে, কারণ নবীনের কাজ ত কলিকাতাতেই! শনি রবিবারে সে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ী গিয়া দুই একদিন কাটাইয়া আসিতেও পারিবে। প্রফুল্লচিত্তেই রেণুকা বাপের বাড়ী ফিরিয়া চলিল, অর্গ্যানটা সঙ্গে লইয়াই গেল।

বড় বৌ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে না হইতে রাজলক্ষ্মী ছোট বৌ আনিবার চেষ্টায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। কর্ত্তাকে বলিলেন "কৈ হালিসহরের সেই মেয়ে দেখার কি হল? অঘ্রাণের গোড়াতেই বিয়ে দিতে হবে তা বলে রাখছি কিন্তু; আমার যা শরীর হয়েছে, কবে আছি কবে নেই। যাবার আগে সব গুছিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

শীর্ণকায় কর্ত্তা বিপুলা গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "যাবার তাড়া এত কিসের? এমন কি বয়েস হয়েছে?"

রাজলক্ষ্মী খুসি হইয়া বলিলেন, "সে যাক্‌গে, মেয়ে দেখার কি করছ বল? ঘট্‌কী মাগী যা বলে গেল, তাতে কিছু মন্দ শোনায়নি। তবু নিজেদের চোখে মেয়ে একবার দেখা দরকার। কবে যাবে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভাল দিন থাকে ত কাল পরশুই যেতে পারি, আমার আর অসুবিধে কি? তোমার ছেলেও যেতে চায় নাকি?"

রাজলক্ষ্মী মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "এ ছেলে আমার তেমন নয় গো, ধর্ম্মে ওর মতি কত। যা আমরা এনে দেব তাই নিয়ে ঘর করবে। নবীনের মত সুন্দর সুন্দর বাই ওর নেই।

কর্ত্তা বলিলেন, "তবু এঁরা হলেন সব কলিযুগের রোজগেরে ছেলে, এঁদের মতে চলাই ভাল। নইলে আবার অপ্রস্তুতে পড়তে হবে। ও রাধু, তোর ছোড়দাকে জিগ্‌গেস করত হালিসহরে ও নিজে যেতে চায় কিনা। কাল পরশুর মধ্যে কনে দেখতে যাব।"

সুরেন তখন বৈঠকখানায়, তক্তপোষে শুইয়া "কৃষ্ণ চরিত্র" পড়িতেছিল। রাধারাণী ও বীণাপাণি দুই বোনেই গিয়া হাজির হইল সেখানে। রাধু কিছু বলিবার আগেই বীণা বলিল, "ও ছোড়দা, কাল না পরশু বাবা তোমার কনে দেখতে যাচ্ছেন বুঝলে? তা তুমি যেতে চাও নাকি?"

সুরেন গম্ভীর মুখে বলিল, "না।"

রাধারাণী বলিল, "নিজে দেখে শুনে নেওয়া কিন্তু ভাল ছোড়দা, তাহলে আর পরে গণ্ডগোল হবার পথ থাকে না।"

বীণা বলিল, "গায়ের রংটা ঠিক হাঁড়ির কালির সঙ্গে মিশ্‌বে কিনা সেটা দেখে নেওয়া চাই ত?"

সুরেন ছোট বোনের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিল, "বীণি, কথা বলতে যখন জানিস্ না,

তখন কথা বল্‌তে আসিস্ না। রাধু বাবাকে বল গিয়ে আমি যাব না, তবে তাঁরা যেন তিনকড়েকে সঙ্গে নেন।

রাধু বলিল, "আচ্ছা, আয় লো বীণি। রাগ করলে কি হবে? গুরুজনের সঙ্গে কি ঐরকম করে কথা কয়?

ভাল দিন তৎক্ষণাৎ পাওয়া গেল। সুতরাং পরদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া সারিয়া কর্ত্তা, তাঁহার এক খুড়তুতো ভাই, এবং ঘোষালদের তিনকড়ি কনে দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

গৃহিণী মেয়েদের লইয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "রাধুর আর নবুর সংসার ত পেতে দিলাম এখন সুরুর আর বীণির ব্যবস্থা হলেই হয়। এই বিয়েতে হাজার দেড় পেলে আর একখানা টিনের ঘর হয়ে যায়, বীণির বিয়ের জোগাড়ও খানিক হয়। তারপর আমার দায় থেকে মুক্তি বাপু, কাশী বিন্দেবন যে দিকে মন চায়, বুড়োকে নিয়ে চলে যাব।"

রাধারাণী বলিল, "কি যে বল তার ঠিক নেই। চিরটা কাল খাটলে, এখন যেই একটু গুছিয়ে বসবার সময় হল অমনি কাশী বৃন্দাবন যাচ্ছ। কেন, কি দুঃখে? বসে বৌদের হাতের সেবা নেও দুদিন, নাতিপুতি নিয়ে আহ্লাদ কর, তারপর যত পার কাশী যেও।"

মা বলিলেন, "হ্যাঃ, তুইও যেমন। কলিকালের মেয়ে আবার শাশুড়ীর সেবা করবে। ঘাড় ধরে বার না করে ত ঢের্। যা সব বিবিয়ানা ঢং, আর যা সব মূর্ত্তি, তাঁদেরই কে সেবা করে তার ঠিক নেই।"

রাধা বলিল, "তোমাদের ঐ এক ছিরির কথা। কেন গা, কলিকালের মেয়েরা কি গিয়েই শাশুড়ীদের গলা টিপে দেয় নাকি? এই ত আমার বুড়ী শাশুড়ী রয়েছে, জিগ্‌গেস্ কর না তাকে, কত গলা টিপ্‌ছি?"

মা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমার রক্তে জন্ম তোর, তুই কেন অমন হবি? তা বাপু যাই বল্ আমাদের বড় বৌ যা হল, তাকে শুধু বিবি সাজিয়ে বসিয়ে রাখা চল্‌বে, কাজকর্ম্ম কিছু তাকে দিয়ে হবে না। আমরা মানুষ চিনি।"

বীণা কি বলিতে যাইতেছিল, রাজলক্ষ্মী তাহাকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "তুই থাম দেখি বাপু! বৌ যেন ওঁকে উকীল লাগিয়ে গেছে, সব তাতে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে আসে।"

কর্ত্তার ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। গৃহিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া পাখা লইয়া হাওয়া করিতে বসিলেন। বলিলেন "একেবারে তেতে পুড়ে এলে। শরীর ত এমনিতেই যা। বেশী কষ্ট হল নাকি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "না, গাড়ীতে গেলাম, এলাম, কষ্ট আর বেশী কি হবে? ওরা আদর যত্ন খুব করেছে, তাদের অবস্থার পক্ষে। তবে মেয়ে ত দেখতে বড় কুৎসিত মনে হল। এতটা মনে করিনি।"

গৃহিণী বলিলেন, "খুব কুৎসিত মানে? কালো রং এই ত? তা সুরুর আমার শাদা চামড়ার উপর লোভ নেই।"

কর্ত্তা বলিলেন, "না, শুধু রং কাল নয়, মুখ চোখও ভাল না। রোগা মত, চুলও বেশী নেই।

সাদাসিদে হলে চলে একরকম, তা অত কুৎসিত বৌ আনা কি ঠিক? নাতী নাতনী যে একেবারে রক্ষেকালীর বাচ্চা হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমার এক কথা। কৈ ঘটকী মাগী ত এমন বলে নি! তুমি সন্ধ্যের অন্ধকারে কি দেখতে কি দেখেছ। দাঁড়াও তিনকড়েকে ডেকে জিগ্‌গেস করছি।

তিনকড়িকে পাওয়া গেল না। সুরেন তাহাকে লইয়া ততক্ষণে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়া বসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কেমন দেখলি রে?

তিনকড়ি বলিল, "যেমনটি চেয়েছ ভাই। ওর দিকে তাকিয়ে অন্তত পরকালের ভাবনা ভুলবে না, তা তোমায় লিখে দিতে পারি।"

তিনকড়ির উৎসাহে সুরেন একটু যেন দমিয়া গেল। "সাজসজ্জা কেমন দেখলি? শহুরে বিবিদের মত?"

তিনকড়ি জিভ কাটিয়া বলিল, "আরে রামঃ, শুধু লাল পেড়ে শাড়ী আর শাদা সেমিজ জামা পরা। চুলও বাঁধেনি। গায়ে গহনা গাঁটি নেই, বড় গরীবের ঘর। তবে এর দাদামশায় কলকাতায় থাকেন, তাঁর ভরসায়ই বিয়ের প্রস্তাব করেছে, তিনি খরচপত্র দেবেন বলেছেন। মেয়ের বাপ নেই কিনা। হালিসহরে ঠাকুর্দ্দা বুড়ো আর খুড় থাকে।"

সুরেন বলিল, "ঠাকুর্দ্দা ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তাঁর নাম শুনেই এগোন যাচ্ছে। তবে মেয়ে বেশীর ভাগ থাকে কলকাতায়, শিক্ষা দীক্ষা কেমন কে জানে?"

তিনকড়ি বলিল, "শিক্ষাদীক্ষা ঘরেই যা হয়েছে। ইস্কুল টিস্কুলে যায় না শুনলাম।"

"বয়স কত?" তিনকড়ি বলিল "ওটি জানতে চেওনা ভাই, মেয়েদের বয়স আমি মোটেই বুঝতে পারি না।"

সুরেন বাড়ী ফিরিয়া গিয়া বোনকে দিয়া পিতামাতাকে জানাইয়া দিল তিনকড়ির মুখে বর্ণনা শুনিয়া কনে তাহার পছন্দ হইয়াছে।

এইবার দেনা পাওনার কথা আরম্ভ হইল। গৃহিণী দেড় হাজার টাকা নগদ চান, কন্যাপক্ষ সব জড়াইয়া আড়াই হাজারের বেশী খরচ করিবে না বলিয়া খোট্ ধরিয়া বসিয়া আছে। অনেক কথাবার্ত্তার পর, দুই পক্ষেরই কথা রহিল। দেড় হাজার টাকা তাহারা দিতে রাজী। আগাম দিতেই রাজী। কিন্তু আর কিছু যেন তাহাদের নিকট প্রত্যাশা না করা হয়। যেমন তেমন করিয়া তাহারা বিবাহ সারিয়া দিবে। কলিকাতায়ই বিবাহ হইবে।

গৃহিণী একটু খুঁৎ খুঁৎ করিলেন, সকল দিকেই যে নবীনের চেয়ে নিরেশ হইল! কিন্তু উপায় যখন নেই সহ্য করিতেই হইবে। তাড়াতাড়ি আশীর্ব্বাদ সারিয়া, টাকা ঘরে আনিয়া তিনি একখানি মেটে চালাকে পাকা ঘরে পরিবর্ত্তিত করিতে ব্যস্ত হইলেন। বড় বৌকেও এই ফাঁকে বাপের বাড়ী হইতে আনাইয়া লইলেন। বীণাপাণি বলিল, "বৌদি আরো সুন্দর হয়ে এসেছ যে?"

রেণু হাসিয়া বলিল, "যাঃ, কি যে বলে।"

বিবাহের দিন দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। বৌ লইয়া সুরেন যেদিন বাড়ী ফিরিবে, তাহার পরদিনই বৌভাত। কাজেই এ বাড়ীতেও আয়োজনের ধুম বাধিয়া গেল।

বরযাত্রী বেশী না লইয়া যাইবার অনুরোধ ছিল। তবু বাদসাদ দিয়াও গোটা ত্রিশ দাঁড়াইল। শুভক্ষণ দেখিয়া, শঙ্খধ্বনির সঙ্গে যাত্রা করিয়া সুরেন সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইল।

কনের বাড়ী একটু সাজান হইয়াছে বটে, তবে বাজনা বাদ্যের ঘটা নাই। লোকজন নিতান্ত মন্দ জমা হয় নাই। আদর অভ্যর্থনার কিছু ত্রুটি হইল না, তবে বিবাহে ঘটা না করিবার যে প্রস্তাব পাত্রীপক্ষ করিয়াছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইল।

শুভদৃষ্টির সময় কন্যাকে দেখিয়া সুরেনও চমকিয়া উঠিল। তিনকড়ির কথা সত্যই বটে। এত-খানি কুৎসিত না হইলেও চলিত। কিন্তু তাহাতেও তত আসে যায় না, এত ভীষণ রোগা কেন? এই মেয়ে আদর্শ কুলবধূর কর্ত্তব্য কিরূপে পালন করিবে? স্বাস্থ্যের বিষয় সে না হয় কিছু বলে নাই, বাবার কি দেখিয়া লওয়া উচিত ছিল না?

যাহা হোক, বিবাহ হইয়া গেল, সুরেন বৌ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই বৌয়ের হইল জ্বর।

বীণা বলিল, "এই নাও, ফর্শা না হলেও দেখি রুগ্ন হতে আট্‌কায় না।" মা বৌ দেখিয়া অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিলেন, কথা বলিলেন না।

বৌয়ের নাম মালবিকা। সুরেন নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "যত সব নাটুকেপণা, এ বাড়ীতে ওর নাম হল সাবিত্রী।"

সাবিত্রীর বৌভাত হইয়া গেল। জ্বরের ধমকে সে বেশীক্ষণ বসিতেও পারিল না, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হইল।

বৌভাতের পরদিনই মা বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "অত রোগীর সেবা করতে পারব না বাপু। ভাল করে সারিয়ে সুরিয়ে পাঠায় যেন।" বৌয়ের সঙ্গে সুরেনের কোন পরিচয় হইবার আগেই সে চলিয়া গেল।

পরের সপ্তাহে শ্বশুর বাড়ী হইতে সুরেনের নিমন্ত্রণ আসিল। বৌয়ের মামাতো বোনের বিবাহ, সুরেন যদি দিন দুই আগে আসিতে পারে, তাহা হইলে সকলে বড় খুসি হইবেন। সুরেন কাহাকেও খুসি করিতে রাজী হইল না, বলিল, "বিয়ের দিনই যাব এখন, অত আদেখলামি আমার ধাতে নেই।" নবীন কথা শুনিয়া একটু হাসিল মাত্র।

বিবাহের দিনে দুই ভাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিল। অতদূরে যাইতে বাড়ীর মেয়েদের ইচ্ছা হইল না।

ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া একখানা ট্যাক্সি লইয়া দুই ভাই চলিল। নূতন কুটুমের বাড়ী একে-বারে ট্রামে চড়িয়া হাজির হওয়া যায় না ত!

ট্যাক্সি আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। এ বিবাহে ঘটার অভাব নাই, বাহিরেই ফুলপাতা রঙীন কাগজ মণ্ডিত বিচিত্র তোরণ, দুই রকম ব্যাণ্ডের শব্দে কানে তালা ধরিয়া যায়।

লোক জনের ভীড়ও খুব। অভ্যর্থনা করিতেই যে কতগুলি দাঁড়াইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। তরুণ তরুণী, বালক বালিকা, কিছুরই অভাব নেই।

"আসুন, আসুন, দেরি দেখে ভাবছিলাম, ভুলেই গেলেন নাকি," বলিয়া একটি যুবক তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিল। নবীন হাসিমুখে প্রত্যুত্তর দিয়া অগ্রসর হইল।

সুরেন কিন্তু তখন পাথরের মূর্ত্তির মত ফুটপাথে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহার গজখানেক দূরেই, তাহার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী মালবিকা ওরফে সাবিত্রী দাঁড়াইয়া অতিথিদের অভ্যর্থনা করিতেছেন। তাঁহার মাথায় ঘোমটা নাই, বব করা চুল কাঁধ অবধি ঝুলিতেছে। ভুরু কামাইয়া, তুলিদিয়া আঁকা হইয়াছে, বসা গালে গোলাপী রুজ্, ঠোঁটে রক্তের মত লাল লিপ্‌স্টিক্। অতি নীচু গলার হাতহীন পাৎলা জর্জ্জেটের জামার তলা দিয়া পাঁজরগুলি গোনা যাইতেছে, জর্জ্জেটের শাড়ী খানি, সাপের খোলশের মত গায়ে লেপ্‌টাইয়া আছে। পায়ের জুতার হীল প্রায় দুই ইঞ্চি উঁচু। সরব হাস্যে ফুটপাথ প্রকম্পিত।

হায় কলিকাল!



বঙ্কিমচন্দ্র

ব্রজ শর্ম্মা

১

যে দিন সমগ্র দেশ নিদ্রা ঘোরে ছিল অচেতন পরাধীনতার গ্লানি
বহি' নিজ শিরে,
যে দিন এ দেশবাসী প্রতিবাদ করিত না লাঞ্ছিতা হইতে দেখি
নিজ জননীরে,
সে দিন প্রথম তা'র কে ভাঙ্গা'ল সেই ঘুম, কে শিখা'ল বাঁচাইতে
জননীর মান?
তুমিই ভাঙ্গায়ে ঘুম প্রথম শিখা'লে তাহা, হে বঙ্কিম
তোমারে প্রণাম।

২

গভীর অরণ্য হ'তে তোমার উদাত্ত কণ্ঠ যে দিন মুক্তির মন্ত্র
উঠিল গাহিয়া
না জানি কি মন্ত্র বলে বাঙ্‌লার একপ্রান্ত হ'তে আর প্রান্ত তাহা
দিল আলোড়িয়া,
বাঙ্‌লার নর নারী শতাব্দীর মোহ নিদ্রা ত্যজি উঠিল জাগিয়া
শুনি সে আহ্বান,
জনগণ উদ্বোধক, নবযুগ স্রষ্টা ঋষি, সত্যনিষ্ঠ যে বঙ্কিম
তোমারে প্রণাম!

৩

তারপর ধীরে ধীরে তোমার প্রদীপ্ত শিখা লাগিল নাশিতে ভারতের
গাঢ় তমিস্রায়,
ধীরে ধীরে বেলা হ'লে হেমন্তের কুজ্ঝটিকা রাশি যেমন বিলীন হয়
দীপ্ত সবিতায়—
সে আলোকে সেই দিন এ ভারত প্রথম বুঝিল এই জগতের মাঝে
কোথা তা'র স্থান,
ভারতের মুক্তিগুরু, ভারতীর নয়ন-দুলাল, তমোপহ হে বঙ্কিম
তোমারে প্রণাম।

৪

আজ তুমি কোথা আছ, কোন রাজ্যে, কত ব্যবধানে ওগো ঋষিবর
কিছু নাহি জানি,
শুধু জানি আছ তুমি ভারতের প্রতি মানবের হৃদয় মন্দিরে
হে তাপস, জ্ঞানী,—
শতাব্দীর পারে আজি তব পুণ্য জন্মতিথি স্মরি' তব দেশবাসী গাহে
তব জয় গান,
তা'রি সাথে এ বঙ্গের কোন এক অখ্যাত কবির আজি শতবর্ষ পরে
লহ হে প্রণাম।

উন্মীলন

বুদ্ধদেব বসু

বেলা সাড়ে আটটা আর সাড়ে দশটার মধ্যে বালিগঞ্জ থেকে শহরগামী ট্র্যামে বসবার জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব—যদি না আপনার বাসস্থান ইষ্টিশান থেকে আধ মাইলের মধ্যে হয়। লেক মার্কেটের কাছাকাছি আসতে-আসতে ট্র্যামটিতে আইনত একটি ইঁদুরেরও আর জায়গা থাকে না; কিন্তু ইঁদুরের পক্ষে যা অসম্ভব, মানুষের পক্ষে তা যদি সম্ভব না হবে তাহ'লে কি এত বড়ো সভ্যতাই গড়ে উঠতে পারতো, না কি কলকাতার আপিসগুলোই এমন নির্বিঘ্নে চলতো। ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, গরম, সিগারেটের ধোঁয়া, সঙ্কীর্ণ আশ্রয়ে আন্দোলিত হ'তে-হ'তে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করবার পঙ্কিল কসরৎ—তারপর কাঁটায়-কাঁটায় আপিসে পৌঁছিয়ে নিজের চেয়ারটিতে বসবার সার্থকতা। স্টেশনের কাছাকাছি থাকলেও বসবার জায়গা যে পাওয়া যাবেই তা বলা যায় না; দাঁড়িয়ে যেতে হবে এ-কথা মনে ক'রেই বাড়ি থেকে বেরুনো ভালো। নিবারণ তাই করে; আর তা-ই শরীরের কষ্ট হ'লেও মনে তার কোনো দুঃখ নেই। যা সহ্য না ক'রে উপায় নেই, তা নিয়ে আক্ষেপ করলে দুঃখ শুধু বেড়েই চলে, আর কোনো লাভ হয় না, নিবারণের এই মত। নিবারণ দুঃখ বাড়াবার পক্ষপাতী নয়, তাই সে কখনো আক্ষেপ করে না, নিজের মনেও জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ প্রশ্রয় দেয় না। সপ্তাহে দু'দিন যদি সে আপিসের ট্র্যামে বসতে পায়, তাহ'লেই সে মনে করে কপাল ভালো; বাকি চারদিন দাঁড়িয়ে থাকাটাকে সে কিছু মনে করে না। সপ্তাহে ছ'দিন যাবার মতো একটা আপিস যে তার আছে, এবং মাসের শেষে যে সেখান থেকে একশো পঁচিশটি মুদ্রা তার করতলগত হয় এতেই সে সুখী। একশো পঁচিশ সংখ্যাটা যখনই সে মনে-মনে ভাবে তখনই তার ঈষৎ রোমাঞ্চ হয়; এমনকি, কোনো বাড়ির গায়ে একশো পঁচিশ লেখা দেখলেও সেই নম্বরটির দিকে সে সলজ্জ সহর্ষ দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থাকে। তার চাকরি তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়—তার অবস্থায় কারই বা তা না হ'তো? সে কী, কী তার যোগ্যতা? কিছুই নয় সে, ময়দানে যত ঘাস, বাংলাদেশে তার মতো ছেলেও তত। বিধবা মা অতি কষ্টে মানুষ করেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেহাৎ সাধারণ বি-এ পাস, মামা কাকা পিসের জোর নেই, আর তার অদৃষ্টে কিনা এই চাকরি! নেহাৎই পিতৃগণের পুণ্যফলে ও মায়ের আশীর্বাদের জোরে এটা সম্ভব হয়েছে, নয়তো···শহরের বেকারমিছিলের দিকে তাকিয়ে নিবারণ মনে মনে শিহরিত হয়, ঐ শীর্ণ মুখ আর ক্ষুধিত দৃষ্টি সে যে সত্যি সত্যি এড়িয়ে গেছে তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। পঞ্চাশ টাকায় এই জাহাজ কোম্পানিতে ঢুকেছিলো, সাহেবের সুনজরে পড়ে পাঁচ বছরে একশো পঁচিশে প্রোমোশন—অসাধারণ ভাগ্যবান না হ'লে এ রকম হয় না। এমনকি, এখন তাকে স্যুট পরে আপিস করতে হয়, আর যদিও এতে খরচ কিছু বেড়েছে, তবু এই সম্মান উপযুক্ত বিনয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেছে সে। যা-ই বলো, চাকুরে মানুষকে এ পোষাকেই মানায়।

সুতরাং, বালিগঞ্জের ট্র্যামের ভিড়াক্রান্ত দুর্দশায় আর যে-ই আপত্তি করুক, নিবারণ দত্ত কখনো করে না। আগাগোড়া দাঁড়িয়ে যাওয়াটাই সে নিয়ম ব'লে মেনে নিয়েছে, সুতরাং যেদিন বসতে পায় সেদিন

মনে হয় একটা মহার্ঘ বিলাসিতার অধিকারী হ'লো। আর ফেরবার পথে রোজই অবশ্য ব'সে আসে, কেননা সে ট্র্যামে ওঠে ক্লাইভ স্ট্রীটের মোড়ে, আর লালদিঘি পরিক্রমা শেষ হ'লে তবে ট্র্যামটি ভরে। এই বসে আসাটুকু সারাদিনের মধ্যে তার একটি প্রধান আরাম।

নিবারণ থাকে মনোহরপুকুরে, তিনকোণা পার্কের পিছন দিয়ে যে রাস্তাটি হিন্দুস্থান পার্কে গিয়ে মিশেছে। তার বাড়ির সামনে কাঁচা ড্রেন, উল্টোদিকে জঙ্গল, বড্ড মশা, কিন্তু অপেকাকৃত খারাপ রাস্তা ব'লেই সে বত্রিশ টাকায় অমন বাড়িটি পেয়েছে। আর এমন খারাপ রাস্তাই বা কী—বড়োলোকেরই তো পাড়া, লেক কাছে, কয়েক পা হাঁটলেই ট্র্যাম। সেদিন কিন্তু সেই কয়েক পা-ই তার অনেকটা রাস্তা মনে হচ্ছিল, কেননা আগের রাত্রে সে মোটে ঘুমুতে পরেনি। ছোটো ছেলেটার কী বিশ্রী এক কাসি হয়েছে, তাকে নিয়ে সারা রাত হৈ-চৈ। বাস্‌রে, ছেলেটা চ্যাঁচাতেও পারে! ফুসফুসে যার অত জোর, তার আবার অসুখ করে কেমন ক'রে! ডাক্তার দেখাতে হবে, আর ডাক্তার এসেই বা ছাইভস্ম কতগুলো ওষুধ দেবে—যাবে কয়েকটা টাকা। বরং বীণাকে কয়েকদিন আসানসোলে তার মামার কাছে রাখলে হয়—তবে যদি ছেলেপুলেগুলোর শরীর সারে।

হাঁটতে হাঁটতে নিবারণের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো। আজ যেন সে ট্র্যামে বসতে পায়, তাহ'লে এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট যা হোক একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে। ট্র্যাম এলো, সামনের জায়গাটুকুতে চার-পাঁচজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তার মন খারাপ হ'য়ে গেলো। ট্র্যামে উঠে সে করুণভাবে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলো। কাঁধ, মুখ, পিঠ, সবই গভীর গাম্ভীর্যে অনড়; টুপির ধার, কোটের রেখা, চাদরের প্রান্ত, জুতোর ফিতে, সবই স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অফিস-অভিসারে অনন্যমনা; ভাঁজ-করা খবরের কাগজ, খোলা বই, আধ বোজা চোখ, দৃষ্টিহীন খোলা চোখ—সবই এক লক্ষ্যে নিবিষ্ট, নিমগ্ন; সচল শুধু সিগারেটের ধোঁয়া, আসন্ন আটঘণ্টার জীবনহীন অস্তিত্বের মতোই অস্পষ্ট, শূন্য। সকলেই চলেছে এক জীবিকার তীর্থে, অনেকেই অনেকের মুখ চেনা, কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না; সমস্ত ট্র্যামে গম্ভীর অস্বাভাবিক স্তব্ধতা—মুদ্রার প্রফুল্ল সুখকর ঝঙ্কারও বিশেষ শোনা যাচ্ছে না, কারণ প্রায় সকলেরই মাসিক টিকিট। শুধু, যখন ট্র্যামটা থামছে, তখন পাশের সেকেণ্ড কেলাস থেকে ইতর কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

খোলা জায়গাটুকুতে চার পাঁচজনের মধ্যে নিবারণ গিয়ে দাড়ালো। পরের স্টপে ট্র্যাম থামতেই অন্যান্য লোকের সঙ্গে দুটি মেয়ে এলো এগিয়ে। মেয়ে দুটিকে দেখে নিবারণ আরো বেশি ক্ষুব্ধ হ'লো। যদিও আজকের দিনে আপত্তি করে আর লাভ নেই, এবং যদিও বছরে দু'চারবার সে নিজেও বীণাকে নিয়ে ট্র্যামে চড়েই বাংলা সিনেমায় যায়, (মিছিমিছি অতগুলো ট্যাক্সির পয়সা, তার উপর তার মাসিক টিকিট!) তবু মনে মনে সে মেয়েদের সাধারণ যানে ভ্রমণ করবার পক্ষপাতী নয়। তার জীবনে প্রবলতম প্রভাব তার মা-র, সে নিজেও জানে না যে তার সমস্ত মতামতই আসলে ঐ সনাতনী বিধবার। বিশেষ, এই আপিসের সময়ে কোনো বঙ্গনারীকে ট্র্যামে চড়তে দেখলে তার মন তীব্র প্রতিবাদ ক'রে ওঠে। ফিরিঙ্গি মেয়েগুলোর কথা আলাদা, তাদেরও আপিস করতে হয়; কিন্তু নিবারণ কল্পনাও করতে পারে না যে কোনো বাঙালি মেয়ের এমন কোনো দরকার থাকতে পারে যাতে এক ঘণ্টা আগে কি পরে বেরুলে চলে না। তার মনে হয়, পুরুষদের শাস্তি দেওয়া ছাড়া এ-সময়ে মেয়েদের ট্র্যামে ওঠার কোনই উদ্দেশ্য নেই;

সারাদিন খেটে ঘরে-ঘরে যারা স্ত্রী-জাতিকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করছে, তাদের দাঁড় করিয়ে রেখে (দাঁড়াবারই বা জয়গা কোথায় ?) মজা দেখতেই যেন এই চপল হৃদয়হীনারা এ সময়ে বাড়ি থেকে বেরোয়। যাই হোক, মেয়ে দুটি উঠলো, দাঁড়ানো যাত্রীরা যথাসাধ্য সঙ্কুচিত হয়ে তাদের জন্যে পথ ক'রে দিলে; লেডিজ সীট থেকে দু'জন উঠে এসে তাদের দলে যোগ দিলে, আরো তিনচার জন চাকুরিজীবী উঠলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-জায়গাটুকু মনুষ্যমাংসে যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, পার্শ্ববর্তীর গায়ের গন্ধ না শুঁকে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না।

এ ভারি বিশ্রী। হাত তোলা যায় না, পা নাড়া যায় না, হাঁচি এলে হাঁচি আটকে রাখতে হয়। তার উপর কাল সারা রাত সে ঘুমোয়নি। একটু একটু ক'রে ভিড় ঠেলে, রীতিমতো চেষ্টা করে নিবারণ সামনের দিকে এগিয়ে এলো, হাতল ধরে দাঁড়ালো একেবারে রাস্তার সামনে। তবু ভালো, এখানে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। অবশ্য এই সুখ-স্থানটির উপর অধিকার বজায় রাখা শক্ত, যখনই কেউ ওঠে কি নামে (দু'একজন নামেও, কিন্তু তাতে কিছুই সুবিধে হয় না), সরে দাঁড়াতে হয়, এবং মুহূর্ত্তেই জায়গাটি বেদখল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিছু বুদ্ধিবলে, কিছু ক্ষিপ্র অঙ্গচালনার ফলে নিবারণ তার আকাঙ্ক্ষিত জায়গাটিতেই দাঁড়িয়ে রইলো, ট্র্যাম চলেছে আস্তে আস্তে, এক্ষণে কালীঘাট ডিপো, বালিগঞ্জ দূরও কিছু!

হাজরা রোডের কাছাকাছি এসে নিবারণের প্রতিবেশীদের মধ্যে একটা নড়াচড়ার ঢেউ খেলে গেলো; মেয়ে দুটি নামছে। নিবারণ হিসেব ক'রে দেখলো যে ঐ ভিড় ঠেলে পরিত্যক্ত আসন দখল করা তার পক্ষে অসম্ভব, তাছাড়া এলগিন রোড আর থিয়েটার রোডের মধ্যে দু'চারজন ফিরিঙ্গি মেয়ে উঠবেই, তখন তো আবার দাঁড়াতেই হবে। একপাশে দাঁড়িয়ে মেয়ে দুটির দিকে সে হিংস্র চোখে তাকালে। দু'জনেই তরুণী; একজন ফর্সা ও লম্বা, চিক্‌চিকে কালো চুল মাঝখানে সিঁথি করা, পরনে একটি ধব্‌ধবে ফর্সা লাল-পেড়ে শাড়ি, সুন্দর সুডৌল বাহু দুটি সোনার রুলি-পরা মণিবন্ধের কাছে সরু হ'য়ে পাঁচটি টুক্‌টুকে আঙুলে পর্য্যবসিত। ফর্সা মেয়েটি সামনে, এবং তাদের নামতে অন্তত দশ-বারো সেকেণ্ড সময় লাগলো, তাই নিবারণ তাকে লক্ষ্য করবার সময় পেলে যথেষ্ট। মেয়েটি সুন্দর বলেই বোধ হয় আক্রোশটা যেন আরো তীব্র হ'য়ে উঠলো, যেটুকু না সরলেই নয় তার বেশি সে সরলে না, হাতলটা ধরেই রইলো। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তার সৎসাহস পরাস্ত হ'লো, হাতল থেকে হাত সরাতেই চকিতে তার হাত ফর্সা মেয়েটির নগ্ন বাহুর সঙ্গে লাগলো—আর তার পরেই মেয়ে দুটি নেমে গেলো, ট্র্যাম দিলে ছেড়ে।

রাস্তা পার হ'য়ে মেয়ে দুটি ফুটপাথে গিয়ে উঠলো, যতক্ষণ দেখা গেলো নিবারণ রইলো বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আশুতোষ কলেজের কাছে ছেলেমেয়েদের ভিড়, বুঝি কোন পরীক্ষা হচ্ছে, ঐ মেয়ে দুটিও নিশ্চয়ই পরীক্ষার্থী। মেয়েটির বাহুর স্পর্শ তার যে-হাতে লেগেছিলো, নিজের সে-হাতটির দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো, হাতল চেপে ধরলে অন্য হাতে। এখন এই হাতটি নিয়ে সে কী করে? কী ক'রে এই হাতটিকে সে বাঁচাবে নানা স্থূল ও সাধারণ স্পর্শ থেকে? যাবে, এই অদ্ভুত, আশ্চর্য স্পর্শ দু' এক ঘণ্টার মধ্যেই মুছে যাবে তার হাত থেকে, তার জীবন থেকে, তার স্মৃতি থেকে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সে তার এই ক্ষণিকের অপরূপ অভিজ্ঞতাটি মনে-মনে আবার অনুভব করবার চেষ্টা করলে। সে তো এর

আগে কখনো জানেনি যে স্ত্রীলোকের দেহের স্পর্শ এই রকম। কী কোমল, কী শীতল! তার মনে হ'লো স্ত্রী-দেহের স্পর্শই সে কখনো পায়নি, যদিও সে আজ পাঁচ বছর বিবাহিত, এবং তিনটি সন্তানের পিতা। জীবনে সে দুটি মাত্র স্ত্রীলোককে কাছে পেয়েছে—তার মা আর তার স্ত্রী, দু'জনেই সেবাপরায়ণা, তার প্রতি স্নেহান্ধ, তার সুখসাধনে আত্মত্যাগী। স্ত্রীলোকের কাছ থেকে পুরুষের যা পাবার তা সে পরিপূর্ণ মাত্রাতেই পেয়েছে ও পাচ্ছে, এই রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিলো তার মনে। কিন্তু এ কী! পুরুষকে স্ত্রীলোকের যা শ্রেষ্ঠ দান—তা কি এই, এই নগ্ন, কোমল বাহু, আর স্নিগ্ধ মসৃণ শরীর? আর এ-ই থেকেই সে কি চিরকাল বঞ্চিত?

তার চাকরি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মা তার বিয়ে দেন। সে আপত্তি করেনি—কেনই বা করবে?—দেখে-শুনে একটি ভালো বংশের সুলক্ষণা পনেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মেয়েটিও গরিবের ঘরের, কাজ করতে হবে ব'লেই এসেছিলো, প্রথম দিন থেকে মনে-প্রাণে দু'হাতে কাজ করেছে। নিবারণ তার নব-বিবাহিত দিন ও রাতগুলির কথা ভাবলে···কোথায়, কোথায় এই স্পর্শের উন্মাদনা? বীণারও তো স্ত্রীলোকের শরীর, কিন্তু তার শরীরকে কী করে সে লুকিয়ে রেখেছে, কোথায় সে লুকিয়ে রেখেছে? নিবারণের হঠাৎ মনে হ'লো যে যদিও এই পাঁচ বছর তারা পাশাপাশি এক বিছানায় ঘুমুচ্ছে, তবু এ-পর্য্যন্ত তার স্ত্রীর শরীর সে দেখেনি। অবশ্য শরীর তার নামমাত্রই ছিলো। বড্ড রোগা ছিলো প্রথমটায়, এবারে তৃতীয় সন্তানটির জন্মের পরে দ্রুতবেগে মোটা হ'য়ে যাচ্ছে।···শরীর, শরীর, কোন্ দেবতার মন্দির তুমি, প্রাণময়ী প্রতিমা, আর কোন্ দেবতাই বা তোমাকে ছেড়ে চলে যায়, রেখে যায় খড় আর মাটি, মাটি আর খড়।

নিবারণ তার স্পর্শময় হাতখানা আর একবার চোখের সামনে খুলে ধরলো, তারপর পকেটে ঢুকোতে গিয়েই নিয়ে এলো তুলে, পাছে সেই মহামূল্য স্ত্রী-সত্তাসার কোটের ঘষা লেগে এক্ষুনি উবে যায়।

* * *

ফেরবার পথে নিবারণ ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখে সেই মেয়ে দুটি ট্র্যামে এসে উঠলো। স্বপ্ন নাকি? না, ঐ তো আশুতোষ কলেজ, বাইরে ভিড়, পরীক্ষা শেষ করে ছাত্রছাত্রীরা ফিরছে। মেয়ে দুটি কিন্তু দাঁড়িয়েই। ট্র্যামে জায়গা নেই, লেডিজ সীট দুটিই মহিলাদ্বারা অধিকৃত। তড়াক ক'রে নিবারণ উঠে দাঁড়ালো, তার পাশে ব'সে ছিলেন যে আধ-বুড়ো ভদ্রলোক, তিনিও ঘোরতর অনিচ্ছায় উঠতে বাধ্য হলেন। মেয়ে দুটি অনায়াসে এগিয়ে এসে সদ্য-পরিত্যক্ত আসনে বসলো, যে-পুরুষের উদারতায় তারা এই সুবিধাটুকু পেলে, তাকে সামান্য একটা মৌখিক ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাক, তার দিকে একবার তাকালে না পর্য্যন্ত, তার কোনো অস্তিত্বই যেন নেই। নিবারণ তাদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো। যে-নগ্ন, সুন্দর বাহুটি তাকে স্পর্শ করেছিলো, সেটি ঠিক তার চোখের সামনেই—আর মেয়েটির মুখখানা একটু ক্লান্ত, একটু মলিন—কিন্তু এই ক্লান্তিটুকুও কত সুন্দর!

সে, নিবারণ দত্ত, পুরুষ, বি-এ পাস, সওয়া শো টাকার চাকুরে—সে বাঁদর, সে বেবুন—না, সে অস্তিত্বহীন, সে নেই, তার আপিস আর তার বাড়ির বাইরে কোনোখানেই সে নেই। মেয়েটির ক্লান্ত তরল

কালো চোখের দিকে সে একবার তাকালো, আর তার আপিস আর বাড়ি যেন এক প্রবল জোয়ারজলে ভেসে তলিয়ে গেলো···নেই, কোনোখানেই নেই সে।

না কি সে-ও আছে, তারও শরীর আছে, যে-শরীর উজ্জ্বল ও তুর্লভ, যাকে শরীর দিয়েই জাগাতে হয়, যে-শরীর তার কখনো জাগেনি, আর কখনো জাগবেও না।

ফর্সা মেয়েটি বললে, 'বাড়ি গিয়ে তুই আজ কী করবি ?'

অন্য মেয়েটি বললে, 'ঘুমুবো। তু'তিন দিন আর বিছানা থেকেই উঠবো না।'

ফর্সা মেয়েটি হাসলো।

অন্য মেয়েটি আবার বললে, 'পরীক্ষা ব্যাপারটা বিশ্রী। যতদিন না হয়, প্রাণ যায়, হ'য়ে গেলে আবার ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।'

'আমার কিন্তু পরীক্ষা দিতে বেশ লাগে।'

'তোর কথা আলাদা। অনায়াসে বোধ হয় ফার্স্ট্ই হবি তুই।'

'কে বললে তোকে ?'

অন্য মেয়েটি সে-কথার জবাব না-দিয়ে বললে, 'আমি আর এম-এ টেম-এ পড়বো না। যথেষ্ট বিগ্যে হয়েছে বাপু। তুই কি যাবি কোথাও কলকাতার বাইরে ?'

'বাবা বোধ হয় মুসৌরি যাবেন। পাহাড় আমার আর ভালো লাগে না—পুরী গেলে বেশ হয়। মা-কে ব'লে দেখবো। বাবা যান মুসৌরি, মাকে নিয়ে আমি আর দাদা পুরী যাবো। তুইও চল্ না আমাদের সঙ্গে।'

'সত্যি বলছিস ?'

'কেন, এটা এমন বেশি কথা কি ?

অন্য মেয়েটি চুপ ক'রে রইলো। খানিক পরে বললে, 'সেদিন শিপ্রা চ্যাটার্জিকে তোর কেমন লাগলো ?'

ফর্সা মেয়েটি ঠোঁট উল্টিয়ে মাথা নাড়লে।

'ওর স্বামীটি বরং ভালো।'

'তা ভাল হ'লেই বা লাভ কি এখন ?'

অন্য মেয়েটি অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, 'যাঃ !'

পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিবারণ প্রত্যেকটি কথা শুনতে পাচ্ছিলো। তার মনে হচ্ছিলো এরা যেন কোনো বিদেশী ভাষায় কথা বলছে, সে এর এক বর্ণও বোঝে না। কিন্তু এই ভাষার ধ্বনি এত মধুর যে সঙ্গীতের ইন্দ্রজালের মতো তার মনকে আচ্ছন্ন করছে। সে এক স্বপ্নের মধ্যে ঢুকেছে, কিন্তু এই স্বপ্ন যেন না ভাঙে, হে দেবতা, এই ধ্বনির কুহক যেন থেমে না যায় !

নিবারণের বাড়ির আগের স্টপে মেয়ে তুটি নেমে গেলো।

চৈত্র দিনের আলো তখনো মেলায়নি, কিন্তু নিবারণের একতলার ফ্ল্যাটে ইলেক্ট্রিকের হলদে বাতি জ্বলেছে। সে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই বীণা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো তার জুতোর ফিতে খুলে দিতে, কিন্তু নিবারণ বললে, 'থাক আমি নিজেই খুলছি।'

বীণা অবাক হ'লো, একটু দুঃখিতও হ'লো বুঝি। এ তো তার প্রতিদিনের ধরাবাঁধা কাজ, আজ তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

'কী, জুতো খুলবে না ?'

'নিজেই খুলতে পারবো।'

বীণা শঙ্কিতদৃষ্টিতে নিবারণের মুখের দিকে তাকালো—স্বামী কি কোনো কারণে রাগ করেছেন ? ক্যানভাসের ঈজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে স্ত্রীর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিবারণ বললে, 'একটা ময়লা শাড়ি পরেছো কেন ?'

বীণা বললে, 'ময়লা ! এই তো সেদিন ধোপের পাট ভেঙে পরলুম।'

'মশলার দাগ লেগেছে।'

—'তা দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হ'লে একটু-আধটু লাগে বইকি। পটের বিবি হ'য়ে থাকা তো আর আমাদের পোষায় না।'

নিবারণ বললে, 'সন্ধেবেলায় একখানা ভালো শাড়ি প'রে একটু ফিটফাট হ'য়ে থাকলেও তো পারো। কী চেহারার ছিরি !'

'ওঃ, বুড়ো হ'য়ে গেলাম, এখন আবার চেহারা ! ও রামের মা, দেখো তো চায়ের জলটা ফুটলো নাকি।'

বিশ্রস্ত আঁচল গায়ে তুলতে তুলতে বীণা রান্নাঘরের দিকে চললো। যেতে-যেতে ব'লে গেলো, 'হাত মুখ ধুয়ে নাও এবারে। চা আনছি।'

নিবারণ কিন্তু জুতোও খুললে না, পোষাকও ছাড়লে না, ওখানেই চুপচাপ ব'সে রইলো। একটু পরে বীণা চা আর খাবার নিয়ে এসে পাশের টীপয়ে রেখে বললে, 'এ কি ! পোষাক প'রেই ব'সে আছো ? ওঠো।'

নিবারণ কোট আর নেকটাই খুলে ফেলে বললে, 'আগে খেয়ে নিই। বোসো তুমি, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

বীণা মেঝের উপর দু'পা ছড়িয়ে বসলো, হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো নিবারণের পিঠে। কিন্তু নিবারণ খপ্ করে তার হাতটা ধ'রে ফেল বললে, 'থামো, হাওয়া করতে হবে না।'

'তোমার আজ হ'লো কি ? সবটাতেই এমন বাধা দিচ্ছ কেন ? ছাড়ো, হাওয়া করি।'

'না, না, হাওয়া করতে হবে না বলছি। মেঝেতে ব'সে পড়লে কেন ? এই চেয়ারটাতে বোসো।'

বীণা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, 'মাথা-খারাপ !'

'কেন ? মাথা-খারাপ হবে কেন ? তোমার কি চেয়ারে বসতে নেই ?' ব'লে নিবারণ বীণার পিঠের আঁচল ধ'রে টান দিলে।

'আঃ, কী অসভ্যতা করো ! মা রয়েছেন পাশের ঘরে, তীব্র চাপা-গলায় বীণা বললে।

নিবারণ হঠাৎ বললে, 'একটা ব্লাউজ পরতে পারো না ? খালি একটা শেমিজ পরে থাকলে কী বিশ্রী দেখায় !'

'ওঃ, তুমি তোমার ফ্যাশন নিয়ে থাকো। প্রাণ যায় গরমে !' বীণা আশ্চর্য্য কৌশলে মাথার উপরে

একটুখানি কাপড় বজায় রেখে গা থেকে আঁচলটা ফেলে দিলে। তারপর শেমিজের গলাটা দু আঙুলে সামনের দিকে টেনে ধরে আর এক হাতে নিজের বুকের মধ্যে হাওয়া করতে লাগলো। নিবারণ এ-দৃশ্য রোজই দেখে, কিন্তু আজ যেন সে সেদিকে তাকাতে পারলো না, মাথা নিচু ক'রে চা খেতে লাগলো।

বক্ষদেশ শীতল ক'রে পাখাটা পাশে নামিয়ে রেখে বীণা বললে, 'ছোট খোকার জন্য ডাক্তার আনবে নাকি ?'

'আনবো নাকি ?'

আমি তো বলি দরকার নেই। ছেলেপুলের সর্দিকাসি এমনিই সেরে যায়। মা আজ তুলসী-পাতার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছেন। এখন ভালো আছে। ছেলেপুলে নিয়ে আর শান্তি নেই। মণ্টু দুপুরবেলায় দোতলার ছেলের সঙ্গে মারামারি ক'রে নাক ফাটিয়ে এসেছে—ঐটুকু তো ছেলে, কিন্তু কী বিষম গুণ্ডা। আর দেরী না ক'রে ওকে ইস্কুলে দিয়ে দাও !'

নিবারণ বললে, 'হুঁ।'

'আর-এক কথা। সুষমার বিয়ে তেস্‌রা বৈশাখ—মাসিমা এসেছিলেন নেমন্তন্ন করতে। যাবো নাকি ভাবছি।' স্বামীকে চুপ দেখে বীণা আবার বললে, 'না গেলে ভালো দেখায় না।'

'তা যাবে বইকি।'

'কিন্তু খালি হাতে তো আর যাওয়া যায় না। তাই ভাবছিলুম—'

'খালি হাতে যাবে কেন ? কিছু নিয়েই যাবে।'

চার-পাঁচটাকা দামের মধ্যে একখানা শাড়ি—কি বলো ? হয়েছে নাকি তোমার চা খাওয়া ? আমি যাই, মা-র ঘরে লক্ষ্মীর আসন দিতে হবে।'

নিবারণ হঠাৎ বললে, 'লাল পেড়ে শাড়ি আছে তোমার ?

'কেন বলো তো ?'

'ফর্সা লাল-পেড়ে শাড়ি পরলে তো পারো মাঝে-মাঝে। বেশ দেখায়।'

'কেন, আজ কোনো সুন্দরীর লাল-পেড়ে শাড়ি দেখে মূর্চ্ছা যাওনি তো ? তোমরা পুরুষমানুষ, তোমাদের বিশ্বাস নেই।'

'শোনো—কাপড়-চোপড় প'রে নাও না, একটু বেড়াতে যাই।'

বীণা যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। —'কী যে বলো তুমি, বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেলো নাকি ? এখন আমার কত কাজ !'

'কী আর কাজ। রান্না তা রামের মা-ই নামাতে পারবে। আর ছেলেপুলেদের মা দেখবেন। আর কি ? চলো। ট্যাক্সিতে যাবে গঙ্গার ধারে ? গিয়েছো কখনো ? কলকাতার গঙ্গা দেখেছো ?'

'কেন দেখবো না ? মা-র সঙ্গে তো সে দিনও স্নান ক'রে এলাম।'

'ওঃ, সে তো কালিঘাটের ঘোলা নর্দমা। বড়ো গঙ্গা দেখেছো—যেখানে জাহাজ এসে দাঁড়ায়, —মস্ত জাহাজ, যাতে ক'রে লোকে বিলেত যায়।'

'কাজ নেই বাপু আমার ও-সব দেখে। ঘরের কাজ ফেলে স্বামীর হাত ধরে বিবি সেজে বেড়ানো—ও-সব আমাকে দিয়ে হবে না।'

'কেন, বেড়ালে দোষ কি ?'

'নাও, নাও, তোমার এ-সব বাজে কথা শোনবার সময় নেই আমার।'

নিবারণ মূঢ়ের মতো বল্‌লে, 'বেড়াতে না যাও, একটু ফিট্‌ফাট হ'য়ে তো থাকতে পারো। ইচ্ছে ক'রে কুৎসিত হচ্ছ কেন ?'

'কী বললে ?' বীণা তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো। ও, বুঝেছি, তোমার মতিগতি ভালো দিকে যাচ্ছে না, স্বভাব চরিত্র ঠিক আছে কিনা তাই বা কে জানে! বিয়ে ক'রে বৌ ঘরে এনেছো, পাঁচ বৎসর ঘর করছি, তিনটি ছেলেমেয়ে পেটে ধরেছি, নিজের সুখদুঃখ সবই এই সংসারের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়েছি, তবু কিনা তুমি এ-সব জঘন্য কথা বলো! ঘরের বৌয়ের আবার সুন্দর-কুৎসিত কী শুনি! আমাকে তো আর নয়নবাণ হেনে মন ভোলাতে হবে না—আমার একভাবে থাকলেই হ'লো। উঃ, রাস্তায় বেরুলে যা সব মেয়ে চোখে পড়ে আজকাল—কি বৌ, কি ঝি, মেয়েগুলো আজকাল যেন ঢঙেই বাঁচে না—কেবল রংচং কেবল চোখের চমক। বদ্, বদ্! ওরই একটা বদ মেয়ে ঘরে আনলে পারতে—সখ মিটতো কিছু। তা এ-ও বলি, এত দুঃখকষ্টে মুখ বুজে এমন প্রাণ দিয়ে সেবা করতো না আর কেউ, টেরি-কাটা আর একটা ছোকরা চোখে পড়লেই পিট্‌টান। যা সব শুনছি আজকাল চারদিকে—জাতধর্ম্ম ব'লে আর আছে নাকি কিছু! তোমার যা অবস্থা দেখছি, বাইরে গিয়ে কিছু রস মজিয়ে এলে পারো—আমি তোমার বিবাহিত ধর্ম্মপত্নী, সে কথা মনে রেখো!'

তীব্র অথচ নিচু গলায় এই কথাগুলো ব'লে বীণা চলে গেলো পাশের ঘরে। নিবারণ স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলো। বীণার এতখানি চটবার মতো কী যে সে বলেছে কিছুতেই ভেবে পেলে না।

রাত এগারোটার পর সব কাজকর্ম্ম সেরে বীণা শুতে এলো। মণ্টু আর মিনু ঠাকুমার সঙ্গেই শোয়, আর ছোটখোকাও আজ, বোধ হয় তুলসীপাতার গুণেই, শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, আলো নিবিয়ে দিয়ে বীণা বিছানায় আসতেই নিবারণ দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। এমন অসঙ্গত ব্যবহার সে অনেকদিন করে না, হয়তো কখনোই এর আগে করেনি।

বীণা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'এ কি! কী করছো? ছাড়ো! উঃ, যা গরম!'

বীণার গায়ে ঘামের আর পেঁয়াজের গন্ধ। শুতে আসবার আগে তার একবার স্নান করা উচিত, কিন্তু নিবারণ কিছু বলতে সাহস পেলে না—কিংবা ইচ্ছে ক'রেই কিছু বললে না। সেই দুর্গন্ধ শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে চাপতে লাগলো।

বীণাও আর কিছু বললে না ; চুপ ক'রে স্বামীর আকস্মিক ও উদ্দাম আদর সহ্য করতে লাগলো।

অন্ধকারে, নিবারণ তার স্ত্রীর শরীর খুঁজে ফিরতে লাগলো। কোথায়, কোথায় সে তাকে লুকিয়ে রেখেছে, কোথায় হারিয়ে ফেলেছে তার উজ্জ্বল, আশ্চর্য্য শরীর? বীণার সমস্ত দেহদেশের উপর নিবারণের হাত বার বার পর্য্যটন করলো···কিন্তু কোথায়? কোথায়? বীণার শরীর নেই, বীণার শরীর মৃত, মৃত···তার স্ত্রী-সত্তার অমূল্য উত্তরাধিকার সে হেলায় হারিয়েছে।

খানিক পরে বীণা বললে, 'হয়েছে? এখন ঘুমোও, কাল সারা-রাত ঘুমোতে পারো নি।'

কোনো কথা না ব'লে নিবারণ তার হাত সরিয়ে আনলে। বীণা স্বামীর দিকে পিছন দিয়ে পাশ

ফিরে শুলো, একটু পরেই বোঝা গেলো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন কাজকর্ম করে, রাত্রে বড়ো ক্লান্ত থাকে, শুলেই ঘুম।

নিবারণও ক্লান্ত কম নয়, কিন্তু সে-রাত্রে অনেকক্ষণ তার চোখে ঘুম এলো না। তাদের শরীর নেই, তাই জীবনও নেই, জীবনহীন অস্তিত্বে তারা আবদ্ধ। এ-কথাটা এর আগে কখনো বোঝেনি সে, তা ভেবে অবাক লাগলো তার। কিন্তু না বুঝলেই বুঝি ভালো ছিলো। এ কী অশান্তি যে তারও শরীর আছে, শরীরের সঙ্গেই যে জেগে উঠে, কিন্তু কখনো সে জাগেনি, আর কখনো জাগবে না। শরীর, শরীর কোন দেবতার প্রতিমা তুমি, কোন্ দেবতা কখন এসে চলে গেছে, আমি কিছুই জানিনি। হে দেবতা, হে শরীরদেবতা, সত্যি কি তুমি চলে গেছো, আর কি ফিরে আসবে না, রেখে গেছো শুধু খড় আর মাটি, মাটি আর খড় !

কাব্যময়ী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

তোমার পাণ্ডুর মুখে রক্তশূন্য মরণ যাতনা .
তোমার রক্তিম বুকে শব্দহীন বহে ফল্গুনদী,
জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত
সূর্য্যালোকে মূর্চ্ছাহত,
প্রকাণ্ড বিস্ময় ভরা প্রেম তব বহে নিরবধি !
আমার বুকের চির বিষণ্ন প্রশ্নের মত তুমি
ঘুম কেড়ে নিয়ে জাগায়ে রেখেছ রচিয়া স্বপ্ন ভূমি !
চিতাশয্যা বিরচিয়া স্বপ্নরাজ্যে হে মহিমময়ী
অভিসার পথে টানি দুর্য্যোগের ঘন যবনিকা,
অঙ্গের উত্তাপ তব
এ কি তীব্র অভিনব
জ্বেলেছ আমার বক্ষে অচঞ্চল বিদ্যুতের শিখা !
সেই তো তোমার প্রেমের লীলা গো জীবনের পথে পথে,
রাত হ'তে দিন, দিন হ'তে রাত যুগ যুগান্ত হ'তে।
তোমার সে বন্দী আত্মা স্বর্গ হ'তে অগ্নিশিখা হরি ;
নিখিল কবির মনে জ্বালায়েছে দীপ্ত হোমানল ;
প্রেম-বিহঙ্গমী উড়ে
স্বর্ণমেঘ-সৌধ চূড়ে,
হিরণ্য পক্ষের ছায়ে জ্বলে লক্ষ স্বপ্নের কমল।
অভিসার তব অলকাপুরীর অলকনন্দা তীরে
ঝঞ্ঝাছিন্ন মেঘরেখা সম নভসীমান্ত ঘিরে।

বিদ্যুৎ সারথি তব, রথচক্রে বজ্র কেঁদে মরে
ঘুমাও সুদীর্ঘ রাত্রি রুদ্র ঝড় তুলিয়া নিশ্বাসে,
সমুদ্র প্রেমিক মন
ডাকে তোমা' সারাক্ষণ,
হে সুপর্ণা মেঘকন্যা, তব প্রেমে বিপুল উচ্ছ্বাসে!
উদয়ের পথে উন্মুখচক্ষু মেলিয়া তপন কাঁদে,
রশ্মিতে শত স্বর্ণ-ভ্রমর তোমারি রাগিণী সাধে।
বিশাল সৃষ্টির বুকে তুমি এক সৃষ্টিছাড়া মেয়ে
কি যে তুমি চাও প্রিয়ে, দাও নাই কোন সদুত্তর,
রূপের রোমাঞ্চ জাগে
আত্মঘাতী অনুরাগে,
ওগো বিদ্রোহিনী তব মুখপানে চেয়ে নিরন্তর।
হে বন-বিহগী, একি বন মায়া দিয়াছ আমার মনে?
উদাসীন বুকে দিন কাটে মোর কারণে ও অকারণে।
দুঃখের প্রচণ্ড সুর বৈশ্বানরী দীপক রাগিণী
অদ্ভুত বীণায় তব শব্দহীন বাজে অন্ধকারে,
আঘাতের উন্মাদনা
মর্ম্মে মোর হে উন্মনা,
জাগ্রত করেছ তুমি মহাকাব্য ছন্দের ঝঙ্কারে।
তোমার হংস শ্বেত পাখা মেলি হে প্রিয়ে সরস্বতী,
মৃত্যুর পরে বিদ্রোহী আজ করেছে আমারে সতি!



আবিষ্কার

শ্রীনবেন্দুভূষণ ঘোষ

আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশুতি রাত্রির গ্রাম তখন সুপ্ত, নিঃশব্দ; কেবলমাত্র উমাশঙ্করের প্রমোদকক্ষে তখনও কেহ সুপ্ত নহে। নানাবর্ণের ঝাড়লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত কক্ষে তখন উৎসব চলিয়াছে; বহুমূল্য আসবাবপত্রে সুসজ্জিত, কাশ্মীরী গালিচায় আবৃত, বিবসনা সুন্দরীদের তৈলচিত্রে পরিপূর্ণ কক্ষে তখন আসর পুরামাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছে।

গান চলিতেছিল। স্বর্ণখচিত আলবোলায় সুগন্ধি তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, হাতের মদের গেলাস হাতেই রহিয়া গিয়াছে; বিস্মিত অপলকনেত্রে উমাশঙ্কর শুধু গান শুনিয়া যাইতেছেন। এমন অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনেন নাই।

যে গান গাহিতেছিল সে নারী—বিদেশাগতা এক সুপ্রসিদ্ধা বাইজী। বাইজী অল্পবয়স্কা এবং রূপসীও বটে।

উমাশঙ্কর তন্ময়চিত্তে গান শুনিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপাইয়া বাইজীর কণ্ঠস্বর নানাভাবে, কখনও উঁচু পর্দ্দায়, কখনও নীচু পর্দ্দায়, কক্ষের মধ্যে উঠানামা করিতে লাগিল। বাইজী মালকোষ আলাপ করিতেছিল। সেই বিষণ্ণ আলাপে উমাশঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেন কক্ষের উজ্জ্বল আলোগুলি ম্লান হইয়া যাইতেছে, একটা শীতল আবহাওয়া যেন তাঁহার পারিপার্শ্বিককে ক্রমশঃ জমাট করিয়া ফেলিতেছে। হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল তাঁহার নেশা ছুটিয়া যাইতেছে, মনে হইল তাঁহার ন্যায় দুঃখী আর এ পৃথিবীতে কেহ নাই; আত্মীয়হীন, উদ্দেশ্যহীন, তৃপ্তিহীন আত্মা যেন ঐ মালকোষের বিষণ্ণ আলাপের সহিত সুর মিলাইয়া বিলাপ করিতেছে। তিনি অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। বক্ষ ভেদ করিয়া অকারণে দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, একটা দুরন্ত ক্রন্দনাবেগ সমস্ত দেহকে কাঁপাইয়া তুলিল, মুক্তি চাহিল, অতিকষ্টে তিনি তাহা দমন করিলেন। কিন্তু বাইজীর কণ্ঠস্বর যখন প্রতিমুহূর্ত্তে আরও করুণ আরও বিষণ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন; মনে হইতে লাগিল, আকাশের চাঁদ যেন অস্ত গিয়াছে, কক্ষেও আলো নাই; সারা পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত, তাহাতে যেন আর মানুষ নাই; একা তিনি সেই গাঢ় অন্ধকারে দুঃখের অতল সমুদ্রে যেন ডুবিয়া যাইতেছেন।

তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, হাত নাড়িয়া বিকৃতকণ্ঠে আদেশ করিলেন, "থাম।"

বাইজী শঙ্কিতচিত্তে থামিল, সারেঙ্গীর তান, তবলার সঙ্গতও থামিয়া গেল, অনুচরেরা বিস্মিতনেত্রে উমাশঙ্করের দিকে তাকাইল। বিশ্বস্ত সহচর মাণিক বলিল, "কেন, বেশ তো হচ্ছিল"—

উমাশঙ্কর মাথা নাড়িলেন, "হ্যাঁ, বেশ হচ্ছিল বটে কিন্তু ও কান্না আমার ভাল লাগে না।"

মাণিক প্রত্যুত্তরে ঈষৎ হাসিল।

উমাশঙ্কর বাইজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার মত এমন মিষ্টি গলা আমি খুব কম শুনেছি বাইজী, কিন্তু দুঃখের সুর আমার ভাল লাগে না।"

বাইজী হাসিল, অতি মধুর সে হাসি, হাসিলেই এক পংক্তি সুবিন্যস্ত শুভ্র দন্তরাজি রক্তওষ্ঠের পশ্চাতে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠে। সে হাসি দেখিয়া উমাশঙ্কর মুগ্ধ হইলেন।

বাইজী প্রশ্ন করিল, "কি গান তবে গাইব হুজুর ?"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন, "এমন গান গাও যা রক্তে দোলা দেয়, চোখে আনে স্বপ্ন।"

বাইজী আবার হাসিয়া অভিবাদন করিল এবং বলিল, "যো হুকুম।"

বাইজী এইবার নৃত্যের সহিত গাহিতে আরম্ভ করিল। সে নৃত্য তাহার সঙ্গীতের মতই অপূর্ব্ব। বিসর্পিল গতিভঙ্গে, চপল পদক্ষেপে, নূপুর নিক্কণে, সঙ্গীতের চটুল ছন্দে কক্ষ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। উপর্য্যুপরি দুই পাত্র মদ্যপান করিয়া মত্তকণ্ঠে উমাশঙ্কর বলিলেন—"চমৎকার!"

বাইজী উৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বসন্তকালের প্রজাপতির মত তাহার গতি। উজ্জ্বল আলোকে, তাহার জরীযুক্ত নানাবর্ণের রেশমী পেশোয়াজ ময়ূরের পেখমের মত ফুলিয়া উঠিল, ওড়না খসিয়া পড়িয়া জরী দিয়া বিনুনী করা দীর্ঘ বেণীকে, সমুন্নত বক্ষ দেশকে আরও প্রকাশিত করিয়া দিল। সেই নৃত্য দেখিতে দেখিতে আর 'সুরসাগরে'র আলাপ শুনিতে শুনিতে উমাশঙ্করের চোখে স্বপ্ন ঘনাইয়া আসিল। এ জীবন অপূর্ব্ব। বাইজী রূপসী, কিন্তু এখন মনে হইতে লাগিল যে সে অপূর্ব্ব রূপসী। আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষুর মর্ম্মভেদী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, সহাস্যমুখে বাইজী নৃত্যগীত করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া এইবার উমাশঙ্করের চক্ষু শ্বাপদের মত জ্বলিয়া উঠিল। দেহের প্রতি রক্তকণায় একটা পিপাসা, একটা কামনা—সাপের মত চলাফেরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ইঙ্গিতে মাণিককে ডাকিয়া, তিনি তাহার কানে কানে কয়েকটি কথা বলিলেন। মাণিক সমস্ত শুনিয়া মাথা নাড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সমস্ত কক্ষ নিঃশব্দ হইয়া গেল। গান থামিল। মাণিক প্রত্যেকের কানে কানে কি বলাতে, লোকেরা উঠিয়া অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। দু'একজন নেশায় একটু বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইল। বাইজীও সেলাম করিয়া উঠিতেছিল, উমাশঙ্কর বলিলেন, "তোমার লোকেরা যাক্, কিন্তু তুমি এখন থাক বাইজী।"

বাইজীর অনুচরেরা চলিয়া গেল।

উমাশঙ্করের সহিত মুখোমুখী বসিয়া, নৃত্যজনিত পরিশ্রমে বাইজী ঘামিতে লাগিল, আলোকে তাহা চক্‌চক্ করিয়া উঠিল ; উমাশঙ্কর তাহার দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

বাইজীও হাসিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "কি হুকুম করেন হুজুর ?"

উমাশঙ্কর স্থিরদৃষ্টি মেলিয়া বাইজীকে প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া বাইজী আবার নিঃশব্দে হাসিল, হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

তাঁহার চিরকাম্য তিনি চিরদিন পাইয়াছেন,—অর্থ এবং শক্তি দ্বারা। আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেহ নাই, স্ত্রী নাই, সন্তান নাই, এ পৃথিবীতে নিজে ব্যতীত আর কাহারও বিষয়ে ভাবিবার মত কেহ নাই ; বিশাল জমিদারীর বিপুল আয় তিনি নারী, মদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ আমোদপ্রমোদে নির্ব্বিকারচিত্তে উড়াইয়া যাইতেছেন। তাঁহার জীবনে ভোগ ছাড়া অন্য ধর্ম্মের স্থান নাই।

অন্ধকার কক্ষে, বিস্রস্তবসনা নিদ্রিতা বাইজীপার্শ্বে, নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করিতে করিতে উমাশঙ্কর হাসিলেন।

অতীতের গর্ভ হইতে বহু নারীর কাকুতিমিনতি, হাসিকান্না, তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল; কুণ্ডলীকৃত ধূম্রপুঞ্জের মত কত দৃশ্যের অস্পষ্ট ছায়া দৃষ্টিসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। কত কথা! কে বাধা দিবে? অগ্নিদগ্ধ কুটীর, গভীর রাত্রে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা, ডাকাতি করিয়া নারীলুণ্ঠন, অসহায় স্বামীদের আর্ত্তনাদ; নিগৃহীতা নারীদের বিলাপ;—এই ঘটনা কি প্রমাণ করিবে না যে তাঁহাকে বাধা দিবার মত কেহ নাই?

কিন্তু একজন বাধা দিয়াছিল; সে কে, তাহার নাম এখন আর মনে নাই, কারণ সে বহুদিন পূর্ব্বেকার কথা। কিন্তু এইটুকু মনে আছে যে সেই শত্রুর বিচ্ছিন্ন মস্তক ছিল এক জঙ্গলে, মাটীর নীচে; আর তাহার কবন্ধ, সপ্তখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া নদীর জলে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল। উমাশঙ্কর আর একবার নিজের মনে হাসিলেন।

দিন দুই পরে একদিন সকালে মাণিক আসিয়া প্রশ্ন করিল, "নন্দীগ্রামের মেলা দেখ্‌তে যাবেন নাকি কর্ত্তা?"

প্রতি বৎসর, নন্দীগ্রামে, সেখানকার জাগ্রত শিবের বিখ্যাত মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া, শিবরাত্রি উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী বেশ বড় একটি মেলা হয়। অনেক দেশের মহাজনী নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়ে, দর্শক আর তীর্থযাত্রীদের ভীড়ও প্রচুর হয়। জিনিষপত্রে, বেচাকেনায়, ভ্রাম্যমান সখের থিয়েটার, যাত্রা, নাগরদোলা, নানারকম তামাসার জিনিষ আর হট্টগোল,—নন্দীগ্রাম একেবারে সরগরম হইয়া উঠে।

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে থেকে মেলা আরম্ভ হবে?"

"পরশু থেকে।"

একটু ভাবিয়া উমাশঙ্কর বলিলেন, "আচ্ছা।"

"তাহলে সব বন্দোবস্ত করি?"

"হ্যাঁ, তা কর।"

মাণিক খুশী হইয়া উঠিল, "বেশ হবে, অনেকদিন বেড়ান হয় না। মেলাও দেখা যাবে আর নন্দীগ্রামের শিবকে একটা বেলপাতা দিয়ে পেন্নামও করে আসা যাবে।"

উমাশঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তুমি দেবদেবতা মান নাকি?"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "কি বলেন, মানি না! পাপ করি আর যাই করি, তাই বলে ভগবান মানব না?"

উমাশঙ্কর হঠাৎ হাসিলেন, নিঃশব্দে কয়েকবার পাদচারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাপী মাণিক, কারণ তুমি ভয়ে ভয়ে পাপ কর।"

মাণিক দার্শনিক নহে, নেহাৎ স্থূলবাদী, সে উমাশঙ্করের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার সে দৃষ্টি দেখিয়া উমাশঙ্কর আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "যাক্‌গে—তুমি তাহলে নন্দীগ্রামে যাবার ব্যবস্থা কর। আমি যাব, তবে শিবের মাথায় বেলপাতা চড়াতে নয়, মেলা দেখ্‌তে।"

তিন দিন পরে, দ্বিপ্রহরের সময় ঘাট হইতে বজ্‌রা ছাড়িল। উমাশঙ্করের সহিত মাণিক, রামতনু, পরেশ, দুইটি চাকর আর লাঠিয়াল হারু বাগ্দী চলিল।

আলবোলার নলটি টানিয়া লইয়া উমাশঙ্কর বলিলেন, "একটা গান গাও ত পরেশ"—

পরেশ বয়সে ছোকরা, ইতিপূর্ব্বে দশ বৎসর যাত্রাদলে ছিল। তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া, উমাশঙ্কর তাহাকে পার্শ্বচরদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন।

গান আরম্ভ হইল। মাণিক তবলা ধরিল। গানের পর গান চলিল। নদীর জলের কলকল ধ্বনি, দাঁড়ের ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ, তবলার বোল আর পরেশের কণ্ঠস্বর—সব মিলিয়া বেশ একটা সুষ্ঠু সমন্বয়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, মাথা নাড়িয়া, তাল দিতে দিতে উমাশঙ্কর বলিলেন, "বেশ—বেশ—"

গান বেশ জমিয়া উঠিল। যাত্রার দলের সখীর মত চক্ষুটি বুজিয়া, মুচকি হাসিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে পরেশ ঠুংরীর আলাপ করিতে লাগিল। সেই আলাপের মধ্য দিয়া একটি বিরহকাতরা তন্বী নায়িকার ক্লান্ত অভিযোগ। প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল, অন্ধকারে তাহার ভয় লাগে, নিঃশব্দ কক্ষে, শুভ্র সজ্জায় সে একাকিনী বসিয়া প্রহর গণিতেছে। একের পর এক প্রহর কাটিয়া যায়, তবু নায়ক আসিল না, আসিল না, না, না। বিরহের দীর্ঘশ্বাসে মন্থর, শীতল কক্ষে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া, উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন পথের প্রতি, সে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে ;—পিয়া বিনু নিদ্‌ নাহি আওত'—

অন্ধকার রাত্রি, যুবতী নারী, নির্জ্জন কক্ষ,—এই সব কথাগুলিতে উমাশঙ্করের ইন্দ্রিয়াসক্ত মন, চির-দিন উৎফুল্ল হইয়া উঠে—। কিন্তু আজ তাঁহার হঠাৎ একটু দুঃখবোধ হইল ; বহু ঘটনা, বহু নারীর মুখচ্ছবি মনে পড়িল ; কিন্তু গভীর প্রেমের সহিত, অতীন্দ্রিয় ক্ষুধা লইয়া, কোনও নারী, এমন কি কোনও বারবনিতা পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য কোনও দিন বসিয়া থাকে নাই। তাঁহার জীবনে যে সকল নারী আসি-য়াছে, তাহারা ভালবাসিয়া আসে নাই, আসিয়াছে তাঁহার বলে এবং অর্থে বশীভূত হইয়া। কোন নারীর হৃদয় তিনি জয় করিতে পারেন নাই।

লজ্জামিশ্রিত দুঃখে উমাশঙ্করের হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তিনি মাথা নীচু করিলেন।

রামতনু হঠাৎ গানের মাঝখানে বাধা দিল। গানের প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। উমাশঙ্কর বাহিরে কোথায়ও বেড়াইতে গেলেই একটি দূরবীণ লইয়া যান ; সেই দূরবীণটি দিয়া সে বজরার খোলা জানালা দিয়া, তীরবর্ত্তী শ্যামপুর গ্রাম দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,— "দেখুন, দেখুন কর্ত্তা"—

তবলায় একটি চাঁটি মারিয়া মাণিক মুখবিকৃতি করিল। উমাশঙ্কর একটু বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি ?"

রামতনু সোৎসাহে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"দেখুন।"

গান থামিয়া গিয়াছে। সেই বিরহকাতরা নায়িকার আলাপে, যে আক্ষেপ, যে লজ্জা, একটু আগেই উমাশঙ্করের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল ; তাহা এক মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। রামতনুর হাত হইতে বাজপাখীর মত ছোঁ মারিয়া দূরবীণটি কাড়িয়া লইয়া তিনি তাহাতে দৃষ্টি সংযোগ করিলেন। নদীতীর হইতে প্রায় বিশ হাত দূর দিয়া বজরা যাইতেছিল। সেই তীরের একটি ঘাটে তিনজন স্ত্রীলোক কলসী

লইয়া জল ভরিতে আসিয়াছিল। দুইজন বর্ষিয়সী ও একজন যুবতী। সেই যুবতীটিকে উমাশঙ্কর দেখিলেন। নিঁখুত দেবী-প্রতিমার মত রূপ।

উমাশঙ্করের দৃষ্টি লালসায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, নৌকা থামাইয়া ঐ যুবতীটিকে অনুসরণ করার ও নৌকাতে উঠাইয়া লইয়া যাইবার একটা দুর্ণিবার আকাঙ্ক্ষা যুক্তিহীনভাবে মস্তিষ্কে পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু তাহা তিনি অবশেষে দমন করিলেন। দূরবীণটা মাণিকের হাতে দিয়া ধীরে ধীরে অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "তোমায় একশ' হাত দূরে গিয়ে নামিয়ে দিচ্ছি মাণিক, ঐ মেয়েটি কে, কোথায় থাকে, সমস্ত জেনে আজই নন্দীগ্রামে ফিরে যাবে।"

মাণিক যুবতীটিকে দেখিতে দেখিতে মাথা নাড়িল।

বজরা থামিল, মাণিক নামিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে নন্দীগ্রামের ঘাটে যখন বজরা নোঙ্গর ফেলিল, তখন সূর্য্য অস্তপ্রায়। পূর্ব্ব হইতেই মেলার বাহিরে, নদীর তীরে তাঁবু ফেলা ছিল, উমাশঙ্কর সদলবলে সেখানে পৌঁছাইলেন।

মেলায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছে, চারিদিকেই কোলাহল, ভীড় আর বেচাকেনা। শিব-মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল।

পরেশ ও রামতনু আসিয়া বলিল—"মেলা দেখ্‌তে যাবেন নাকি?"

উমাশঙ্কর মাথা নাড়িলেন। অগত্যা তাহারা চলিয়া গেল। উমাশঙ্কর বসিয়া সেই যুবতীটির কথা ভাবিতে লাগিলেন। ইহার রূপে নূতনত্ব আছে। কোন্ উপায়ে তিনি ঐ নারীকে লাভ করিবেন তাহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি হাঁকিলেন—"হারু।"

হারু বাগ্দী তাঁবুর বাহিরে ছিল, সে ভিতরে আসিতেই তিনি বলিলেন—"এক গেলাস দে ত'।"

হারু মদের বোতল খুলিয়া, এক পাত্র তাঁহাকে দিল, তিনি তাহা এক চুমুকে নিঃশেষ করিলেন।

ঘণ্টা তিনেক পরে মাণিক ফিরিয়া আসিল। জড়িতস্বরে উমাশঙ্কর প্রশ্ন করিলেন, "কি খবর?"

মাণিক বলিল, "নারায়ণ তর্করত্নের ছেলের বৌ, এই কিছুদিন হল বিয়ে হয়েছে, ওদের সম্মান, প্রতিপত্তি আছে আর অবস্থাও নেহাৎ মন্দ নয়।"

উমাশঙ্কর সব শুনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বজরায় চলো, আমার এখানে আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

মাণিক বিস্মিত হইয়া বলিল—"সেকি! রাত হয়েছে, আর তা ছাড়া রামতনু, পরেশ, এরাও তো নেই দেখছি—"

উমাশঙ্কর বাধা দিয়া, টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বয়ে গেছে, ওরা আপনা থেকে যাবে'খন; তুমি আমার সঙ্গে চলো, ব্যস্ আর কথা নয়।"

মাণিক আর কথা বলিতে সাহস করিল না, নিঃশব্দে সে হারুকে ও চাকরদের লইয়া উমাশঙ্করের অনুসরণ করিল।

পরদিন অপরাহ্নে উমাশঙ্কর মাণিককে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রমোদা বুড়ীকে ডেকে আনত'।"

মাণিক চলিয়া গেল।

উমাশঙ্কর নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। নানা কাল্পনিক সম্ভাবনায় তাঁহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে

খানিকক্ষণ পরে প্রমোদা আসিল। তাহার বয়স বছর ষাটেক হইবে। দেহের গড়ন, বর্ণ দেখিয়া এখনও বুঝিতে পারা যায় যে যৌবনকালে সে সুন্দরী ছিল এবং লোকেরা বলিয়া থাকে যে সেই সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত দেহ নানা লোককে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সে যৌবন এখন আর নাই, শুধু তাহার চিহ্নই রহিয়াছে। দরিদ্রঘরের স্ত্রীলোক, দেহ লইয়া ব্যবসা করিত; কিন্তু, জরা আসিয়া যখন দেহে আত্মপ্রকাশ করিল, বিগতযৌবনাকে ঘিরিয়া লোকেরা যখন আর মাতিল না, তখন বাঁচিবার জন্য প্রমোদা অন্য পন্থা অবলম্বন করিল। চরিত্রহীন লোকদের অভিষ্ট সিদ্ধির সে অত্যাবশ্যক বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। উপার্জ্জন সে এখন মন্দ করে না।

একগাল হাসিয়া প্রমদা বলিল, "পেন্নাম হই গো কত্তা, কি হুকুম ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "এবার যদি পারিস প্রমোদা—তবে তোকে প্রাণভরে খুশী করে দেব।"

কটাক্ষ হানিয়া বুড়ী প্রশ্ন করিল—"সব খুলে বল কেনে, কে, কোথাকার সব বল কেনে।"

রামতনু সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, উমাশঙ্কর তাহার দিকে চাহিলেন। রামতনু সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া প্রমোদাকে সমস্ত কাহিনী বলিল, মন দিয়া সমস্ত শুনিয়া প্রমদা ফিক্ করিয়া হাসিয়া উমাশঙ্করের মুখের দিকে চাহিল।

উমাশঙ্কর স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন—"পারবি ?"

প্রমোদা খন্‌খনে গলায় হাসিয়া উঠিল—"কি বল গো কত্তা—পারব না কেনে ? তোমার ইচ্ছার জিনিস আনতে কি আমি কোন দিন লারছি ?"

প্রমোদা আবার হাসিয়া উঠিল। অতীতের অনেক অন্ধকার রাত্রির মধ্যে প্রমোদার জয়ের কাহিনী লুক্কায়িত আছে। এই অট্টালিকার খিড়কি দরজা দিয়া নিস্তব্ধ রাত্রে, জঙ্গলের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া, সে কি ইপ্সিত নারীদের লইয়া আসিতে কোন দিন ভুল করিয়াছে, অসমর্থ হইয়াছে ? সাধারণ নারী ত' দূরের কথা, সম্ভ্রান্তঘরের দু'একজন নারীকেও কি সে উমাশঙ্করের প্রমোদ কক্ষের লালসাতপ্ত আবেষ্টনীর নাগপাশে বন্দী করে নাই ?

প্রমোদার হাসি দেখিয়া উমাশঙ্কর বলিলেন—"তাহলে পারবি ?"

"হ্যাঁ গো কত্তা—"

"রামতনু, মাণিককে প্রমোদার জন্য নৌকো ঠিক্ করে দিতে বলো।"

"যে আজ্ঞে।"

রাত্রে উত্তেজনায় ভালভাবে নিদ্রা হয় না। বহুদিন যাবৎ অর্থলভ্য নারী ব্যতীত আর কোনও নূতন নারী তাঁহার কামনাপূরণ করে নাই। একঘেয়ে লাগিতেছে। মদের পাত্র নিঃশেষ করিয়া উমাশঙ্কর ভাবেন। যেদিন ঐ নারী তাঁহার হস্তগত হইবে ? সেইদিন ?—

মানসচক্ষে এক নারীর দেহকান্তি ভাসিয়া উঠে। যৌবনদৃপ্ত বলিষ্ঠ দেহের প্রত্যেকটি রেখায় একটি অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি।

উমাশঙ্কর ব্যাধিগ্রস্তের মত ছট্‌ফট্ করেন।

তিন দিন পরে। প্রমোদা ফিরিয়া আসিল। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া উমাশঙ্কর কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তাহলে ওভাবে আর হলো না।"

বুড়ী মাথা নাড়িল, "ওরে বাবা, রল কেনে কত্তা, ও এক্কেবারে কেউটের বাচ্চা গো, বুড়ো বয়সে যে বেঁইচে আস্‌তে পেরেছি, সে কেবল ভাগ্যিমানী বলে"—

"হুঁ"—গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া, মাণিকের দিকে চাহিয়া উমাশঙ্কর বলিলেন—"মাণিক।"

"আজ্ঞে ?"

"হারুকে খবর দাও ত'।"

প্রমোদা বুড়ী ও মাণিক চলিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া উমাশঙ্কর ভাবিতে লাগিলেন, ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, নাসিকা রুদ্ধ উত্তেজনার আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে অচিরেই তিনি মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। যে স্বেচ্ছায় আসিবে না, তাহাকে বলপ্রয়োগেই বাধ্য করিতে হইবে। পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হউক, তাহা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।

হারু আসিল। সঙ্গে মাণিকও।

স্থিরদৃষ্টিতে হারুর প্রতি চাহিয়া উমাশঙ্কর বলিলেন, "শ্যামপুরে তোমায় যেতে হবে সর্দ্দার, মাণিক তোমায় সব খুঁটিনাটি বলে দেবে।"

হারু বেশী কথা বলে না। বসন্তরোগের নির্ম্মম অত্যাচারে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অপর ক্ষুদ্র চক্ষুটির ভিতর দিয়া দুই চক্ষুর হিংস্রতাকে প্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে সে মাথা নাড়িয়া বলিল—"আজ্ঞে আচ্ছা।"

"বেশ, এখন তবে যাও, তৈরী হওগে।"

হারু চলিয়া গেল।

উমাশঙ্কর মাণিকের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"এবার ?"

মাণিক উত্তর দিল না, তবুও সে যেন একটা কিছু বলিবার জন্যই ইতস্ততঃ করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া উমাশঙ্কর প্রশ্ন করিলেন, "কিছু বল্‌বে ?"

"হ্যাঁ।"

"বল।"

একটু কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া মাণিক বলিল, "আমি বল্‌ছিলাম কি,---থাক্ না।"

"কি থাক্ না ?"

"ঐ যে হারুকে পাঠালেন।"

উমাশঙ্কর বিস্মিত হইলেন,—"কেন, তাতে হয়েছে কি ?"

মাণিক একটু চুপ থাকিয়া হঠাৎ মরীয়ার মত একনিঃশ্বাসে বলিল, "অনর্থক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করা, তাছাড়া সত্যি ওরা বড় নিরীহ প্রকৃতির লোক।"

একমুহূর্ত্তে উমাশঙ্কর হিংস্র হইয়া উঠিলেন, সগর্জ্জনে তিনি বলিলেন—"তুমি আমায় উপদেশ দিতে এসেছ, আস্পর্দ্ধা তো তোমার কম নয়! হঠাৎ তোমার এ দরদ, এ ওকালতী দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে মাণিক"—পরে কি ভাবিয়া তিনি নিজেকে একটু সংযত করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"হুঁসিয়ার মাণিক, তুমি অনেকদিনের লোক বলে এ যাত্রা তোমায় খালি সাবধান করেই ছেড়ে দিচ্ছি; এ কথা মনে রেখো যে আমার কাজের ভালমন্দ বিচার করবার ভার তোমার ওপরে নয়।"

উমাশঙ্কর কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন, মাণিক নির্ব্বিকারভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আজ হঠাৎ তাহার উমাশঙ্করের উপর ঘৃণা জন্মাইল। লালসারও একটা সীমা আছে, কিন্তু উমাশঙ্করের তাহা নাই।

উমাশঙ্করের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, তাই সেদিন গানের মজলিস আর জমিল না। পরেশ তবুও একবার একটু অনুযোগের সুরে বলিল, "একটা জয়জয়ন্তী নতুন তৈরী করেছি, শুন্‌বেন কত্তা?"

উমাশঙ্কর মাথা নাড়িলেন।

মাণিক চুপ করিয়া বসিয়াছিল, রামতনু তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আর দু'দিন পরে তোর গান শুন্‌বেন রে, এখন কি আর অন্য কিছু ভাল লাগে রে?".

উমাশঙ্কর মৃদু হাসিলেন, তাহা দেখিয়া রামতনু সাহস পাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; নিজের রসিকতায় নিজে না হাসিলে তাহার মেজাজটা একটু খারাপ হইয়া যায়।

মজলিস ভাঙিবার পর উমাশঙ্কর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। দাসী আসিয়া বাতি কমাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। স্বল্পালোকিত কক্ষের স্তব্ধতার মধ্যে অর্দ্ধসুপ্তভাবে উমাশঙ্কর চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুইদিন পরেই ত সে আসিবে। এ নারী কেমন হইবে? কাঁদিবে, না ক্রোধে অভিশাপ দিবে, না আত্মহত্যা করিবে?

বহুদিন আগেকার, বছর দশেক আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়িল। গভীর নিশীথে, প্রমোদ-কক্ষের ভিতর অপূর্ব্ব সুন্দরী এক নারী ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর মত অগ্নিময়ী দৃষ্টি মেলিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—"ছেড়ে দেবেন কি না?"

তিনি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিয়াছিলেন—"না।"

প্রত্যুত্তরে সেই নারী হস্তের হীরকাঙ্গুরীয় মুখে লাগাইয়া হাসিয়াছিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই তাহার প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরের কাহিনী অতিশয় সংক্ষিপ্ত। অন্ধকারে, মাটির নিচে, তাহার অপূর্ব্বসুন্দর দেহ চাপা পড়িয়া পৃথিবীর আলো হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইল। মূর্খা, কিন্তু জয়ী নারী।

এও কি তেম্‌নি আত্মহত্যা করিবে? তাঁহার জয়ের আনন্দকে পরাজয়ের লজ্জায় রূপান্তরিত করিবে? না, তিনি তাহা আর ঘটিতে দিবেন না।

দুইদিন পরে তাহা হইলে সে আসিবে! কিন্তু, ভালবাসিয়া ত' আসিবে না। পরেশের সেই দিনকার গানটির কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

একদিন কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় দিনের মধ্যরাত্রে শ্যামপুরে এক ডাকাতি হইয়া গেল। চীৎকারে, ক্রন্দনে সারা গ্রাম জাগিয়া উঠিয়া ব্যর্থ অনুসন্ধানে চারিদিক মুখর করিয়া তুলিল। ডাকাতেরা অন্য কোন জিনিষপত্রই স্পর্শ করে নাই, কেবল, একটি নারীকে তাহারা লইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে তারাপদ আসিয়া উমাশঙ্করকে প্রণাম জানাইল।

উমাশঙ্কর শঙ্কিত চিত্তে প্রশ্ন করিলেন, "কি খবর?"

তারাপদ মৃদু হাসিয়া বলিল—"সব ঠিক হুজুর, আজ রাত্রেই হারু এসে পৌঁছুবে।"

"কোন্ দিক দিয়ে আস্‌ছে ?"

"হৈ ঠেঙ্গারে চর ঘুরে।"

"আচ্ছা।"

সময় কাটিতে লাগিল, কিন্তু তাহার গতি, উমাশঙ্করের নিকট অত্যন্ত মন্থর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অধীরভাবে তিনি একবার বাহিরের কক্ষে, একবার প্রাঙ্গণে, একবার কাছারীঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। পরেশ, রামতনু প্রমোদ-কক্ষে গানবাজনা করিতে লাগিল। মাণিক একপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সেইখানে বসিয়া উমাশঙ্কর প্রহর গণিতে লাগিলেন।

রামতনু একটু হাসিয়া বলিল—"একটু সেজে নিবেন কিন্তু কত্তা।"

পরেশ মাথা নাড়িল—"এজ্ঞে হ্যাঁ, রাধা আস্‌বে যে গো।"—বলিয়াই সে এক কীর্ত্তন আরম্ভ করিল।

উমাশঙ্কর নিজের পরিচ্ছদের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ;—"ঠিক বলেছ হে তোমরা, যাই পোষাকটা বদ্‌লে আসি। মাণিক"—

"আজ্ঞে"—

"সময় হয়ে এসেছে, না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যে কোন সময়ে এসে পড়বে।"—

"তা বটে।"

দ্রুতপদে তিনি সজ্জাগারে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বহুমূল্য, কোঁচান ধুতি, তুলার মত নরম, সুখস্পর্শ, বিদেশী সিল্কের পাঞ্জাবী তাঁহার দেহের উপর থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বেনারসী সিল্কের চাদর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বুকের উপরে নামিল ; পায়েতে জরিযুক্ত মখমলের জুতা ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। দেরাজ হইতে সুগন্ধি আতর বাহির করিতে করিতে তিনি আত্মতৃপ্তির হাসি হাসিলেন। যে কোনও মুহূর্ত্তে সে আসিয়া পড়িবে।

আতর লাগাইয়া, তিনি দেওয়ালে বিলম্বিত প্রকাণ্ড বড় দর্পণের সম্মুখে গিয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন। চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে তিনি আবার হাসিলেন, তাঁহাকে সুন্দর দেখাইতেছে। তিনি দর্পণের আরও নিকটে গেলেন।

অকস্মাৎ বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। পায়ের নীচ হইতে হঠাৎ মাটি সরিয়া গেলে যেমন এক বৈদ্যুতিক অনুভূতি সারা দেহকে, সমস্ত চেতনাকে মুহ্যমান করিয়া দেয়, এক্ষেত্রেও তেমনি ঘটিল। উমাশঙ্কর কাঁপিতে লাগিলেন। যাহা তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই, আজ তাহা তাঁহার নিকট একটি বিরাট ও ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত করিল। দুই কানের পার্শ্বদেশ দিয়া তাঁহার ঘনকুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে ! তিনি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন !

উমাশঙ্কর দর্পণের একান্ত সন্নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন ; মনে হইতে লাগিল, প্রতিবিম্ব ও তিনি যেন এক হইয়া যাইবেন। নিজের কেশরাশি তিনি পাগলের মত টানিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে অন্য আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলেন,—তাঁহার গৌরবর্ণ, মসৃণ ললাটের উপর অসংখ্য বলিরেখা

বিষাক্ত সরীসৃপের মত শোভা পাইতেছে। এ কি হইল? কেমন করিয়া হইল? কোনও দিন ত' উমাশঙ্কর বুঝিতে পারেন নাই, জানিতে পারেন নাই!

সময় কাটিতে লাগিল। নিস্তব্ধ কক্ষে তিনি নির্ব্বিকারভাবে নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি সব বিস্মৃত হইলেন। যে কোনও মুহূর্ত্তে সেই ইপ্সিত নারী আসিয়া তাহার যৌবন ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার লইয়া তাঁহার পদানত হইবে, তাহাও তিনি ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত সত্তা তখন শুধু এক কথা ভাবিতেছিল, তিনি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

চমক ভাঙিল রামতনুর কথায়। দ্বারদেশে সে দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল—"হুজুর, হারু এসেছে।"

—প্রাণপণে নিজের দুর্ব্বলতাকে গোপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তিনি যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে বাহির হইয়া প্রমোদ-কক্ষের প্রতি অগ্রসর হইলেন। অর্দ্ধালোকিত বহির্দেশে হারু দাঁড়াইয়া ছিল, সে আসিয়া প্রণাম জানাইল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল—"এনেছি হুজুর।"

উমাশঙ্কর নিরুত্তরে মাথা নাড়িলেন। অন্ধকারে একচক্ষুষ্মান্ হারুর এক চক্ষু পুরস্কারের আশায় জ্বলিয়া উঠিল। টলিতে টলিতে উমাশঙ্কর অগ্রসর হইলেন। প্রমোদ-কক্ষের অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার দিয়া তিনি ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ভূতলের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সেই নারী আকুলভাবে কাঁদিতেছে। তাহার সুগৌর একটি হাত শ্লথভাবে মেঝের উপর বিস্তৃত, মেঘের মত নিবিড় কালো কেশের রাশি তাহার অর্দ্ধেক ঢাকিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, তিনি আজ বৃদ্ধ!

উমাশঙ্কর হঠাৎ ছুটিয়া পলাইলেন। তাঁহার নিঃশ্বাস দ্রুত হইয়া উঠিল। বিকৃতকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন—"হারু।"

"আজ্ঞে।"

"ফিরিয়ে নিয়ে যা।"

"ফিরিয়ে নিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ, যেখানে হোক্—আমি চাই না একে।"

"হুজুর!"

কোনও কথা নয় হারু।"

"আজ্ঞে আচ্ছা—কিন্তু বিপদ আছে হুজুর।"

"যা ভাল বুঝিস তাই করগে, কিন্তু আমি আর একে চাই না।"

উমাশঙ্কর শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে মাণিকের সহিত দেখা, সবিস্ময়ে মাণিক প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাচ্ছেন কর্ত্তা?"

"ঘরে।"

"সে কি!"

দুর্ব্বলতায় উমাশঙ্কর ভাঙিয়া পড়িলেন, কাতরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমি আজ পারলাম না মাণিক।"

মাণিক গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমি তা জান্‌তাম, জান্‌তাম একদিন আপনি আর পারবেন না।"

"কবে ?"

"যেদিন আপনি বুড়ো হয়ে পড়্‌বেন।"

"মানে ?"

"আজ আপনি বুড়ো হয়ে পড়েছেন হুজুর !"

"খবরদার মাণ্‌কে"—উমাশঙ্কর মাণিকের উপর গর্জ্জন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, দুই হাতে তাহার কণ্ঠদেশ সজোরে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু একটু পরেই তাঁহার হাত অবশ হইয়া পড়িল। কথাটা তো মিথ্যা নয়, তিনি ত' সত্যই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ছুটিয়া তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে মাণিক গলায় একবার হাত বুলাইয়া লইয়া হাসিয়া উঠিল।

উমাশঙ্কর বিছানায় বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। প্রদীপের আলো চক্ষুকে পীড়া দিতে লাগিল, তিনি তাহা নিভাইয়া দিলেন ; কক্ষ অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। সেই অন্ধকারে নিজের দেহের উপর, কেশের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন।

একবার তিনি চেষ্টা করিলেন এ দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিতে, কিন্তু পারিলেন না। জীবনে তিনি অর্থ এবং বল দ্বারা অনেক জিনিসই করায়ত্ত করিয়াছেন, কিন্তু যৌবনকে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত জয়ের অন্তরালে, অদৃশ্য এক শত্রু, তাঁহার পরাজয়ের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া চলিয়াছে। সুন্দরী নারীর সঙ্গলাভে তাঁহার কিছুই লাভ হয় নাই, তিনি মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিলেন না। দেহের প্রতি রোমকূপ দিয়া বহুমূল্য সুগন্ধি আতরের গন্ধকে ম্লান করিয়া দিয়া মৃত্যুর গন্ধ তাঁহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। এখনও সেই মেয়েটি বোধ হয় তেমনিভাবে কেশদাম এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে, তাঁহারই করায়ত্ত অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী – ; কিন্তু তিনি যে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন !

ঝড়ের মত সারা জীবনের কাহিনী চক্ষের সম্মুখ দিয়া অন্ধকার পটভূমিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে তিনি দেখিলেন—শুধু পাপের ইতিহাস। তিনি শুধুই পাপ করিয়াছেন, কাহাকেও ভালবাসেন নাই, কাহাকেও দয়া করেন নাই, কাহারও উপকার করেন নাই। তাঁহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন পাপের একটি পঙ্কিল ইতিহাস।

হঠাৎ নিস্তব্ধ কক্ষের অন্ধকারকে মথিত করিয়া তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, মুখে হাত দিয়া তাহা থামাইতে গিয়াও পারিলেন না। বুকে এক হাত ও মুখে এক হাত দিয়া, অন্ধকারের মধ্যে প্রেতের মত বসিয়া, উমাশঙ্কর নিজের সেই পশুর মত ক্রন্দনধ্বনি, সভয়ে শুনিতে লাগিলেন।

পুস্তক পরিচয়

পাতালকন্যা—অজিত দত্ত। কবিতাভবন, দাম দেড় টাকা। অজিত দত্ত আধুনিক, কিন্তু তিনি কবিতাই লিখে থাকেন। অর্থাৎ তিনি নিছক, খাঁটি কবিতা লেখেন এবং তার মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই। এর থেকে বোঝা যায়, রোমান্টিক সুরের চলন ক্রমশ কমে এলেও তিনি সেই সনাতন সুরেরই একনিষ্ঠ সাধনা করেছেন। এবং এর ফলে উগ্র-প্রগতি সম্পন্ন সমালোচকের কাছে তাঁকে আধুনিকদের সবচেয়ে বড়ো অপবাদ পেতে হবে যে তিনি সে-কেলে। তবু, আশ্চর্য্যের বিষয়—তিনি কবিতা-সৃষ্টির একটা বিশেষ যুগের মধ্যে পালিত হয়েও কোনো রকম অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর একান্ত নিজস্ব কাব্য-প্রতিভাকে খণ্ডিত করেন নি। তাঁর কাব্যের রূপ ও অলঙ্কার নতুন কোনো প্রচেষ্টার আওতায় পড়ে বিকৃত হয়নি। তার বাইরের কাজ অত্যন্ত সাদাসিদে; আর বিষয়গুলি চড়া রকমের রোমান্টিক সুরে বাঁধা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাতে স্টাইলের আত্মসচেতনা নেই, আছে নিপুণ পদযোজনা ও শব্দসঙ্গীতের নিখুঁত কান; -এতো নিখুঁত যে ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার আবেশে মন অভিভূত হয়ে পড়ে—

একবার মনে হয়, দূরে—বহু দূরে—শাল, তাল,
তমাল, হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়াম্লান দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোনো দিন এসে'
আঁখি হ'তে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

এ কবিতা তাঁরি হাত থেকে বেরুনো সম্ভব যাঁর হাতে কঠিন নিগড়ে বাঁধা সনেট নূপুরে পরিণত হয়েছে, যাঁর কানে বর্ণের অতি-সূক্ষ্ম ধ্বনি ধরা পড়ে, আর মনের মধ্যে আছে একটা স্বপ্নসমৃদ্ধ অথবা মোহময় একটা অলৌকিক পৃথিবীর উপর আসক্তি। "কুসুমের মাস"-এর কবি যে সত্যিকারের শিল্পী এটা বোঝাবার জন্যে আর কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

রোমান্টিক কবিতায় অজিত বাবুর আসন সুপ্রতিষ্ঠ। তাঁর "কুসুমের মাস" বইখানিতে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল, 'পাতালকন্যা'তেও তা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত আছে। অবশ্য 'পাতালকন্যা' আরও পরিণত রচনা এবং কবি ইতিমধ্যে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু প্রথম বইয়ের 'মায়া' অথবা 'মালতী ঘুমায়' কবিতাগুলির সঙ্গে 'পাতালকন্যা' ও 'পরী'র আন্তরিক সংযোগ রয়েছে এবং রূপকথার রাজ্যের সঙ্গে কবি-মনের যে নিবিড় বন্ধন কুসুমের মাসে লক্ষ্য করেছিলাম, তা' আট বছর পরেও ছিন্ন হয়নি। ভাষা আরও সংযত হয়েছে, ছবিগুলি আরও পরিস্ফুট হয়েছে, এবং তাদের রঙের তীব্রতা কিছু কমেছে, কিন্তু মোটের উপর কল্পনা-বস্তু একই আছে, বিশেষ কিছু বদলায়নি। 'পাতালকন্যা' পড়ে বোঝা গেলো—কবি মায়াপুরীর মোহে আচ্ছন্ন। বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও তিনি কল্পলোকের অধিবাসী। এতে সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হবার কারণ কিছু নেই। বিলেতে যদিও আধুনিক লেখকের হাতে কাব্যের রূপ ও বিষয়ের অভাবনীয় বিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, তবুও সেদেশে ওয়ালটার ডি লা মেয়ার, ডেভিস্-এর কদর কমেনি এবং কাব্যশিল্পী হিসেবে তাঁদের স্থান আজও অতি উঁচুতে। সুতরাং অজিত বাবুর 'পরী' কবিতাটিতে যে মনোভাব ধরা যায়, তা' আধুনিকতার পরিপন্থী হলেও কীট্‌স্-এর La Belle Dame sans Merci-রই সমধর্ম্মী।

'মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়ো আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান ;
সাবধানে যেয়ো সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তার মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান।'

কিংবা

'কুমার শুনেছে রূপকথা ;
সাপের নিশ্বাসে হিম পাতালের অবশপ্রাসাদে
কন্যার সোনার তনু গরলের নীলিমায় কাঁদে,
—নীল সোনালতা।
সেখানে বেঁধেছে বাসা কুমারের উদাসীন মন ;
তাহারে ফিরাবে কোন্ জন ?

এ সব যে কবির রচনা, তাঁর মন উগ্র রকমের রোমান্টিক হলেও, তিনি শিল্পী এবং তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাবো। কেননা, তাঁর এক হাতে আছে সোনার কাঠি, অপর হাতে সাপের মণি।

'পাতাল-কন্যা'র কবিতাগুলি অবশ্য সবই একজাতীয় নয়। তাতে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন 'পুলিশ' ও 'বড় বাজার', আর 'মিস্—' 'অনধিকারী', 'আত্মীয়' ও 'পত্র' প্রভৃতি কয়েকটি অতি-উপাদেয় মৃদু ব্যঙ্গ-কবিতা আছে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে 'রাঙা সন্ধ্যা,' এবং বিশেষ করে,—'মাছেরা' ও 'একটি কবিতার টুক্‌রো' অজিত বাবুর প্রকৃত কাব্যপ্রতিভা ও শিল্পসৃষ্টির উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। 'রাঙা সন্ধ্যা' আমার মনে Alice Meynell-এর কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর 'মাছেরা' কবিতাটি পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় Yeats-এর কথা। শেষোক্ত কবিতাটি এত সরল, সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর সৃষ্টি যে তা থেকে কয়েকটি লাইন্ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।—

ছোট মাছ, বড় মাছ—পাশাপাশি ছুটে চলে যায়,
নীলাভ ঢেউয়ের 'পরে, পাতালের নিথর শীতলে,
তা'দের ডানার নিচে সপ্ত সমুদ্রের নীল জল,
তা'দের নিশ্বাসে কাঁপে আকাশের নক্ষত্রের ছায়া।

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙলা মিলের দুরূহ তত্ত্ব-আলোচনা প্রসঙ্গে অজিতবাবু লিখেছিলেন, "কবিতা লিখ্‌তে আমার কষ্ট হয় ; কারণ মিল ছাড়া জিনিসটা আমার মনে হয় ভীষণ দুরূহ। অথচ মিল ছাড়া গদ্য কবিতা লেখবার শক্তি আমার নেই।" একথা ঠিক যে অজিত বাবু স-মিল কবিতা এবং নিয়মিত মাত্রায় ছন্দোরচনার পক্ষপাতী। এবং বাঙলা ভাষায় ভালো মিল দেওয়ার জন্য প্রচলিত মাত্র যে কয়েকটি শব্দ আছে, তারা অতি-ব্যবহারে মলিন—সত্যিকারের কাব্যরস নষ্ট করে দেয়। যদিও অজিত বাবু "আরেক রাত্রিতে" কবিতায় 'ওড়ে যেথা প্রজাপতি'র সঙ্গে 'কুসুমিত বসুমতী'র পদ্যপাঠের মিল করিয়েছেন কিন্তু সেটা বাধ্য হয়েই। এই জন্যেই অজিত বাবু এক-স্বরান্ত মিলের পক্ষপাতী, যদি-ও তার প্রচলন এখনো খুব হয় নি। তবু 'পাতালকন্যা'য় একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, সেটা অজিত বাবুর ছন্দোবৈচিত্র্য। 'পশ্চাদ্বর্ত্তী', 'পুলিশ' এ দুটি কবিতায় তিনি ছন্দ বদলেছেন ; 'অহল্যা' কবিতায় তিনি অমিত্রাক্ষরকে অতি নিপুণভাবে রূপ দিয়েছেন, আর 'একটি কবিতার টুক্‌রো'তে তিনি অসম-মাত্রায় অতি সুন্দর মিল দিয়েছেন। শেষোক্ত কবিতাটি ভাবে ও ভাষায় একটি নিখুঁত সৃষ্টি। এই জাতীয় রচনা দেখে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে কাব্যরস অব্যাহত রেখে ছন্দ আর মিলের উৎকর্ষ সাধন অজিত বাবুর করায়ত্ত হয়েছে, যদি-ও স্বীকার করি ও দুটো জিনিষই রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

'পাতালকন্যা'য় আমরা আরো কয়েকটি বেশী কবিতা সন্নিবেশিত হবে প্রত্যাশা করেছিলাম। এবং সে প্রত্যাশা মোটেই অন্যায় নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো তিনিও স্বল্পভাষী ও প্রকাশকুণ্ঠ কবি। তিনি অত্যন্ত কম লেখেন ; কিন্তু এতো অল্প রচনার মধ্যে তিনি এতো ভালো জিনিষ আমাদের দিয়েছেন যে কবিতানুরাগী পাঠকেরা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করবার অধিকার রাখে। ফেনানো কথা, চতুর পদবিন্যাস, চমক লাগানো উপমা প্রভৃতি কাব্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর অলঙ্কারমোহ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাব্যশক্তির বিকাশ অথচ সযত্ন শিল্পশ্রমের পরিচয় আছে। এক কথায় অজিত বাবুর কবিতা ঐতিহ্যের নোঙর-ছেঁড়া না হলেও কারুর দাসত্ব করে না। তাঁর লেখা রোমান্টিক হলেও বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। অতএব—

'যারা বলে জানা আছে সব
আমি থাকি তাদের পশ্চাতে—
বাক্যহীন মূঢ়দের সাথে'

এ ধরণের আত্মগুপ্তি-পরায়ণ মনোভাব যতই প্রশংসা-যোগ্য হোক্ না কেন,—আমরা বলি, তিনি অতোটা পশ্চাদ্বর্ত্তী না থেকে আরো একটু বিস্তৃত প্রকাশক্ষেত্রে অগ্রসর হোন্। শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

ভাষার ইতিবৃত্ত,—শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা বাংলাভাষায় এ পর্য্যন্ত যৎসামান্যই হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকায় ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দুই চারিটী ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী মূল্যবান নিবন্ধ ব্যতীত ভাষাতত্ত্বের ধারাবাহিক আলোচনায় শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবু ও সুকুমার সেন মহাশয়ের গবেষণাই উল্লেখযোগ্য। "বাংলাসাহিত্যে গদ্য" গ্রন্থে সুকুমার বাবু বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমপরিণতির ইতিহাস রচনা করিয়া তাঁহার গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিও ভাষাতত্ত্বে সুকুমার বাবুর বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দেয়। "ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থখানি স্বল্পপরিসর হইলেও, খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিষয়বিভক্তির বৈচিত্র্যে ও সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্ আলোচনার কৌশলে বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে ইংরেজীতে প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব নাই। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের মূলনীতিগুলি এ পর্য্যন্ত বাংলা-ভাষায় সাধারণের পাঠযোগ্যভাবে আলোচিত না হওয়ায় বাংলাভাষাসেবিগণকে সকল সময়েই ইংরেজী গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সমস্ত ইন্দো-ইয়ুরোপীয় ভাষাই যে পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং ইহাদের ঐতিহাসিক রূপান্তর যে কতকগুলি অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী ঘটিয়াছে, ইহা সাধারণ পাঠকবর্গেরও জানা দরকার। নতুবা বাংলাভাষার বিবর্ত্তনের ইতিহাসের জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও সঙ্কীর্ণ জাতীয় ও প্রাদেশিক বেষ্টনীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। গ্রন্থের প্রথম অংশ—"ভাষাবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা"য় সুকুমার বাবু ভাষাতত্ত্বের সাধারণ সূত্রগুলি অতি সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ভাষার উৎপত্তি, গঠন ও ক্রম-পরিবর্ত্তনের সমস্যা ও উহা সমাধানের জন্য ভাষাবিজ্ঞানের গৃহীত সূত্রগুলি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রচলিত ইংরেজী গ্রন্থে যেমন উদাহরণগুলি য়ুরোপীয় ভাষাসমূহ হইতে আহরিত হয় তেমনি সুকুমার বাবু প্রধানতঃ ভারতীয় ভাষাগুলি হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয় আরও সহজবোধ্য করিয়াছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে ইন্দো-ইয়ুরোপীয় মূল ভাষার সহিত প্রাচীন ভারতীয় ভাষাগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে। এই সকল জটিল বিষয়ের অতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ আলোচনা-পদ্ধতি অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে অনেক পরিশ্রমের দায় হইতে অব্যাহতি দিবে। ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রীয়ারসন, গাইগের, উহ্‌লেনবেক ও কাদ্রী প্রমুখ আচার্য্যগণের প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠ করা আয়াস-সাধ্য এবং সকলের পক্ষে সম্ভবপরও নহে। "গ্রিমের সূত্র", "ভেরনরের সূত্র" প্রভৃতি যাহা ইংরেজী ভাষাবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলিতেও সহজবোধ্য নহে, তাহা সুকুমার বাবুর বাংলা আলোচনার মধ্যে প্রাঞ্জল হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা পরিভাষায় রূপান্তরিত হইয়াও সূত্রগুলি কোথায়ও দুর্ব্বোধ্য হয় নাই। এক ভাষার সহিত অন্য ভাষার ধ্বনি-গত ও শব্দগত সাদৃশ্য অনেক সময়ে আমাদিগকে বিস্মিত করে; কিন্তু এই সাদৃশ্যের মূলে যে সকল নিয়ম সক্রিয় রহিয়াছে তাহা জানা থাকিলে বিভিন্ন ভাষার মূলগত ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য বোধগম্য হয়। সুকুমার বাবুর গ্রন্থের তৃতীয় অংশ নব্যভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির ধ্বনি-গত, শব্দরূপগত ও ধাতুরূপগত ঐক্য ও ক্রমিক রূপান্তর বিশদভাবে আলোচিত হওয়ায় সাধারণ পাঠকবর্গের মনে ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলি সম্বন্ধে একটী সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিতে পারিবে। "বাংলাভাষার সাধারণ লক্ষণ ও যুগবিভাগ" অধ্যায়টী বাংলাসাহিত্যসেবী প্রত্যেকেরই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য; এইরূপ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধেও সুকুমার বাবু একটী ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন।

শব্দের অর্থপরিবর্ত্তন ও বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডার অধ্যায় দুইটী বাংলাভাষা-বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে এই বিষয় আলোচনায় অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে। ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে শব্দার্থপরিবর্ত্তনের

আলোচনা এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। ভাষার বাহ্যিক রূপান্তর আলোচনা অপেক্ষা বিভিন্ন শব্দের অর্থ-প্রসার, সঙ্কোচ ও সংশ্লেষের ঐতিহাসিক ধারা অনুসন্ধান যেমন বিচিত্র তেমনই শিক্ষাপ্রদ। কারণ ভাষার ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত পরিবর্ত্তন অপেক্ষা ভাষার শব্দগত পরিবর্ত্তন ও শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সমাজ-মনের বিচিত্র বিকাশের বহুমুখী গতির সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ-পরিচয় করাইয়া দেয়। শব্দার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনা অপেক্ষাকৃত শৈশবা-বস্থায় থাকিলেও ব্রেয়াল, রিচার্ডস্, অগ্‌ডেন প্রমুখ পণ্ডিত-গণ এই বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা-ভাষায় শব্দার্থ পরিবর্ত্তনের আলোচনা যৎসামান্যই অগ্রসর হইয়াছে। সুকুমার বাবু শব্দার্থ পরিবর্ত্তনের মূলনীতিগুলির সহিত সাধারণ পাঠকবর্গকে পরিচিত করাইয়া, এই বিষয়ে আলোচনার পথ সুগম করিলেন সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা এই বৈজ্ঞানিক পুস্তকখানির প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া সাহিত্য সেবিগণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

—শ্রীসরোজরঞ্জন আচার্য্য



বিপিনের সংসার

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবারণ মুখুজ্জে বলিলেন না না সে সব কিছু নয়। ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। বলেই ফেলি। এই গিয়ে তোমার বোনকে নিয়ে গাঁয়ে কথা উঠেছে—মানে ওপাড়ার পটলের সঙ্গে সর্ব্বদাই মেলামেশা করে আসছে তো অনেকদিন থেকেই—সম্প্রতি একদিন নাকি সন্দেবেলা তোমাদের বাড়ীর পেছনে বাগানে কাঁটালতলায় তুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল—যে দেখেছিল সেই বলেছে। এই নিয়ে গাঁয়ে খুব কথা চলছে। এই সময় তোমার একবার বাড়ী যাওয়া খুব দরকার বলে মনে করি।

বিপিন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল—তাহার বোন অসঙ্গত কিছু করিতে পারে ইহা তাহার মাথায় আসেই না। তাহাকে বিপিন নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া জানে—আচ্ছা, যদি পটলের সঙ্গে কথাই বলিয়া থাকে তবে তাহাতে দোষই বা কি আছে?

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল বাড়ী যাওয়াটা খুব দরকার বটে এসময়। পলাশ পাড়ায় এমন কোনো জরুরী দরকার নাই যে আজ না ফিরিলেই চলিবে না। বরং একবার বাড়ী ঘুরিয়া আসা যাক্।

বৈকালের দিকে বিপিন গ্রামে পৌঁছিল। বাড়ী ঢুকিতেই প্রথমে মনোরমার সঙ্গে দেখা। স্বামীকে হঠাৎ এভাবে আসিতে দেখিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল—কখন এলে কোন্ গাড়ীতে? চিঠি তো দাও নি? ভাল আছ তো?

বিপিন পুঁটুলিটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল—ধরো এটা। মার জন্যে বাতাসা আছে, ভেঙে না যায় দেখো। নেবেঞ্চুস্ আছে, ছেলেপিলেদের ডেকে দাও। তোমরা কেমন আছ?

বলাই কোথায়?

—বলাই গিয়েচে মাছ ধরতে।

—কেমন আছে সে?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল।

—কেমন আছে বলাই?

—ভালো না। আমার কথা কেউ তো শোনে না, যা পাচ্চে তা খাচ্চে, রোজ নদীর ধারে মাছ ধরতে গিয়ে জলের হাওয়ায় বসে থাকে। জ্বর হয় রোজ রাত্তিতে—তার ওপর খায় দায়। ওষুধ বিষুধ কিছুই না।

—মুখ হাত পা কেমন আছে?

—বেজায় ফোলা। এলেই দেখে বুঝতে পারবে। আর একটা কথা শুনেচ?

—হ্যাঁ, নিবারণ কাকার মুখে শুনলাম রাণাঘাটে। কি ব্যাপার বলো তো?

—যা শুনেছ, সব সত্যি। আমার কথা ঠাকুরঝি একবারে শোনে না—কত দিন বারণ করেছি।

মাকেও বলে দিইছি, মা শুনেও শোনেন না। এখন গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে—এখন আমার কথা হয় তো তোমাদের ভাল লাগলেও লাগতে পারে। দাসী বাঁদির মত এ বাড়ীতে আছি বই তো নয়?

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, যা জিগ্যেস্ করছি তার উত্তর দাও না আগে। তুমি নিজের চোখে কিছু দেখেছ?

—কত দিন। তোমাকে বল্লেই তুমি রেগে যাবে বলে কিছু বলিনি। মাকে বলে কি হবে—ও'কে বলা না বলা দুই সমান।

—আচ্ছা থাক্। বীণাকে একবার ডেকে দাও—আমি তাকে দুএকটা কথা বলি। তুমি এঘর থেকে যাও।

কিন্তু মনোরমা ঘর হইতে চলিয়া গেলেও বীণার আসিতে দেরি হইতে লাগিল। বিপিন ভাবিতে লাগিল, এ ব্যাপার লইয়া বীণাকে সে কি বলিবে? বীণা তাহার ছোট বোন। কখনও তাহাকে সে রূঢ় কথা জীবনে বলে নাই—বিশেষ করিয়া বীণা বিধবা হইবার পরে বিপিন সাধ্যমত চেষ্টা করে ছেলেমানুষ বীণাকে কি করিয়া একটুখানি সুখী করা যায়। তাহার ছোট বোন—কি বলিবে তাহাকে এ ব্যাপার সম্বন্ধে? তারপর সে ভাবিল—বীণার দোষ কি? অল্পবয়সের বিধবা! ওর মনের কোন্ সাধই বা পুরেছে? পটলকে হয়তো ওর চোখে ভাল লেগেছে—সম্পূর্ণ সম্ভব। ছেলেবেলা থেকেই পটলের সঙ্গে ওর ভাব ছিল, আর কেউ না জানুক, আমি জানি। যদি পটলের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে ওর তৃপ্তি হয়—তা আমি বারণ করিই বা কি ভাবে!······তবে বীণা ছেলেমানুষ, সংসারের কি-ই বা জানে! কত বিপদ আছে কত দিকে, সে তার কি খবর রাখে? না—আমার কাজ নয়। মনোরমাকে দিয়ে বলাতে হবে।

হঠাৎ তাহার মনে আসিল, মাণীর কথা।

সেও তো এই রকম ছেলেবেলার বন্ধুত্ব। মানী বিবাহিতা, তার স্বামী শিক্ষিত, মার্জ্জিত, ভদ্র যুবক। তবে মানী কেন তাহার সহিত কথা বলিতে আসে? কেন তাহাকে দেখিবার জন্য মানীর এত আগ্রহ?

এসব কথার কোনো মীমাংসা নাই। মীমাংসা হয় না। এই যে সে আজ বাড়ী আসিয়াছে—সারাপথ, সারাট্রেনে কাহার কথা সে ভাবিয়াছে?

নিজের মনকে চোখ ঠারা চলে না। ছেলেমানুষ বীণাকে সে কি দোষ দিবে? তাহার বাবা কি করিয়াছিলেন?

যাক ওসব কথা। মনোরমাকে দিয়া বীণাকে বলাইতে হইবে। গ্রামে কোনো কুৎসা ঘটে বীণার নামে—তাহা কখনই হইতে দেওয়া চলিবে না। আবশ্যক হইলে বীণাকে এখান হইতে সরাইয়া ধোপাখালি কাছারীতে নিজের কাছে কিছুদিন না হয় রাখিবে।

এই সময়ে বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ডাকছিলে দাদা?

বিপিন চোখ তুলিয়া বীণার দিকে চাহিল। অনেক দিন ভাল করিয়া সে বীণাকে দেখে নাই। বীণার মুখশ্রী আজকাল এত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে! কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে বীণা! চোখ দুটি যেমন ডাগর, তেমনি স্নিগ্ধ। মুখখানি এখনও ছেলেমানুষের মতই। এ চোখে ও মুখে কোন পাপ থাকিতে পারে?

বিপিন বলিল—বলাই কোথায়?

—ছোড়দা মাছ ধরতে গিয়েছে।

—তোর শরীর ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ। তুমি হঠাৎ চলে এলে যে?

—এম্‌নি। রাণাঘাটে এসেছিলাম কাজে—ভাবলুম একবার বাড়ী ঘুরে যাই। হ্যাঁ, মা কোথায়?

—মা বড়ির ডাল ধুতে গিয়েছেন পুকুরের ঘাটে। ডেকে আনবো?

থাক্ এখন। ডাকার দরকার নেই। তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কি বল না?

—তুই পটলের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিস্ নে। গাঁয়ে ওতে পাঁচরকম কথা ওঠাচ্ছে—আমরা গরীব লোক, আমাদের পক্ষে সেটা ভাল নয়।

বিপিন কথাটা মরীয়া হইয়া বলিয়াই ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, পটলের কথা বলিতেই বীণার চোখ মুখের ভাব যেন কেমন হইয়া গেল—যে ভাব সে বীণার মুখে চোখে কখনও দেখে নাই।

মনোরমার কথা তাহা হইলে মিথ্যা নয়—নিবারণ মুখুজ্জেও বাজে কথা বলেন নাই। পূর্ব্বে হইলে হয় তো বিপিন বীণার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত না—কিন্তু গত কয়েক মাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বিপিন এসব লক্ষণ বুঝিতে পারে এখন!

বীণা কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে যেন সামলাইয়া লইয়া সহজ ভাবেই বলিল—যা বলো দাদা। পটল-দা আসে, কথাবার্ত্তা বলে—তাই বলি। না হয় আর বলবো না।

বিপিন বুঝিল ইহা মিথ্যা আশ্বাস। বীণা ছলনা করিতেছে—পটলের সঙ্গে তাহার কিছুই নাই ইহা সে দেখাইতে চায়—আর একটি খারাপ লক্ষণ। ছেলেমানুষ বীণা ভাবিয়াছে ইহাতেই দাদার চোখে ধূলা দেওয়া যাইবে—যাইতও, যদি মানীর সঙ্গে পলাশপুরের বাড়ীতে তাহার দেখা না হইত।

ইহা ঠিকই যে বীণা মিথ্যা কথা বলিতেছে। পটলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে বন্ধ করিবে না। লুকাইয়া দেখা করিবার চেষ্টা করিবে। বিপিন বুঝিল, সে বীণা আর নাই, তাহার ছোট বোন সরলা ছেলেমানুষ বীণা এ নয়, এ প্রেমমুগ্ধা তরুণী নারী, প্রেমিকের সহিত মিশিবার সুবিধা খুঁজিতে সব রকম ছলনা এ অবলম্বন করিবে। সহোদরা বটে, কিন্তু বীণাতে আর বিশ্বাস নাই। বীণা দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বিপিন তবুও হাল ছাড়িল না। বীণাকে কাছে বসাইয়া তাহাদের বংশের পূর্ব্ব গৌরব সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গ্রাম্য কুৎসা যে ভয়ানক জিনিস, তাহাতে একটি গৃহস্থের ভবিষ্যৎ কি ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, দু একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বীণা খানিকক্ষণ মন দিয়া শুনিল—কিন্তু ক্রমশঃ সে যেন অধীর হইয়া পড়িতেছে, দু একবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও সে সাহস পাইতেছে না—দাদার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচে—এরূপ ভাব তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই সময়ে বলাই আসিয়া পড়াতে বিপিনের বক্তৃতা আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া গেল। বলাই ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দাদা, কখন এলে? মাছ ধরে এনেছি দেখবে এস—মস্ত একটা শোল মাছ আর দুটো ছোট ছোট বান—

বিপিন বলাইয়ের চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মুখ আরও ফুলিয়াছে, শরীরে রক্ত নাই—পায়ের পাতা বেরি বেরি রোগীর মত দেখিতে, চোখের কোণ সাদা। অথচ এই চেহারা লইয়া বলাই দিব্য মনের আনন্দে মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে, খাওয়া দাওয়া করিতেছে।

ভগবান এ কি করিলেন? চারিদিক হইতে তাহার জীবনে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহার বুঝিতে বাকি নাই। বলাই বাঁচিবে না। নেফ্রাইটিসের রোগীর শেষ অবস্থা তার চেহারায় পরিস্ফুট—অথচ সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

বিপিন বলাইকে কিছু বলিল না। বলিয়া কোনো ফল নাই—যেমন বীণাকে বলিয়া কোনো ফল নাই। কেহই তাহার কথা শুনিবে না। সে চাকুরী করিতে বাহির হইলেই উহারা যাহা খুসী তাহাই করিবে। এ জগতে কেহ কাহারও কথা শোনে না—সবাই স্বার্থপর, যাহা যাহার ভাল লাগে—সে তাহাই করে, অন্য কারো মুখের দিকে চাহিবার অবসর তখন তাহাদের বড় একটা থাকে না। সে নিজে সারা জীবন তাহাই করিয়া আসিয়াছে—এখনও করিতেছে—অপরের দোষ দিয়া লাভ কি?

দুপুরের পর সে নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছে, মনোরমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি?

—না ঘুমুই নি। বসো।

মনোরমা তক্তপোষের এক কোণে বিপিনের মাথার কাছে বসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বীণাকে বল্লে কিছু নাকি?

—বলেছি।

—ও কি বল্লে?

—বল্লে, পটলের সঙ্গে আর কথা বলবে না।

—একটা কথা বলি শোনো। ওরকম করলে হবে না কিছু। বীণা ঠাকুরঝি যাই বলুক, পটলের সঙ্গে দেখা না করে পারবে না। তুমি বাড়ী থেকে বেরুতে যা দেরী। তার চেয়ে এক কাজ করো, পটলকে একবার বলে যাও কথাটা। ওকে ভয় দেখাও, বাড়ী আসতে বারণ করে যাও—তাতে কাজ হবে। বুঝলে আমার কথা? বিপিন মনে মনে মনোরমার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। মেয়েমানুষের মন সে অনেক বেশী বোঝে তাহার নিজের চেয়ে।

মনোরমা আবার বলিল—না হয় পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে তাদের সামনে পটলকে দুকথা বল। এ বাড়ী আসতে মানা করে দাও। তাতে দুকাজই হবে। গাঁয়ের লোক জানুক তুমি বাড়ী এসে দুজনকেই শাসন করে দিয়েছ—পটলেরও একটা ভয় আর লজ্জা হবে—সে হঠাৎ এবাড়ীতে আসতে পারবে না।

—কিন্তু তাতে একটা বিপদ আছে। গাঁয়ের লোকের কথা আমিই বা অনর্থক গায়ে মেখে নিতে যাই কেন? তাতে উল্টো উৎপত্তি হবে না?

—কিছু উল্টো উৎপত্তি হবে না। বেশ, ভয় দেখিয়ে না হয় মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলো পটলকে। যখন এরকম একটা কথা উঠেছে—তখন ভাই আমাদের বাড়ী আর তোমার যাওয়া আসাটা ভাল দেখায় না—এই ভাবে বল।

—তাই তবে করি। এদিকে আর একটা কথা বলি শোনো। বলাইয়ের অবস্থা ভাল নয়। আজ দেখে বুঝলাম ও আর বেশী দিন নয়।

—বল কি গো? অমন বলতে নেই।

—আর বলতে নেই! মনোরমা, সামনে আমার অনেক বিপদ আসছে আমি বুঝতে পেরেছি। এই বীণার ব্যাপার, বলাইয়ের চেহারা—এ সব দেখে তোমারই বা কি মনে হয়? আমার এখন পলাশপাড়া যাওয়া হয় না। সেই রাত্রেই বিপিনের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইল। শেষ রাত্রি হইতে বলাই হঠাৎ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল, মাঝে মাঝে চীৎকার করে, মাঝে মাঝে ছুটিয়া বাহির হইতে যায়। প্রতিবেশীরা অনেকে দেখিতে আসিলেন—নানারকম টোটকা ওষুধের ব্যবস্থা করিলেন—কিছুতেই কিছু হইল না। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, বলাইএর মুখের বুলিই হইল—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!......যন্ত্রণায় বলাই যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল, মুখে যাহা আসে বকে, হাত পা ছোঁড়ে, আর কেবলই ছুটিয়া বাহির হইতে যায়।

তিন দিন তিন রাত্রি একই ভাবে কাটিল। কত রকম তেল-পড়া, জল-পড়া, ঝাড়ফুঁক যে যাহা বলে তাহাই করা হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। চতুর্থ দিন সকাল আটটার সময় হইতে বলাইয়ের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

বিপিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—কি করচো?

মনোরমার চক্ষু রাত জাগিয়া লাল, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে—বৃদ্ধা শাশুড়ী রাত জাগিতে পারেন না—বিপিনও আয়েসী লোক, রাত একটা পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে জাগিয়া থাকে—তারপর গিয়া শুইয়া পড়ে। মনোরমা সারারাত জাগিয়া থাকে রোগীর পাশে—আর থাকে বীণা।

মনোরমা বলিল—গোয়ালে আজ চারিদিন ঝাঁট পড়েনি গোয়ালটা একটু ঝাঁট দিচ্ছি।

বিপিন বলিল—গোয়াল ঝাঁট থাকুক। সকাল সকাল নেয়ে এসে দুটো যাহয় রেঁধে ছেলে-পিলেদের খাইয়ে দাইয়ে নাও—বীণাকে আর মাকে খাইয়ে দাও। বলাইয়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না?

মনোরমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কেন গো—ঠাকুরপোর অবস্থা খারাপ?

তা দেখে বুঝতে পারছ না? আজই হয়ে যাবে। আর দেরি নেই। শীগগির করে ঘাটে যাও।

মনোরমা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। বিপিন বলিল—কেঁদে কি হবে, এখন যা করবার আছে করে ফেল। মায়ের সামনে যেন কোঁদো না, ঘাটে যাও চলে।

মনোরমার একটা অভ্যাস সংসারের মধ্যে যে যে আছে তাহাদের সকলকেই সে ভালবাসে, স্নেহ করে—মা, বীণা ঠাকুরঝি, ঠাকুরপো,—সকলেরই সুখসুবিধা দেখা তাহার চিরকালের অভ্যাস। এই সাজানো সংসারের মধ্য হইতে বলাই ঠাকুরপো চলিয়া গেলে সংসারের কতখানি চলিয়া যাইবে!...সে চিন্তা মনোরমার পক্ষে অসহ্য!

বিপিন ভাইয়ের সামনে গিয়া বসিল। বীণাকে বলিল—যা বীণা, ঘাটে যা—আমি আছি বসে। মাকে নিয়ে যা।

সত্যি, এতটুকু মেয়ে বীণা কয়দিন কি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সমানে রাত জাগিতেছে—মা ও উঁহার বৌদিদির সঙ্গে। দেবীর মত সেবা করিতেছে ভাইয়ের, অথচ কি অভাগিনী! জীবনে সে কখনো

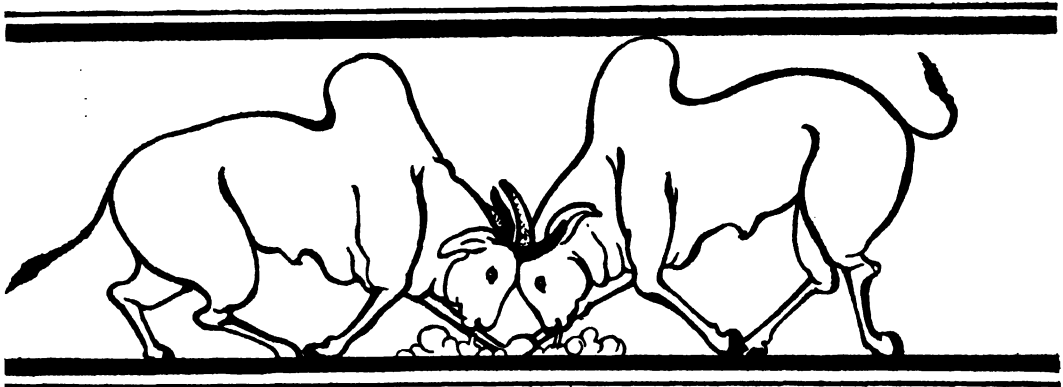
যাহা পায় নাই—অথচ যার জন্য তার বালিকা মন বুভুক্ষু, অপরের নিকট হইতে তারই এককণা পাইবার নিমিত্ত অভাগিনীর কি ব্যর্থ আগ্রহ! নিজেকে দিয়া বিপিন বোঝে এ কি নিদারুণ বুভুক্ষা।

সকলে আহারাদি শেষ করিয়া লইয়া বলাইয়ের কাছে বসিল। বলাইয়ের গত দুই দিন কোনো জ্ঞান ছিল না—যন্ত্রণায় চীৎকার করে মাঝে মাঝে কিন্তু মানুষ চিনিতে পারে না। বিপিনের মা খুব শক্ত মেয়ে—তিনি সবই বুঝিয়াছিলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত তাঁহার চোখে জল পড়ে নাই—বরং বীণা ও মনোরমা কাঁদিলে তিনি কালও বুঝাইয়াছেন। আজ কিন্তু দুপুরের পর হইতে তিনি অনবরত কাঁদিতেছেন। বীণা ডোবার ধারে বাসন লইয়া গিয়াছিল।

ডোবার ওপারের ঘাটে রায় বৌ ও নিবারণ মুখুজ্জের বড় মেয়ে নলিনী কথা বলিতেছিল। নলিনী হাত পা নাড়িয়া বলিতেছে—তা হবে না ওরকম? বাড়ীতে বিধবা মেয়ের ওই রকম অনাচার ভগবান সহ্যি করেন! জলজ্যান্ত ভাইটা ধড়ফড় করে মরলো চোখের সামনে। এখনও চন্দ্র সূর্য্য আছেন—অনাচার ঢুকলে সে সংসারে মঙ্গল হয় কখনো! বীণা জলে নামিতে পারিল না—জলের ধারে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

উহারা বীণাকে দেখিতে পায় নাই—বীণা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাসন লইয়া চলিয়া আসিল—চোখের জল সামলাইতে পারিল না ফিরিবার সময়। পটলদা'র সঙ্গে কথা বলা অনাচার! এ ছাড়া আর কি অনাচার সে করিয়াছে? ভগবান তো সব জানেন। তাহারই পাপে ছোড়দা মরিতে বসিয়াছে—একথা যদি সত্য হয়—সে পিতল কাঁসা হাতে শপথ করিয়া বলিতেছে আর কোন্ দিন সে পটলদার মুখ দেখিবে না। ভগবান ছোড়দাকে বাঁচাইয়া দিন। কিন্তু ভগবান তাহার অনুরোধ রাখিলেন না। বৈকাল পাঁচটার সময় বলাই মারা গেল।

ক্রমশ





আমাদের দেশে দৈনিকপত্র ছুঃখের বার্ত্তাবহ। কিন্তু যদি দৈনিকপত্র কেবল আনন্দের সংবাদ বহন করিত! আমাদের যদি কোন অভাব অভিযোগ না থাকিত, চারিদিকে আনন্দ আর আনন্দ! দেশে পরিমিত বৃষ্টি হইয়াছে, ক্ষেত শস্যভারে প্রপীড়িত, গাছে গাছে পাখীরা ভারতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে, ডাক্তারদের লোকে বিনা কারণে টাকা দিতেছে, ইংরেজগণ বলিতেছে, ভারতবাসী স্বাধীনতা গ্রহণ কর, ভারতবাসী বলিতেছে কি হইবে স্বাধীনতায়, আমরা মহাসুখে আছি; ব্যাঙ্ক বিজ্ঞাপন দিয়াছে কে টাকা ধার লইবে আইস, টাকা শোধ দিতে হইবে না, দলিলে স্বাক্ষর করিতে হইবে না, চাহিলেই টাকা; কিন্তু সে টাকা কেহ লইতে আসিতেছে না; হিন্দু বলিতেছে ভাই মুসলমান যাহা চাও তাহাই দিতেছি; মুসলমান বলিতেছে কিছুই চাই না, প্রতিদিন শুধু ইয়ার্কি করিয়া যাইতেছি; হিংস্র পশু হিংসা ভুলিয়া গৃহস্থের ছুয়ারে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে; দলে দলে হরিণ বাঘের নিকট গিয়া বলিতেছে আমাদিগকে ভক্ষণ কর, বাঘ বলিতেছে না আমরা বর্ত্তমানে শাকশব্জী খাইতেছি; মহাত্মা গান্ধী স্বহস্তে ছাগহত্যা করিতেছেন; সুভাষচন্দ্র আশ্রম খুলিয়া গীতার ভাষ্য লিখিতেছেন; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ভাঙিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু কোন কর্ম্মেরই প্রয়োজন না থাকাতে পথে পথে বেকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; আদালতগুলি মোকদ্দমার অভাবে উঠিয়া গিয়াছে; সিনেট হাউসে সিনেমা হইতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

* * * *

সত্যই যদি দেশের এইরূপ অবস্থা হইত, তাহা হইলে আনন্দ বার্ত্তাবহ দৈনিকপত্র আর কেহ পড়িত না। অন্য কথায় ছুঃখের সংবাদ থাকে বলিয়াই লোকে দৈনিকপত্র পাঠ করে। দৈনিকপত্র সর্ব্বহারার মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্ব্বজয়ী হইয়াছে; সেইজন্য বৎসরের একটিমাত্র আনন্দের দিনেও সে তাহার বৈশিষ্ট্য ভুলিতে পারে না। বিজয়ার দিন যখন সমগ্র বাংলাদেশ আনন্দ উৎসবে মত্ত, সেদিনও সে সম্পাদকীয় কান্না ছাড়িতে পারে না। সেদিনও সে বলে, বাংলাদেশ যে শ্মশান, এই শ্মশানে আনন্দ করিবে কে? সেদিনও তার রঙীন সাজের অন্তরালের দীন মূর্ত্তিটি স্পষ্ট দেখা যায়, তার ফুলের মালার অন্তরালের সর্ব্বসিদ্ধি এবং ধনদা কবচ বাহির হইয়া পড়ে।

* * * *

ক্রন্দন বাঙালীর পক্ষে এমনই সহজ যে বিবাহের মত আনন্দ উৎসবেও সে 'উপহার' ছাপাইয়া তাহাতে কাঁদিবার সুযোগ করিয়া লয়। শুভ বিবাহের দিনে পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কে কে বিবাহ

দেখিতে পারিল না বলিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে। ক্রন্দনের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের আশাও আমাদের দেশেই সম্ভব হইয়াছিল।

* * * *

দৈনিকপত্রের এইটুকু মূল্য স্বীকার করিয়া লইলে এদেশে সংবাদপত্র হিসাবে সাপ্তাহিক পত্রের কোন মূল্যই থাকে না। সাপ্তাহিক পত্রের অর্থ সপ্তাহকে লোকের নিকট পরিচিত করাইয়া দেওয়া। কিন্তু আমাদের দেশে যে জিনিস একদিনে শেষ হইল না তাহা এক সপ্তাহেও শেষ হয় না। সাপ্তাহিক পত্র যে কারণে সিনেমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হইতে চাহিয়াছে, সেই সিনেমাও আমাদের দেশে একবার আরম্ভ হইলে শেষ হইতে অনেক সময় বিশ-পঁচিশ সপ্তাহ কাটিয়া যায়। স্কুলে ভর্ত্তি হইলে বাহির হইয়া আসিতে দশ বৎসর লাগে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাস করিবার পর বেকার অবস্থায় বাকী জীবন কাটিয়া যায়। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে এখনও শেষ হয় নাই, আমাদের সাহিত্যের মৃত্যু ঘটিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছে, শিল্পের মৃত্যু ঘটিয়াছে কুড়ি বৎসরে, সঙ্গীতের ঘটিয়াছে দশ বৎসরে, কোন ভাল মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে শেষ হইতে দশ পনের বৎসর লাগে, বাঙালী জাতির মৃত্যু ঘটিতে আরও ত্রিশ বৎসর কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এদেশে পরাধীনতা প্রায় হাজার বৎসর টিকিয়া আছে।

* * * *

একমাত্র আশা ছিল প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে অনুরাগ সঞ্চার। ইহার জন্য অন্তত সাত দিন সময় লাগা উচিত, কিন্তু বর্ত্তমানে উহা সাত মিনিটেই শেষ হইয়া যায়। উহা অনেকটা এইরূপ।—উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ, উভয়েই উভয়ের অপরিচিত।

তোমাকে আমি ভালবেসেছি।

আমিও তোমাকে ভালবেসেছি।

আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, প্রস্তুত?

আমি প্রস্তুত, কিন্তু অভিভাবক প্রস্তুত নন।

কেন?

আমার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়েছে।

তবে উপায়?

ইহজগতে উপায় নেই।

তবে চল, যে জগতে আমাদের মিলন হবে, সেই জগতেই চল।

উভয়ে লেকের ধারে গেল। ধীরে ধীরে জলে নামিল, আর উঠিল না।

সাত মিনিটের ভিতর সব শেষ হইয়া গেল।

* * * *

সাপ্তাহিক পত্র এটা জানে বলিয়াই সে দৈনিক এবং মাসিকপত্রের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছে, কাজেই তাহার নিজস্ব কোন চরিত্র নাই এবং কোন পদমর্য্যাদাও নাই। দৈনিক হাহাকার ছাপিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হয়, মাসিক গাম্ভীর্য্যও তাহাকে মানায় না, সুতরাং আড়ম্বরপূর্ণ অথচ শূন্যগর্ভ উপকরণে চলে তাহার সাপ্তাহিক প্রসাধন, এবং সেটা প্রায় অসাধ্য সাধনের পর্য্যায়েই পড়ে। সর্ব্বহারা দৈনিক এবং বনিয়াদি মাসিক উভয়েই তাহাকে বুর্জোয়া বলিয়া ঘৃণা করে, কারণ সে উভয়েরই পাঠক ভাঙাইয়া লইবার চেষ্টা করে। সে যদি শুধু দৈনিক সংবাদ দিয়া পাতা ভর্ত্তি করিত তাহা হইলে সে দৈনিকের অপেক্ষাও দীন হইয়া পড়িত, আবার মাসিকপত্রের মত গুরুগম্ভীর হইলেও তাহার অকালপক্কতা কেহ সহ্য করিতে পারিত না।

* * * *

ইহা ভিন্ন বিক্রয়ের দিক দিয়াও সাপ্তাহিকে অসুবিধা আছে। আমাদের দেশে কেহ সাত দিন অন্তর বেতন পায় না, কাজেই সাপ্তাহিক পত্র নগদ কিনিয়া পড়া আমাদের দেশে প্রায় অসম্ভব। দৈনিকপত্রের খরচ দৈনিক বাজার খরচের সঙ্গে চলিয়া যায়, মাসিকপত্র কেনা যায় মাসিক বেতন হইতে, সুতরাং সাপ্তাহিকপত্র কিনিতে হইলে হয় দৈনিকপত্র বন্ধ করিতে হয়, না হয় মাসিকপত্র বন্ধ করিতে হয়, অথচ সাপ্তাহিকপত্রে দৈনিক বা মাসিক ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই।

* * * *

সুতরাং মাসিকপত্রের অবস্থা অনেক উন্নত। তদুপরি মাসিকপত্র দিনের সঙ্গে বা সপ্তাহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয় বলিয়া তাহার এমন একটি বিশ্বকালীন স্বাতন্ত্র্য আছে যাহার জন্য সে আর সকলের অপেক্ষা উচ্চাসন গ্রহণ করিয়াছে। সেই বিশ্বকাল প্রাচীন কাল দিয়া গঠিত। মহাকালও প্রাচীন। সুতরাং মাসিকের আভিজাত্য মহাকালের আভিজাত্য। অভিজাত ব্যক্তির লক্ষণের সঙ্গে ইহার সমস্ত লক্ষণ হুবহু মিলিয়া যায়। অভিজাত ব্যক্তির লক্ষণ এই যে তাহার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই, অতীত গৌরবই তাহার একমাত্র সম্পদ।

তাহার সম্পত্তি উত্তমর্ণের কাছে বাঁধা, তাহার প্রাচীন জীর্ণ গৃহে চামচিকার এবং পায়রার বাসা, এবং গৃহে তার যত জীর্ণতার ছাপ আভিজাত্যের সম্মান তাহার তত বেশি। সম্মুখের পথ তাহার অন্ধকার বলিয়া সে পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। সে দার্শনিক, এবং পশ্চাতের দিকে তাহার দৃষ্টি বলিয়া তাহার দার্শনের নাম পশ্চাৎ-দর্শন, অর্থাৎ ঠিক পাশ্চাত্য দর্শনের বিপরীত। অভিজাত ব্যক্তির এই সমস্ত চিহ্নই মাসিকপত্রে বর্ত্তমান। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব বিষয়ে যে কোন গবেষণা মাসিকপত্রের প্রধান অবলম্বন। প্রাচীন দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়েই হউক, বা প্রাচীন পুঁথি বিষয়েই হউক, একটা অন্তত প্রবন্ধ তাহার চাই। প্রাচীন শিলালিপি হইলে আরও সুখের। মাসিকের বক্ষ দেশে এই শিলার চাপ যত গুরু হইবে, অভিজাত-গুরুত্ব তাহার ততই বৃদ্ধি পাইবে।

* * * *

অতএব হে মাসিকপত্র পরিচাল্লনেচ্ছু, আপনার যদি প্রাচীন ভারতীয় কোন বিষয়ে কোন প্রবন্ধ জোগাড় হইয়া থাকে তবে আর মাসিকপত্র বাহির করিতে লেশমাত্র দ্বিধা করিবেন না। সে প্রবন্ধ যদি কেহ নাও পড়ে (পড়ে না, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই) তাহা হইলেও দ্বিধা করিবেন না। মাসিকপত্রের প্রথম প্রবন্ধ যে কেহ পড়ে না ইহার প্রমাণ আছে। শুনা যায় কোনও মাসিকপত্রে দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে একটি প্রবন্ধ শিরোনামা বদলাইয়া প্রতি মাসে ছাপা হইত এবং সেই একই প্রবন্ধ অবিরাম দশ বৎসর ধরিয়া ছাপা হইয়াছিল, কেহ ধরিতে পারে নাই।

*　　*　　*

আসলে ভূতমুখী মাসিকপত্র ভবিষ্যতের দিকে চলে ছোট গল্পের জন্য, কিন্তু কোন মাসিকপত্রের সবগুলি লেখাই যদি ছোট গল্প হয় তাহা হইলে সে পত্রের সামাজিক স্থান অতি নীচে নামিয়া পড়ে। যেমন অফিসের কেরানি। অফিসের কাজে প্রয়োজন পাটীগণিতের সিম্পল রূল-অব্-থ্রী, কিন্তু একটি লোক যদি শুধু রূল-অব্-থ্রী জানে তবে সে চাকরি পায় না। কিন্তু কোন লোক যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দিয়া প্রমাণ করিতে পার যে শেক্সপীয়ার কয়খানি নাটক লিখিয়াছেন তাহা সে জানে, কাব্য হিসাবে মেঘ-দূত বড় কি কুমার-সম্ভব বড় তাহা সে জানে, সাইকলজি আর্ট না সায়েন্স তাহা সে জানে, তাহা হইলে রূল-অব্-থ্রীর সাহায্যে অফিসের কাজ চালাইবার কাজ সে পাইবে। হিসাব রাখিতে শেক্সপীয়ার বা কালিদাস, ক্যাণ্ট বা হেগেল প্রয়োজন নাই, কিন্তু অভিজাত্য রাখিতে ইহা প্রয়োজন। আর অভিজাত্য না থাকিলে এ সংসারে কিই বা থাকিল ?

*　　*　　*

ছোট গল্প গবেষণামূলক প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গৌরবান্বিত হয়। তখন লোকে ইহার মূল্য বুঝিতে পারে। তাহার প্রমাণ, যে- ছোট গল্প মাসিকপত্রে না থাকিলে মাসিকপত্র চলে না, সেই ছোট গল্প যখন স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হয় তখন তাহা কেহ কেনে না। সেই জন্যে পাঠককে ভুলাইবার জন্য ছোট গল্পের বইয়ের নাম এমন রাখিতে হয় যাহাতে সে বুঝিতে না পারে যে ইহা অনেকগুলি গল্পের সমষ্টি। সে জন্য একটি গল্পের নামে সমগ্র বই খানির নাম রাখিতে হয়। বইয়ের ভিতরে অনেকে আবার স্বতন্ত্র ছোট গল্পের স্বতন্ত্র নাম না রাখিয়া এক দুই তিন প্রভৃতি নম্বর ব্যবহার করেন, যাহাতে ক্রেতা বই খুলিয়াও চাতুরি ধরিতে না পারে। কাজেই ছোট গল্পের লেখকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ছোট গল্পের প্রকাশক চোর এবং জুয়াচোর হইতে বাধ্য হয়।

*　　*　　*

আমাদের দেশে ছোট জিনিসকে কেহ বড় আদর করে না। হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে কোন লোককে আমার বলি ছোট লোক। সুতরাং গল্পের পাঠক ছোট গল্প দেখিলেই মনে করে ছোটলোকের মতই ইহা হেয়। একমাত্র মাসিকপত্রই ছোট গল্পের ছোটকে বড় করিয়া দিয়াছে। সুতরাং ছোট গল্পের লেখককে সে বড় করিয়াছে। আমাদের দেশে অনেকে এমন আছেন যাঁহারা বরঞ্চ বড় গল্প লিখিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু ছোট গল্পে তাঁহাদের সম্মান এখনও অটুট।

*　　*　　*

কিন্তু মাসিকপত্রের এই আভিজাত্য থাকা সত্ত্বেও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে মাসিক-পত্রও আমাদের দেশের আদর্শ পত্র নহে। আমাদের দেশের গতির সঙ্গে ইহার সঙ্গতি নাই, কারণ আমাদের দেশের কোন গতিরই তাল নাই। একমাত্র গানের গতিতে তাল আছে বটে কিন্তু সেখানে শুধু তালই আছে অন্য কিছু নাই। আর গানের যেটাকে তাল বলা হয় সেটা আসলে তিল। সুতরাং মাসিকপত্র হইতেও শ্রেষ্ঠ পত্র আমাদের দেশে আছে। সেই পত্র এক সংখ্যা বাহির হইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকে, ভবিষ্যতে কখনও পুনরায় বাহির হয়, কখনও বাহির হয় না। অর্থাৎ একবার দেখা দিয়াই ভূত হইয়া যায়।

* * *

কিন্তু ভূত যে বর্ত্তমান ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বৈজ্ঞানিকের মতে ভূত শুধু যে বর্ত্তমান তাই নয়, ভূত ভবিষ্যৎও বটে। বৈজ্ঞানিক বলেন তিনটি কালই ভূত। অর্থাৎ এই বিশ্বে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, নূতন করিয়া আর কিছুই হইবার নাই, আমরা শুধু তাহার সবখানি একসঙ্গে দেখিতে পাইতেছি না। তাহার যে অংশ আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া গেল সেই অংশকে আমরা ভূত বলি, যে অংশ ব্যক্ত তাহাকে বলি বর্ত্তমান, আর যে অংশ এখনও অব্যক্ত তাহাকে বলি ভবিষ্যৎ। সুতরাং যে ভূত লইয়া কারবার করে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিনটি কালই তাহার মুঠার মধ্যে। সুতরাং ভূত পত্রই যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ পত্র এবিষয়ে সন্দেহ নাই।



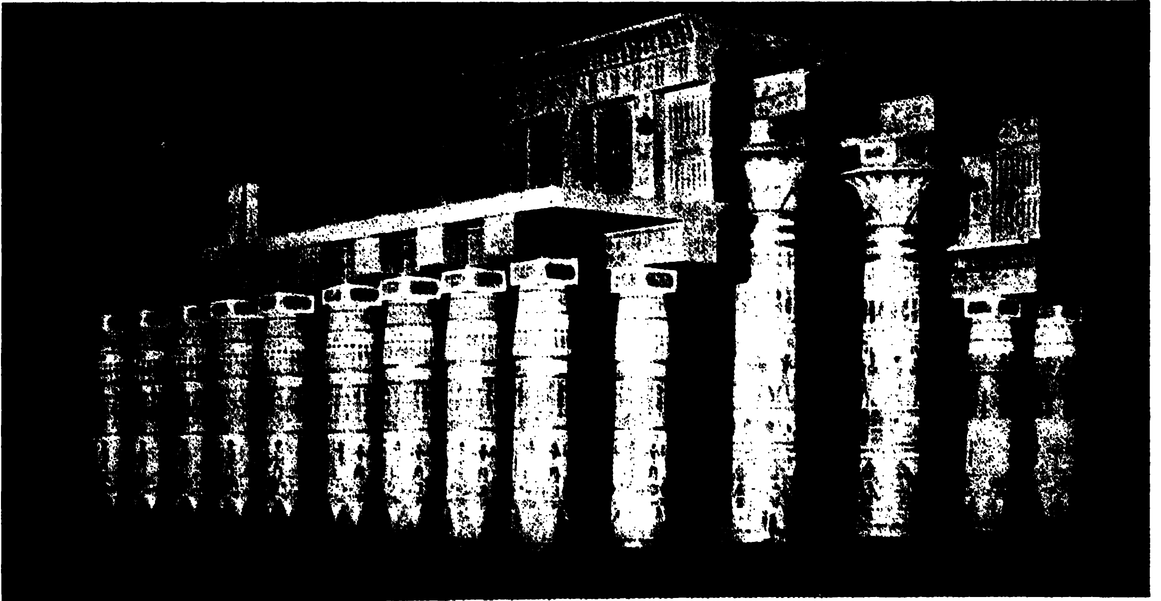
অতীতের ঈজিপ্ট

শ্রীচিত্রগুপ্ত

ঈজিপ্ট !······

সভ্যতা সুন্দরীর শিশুশয্যা নীলনদের উদার উন্মুক্ত ক্রোড়ভূমি ঈজিপ্ট—পিতা নীলনদের অজস্র স্নেহসুধারসে পরিপুষ্টদেহা—গরীয়সী !

এই খানে কালের নির্ম্মম হস্তকে হেলায় অগ্রাহ্য ক'রে আজও সগৌরবে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—মানুষের প্রাচীনতম স্থাপত্য-কীর্ত্তি অতুলনীয়



আমন দেবের মন্দির। পিরামিড বাদ দিলে ইহাই প্রাচীন ঈজিপ্টের সর্ব্ব বৃহৎ সৌধ।

পিরামিড্-শ্রেণী। বুকের মধ্যে তার সুরক্ষিত —অসংখ্য কীর্ত্তির অঙ্গে অঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত—সুদূর অতীতের প্রাচীনতম সভ্যতার ইতিবৃত্ত, বিংশ শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য্য-সম্ভার দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ !

বহু যুগের রহস্য-গুণ্ঠনে আবৃত স্ফিঙ্ক্স্-মূর্ত্তির গোপন হাসির রহস্য—ছ'হাজার বছরের নীরবতার দৃঢ়বদ্ধ সিংহ-দ্বারকে আজ উদ্ঘাটিত ক'রেছে সেই রহস্যলোকের চাবি —ঈজিপ্টোলজি

তার ফলে আজ আমরা জান্‌তে পারি যে দশ হাজার বছর আগেকার ঈজিপ্টের অধিবাসীদের অবস্থা ছিলো বর্ত্তমান মাওরী জাতির অনুরূপ। তারাও নৌকার ব্যবহার জান্‌তো, মাছ ধরতো, চিরুণী ব্যবহার করতো, আর অলঙ্করণ ও মণ্ডনশিল্পে মাওরীদের মতনই ছিলো তাদের দক্ষতা। মূর্ত্তিপূজাও তারা করতো।·····

ঈজিপ্টে এই ধরণের প্রথম সভ্যতা বর্ত্তমান ছিলো ন'হাজার বছর পর্য্যন্ত। তারপর সাত হাজার আটশো বছর আগে পর্য্যন্ত ছিলো ওখানকার দ্বিতীয় সভ্যতার যুগ। এখন এলো রূপার ব্যবহার। এ সময়ের সভ্যতার বর্ত্তমান উদাহরণ মালয় ষ্টেট্‌স্। ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার-লাভ করেছিলো। দুই পাশে শতাধিক দাঁড়ের সাহায্যে চালিত যাট ফুট দীর্ঘ জাহাজ এ সময়ে তারা ব্যবহার করতো। এই সব জাহাজে ক'রে জলপথে তারা স্মার্না, ক্রীট্, উত্তর সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-ব্যপদেশে গমনাগমন করতো। সে সময়ের কবর থেকে জানা



নিউবিয়ায় অবস্থিত একটি উৎকৃষ্ট মন্দির

এর ফলে প্রতি একশো কুড়ি বছরে তাদের পঞ্জিকা একমাস ক'রে পিছিয়ে পড়্‌তো।

যাই হোক্ ঈজিপ্টের প্রথম রাজবংশের প্রথম রাজা 'মেনা'র রাজত্বকাল থেকে (খৃঃ পূঃ ৪৩২৬-৪২৬৫) ত্রিংশ রাজবংশের শেষ রাজা নেখ্‌ট্‌-হর্‌-হেব্‌ এর সময় (খৃঃ পূঃ ৩৫৯-৩৪২) পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ চার হাজার বছরের (৩৯৮৪) ইতিহাস হ'চ্চে ঈজিপ্টের সভ্যতার ধারাবাহিক গৌরবময় ইতিহাস।

তারপর তিন শো বছর কাল গ্রীক আধিপত্যের তলায় চাপা প'ড়ে থেকে যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করার তিরিশ বছর আগে প্রাচীন ইজিপ্টের স্তিমিত গৌরবের নির্ব্বাণোন্মুখ শিখাটি একবারমাত্র রাণী ক্লিওপেট্রার সর্ব্বনাশা রূপের অত্যুগ্র প্রভায় শেষবারের মতন জ্বলে উঠেই আবার চিরদিনের মতন ছাই হ'য়ে গেছে। ক্লিওপেট্রার রূপের আলোক-প্রভার জন্যেই আমরা শেষবারের মতন দেখ্‌তে পাই হীনবীর্য্য ঈজিপ্টের অঙ্গে অঙ্গে তখনো কী ঐশ্বর্য্য ......কী আড়ম্বর!

তারপর এই দু'হাজার বছরের প্রথম সাড়ে ছ'শো বছর রোমক শাসনের অধীনে এবং তারপর আরব, মামেলুক ও তুর্কীদের হাতে থেকে অবশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর বর্ত্তমানের ব্রিটিশ আশ্রিত ঈজিপ্টের যে চেহারা আমরা দেখি এর সঙ্গে তার পূর্ব্বের সে চেহারার আর কোন মিল নেই।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ঈজিপ্ট স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষিত হয়েছে এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লীগ্ অব্ নেশনস্‌এ প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। বর্ত্তমানের ঈজিপ্ট একান্ত

যায় যে ধন আহরণ এবং দীর্ঘকালব্যাপী ধৈর্য্যসাপেক্ষ কাজের অভ্যাসও তাদের ছিলো। প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বেকার নৃপতিদের প্রস্তর মূর্ত্তিও ওখানে দেখতে পাওয়া যায়। আজও গ্রানাইট্, বাসাল্ট্, স্ফটিক প্রভৃতিতে তাদের হাতের তৈরী শিল্পকর্ম্ম তাদের নৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়।

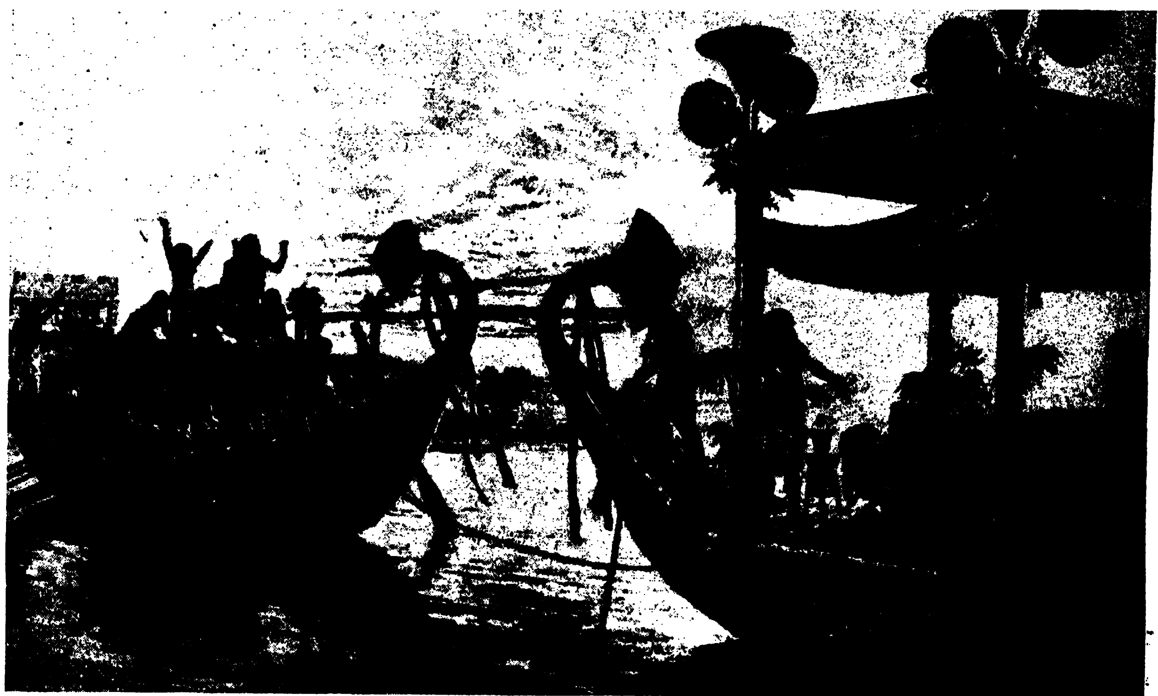
তারপর তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে ওখানে এলো গৌরবের যুগ। এখন থেকে ওখানে আরম্ভ হ'ল রাজ-বংশের যুগ। এরা নিয়ে এলো লিপিবিদ্যা, ইটের তৈরী বাড়ী, সূত্রধরের হাতের তৈরী দারু শিল্প আর উন্নতধরণের কলাজ্ঞান। এ সময় তারা বর্ষগণনা করতে জানতো। কিন্তু লীপ-ইয়ারের গণনা তারা তখন জান্‌তো না।

ভাবে আধুনিক। এখন তার সর্ব্বাঙ্গ জুড়ে তিন হাজার মাইল দীর্ঘ রেলপথ বিস্তৃত। একশো মাইল দীর্ঘ সুয়েজ খাল ১৪৭ ফুট উঁচু আর সওয়া মাইল লম্বা অ্যাসুয়াম ড্যাম্ প্রভৃতির অঙ্গ সজ্জায় ঈজিপ্ট সুন্দরী এখন দস্তুর মত আধুনিকা।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতার পালিশের জন্যে ঈজিপ্টের গৌরব নয়, তার গৌরব নিহিত আছে তার ঐতিহ্যের মধ্যে—যে ঐতিহ্য দীর্ঘকাল মূক পিরামিডগুলির নীচে পাথরের সমাধির তলায় আত্মগোপন ক'রে ছিল। মাত্র

কিন্তু সভ্যতার মধ্যাহ্নসূর্য্য যখন ঈজিপ্টের গাঢ় নীল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দীপ্তি পেতো তার তখনকার অবস্থা জানবার জন্যে ঐতিহাসিককে এত বেশী আয়াসও স্বীকার করতে হয়নি। আজ থেকে চারহাজার বছর আগেকার ঈজিপ্টের সুসভ্য অধিবাসীদের হাতে ছিল ১৪০০ বছরের ধারাবাহিক লিখিত ইতিহাস!

নিজেদের গরিষ্ঠতার সম্বন্ধে প্রাচীন ঈজিপ্টবাসীরা যথেষ্ট সচেতনও ছিল। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস যখন খৃঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে ঈজিপ্টের এক



নৌকায় শবাধার বহন করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইতেছে। বহনকারীরা আনন্দ উৎসব করিতেছে। ঈজিপ্টবাসীদের বিশ্বাস ছিল আত্মা অমর তাই তাহারা মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিত না।

একপুরুষ আগেও যার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতুম না। অথচ বর্ত্তমানে ঈজিপ্টোলজি নামে একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান যার সূত্রসন্ধানে একান্ত ভাবে ব্যাপৃত।

ঈজিপ্টের বৃষ্টিহীন মরুময় প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ফলে ওখানকার সভ্যতার অরুণোদয়ের সময়কার বহু প্রামাণিক জ্ঞাতব্য তথ্য ওখানকার বহু প্রাচীনকালের কবরগুলির মধ্যে থেকে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। তা' থেকে আহৃত দশহাজার বছর আগেকার ঈজিপ্টের কাহিনী প্রথমেই বলা হয়েছে।

পুরোহিতের কাছে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে গেছলেন তখন পুরোহিত তাঁকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তোমরা—গ্রীক্‌রা তো সবেমাত্র শিশু!"

যাইহোক, ঈজিপ্টের পরবর্ত্তী যুগের কবরগুলি থেকে জানা যায়, কেমন ক'রে ঈজিপ্টের প্রাচীন অধিবাসীরা প্যাপিরাস্ গাছ থেকে কাগজ তৈরী ক'রতে শিখেছিলো, চিত্রের সাহায্যে লিখন পদ্ধতিকে পরিবর্ত্তিত ক'রে অক্ষরের সাহায্যে লেখ্‌বার প্রণালী আবিষ্কার ক'রেছিলো, ইট্ তৈরী ক'রে তা' দিয়ে ইমারত তৈরী এবং পাথর

কেটে মূর্ত্তি তৈরী করতে পারতো। এই সব কবর থেকে শুধু যে তাদের চিত্রকর্ম্ম, মৃৎশিল্প, কাঠের চেয়ার প্রভৃতি আসবাব পত্র, প্যাপিরাসে লেখা বই প্রভৃতিই পাওয়া গেছে তা নয়, তাদের প্রাণহীন দেহগুলিও অদ্যাবধি আমরা দেখতে পাই!



করণাকের একটি মন্দিরের পথে প্রপিলন তা তোরণ।

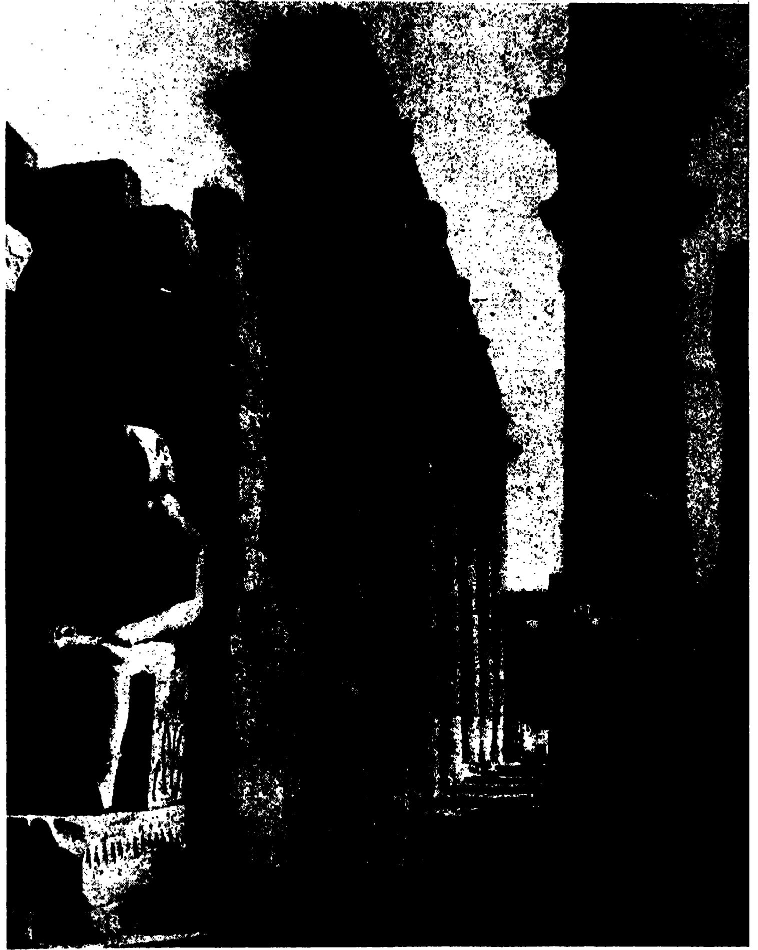
বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নরদেহের ম্যমী প্রস্তুত ক'রে এমন সুন্দর ভাবে সেগুলিকে তারা রক্ষা ক'রে গেছে যে আজও আমরা সমাধি থেকে প্রাপ্ত বহু সহস্র বছরের প্রাচীন রাজাদের অবয়বের সঙ্গে প্রস্তরে খোদিত তাদের তখনকার প্রতিমূর্ত্তি গুলি মিলিয়ে দেখবার সুযোগ পাই এবং দেখে বিস্মিত হই, যে কী আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রেখে সেই প্রাচীনকালের ভাস্কররা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতে পারতো।

ঈজিপ্ট সম্বন্ধে বহু তথ্য আজো আমাদের অজ্ঞাত থেকে যেতো যদি তখনকার ঈজিপ্টবাসীদের হাতে খোদিত বিখ্যাত রসেটা স্টোন্ নামক প্রস্তরখণ্ডটি না পাওয়া যেতো। হাইরোগ্লিফিক্স নামক বহুকাল বিস্মৃত যে ভাষায় প্রাচীন ঈজিপ্টের প্রস্তরে খোদিত লিপিগুলি এবং প্যাপিরাস্ গ্রন্থগুলি লিখিত সেই বিস্মৃত ভাষার সূত্র-সন্ধান পাওয়া গেছে এই 'রসেটা স্টোন্' নামক প্রস্তরখণ্ডটি থেকে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়নের সৈন্যরা নীলনদের রসেটা নামক মোহানার কাছে ট্রেঞ্চ খনন করছিলো সেই সময় তিন ফুট ন ইঞ্চি লম্বা আর দু' ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি চওড়া এই বাসাল্ট পাথরের মোটা টুক্‌রোটা পাওয়া যায়। এই পাথরে খৃঃ পূঃ ১৯৫ অব্দের এক ঈজিপ্ট-নৃপতির গৌরব-কাহিনী তখনকার ওখানের রাজভাষা গ্রীক্, সাধারণ ঈজিপ্সিয়ান্, ও প্রাচীন পবিত্র হাইরোগ্লিফিক্স ভাষায় খোদিত আছে। চ্যাম্পোলিয়ন্ নামে এক ফরাসী পণ্ডিত অনুবাদের সঙ্গে মূলের তুলনা ক'রে ক'রে বহু পরিশ্রমে প্রাচীন কালের এই বিস্মৃত ভাষাটির সূত্রসন্ধান করেন। এবং তার পরবর্ত্তী বহু পণ্ডিতে মিলে অবশেষে ভাষাটির সম্যক উদ্ধার-সাধন ক'রে আমাদের কাছে প্রাচীন ঈজিপ্টের রক্ষিত লিপির মধ্যে থেকে বহু অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন।

এইখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগতে পারে যে প্রাচীন ঈজিপ্টের অধিবাসীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বহুবিধ বস্তুসম্ভার, তাদের মৃতদেহগুলি এবং তৎসম্বন্ধীয় বহুবিধ লিখিত বিবরণ অত কষ্ট এবং এত যত্ন ক'রে রক্ষা করতো কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে তাদের ধর্ম্মবিশ্বাসই এর কারণ। হেরোডোটাস্ লিখে গেছেন, যে, ঈজিপ্শিয়ান্‌রা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি।

প্রাচীন ঈজিপ্টের লোকদের বিশ্বাস ছিলো যে মৃত্যুর পরেও আত্মা বর্ত্তমান থাকে এবং পরম দেবতা 'ওসিরিস্' পৃথিবীতে কৃত পাপ ও পুণ্যকর্ম্মের হিসাব অনুসারে সেই আত্মার বিচার করেন। তাছাড়া তাদের এ বিশ্বাসও ছিলো যে আত্মা আবার পরিত্যক্ত দেহের মধ্যে ফিরে এসে কবরের মধ্যে রক্ষিত আহার্য্য পানীয় প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু উপভোগ করতে এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করতে পারে। সেই জন্যে প্রাচীন কালের 'ফেরো' বা ঈজিপ্টের নৃপতিরা মৃত্যুর পরে থাক্‌বার জন্যে মাটির নীচে ইটের তৈরী সমাধিমন্দির প্রস্তুত করাতেন এবং খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ থেকে তাঁরা দীর্ঘকাল তাঁদের দেহকে সুরক্ষিত রাখবার জন্যে বিরাট বিরাট পাথরের পিরামিড তৈরী করাতে আরম্ভ করেন।

ঈজিপ্টের ইতিহাসের প্রথম তারিখ দেওয়া বিবরণ আমরা পাই সমগ্র ঈজিপ্টের প্রথম একচ্ছত্র সম্রাট মীনিসের সমাধিস্থল থেকে। এই সমাধিস্থলটি কাইরো থেকে ৩৫০ মাইল দক্ষিণে থিনিস্ নামক স্থানে অবস্থিত। এই সমাধিস্থলটি মাটির নীচে ইটে গাথা কতকগুলি সমাধির সমষ্টি। এর মধ্যে একটিতে সম্রাট মীনিস্ স্বয়ং আজও শায়িত। সম্রাট মীনিসের ব্যবহৃত স্বর্ণময় রাজদণ্ড হাতীর দাঁত, আবলুস্ কাঠ আর রত্নময় ফলকে আছে প্রাচীনতম নৃপতিদের কাহিনী। তাঁদের সুশৃঙ্খল রাজনীতি তাঁদের গৌরবময় যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বহু কাহিনী এই সমাধিস্থল থেকে আহৃত হ'য়েচে।



ঈজিপ্টের সুদৃশ্যতম স্তম্ভমালা।

ঈজিপ্টের ইতিহাসের পরবর্ত্তী কাহিনী জান্‌তে পারা যায় সম্রাট মীনিসের প্রাচীন রাজধানী বর্ত্তমান কাইরো থেকে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী মেম্‌ফিস্ শহর হ'তে। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে আরববা এই সহরটিকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছিলো। বর্ত্তমানে এখানে কতকগুলো গ্রানাইট পাথরের টুক্‌রো, কতকগুলো প্রস্তর মূর্ত্তি এবং রাবিশের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রাচীন মেম্‌ফিস্‌এর অধিবাসীদের তৈরী তাদের রাজাদের সমাধি মন্দির বিরাটকায় পিরামিডগুলি এখনো সেখানে অটল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নীলনদের তীরে তীরে ৬০ মাইল স্থান ব্যাপী প্রসারিত এই পিরামিড শ্রেণী। পিরামিডের যুগে (খৃঃ পূঃ ৩০০০ ২৫০০ অব্দ) ৫০০ বছর ধরে যে সব রাজা ওখানে রাজত্ব করেছিলেন একদিন তাঁদেরই বিশ্রামস্থল ছিল—এই সমাধি মন্দিরগুলি। এগুলির প্রত্যেকটির তলায় গোপন গৃহে অপরিমিত ধনরত্নে পরিবৃত ম্যমীরূপে রক্ষিত ছিল এক একটি রাজদেহ। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের দস্যুদের নিষ্ঠুর হস্তের অত্যাচারে তার অধিকাংশই হ'য়েচে অপহৃত।

মেম্‌ফিসের কাছাকাছি অবস্থিত প্রাচীনতম প্রস্তর স্থাপত্যের নিদর্শন রাজা জোসরের পিরামিড্। এর একশো বছর পরে কাইরোর বিপরীত দিকে গিজে নামক স্থানে অবস্থিত বিরাট পিরামিড্‌টি প্রস্তুত করিয়েছিলেন রাজা 'খুফু' (বা চিওপস্)। তেরো একর জমির ওপর এটি নির্ম্মিত। প্রতি দিকে ৭৫৫ ফুট্ ক'রে দীর্ঘ এই পিরামিড্‌টির উচ্চতা ৫০৫ ফুট্। তেইশ লক্ষ বিরাট প্রস্তরখণ্ডে এটি প্রস্তুত। হেরোডোটাস্ বলেন একলক্ষ লোক ২০ বৎসরের পরিশ্রমে এটী তৈরী ক'রেছিলো। আধুনিক প্রত্ন

তাত্ত্বিকদের মতে এটী তৈরী করতে এর চেয়েও বেশী সময় লেগেছিলো।

এর পাশেই অবস্থিত রাজা খাফ্‌রার (Chephren) পিরামিড্‌টিও আয়তনে এরই সমতুল্য। এরই সম্মুখে মানুষের বহু যুগের জিজ্ঞাসারূপী সুচির-রহস্যে আবৃত বিরাটকায় স্ফিঙ্ক্‌স্‌ মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তির অর্থ অধুনা নির্ণীত হ'য়েচে।

পিরামিড্‌গুলির চতুর্দ্দিকে রাজবংশের অপরাপর ব্যক্তিদের এক রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদের অপরাপর ব্যক্তিদের সমাধিগুলি অবস্থিত। প্রত্যেকটি সমাধিরই রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পৃথক আয়ের ব্যবস্থা থাক্‌তো যা থেকে সমাধিস্থলে পুরোহিতরা মৃতের আত্মার উদ্দেশে নানাবিধ ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। মৃত্যুর পর আত্মাকে তার দীর্ঘ পথে সাহায্য করবার উপযুক্ত মন্ত্রাদি লিখিত ঠিকুজীর মত জড়ানো সুদীর্ঘ প্যাপিরাস্‌ পুঁথি প্রত্যেক সমাধির মধ্যেই রক্ষিত হোত। এই জড়ানো পুঁথিগুলির কোন কোনটির দৈর্ঘ্য ৯০ ফুট পর্য্যন্ত হোত। এই রকমের অসংখ্য পুঁথি সংগৃহীত হ'য়েচে।

ঐ সব সমাধি মন্দিরের ভিতর দিকের দেওয়ালে মৃতের রাজ্যের বহুবিধ বিবরণ চিত্রিত করা হোতো। এই সব চিত্রে তাঁদের পশু ও কৃষি সমৃদ্ধিরও নমুনা দেওয়া হোতো। চিত্রের মধ্যেই নানাবিধ শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত বিভিন্ন শিল্পীর চিত্রও আঁকা হোতো। এই সব ছবি থেকে সেই সব সময়কার বহু ইতিহাস জানবার সুবিধা হয়। এই সব ছবি থেকে তখনকার কর্ম্মরত কুম্ভকার ভাস্কর, স্বর্ণকার প্রভৃতির কর্ম্মপদ্ধতির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। জানা যায় শিল্পী কাঁচের পাত্রাদি এবং টালী প্রভৃতি তৈরী করতো, এবং মেয়েরা বয়নশিল্পে কি রকম পারদর্শী ছিলো। এর মধ্যে, জাহাজ, কাগজ প্রভৃতি, সাধারণ কাঠের এবং আবলুস্‌ কাঠের, হাতীর দাঁতের, নানাবিধ ধাতু, চামড়া প্রভৃতি দিয়ে মোড়া আসবাব পত্র ইত্যাদি প্রস্তুত রত শিল্পীদেরও দেখানো হোতো। তা' ছাড়া তখকার ঈজিপ্টের সামাজিক জীবনের নানাদিকও এই সব দেওয়ালে চিত্রিত হোতো।



একটি শবাধার চিত্র। গৃহপালিত পশু ও পশুপালক।

তা' ছাড়া বড় বড় জারের মধ্যে তারা প্যাপিরাসে লিখিত অগণিত পুঁথি রেখে গেছে তা' থেকেও তাদের সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য সংগৃহীত হ'য়েচে। এই সব গ্রন্থে তাদের দুঃসাহসিক অভিযান প্রভৃতির কাহিনী, নানাবিধ গল্প, কবিতা, যাদুবিদ্যা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

খৃঃ, পূঃ ষোড়শ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আবার ঈজিপ্টের সভ্যতা উৎকর্ষের চরমে উঠেছিলো। ওখানকার এই সময়কার সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায় থীবস্‌ এর সমতল ক্ষেত্রে। এই সময় ঈজিপ্টের রাজ্য এশিয়ার মেসোপটেমিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। থীবস্‌ এর কার্ণাক (Karnak) নামক স্থানে প্রাচীন ফেরোদের নির্ম্মিত অসংখ্য মন্দির শ্রেণী আজিও বিদ্যমান। বৃহদাকার থামওয়ালা বৃহত্তম দালানটি আজও এখানে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে সেকালের স্থাপত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এর অনতি

দূরে স্থিত আশি নব্বুই ফুট উচ্চ এক একটি অখণ্ড প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি দেখ্‌লে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। বোঝা যায় না যে এত ভারী পাথর তারা কোথা থেকে কেমন করে এখানে এনেছিলো!

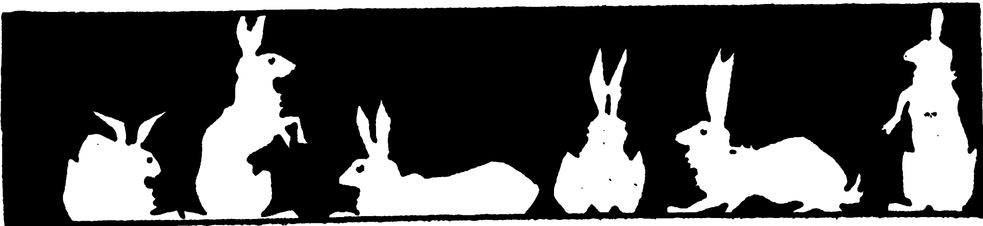
ঈজিপ্টের ইতিহাসের অন্যতম চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার সাধিত হ'য়েচে সম্প্রতি—১৯২২-২৪ খৃষ্টাব্দে—লর্ড কার্ণারভন্ ও হাওয়ার্ড্ কার্টারের হাতে। আট বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁরা খৃঃ পূঃ ১৩৫০ অব্দের ঈজিপ্‌শিয়ান্ ফেরো তুতান্ খামেনের কবর আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ইতিপূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বহুবিধ অমূল্য নিদর্শন এই আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েচে। কারণ যারা ইতি পূর্ব্বে ঈজিপ্টের অন্যান্য সমাধি-স্থলগুলি লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল বর্ত্তমান সমাধি স্থলটি তাদের হাতে ইতিপূর্ব্বে লাঞ্ছিত হ'তে পায়নি।

তুতান খামেনের কবর থেকে যে সমস্ত ঐতিহাসিক সম্পদ পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ছিলো স্বর্ণ, হস্তীদন্ত এবং রঙীন কাঁচের কারুকার্য্য শোভিত চারখানি রথ; কয়েকখানি বড় বড় স্বর্ণ খচিত কৌচ, খাট, চেয়ার টুল; রৌপ্য, স্বর্ণ ও রত্ন খচিত একখানি সিংহাসন, সুচিত্রিত, গজদন্ত ও আব্‌লুশ্ খচিত কতকগুলি বাক্সের মধ্যে মূল্যবান্ পরিধেয় সুরক্ষিত আহার্য্য সামগ্রী এবং অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্যাদি পূর্ণ কতকগুলি বাক্স; এবং ভিতরের একটি কথা থেকে স্বর্ণ ও রত্নাদি খচিত মনোরম চন্দ্রতাপ তলে রক্ষিত অপরূপ কারুকার্য্য মণ্ডিত কফিনে ম্যমীরূপে রক্ষিত স্বয়ং সম্রাটের দেহ! এর পূর্ব্বে ১৯০৫ খৃঃ অব্দেও ঈজিপ্টের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায় অবশ্য আবিষ্কৃত হয়েছিলো রাণী হাট্ শেপসুটের সমাধির অবিষ্কারে। তাঁর জীবিত কালের তারিখ ছিলো খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁর সমাধি থেকে আহৃত বস্তু এবং কাহিনীও কম বিস্ময়কর নয়।

ঈজিপ্টের ইতিহাসের শেষ গৌরব ছিলেন সম্রাট্ দ্বিতীয় রামেসিস্। ঈজিপ্টের ইতিহাসের জ্ঞান না নিয়ে যদি কেউ আজও নীলনদের বুকের ওপর দিয়ে জল-যাত্রা করে তা হ'লে সে দুপাশে যে সমস্ত নিদর্শন দেখ্‌তে পাবে তা' দেখে সহজেই তার মনে হবে যে দ্বিতীয় রামেসিস্ই বুঝি ঈজিপ্টের একমাত্র ফেরো ছিলেন। বস্তুতঃ মিশরীয় নৃপতিবৃন্দের মধ্যে স্থাপত্য কীর্ত্তি বিষয়ে উৎসাহ ছিলো তাঁরই সমধিক।

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন প্রাচীন ঈজিপ্টের গৌরব গেল স্তিমিত হয়ে এবং তারপর ধীরে ধীরে কেমন ক'রে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার সমাধি ঘট্‌লো তার আভাস দিয়েই বর্ত্তমান নিবন্ধের সূচনা করা হ'য়েচে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে প্রাচীন ঈজিপ্টের ইতিহাস বা তার ঐতিহাসিক সম্পদ পরম্পরার পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়—অতীতের গর্ভে সমাহিত পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার বিস্ময়কর রূপটির প্রতি পাঠকের মনে কথঞ্চিৎ কৌতূহল জাগ্রত হলেই এই নিবন্ধের অবতারণাটি সার্থকতা লাভ করবে।



সরগুযশ্‌ত্‌-ই-উযীর-ই-খান-ই-লঙ্ক্‌রান

(লঙ্কুরান শহরের খানের উযীরের কীর্ত্তি)

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল

২য় অঙ্ক

(শু'লহ্‌খানমের ঘরে ঘটনা হচ্চে)

তয়মুর আকা—(নিসাখানমের সামনে দাঁড়িয়ে)—বল, তারপর দেখব কি করা যায়। উযীর কি খেয়াল করেছেন? আমি কি মরে গিয়েছি যে তিনি তোমাকে অন্যের হাতে দিয়ে দেবেন? খানের সঙ্গে তার আত্মীয়তার ইচ্ছা কি?

নিসাখানম—আপনি কি তার মতলব জানেন না? তাঁর ইচ্ছা হলো শক্তি, ইজ্জত ও সম্মান।

তয়মুর—খান, সম্মান ও ইজ্জতের যা' তাকে দিয়েছেন, তাতে কি তার যথেষ্ট হয় নি?

নিসা—আরও বাড়িয়ে নিতে চান—তাঁর যে এতেও বিশ্বাস নেই। তিনি চান যাতে সম্মান, শক্তি ও ইজ্জতের কারণ দৃঢ় হয়।

তয়মুর—আশ্চর্য্যরকমের আহম্মক! মনে হয় খান যে বিশাল কাজের ভার তাকে দিয়েছেন, তা' তিনি নিজের চোখে দেখ্‌ছেন না। তাঁর এসব বিষয় অন্ততঃ একবার খেয়াল করা উচিত। তুমি যদি কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আমার বিষয়ে এখন পর্য্যন্তও জানিয়ে না থাক, তা হলে আমিই জানাব—তবেই তাঁর বদখেয়াল হতে ফিরে আসবেন, আর তা না হলে তাঁর ভাল হবে না।

নিসা—বন্ধু, প্রিয়তম, এমন খেয়াল ছাড়ুন। কারণ এ বিষয়ে উযীরকে কখনই যে বলা যেতে পারে না। বিশেষকরে এ জন্তে যে তিনি অনেকদিন আগে বলেছিলেন—'সবসময়ই খান কোন রকমে তয়মুর আকাকে মারবার চেষ্টায় আছেন; এবং আমিও খবর নিয়েছি যে তিনি অনেক সময়ই এ বিষয়ে উযীরের সঙ্গে পরামর্শ করেন। যদি উযীর আমাদের ভালবাসার কিছু বুঝতে পারেন, তা' হলে তাঁর স্বার্থের জন্য তখনই খানকে খবর দেবেন যে আপনি তাঁর নামজাদের (বাগদত্তার) প্রতি চোখ ফেলেছেন। বিশেষ করে উযীরও যে আপনার প্রতি বিরক্ত।

তয়মুর—আমার বাবার রাজ্য দখল করেও তাঁর আশা মেটেনি! আবার আমাকে মারবার চেষ্টা। বড় অবিবেচনার কাজ করছেন!

নিসা—নিশ্চয়ই, তিনি কিন্তু আপনাকে তাঁর কার্য্যসিদ্ধির বাধা বলে মনে করেন। তিনি ভাবেন, কোন্ সময় আপনি আপনার বাবার রাজ্য দাবী করে বস্‌বেন। লোকমুখে শুনেছি তিনি অন্য উপায় নেই বলে কেবল আপনার প্রশংসা করে থাকেন। সুযোগ পেলে একদিনের জন্য জীবিত থাকতে দেবেন না।

তয়মুর—খানদের মত আমাকে আর বধ করতে হবে না! শহরবাসী অনেকেই এবং উচ্চপদস্থদের সকলেরই বাবার গুণের কথা জানা আছে এবং আমার প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে। আমি ত আর মুরগী নই যে আমার মাংস খাওয়া হবে। আচ্ছা, তুমিই বলো, উযীরের আমি কি করেছি, যে তিনি আমার উপর অন্যায় করছেন?

নিসা—আপনি যে আগের উযীরের ছেলে মির্জ্জা সলীমকে ডেকে এনে মুন্সী করে দিয়েছেন। উযীর এখন ভাবেন, যদি ক্ষমতা আপনার হাতে আসে, তা' হলে নিশ্চয়ই মির্জ্জা সলীম তার বাপের পদ দখল করে বসবে। এখন তাঁর খেয়াল হলো এই যে খানকে বলে তাকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করা।

তয়মুর—তাঁর কথায় এ সম্ভব হবে না যে আমার

মির্জাকে বিতাড়িত করে দেন। বাবার নিমক কি তাঁকে এমনই অন্ধ করেছে যে আমার দাবীর প্রতি তিনি এমন করেই বদখেয়াল করে নিয়েছেন! খুদাকে ধন্যবাদ, তাঁর উদ্দেশ্য তাঁকে স্পষ্ট করে বলে, আমার মতলবটাও জানাব। কিন্তু তুমিই সত্যি করে বলো দেখি, উযীর কি আমার ইচ্ছা এখনও বুঝতে পারে নি? শু'লহ্‌খানম কোথায়? তাঁকে আমার কিছু বলবার ছিল।

নিসা—তিনি মার ঘরে আছেন।

তয়মূর—তাঁকে এখানে ডেকে আনা যায় না কি?

নিসা—মা ঘরে নাই। চলুন, আমরা উভয়েই সেখানে যাই।

তয়মুর—বেশ, চল যাই।

(তা'রা যাওয়ার পর)

যীবাখানম (ঘুরে ঢুকে)—আরে বদমাগী, তুই এতদূর অগ্রসর হয়েছিস যে, আমার দাসীকে বকিস। আমার সঙ্গে পাল্লা দিবি! উযীর তোকে একেবারে পাগলা কুত্তার মত লেলিয়ে দিয়েছে! (তিনি চেয়ে দেখলেন সে ঘরে কেউ নেই—এদিক ওদিক তাকিয়ে) এ বদমাগী দেখ্‌ছি আবার কোথায় গেলো! উযীরের ঘর নষ্ট হউক—কারণ ওর জন্যই ত আমাকে এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছে। (তিনি বে'র হতে যাবেন এমন সময় একটী বেটাছেলের আউয়াজ পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন)—হায়, হায়, অজানা মানুষের শব্দ আসছে! হায়, হায়, এখন যে ঘরে ঢুকতে চায়! কি করি? বাইরেও ত যাওয়া যাবে না! আমি কি আপদের মধ্যে পড়লাম! (এদিক ওদিক তাকিয়ে একটী পর্দ্দার পেছনে নিজেকে লুকালেন—শু'লহ্‌খানম ও তয়মূরআকা ঘরে ঢুক্‌লেন)

তয়মূর—শীগগিরই ত আপনার মা স্নানের ঘর হতে ফিরবেন—তার ঘরে আলাপ করা যেতে পারে না—এ যায়গা উপযুক্ত হলো না। আমার যে অনেক কথা ছিল। উযীরও এখানে আসতে পারেন হয়ত?

শু'লহ্‌—আপনি নিশ্চিন্ত হউন। উযীর আজ এখানে আসতে পারেন না।

তয়মূর—পারেন না কেন?

শু'লহ্‌—আজ যীবাখানমের ঘরে যাবার দিন। তার কথা কাটাকাটী ও চেঁচামেচির ভয়ে, তিনি কখনও এখানে আস্‌তে সাহস পান না।

তয়মূর—এ ঠিক কথা। কিন্তু এ কথার ভরসায়ই ত আর নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তারপর সতর্কতাকে কোন সময় দূরে রাখা উচিত নয়। হতে পারে যে তিনি বেপরোয়া হয়ে ঘরে এসে ঢুকতে পারেন।

শু'লহ্‌—নিশ্চিন্ত হউন। নিসাখানমকে ফটকে বসতে বলে দিয়েছি। যদি উযীর এসে হাজির হন, তা' হলে আমাদের খবর দেবে। ভয় হচ্চে নাকি?

তয়মূর—আমি কি জন্য ভয় করব? কাকে ভয় করব? কাকেও ভয় পাব, এমন মানুষ আমি নই। নানা কারণেই আমি চাই না যে তিনি এখানে আমাকে দেখতে পান, তা'হলে তিনি গিয়ে খানকে খবর দেবেন। আমার যা' সঙ্কল্প রয়েছে, তা' আগে পূরণ করে নি।

শু'লহ্‌—তা ঠিক, কিন্তু উযীর হয়ত এসব ভাবেন নি, আর যদি তিনি বলেন, তা' হলে তখন শত্রুতার ছড়াছড়ি হবে যে। (lit গাধা আন ও শত্রুতা বোঝাই কর)

(এমন সময় কোঠায় মাথা বাড়িয়ে নিসাখানম বললে, 'হায় আমান, উযীর আসছেন যে।')

শু'লহ্‌—(চিন্তিত হয়ে, দম না ফেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে)—হায় আমান, উযীর যে সোজা আমাদের ঘরে চলে আসছেন। তৈমূর আকা, আপনার কোথাও যাবারও যে উপায় নেই, আবার থাকবারও যে যায়গা নেই।)

তয়মূর—তা হলে কর্ত্তব্য কি? কি করা যায়? কিন্তু সম্ভবতঃ আমার এখানে অবস্থানের কথা কেউ তাঁকে বলে দিয়েছে, এই খঞ্জর দিয়ে তার পেটকে কুকুরের খাবার করে ছাড়ব। (তাঁর খঞ্জরটী বের করলেন)

শু'লহ—আরে মিঞা, এখন কথা বলবার সময় নেই। আসুন, এই পরদার পিছনে যান। দেখ্‌ব কোন উপায়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় কি না। (ইতস্ততঃ করে পর্দ্দার পেছনে গেলেন)

উযীর—(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে এসে ঢুকে) শু'লহ্‌খানম, কি হচ্ছে? ভাল আছ তো?

শুলহ্‌—আল্লাহুআকবর, আপনার দৌলতে আমি যে সব সময়ই বেশ সুখে আছি। আপনার খবর কি? এ তো খুব আশ্চর্য্যের কথা আপনি যে আজ অনুগ্রহ করে এখানে এসে পড়েছেন? এ কি আপনি খোঁড়াচ্ছেন যে? আপনার চোখে মুখে এমন ভাব যে, খুদা মঙ্গল করুন।

উযীর—আঃখ, আজ এক অঘটন ঘটে গেল। এ আর বলো না। এ কখনো আমি ভাবি নি। এজন্য কুকুরের মত আমি লজ্জিত। আক্কা 'মস'উদ, যা তো আমার জন্য এক কফি পাকিয়ে নিয়ে আয়। (খাজহ্‌ মস'উদ মাথা নোয়ায়ে প্রস্থান করল)

শু'লহ্‌—অনুগ্রহ করে বলুন, কি আপনার অঘটন ঘটেছে? আচ্ছা, না হয় এখন থাক। হয়ত বলতে অনেক সময় নেবে, তা হলে এ আপনার কষ্টের কারণ হবে।

উযীর—বেশী লম্বা নয়, কথাটা এই—আজ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি একসঙ্গে খানের নিকট বসেছিলাম—তয়মুর আক্কার জোর সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছিল। সববাই বলছিলেন, তয়মুর আক্কার সঙ্গে লস্করানের কেউই শক্তিতে পেরে উঠবে না। খানও এ স্বীকার করে নিচ্ছিলেন। আমি এ অস্বীকার করে বললাম, তয়মুর আক্কার জোরই নেই। রোযার মাসের ঈদের দিন যদিও তিনি কয়েকজনকে কুস্তীতে মাটিতে ফেলেছিলেন, কিন্তু তারা ছিল একেবারে ছেলে মানুষ'। তৈমুর আক্কাও তখন সেখানে ছিলেন। খান আমার কথায় কবুল না করে বললেন, 'আপনার কথার কি প্রমাণ আছে? আমি জবাব দিলাম 'আমার এ সাজে না, না হলে এই পঞ্চাশ বৎসরের সময়ও তয়মুর আক্কার সঙ্গে কুস্তী লেগে তাঁকে মাটিতে ফেলতে পারতাম, তা আপনারা দেখ্‌তেন'। খান এ সব বেশ পছন্দ করতেন তাই তিনি আদেশ করলেন ও আমাকে বাধ্য হয়ে কুস্তীতে নাম্‌তে হলো। অন্য উপায় না দেখে কুস্তীতে নাম্‌লাম। উভয়েই উভয়ের হাত ধরলাম। নিজের মর্য্যাদা আমাকে শক্তিমান করে দিল, মুহূর্ত্ত না যেতেই তাঁর লেংটী বেশ কষে ধরলাম, এরপর আর আমি জানি না কেমন করে যে তাঁকে মাটিতে ফেল্‌লাম। বেচারা বেহুস হয়ে প্রাণহীন মূর্ত্তির মত মাটিতে পড়ে রইল। এরূপ অবস্থায় আধঘণ্টা খানেক থাকার পর তার পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পেল। চোট লেগে আমার কোমরের একটা হাড় মচ্‌কে গিয়েছে ও তাতে বিষম ব্যথা করছে এজন্য আমি ঠিকমত হাঁটতে পারছি না।

শু'লহ্‌—(হেসে) আপনি এ কি করলেন? যদি ও মাটীতে পড়ে মরে যেতো, তা হলে তার মার জীবন যে অন্ধকারময় হয়ে যেতো।

উযীর—তা সত্যি, তা হ'লে আমারও যে বিশেষ লজ্জা পেতে হতো। কিন্তু তাতে কি লাভ? এরূপই যে ঘটে গেলো।

শু'লহ—বেশ, তা হলে বেচারা ওখানে পড়ে রয়েছে, আর আপনি এলেন এখানে আপনার প্রশংসা জানাতে?

উযীর—তা নয়, চাকররা তাঁকে তাঁর মার নিকট নিয়ে গিয়েছে। (এ কথাগুলো শুনে তয়মুর না হেসে থাকতে পারলেন না। খিল খিল করে হেসে উঠলেন উযীর অগ্রসর হয়ে পর্দ্দা তুলে তার পেছনে জীবাখানম ও তয়মুর আক্কাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন শু'লহখানম ও বীযাখানমকে দেখে আশ্চর্য্য হলেন)।

উযীর—সুব্‌হান আল্লা, এ আবার কেমন? তয়মুরের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে আক্কা, আপনি এখানে কি করছেন? (তয়মুর মাথা হেট করে রইলেন) তারপর বলুন শুনি, আপনি কোথায়? আর এ কোথায়? এখানে কি করচেন? কি দরকার ছিল? (তৈমুর আক্কা কোন উত্তর না দিয়ে পর্দ্দার পিছন হতে বের হয়ে মাথা নুয়ে বাইরে চলে যেতে চাইলেন উযীর তার হাত ধরে—) যে পর্য্যন্ত না আপনি বলবেন কি জন্য এখানে এসেছিলেন, আপনাকে যেতে দেব না। বলুন।

তয়মুর—(ঝাঁকানি দিয়ে) আমাকে ছাড়ুন।

উযীর—(শক্ত করে ধরে)—অসম্ভব, জবাব না দেওয়া পর্য্যন্ত ছাড়া যেতে পারে না।

(তয়মুর আক্কা দুঃখিত হয়ে, এক হাতে উযীরের কাঁধে চাপ দিয়ে ও অন্য হাতে পায়ের ডিম ধরে তাকে আগ্‌লিয়ে একটা বোচকার মত করে ঘরের মধ্যে ফেলে তাড়াতাড়ি করে এক লাফে ঘর হতে বের হয়ে গেলেন)

উযীর—(মুহূর্ত্ত মধ্যেই পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পেয়ে যীবাখান

মের দিকে মুখ ফিরিয়ে) আরে বদ এ আবার কি আপদ আমার মাথায় এনে ফেললি ?

যীবা—এ কি আমি আনলাম ? আমার কি দায় পড়েছে ? বেচারা, তুমি এর কি করে খবর রাখবে ?

উযীর—(রেগে) চুপ কর, বদমাগী, বেশী কথা বলিস না। তোকে আবার চিন্‌লাম। এসব দুষ্টামি তোরই। ইনসা' আল্লা, তোকে ভাল করেই দেখব ?

যীবা—বেচারা, তুমিই বল, কি জন্য আমার সাজা দেবে ? ধর্ম্মের খিলাফ করেছি ? কারো সঙ্গে প্রেম করেছি ? কারো ঘরে গিয়েছি ? চুরি করেছি, না অন্য কিছু অন্যায় করেছি ? আমি কি করেছি ?

উযীর—দুষ্টা, আর কি করতে চাস্‌ ? পর্দ্দার পেছনে ওই বলিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে দেখলাম এর চেয়ে আর কি ?

যীবা—আরে বেচারা, তোমার বউ শু'লহ্‌খানমকে জিজ্ঞেস কর ওই অজানা লোকটা ঘরের মধ্যে কি করছিল ?

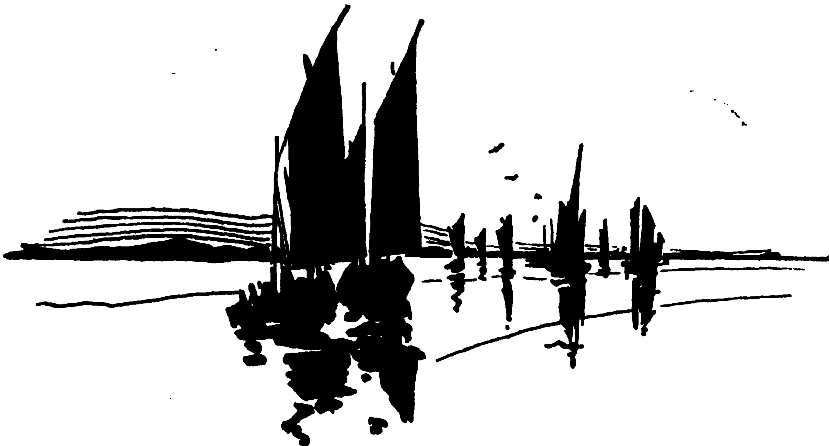
উযীর—আরে দুষ্টা, আগে তুই আমার উত্তর দে—পর্দ্দার পিছনে এক অপরিচিতের সঙ্গে তুই কি করছিলি ?

জীবা—বেশ ভাল। আগে আমিই বলি তারপর ও বলবে—দেখব ও কি বলে। তোমার বউ শুলহ্‌খানম আমার দাসীকে বকেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম—কি জন্য তোমার সীমার বাইরে গেলে ? সে ত তোমার খেয়ে আছে না যে তাকে বকবে ?" এসে না পেয়ে ফিরতে যাব, এমন সময় দেখি শুলজুয়ানম এক মরদের সঙ্গে ঐ দিক থেকে ঘরে ঢুকছে। লজ্জায় পড়ে গেলাম বাইরেও যেতে পারি না। ঐ পর্দ্দার পেছনে গিয়ে চুপ করে রইলাম। দেখি ওরা কি করে তারপর তোমায় খবর দেব। বিশেষতঃ তখন আমার মাথা ছিল খোলা। খোলা মুখে এক অপরিচিতের সামনে আসতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘটনাক্রমে তুমি এসে উপস্থিত হলে। যখন তুমি প্রায় পৌছঁবে, ও ইচ্ছা করলে তোমা হতে দূরে থাকে কিন্তু কোন উপায় না পেয়ে পর্দ্দার পেছনে এল যাতে তোমার না খাওয়া পর্য্যন্ত চুপ করে থাকতে পারে।

উযীর—এ যদি ঠিক বলে থাকিস, যখন ও বের হয়ে এলোনা, আমাকে খবর দিয়েছিলে ?

যীবা—কিন্তু আমি যে বের হতে পারিনি। ও বললে 'যদি কথা বলবে তা' হলে এই খঞ্জরের বাট পর্য্যন্ত দিলের মধ্যে বসিয়ে দেব।'

উযীর—(চিন্তা করে, শু'লহ্‌খানমের দিকে তাকিয়ে) —ওর কতদূর সত্য বল দেখি, ও কি তোমার নিকট এসেছিল ? ক্রমশঃ



অজানারে জানা নাহি যায়

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

অজানারে জানা নাহি যায়,
মিছে তার মিছে ভাবনা।
যেটুকু যে হাতে পাই যার
বেশী তার কিছু চাব না।
এ মাটিতে এ মাটির গান
গেয়ে চ'লে যাব অফুরান,
জানি যা' যাবার তারে আর
বারে বারে ফিরে পাব না।
অজানারে জানা নাহি যায়,
মিছে তার মিছে ভাবনা।

এ পৃথিবী রবে চিরকাল,
আমার সে শুধু দু'দিনের।
দিনের না আলো যেতে তাই
কথা ক'য়ে যাই দিনেকের।
এ জনমে যাহা কিছু পাই
ভেবে যাব তারি ভাবনাই,
আঁধারে যা র'য়ে গেল হায়,
কাঁদা তার কেঁদে যাব না।
অজানারে জানা নাহি যায়,
মিছে তার মিছে ভাবনা।



কুন্দ

শ্রীরত্না দেবী

১

আজ আমবাগানে সমস্ত দুপুর, কোমরে কাপড় জড়িয়ে, পাড়ার সঙ্গিনীদের সঙ্গে, কুন্দ লুকোচুরী খেলেছে। তারপর বেলা যখন প'ড়ে এসেছে, তখন মা'র কাছে বকুনি খেয়ে, সেদিনকার মত খেলা সাঙ্গ ক'রে, চুল বেঁধে ছোট্ট পেতলের ঘড়াটা নিয়ে, মধুমতীর ঘাটে গা ধুতে নেমেছে। আজ তার বড় বেলা হ'য়ে গিয়েছে। একেবারে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে নদীর ওপারে। তাছাড়া, অন্য পাড়ার মেয়েরা, মণি, রাধী, শান্তী, ফুলী, দুলী, যাদের সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক দেখা হয়, তারা সব কখন চ'লে গেছে।

জলে নেমে, পশ্চিম আকাশে জ্বল জ্বলে সন্ধ্যা তারাটার দিকে তাকিয়ে, কুন্দ ভাবল—"আর দুটো দিন মাত্র এখানে আছি। তারপর এখানকার সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে, উঠে যেতে হবে কলকাতায়।" তাই আজ খেল্‌তে খেল্‌তে, এত বেলা হ'য়ে গেছে। কলকাতায় গেলে তো এখানকার মত খেলার সঙ্গী জুটবে না।

রাধুর সঙ্গে পুতুল বিয়ে দিয়েছে। সে পুতুলও চেয়ে আনতে হবে। "আর যদি, না—ই আসি, আমার পুতুল ওর কাছেই র'য়ে যাবে। অত সুন্দর চীনে পুতুল, একটা গেলে আর পাব না। বাবার এখন চাকরী নেই। বাবা কি আর পুতুল চাইলে দিতে পারবে?"

কুন্দর বাবা সোঁদলপুরের মাইনার ইস্কুলে মাষ্টারী করতেন। হেড্‌ মাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য, তাও সম্প্রতি গেছে। মাষ্টারী করার সময়েই, কুন্দর বাবার সামান্য আয়ে, তাদের সংসার একরকম অচল হ'য়ে প'ড়েছিল। কুন্দরা অনেকগুলি ভাইবোন। বারো মাস সংসারে অভাব, অনটনের জন্য কুন্দর মা'র মুখে কেউ কোন দিন হাসি দেখেনি।

কুন্দর মা শহরের মেয়ে এবং অবস্থাপন্ন ঘর থেকেই এসেছিলেন এ পরিবারে। তখনও সচ্ছলতার মধ্যেই এসেছিলেন।

কুন্দর বাবা বড় খেয়ালী, সেইজন্যই তার মা'র এই পরাভোগ! কুন্দর বাবা নিজের অবস্থা মোটে বোঝেন না। কাকা জ্যাঠাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে রাগের মাথায় পৈত্রিক সম্পত্তিতে নিজের অংশ ছেড়ে দিয়ে শেষে এই সোঁদলপুরে এসে মাষ্টারী ক'রে কোনওমতে দিন গুজরান্ করা। এখানে আসার পর থেকে কুন্দর বাবার সঙ্গে তার মায়ের রোজই মন কষাকষি চ'লত। মাষ্টারী ছেড়ে দেওয়ার পর তো কথাই নেই। মা বাবাতে অনেক কথা কাটাকাটি হ'য়েছে। শেষে এখন দিন কয়েক ধ'রে কোন কথাবার্ত্তাই হয় না।

কুন্দর বাবা শেষে ঠিক ক'রলেন, সবাইকে নিয়ে কলকাতায় থাকবেন। কুন্দর বাবার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কলকাতায় গিয়ে কোনও মতে দাঁড়াতে পারলেই তাঁর কপাল ফিরে যাবে। মা তো কেঁদে কেটে অস্থির— "অত বড় শহরে কেউ আমাদের চেনে না, জানে না। এতগুলি ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে। এখানে ভিক্ষে ক'রেও পেট চ'লতে পারে। সেখানে উপোস ক'রে ম'রতে হবে।"

দিন কয়েক ধ'রে, এমন বাড়ীর অবস্থা হ'য়েছে যে, কুন্দর বাড়ীতেই ঢুকতে ইচ্ছে করে না। ছোট ভাইটাকে কোলে নিয়ে সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়।

ঘাটে উঠে অন্যমনস্কতা বশত কুন্দর পা পিছলে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ভিজে কাপড় নিংড়োতে নিংড়োতে ভাবল—এই সোঁদলপুর ছেড়ে যেতে একটুও মন স'রছে না, যদিও মতিরাণী গল্প ক'রেছে, সোঁদলপুরের কাছে কলকাতা নাকি স্বর্গ। হ'লই বা স্বর্গ। আমাদের এই খড়ের বাড়ীটা, ঐ বকুলতলা, এই নদীর ধারের মাঠ, এসব তো সেখানে নেই। এদের ছেড়ে যেতে কত কষ্টই যে হচ্ছে! বাবার যে কি মতিগতি।"

কুন্দদের রওনা হওয়ার দিন গ্রামসুদ্ধ লোক, যে যেখানে ছিল ঘাটে এসেছিল ওদের নৌকায় তুলে দিতে।

নৌকাটা যখন আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল, কুন্দ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সেছিল, তবুও চোখের জল চাপ্‌তে পারেনি।

কলকাতায় এক অন্ধকার গলি ঘুঁজির মধ্যে কুন্দদের বাসা। মাটির দেওয়াল, ওপরে খোলার ছাউনি। ঘিঞ্জি বসতি। এক সঙ্কীর্ণ জায়গায়, এতগুলো প্রাণী একসঙ্গে থাকা, তার জীবনে এই প্রথম। কুন্দর প্রাণ সর্ব্বদাই যেন হাঁফিয়ে উঠত।

আর পাড়াটা কি জঘন্য! যতসব ছোটলোকের বাস। একটা কলতলা আছে, সেখানে পাড়ার সবাই জল নিতে যায়। প্রতিদিন একটা হিন্দুস্থানী গয়লা বউয়ের সঙ্গে, অন্য সব লোকেদের একবার ঝগড়া বাধবেই। গয়লানী চায়, সে সবার আগে জল নেবে। সে আগেই আসুক আর পরেই আসুক।

কুন্দদের পাশের বাড়ীতে একটা মাত্র ঘর নিয়ে, সাধুমতী ব'লে এক বৈষ্ণবী থাকে। সারাদিন তাকে দেখাই যায় না। কপালে চন্দনের তিলক কেটে কোথায় যে ভিক্ষেয় বেরোয়। তারপর ভিক্ষের থেকে, অনেক বেলায় ফিরে এসে তার এক 'চন্দনা' আছে, তাকে 'হরেকৃষ্ণ' বুলি পড়ায়। কুন্দদের বাসার সামনেই একদল মাতালের আড্ডা। সমস্ত রাত কি হল্লাই করে! প্রায় প্রতিদিনই পাশের একটা বাড়ী থেকে স্বামী স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া শুনতে পাওয়া যায়। ঐ পাড়াতেই এক কসাই থাকে। তার ঐ আগুনের ভাঁটার মত লাল দুটো বড় বড় চোখ দেখলে কুন্দর ভারি ভয় করে।

একটা খোলার ছাউনীতে কতকগুলো উড়ের আড্ডা। দুপুরে হারমোনিয়ম নিয়ে তাদের তারস্বরে বেসুরে বেতালে কি গান! আর সেই ঝগড়াটী হিন্দুস্থানী গয়লানী বুড়ীর যাঁতায় ডালপেষার একঘেয়ে শব্দ তো আছেই। সেই খোলার ঘরের ছোট্ট জানলাটার ধারে দাঁড়িয়ে একটুকরো আকাশ, আর একটু সবুজ দেখার জন্য যখনই কুন্দর মন তৃষিত হ'য়ে উঠ্‌ত, তখনই, তার সোঁদলপুরের কথা মনে হ'ত।

কুন্দ লক্ষ্য ক'রত, ওর বাবা, প্রতিদিন একটা বিশেষ সময়ে ছেঁড়া পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে, ময়লা ধুতীর কোঁচাটা ধ'রে, জীর্ণ, বিবর্ণ ছাতাটা বগলে নিয়ে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। কিছুদিনের মধ্যেই কুন্দ একদিন জানতে পারল, তার বাবা নাকি কালী, এসেন্স, গন্ধতেল, তরল আলতা, মেটে সিঁদুর, সাবান ইত্যাদির ব্যবসা আরম্ভ ক'রবেন। তাই, কোনও একজন লোকের কাছে শিখতে যান। আর, না ক'রেই বা কি ক'রবেন। হাতের পুঁজি তো ফুরিয়ে গেছে আজ অনেক দিন। কুন্দর বাবা যে মাড়োয়ারী মুদীর দোকান থেকে ধার নিচ্ছিলেন, তারাও আর ধারে দিতে চাইছে না। বরং তাদের পাওনাটা চাচ্ছে।

একদিন কুন্দর বাবা ঘুরে এসে বল্লেন—অনেক তেল, সাবান কালী, আলতা এই সব তৈরী ক'রেছি। কাল থেকে খুকীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। খুকীকে দিয়ে বিক্রী করাব।

কুন্দর বাবার সে প্রস্তাবে তার মা একটু রাগারাগি করলেন—"না হয় দৈন্যই এসেছে, তাই ব'লে এত বড় মেয়েকে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফেরীওলার কাজ করালে সমাজে স্থান হবে না। মেয়েটার যদি বা কোনও দিন বিয়ের আশা থাকৃত, তাও ঘট্‌বে না।"

কুন্দর বাবার মাথায় কোন এক মাড়োয়ারী ব্যবসাদার ঢুকিয়ে দিয়েছে—'তোমার ঐ মেয়েটী বেশ ফুট্‌ফুটে, ওকে সাজিয়ে গুজিয়ে ওকে দিয়ে বিক্রী করালে, দু'পয়সা হবে।'

এমন কি ধার ক'রে কুন্দর বাবা, মেয়ের জন্য জাপানী সিল্কের ফ্রক আর জাপানী রবারের জুতো কিনে আনলেন।

কুন্দর সেই দিন থেকে এক কাজ হ'ল; রোজ ঐ জামা জুতো প'রে, ক্যাম্বিসের থলিতে ক'রে জিনিসগুলো নিয়ে লোকের দুয়োরে দুয়োরে গিয়ে দাঁড়ান। কুন্দর বাবা নাম মাত্র সঙ্গে যেতেন, আড়ালে আড়ালেই থাকতেন। কুন্দর বাবা বড় বড় সাহেবদের আপিসেই বেশীর ভাগ সময় নিয়ে যেতেন। সেখানে কেরানীমহলে পসারটা বেশ জ'মে উঠেছিল। সাহেবরা, কুন্দকে দেখে পরস্পর কি বলাবলি ক'রত।

সেদিন কুন্দর বাবা জ্বরে একেবারে বেহুঁস। গ্রামে থাকার সময় ম্যালেরিয়া ছিল, সেই ম্যালেরিয়ারই প্রকোপ। জ্বরের মধ্যেই ক্ষীণ, কম্পিত স্বরে বললেন—

কুন্দ, তুই আজ একলাই যা। পথ তো তোর একরকম চেনাই হ'য়ে গেছে। একদিন না গেলেও তো চলার উপায় নেই।

বাস ষ্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে, ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে হেলান দিয়ে, কুন্দ দাঁড়িয়ে রইল বাসের প্রতীক্ষায়—বাস্ ধরবে।

একটা মোটর নিমেষের মধ্যে চ'লে গেল। কুন্দর হঠাৎ চোখে প'ড়ল—তার পরিচিত ফিন্‌লে কোম্পানীর অফিসের মুর সাহেব। আর তার মেম্ একটা কুকুরের ঘাড়ে হাত দিয়ে, তারই বয়সী, একটা মেয়ে, বোধ হয় ঘোড়দৌড় দেখতে যাচ্ছে। কুন্দর মনে হ'ল—তার সঙ্গে তারই বয়সী ঐ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে কত প্রভেদ!

কুন্দ নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ট্রামের পর ট্রাম, বাসের পর বাস, মোটরের পর মোটর চ'লে গেল। তার খেয়ালই নেই!

সন্ধ্যে নেমে এল। বিদ্যুতালোকে সমস্ত মহানগরী ঝল্‌মল্ ক'রে উঠ্‌ল। হঠাৎ জন কয়েক গুণ্ডা ধরণের লোক তার পিছন থেকে বিশ্রী উৎকট শব্দে ব'লে উঠ্‌ল—এই খুকী, তোমার ঐ ব্যাগে কি?

কুন্দ হঠাৎ চমকিয়ে উঠ্‌ল—'তাইতো' সে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ল, আজ একটা পয়সাও ঘরে নিতে পারল না। এখন আর বাড়ী ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার উপর আজই প্রথম সে একলা কলকাতার রাস্তায় বেরিয়েছে। না হয় আজ সে মিথ্যেই বল্‌বে। কিছু বিক্রি ক'রতে পারেনি।

পরক্ষণেই তার চোখের উপর ভেসে উঠ্‌ল—অবুঝ, রুক্ষকেশ, শিশু ভাইবোনগুলো, আধপেটা খেয়ে সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান ক'রছে। আর ডাষ্টবিনের ধারে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। বাবা বিছানায় শুয়ে জ্বরের ঘোরে ক্রমাগত ভুল ব'কছেন। মা হয়তো দোরগোড়ায় আমার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে সামনেই মুড়ীওয়ালীর দোকানে, ধারে দু পয়সার মুড়ী কিন্‌তে গেছেন। মুড়ীওয়ালী হয়তো ঝাঁঝালো সুরে মুখনাড়া দিয়ে জানাল—সে আধ পয়সারও ধারে কিছু দিতে নারাজ।

"বামুনের বৌ, তোমার কাছে বাকী বকেয়া আদায় করা ভারি কঠিন। পরে দেব'খন। আজ হাতে নেই, কাল হাতে নেই ক'রে তুমি ভারী ঘোরাও।"

মা হয়তো হতাশ হ'য়ে ঘরে ফিরে এলেন, ভাই-বোনরা সব হেঁকে ধ'রল—"দুটী মুড়ী দাও।"



একটি গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
আপন মনে যাও চলে গান গেয়ে।
যে আকাশে সুরের লেখা লেখো
না বুঝেও তার পানে রই চেয়ে।
হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চোলে
প্রতি দিনের ঠিক ঠিকানা ভোলে।
মৌমাছিরা আপনা হারায় যেন
গন্ধের পথ বেয়ে॥
গানের টানা জালে
নিমেষ ঘেরা বাঁধন থেকে
তোলে অসীম কালে।
মাটির আড়াল করি ভেদন
স্বর্গ-লোকের নামে বেদন
পরাণ ফেলে ছেয়ে॥





সম্পাদকীয়

শব্দকে রূপে পরিবর্ত্তন করা, ভাষান্তরে, শ্রুতিকে দর্শনে পরিণত করা মানব সমাজের এক অদ্ভুত ও অতুলনীয় কীর্ত্তি। কারণ আমরা যাকে সভ্যতা বলি তা লেখার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। নিরক্ষর মানুষের সভ্যতা নেই। আমরা যাকে সাহিত্য বলি তারও মূল হচ্ছে অক্ষর। কারণ কানে যা শুনি তা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু অক্ষর চিরস্থায়ী। মানুষের মনোভাবের এই পরমায়ু বাড়ানোই অলকার উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর দুটি ভাষার প্রাচীন সাহিত্য সর্ব্বাগ্রগণ্য, একটি গ্রীক ভাষার অপরটি সংস্কৃত ভাষার। এ উভয় ভাষারই আদি সাহিত্য লেখা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিত সমাজে মতভেদ আছে। ধরে নেওয়া যায় যে বেদের সৃষ্টি অক্ষরের পূর্ব্বে। কিন্তু বেদ বাদ দিয়েও সংস্কৃতে বিপুল সাহিত্য আছে এবং সে সাহিত্য যে লিখিত ছিল, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য আমার এ মত অনুমান মাত্র। অলিখিত সাহিত্য মূক ব্যক্তিরা রচনা করতে পারে নি, আর যারা বধির তারা মুখস্থ করতেও পারেনি। আর পৃথিবীতে যারা নিরক্ষর তারা চোখ থাকতেও কানা আর কান থাকতেও কালা।

সুতরাং লিখিত কথাকে সাহিত্যের ভিত্তি বললে অত্যুক্তি হয় না। অক্ষর বহুকাল হস্ত লিখিত ছিল, এখন তা যন্ত্রে মুদ্রিত। সেকালের 'আখরিয়া'র কাজ একালে ছাপাখানা করছে। ফলে সাহিত্য দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা বাংলার মুদ্রাযন্ত্রের আমদানী ক'রে বঙ্গ সাহিত্যকে মুক্তি দিয়েছেন। ফলে গত উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ছাপার অক্ষরের সাহিত্য। এর ফলে আমাদের এ যুগের সাহিত্যের রূপও বিচিত্র আর পূর্ব্বের তুলনায় আকারও বৃহৎ।

এখন শুধু বাংলায় নয় সব দেশেরই সাহিত্যের উপাদান হচ্ছে পুস্তকপুস্তিকা ও পত্র। পত্র অবশ্য আমি চিঠি অর্থে ব্যবহার করছিনে, কারণ এ জাতীয় পত্র সাহিত্যে বাংলা ভাষা আজও দরিদ্র। রবীন্দ্র নাথের 'ছিন্নপত্র' ব্যতীত অপর কোনও পত্রাবলীকে সাহিত্য বলা যায় না। অপর পক্ষে পত্র অর্থ যদি হয় সাপ্তাহিক পত্র, তা হ'লে এই মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে কত পত্রের আবির্ভাব হ'য়েছিল, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার পরিচয় আমাদের দিয়েছেন। যাঁরা সেকালের বাঙালীর মনের কথা জানতে চান তাঁরা ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছে চিরঋণী থাকবেন। আর একালেও সে সব লেখার বিষয়বস্তু বেশি কিছুই বদলায়নি।

এ কারণ যদি বলা যায় যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদি যুগ সাপ্তাহিক পত্রের যুগ তা হ'লে নিতান্ত ভুল কথা বলা হবে না। এ যুগে যে কোনও পুস্তক পুস্তিকা লেখা হয়নি তা অবশ্য নয়। লেখা হয়েছিল খান তিন চার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের টেক্সট্ বুক এবং বহু পুস্তিকা যার অনেকগুলি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি উদ্ধার করেছেন। তাঁদের লিখিত ভূমিকাগুলি যাদৃশ চমৎকার গ্রন্থগুলি তাদৃশ মনোমুগ্ধকর নয়। কোম্পানির আমলের অদ্বিতীয় মনীষী রামমোহন রায়ের লেখাও ঠিক সাহিত্য নয়—'সুপার-জার্নালিজম্'।

এদেশ যে যুগে কোম্পানির হাত থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে এল সেই যুগেই প্রথম মাসিকপত্র বঙ্গদর্শন আবির্ভূত হল। এই পত্রিকার অনুকরণ ও অনুসরণ করে আর দুচারখানি মাসিক পত্রিকাও দেখা দিয়েছিল। বঙ্গদর্শনে গল্প উপন্যাস, দর্শন বিজ্ঞান সবই ছিল। এযুগেও মাসিক পত্রিকার বিষয়বস্তু এই সব। অবশ্য বঙ্গদর্শন মানে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তিনি যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সে পথ আমরা অবলম্বন করতে বাধ্য। এই হচ্ছে আদি মাসিক পত্র যা সাহিত্য পদবাচ্য।

আজকের দিন দৈনিক পত্রের আমল। দৈনিক পত্র এখন অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে। আর দৈনিক পত্রের অঙ্গে টুক্‌রো টাক্‌রা দর্শন বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দৈনিক পত্র এখন সাপ্তাহিক পত্রের উদ্দেশ্য সাধন করছে। পাঠক এখন টাটকা খবর চায়। কি পলিটিক্স, কি ফুটবল, কি সিনেমা, কোন বিষয়েরই বাসি খবর কারো মুখে রোচে না। আমাদের বর্ত্তমান জীবনটাই হয়ে পড়েছে দিন-আনি দিন-খাই গোছের। এ সত্ত্বেও মাসিক পত্র আজও টি'কে আছে। ছোট বড় নানা রকমের। এর কারণ বাঙালীর সাহিত্য রচনার দিকে একটা নৈসর্গিক প্রবণতা আছে।

দৈনিক পত্রের পরমায়ু নির্ভর করে পাঠকের কৌতূহলের উপর, আর মাসিক পত্রের প্রধান সম্বল [illegible] লেখকের কৃতিত্ব। অবশ্য এ উভয় জাতীয় পত্রই দাঁড়িয়ে থাকে 'ইকনমিক' ভিত্তির উপর। যদি কোন

মাসিক পত্র 'কমার্শিয়াল' না হয় তা হ'লেও তা শূন্যে ঝুলতে পারে না। মাটিই তার পায়ের নীচে একমাত্র নির্ভর। আর এস্থলে মাটি মানে অর্থ। অর্থ কাগজেরও চাই, লেখকেরও চাই।

একালে মাসিক পত্রিকা জন্মায় অনেক কিন্তু বেশির ভাগ বাঁচে না বেশি দিন। ইংলণ্ডের অবস্থাও তাই। ইতিমধ্যেই বিলেতে বহু মাসিক পত্রিকা জন্মেছে কিন্তু তার একটিও দীর্ঘজীবী হয়নি। লেখকের অক্ষমতার জন্য নয়, পাঠকের ঔদাসীন্যের জন্য। বাংলায় এখন পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সাহিত্য রসিকের দল যথেষ্ট বাড়েনি। বলা বাহুল্য এ যুগে সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় হচ্ছে মাসিক পত্রিকা।

কেউ কেউ মনে করেন যে বিলেতি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে বাধা। বিলেতি সাহিত্যের শক্তি ও সৌন্দর্য্য যে বাংলা সাহিত্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সাহিত্যের প্রভাব আমাদের নব সাহিত্যের অনুকূল, প্রতিকূল নয়। এ যুগে কেবলমাত্র ন্যাশন্যাল লিট্‌রেচার গড়া অসম্ভব।

বহুকাল পূর্ব্বে কার্‌ল্‌ মারক্স তাঁর কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে ব'লে গিয়েছেন "National one-sidedness and narrow-mindedness becomes more and more impossible and from the numerous national and local literatures there arises a world literature." একথা সম্পূর্ণ সত্য।

মাসিক পত্রের পরমায়ু অনিশ্চিত জেনেও আমি অলকার সম্পাদনের ভার হাতে নিয়েছি। তার কারণ অলকা একখানি গড়া কাগজ, আমাকে তা গ'ড়ে তুলতে হবে না। অলকার পূর্ব্ব সংখ্যাগুলির উপর চোখ বুলিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল যে এ পত্রিকার কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ছবি ভাল। এ পত্রিকার মুখপাত দুরস্ত। অলকার এই অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে আমি খুশী হয়েছি।

তারপর দেখলুম যে অলকার লেখকেরা সেই লেখক যাঁরা অন্যান্য মাসিক পত্রিকার খোরাক যোগান। সুতরাং অলকা যে টিঁকে থাকবে এ আশা করা যায়। বাংলার যে কয়খানি পত্রিকার অখণ্ড পরমায়ু তাদের

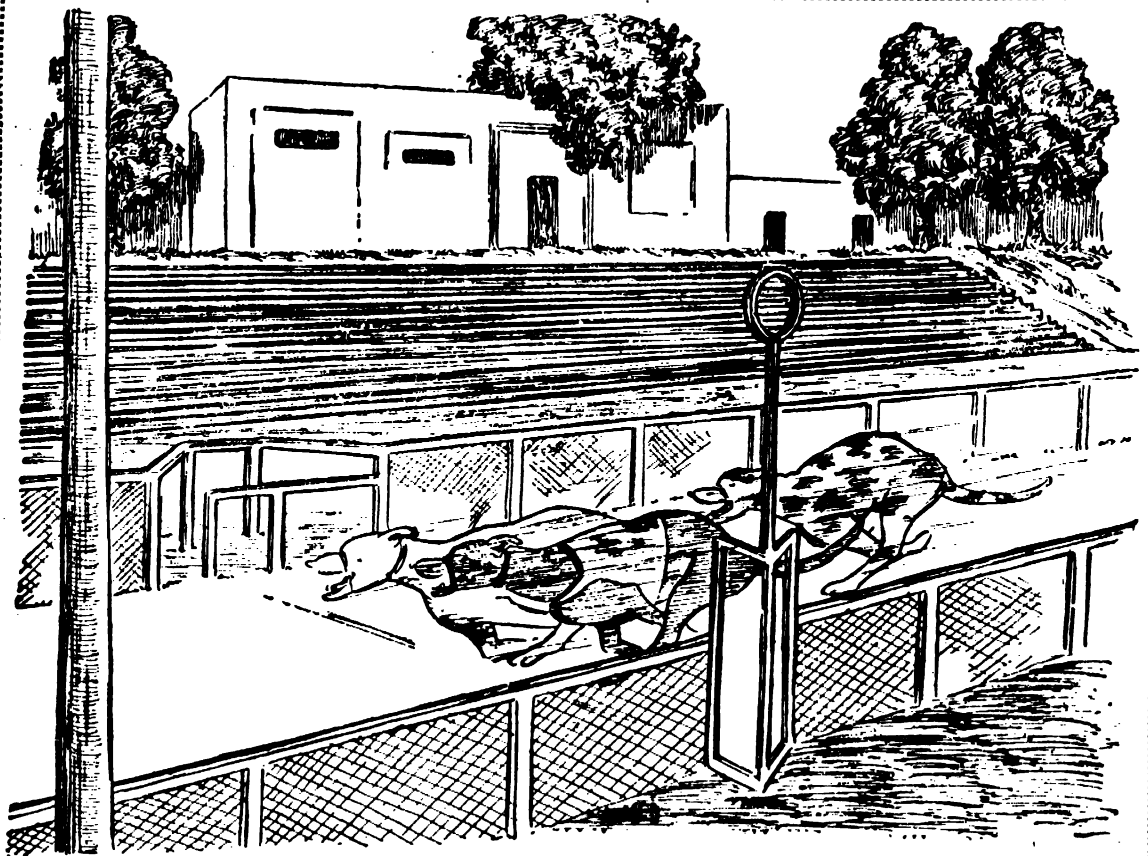
বিষয় সত্য কথা এই যে তাদের "জীনেকো আদত পড় গেয়ী" অর্থাৎ বেঁচে থাকবার অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছে। অভ্যাসও মামুলি হওয়া সময় সাপেক্ষ। আমাদের সমাজ যে আজও টিকে রয়েছে সেও সামাজিক লোকের অভ্যাসের প্রসাদে, কোনও দর্শন বিজ্ঞানের প্রসাদে নয়।

আমি এ পত্রিকার সম্পাদনের ভার নিয়ে এর অপমৃত্যু না ঘটলেই কৃতার্থ হব। আমি যে এ কাজ হাতে নিয়েছি তার কারণ সাহিত্য সমাজে পেনশন্ ব'লে কোন জিনিস নেই !

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী



শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত
শ্রীশশধর চক্রবর্তী কর্তৃক কালিকা প্রেস লিঃ ২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
১৫ নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ হইতে প্রকাশিত।



গ্রেহাউণ্ড রেসিং

দি ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত

আজকালকার সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য আমোদ।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিতে ভুলিবেন না—তাঁহারা আরও অধিক আনন্দ পাইবেন;

উত্তেজনাপূর্ণ উন্মাদনাকারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আনন্দ!

প্রবেশ মূল্য	এনক্লোজার	"এ"	১৷০	স্পেশাল এনক্লোজার (বক্স)	৪৲
	"	"বি"	॥৵০	ঐ মহিলাদের জন্য	২৲

স্থান—বেহালা (ডায়মণ্ডহারবার রোড)

ট্রাম ও বাস পাওয়া যায়।

নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র

জীবন-মরণ



পরিচালনা ঃ নীতীন বসু

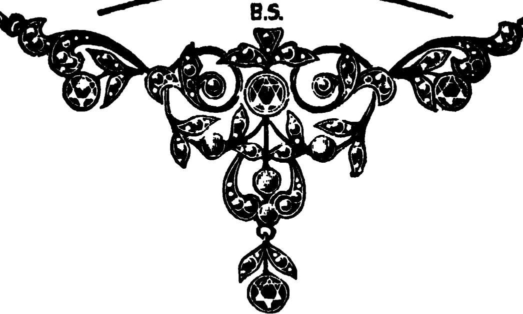
ভূমিকায় ঃ লীলা দেশাই, সায়গাল, ভানু ব্যানার্জ্জি,
ইন্দু মুখার্জ্জি, অমর মল্লিক, নিভাননী,
মনোরমা এবং আরও অনেকে।

আ গ ত প্রা য়

টেলিফোন
বড়বাজার

বি, সরকার এণ্ড সন্স

"গিনি হাউস"



লিমিটেড

১৩১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের ব্রাঞ্চ দোকান নাই কিম্বা আমাদের কোন অংশীদারদিগের ভিতর কেহ পৃথক গহনার দোকান করেন নাই।
জগদ্ব্যাপী অর্থ সঙ্কট প্রযুক্ত আমাদের সমস্ত গহনারই মজুরি কম করা হইয়াছে। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
যে কোন প্রকার পুরাতন সোনা বা রূপা বাজার দর হিসাবে মূল্য ধরিয়া নূতন গহনা দেওয়া হয়।

'অলকা'র নূতন কার্য্যালয়

হিমালয় হাউস

১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ

কলিকাতা

ফোন—কলিকাতা ৬৩৫৫



শারদীয়া আনন্দ-অবসর সার্থক
করিয়া তুলিতে সঙ্গীতবাদ্য চাইই !

—আমাদের দোকানে সর্ব্বদা—

সকল উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র পাইবেন

বীণা অর্গান হারমোনিয়ম, সেতার, বেহালা, এসরাজ,
রেডিও, গ্রামোফোন, ইত্যাদি সব কিছুই।

দোকানে আসুন বা পত্র লিখুন।

এম, এল, সাহা লিঃ
৫/১ বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
সি, সি, সাহা লিঃ
১৭০ বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

সস্তায় সকল রকম দেশী ও বিলাতি কাগজ
কোথায় পাওয়া যায়
জানেন কি ?



পত্র লিখুন বা ফোন করুন—

বসু ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪।২, ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১২২ নং ঘর

ফোন : ক্যাল ২২৮০

ডাক্তাররা বলেন—

'লিলি'

ব্র্যাণ্ড

বার্লি

ভারতে শ্রেষ্ঠ
পানীয় খাদ্য



লিলি বার্লি প্রত্যহই কলিকাতায় প্রস্তুত হয়, সুতরাং
ঋতুর প্রকোপ ইহার গুণ নষ্ট করিতে পারে না।

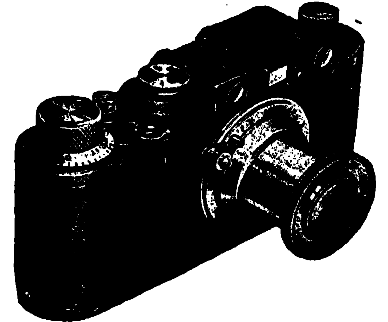
সেই কারণেই—

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য পথ্য ও পানীয়।

ক্যামেরা ?

• লাইকা
• রোলিফ্লেক্স
• বল্‌ডিনা
• ব্রিলিয়াণ্ট



ডেভেলপিং এবং প্রিণ্টিং

আমাদের নিকট

পরীক্ষা করিয়া দেখুন—

খুসী হইবেন।

ইত্যাদি সকল প্রকার ক্যামেরা

এবং

সর্ব্বপ্রকার ফিল্ম, প্লেট, পেপার, ফোটো কেমিক্যাল ইত্যাদি

আমাদের দোকানে ন্যায্য মুল্যে সকল সময় পাইবেন।
একবার দোকানে আসুন কিম্বা তালিকার জন্য পত্র লিখুন ॥

ফোটোগ্রাফিক্ ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সি কোং লিঃ

১৪৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ঃঃ ঃঃ কলিকাতা



GOVERNMENT PRODUCTS

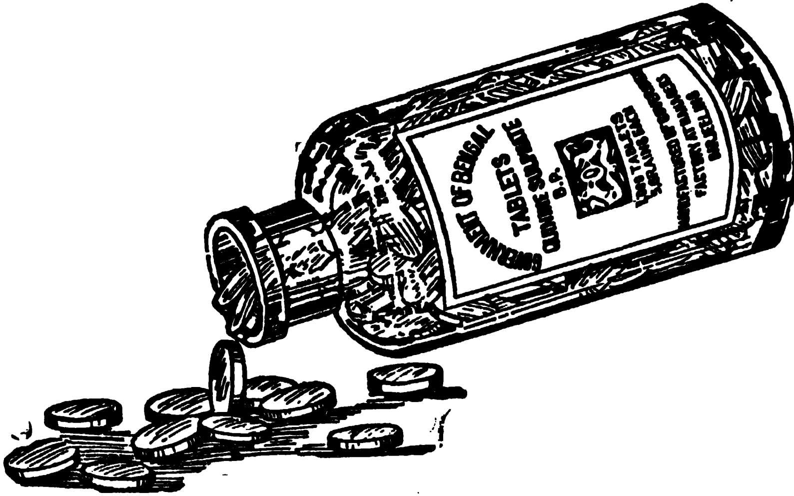
বাংলা গভর্ণমেণ্টের

কুইনাইন

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

সহর ও মফঃস্বলের সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।



জয়েণ্ট এজেণ্টস্—

শা, ওয়ালেস এণ্ড কোং

পোষ্ট বক্স নং ৭০, কলিকাতা

চৌধুরী এণ্ড কোং

৪ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হাতে খড়ি

অভিনব চিত্রকথা

কি করিয়া শিশুদের ভবিষ্যৎ
জীবন গঠন করা যায়—
তাহাই চিত্রে দেখান হইয়াছে

হাতে খড়ি

আপনাদের নূতন পথের সন্ধান দিবে—
শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার পথ দেখাইবে—
শিশুদের অফুরন্ত বিমল আনন্দ দিবে—

হাতে খড়ি

শিশুদের দ্বারা অভিনীত
শিশুদের একমাত্র উপযুক্ত ছবি
এইরূপ ধরণের ছবি ভারতে এই প্রথম

"হাতে খড়ি"

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন্ কর্ত্তৃক প্রযোজিত

নিরঞ্জন পাল কর্ত্তৃক পরিচালিত

এম্প্যায়ার ডিষ্ট্রীবিউটার কর্ত্তৃক পরিবেশিত

রূপবাণীতে

ফিল্ম কর্পোরেশন
অব্ ইণ্ডিয়ার বাঙলা ছবি
রিক্তা
রিক্তা
পরিচালক: সুশীল মজুমদার
ভূমিকায়: ছায়া, অহীন্দ্র, রতীন্, তুলসী, দেববালা, মোহন, সত্য প্রভৃতি।

চিত্রা ও
নিউ সিনেমায়
রজত-জয়ন্তী
নিউ থিয়েটার্সের
কৌতুকরস মধুর বাণীচিত্র—
হাসির তুফান!
পরিচালক: প্রমথেশ বড়ুয়া
ভূমিকায়: মেনকা, মলিনা, প্রমথেশ, পাহাড়ী, শৈলেন, ইন্দু, দীনেশ দাশ, পণ্ডিত শোর প্রভৃতি

রাধা ফিল্মসের আগতপ্রায়
পৌরাণিক চিত্রকাহিনী
বামনাবতার
পরিচালক: হরি ভঞ্জ
দ্রৌপদী
পরিচালক: অহীন্দ্র চৌধুরী

সাগর মুভিটোনের
কুঙ্কুম (লাইফ অব এ ড্যাঞ্চার)
শ্রেষ্ঠাংশে: সাধনা বোস
পরিচালক: মধু বোস

ফিল্ম কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার
তটিনীর বিচার

সোল্-ডিষ্ট্রিবিউটার্স:
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ
গ্রাম: রূপবাণী = ফোন: বি, বি, ১১৩
৭৬-৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

mothers are not MARTYRS!



ON the proper care of the expectant mother and the child to come hang issues of supreme happiness or supreme sorrow. Both in the pre-natal and post-natal stages of maternity the health of the mother must be adequately sustained and conditioned to stand, unimpaired, the strain of motherhood.

LADCOVINE
A PORT WINE TONIC

Manufactured under strict Excise Supervision. Contains, besides the best Port Wine, a number of carefully selected ingredients that eliminate physical and nervous tension during the pre-natal and post-natal periods.

TITAN OF TONICS
In the Hour of Trial.

THE LISTER ANTISEPTICS & DRESSINGS Co. (1928), Ltd.,
COSSIPORE, CALCUTTA.



'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষান্মাসিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	১	পৃষ্ঠা	প্রতিমাসে	২০৲
”	½	”	”	১১৲
”	¼	”	”	৬৲
কভার	৪র্থ	”	”	৬০৲
”	২য়	”	”	৫০৲
”	৩য়	”	”	৪৫৲

(বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট আবশ্যক।

হিমালয় হাউস
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা
ফোন : কলিকাতা ৬৩৭৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

অলকা ভাদ্র ১৩৪৬

সূচীপত্র

"কপুরচাঁদ লিমিটেড"এর পরিবেশনায়

আগতপ্রায় কয়েকখানি বাণীচিত্র

দেবদত্ত ফিল্ম লিঃ

রুক্মিণী

পুরাণের অদ্বিতীয় চরিত্র

বর্ত্তমানের অতুলনীয় চিত্র

পরিচালক :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে :

পান্না, প্রতিমা দাশগুপ্তা, দেববালা, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু, জহর গাঙ্গুলী, রাধিকানন্দ, রতিন বন্দ্যো

পথ ভুলে

হাসি-কান্নার নব রসায়ন

সামাজিক চিত্রের নূতন পরিকল্পনা

পরিচালক :

ধীরেন গাঙ্গুলী

শ্রেষ্ঠাংশে :

প্রতিমা দাশগুপ্তা, পান্না, কুমারী মনিকা গাঙ্গুলী, সুলেখা চ্যাটার্জ্জী, ডি জি, রঞ্জিত রায়, সত্য মুখার্জ্জী

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

জীবন মরণ

এক হৃদয়গ্রাহী সামাজিক করুণ কাহিনী

পরিচালক :

নীতিন বসু

শ্রেষ্ঠাংশে :

সায়গল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, লীলা দেশাই, ইন্দু, দেববালা, শৈলেন চৌধুরী

?

পরিচালক :

হেমচন্দ্র

শ্রেষ্ঠাংশে :

কানন বালা

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

একমাত্র

—ঃ চিত্র পরিবেশক ঃ—

কপুরচাঁদ লিমিটেড

৩৯, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

TELE BRILLIANTS

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স্

সন এণ্ড গ্রাণ্ড সন্স্ অব লেট বি. সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে ও অর্ডার দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়।

মজুরী পূর্ব্বাপেক্ষা কমান হইয়াছে।

পত্র লিখিলে আমাদের নূতন নূতন ডিজাইন সমন্বিত বি ৩ নং ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রবিবার দোকান বন্ধ থাকে।

PHONE B.B. 1761

V. M. 24/39

১২৪, ১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

MEGAPHONE RECORDS

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

'সাপুড়ে'র শ্রেষ্ঠ গান দুটি

শ্রীমতী কানন দেবী

JNG	কথা কইবে না বউ	'সাপুড়ে'
5380	আকাশে হেলান দিয়ে	ঐ

"রজত জয়ন্তী" চিত্রের অপূর্ব্ব সুন্দর গান দুটি

শ্রীমতী মলিনা কর্ত্তৃক গীত হইয়া শীঘ্রই

নিউ থিয়েটার্স মেগাফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হবে



শ্রীমতী কানন

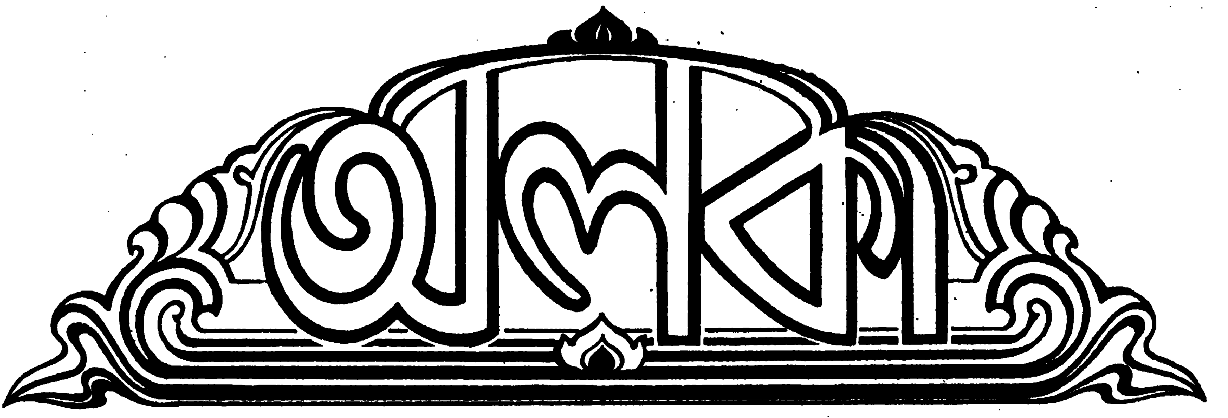


মেগাফোন কোম্পানী কলিকাতা



আলো-ছায়া

শিল্পী—শ্রীহিমাদ্রী সেন



প্রথম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৬ | দ্বাদশ সংখ্যা

রেলেটিভিটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুলনায় সমালোচনাতে
জিভে আর দাঁতে
লেগে গেল বিচারের দ্বন্দ্ব,
কে ভালো কে মন্দ।
বিচারক বলে হেসে
দাঁত জোড়া কী সর্বনেশে
যবে হয় দেঁতো।
কিন্তু সে সুধাময় লোক বিশেষে তো
হাসি রশ্মিতে,
যাহারে আদরে ডাকি, অয়ি সুস্মিতে
পাণিনির শুদ্ধ নিয়মে।

জিহ্বায় রস খুব জমে।
অথচ তাহার সংশ্রবে
দেহখানা যবে
আগাগোড়া উঠে জ্বলি
রস নয়, বিষ তারে বলি।

স্বভাবে কঠিন কেহ মেজাজে নরম,
বাহিরে শীতল কেহ, ভিতরে গরম।
প্রকাশ্যে এক রূপ যার,
ঘোমটায় আর।
তুলনায় দাঁত আর জিভ
সবই রেলেটিভ।
হয়তো দেখিবে সংসারে
দাঁতালো যা, মিঠে লাগে তারে
আর যেটা ললিত রসালো
লাগে নাকো ভালো।
সৃষ্টিতে পাগলামি এই—
একান্ত কিছু হেথা নেই।

ভাল বা খারাপ লাগা পদে পদে উলোটা পালোটা,
কভু সাদা কালো হয় কখনো বা সাদাই কালোটা,
মন দিয়ে ভাবো যগুপি
জানিবে এ খাঁটি ফিলজফি॥



শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

'সাঁতার দিতে দিতে অনেক দূর গিয়া প্রতাপ বলিল—শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে। শৈবলিনী বলিল—আর কেন? এইখানেই। প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল, মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে?'

সমগ্র উপন্যাসখানি ভরিয়া শৈবলিনীর হৃদয়শোণিত দিয়া লেখা আছে—প্রতাপ তাহার কে?

সেদিন শৈবলিনী ডুবিলে তাহা সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত দুর্ঘটনাবিশেষরূপে আধুনিক 'লেক্ ট্র্যাজেডি'র একটি পুরাতন বটতলার সংস্করণ হইত মাত্র। কবি বঙ্কিমের মানসনেত্রে শৈবলিনীকে উপলক্ষ করিয়া যে অতুলনীয় নারীরূপ মূর্ত্তিগ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, যে দিব্য রূপের চরণে 'যুগে যুগে মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় নিজ তপস্যার ফল', বাংলা সাহিত্যে সে রূপ ফুটিবার অবকাশ পাইত না। কবি বঙ্কিম, আর্টিষ্ট্ বঙ্কিম, রূপের ও যৌবনের যে কত বড় পূজারী, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার এই চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বিশেষরূপে পাই। যাঁহারা এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে লোকশিক্ষক বা সমাজনীতি-প্রচারকরূপে দেখিতে পান, তাঁহারা ইহার বহিরঙ্গ দেখেন মাত্র। কিশোর-কিশোরীর যে সমাজ-নিরপেক্ষ প্রেম চিরদিন কবি ও রসিকচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, যে মধুর সৌন্দর্য্যবোধ বাংলায় 'কানু-ছাড়া গীত নাই' এই প্রবাদবচনের সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ যাহার বিরুদ্ধে সমাজ চিরদিন তাহার দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিয়াছে, চন্দ্রশেখর উপন্যাসের অন্তরেও সেই সমাজ-বিরোধী কাব্য-কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু যে কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর সমাজশিক্ষক সাজিয়াও তাঁহার প্রেমনীতিকে সমাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। সমাজনীতি ও সংস্কারকে বজায় রাখিবার জন্য চন্দ্রশেখরে যোগবল, 'সাইকিক্ ফোর্স', প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির আমদানী করায় আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া যে ক্ষোভ দেখা যায় তাহাও বাহ্যদৃষ্টির ফল। বরং এই উপন্যাসেই আমরা পরিচয় পাই—বঙ্কিম কতবড় সাহসী ও কুশলী আর্টিস্ট, ব্যাজস্তুতিতে তাঁহার কি অসাধারণ দক্ষতা!

বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাস এক এক খানি কাব্য। কবি তাহা নিজেও জানিতেন। তিনি বিষবৃক্ষে বলিয়াছেন, "আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয় ইহার লক্ষ যোজন সিঁড়িও নাই।" 'সামান্য কাব্য', অর্থাৎ মহাকাব্য নহে। তিনি বিনয় করিয়া বলিলেও আমরা মনে করিতে পারি তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাস সত্যই এক একখানি সামান্য কাব্য অর্থাৎ এক একটী 'লিরিক'-গুচ্ছ। চন্দ্রশেখর তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ভীমা পুষ্করিণীর অল্পান্ধকার মধ্যে শৈবলিনী ধাতুকলসী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। বঙ্কিম বলিতেছেন,—'যিনি কখন রূপ দেখিয়া জল হইয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন কেমন করিয়া জল কলসী-তাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার শিঞ্জিতের তালে তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে কণ্ঠে স্কন্ধে হৃদয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া জল তরঙ্গ তুলিয়া তালে তালে নাচে।

রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমের মত রূপ দেখিয়া জল হইতে জানেন ; তাই তিনি "হৃদয়-যমুনা"য় আহ্বান করিতেছেন :—

যদি গাহন করিতে চাহ
এস হেথা নেমে এস গহন তলে,
সোহাগ তরঙ্গরাশি
অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি'
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে,
ঘুরে ফিরে চারি পাশে
কভু কাঁদে কভু হাসে
কুলু কুলু কল ভাষে কত কি ছলে।

হৃদয়-যমুনা ও ভীমা পুষ্করিণীতে একই কাব্যধ্বনি। চন্দ্রশেখর-'লিরিক'-গুচ্ছের সূত্র হইতেছে শৈবলিনীর অনবদ্য দিব্য রূপ। প্রেম রূপায়তন হইলে পূর্ণভাবে স্ফূর্ত্তি পায়। কবির মতে রূপের মন্দিরেই প্রেমের পূজার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। শৈবলিনীর রূপে কোথাও কামনা বা ভোগের কথামাত্র নাই, তথাপি এও সেই নারীর দেহ-সৌন্দর্য্যের মহিমাকীর্ত্তন। লালসালোলুপতার অবতারণা না করিয়া শিল্পী ইহাই দেখাইয়াছেন যে রমণীরূপ দেহ দিয়াই ভোগ করিবার জন্য সৃষ্টি হয় নাই ; তাহা এমন অপরূপ যাহা যুগ যুগ দেখাইয়া ও দেখিয়া 'নয়ন না তিরপিত ভেল'।

শৈবলিনীর রূপ-বর্ণনা মামুলি রকমে আরম্ভ হয় নাই। প্রথম তাহার রূপের আভাস পাই যেখানে কবি বলিতেছেন, "শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূরিতে লাগিল। কিন্তু বিবাহ হয় না, সে অরণ্য মধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে ?" শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা ছিল। তাহার পর প্রতাপ ও শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে সন্তরণের দৃশ্য :—

"বর্ষাকাল, কূলে কূলে গঙ্গার জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল। ফেন-চক্র-মধ্যে সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয় রজতাঙ্গুরীয়-মধ্যে রত্ন-যুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল।" প্রকৃত আর্টিস্টের চক্ষু লইয়া দেখিবার ও পাঁচজনকে ডাকিয়া দেখাইবার মত দৃশ্য! যুগল নবীন তনু রত্নযুগলের ন্যায় ফেন-চক্র মধ্যে শোভা পাইতেছে। কিন্তু সে ফেন-চক্র লালসা-সঞ্জাত নহে ; বর্ষার দুকূলপ্লাবিনী গঙ্গার তরঙ্গসঞ্জাত। জলের পটভূমিতে নারীদেহের লাবণ্য আঁকিতে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। বারুণী পুষ্করিণীর তীরে জল-নিষেক নিরতা পাষাণসুন্দরীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, গোবিন্দলাল দেখিয়াছিলেন—"জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন স্বচ্ছ স্ফটীক-মণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।" আর এক প্রদোষকালে উদ্যান-মধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দ ভাবিতেছে, "নগেন্দ্র আমার রূপ দেখিয়া ভালবাসেন ? রূপ ? দেখি। এই কহিয়া কালামুখী স্বচ্ছ সরোবরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল।" পরে নগেন্দ্রনাথের ধ্যান করিতে করিতে সে স্থির করিল ডুবিয়া মরিবে :—

"অন্ধকারে কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবর-সোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। কুন্দ দেখিল। সে অন্ধকারে দেখিবামাত্র চিনিল—নগেন্দ্র! কুন্দের মরা হইল না।" তিনটী দৃশ্যই সুন্দরী রমণীর জলে আত্মহত্যার চেষ্টা। রোহিণী ডুবিয়াছিল জমীদার-ভবনের ঘাসের ফ্রেমে আঁটা বারুণী পুষ্করিণীতে, আর গোবিন্দলাল দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিল স্রস্তবসনা সুগঠিত পাষাণ সুন্দরীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া। কুন্দনন্দিনীও ডুবিতে গিয়াছিল অর্থশালী অভিভাবকের অন্দরস্থ উদ্যানবাটীতে; নগেন্দ্র তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল চোরের মত, অন্ধকারে। আর কুশলী শিল্পী শৈবলিনীর আত্মহত্যার চেষ্টা দেখাইলেন—বর্ষার গঙ্গায়। তখন তাহার অনুপম কিশোর তনু সন্তরণ-পটু প্রার্থিতের পাশে তরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত। শৈবলিনী রোহিণী নয়, কুন্দ নয়; তাই তাহার জন্য বারুণী নয়, উদ্যান মধ্যস্থ বাপী নয়, একেবারে চন্দ্রশেখরের জটা-বন্ধন-সংক্ষুব্ধ বর্ষার গঙ্গা। সন্ধ্যার নিভৃত অন্ধকারে নহে, উজ্জ্বল দিবালোকে,—যখন গঙ্গার ঘাটে অবশ্যই গ্রামস্থ সমাজরক্ষক ও নীতিশিক্ষকগণ সদলে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। আর তাঁহারাও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। কারণ দেখিতেছি,—"তাহারা সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুইজনের কেহ শুনিল না, চলিল।" গঙ্গার তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে যাইতে তটস্থ সমাজনীতির দিকে চাহিয়া কৈশোর-প্রেমের এ কত বড় 'চ্যালেঞ্জ'! অথচ আর্টিস্টের কৌশলে তাহা কেমন নিরীহভাবে সংঘটিত হইয়া গেল!

এই 'চ্যালেঞ্জ' রক্ষা করিয়া জয়ী হইতে হইলে তদুপযোগী অস্ত্র চাই। সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী সেই নারীরূপ সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহা মুনির মৌন ও ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ করে। নানা কাব্যচ্ছটায় সেই রূপের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস না পাইয়া কবি অতি সংক্ষেপে বলিলেন,—"চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।" এই চন্দ্রশেখর কে? তিনি মাতৃবিয়োগের পর অধ্যয়ন অধ্যাপনার অসুবিধা ঘটিতেছে দেখিয়া দারপরিগ্রহ করিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আর সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,—"যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না; কেন না সুন্দরীর দ্বারা মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল, চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন।" শৈবলিনীর রূপ বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে চন্দ্রশেখর বোর্ডিঙে বাস-করা পরিণয়বন্ধনে অনিচ্ছুক গ্রাজুয়েট্-সংযমী নহেন। কবি তাঁহাকে যে নাম দিয়াছেন তিনি সে নামের মর্য্যাদা রাখিবার অধিকারী। কিন্তু তখনও শৈবলিনী মুকুল মাত্র।

তাহার আট বৎসর পরে বেদগ্রামে ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে কবি আমাদের চোখের সম্মুখে শৈবলিনীর রূপ সর্ব্বপ্রথম ফুটাইয়া তুলিলেন। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা আভাসে ইঙ্গিতে ছিল।

"ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্রবসনে কবরীসমেত মস্তকের অগ্রভাগ মাত্র আবৃত করিয়া প্রফুল্লরাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘমধ্যে অচলা সৌদামিনী ফুটিল—ভীমার সেই শ্যাম তরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল।" জলমধ্যে মহিমময়ী নারীমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার সাধ কবি হৃদয়ে একান্ত প্রবল। ইহার মধ্যে 'প্রফুল্লরাজীব' 'অচলা সৌদামিনী' 'স্বর্ণকমল' প্রভৃতি উপমাগুলির প্রয়োগ তোমার আমার লালসা ও কামনাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিতেছে। আর "ফষ্টর চলিয়া গেলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে জল-কলস পূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্ত-পবনারূঢ় মেঘবৎ মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।" অর্থাৎ

যে রূপের জন্য প্রতাপ ডুবিয়া মরে, যে রূপ চন্দ্রশেখরের সংযম ভাঙ্গিয়া দেয়, সে দিব্যরূপ তুমি আমি ফষ্টরের বহু উর্দ্ধ দিয়া "বসন্ত পবনারূঢ় মেঘবৎ" ভাসিয়া গেল। তুমি আমি সে রূপ দেখিয়াই সুখী। মূঢ় ফষ্টর স্পর্শ করিতে গিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়াছিল, এবং চিরমুমূর্ষু অবস্থায় জীবনধারণ করিয়াছিল।

তাহার পরই কবি চন্দ্রশেখরকে সঙ্গে করিয়া বেদগ্রামের শয্যাগৃহে "দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতি বিস্ফারিতনেত্রে সুপ্ত শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে। বাতায়ন পথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন তাঁহার গৃহ-সরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। দেখিলেন চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড় কৃষ্ণভ্রূযুগলতলে মুদ্রিত পদ্মকোরক সদৃশ লোচন-পদ্ম দুটি ফুটিয়া রহিয়াছে; সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপর কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে কর সংস্থাপনের কারণে সুকুমার রসপূর্ণ তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্‌ভিন্ন করিয়া, মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন কি সুখস্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল,—যেন একবার জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল। আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তিসুস্থির হইল। সেই বিলাসচাঞ্চল্যশূন্য সুষুপ্তিসুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল।"

এই দুর্ল্লভ রূপ দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া বহুযুগ ধরিয়া দেখিলেও যেন তৃপ্তি হয় না। ও যেন মর্ত্ত্য ও ধরণীর অনেক উপরের রূপ। আপনার সৃষ্টির আনন্দে কবি বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন—চন্দ্রের আলোকে পদ্ম ফুটিতেছে, জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ খেলিতেছে, খেয়াল নাই। রূপ দেখিয়া সাশ্রুনেত্রে চন্দ্রশেখর আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন। শাস্ত্রানুরাগী স্বভাবসংযত চন্দ্রশেখর সেদিন স্পষ্ট অনুভব করিলেন—তাঁহার অন্তর বাহির, সমস্ত ও সর্ব্বস্ব দান করিলে ও ওই অমরাদুর্লভ রূপের যোগ্য প্রতিদান হয় না —তাই তাঁহার চোখে অশ্রু আসিল। শৈবলিনীর অন্তরের সুখ পিপাসা তিনি মিটাইতে পারিবেন না— এই চিন্তা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল ইহা সত্য; কিন্তু অশ্রুর গূঢ়তর কারণ এই যে বিগত-যৌবন দেহের অন্তরে যে প্রেম বাস করে, তাহা যত স্নিগ্ধ ও গভীর হউক না কেন, ওই বিলাসচাঞ্চল্যশূন্য সুষুপ্তিসুস্থির নবযৌবনার রূপের পার্শ্বে তাহা বঞ্চনা মাত্র। যৌবনকে রূপকে কবি এতই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন যে তাঁহার চন্দ্রশেখর বলিতেছেন,—"তবে কি ওই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?" সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী নিষ্ঠাবান্ পবিত্রচিত্ত প্রেমপরায়ণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর স্বীকার করিতেছেন তিনি ওই রূপ ঘরে আনিয়া পাপ করিয়াছেন। যৌবন-বর্জ্জিত চন্দ্রশেখরের বিবাহিত প্রেম পাপ, আর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে শৈবলিনীর রূপ-যৌবন! সেই রাত্রিতে শৈবলিনীর রূপের দিকে চাহিতে চাহিতে চন্দ্রশেখরের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল;—তিনি মানসফলকে ক্ষণিকের তরে যেন ভবিষ্যৎ পাঠ করিয়াছিলেন। অন্তরে বাহিরে পরোক্ষে প্রত্যক্ষে অসামাজিক ও সামাজিক উভয়বিধ উপায়ে শৈবলিনী অতি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল ইহাই আমরা সকলে জানি। কিন্তু সে কাহার পাপের? কবি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ও বলাইয়াছেন শৈবলিনী পাপিষ্ঠা! সে নিজ-পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত কাব্যের ইঙ্গিত কি তাহাই? কাব্যের প্রাণ তাহার ইঙ্গিতের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে। চন্দ্রশেখর বলিতেছেন তিনিই পাপ করিয়াছেন, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত ত তাঁহারই প্রাপ্য ছিল।

তাহার পর দেখি—কুঠিয়াল ফষ্টর কর্ত্তৃক শৈবলিনীর অপহরণ। ইহাতে শৈবলিনীর যোগ ছিল। যেদিন প্রতাপ ডুবিয়াছিল, অপ্রাপ্তবুদ্ধি শৈবলিনী ডুবিতে পারে নাই—ভয় পাইয়া ভাবিয়াছিল—'প্রতাপ আমার কে?' আজ প্রস্ফুটিত যৌবনে সে বুঝিয়াছে—প্রতাপ তাহার কে, তাই সে পূর্ব্ব অপরাধের প্রথম প্রায়শ্চিত্ত করিতে কলঙ্কসাগরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবার প্রয়াস পাইল। বাহ্যতঃ আমরা দেখিয়াছি ভাগীরথীবক্ষে সুসজ্জিত নৌকায় শৈবলিনী ভাসিয়া চলিয়াছে—কিন্তু সে জানে সে ডুবিতেছে; একমাত্র আশা আছে প্রতাপও তাহার সহিত ডুবিবে। পরে তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়াছিল; প্রতাপ তাহার সঙ্গী হয় নাই। প্রথমবারে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, শৈবলিনী ডুবিতে পারে নাই। এবার শৈবলিনী ডুবিল, প্রতাপ ডুবিতে পারিল না। মুঙ্গেরে প্রতাপের শয্যাগৃহে দুজনের সাক্ষাৎ। প্রতাপ দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া শৈবলিনী কাঁদিল। কিন্তু প্রতাপ যখন বলিলেন "আমি তোমার কি করিয়াছি?" তখন শৈবলিনী গর্জিয়া উঠিল। বলিল "কেন তুমি তোমার এই অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? তুমি কি জান না—তোমার রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশাতেই গৃহত্যাগিনী হইয়াছি। নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

এ পক্ষেও সেই অতুল্য দেবমূর্ত্তির কথা, সেই রূপের ধ্যান। প্রতাপের রূপের কথা দিয়াই গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছিল। সে তখন ষোল বছরের কিশোর। তাহার "পদতলে নবদুর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া এক ক্ষুদ্র বালিকা নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া, আকাশ, বৃক্ষ, নদী দেখিয়া আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল।" আট বৎসরের বালিকা শৈবলিনীর চক্ষু আকাশনদীবৃক্ষময় তাহার ক্ষুদ্র জ্ঞানের জগৎ ঢুঁড়িয়া সে মুখের তুলনা পাই না; তাই পুনরায় সেই মুখেই তাহার একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। প্রতাপের মূর্ত্তি চিরদিনই শৈবলিনীর ধ্যানের বস্তু হইয়া রহিল।

সেবারও দুজনে পরস্পরের জ্ঞাতিত্বের ঐহিক গ্রাম্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি অপরজীবনে মিলন ঘটে, এই আশায় গঙ্গায় ডুব দিয়াছিল। এবারও শৈবলিনীর সেই আশা। ভিন্ন উপায়ে সেই সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া প্রতাপের সহিত মিলিত হইবার আশায় কলঙ্কে ডুব দিয়া সে সামাজিক আত্মহত্যা করিল। কিন্তু সেবার শৈবলিনী পিছাইয়া পড়িয়াছিল, এবার পিছাইল প্রতাপ। 'প্রতাপ বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া সেস্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।'

কিছুপূর্ব্বে প্রতাপ বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বর জানেন তোমাকে সর্প মনে করিয়া তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।" কিন্তু দংশন যখন আসিল তখন আর সর্পদংশন নহে, কবিচিত্তের চিরদিনকার আদরের উপমা—বৃশ্চিকদংশন! দীর্ঘদিন ধরিয়া সমাজ-বুদ্ধির উপাসনারত চিত্তসংযমপরায়ণ প্রতাপ সহসা রূপায়তন প্রেমের বলিষ্ঠ নগ্নমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় পাইয়া পলাইল। ইহাকে তাহার 'ময়াল সেন্স' বা নৈতিক বুদ্ধির জয় বলিলে ভুল করা হইবে। শৈবলিনীর সঙ্গ পাপাসঙ্গ বলিয়া প্রতাপ ক্ষোভে লজ্জায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, ইহাও সত্য নহে। সেদিন প্রতাপের অন্তরে শৈবলিনী যদি দুষ্কৃতিকারিণী পাপিষ্ঠা বলিয়াই আবিষ্কৃতা হইত, তবে প্রেমের বেদী ভূমিসাৎ হইত। মরিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নে "সুপ্তসিংহ জাগিয়া উঠিত না।" আমরা প্রতাপের মুখে শুনিতে পাইতাম না—"তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী! ষোড়শ বৎসর ধরিয়া আমি শৈবলিনীকে

কত ভালবাসিয়াছি।" আসল স্থানে আঘাত পড়িলেই শৈবলিনীও 'গর্জ্জিয়া উঠে,' প্রতাপও 'সুপ্তসিংহ জাগিয়া উঠে'।

শৈবলিনীকে সৃষ্টি করিয়া অবধি কবি তাহার রূপ দেখিয়া ও দেখাইয়া যেন তৃপ্তি পাইতেছেন না। বেদগ্রামে চন্দ্রশেখর সুপ্ত শৈবলিনীর রূপ দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে প্রতাপের শয্যাগৃহে কবি আবার সেই সুপ্ত শৈবলিনীর দেহসুষমা দেখিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। প্রতাপ দেখিতেছেন,—

"শ্বেতশয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালের গঙ্গার স্থির শ্বেতবারিবিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থিরশোভা দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয়বশ্যতা প্রযুক্ত যে তাঁহার চক্ষু ফিরিল না, এমন নহে—কেবল অন্যমনবশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মন্থিত করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।"

এই কি কুলত্যাগিনী পাপিষ্ঠা রমণীর রূপবর্ণনা? এই কি সেই সর্প, যাহার বিষের ভয়ে প্রতাপ বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন? সে সর্প, সে বিষের পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের রোহিণীর নিকট যাইতে হয়।

তাহার পরক্ষণে শৈবলিনী জাগিয়া উঠিয়াই প্রতাপকে দেখিয়া যখন পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন তখন, "প্রতাপ জল আনিয়া মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—সে মুখ শিশিরনিষিক্ত পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল কেশগুচ্ছসকল আর্দ্র করিয়া ঋজু করিয়া ঝরিতে লাগিল। কেশ পদ্মাবলম্ব শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।"

শৈবলিনীর রূপের বর্ণনায় কবির গঙ্গাজল ও পদ্ম ছাড়া যেন আর কোন উপমা পছন্দ হয় না। সুপ্তা শৈবলিনী প্রতাপের চক্ষুতেও 'গঙ্গার স্থির শ্বেতবারিবিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে!' গোলাপ নয়, চম্পক নয়, পদ্ম। পদ্মরাশি তাও আবার শ্বেত পদ্মরাশি! লালসাকামনার স্পর্শ হইতে এ রূপ অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। প্রেমের যে মহীয়সী মূর্ত্তি এই উপন্যাসে পরিকল্পিত হইয়াছে, শ্বেতপদ্ম ভিন্ন অন্য আসন তাহার উপযোগী হইত না।

আর মূর্চ্ছিতা রোহিণীর বর্ণনায় কবি লিখিতেছেন—

"বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারী প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। গণ্ড এখনও উজ্জ্বল; অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল।" রোহিণী শৈবলিনী নয়, তাই মৃতদেহেও তাহার অধর এখনও মধুময় বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল।

কিন্তু প্রতাপ সেই মনোমোহিনী রূপ দেখিয়া 'বিমুগ্ধ', চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। প্রতাপ অবশ্যই ভুলেন নাই গঙ্গায় ডুবিতে গিয়া শৈবলিনী প্রতাপকে ডুবিতে বলিয়া নিজে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। এতবড় অমার্জ্জনীয় অপরাধ প্রতাপ মুহূর্ত্তের জন্য গ্রহণ করেন নাই। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ইহা অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে। ইহার কৈফিয়ৎ কবি কোন স্থানে না দিয়া ইঙ্গিতে যেন ইহাই বলিতে চাহেন—যে-দিব্যরূপের অধিকারিণী হইয়া শৈবলিনী সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে কি কোন অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে? এ অতুল্যরূপ যে-প্রেমের উদ্দীপক, তাহা আপনার ঔদার্য্যে রূপান্বিতার অন্তরের সমস্ত দৈন্য দুর্ব্বলতাকে যদি সস্নেহে আবৃত করিয়া না রাখিল তবে কিসের সে রূপ? চন্দ্রশেখরও

এই রূপ দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন শৈবলিনীর অন্তর যদি বিবাহিত স্বামীর প্রতি প্রেম পোষণ করিতে না পারে তবে সে অপরাধ স্বামীর! চন্দ্রশেখর পুঁথিঘাঁটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তথাপি হিন্দুনারীর পক্ষে অন্তরের দিক হইতে সামাজিক বিধিবিরুদ্ধ এত বড় স্খলনের সম্ভাবনাকে তিনি অপরাধ বলিয়া কল্পনা করিতে পারিলেন না, কারণ সেই তথাকথিত অপরাধী অন্তরের বাহিরে রহিয়াছে অনুপম রূপের আধারভূত একটি পরমসুন্দর নারীদেহ! তিনি বালিকা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করেন নাই। অতিসুলভ কোন কৃষ্ণাঙ্গী প্লীহোদরা ব্রাহ্মণ বালিকার পাণিগ্রহণ করিলে, তিনি অপরাধের কথা মনেও আনিতেন না। তাঁহার অপরাধ, তিনি রূপের অমর্য্যাদা করিতেছেন। সমস্ত ব্যাপার জানিবার পরেও তিনি বলিয়াছিলেন শৈবলিনী নিষ্পাপ। শৈবলিনীকে তিরস্কার করিয়া সুন্দরী বলিয়াছিল—"ঝড়ে হউক, তুফানে হউক, নৌকা ডুবিয়া হউক, মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।" রূপসীর বাড়ীতে আসিয়া সুন্দরী "আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া শৈবলিনীকে গালি দিল, প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় সুন্দরী রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা হতভাগিনী আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। একদিন রূপসী বলিল—তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন? সুন্দরী বলিল—তার মুণ্ডপাত করিব ব'লে—তাকে যমের বাড়ী পাঠাব ব'লে—তার মুখে আগুন দেব ব'লে! রূপসী বলিল—দিদি তুই বড় কুঁদুলী। সুন্দরী উত্তর করিল,—সেইত আমায় কুঁদুলী করেছে।" কুলত্যাগিনী গৃহপ্রত্যাগমনে অনিচ্ছুক গৃহস্থ বধূর প্রতি অপরা গৃহস্থ বধূর এমন স্নেহের আকর্ষণ কোথা হইতে আসে? নবাব দেখিতেছেন—এরূপ লোকবিমোহিনী তাঁহার অন্তঃপুরে কেহই নাই। ইংরাজনৌকার খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে তাহার ক্ষুধানিবারণের উপায় করিতে ব্যগ্র হয়। 'হৃষ্টচিত্তে,' কারণ শৈবলিনী পরমা সুন্দরী। আমিয়ট বিনাদ্বিধায় প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার আদেশ দেয়। কারণ "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়।" বহুদিনের জন্য হোক, বা অল্পক্ষণের জন্যই হোক, যে শৈবলিনীর সংস্রবে আসিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। যাহার প্রতি সে অপরাধ করে সে তাহা গ্রহণ করে না। বাল্যে তারা গণিবার সময় সে মিথ্যা কথা কহে, কৈশোরে প্রতাপকে ডুবাইয়া নিজে ডুবে না, যৌবনে সে বিবাহিত জীবনে নিষ্ঠাহীন, কুলত্যাগকারিণী। শতবার করিয়া তাহাকে পাপিষ্ঠা বলা হইয়াছে। তথাপি সকলেই তাহার প্রতি স্নেহশীল! এমনটি ঘটিতে পারিয়াছে তাহার কারণ সে অপার্থিব রূপে রূপবতী। প্রতাপের প্রেমও যে স্বার্থশূন্য হইয়া মর্ত্ত্যের সমস্ত উচ্চতাকে তুচ্ছ করিয়া স্বর্গাভিমুখী হইতে পারিয়াছিল, তাহারও মূলে আছে শৈবলিনীর রূপ—যাহা মানুষকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করে। সুগঠিত সুন্দর মন্দিরেই শ্রেষ্ঠ প্রেমবিগ্রহের অধিষ্ঠান শোভন ও সম্ভব। তাই প্রতাপের শৈবলিনী অমন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে।

মুর্শিদাবাদযাত্রার পূর্ব্বরাত্রিতে চন্দ্রশেখর নূতন দৃষ্টিতে শৈবলিনীর রূপ দেখিয়া কাঁদিয়া গিয়াছিলেন। বেদগ্রামে ফিরিবার সময় সহসা শৈবলিনীকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন—"আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতে ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব। কতক্ষণে শৈবলিনীকে দেখিব?" চন্দ্রশেখর পুঁথিগত বিদ্যার বলে যাহাকে মোহ বলিতেছেন, তাহাই রূপাশ্রিত প্রেমের সুমধুর প্রথম প্রকাশ।

কিন্তু গৃহে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন গৃহ শূন্য, শৈবলিনী নাই! তখন "সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি একে একে আনিয়া একত্র করিলেন।···অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ ইতিহাস কাব্য অলঙ্কার ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল। মন্নু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।" যাহাদের মোহে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর রূপকে মোহ মনে করিয়াছিলেন আজ প্রথমেই সেই সব মোহজাল তিনি স্বহস্তে ছিন্ন করিলেন। সমাজ ও মানুষকে শাসন করিবার জন্য যে সব শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল চন্দ্রশেখর যেন তাহা সমস্তই ভস্মীভূত করিলেন। অবশিষ্ট রহিল শৈবলিনীর রূপনির্দ্দেশিত আপন হৃদয়শাস্ত্র। চন্দ্রশেখর গৃহত্যাগ করিয়া নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তভার নিজেই গ্রহণ করিলেন।

উদয়নালার যুদ্ধে প্রতাপ যখন অশ্বপৃষ্ঠে মৃত্যু বরণ করিতে ছুটিলেন, তখন চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ। কুলত্যাগিনী শৈবলিনীর সমস্ত পাপ তখন চন্দ্রশেখর পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। তিনি বাষ্প-গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে প্রতাপকে বলিলেন—'এক্ষণে জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব।' সুতরাং চন্দ্রশেখরের মতে শৈবলিনীর মানসিক পাপ পাপই নহে—যখন দৈহিক পাপ ঘটে নাই। তথাপি শৈবলিনীর অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের কেন প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে আবার আমাদের গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে হইবে, যেখানে ইংরাজের নৌকায় বন্দী প্রতাপ অপরিচিতা উন্মাদিনীর জন্য ভাত বাড়িতে গিয়া দেখিল—শৈবলিনী! প্রতাপ মানিল—বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে। তাহার পর শৈবলিনীর বুদ্ধিতে চলিয়া উভয়ের পলায়ন ও চন্দ্রকরোজ্জ্বল ভাগীরথীর বক্ষে আবার সাঁতার।

"দুই জনে সাঁতারিয়া অনেক দূরে গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! প্রতাপ ডাকিল—শৈবলিনী, শৈ! শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল। সে যত বৎসর 'শৈ' শব্দ শুনে নাই, তাহার সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল—প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

চক্ষু মুদিয়া মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিয়া শৈবলিনী কোন্‌ শপথ গ্রহণ করিল বা কোন্‌ নিবেদন জানাইল? কবি স্পষ্টভাবে তাহা না বলিলেও পরের কথোপকথনে তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। সেদিন শৈবলিনী প্রতাপকে বাঁচাইয়া নিজে ডুবিতে মনস্থ করিয়াছিল, তাহার কৈশোরের অপরাধ ক্ষালন করিতে সে প্রথমে সম্ভবতঃ ঐ শপথ লইয়াছিল। কিন্তু সহসা 'শৈ' সম্বোধনে তাহার আশা জাগিল, হৃদয়ের মরা গাঙে আবার চাঁদের আলো ফুটিল। তাই বুঝি চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিয়া নিবেদন করিল—তোমরা আমার অপরাধ লইও না, শপথরক্ষা করিতে পারিলাম না, আজিও আমার মরা হইল না। তখনও সে জানে না বিধাতা তাহার অদৃষ্টে কি গুরুতর নৈরাশ্য লিখিয়া রাখিয়াছেন।

প্রতাপ বলিল—তবে মনে আছে যে আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল—কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।

প্র। আমি উঠিব না! আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়, নিশ্চিত ডুবিব—তোমার হাত।

শৈ। কি চাও প্রতাপ? যা বল তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ?

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ?

শৈ। কাছে আসিয়া হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল।

প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেম, বুঝি গঙ্গার অপেক্ষা পবিত্র, ধর্ম্মেরও উপরকার কথা। সেই প্রেমের বিগ্রহ প্রতাপকে স্পর্শ করিয়া শৈবলিনীকে শপথ করান হইতেছে। কবি বলিতে চাহেন—ঐ শপথের সাক্ষী মামুলি গঙ্গাজল বা চন্দ্রতারা নহে। সমস্ত সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম এমন কি মানব প্রকৃতিও যদি ইহার বিরোধী হয়, তথাপি প্রতাপের হাতে হাত দিয়া শৈবলিনী যে শপথ করিল তাহা অপ্রতিপালিত থাকিতেই পারে না; কারণ তাহা হইলে সে প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। এখানে কবি যেন স্বয়ং শপথ লইতেছেন—"সমস্ত বিশ্বনিয়ম যদি আমার শক্তির বিরোধিতা করে, তথাপি আমি তোমাদের শপথ রক্ষা করিতে সাহায্য করিব, যেহেতু এই প্রেম অপেক্ষা পবিত্রতর উচ্চতর নীতি আমি কল্পনা করিতে পারি না।"

প্রতাপের হাতে হাত রাখিয়া শৈবলিনী বলিল—এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি।—কতকাল পরে প্রতাপ?

প্র। আমার শপথ কর—নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এই পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? (পাপজীবন অর্থ অবশ্য সামাজিক জীবন।)

শৈ। তোমার শপথ—কি বলিব?

প্রতাপ অতি ভয়ঙ্কর শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তকর। শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল—এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ?

প্র। আমি। (শৈবলিনীর অসংযমজাত ও আপনার সংযমজাত-দুঃখ প্রতাপের চক্ষে সমান।)

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে, ধন আছে, কীর্ত্তি আছে, বন্ধু আছে, ভরসা আছে, রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না,—আইস, তবে দুইজনে ডুবি। শৈবলিনীর জীবন-নদীতে, প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। 'আমি মরি' তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন? প্রকাশ্যে বলিল 'তীরে চল'।

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল। তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল, শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ উঠিল।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ—আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ! আমি তোমাকে চাহি না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল। বলিল—প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর, প্রতাপ শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ, আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতেই আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতেই আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল। প্রতাপের মরণবাঁচন শুভাশুভের সমস্ত দায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল। কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল।

প্রতাপের হাতে হাত দিয়া শৈবলিনীকে শপথ করিতে হইল—তোমায় ভুলিব অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াই ভুলিব। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? কবি নিজেই বলিয়াছেন—ইহা অসাধ্য। কিন্তু প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে হইবে, সেই অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। তাই প্রায়শ্চিত্ত-খণ্ডের কল্পনা। সেই জন্যই রমানন্দের যোগবল, 'সাইকিক ফোর্স্', শৈবলিনীর নরকদর্শন ও মস্তিষ্কবিকৃতি। শৈবলিনীকে তাহার সামাজিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করান হয় নাই। তাহার পবিত্রতম প্রথম প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, অন্তরের অন্তরতমের হাত ধরিয়া সে যে শপথ করিয়া আসিয়াছে, সেই অসাধ্য শপথ-পালন সাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে জীবন্তে নরক-বরণ করিতে হইতেছে, উন্মাদ হইতে হইতেছে। যে ধ্যানমূর্ত্তি হৃদয়ে চিরকালের জন্য খোদিত হইয়া গিয়াছে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিতে হইবে, চিত্তফলক হইতে প্রতাপের মধুর স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে হইবে, তাহাকে ভুলিতে হইবে। প্রতাপকে ভুলিয়াই তাহাদের কিশোর জীবনের প্রেমকে মহীয়ান করিতে হইবে। ইহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে, পুণ্যের কঠিনতম পরীক্ষা। সর্ব্বসম্ভাবনাময় প্রেমরাজ্যেও ইহা অসাধ্যসাধনের পরিকল্পনা।

শপথ করাইয়া প্রতাপ শৈবলিনীকে লইয়া ছিপে উঠিল। পশ্চাদ্ধাবিত ইংরাজদিগের অনুচরদিগকে দূরে দূরে রাখিয়া বড় বড় নদীর তীরে তীরে নিভৃত স্থানে বিশ্রাম লইয়া ছিপ চলিতে লাগিল। তাহারই একদিন শেষরাত্রিতে শৈবলিনী অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইল। "এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলাইল। সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয় প্রতাপ এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই, আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য।" "শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।" শৈবলিনীর সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয় সমস্তই প্রতাপ। সেই প্রতাপে তাহার অধিকার গিয়াছিল চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহে; আশা গিয়াছিল মুঙ্গেরে, প্রতাপের সহিত সাক্ষাতে। তবে সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে পলায়ন করিবার কি নূতন কারণ ঘটিল? কবি বলিতেছেন, এখন তাহার প্রতাপের 'আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য।' পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর ধর্ম্মবুদ্ধি, সমাজবুদ্ধি সহসা জাগরিত হইবার এমন কোন হেতু দেখা যায় না, যাহাতে তাহার পক্ষে প্রতাপের আকাঙ্ক্ষা পরিহার্য্য মনে হয়। সুতরাং সেই বিংশতীবর্ষীয়া অসহায়া কিশোরী যে সংসার ছাড়িয়া দুর্গম শৈলারণ্যে পলায়ন করিয়াছিল—তাহা প্রতাপের আকাঙ্ক্ষা

পরিহার করিবার চেষ্টায়, তাহার সেই অসাধ্য শপথের সাধন-প্রয়াসে। রূপযৌবনে অসামান্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-শালিনী শৈবলিনী প্রণয়ীর চিন্তা পর্য্যন্ত পরিহারের শপথ গ্রহণ করিয়া আজ সামান্যা বালিকার ন্যায় নিঃসহায় ও হতবুদ্ধি! শৈবলিনী ক্ষতবিক্ষত চরণে শোণিতাক্ত কলেবরে ক্ষুধার্ত্ত পিপাসাপীড়িতা হইয়া গিরি আরোহণ করিতে লাগিল। 'এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া গিরিশ্রেণী তলস্থ বনরাজী সমস্তই ঢাকিয়া ফেলিল। আর পর্ব্বতারোহণের চেষ্টা বৃথা। শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিল। তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। শৈবলিনী বুঝিল বিষম নৈদাঘবাত্যা। ক্ষতি কি? এই পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষশাখা পত্রপুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না? প্রবল বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনতমস্তকে পার্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে শৈবলিনী বসিয়া,—মাথার উপর শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে।'

এই প্রলয়ানুকারী দৈবদুর্য্যোগের মধ্যে একান্ত অসহায় ভাবে বসাইয়া রাখিলেই যদি শৈবলিনীর পক্ষে প্রতাপকে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইত, তবে আর রমানন্দ স্বামীর প্রয়োজন হইত না। যদি সে রাত্রে শৈবলিনীর মৃত্যু ঘটিত তবে প্রতাপকে ভুলিয়া যাওয়া দূরের কথা, তাহারই স্মৃতির ধ্যান করিতে করিতেই দেহান্ত হইত। বাহিরের প্রলয়ে এ অঘটন ঘটিবার নয়, তাই অন্তরের প্রলয় ঘটাইবার জন্য যোগবলের আবশ্যক হইল। পরম সহানুভূতির সহিত কবিও শপথ লইয়াছিলেন যে শৈবলিনীর শপথ তিনি রক্ষা করিবেন—নচেৎ এই কাব্যের অন্তরে যে সুমহৎ প্রেমপরিকল্পনা রহিয়াছে তাহা ধূলিসাৎ হয়। সেজন্য "মানবহৃদয়সমুদ্রের কাণ্ডারীরূপী রমানন্দ স্বামীর মন্ত্রে শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।" কিন্তু সমস্ত প্রায়শ্চিত্তখণ্ডের মধ্যে এই চন্দ্রশেখর একেবারেই ছায়া, উপলক্ষ্য মাত্র। আর বিবাহিত স্বামীর প্রতি নারীমাত্রেরই অনন্যচিত্ততার যে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধি আছে, সবিস্তারে তাহার বর্ণন, বিশ্লেষণ ও পুনঃস্থাপন, সতীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন—এ সমস্তই কুশলী কবির কৌশল। তিনি প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ে যেন সমস্ত সমাজবিধাতা শাস্ত্রবেত্তা ও নীতি শিক্ষকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

পাপিষ্ঠার পাপের শাস্তি যথাযথ হইতেছে ত? আপনাদের শাস্ত্রে কি এতদপেক্ষা গুরুতর বিধান আছে? দেখুন আমি পূর্ব্বে যাহাই বলিয়া থাকি, এখন আপনাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত। সমাজদ্রোহিণী পাপীয়সীর প্রতি তিলমাত্র মমতা দেখান উচিত হইবে না। কিন্তু হরি হরি, আপনারাও অশ্রু মোচন করিতেছেন কেন? দেখুন আমার চক্ষু কেবল অশ্রুহীন নহে, হাস্যময়। তবে কি আপনারাও বলিতে চাহেন শৈবলিনীর প্রেম পাপ নহে? দেখুন, শৈবলিনী গোপনে পরপুরুষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া কুলত্যাগ করিয়াছিল। চন্দ্রশেখরের ন্যায় স্বামীকে যাহার মনে ধরিল না, ব্রাহ্মণকুলে তাহার মত পাপিষ্ঠা কে আছে? অতি কঠিন শাস্তিই তাহার প্রাপ্য। কিন্তু তাহার ধর্ম্মজীবন জাগরিত করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া চন্দ্রশেখরের উপযোগী ভার্য্যা করিবার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। আমি সেই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই করিতেছি। আপনাদের নির্দ্দেশমত আমি পাপপুণ্য তুলাদণ্ডে মাপিতে বসিয়াছি। আপনারা যাহা যাহা বলিতে বা করিতে চান, আমি তৎসমুদায় অধিকতর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ করিয়া ফুটাইয়া

তুলিতেছি। এখন আপনারাই যদি পাপিষ্ঠার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতি একান্ত সহানুভূতিসম্পন্ন হন, আর আমাকে নীতিবাদী বলিয়া নিন্দা করিতে থাকেন তবে আমি নাচার।

প্রায়শ্চিত্তখণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য শৈবলিনীচিত্তের কলুষমোচন করিয়া সমাজবিধি ও শাস্ত্রবিধির জয়গান নহে। শৈবলিনী-প্রতাপের প্রেমকে সকল বিধিনিষেধের উর্দ্ধে তুলিয়া তাহারই পূজারতি। সেই উদ্দেশ্য সাধনে কুশলী কবি তাঁহার শক্তির শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়াছেন। মানবমনের রহস্যময় গহনে সম্ভব অসম্ভবের প্রত্যন্ত দেশে স্বীয় প্রতিভাকে প্রেরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

চন্দ্রশেখর-পত্নী হইয়াও শৈবলিনী প্রতাপের প্রতি অনুরাগিণী ছিল এবং তাহার সহিত মিলিত হইবার আশায় ফিরিঙ্গীর সাহচর্য্যে গৃহত্যাগ করিতেও দ্বিধা করে নাই—এই মহাপাপের জন্যই কবি তাহার মহাপ্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া সমাজনীতির পূর্ণপ্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন—রসদৃষ্টিতে ইহা চরম নীতিবাদ। প্রতাপের নিকট প্রদত্ত শপথই এই তথাকথিত প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত হেতু ইহা বুঝিলেই নীতিবাদের অপবাদ খণ্ডিত হইয়া প্রেমবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়—যাহা সকল আর্টিস্টের কাম্য ও আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু তাহাতেও প্রশ্ন উঠিতে পারে—প্রতাপ যখন শৈবলিনীকে অমন দুঃসাধ্য শপথ করাইয়া লইল, তখনই ত তাহার মুখ দিয়া সামাজিক নীতিবাদের আদর্শ স্বীকৃত হইয়া গেল। প্রতাপই যদি চাহিয়া থাকে শৈবলিনী তাহাকে বিস্মৃত হইয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিতে থাকুক, তখনই ত কবি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছেন—যে-কোন অবস্থায় বিবাহিত জীবনের প্রেমকেই আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করা আর্টের পরম লক্ষ্য। কিন্তু রসদৃষ্টিতে দেখিলে চন্দ্রশেখরে নীতিবাদের এ দাবীও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝা যাইবে।

প্রতাপ চাহিয়াছিলেন—তাঁহাদের প্রেম ইহজন্মের মত পরস্পরের ত্যাগের দ্বারা, অচিন্তিতপূর্ব্ব আত্মবিলোপের দ্বারা মহীয়ান্ হউক। কবি গ্রন্থারম্ভে একান্ত ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন—বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত আছে। সমস্ত গ্রন্থখানি সেই বাল্যপ্রেমের অভিসম্পাত-কাহিনী। যে মুখ হইতে এই অভিসম্পাত নিঃসৃত হয় তাহা আমাদের অদৃশ্য বা অদৃষ্ট! কিন্তু যাহাদের হাত দিয়া তাহা পরিবেশিত হয় তাহারা আমাদের পার্শ্বচর। প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত পরিবেশন করিবার ভার সমাজ, চন্দ্রশেখর, রমানন্দ সকলে মিলিয়া লইয়াছিল। বাল্যকালে "শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা।" এ অবস্থায় প্রেমকে তাহার পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে হইলে কণ্টকময় ত্যাগের আসনেই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে,—এ শিক্ষা প্রতাপের রক্তে ছিল; শৈবলিনী সে কথা শেষ পর্য্যন্ত মানিতে চাহে নাই। অবশেষে শৈবলিনী গঙ্গাবক্ষে প্রতাপের মুখ হইতে আত্মবিলোপের সেই চরম ত্যাগমন্ত্র গ্রহণ করিল, অসাধ্য বুঝিয়াও শপথ করিল কারণ প্রতাপ জীবনের বিনিময়ে তাহা চায়। প্রতাপ ত্যাগের পরম অভিমানে ও প্রেমের চরম দাবীতে চাহিয়াছিল—একবৃন্তের দুটি ফুল,—যখন এই অভিসম্পাতময় জগতে না ফুটিতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—তখন এবারকার মত একটি রূপসীর খোঁপায়, অপরটি চন্দ্রশেখরের জটায় শুকাইয়া উঠুক্। ত্যাগের দ্বারাই প্রেমকে সার্থক করার যে চিরন্তন নীতি যুগে যুগে শত কবিকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, যাহার সহিত প্রকৃত রসদৃষ্টির কোন বিরোধ নাই, এখানেও সেই নীতি জয়যুক্ত হইয়াছে। ইহার সহিত সমাজ-রীতির পরিপোষকতার কোন সম্পর্ক নাই। পরিণতি যাহাই হউক,

অভিসম্পাত অভিসম্পাতই থাকে। গঙ্গাজলে হাতে হাত দিয়া প্রতাপের ইচ্ছাক্রমে শৈবলিনী শপথ করিল—'আজি হইতে তোমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভের দায় আমার।' বিবাহের এতদপেক্ষা মহত্তর মন্ত্র কোথায় কোন্ পরিণয়ে উচ্চারিত হইয়াছে? কি উপায়ে শৈবলিনী এই পবিত্র দায়ভার বহন করিবে? ইহ-জন্মের মত প্রতাপকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া। প্রতাপের ত্যাগনিষ্ঠ প্রেমই এই চরম আত্মবিলোপের পরিকল্পক এবং সে পরিকল্পনার মূলে আছে আপনাদের প্রেমের শক্তির প্রতি অসীম বিশ্বাস, শৈবলিনীর নিকটে প্রতাপের এই চরম দাবী করিবার অধিকার। কিন্তু এই অভিসম্পাতময় জগতে সেই দুঃসাধ্য পরিকল্পনাকে ব্যক্তরূপ দিবার মত শক্তি কোথায়? অতএব রমানন্দের যোগ-শক্তির সাহায্য লইতে হইল। প্রেম-শক্তির আইডিয়ালিজম্‌' যাহা মুহূর্ত্তে পরিকল্পনা করিল, যোগ-শক্তি সুদীর্ঘ অধ্যবসায়ে তাহাই সংসাধন করিল। নচেৎ সমাজ-ধর্ম্মের রক্ষণাভিপ্রায়ে অসতীকে সতী বানাইবার জন্য যোগবলের সাহায্য লওয়া হয় নাই।

রমানন্দ স্বামীর নির্দ্দিষ্ট প্রচলিত বিধি পালন কালে অনাহারে একাগ্রচিত্তে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল। কবি বলিতেছেন বিকৃতি নয়—দিব্যচক্ষু। সেই দিব্যচক্ষুতে শৈবলিনী দেখিতেছে—চন্দ্রশেখর অসীম রূপবান্। তাঁহার 'ললাট প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট—যেন সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন। ইহার কাছে প্রতাপ? ছিঃ! ছিঃ! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা?' শৈবলিনীর দিব্য চক্ষুতেও প্রতাপ গঙ্গার অপেক্ষা নিকৃষ্ট অপবিত্র কিছু হইতে পারিল না! এই প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায় আছে বলিয়া যিনি বলেন চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নীতিশিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রসবোধে আস্থা রাখা কঠিন। যদি তাহাই হইত তবে মুমূর্ষু প্রতাপকে দিয়া তিনি গ্রন্থশেষে সর্ব্বশাস্ত্রনীতিবিদ্ প্রায়শ্চিত্ত বিধানদাতা রমানন্দ স্বামীকে অমন বোকা বানাইতেন না।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "শুন বৎস, আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয় জয়ের তুল্য হইতে পারে না। তুমি কি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

মনস্তত্ত্ববিৎ স্বামীজী নিজের মতো করিয়াই প্রতাপের অন্তঃকরণ বুঝিয়াছিলেন। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসে কিনা সে সংবাদ সঠিক না জানিয়াও তিনি ইন্দ্রিয়জয় ব্রহ্মাণ্ডজয় প্রভৃতি স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন,—"সুপ্তসিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ বলিষ্ঠ, চঞ্চল উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল। বলিল—কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে। কে বুঝিবে আজি এই যোড়শ বৎসর ধরিয়া আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম।"

প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধির পর রমানন্দের যোগশক্তিতে আচ্ছন্নচেতন শৈবালিনীকে চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:—

প্রতাপ কি তোমার জার?

শৈবলিনী—ছি! ছি!

চন্দ্রশেখর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে কি!

শৈবলিনী—এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন; অনেক ভাবিলেন। বলিতে লাগিলেন—"হায় হায় কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। স্ত্রী-হত্যা করিতে বসিয়াছিলাম!"

কুকর্ম্ম? স্ত্রীহত্যা? গুরুদেবের যোগবল সাহায্যে শৈবলিনীর মানসিক পরিবর্ত্তনের ও শুদ্ধিসাধনের ব্যবস্থার সহযোগিতা করা ছাড়া অন্য কি কুকর্ম্ম বা স্ত্রীহত্যার চেষ্টা চন্দ্রশেখর করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় না। এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বুঝিয়া প্রতাপ দেহত্যাগ করিলেন। শুদ্ধির পর প্রতাপের সহিত শৈবলিনীরও শেষ কথা—'প্রতাপ, এজন্মে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না, স্ত্রীলোকের মন অসার।' উভয়েই বলে—এজন্ম।—এজন্মে অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া পরজন্ম বরণ করিতে হইল। অর্থাৎ নীতি ও ধর্ম্ম এজন্মের ঐহিক মঙ্গল সাধন করিতে পারে; একমাত্র প্রেমই জন্মান্তরেও আমাদের অনুগমন করে। যদি তাহাই হয় তবে নীতি ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য শৈবলিনীর শুদ্ধি ঘটাইবার কোন গুরুতর প্রয়োজন দেখা যায় না; কেবল যোগশক্তির বাহাদুরী দেখান ইহার উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। প্রায়শ্চিত্তের নামে প্রতাপের নিকট প্রদত্ত বাক্যরক্ষাকল্পে ইহজন্মের গোণা কয়টী দিনের জন্য শৈবলিনীর চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া তাহার প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষাই কাব্যের অভিপ্রায়। সতী অসতীর কথা একেবারেই অবান্তর। সেই সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যে অন্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি ও তীব্র অনুভূতি আছে, তাহারই সাহায্য ও সুযোগ লইয়া কবি অপূর্ব্ব কৌশলে তরুণ হৃদয়ের সমাজনিরপেক্ষ প্রেমকেই মহোচ্চ দেশে স্থাপন করিয়াছেন। সে-প্রেম যখন ইহজন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিল, তখন প্রেমের মন্দিরও ধূলিসাৎ হইল। শুদ্ধির পর শৈবলিনীকে নবাব শিবিরে যখন প্রত্যক্ষ করিলাম তখন সে—"রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা, জীর্ণসঙ্কীর্ণ-বাসপরিহিতা, অরঞ্জিতকুন্তলা, ধূলিধূসরা। গায়ে খড়ি, মাথায় ধূলি, চুল আলুথালু, মুখে পাগলের হাসি, চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক দৃষ্টি।" যে দিব্যদেহ সৃষ্টি করিয়া অবধি কবি নানাছলে তাহাকে দেখিয়া ও দেখাইয়া তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, প্রেমের বিদায়ে সে-দেহ বিসর্জ্জিতপ্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় শূন্য পড়িয়া রহিল না, একেবারে কদাকার কুৎসিত হইয়া দেখা দিল! চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিবার পর শৈবলিনীর যেন দেহান্তরও ঘটিল। শৈবলিনী প্রতাপ একবোঁটায় দুইটি ফুল। চিরঅভিসম্পাতময় তাহাদের সেই শুভ্র বাল্য প্রেমের মহিমারক্ষার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়জয়, চিত্তসংযম প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়া কবি জীবিত শৈবলিনীর রূপান্তর, দেহান্তর ও চিত্তান্তর ঘটাইয়া প্রেমের বেদীতে সেই ফুল উৎসর্গ করিয়া দিলেন। স্বীয় প্রেমের গৌরবরক্ষা করিতে শৈবলিনী বাঁচিয়া থাকিয়াও প্রতাপকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেল, প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিতে লাগিল, ইহাই চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মর্ম্মচ্ছেদী ট্র্যাজেডি। ইহাতে কোন প্রচলিত সমাজনীতির প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণশয্যায় আনন্দজ্যোতি স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল। গতপ্রাণ প্রতাপের দিকে চাহিয়া কবি প্রার্থনা করিতেছেন প্রতাপ যেন শেই আনন্দধামে যায় যেখানে সমাজ নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই।

কিন্তু একান্ত বিস্ময় ও ব্যথার সহিত লক্ষ্য করি, কবি সেই অনন্তধামের বর্ণনা করিবার ঝোঁকে সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—প্রতাপ, "সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবে না।" প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসিতে চাহিবে না! এ তবে কোন্ শৈবলিনী? সম্ভবতঃ এ সেই অশেষ উপায়ে শুদ্ধীকৃতা ইহজীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিনের জন্য যোগবলে চন্দ্রশেখরানুরাগিণী শৈবলিনী, মৃত্যুবরণের যাত্রাক্ষণে চির-অশ্রুজয়ী প্রতাপ যাহাকে দেখিয়া 'নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন'। প্রতাপের হাত ধরিয়া প্রতাপের শৈবলিনী গঙ্গাজলে শপথ করিয়াছিল—'আজি হইতে শৈবলিনী মরিল'। যে শৈবলিনী তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সেদিন মরিয়াছে প্রতাপের চক্ষে অনন্তধামে তাহার একটিই যথেষ্ট; লক্ষের স্থান কোথায়? 'লক্ষ শৈবলিনী'র উল্লেখ দ্বারা কবি যদি এই ইঙ্গিত না করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে কমলাকান্ত আফিংএর ঝোঁকে একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রশ্ন

"বনফুল"

ফন্দী করি কবিতারে বন্দী করি ছন্দের শৃঙ্খলে
মনোরথে উড়াইয়া আনি তারে সাহিত্য-কাননে,
রাবণ একদা যথা এনেছিল সীতারে সিংহলে
রাক্ষসীয় বীর্য্য বলে—আখ্যায়িকা আছে রামায়ণে।

উপমা চেড়ীর দল অক্ষর-অশোক-বনে বসি'
সর্ব্ব-অঙ্গে ঝঙ্কারিয়া অনুপ্রাস-মিলের নিক্কণ
নিয়ম-তর্জ্জনী তুলি' কভু রুষি' কখনো বিহসি'
নানা তাল-লয়-মানে বন্দিনীরে করে নিরীক্ষণ।

নিত্য নব পটভূমি—কভু আলো, কভু অন্ধকার,
শ্যামল, উষর কভু, কভু চন্দ্র, কখনো সবিতা;
পাখী গাহে, পাখী থামে, ফুল ফোটে, ঝরে বারম্বার,
বিচিত্র বেষ্টনী মাঝে অধিষ্ঠিতা বন্দিনী কবিতা।

সবই ভালো :—ক্ষুদ্র প্রশ্ন আকুলিছে শুধু মনোবীণা
কবি-রাবণের লাগি অপেক্ষিছে কোন রাম কি না।

———

রহস্যময়ী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সুপ্রভার সঙ্গে সূর্য্যপ্রসাদের পরিচয় হ'ল অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। অন্ততঃ সূর্য্যপ্রসাদ এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

তখন সূর্য্যপ্রসাদের নতুন উপন্যাস "দীপান্বিতা" সবে বেরিয়েছে। বইখানি এর আগে একটা বিখ্যাত মাসিকপত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই অনেকে বইখানার প্রশংসা করেছিল। প্রশংসা ক'রেছিল পরিচিত বন্ধু মহল। তাদের প্রশংসা নতুন নয় এবং বোধ হয় যথেষ্ট নির্ভরযোগ্যও নয়। তার উপরে কিছু পরিমাণ বন্ধুত্বের চূণকাম আছেই নিশ্চয়।

ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তাক্ষরের একখানি খামের চিঠি একদিন হাতে এল। হস্তাক্ষর মেয়েলি ব'লেই মনে হ'ল। এসেছে তার প্রকাশকের কেয়ার-অফে এবং সেখান থেকে রি-ডাইরেকটেড হয়ে তার বাসায়।

সূর্য্যপ্রসাদ খামখানি ছিঁড়ে ফেললে ঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার "দীপান্বিতা" যখন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল তখনও পড়েছি। বই বার হতে আর একবার পড়লাম। আপনার লেখা আমার ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে। আমার যতদূর স্মরণ হচ্ছে, মাসিক পত্রে "দীপান্বিতা"র শেষে আরও একটি লাইন ছিল, "নয়নতারা ফিরে এসে দেখলে রমানাথ অঘোরে ঘুমুচ্ছে", কিম্বা এই রকম একটা কিছু। কিন্তু বইতে সেই লাইনটি নেই।

এ কি আপনি ইচ্ছা ক'রেই তুলে দিয়েছেন? এতে কি রমানাথের চরিত্রের অনেকখানি পরিবর্ত্তন হয়নি? আমাদের মনে হয়, ওই লাইনটিই বোধ হয় ছিল ভালো।

অপরিচিতা হ'লেও আমাকে আপনার অসংখ্য ভক্তের একজন ব'লে মনে করবেন। এই পত্রের উত্তর দিয়ে আমার সন্দেহ নিরসন করলে বাধিতা হব।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নিন। ইতি

বিনীতা

শ্রীসুপ্রভা রায়

সাহিত্য রচনা ক'রে এত আনন্দ সূর্য্যপ্রসাদ জীবনে কখনও পায়নি। সাহিত্য ক্ষেত্রে সে নবাগত নয়। অনেক লেখা সে লিখেছে, এবং অনেক বিখ্যাত লেখা। তার জন্যে লিখিত এবং মৌখিক অনেক প্রশংসাও সে লাভ ক'রেছে। কিন্তু এই মেয়েটির অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং নিরাভরণ প্রশংসা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তার লেখা এই মেয়েটির মতো এমন খুঁটিয়ে আর কে পড়েছে? কেই বা তার লেখার প্রত্যেকটি লাইন এমন যত্ন ক'রে মনে রাখতে পেরেছে? সূর্য্যপ্রসাদের এতদিনের সাহিত্য সাধনা এতদিন পরে একটি অপরিচিতা মেয়ের অর্ঘ্যে ধন্য হয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি বইখানা বার ক'রে দেখলে, সুপ্রভার অভিযোগ সত্য। শেষের লাইনটি তার অজ্ঞাতসারে কে উঠিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত প্রেসের প্রুফ রীডার। সূর্য্যপ্রসাদ নিজের লেখার প্রুফ নিজে দেখতে পারে না। ভালো লাগে না। লেখা শেষ হয়ে যাবার পর নিজের লেখা সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ থাকে না। বই যখন বেরোয় কোনো রকমে একটা প্রুফ সে দেখে,—দ্বিতীয় প্রুফটা। বাকি দুটো সে অনেক খোসামোদ ক'রে প্রেসের প্রুফ রীডারের ঘাড়েই চাপায়। এ ভুল নিশ্চয় সেই মহাপুরুষেরই কীর্ত্তি।

সূর্য্যপ্রসাদ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শেষ পাতাটা দেখতে লাগল। মারাত্মক ভুল সন্দেহ নেই। একটি লাইনের অভাবে রমানাথের চরিত্রটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে, একটু বদলেও গেছে। কিন্তু একটি লাইনের মূল্য অরসিক প্রুফ রীডার কি বুঝবে! বোধ হয় জায়গা হয়নি। একটি মাত্র লাইনের জন্যে আবার একটা পাতা খরচের ভয়েই বোধ হয় সেটিকে সে হত্যা করেছে। এ রকম লাইন-হত্যা সে অসঙ্কোচে দিনে সহস্রটা করে। একবারও হাত কাঁপে না।

সূর্য্যপ্রসাদ মনে মনে তার মুণ্ডপাত করলে।

সুপ্রভাকেও এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে দুঃখ জানিয়ে এবং তার অকিঞ্চিৎকর রচনা এমন মনোযোগের সঙ্গে পড়ার জন্যে বার বার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পত্র লিখে দিলে।

এমনিভাবে দুজনে প্রথম পরিচয়।

সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে সুপ্রভার পড়াশুনো আছে, আগ্রহও আছে। মাঝে মাঝেই নানা বিষয়ে প্রশ্ন ক'রে সে সূর্য্যপ্রসাদকে পত্র লেখে। সূর্য্যপ্রসাদ নিজে বিষয়টি যেমন বুঝেছে যথাসাধ্য সেইভাবে জবাব দেয়।

সুপ্রভা কলেজে পড়ে, থাকে হস্টেলে। কলেজে-পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে সূর্য্যপ্রসাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই। তার ধারণা, ওরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চোদ্দ ঘণ্টা শুধু পাঠ্যপুস্তকের উপরই মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, তার বাইরে না থাকে তাদের দৃষ্টি, না ওড়ে তাদের মন। ওরা রসবস্তুর ধার ধারে না, এবং বিশেষ ক'রে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন।

সুপ্রভার চিঠি প'ড়ে মনে হ'ল, হয় তার ধারণা ভুল, নয় সুপ্রভা একটি ব্যতিক্রম। তার প্রশ্নে এবং লেখায় শুধু যে তার রসিক চিত্তেরই পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, তার মধ্যে বুদ্ধি এবং মনন শক্তির ছাপও সুস্পষ্ট।

কলেজের মেয়েদের সম্বন্ধে সূর্য্যপ্রসাদের ধারণা যখন একটু একটু ক'রে বদলাচ্ছে ঠিক সেই সময় সুপ্রভার আর একখানি চিঠি এল যাকে রোমান্টিক বলা যেতে পারে।

সুপ্রভা আর আড়ালে থাকতে চায় না, সূর্য্যপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় করতে চায়। তার উপায়ও সে স্থির করেছে। আসছে রবিবার তার মামার বাড়ী যাবার জন্যে দিনের বেলাটা সে ছুটি পেয়েছে। সেই দিন বিকেল পাঁচটার সময় সে কার্জন পার্কে আসবে। তার পরনে থাকবে একখানি

ফিকে নীল ক্রেপ শাড়ী, হাতে গোলাপ ফুল। সূর্য্যপ্রসাদ যেন তার অপেক্ষায় পার্কের উত্তর-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে। পুনশ্চ দিয়ে আবার লিখেছে, তার বাঁ হাতে থাকবে সূর্য্যপ্রসাদের নব প্রকাশিত উপন্যাস "দীপান্বিতা"।

পরিচয় সাধনের যে কৌশল সে অবিষ্কার করেছে তার অভিনবত্বে সূর্য্যপ্রসাদ মুগ্ধ হয়ে গেল। কার্জন পার্কের বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা তরুণীকে চেনবার যত রকম উপায় থাকতে পারে, সুপ্রভা ভেবে-ভেবে বার করেছে। নীল ক্রেপ শাড়ী, হাতে গোলাপ ফুল। তাতেও যদি কোনো গোলযোগ ঘটে, যদি আর একটি তরুণী দৈবের নির্ব্বন্ধে ঠিক সেই সময় উক্ত দু'টি বস্তুই ব্যবহার ক'রে ঠিক ওইখানে গিয়েই উপস্থিত হয়, তাহ'লে সেই 'কমেডি অব এররস্' নিবারণের জন্যে পুনশ্চ "দীপান্বিতা"র ব্যবস্থা করেছে। এখন নিঃসংশয়ে আশা করা যেতে পারে, এমন একটি ত্র্যহস্পর্শের যোগাযোগ ওই নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে পৃথিবীর আর কোনো নারীর জীবনে ঘটবে না।

রবিবারের আর দু'টি দিন মাত্র দেরী, সুপ্রভা তার সম্মতির অপেক্ষা করেনি। সে জানে, সূর্য্যপ্রসাদ আসবে, নিশ্চয় আসবে। এ বিষয়ে সূর্য্যপ্রসাদের নিজেরও কোনো সন্দেহ নেই। সে যাবে, সেই পরম মুহূর্ত্তটুকুর জন্যে সে উদগ্র আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকবে। ইতিহাসে এই গোপন মুহূর্ত্তটুকুর মূল্য দেবে না। ইতিহাস মোলোটোভের সঙ্গে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের মিলনের মুহূর্ত্ত লিপিবদ্ধ ক'রে রাখবার জন্যে ব্যস্ত। রবিবারে কার্জন পার্কের বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে, সহস্র চক্ষুর নিম্নে অথচ তাদের সম্পূর্ণ অগোচরে দু'জনে হবে দেখা। অথচ তার পরের দিন কোনো সরকারী কমিউনিকে বার হবে না। পৃথিবীতে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর, সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা এমনি ক'রেই ঘটে!

কিন্তু দুটি দিন যেন নিজেকে বিস্তৃত ক'রে দুমাসের পরমায়ু লাভ করেছে। ঘণ্টাগুলো আশ্চর্য্য রকম বড় হয়ে উঠেছে। সেকেণ্ড যদি বা কাটে, মিনিট কাটে না। মিনিট কাটে তো ঘণ্টা কাটে না। সূর্য্যপ্রসাদ কেবলই কল্পনা করেঃ নীল ক্রেপ শাড়ী, গোলাপ ফুল, দীপান্বিতা। চোখ বন্ধ করে অবস্থাটা ভাবতে চেষ্টা করে। স্বপ্ন দেখেঃ অন্ধকার কালো রাত্রি, নিঃশব্দ সঞ্চারী এরোপ্লেনের লাল আলো, সেই আলোয় আবছা দেখা যায় এরোপ্লেনের একাংশ (দীপান্বিতা?)।

অবশেষে সূর্য্যপ্রসাদকে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এনে এই দুঃসহ সময়ের অবসান হ'ল। রবিবারের বিকেল এল। সেজে গুজে সে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল।

অন্যদিন এই পথে চলে ক্লান্তদেহ, শুষ্কমুখ নরনারীর প্রবাহ। তারা ফিরছে অফিস থেকে সমস্ত দিনের কাজের শেষে। আজ রবিবার, আজ তারা নেই। কিম্বা হয়তো তারাই চলেছে, কিন্তু ক্লান্তদেহেও নয়, শুষ্ক মুখেও নয়, চলেছে সমস্ত দিন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পর বায়ুসেবনে। আজ তাদের অন্য রূপ।

বিকেলের দিকে একখানা মেঘ উঠেছিল। এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। তার চিহ্ন রয়েছে ভিজা ঘাসে, রয়েছে গাছের চিকণ পাতায়, রয়েছে পশ্চিমাকাশের বর্ণাঢ্যতায়।

কার্জন পার্কের গেটগুলি দিয়ে আসছে অবিরাম জনস্রোত। কত কোট-প্যাণ্ট পরা সাহেব, লুঙ্গি পরা পশ্চিমা, ধুতি পরা বাঙালী, কত মাদ্রাজী, কত পার্শী, কত শিখ। কত রঙ-বেরঙের শাড়ী পরা নারী। পেরাম্বুলেটারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, সঙ্গে আয়া। তাদের চেয়ে আরও যারা বড় তারা বাগানের মধ্যে ছুটে ছুটে খেলা করছে। ক'টি খানসামা আয়াদের নিয়ে স্থানে স্থানে মজলিস বসিয়েছে।

পাশ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, কাবলী মটর বাবু, তাজা গরম!

ওদের উৎপাতে সূর্য্যপ্রসাদ তার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কাবলী মটর যদি যায় তো চানাচুরওয়ালা আসে, সে যদি যায় তো বাদাম-ভাজা। একজন গেলে আর একজন আসে। তারাই আবার বারে বারেও আসে।

কোন্ গেট দিয়ে সুপ্রভার আবির্ভাব হবে ভগবান জানেন। সূর্য্যপ্রসাদ সব দিকেই মাঝে মাঝে গভীর প্রত্যাশায় চায়। পাঁচটার সে কিছু আগেই এসেছে।

নীল শাড়ী! হ্যাঁ নীল শাড়ী। কিন্তু ক্রেপ নয়।

নীল ক্রেপ শাড়ী! কিন্তু হাতে গোলাপ ফুল কই?

তার সামনে দিয়ে বাহুতে বাহু বেঁধে দুটি সাহেব মেম খট্ খট ক'রে চলে গেল। হাসিতে মেয়েটার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাহেবটার মুখ যেন পাথরের মতো কঠিন। বিড় বিড় ক'রে সে যেন কি বলতে বলতে যাচ্ছিল।

সূর্য্যপ্রসাদ কল্পনা করতে লাগল, ওই রকম কঠিন মুখ নিয়ে এই বর্ণোজ্জ্বল অপরাহ্ণে একটি মেয়ের বাহু ধ'রে কি কথা বলা যেতে পারে? কী কথা?

একটা শক্ত ছোট বল এসে ওর পায়ে লাগল। ভিতরে ভিতরে ও বোধ হয় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। পা দিয়ে ঠেলে বলটাকে সে ছেলেদের কাছেই পাঠিয়ে দিলে।

নমস্কার!

সূর্য্য প্রসাদ চমকে উঠল।

নীল ক্রেপ শাড়ী···গোলাপ ফুল...দীপান্বিতা···

সূর্য্য প্রসাদ নমস্কার করতে ভুলে গেল।

—অনেকক্ষণ এসেছেন?—সুপ্রভা ঘড়ির দিকে চাইলে।

—না, বেশীক্ষণ নয়।

—চলুন ইডেন গার্ডেনের দিকে। এদিকটায় বড় ভিড়। কি বলেন?

—তাই চলুন।

আশ্চর্য্য মেয়ে সুপ্রভা! তার আচারে-আচরণে, কথায় বার্ত্তায় কোথাও অপরিচয়ের আড়ষ্টতা নেই। যেন তাদের কত কালের পরিচয়, অনেকদিন পরে দেখা হ'ল।

বললে, কি ক'রে আপনাকে চিনলাম বলুন তো?

—প্রতীক্ষা-ব্যাকুল ভাব দেখে?

সুপ্রভা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। বললে, না। আপনার ছবি বেরিয়েছিল 'অনিন্দিতা' কাগজে। সে মুখ আমার মনে ছিল।

—তাই বলুন।

—কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেননি।

—নিশ্চয়ই পারিনি। অর্থাৎ আপনাকে আমি প্রথমে লক্ষ্যই করিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাকে দেখলেই চিনতে পারতাম। নীল শাড়ী না প'রে থাকলেও।

আপনি কি আমাকে দেখেছেন কোথাও ?

—দেখেছি।

—কোথায় বলুন তো ?

—তা মনে নেই। কিন্তু দেখেছি নিশ্চয়।

—হয় তো দেখেছেন। কিন্তু সেই লোকই যে আমি তা কি ক'রে বুঝতেন ? আমাকে দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু চেনেন না নিশ্চয়ই।

—না চিনলে চিনতাম কি ক'রে ? বা রে !

—মিথ্যে কথা। কি ক'রে চিনলেন বলুন।

—চিঠির মারফৎ। কিন্তু সে কথা থাক সুপ্রভা দেবী, আপনার ছুটি কতক্ষণ আগে বলুন।

সুপ্রভা হেসে মাথা দুলিয়ে বললে, এরই মধ্যে সে খোঁজ কেন ? চলুন, ওই জলের ধারটায় গিয়ে বসা যাক। আপনি নৌকো বাইতে জানেন ?

—না।

—সাঁতার দিতে ? তাও না ? কি পারেন তবে ? শুধু মেয়েদের গল্প লিখতে ?

—তাও পারি কই ? তারও শেষ লাইনে ভুল থাকে।

দুজনেই হেসে উঠল।

চোখ বিস্ফারিত ক'রে সুপ্রভা বললে, দেখুন, কি রকম ধ'রেছি।

—সত্যি।

—আজ আপনাকেও কি রকম ক'রে ধ'রেছি সে তো জানেন না।

—কি রকম ক'রে ?

—মামাতো বোনের জন্মদিন উপলক্ষে তো গিয়েছিলাম। সেখানে বিকেলে সবাই ঠিক ক'রলে "ট্যাবু" দেখতে যাবে। আমাকে নিয়ে টানাটানি। বেগতিক দেখে বললাম, "ট্যাবু" দেখেছি। তখন নিষ্কৃতি। ওরা সিনেমায় গেল, আমি এখানে এলাম।

সুপ্রভা বিজয়গর্ব্বে হাসলে।

সূর্য্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলে, "ট্যাবু" দেখেছেন ?

—না। আপনি ? দেখেছেন ? কি রকম ? ভালো ?

—ভালো। অন্তত আমার চেয়ে যে ভালো তাতে আর সন্দেহ নেই।

—আপনার চেয়ে ? যান। আপনিও কি ট্যাবু ?

কথাটা ব'লে ফেলেই সুপ্রভা মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলে, এবং সূর্য্য প্রসাদ জবাব দেবার পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বুঝি খুব সিনেমায় যান ?

—মাঝে মাঝে। আপনি ?

—মাঝে মাঝে।

এইবার সুপ্রভাকে হস্টেলে ফিরতে হবে। সে উঠল। সূর্য্যপ্রসাদ তাকে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে গেল।

এর পরে প্রায় প্রতি রবিবারেই ওদের দেখা হ'তে লাগল। কখনও ইডেন গার্ডেনে, কখনও বটানিকাল গার্ডেনে, কখনও সিনেমায়, কখনও বা ডায়মণ্ডহারবারগামী ষ্টীমারে। বাহান্নটি রবিবারের অনেকগুলি রবিবার এমনি ক'রে কাটল।

তারপরে মার্চের গোড়ার দিকে সুপ্রভার বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। সুপ্রভা কথা দিলে পরীক্ষার শেষে একটা সপ্তাহ সে মামার বাড়ীতে থাকবে। এই সাতটা দিন সে সূর্য্যপ্রসাদকে প্রচুর সঙ্গ দেবে। সেই অনুযায়ী ওদের প্রোগ্রামও তৈরী হ'ল।

শেষ দিনে ওরা গেল বটানিকাল গার্ডেনে। একটা নির্জ্জন অংশে দুজনে ঘাসের উপর বসল। কালকে সুপ্রভা চ'লে যাবে, কে জানে কত দিনের জন্যে। ও আবার এম-এ পড়তে আসবে কি না কে জানে ? এলে আবার দেখা হবে। নয় তো নয়।

সূর্য্যপ্রসাদ অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

সুপ্রভা জিজ্ঞাসা করলে, চিঠি দিলে উত্তর দেবেন তো ?

—নিশ্চয়।

সূর্য্যের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। সূর্য্যপ্রসাদের মনে হ'ল তার মুখ যেন পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছে। বহুদিন আগে কার্জন পার্কে সেই সাহেবটির মুখে যে কাঠিন্য দেখেছিল তেমনি কাঠিন্য। তার চোখ যেন জ্বালা করছে।

ধীরে ধীরে সুপ্রভার একখানি হাত সে নিজের হাতের মধ্যে নিলে।

ডাকলে, সুপ্রভা দেবী !

—বলুন।

কিন্তু সূর্য্যপ্রসাদ কিছুই বলতে পারলে না, কথা তার মুখে আটকে গেল।

সুপ্রভা ওর চোখের উপর থেকে চোখ নামিয়ে নিলে। ওর হাতের পীড়ন সুপ্রভার হাতে প্রবলতর হ'য়ে উঠল।

সুপ্রভা নিঃশব্দে এবং সযত্নে ওর মাথার উপর থেকে একটা ঝ'রে-পড়া শুকনো পাতা সরিয়ে দিলে।

সূর্য্যপ্রসাদ ওর মুখখানি দুই হাতের মধ্যে নিলে। তার গলার স্বর যেন ভেঙে গেছে।

বললে, সুপ্রভা দেবী, আমার অভিবাদন !

মুখ সরিয়ে নিয়ে কৃত্রিম কোপে সুপ্রভা শুধু একটা তর্জ্জনী তার মুখের কাছে তুলে ধরলে।

মলিন মুখে সূর্য্যপ্রসাদ ব'সে রইল।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হাস্যে সুপ্রভা যেন ঢেউ-এর মতো সূর্য্যপ্রসাদের গায়ে ভেঙে পড়ল। অস্ফুট কণ্ঠে বললে, রাগ করলেন ?—কণ্ঠে তার নিবেদনের সুর।

* * * *

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সুপ্রভাকে তার মামার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কালকে সে যাবে। তার বাঁধা-ছাঁদা আছে। তার নিজের জন্যে এবং ছোট ছোট ভাই-বোনের জন্যে টুকিটাকি কতক-গুলো জিনিসও কেনবার আছে। ফেরার পরে হগ মার্কেটে কিনে নিয়ে যাবে এখন। কাল সকালে আর সময় পাবে না। অনেকগুলি বন্ধু আসবে দেখা করতে।

ওরা উঠল। চলল মার্কেটের দিকে। সেখানে জিনিসগুলো কিনে ফিরল বাসায়।

ওর মামার বাড়ীর সামনে এসে সূর্য্যপ্রসাদ বিদায় নিলে।

সুপ্রভা হাসলে।

বললে, চিঠি দেবেন কিন্তু। এই সাতটা দিনের কথা জীবনে ভুলব না।

সূর্য্যপ্রসাদও হাসলে। মনে মনে বললে, সেই প্রত্যাশাটুকুই রাখলাম। নইলে বাঁচব কি নিয়ে?

সুপ্রভা প্রজাপতির মতো ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উল্লিখিত ঘটনা অবশ্য অনেক দিনের। সাত-আট বৎসরের। সেই ফাল্গুনেই একটি নব নিযুক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সুপ্রভার বিয়ে হয়। এখন তারা সিরাজগঞ্জে আছে। বেশ আছে।

মাঝে মাঝে সুপ্রভা চিঠিও লেখে। মাস কয়েক আগে তার ছোট কন্যার অন্নপ্রাসন গেছে। সূর্য্যপ্রসাদ যেতে পারেনি। শুধু একটা হার পাঠিয়ে দিয়েছিল। ক'দিন আগে চিঠি লিখেছে, তার সেজ ছেলেটির খুব অসুখ, টাইফয়েড। এই মাত্র সূর্য্যপ্রসাদ রেল পার্সেলে তার জন্যে এক বাস্কেট ফল পাঠিয়ে দিয়ে ফিরছে।



পথ

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

গভীর রাত্রি হাঁকিছে প্রহরী, শিথিল তন্দ্রা টুটে
জাগিয়া উঠিনু অলস শয্যাপরে,
লৌহ বাঁধানো পাদুকায় তা'র খট্ খট্ ধ্বনি উঠে
অদূরে ঝিল্লি ডাকিছে আর্ত্তস্বরে।
নগর প্রান্তে মিলালো সে ধ্বনি বিজন পথের শেষে
নিদহারা আঁখি চাহিয়া রহিনু পথে,
নৈশ-মরণে নীরব পল্লী পতিতা মলিন বেশে
অজানা কবিতা জাগিল মর্ম্ম হ'তে।
এক চোখো ক্রূর দানবের মত জ্বলিছে গ্যাসের আঁখি,
পতঙ্গদল উড়িছে ঘিরিয়া তা'রে,
অঘোরে ঘুমায় অন্ধ ভিখারী ছেঁড়া কাঁথা গায়ে ঢাকি'
পোড়ো বাড়িটার আবছা অন্ধকারে।
পথ তরুশাখে নিশাচর পাখী ঝাপটিয়া কালো পাখা
অজানা পথের উদ্দেশে উঠে কাঁদি;
ওগো পথ, ওগো পন্থা তোমার ধূসর-কুহেলি মাখা—
নিশীথের মায়া নয়ন দিয়াছে ধাঁধি'।
লক্ষ যুগের চরণ চিহ্ন বক্ষে ধরিয়া কত—
ওগো পথ, ওগো পন্থা নির্ব্বিকার,
ছেদ যতি হীন বিরাম বিহীন হে চির অব্যাহত
মর্ম্মে তুলিছ অনাহত ঝঙ্কার।
মেরু মরু মহারণ্য আকাশ নদ নদী সাগরেতে
বাধাহীন গতি দিয়াছ সভ্যতারে,
আপনারে করি রিক্ত ভিখারী ভিক্ষা পাত্র পেতে,
চাহ নাই কিছু নিরাশার হাহাকারে।
অন্ধ খঞ্জ মূক ও বধির পাষাণ প্রকৃতি তব
ভাষাহীন চির রুদ্ধ হৃদয় দ্বার,
পর্ণ কুটির প্রাসাদ পণ্য বীথিকায় অভিনব
দু'পাশে তোমার শোভিত অলঙ্কার;
কভু ক্ষুরধার অগম অপার পথিকের বিভীষিকা
লঙ্ঘিতে শুধু পেরেছে মুষ্টিমেয়—
কচিৎ কর্ম্মী সাধু মহাজন; তা'ছাড়া গড্ডলিকা
ওগো পথ তব গতি যে অপরিমেয়!
যাযাবর এই সভ্যতা চলে কোটি কোটি বৎসর
গুহাবাস ত্যজি' অসংখ্য পথ বেয়ে
গিরিদরি মেরু কান্তার মরু মৃত্তিকা-গহ্বর
চেতনা দীপ্ত বিজয়-নিশানে ছেয়ে।
সারমেয়রূপী ধর্ম্ম তোমারি বন্দনা গান গেয়ে—
ধার্ম্মিক রাজা জীবিত যুধিষ্ঠিরে
লয়ে গেছে দূর নন্দনপুর তোমারি বক্ষ বেয়ে
অলকনন্দা মন্দাকিনীর তীরে।
রাজার দুলালে ভিখারী করেছ প্রচারিতে নির্ব্বাণ
দীক্ষিত করি পথের মন্ত্র গানে,
ধূলি মেখে তব নদীয়ার গোরা গেয়েছে প্রেমের গান
শ্যাম বিরহের দুর্জ্জয় অভিমানে।
গভীর নিশীথে অভিসারিকার চির বান্ধব তুমি
পৌঁছিয়া দাও মিলন কুঞ্জ দ্বারে,
অন্ধ মানব মানবীর প্রেম রচিছে স্বপ্নভূমি
পথ হ'তে পথে আলোকে অন্ধকারে।
এক পারে তব উঠে সকরুণ মরা কান্নার ধ্বনি
বিচ্ছেদাতুর বক্ষ চাপড়ি মরে,
অপর পারেতে মিলনোৎসবে বীণা বাজে রণরণি
নবদম্পতি মালা বিনিময় করে।
দম্ভে তোমায় দলিত করেছে উদ্ধত পদপাতে
বিষাণ বাজায়ে বিজয়ী সৈন্যদল;
গতিবেগে তা'র ভীরু বিজিতেরা মরিয়াছে অপঘাতে
ধূলিতে তোমার ঢালিয়া অশ্রুজল।
হয়, রথ, করী, সেনা, সেনাপতি, গোযান, অশ্বযানে
যুগ যুগান্ত মুখরিত তব হিয়া,
সত্য ও ত্রেতা দ্বাপর কলির পদাঘাতে অপমানে
বিদ্রোহে কভু ওঠোনি হুঙ্কারিয়া।

রাজ প্রাসাদের মিনার স্তম্ভ গম্বুজ কর্ণিকা
ভেঙ্গে চুরে তব রচিয়াছে কঙ্কর,
আবার উঠেছে নূতন হর্ম্ম্য নূতন অট্টালিকা
যুগবিপ্লবে স্পর্শিয়া অম্বর।
রাজ্য ও রাজা উঠেছে পড়েছে কালের ভ্রূকুটি লেগে
তুমি শুধু আজো অপরিবর্ত্তনীয়,
অনাদিকালের ঘুমভাঙ্গা চোখে আজিও রয়েছ জেগে
ধূলি ধূসরিত উড়ায়ে উত্তরীয় ?
মরেছে দৈব দুর্ঘটনায় অভাগা পথিক কত
দ্রুতগামী রথচক্রের তলে পিষে,
কঙ্করে তব অঙ্কিত করি তাজা শোণিতের ক্ষত
চকিতে আবার পায়ে পায়ে গেছে মিশে।
পায়ে পায়ে গেছে মিশিয়া তোমার কতনা মর্ম্ম কথা
মিশে গেছে প্রতি নিমেষের ইতিহাস,
মুক্তিতে সদা যুক্ত তুমি হে ; বন্ধুর, সরলতা,
অঞ্চলে তব বৃথা ফেলে নিঃশ্বাস !

* * * * *

টুটিল চিন্তা হেরিনু ক্লান্ত স্তিমিত গ্যাসের আঁখি
পতঙ্গদল মরেছে ঘিরিয়া তারে,
ছেঁড়া কাঁথা গায়ে অন্ধ ভিখারী শিহরিছে থাকি' থাকি'
পোড়ো বাড়ীটার আবছা অন্ধকারে।



ছেলে মেয়ে

"বনফুল"

১

মেয়েদের হাঁসপাতাল।

আন্নাকালী ও নমিতা একই ঘরে আছেন, পাশাপাশি খাটে। আন্নাকালীর বয়স চল্লিশ, নমিতা সপ্তদশী। দুইজনেই আসন্ন প্রসবা, এখন-তখন হইয়া আছেন।

আন্নাকালীর গালের হাড় উঁচু, কপাল শিরা-বহুল, চক্ষু পীতাভ, হাসি দন্তসর্ব্বস্ব, পেট প্রকাণ্ড, হাত পা সরু সরু, মাথার সম্মুখ দিকটায় টাক। সাতটি সন্তানের জননী, গর্ভে অষ্টম সন্তান। আগের বার প্রসব করিবার সময় যমে-মানুষে টানাটানি হইয়াছিল তাই এবার ডাক্তারের পরামর্শ-অনুযায়ী আন্নাকালী হাঁসপাতালে আসিয়াছে। স্বামী কেরানি।

নমিতা সুন্দরী। এইবার প্রথম সন্তান হইবে। সহসা দেখিলে গর্ভবতী বলিয়া মনেই হয় না। সমস্ত অবয়ব পরিপুষ্ট, আসন্ন মাতৃত্বের পূর্ব্বাভাসে সে যেন আরও শ্রীমতী হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী ডাক্তার। বিজ্ঞান-সম্মত প্রসব-পদ্ধতি হাঁসপাতালে ঠিক-মত অনুসৃত হইবে বলিয়া স্ত্রীকে হাঁসপাতালে রাখিয়াছেন।

২

বয়সের, রূপের এবং অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। প্রথম প্রথম অবশ্য রাখিয়া-ঢাকিয়া শোভন, সংযত, কেতা-দুরস্ত ভাবে আলাপ সুরু হইয়াছিল। উভয়েই উভয়ের উজ্জ্বল দিকটা সুকৌশলে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। ক্রমশঃ নিজের নিজের স্বামীর প্রসঙ্গ লইয়াও আলোচনা সুরু হইল এবং রাখা-ঢাকা ভাবটা ক্রমশঃ যেন তিরোহিত হইতে লাগিল। আলাপটা যখন ভাল করিয়া জমিল তখন দেখা গেল উভয়েই পুরুষ-বিদ্বেষী। পুরুষ জাতির নানাবিধ দোষ কীর্ত্তন করিতে উভয়েই পঞ্চমুখ। এমন কি উচ্ছ্বাসের মুখে উদাহরণ স্বরূপ নিজের নিজের স্বামীর দোষও উভয়ে আজকাল অকাতরে উদ্ধৃত করিতেছেন। দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অবলীলাক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। আন্নাকালীর প্রাত্যহিক কোমর-কন-কনানিটাও যেন কিছু কম পড়িয়াছে। সেদিন দ্বিপ্রহরে নিম্নলিখিত রূপ আলাপ হইতেছিল।

আন্নাকালী। ব্যটাছেলেদের কথা আর বোলো না ভাই, অমন স্বার্থপর জাত দুনিয়ায় আর আছে না কি!

নমিতা। [মৃদু হাসিয়া] নিজেদের পান থেকে চুন খসলেই তুল্‌কালাম্‌।

আন্নাকালী। সে কথা আর বলতে! আমাদের বাড়ির কর্ত্তাটি আপিস থেকে এসেই ছুটবেন পাশার আড্ডায়, ফিরবেন কোনদিন এগারোটায়, কোনদিন বারোটায়। কিন্তু এসে ভাত যদি না গরম পান বাড়ি মাথায় তুলবেন। আচ্ছা, অত রাত্তির পর্য্যন্ত ভাত গরম রাখা কি সহজ কথা ভাই, আঁচ আর কতক্ষণ থাকে বল। এদিকে আবার কয়লা যদি কোনমাসে বেশী খরচ হয়েচে তো সেও আবার ফাটাফাটি ব্যাপার!

নমিতা। আমাদের উনিও তাই।

আন্নাকালী। পাশা খেলা বাই আছে না কি ?

নমিতা। না, উনি খেলেন বিলিয়ার্ডস্। বিলিয়ার্ডস্ খেলে আড্ডা দিয়ে সিনেমা দেখে রোজ বাড়ি ফিরবেন রাত দুপুরে। কিন্তু এক ডাকে কপাট না খুলে দিলেই রাগ ! আমরা যেন চাকরানী, রাতদুপুর অবধি কপাট খুলে দেবার জন্য দুয়ার গোড়ায় বসে থাকব। একদিন রাত্তিরে এসে দেখেন আমি নেই, পাড়ায় একজনদের বাড়ি কীর্ত্তন হচ্ছিল আমি শুনতে গেছলাম। বাবুর সে কি রাগ !

আন্নাকালী। ওই রাগটুকুই ভগবান দিয়েছেন শরীরে, আর কোন গুণ নেই। আমাদের পাশের বাড়ির বৈকুণ্ঠবাবু কি কাণ্ডই যে করেন রোজ মদ খেয়ে এসে। প্রহার তো বউ-দুটোর অঙ্গের ভূষণ হয়েছে !

নমিতা। [সাগ্রহে] কি রকম ?

আন্নাকালী। রোজ ঠ্যাঙায় ধরে'। মুষ্কো চেহারা, ইয়া গোঁফ, লাল চোখ, কালো রঙ্—যেন একটা দৈত্য ! অগাধ পয়সা আছে শুনেছি, রোজ সন্ধেবেলা মদ খাবে, মদ খেয়ে বউ-দুটোকে ডেকে এনে ঘরে পুরে কপাটে খিল দেবে। খিলও আবার এত উঁচুতে যে বউরা কেউ নাগাল পায় না। সেই খিলটি এঁটে বন্ধ করে সুরু করবে মার। মারতে মারতে যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাবে ততক্ষণ ছাড়বে না।

নমিতা। বউ দুটো ?

আন্নাকালী। দুটোই তো ! সেদিন আবার একটা বিয়ে করেছে লুকিয়ে ! ওদের কি লজ্জা আছে ! চিরকালই ওই রকম, আগেকার দিনে দুশো পাঁচ শো বিয়ে করতো, এখন আর খ্যামতায় কুলোয় না বলে করে না।

নমিতা। [মুচকি হাসিয়া] মনে মনে কিন্তু লোভ আছে প্রচুর। আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই একজন ভদ্রলোক থাকেন, প্রবীণ লোক, কিন্তু তার জ্বালায় ওদিকের জানলা খোলবার জো নেই।

আন্নাকালী। [নাসা কুঞ্চিত করিয়া] ঝ্যাঁটা মার, ঝ্যাঁটা মার ! দেখে দেখে আর শুনে শুনে ঘেন্না ধরে গেছে জাতটার উপর !

নমিতা। নেশা তো একটা না একটা করাই চাই !

আন্নাকালী। ওঁর সে সব বালাই ছিল না এতদিন, কিন্তু বুড়ো বয়সে আবার আপিঙ্ ধরেছেন মরতে !

নমিতা। উনি দিনরাত সিগারেট চালাচ্ছেন !

আন্নাকালী। স্বার্থপর, ভয়ঙ্কর স্বার্থপর সব।

নমিতা। খবরের কাগজে তো পুরুষদের কীর্ত্তি রোজ একটা না একটা আছেই ! হয় গুণ্ডায় মেয়ে ধরে নিয়ে গেছে, না হয় কোন মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে, না হয় স্বামী বউকে খুন করেছে। রোজ একটা না একটা কিছু থাকবেই।

আন্নাকালী। খবরের কাগজের কথা বলতে পারি না, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখছি রোজ। অমন নেমখারাম জাত আর আছে না কি ! এই ধর না যে ছেলেকে পেটে ধরে' বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করি আমারা, সেই ছেলেই বিয়ে করে' একেবারে পর, মায়ের দিকে ফিরেও চায় না। সেই বউও আবার কিছুদিন পরে পানসে হয়ে যায়, তখন আবার অন্য দিকে নজর—স্বার্থপর পাজি সব !

নমিতা। তাছাড়া, নিজেরা রোজগার করেন বলে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, কথায় কথায় দশ-বার করে শোনানো হয় সে কথা আমাদের। কিন্তু আমরা যে এদিকে একাধারে, রাঁধুনি, চাকরানী, সেবা-দাসী, আমাদের দামও নেই, কদরও নেই। একটি পয়সা চাইতে হলে ওঁদের কাছে হাত পাততে হয়, দেন তো সাড়ে বাইশ, কিন্তু লম্বা লম্বা লেকচার কত। বাজে খরচ করতে নেই, বিলাসিতা করা মহাপাপ, নিজেরা যেন সব সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী!

আন্নাকালী। নিজেরা? নিজেরা এক একটি কাছিম। জলেও থাকেন স্থলেও থাকেন যখন যেখানে সুবিধে, একটু বিপদের সম্ভাবনা দেখলে মুখটি গুটিয়ে নেন, সর্ব্বাঙ্গে কঠিন আচ্ছাদন, মারো বকো ভ্রূক্ষেপ নেই! নিজের সুবিধে মতন আস্তে আস্তে মুখটি বার করেন, আর যদি একবার কামড়ে ধরেন তো রক্ষে নেই। জেদি, ভীতু, একগুঁয়ে—অবিকল কাছিম সব।

নমিতা। [হাসিয়া] আমি ভেবেছিলাম—বলবেন বুঝি ঘুঘু। বেশ উপমাটা বের করেছেন তো!

৪

সেই দিনই গভীর রাত্রে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। পুরুষদের অপেক্ষা করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে আন্নাকালীর স্বামী ভজহরি বিশ্বাস আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া বসিয়া আছেন। বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণ, সম্মুখে উপবিষ্ট সুদর্শন যুবক, প্রাচীর বিলম্বিত টকটকায়মান ঘড়ি, কোন কিছুরই সম্বন্ধে তিনি সচেতন নহেন। তন্ময় বিভোর ভাবে অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। মাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে আসিয়াছেন।

সুদর্শন যুবকটি ডাক্তার বি. কে. দত্ত। নমিতার স্বামী। দীর্ঘ সরু একটি পাইপে ধীরে ধীরে টান দিতেছেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে 'টু লাভ স্টোরি' নামক ইংরেজি পত্রিকা হইতে সচিত্র একটি প্রণয়-কাহিনী পাঠ করিতেছেন। তাঁহারও বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত।

পাশাপাশি দুইখানি ঘরে দুইটি টেবিলের উপর আন্নাকালী ও নমিতা শায়িতা। উভয়েই প্রসব বেদনাতুরা। উভয়ের নিকটেই ধাত্রীবিদ্যাপারদর্শী ডাক্তার ও নার্স দণ্ডায়মান।

আন্নাকালী বলিতেছিলেন, "ওগো ডাক্তারবাবু, আমায় বাঁচান গো ডাক্তারবাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—"

নার্স বলিল, "আর একটু পরেই সব যন্ত্রণার অবসান হবে মা, ছেলের মুখ দেখলেই সব ভুলে যাবে!"

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিলেন।

পাশের ঘরে নমিতা আরও অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

"আর পাচ্ছি না, উঃ আর পাচ্ছি না আমি, ওঁকে ডেকে দিন, উঃ গেলুম, ডাক্তার বাবু, উঃ উঃ উঃ ওঁকে ডেকে দিন, শিগগির ওঁকে ডাকুন।" নমিতার নার্স বলিলেন, "ভয় কি, এখনি হয়ে যাবে, ছি, অমন করে না।" ডাক্তারবাবু সাবান দিয়া হাত ধুইতে লাগিলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে ভজহরি বিশ্বাস ও ডাক্তার দত্ত খবর পাইলেন প্রসব নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে। দত্তের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি লম্বা পাইপে আর একটি সিগারেট গুঁজিয়া ধরাইয়া ফেলিলেন।

ভজহরি স্বপ্নাচ্ছন্ন-নয়নে খানিক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার মুখেও মৃদু একটি হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল।

উভয়েই রাস্তায় নামিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে।

নার্স আসিয়া আন্নাকালীকে বলিল, "এই দেখ মা, কেমন সুন্দর মেয়ে হয়েছে তোমার!"

আন্নাকালীর পাণ্ডুর মুখ আরও যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

সদ্যোজাত শিশুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সহসা তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "মেয়ে! আমার মেয়ে হয়েছে!"

"মেয়েই তো, কেমন সুন্দর গোলগাল, ফুটফুটে, একমাথা চুল!"

"নমিতার কি হয়েছে?"

"ছেলে।"

নার্স মেয়েটিকে আন্নাকালীর বিছানার পাশে শোয়াইতে যাইতেছিল, হঠাৎ আন্নাকালী উঠিয়া দুই হাত দিয়া শিশু কন্যাটিকে ঠেলিয়া দিলেন।

"ও আমার মেয়ে নয়, নিয়ে যাও, বদলাবদলি করে দিয়েছ তোমরা!" বিস্মিত নার্স বলিল, "সে কি কথা, বদলাবদলি করব কেন।"

"নিশ্চয় বদলাবদলি করেছ, আমার মেয়ে হতে পারে না—জ্যোতিষী বলেছে এবার আমার ছেলে হবে—"

আন্নাকালীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

"এ তোমারই মেয়ে—"

না, না, আমার মেয়ে নয়, আমার সাত সাতটা মেয়ে, আর মেয়ে আমি চাই না, আমার মেয়ে হয়নি, আমার ছেলে হয়েছে, নমিতা ডাক্তারের বউ বলে আমার ছেলেটি তাকে দিয়েছ তোমরা।"

"ছি, ছি তাকি কখনও হতে পারে! এ তোমারই মেয়ে, নাও কোলে কর।"

"না মেয়ে আমি চাই না—চাই না—চাই না,—আমার ছেলে এনে দাও, আমার ছেলে এনে দাও—নিশ্চয় আমার ছেলে হয়েছে।"

হাঁসপাতালের নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া আন্নাকালী চীৎকার করিতে লাগিলেন।

আর্ত্ত অসহায় চীৎকার।

পাশের খাটে নমিতা সভয়ে তাহার শিশু পুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

বাঙ্গালা পুঁথির পুষ্পিকা

শ্রীসুকুমার সেন

[বর্ত্তমানের লিখিত গ্রন্থের লিপিকার মুদ্রাযন্ত্র। কিন্তু গ্রন্থকারের বক্তব্য ছাড়া মুদ্রাযন্ত্রের বক্তব্য গ্রন্থে সামান্যই থাকে। থাকে বড় জোর মুদ্রাকরের নাম ঠিকানা ইত্যাদি। কিন্তু সেকালের লিপিকার বা পুঁথির নকলকারী, লেখকের বক্তব্য শেষে নিজের খেয়াল মত অনেক কিছু লিখিতেন। লিখিবার মত কিছু না থাকিলে বাজার দর বা ঐ জাতীয় কিছু লিখিতেন। তাহা ছাড়া শত্রুকে গাল দেওয়া, আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য, সমসাময়িক সংবাদ প্রভৃতি সম্ভব অসম্ভব সব কিছুই পুষ্পিকায় স্থান পাইত। সুতরাং অন্তকার যুগে এইগুলি যেমন কৌতুকপূর্ণ তেমনি মূল্যবান বলিয়া মনে হইবে। এই প্রবন্ধের লেখক প্রাচীন লিপিকারের এই ধরণের কতকগুলি পুষ্পিকার পরিচয় এই প্রবন্ধে দিয়াছেন—অ. স.]

পুঁথির শেষ অংশে সাধারণতঃ লিপিকারের নাম ও পরিচয় এবং পুঁথি-সমাপ্তির তারিখ ইত্যাদি দেওয়া থাকে। পুঁথির এই অংশকে বলা হয় "পুষ্পিকা"। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লেখা বাঙ্গালা পুঁথির সংখ্যা প্রচুর নহে। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা বাঙ্গালা পুঁথি অজস্র পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পুঁথির পুষ্পিকায় লিপিকারেরা অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। লিপিকাল, লিপিকারের নাম-ধাম ইত্যাদি মামুলি খবর ছাড়া অনেক কৌতুকাবহ এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য এই পুষ্পিকাগুলির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা গদ্য শৈলীর ইতিহাসের পক্ষেও এইগুলির মূল্য নিতান্ত কম নহে, কেননা এগুলির মধ্য দিয়া বাঙ্গালা গদ্যের কাল-ক্রমিক বিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পাওয়া যায়।

পুষ্পিকা সাধারণত গদ্যেই লেখা হইত। কিন্তু পয়ারের পর পয়ার কপি করিতে করিতে লিপিকারেরও অনেক সময় ঘাড়ে ছন্দের ভূত চাপিয়া যাইত, মিল অমিল লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারাও অনেক সময় পয়ার বা ত্রিপদী চালাইয়া যাইতেন। পয়ারে রচিত পুষ্পিকার কিছু নিদর্শন দিতেছি। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত অংশের বানান শুদ্ধ না করিয়া দিয়া গত্যন্তর নাই; অন্যথায় সাধারণ পাঠকের নিকট অবোধ্য রহিয়া যাইবে। জ্ঞানের অনুপাতে লিপিকারগণের সাধারণতঃ সংযুক্ত বর্ণবোধের উপর প্রবলতর আগ্রহ ছিল; 'শুদ্ধ'-কে তাঁহারা 'শুর্দ্ধ' না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না; 'অক্ষর'-কে 'য়ক্ষ‍র্র' করিয়াই তবে তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য-বোধ চরিতার্থ হইত।

(১) শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আশীর্ব্বাদ কর নারায়ণ।
তোমা বই গতি নাই পতিতপাবন ॥
পুস্তক লিখিল প্রতি ছন্দ অনুসারে।
লিখনের নাঞি দোষ এইত বিচারি ॥
কদাচিৎ তায় যদি হয় ভুল ভ্রান্তি।
ভীমের সমরে ভঙ্গ মুনি ভ্রমে মতি ॥
শশীর সন্ধান তাহে অমর মিলন।
এত দূরে এই পুঁথি হইল লিখন ॥

(২) এমন অপূর্ব্ব কথা সদা কর মন।
শ্রীজগন্নাথ ঘোষ করিল লিখন ॥
একলখি গ্রামে বাস ঘোষ কুলোদ্ভব।
শ্রবণ কারণ ইহা লিখিলাম সব ॥
শঙ্কর ঘোষ গোপ পুস্তক এ হয়।
যত্ন করি লেখাইল কড়ি করে ব্যয় ॥
চৌদ্দ পত্রেতে পুস্তক হইল সারা।
যত্নেতে রাখিবে যেন না হয় হারা ॥

পুঁথি যে শুধু হিন্দুরাই লিখাইতেন, এমন নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যে তখন ধর্ম্ম লইয়া দলাদলির কথা কেহ চিন্তা করিত না। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি হিন্দু মুসলমানের সমান মমত্ববোধ ছিল। সুতরাং হিন্দুদের মত মুসলমানেরাও বাঙ্গালা পুঁথি নকল করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান লিপিকারের লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডের একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; তাহার পুষ্পিকা এইরূপ—

লিখিয়তে শ্রীসাহ মোহাম্মদ শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩১ তারিখ ২৬ জিলকাজ মাহে ২৭ মাঘ।

বাঙ্গালা পুঁথির লিপিকাল সাধারণতঃ শকাব্দ অথবা বাঙ্গালা সনে দেওয়া থাকে। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের অর্থাৎ মল্লভূমির পুঁথিতে সাধারণতঃ মল্ল সন দেখা যায়, যদিও অনেক সময় মল্ল শব্দের উল্লেখ থাকে না। মল্ল সন বাঙ্গালা সনের ১০১ বৎসর পরবর্ত্তী। অনেক পুঁথিতে আবার বাঙ্গালা সন এবং মল্ল সন দুইই পাইয়া থাকি। মল্ল সনের নামান্তর রাজ সন বা জমিদারী সন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুঁথিতে প্রায়ই মঘী সন দেওয়া থাকে; মঘী সন বাঙ্গালা সনের ৪৫ বৎসর পরবর্ত্তী। এমন ব্যাপারও বিরল নহে, যে প্রদত্ত বিভিন্ন সালের মধ্যে একেবারেই ঐক্য নাই!

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কোন কোন পুঁথিতে আবার শকাব্দ এবং সনের সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দেরও উল্লেখ দেখা যায়। যেমন,

ইতি সন ১২০৮ বার সও আট শাল তারিখ সোলঞি জ্যৈষ্ঠ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। ইতি শকাব্দা ১৭২৩ সতের সও তেইস শক ইঙ্গিরাজী সন ১৮০১ আঠার সও এক সাল। লিখিতং শ্রীরামপ্রসাদ চৌধুরী সাকিম গুড়্যাঘর পরগণে হাবেলি॥

ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দা সন ১২২৪ বাঙ্গালা সন ১৮২৭ ইংরেজী সন ১১৭৯ মঘী তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রোজ বৃহস্পতিবার তিথি চতুর্দ্দশী…।

পুঁথির লিপিকালও অনেক সময় ছন্দে দেওয়া হইয়াছে। যেমন,

যোল শ' ("=স্লোস") উনপঞ্চাশ যখন শকের উৎপত্তি।
তখন দ্বিজ রঘুনাথ লিখিলেন পুঁথি॥
চন্দ্রাকাশ হয় ক্ষিতি শকের নির্ণয় ইতি
তিথি (="তীর্থ") পৌর্ণমাসী সুরগুরু।
অর্দ্ধমেষে শশী নারী ভুবনে বিখ্যাত হরি
বনি যোগেন্দ্র অতি চারু॥
(সাহিত্য পরিষদ পুথি ২২৫।)

ইহা হইতে পাই ১৭১১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

গদাপর্ব্ব সমাধান পঞ্চদশ পাতে।
শকাব্দা সতের পৌউত্রিশ ভাদ্রের সাতিশাতে॥
রাত্রে শুক্রবার তিথি পূর্ণিমা।
ধৃতিযোগ হয় ভাই নক্ষত্র শতভিষা॥
সেরস্তার মতে ভাই বার শত বিশ সনে।
মোকাম দুর্গাপুর ফত্তেসিংহ পরগণে॥
আদর্শ স্বাক্ষর মম শুনহ সভায়।
লিখিল পুস্তক শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়॥
পূর্ব্বদ্বার ঘরে দেড় প্রহর সময়ে।
মবলগে পনের পাতে পুঁথি সমাপ্ত হয়ে॥

পুষ্পিকায় লিপিকারগণ প্রায়ই স্বীয় জ্ঞানহীনতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা জ্ঞাপক শ্লোক উদ্ধার অথবা তদনুবাদে পয়ার রচনা করিয়া দিতেন। পাঠকের উপর শুদ্ধ করিয়া লইবার বরাত দিতেও ভুলিতেন না। সচরাচর এই শ্লোক এবং শ্লোকাংশ দুইটিই উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়—

ভগ্নপৃষ্ঠকটিগ্রীবঃ স্তব্ধদৃষ্টিরধোমুখঃ।
যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং শোধয়িষ্যন্তি পণ্ডিতাঃ॥
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥

শ্লোক উদ্ধারে এবং নুতন "শ্লোক" বা পয়ার রচনায় লিপিকারগণ প্রায়ই হাস্যোদ্দীপক ভাষা ও বর্ণজ্ঞানহীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন,

জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকৌ দোষ নাস্তিঃ॥
লিখিয়াছেন যাদরস (=আদর্শ) উপর।
দোষ গুন (=গুনাহ, অপরাধ) নাই লবে ঘাটী (অর্থাৎ ঘাট্তি) অক্ষর॥
পবননন্দন বীর রণে ভঙ্গ দিল।
মুনি লয়ে মতিভ্‌্রম (=মতিভ্রম) পুরাণে লিখিল॥
যদাদিষ্ট তথা লিখিতং কহেন দ্বিজবর।
দোষ গুন (=গুনাহ্) না লইবেন ঘাইট বা জীত (অর্থাৎ অধিক) অক্ষর॥

কোন কোন লিপিকার আবার পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য অযথা অসঙ্গত শ্লোক পুষ্পিকায় ঢুকাইয়া দেন। একটি পুঁথিতে দেখি লিপিকার সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ হইতে বেমক্কা একটি শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন অত্যন্ত অশুদ্ধভাবে—

সিবং প্রণমং সর্ব্বেসং সর্ব্বভামা যুলক্ষণ
সংক্ষিপ্তসার মাচটে পণ্ডত ক্রমদিশ্বর॥

আর একটি পাণ্ডিত্যের নমুনা—

শ্রীমতী প্রিয়ারি দাস্য পঠিতা পাঠিতা
যজিতা যাজিতা কেনচিৎ লিখিতা॥

এক একখানি পুঁথি লিখিতে অশেষ কষ্ট হইত, সন্দেহ নাই। এত কষ্টের লেখা চুরি গেলে বিশেষ আফশোষের বিষয়; সুতরাং পুঁথিচৌর্য্যের বিষয়ে লিপিকারেরা নানাবিধ গালি ও অভিশাপ বর্ষণ করিতে ভুলেন নাই। সাধারণ অভিশাপ হইতেছে এ শ্লোকটি এবং তাহার নানাবিধ রূপান্তর—

যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ।
মাতা চ শূকরী তস্য পিতা ভবতি গর্দ্দভঃ॥

অপর গালিগালাজের কিছু কিছু নমুনা দিতেছি—

যে এই পুঁথি চুরি করিবে সে বোবা হইবে···॥

এটি আপাতদৃষ্টিতে অসাধারণ বোধ হইবে না বটে, কিন্তু তখনকার দিনের পক্ষে ভীষণ অভিশাপ, কেননা তখন বহু শ্রোতা লইয়া পুঁথি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হইত, এখনকার মত জনে জনে মনে মনে নহে।

এ পুস্তক যে চুরি করিবেক তাহাকে তাল্লাক লাগিবেক॥
এ পুস্তক যে হরিবেক তাহাকে গোব্রাহ্মণবধ লাগিবেক॥
এই পুস্তক যে কেহ চুরি করি ও মিথ্যা দাবি করি ও কোন কেরবি (=খুনখারাবি ?) করি লই জাএ তাহার পিতার ও চৌদ্দ পুরুষের নরকগামী হএ ও আজন্ম নরকে থাকিবেক ইতি॥

ইহা ছাড়া আরও অনেক বিচিত্র গালাগালি আছে যাহা অকথ্য, অলেখ্য এবং অপাঠ্য।

অনেক লিপিকার পুঁথির শেষে সন তারিখ বার, স্বীয় নাম ধাম ইত্যাদির সঙ্গে নিজের বাসস্থান বা যেখানে বসিয়া পুঁথি লেখা সমাপ্ত হইল তাহার বিস্তৃত চৌহদ্দী জুড়িয়া দিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিতেছি—

সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৩ অগ্রহায়ণ। এ পুস্তক শ্রীমাধবচন্দ্র বিশ্বাস সাং পাত্রসায়ের মোকাম রঘুনাথপুর বিশ্বাসপাড়া ৺কালীচরণ ঘোষের বাটীর পূর্ব্ব রাস্তার উত্তর বিদ্যাধর বিশ্বাসের বাটীর পশ্চিম সোনাতন ভাণ্ডারির বাটীর উত্তর সোনার গড়্যার দক্ষিণ। এই চতুঃসীমা॥

কৌতুকের বিষয় এই যে অনেক পুঁথির পুষ্পিকায় পুঁথি সমাপনের তারিখ বার তিথি নক্ষত্র প্রহর দণ্ড এবং স্থানের নিখুঁত চৌহদ্দি এমনকি অমুকের বাটীর অমুক দুয়ারি পিঁড়া ইত্যাদি খুঁটিয়া বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু সনটি দেওয়া নাই! এরকম 'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো' পুঁথিলেখকদের মধ্যে একেবারেই বিরল নয়।

কোন কোন পুঁথিলেখক নিজের নাম দিয়া তৃপ্ত না হইয়া পিতা পিতামহ এমন কি সাত পুরুষের নাম ("শ্রী" দিয়া!) চালাইয়া দিয়াছেন। যেমন,

সহক্ষরং (=স্বাক্ষর) শ্রীমাণিক্যদাসপ্রগনে (=পরগনে) দক্ষিণ সাভাজপুর (=শাহাবাজপুর) মোকাম ছান্দিয়া··· পুস্তক শ্রীমাণিক্য দাস পিসরে শ্রীমুক্তারাম দাস তান পিসরে শ্রীবেণুরাম [দাস] তান পিসরে শ্রীপ্রসাদ দাস তান পিসরে শ্রীভবানী দাস তান পিসরে শ্রীযদু দাস তান পিসরে শ্রীতিঅরাম দাস তান পিসরে শ্রীভঙ্গ দাস। সাত পুরুষঃ কশ্যপ গোত্র॥ গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির পরিবার॥ কোন গদাধর প্রিয় গদাধর॥

কেহ কেহ আবার আত্মীয় স্বজনের পরিচয় অথবা নিজের কথা বা আত্মজীবনীর কিছু কিছু ঘটনা বলিয়া গিয়াছেন। এই বর্ণনাগুলি বিশেষ কৌতুকাবহ। সেকালের জীবনের এগুলি যেন স্ন্যাপশট্। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

...ঘাড়ের মধ্যে সাল (=শল্য, বেদনা) হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম—এহি পুস্তক আর কেহর এলাকা নাহি···॥

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ গ্রন্থ করিলা লিখন।
যত্নেতে লিখিলা নিজের পাঠের কারণ॥
কলিকত্তার সিমল্যার বাজারেতে বাসা।
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম যাহার ভরসা॥
শ্রীঅকিঞ্চন দাস ঠাকুর কৃপার সাগর।
তাঁর স্থানে ছিল্যা এই গ্রন্থ মনোহর॥
দীননাথ দাস মূঢ় পাপী দুরাচার।
কেশে ধরি সভে মোরে ভবে কর পার॥
শকাব্দা ষোল শ নিরালর্বের বিংশতি ফাল্গুনে।
দ্বিতীয় প্রহরে সমাপ্ত হইলা লিখনে॥

নিম্নে উদ্ধৃত পুষ্পিকা হইতে জানিতে পারি যে লেখক মহাশয় গৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া এক বালকের প্রাইভেট টিউটর হইয়া থাকার কালে পুঁথিটি লিখিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাবল্লভ লাল পদ করি আশ।
ভারতের আশ্চর্য্য লিখিল শ্রীরামপ্রসাদ দত্ত দাস॥

তার পর কৈন্থু বাড়ী নিজ সয়ানন (?)।
বেহারি পলায়্যা গেল স্থকু ঘোষের নন্দন ॥
ঘোষের নিকটে আছি নিরাশ্রমে বসি।
এই কথা নিরাশ্রমে হইছে লোক হাসি ॥
কয়েক জায়গায় আমি চেষ্টা পাইল।
অবশেষে ঘোষ ছাওয়াল পড়াইতে গেল ॥
সংপ্রতিক যেই ছাওয়াল পড়ান অনুসারে।
........................দেবতার বরে ॥
লিখিতে বাহাল্য (=বাহুল্য) হয় সংক্ষেপে লিখিলা।
কিছুমাত্র তত্ত্বকথা নিবেদন কৈল্যা ॥

নিম্নে উদ্ধৃত, যদুনন্দন দাসের কৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্যের এক পুঁথির পুষ্পিকায় লিপিকার-জামাতা প্রদত্ত শ্বশুরের কথা নিরতিশয় কৌতুকাবহ। তবে শ্বশুর মহাশয়ের "প্রাইভেট লাইফ" প্রকাশ করিয়া তিনি যে জামাতার উপযুক্ত কাজ করেন নাই এ কথা বলা বাহুল্য। আরও দুঃখের বিষয় জামাতা মহোদয়ের ছন্দোজ্ঞান যৎ-সামান্যই ছিল। অথবা, বলিব যে তিনি ছিলেন মিল-হীন কবিতার প্রথম লেখক—ভুল করিয়া দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাটী হইতে কার্য্য অন্তে দিনাজপুর গমন।
আমানিগঞ্জে করিলাম পাণিগ্রহণ ॥
আমার শ্বশুর বন্ধ আছেন কোম্পানি ফাটকে।
তে কারণে স্থিতি মোর হৈল বার মাস ॥
তেঁহে আদেশ কৈলা পুস্তক লিখিতে আমাকে।
খালাস হইয়া তেহো গেলেন কলিকাতা ॥
এ সনে আমার গ্রন্থ লেখা হইল সমাপ্ত।
স্বাক্ষর মিদং শ্রীশচীনন্দন মিত্র ॥

অনেকে পুষ্পিকার মধ্যে বা অন্যত্র ডায়েরির মত স্থানীয় বা পারিবারিক সমসাময়িক ঘটনা নোট করিয়া গিয়াছেন। যেমন,

সন ১১৮৪ শালে শ্রীজয়হরি ঘোষ দ্বিতীয় পুত্র হয় রূপসনাতন ঘোষ ১৩ ফাল্গুন রবিবার বেলা ২৷৷০ আড়াই প্রহর ভিতরে ॥

সন ১১৫১ মঘী তাং ২৭ মাঘ শ্রীরামহরি দাস পীং জয়নারায়ণ দাস স্বঅক্ষর। আমলে শ্রীশ্রীযুক্ত কালীচরণ দেবান জীউ যেই দিন কৈলগাতা রাহি করিলেন সেই দিন ॥

শ্রীরামতনু যশ পুস্তক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সাকিম আঙ্গরোল গ্রামে বসিয়া লিখিয়াছিলাম। ছেয়াসি সালে ইজারা করিয়াছিলাম সে গ্রামে টোটা [=বজ্র?] পড়িয়াছিল সেই টোটার দায়ে পালাতক আঙ্গরোল গ্রামে গিয়াছিলাম তাহাতে এই পুঁথি বসিয়া লিখিয়াছিলাম......॥

এক লিপিকার পুষ্পিকার মধ্যে এই আদেশ জারি করিয়াছেন—

......আমাদের গ্রামের যে চোরা থাকে তাহাকে ফাড়িতে সুআইয়া তাহাকে জব্দ রাখিবে। ইতি তাঃ —২৬ অগ্রহায়ণ ॥

কয়েকটি পুঁথির পুষ্পিকার মধ্যে লিপিকারের পারি-শ্রমিকের উল্লেখ আছে। যেমন,

এ পুস্তকের [পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪] দক্ষিণা টং ১ এক টাকা হইল ॥

ইহার [পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪] দাম দেড় টাকা লইলাম ॥

একটি পুঁথিতে দামের সঙ্গে গ্রহীতার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনও রহিয়াছে—

......এ পুস্তক [চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০১] বলরাম দাস বৈরাগী। লিখিতং শ্রীনির্ম্মল দাস বৈরাগী। ইদং পুস্তক পুষ্পমাল্য করিয়া লইলাম ॥ ইতি ২ তঙ্কা ॥

কয়েক স্থলে পুষ্পিকায় সেকালের বাজার দরের কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। যাঁহারা সে যুগের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে গবেষণা করিবেন, এই সংবাদগুলি তাঁহাদের নিকট অমূল্য বিবেচিত হইবে। বর্ণনায় যে খেদ বা দুঃখের ভাব রহিয়াছে তাহা মর্ম্মস্পর্শী। যেমন,

গত সন দেবতা শুখা করিয়াছে এক্ষণে চার্ল্যের (=চাউলের) দর চব্বিশ পঁচিশ পাই আর কী প্রকার হয় ॥

ই বৎসর আবাদ অল্প হইয়াছে। ভাল রকমে হইল ইক্ষু। পোস্তভ হয় নাই। কাপাস টাকায় ৩৷৷০ চৌদ্দ পুয়া তাই পায় নাই ॥

কোন কোন পুঁথির পুষ্পিকা হইতে মূল্যবান ঐতি-হাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের রাজা,

রাজমহিষী এবং রাজকন্যারাও বাঙ্গালা পুঁথি পড়িতেন এবং লিখিতেন ইহা তাঁহাদের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে জানা গিয়াছে। বিষ্ণুপুরের রাজমহিষীদিগের উপাধি ছিল ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী। এক ধ্বজামণি পট্ট-মহাদেবী লিখিত প্রেমবিলাসের পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় আছে। মল্লরাজ চৈতন্যসিংহ দেবের জন্য লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার পুঁথিও পরিষদ গ্রন্থালয়ে রক্ষিত হইয়াছে। এই পুঁথিটির পুষ্পিকা হইতেছে—

মল্ল শক সন ১০৯২ সাল স্বস্তি মল্লমহীমহেন্দ্র মল্লাবনী-নাথ মহারাজাধিরাজ শ্রীল চৈতন্যসিংহ দেবস্য পুস্তকমিদং॥ জ্যৈষ্ঠস্য দশঞি দিবসে রবিবার নবম্যাং তিথৌ দিবা তিন প্রহরাভ্যন্তরে লিখিতং বিফলী জন্ম ভূতলে দীনহীন শ্রীচৈতন্যচরণদাসেন আদ্যলীলা গ্রন্থ সাঙ্গং করতু॥

বিষ্ণুপুরের "শ্রীশ্রীরাজকন্যা সাবিত্রী কোঙারি" দেবীর "পঠনার্থে" ১১৩৪ সালে লিখিত কৃষ্ণদাস বিরচিত কণ্ব-মুনির পারণ কাহিনীর পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে।

কবীন্দ্রের মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বের এক পুঁথির পুষ্পিকার লিপিকার নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু তারিখ দিয়াছেন। পুঁথিটি অনতিকাল পরেই সমাপ্ত হইয়াছিল। পুষ্পিকাটি এই—

পুস্তক লিখিতং স্বহস্তাক্ষর শ্রীরামপ্রসাদ শর্ম্ম বাগছি সাং চন্দ্রপুর পরগণে সোনাবাজু তপ্পে (=তরফে) চাপৈলা সরকার বাজুহার তালুক শ্রীযুত ৺বৃন্দাবনচন্দ্র দেবদেবস্য শকাব্দা ১৬৭৯ ষোল শত উনআশী সুবেদারি নবাব সিরাজদৌলা ফৌতি বতারিখ ১৮ই আষাঢ় যেওজ মিরজাফর জমিদার শ্রীমতী রাণী ভবানী দেব্যা গোমাস্তে দয়ারাম রায় সন ১১৬৪ এগার শ চৌষট্টি পুস্তক সমাপ্ত বতারিখ ১২ শ্রাবণ রোজ সোমবার দিবা·১ এক প্রহর সদম্যাং (?) তিথৌ……… ॥

শাহজাদা আজিমু-স্-সানের সুবেদারির সময়ে লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদিকাণ্ডের একটি পুঁথির পুষ্পিকা এইরূপ—

ইতি পুস্তক লিখিতং শ্রীমণীরাম দেবশর্ম্মন সকলম সহি পুস্তক শ্রীআত্মারাম গন্ধবণিকের সমাপ্ত লিখন হইল। ৪ মাঘ বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্থী শকাব্দ ১৬২২ সন হাজার এগার শহ ছয় শাল নিবাস রুকুনপুর আমল সাহজাদা মোকাম রাজমল (=রাজমহল) কবোরি গুলাব রায় শীকদার শ্রীবসন্ত রায়ঃ বৃহস্পতিবারের এক প্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি সমাচার হাতিশালার শ্রীমণীরাম ঠাকুরতার সহি॥

রামেশ্বরের শিবায়নের এক পুঁথির ভণিতাও উল্লেখ-যোগ্য—

শকাব্দা ১৬৭১ সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৫ই মাঘ রোজ বুধবার সপ্তম্যাস্তিথৌ রাত্রি এক প্রহরের কালে আমল মির হবিবুল্লা খাঁ ও লালুজী পিসর রঘুজি মারহাট্টা মোকাম তাম্রলাপিতপুর (=তাম্রলিপ্তপুর?) আমলে পরগনে কাশীযোড়া সরকার গোয়ালপাড়া মজফে সুবে উড়িস্যাঃ বহঙ্গাম পলায়ন বাবুজান খাঁ তনখাদার।

পুঁথি অপেক্ষা পুঁথির পুষ্পিকার আকর্ষণ যে সর্ব্বদাই নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নয় আশা করি এই আলোচনা হইতে কিছু দিগ্‌দর্শন মিলিবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে যে হাজার হাজার বাঙ্গালা পুঁথি আছে, সে-গুলির বিবরণ প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ে বিস্তৃত ও মূল্যবান গবেষণা হইতে পারে—আমার প্রবন্ধের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।



প্রেতের আহ্বান

শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্য ঘটনা। আমার একজন নিকট আত্মীয় ডাক্তারের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মজঃফরপুর সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে কলেরার প্রবল প্রাতুর্ভাব হয়। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তারি পাস করার পর প্রায় কয়েক বৎসর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের অধীনে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ঠিক্ সেই বৎসরেই মজঃফরপুরে ডাক্তারি আরম্ভ করি। বাঙ্গালী হইলেও বিহারে আমাদের বহুদিনের বাস। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পিতা কর্ম্মোপলক্ষে সেখানে যান এবং তদবধি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণের পরও আমরা অবিচ্ছিন্নভাবে সেইখানে বাস করিতে থাকি। মজঃফরপুরের বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত মুখার্জ্জি সেমিনারি স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি এবং জন্মাবধি সেখানে থাকায় সহর এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠি। কলিকাতায় ডাক্তারি করার উচ্চাকাজ্ক্ষা ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু হইলে কতকটা অনিচ্ছার সহিত মজঃফরপুর যাইতে বাধ্য হই এবং সেইখানেই আমার প্রকৃত ডাক্তারি জীবনের সূত্রপাত হয়।

আমার চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিবার প্রায় মাসখানেক পরেই এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হইতে সহরের মধ্যে তুই একটি করিয়া লোক কলেরা রোগগ্রস্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ সহরের বিভিন্ন বিভিন্ন পল্লীতে যখন রোগ অধিক সংখ্যায় দেখা দিল তখন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সন্ত্রস্ত হইয়া ড্রেন পরিষ্কার করান এবং বাজারের খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু সপ্তাহকালের মধ্যেই কলেরা হঠাৎ সংক্রামকরূপে বৃদ্ধি পাইয়া সহরের চতুর্দ্দিকে এবং সুদূর গ্রাম সমূহে ছড়াইয়া পড়িল। সুচিকিৎসা, কুচিকিৎসা এবং অচিকিৎসার ফলে দলে দলে রোগী মরিতে আরম্ভ করিল।

নিন্দুকেরা বলে যে রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। এই ধারণাপ্রসূত একটি গ্রাম্য প্রবাদ আছে যে চিকিৎসা ব্যবসায় মন্দা পড়িলে ডাক্তারের মাতা অথবা তৎস্থানীয়া কোনও গুরুজন বাটির ছাদের উপর কুলো শুকাইতে দেন। কুলোটি যতই রৌদ্রদগ্ধ হইয়া ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করে গ্রামে মড়ক ততই বাড়িতে থাকে এবং ডাক্তারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। আমার মাতা অথবা মাতৃস্থানীয়া কোনও লোক তখন মজঃফরপুরে না থাকায় আমি সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইবার দাবী করিতে পারি। কিন্তু উল্লিখিত গ্রাম্য প্রবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে সে বৎসর কেবলমাত্র একখানি কুলাই ছাদে উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এক একজন পুত্রকল্যাণকামিনী স্নেহময়ী ডাক্তার-জননী অন্ততঃ পাঁচসাতখানি করিয়া কুলা রৌদ্রদগ্ধ না করিলে কলেরা রোগের প্রকোপ অত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভবপর হইত না। বিহারী গ্রামবাসী অশিক্ষিত লোকেরা বলিল "কলেরা-মাই" (অর্থাৎ কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) এবার লক্ষ বলি গ্রহণ করিবেন। লোক মরিয়া ছোট ছোট গ্রাম জনহীন হইল, দাহ করিবার লোকের অভাবে মড়া গৃহপ্রাঙ্গণে পচিতে লাগিল, শৃগাল কুক্কুরের শব্দে পল্লীভূমি মুখরিত হইল,

ডাক্তারের স্নান আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় রহিল না, রাত্রিতেও চিকিৎসা করিবার জন্য ডাক আসিতে লাগিল। সে বৎসর মজঃফরপুরে "শতমারী বৈদ্য" কেহই রহিল না, সকলেই "সহস্রমারী চিকিৎসক" হইয়া দাঁড়াইল।

আমি কলিকাতা হইতে বৈজ্ঞানিক নূতন চিকিৎসা প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছি বলিয়া একটা জনরব পড়িয়া গেল এবং আমার নিকট রোগীর সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া ডাক্তারখানায় আসিয়াই কক্ষটি লোকপূর্ণ দেখিতে পাই, বাহিরের বারেণ্ডাও শূন্য থাকে না। সকলেই কলেরা রোগীর জন্য আসিয়াছে, যেন "কলেরা-মাই"এর প্রভাবে অন্য সমস্ত রোগ-দেবতা মজঃফরপুর জেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক লোকের নিকট রোগী এবং তাহার গ্রামের সংবাদ লইয়া সহরের রোগীগুলিকে আগে দেখিয়া আসি, এবং পরে ট্যাক্সি অথবা ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে রোগী দেখিতে যাই। অধিক দূরবর্ত্তী গ্রামের রোগী হইলে সময়ের অভাবে সেখানে যাইতে অনেকক্ষেত্রে অস্বীকার করিতে হয়। হঠাৎ কলেরার ঘূর্ণিবায়ুর মধ্যে পড়িয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রারম্ভেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া নূতন চিকিৎসকের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম।

একদিন সকালে ডাক্তারখানায় অন্যান্য লোকের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিবার পর ঘরের এক কোণে বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ কৃষিজীবী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে প্রায় আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী ঢোলী গ্রামে তাহার একমাত্র যুবা পুত্র রাত্রিশেষে কলেরা রোগগ্রস্ত হইয়াছে। বৃদ্ধের স্ত্রী এবং দুইটি কিশোরবয়স্কা কন্যা একে একে সপ্তাহকালের মধ্যেই কলেরায় মারা গিয়াছে। পিতাপুত্র ভয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দিনপাত করিতেছিল, কিন্তু 'কলেরা-মাই' আজ পুত্রটির উপরেও কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। সেই গ্রামে কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি রোগী দেখিতে গিয়াছিলাম, কলেরার ভীষণ প্রকোপে গ্রাম প্রায় জনহীন দেখিয়া আসিয়াছি। যাহারা গ্রামে ছিল তাহাদেরও দ্বার রুদ্ধ, ডাকিলেও উত্তর পাওয়া যায় না। কাহারও রোগ হইলে তাহার প্রতিবাসী, শক্তি থাকিলেও ডাক্তার ডাকিতে যাইতে অস্বীকার করে। কুসংস্কারগ্রস্ত গ্রামবাসীদের বিশ্বাস যে অপরের জন্য ডাক্তার ডাকিতে যাইলে, কলেরা-দেবী তাহার উপর কুপিতা হইবেন এবং রোগী নিষ্কৃতি পাইলেও, রোগীকে বাঁচাইবার প্রয়াসকারীর কলেরা রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বৃদ্ধ পিতা সেইজন্য গ্রামের কোনও সাহায্য না পাইয়া একাকী আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ডাক্তারের সাহায্য লইতে আসিয়াছে।

নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে কতকগুলি রোগীর সংবাদ পাইয়া আমি বৃদ্ধের দূরগ্রামস্থিত পুত্রের চিকিৎসার ভার লইতে অস্বীকার করিলাম। বৃদ্ধ অস্থির হইয়া আমাকে অর্থের লোভ দেখাইল, পুত্র হয়ত একাকী পড়িয়া আছে, মুখে একবিন্দু জল দিবারও লোক নাই বলিয়া অসহায় ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার করুণ দৃষ্টি বিপত্নীকের শ্রীহীন গৃহের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল। আর অস্বীকার করিতে পারিলাম না। অন্যান্য রোগী দেখা যথাসম্ভব শীঘ্র শেষ করিতে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা সময় লাগিবে হিসাব করিয়া তাহাকে বেলা দশটার সময় ট্যাক্সি আনিতে বলিলাম। বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হইল, সে ধীরে ধীরে আমার কক্ষ ত্যাগ করিয়া গাড়ির সন্ধানে চলিয়া গেল।

বেলা দশটার পূর্ব্বেই অন্যান্য কাজ শেষ করিয়া বৃদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন বৃদ্ধ আসিল না তখন একটু বিরক্ত হইয়া উপরে চলিয়া গেলাম। মনে করিলাম

সে হয়ত অন্য ডাক্তারের সাহায্য লইয়াছে। কিন্তু অপরাহ্ণ প্রায় চার ঘটিকার সময় বৃদ্ধ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত। তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ তাহাকে এত দেরী করিয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সে বলিল যে সমস্ত দিন আহার নিদ্রা ভুলিয়া চেষ্টা করিয়াও সে ট্যাক্সি যোগাড় করিতে পারিল না, যে কয়খানি ট্যাক্সি সহরে আছে তাহারা সর্ব্বদাই ডাক্তারদের লইয়া বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে ব্যস্ত। বৃদ্ধ ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া আনিবার অনুমতি চাহিল কিন্তু রোগী বিনাচিকিৎসায় তখনও জীবিত আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হইল এবং দীর্ঘপথ ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াতে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইবে মনে করিয়া তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলাম। বৃদ্ধ হতাশ হইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় এগারোটা। সমস্তদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর অবসন্ন হইয়া দ্বিতলের কক্ষে শুইয়া আছি। তখনও ঘুমাই নাই, অসম্বদ্ধ খণ্ড খণ্ড চিন্তা ধারা নানাবিধ আকারে পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, সুস্থ সবল চিন্তা নয়, বাস্তব জীবনের সহিত তাহাদের সম্বন্ধও অতি অল্প। একতলায় ডাক্তারখানার পাশের ঘরে কম্পাউণ্ডার ও চাকরটি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। হঠাৎ নীচের দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত শুনিতে পাইলাম। এরূপ প্রায়ই হয়, কিন্তু এত রাত্রিতে রোগী দেখিতে যাইতে হইলে যথেষ্ট টাকা দাবী করিয়া থাকি। ক্রমশঃ শব্দ জোরে জোরে হইয়া প্রথমে চাকরটি ও পরে কম্পাউণ্ডারের নিদ্রাভঙ্গ করিল। আগন্তুকের গলা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বৃদ্ধটি আবার আসিয়াছে, কিন্তু এ সেই দিনের বেলার পরিশ্রান্ত বৃদ্ধের ক্ষীণ গলা নয়, তাহার সবল কণ্ঠে যুবার শক্তি এবং উৎসাহ প্রকাশিত হইতেছে। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে দ্বারদেশে একটি ট্যাক্সিও দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ সমস্ত দিন সহরে অপেক্ষা করিয়া পীড়িত পুত্রের জন্য এত রাত্রিতে ট্যাক্সি আনিয়াছে সুতরাং কথামত তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। রোগ আরম্ভ হইবার পর প্রায় চব্বিশ-ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে ; রোগী তখনও জীবিত আছে কিনা তাহাই সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক দশ মিনিটের মধ্যে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া গাড়িতে উঠিলাম। আমার ঔষধের বাক্সটি লইয়া বৃদ্ধ মোটর চালকের পার্শ্বে বসিল। তীরবেগে ট্যাক্সিখানি সহরের প্রান্তভাগ অতিক্রম করিল।

গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন গ্রামপথে গ্রীষ্মকালে গাড়ি করিয়া যাওয়ার একটা আনন্দ আছে। রাস্তার দুই ধারে বিস্তৃত মাঠ, অসমতল পথ দিয়া আমাদের গাড়ি ছুটিয়াছে, জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক প্লাবিত। আমার সম্মুখে শিখ্ ড্রাইভার, তাহার বামদিকে বৃদ্ধ। বাতাসে বৃদ্ধের স্কন্ধস্থিত লাল ডোরাদার গামছাটি উড়িতেছে, আমার ঔষধের বাক্সটি দুই হাতে সযত্নে রক্ষা করিয়া নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত সে বসিয়া আছে। নিস্তব্ধ প্রান্তরে কলেরার কোনও কলুষচিহ্ন নাই, প্রকৃতির শান্ত অক্ষুব্ধ মূর্ত্তি। জীবন মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে যাইতেছি, কিন্তু প্রকৃতির সে মহিমময়ী স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাউদ্ভাসিত দিক্‌চক্রবালহীন মূর্ত্তি অজ্ঞাতসারেই আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিল। ক্ষণিকের জন্য রোগী, ঔষধ, বৃদ্ধ ও শিখ্ ড্রাইভার সমস্তই বিস্মৃত হইলাম।

হঠাৎ চমকিত হইয়া অদূরে খণ্ড খণ্ড অগ্নিকুণ্ড দেখিতে পাইলাম। একটি ক্ষুদ্র সেতু অতিক্রম করিয়া তখন গাড়ি চলিয়াছে, স্বল্পতোয়া, ক্ষীণরেখা একটি ক্ষুদ্র নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরস্থিত জ্যোৎস্না ও গাছপালার আলো ও অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। এতক্ষণের পর বৃদ্ধ কথা কহিল। তাহাদের গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়াছি, যেখানে গাছপালা ঘনীভূত হইয়া একখণ্ড নিবিড় অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে

সেই অন্ধকারের অন্তরালেই তাহাদের গ্রাম। গাড়িতে যাইতে যাইতে অগ্নিকুণ্ডগুলি গুণিতে লাগিলাম, গভীর রাত্রিতে একটিমাত্র ক্ষুদ্রগ্রামের আটটি মৃতদেহ দগ্ধ হইতেছে। নির্ব্বাণোন্মুখ কয়েকটি চিতাও দেখিলাম। সে দৃশ্য আমি ভুলিব না। একদিকে শুভ্র জ্যোৎস্না, অন্যদিকে তাম্রবর্ণ অগ্নিশিখা,—কোনও চিতার নিকট দুইজন লোক, কোথাও তিনজনের বেশী নাই। অস্থির আলোকে দাহকারীদের ভীতিবিহ্বল মুখ মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে, সকলেই নির্ব্বাক্, যেন প্রেতমণ্ডলী প্রেতের দাহকার্য্য সমাপন করিতেছে। দিগন্তব্যাপী একটা জমাট নিস্তব্ধতা, মোটরের একঘেয়ে ফোঁসফোঁসানি, বৃদ্ধের প্রস্তরবৎ কঠিন মুখ, বামপার্শ্বে বাতাসে শবদেহের দুর্গন্ধ, দক্ষিণে গ্রামের তরুশাখাসমাবৃত নিবিড় অন্ধকার। এ যেন প্রকৃতির করাল সংহারমূর্ত্তি। একটা অজ্ঞাত ভীতিতে সমস্ত মনটা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

গ্রামের প্রান্তভাগে বৃক্ষশ্রেণীর নিকট বৃদ্ধ গাড়িটি থামাইল। কয়েকটি কুটির সেখান হইতে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। গাড়ি হইতে নামিয়া নির্দ্দেশ মত তাহার পিছু পিছু অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তাহার স্কন্ধে সেই লাল ডোরাদার গামছা, হাতে ডাক্তারের বাক্স, পদবিক্ষেপ গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ দ্রুততর হইতেছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গৃহাভিমুখী বৃদ্ধের সহিত হাঁটিতে হাঁটিতে যেন হাঁপাইয়া পড়িতে লাগিলাম। অবশেষে এক কুটিরের সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। আমি তাহাকে ভিতর হইতে আলো আনিতে বলিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, সে অর্গলমুক্ত বদ্ধদ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

বাহিরে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি, অথচ বৃদ্ধের দেখা নাই। প্রতি মুহূর্ত্ত যেন যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, দূরে দূরে যে দুই একটি কুটির রহিয়াছে তাহাদের দ্বার রুদ্ধ। ট্যাক্সি গাড়িটি অনেকদূরে গ্রামপ্রান্তে ছাড়িয়া আসিয়াছি। একাকী অন্ধকারের মধ্যে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধকে ডাকিতে লাগিলাম। তথাপি কোনও উত্তর নাই। অবশেষে অসহিষ্ণু হইয়া দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তাহার পরই উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত বারেণ্ডা, বারেণ্ডার কোলে দুইখানি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কোনও মানুষই দেখিতে পাইলাম না। তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে দক্ষিণ-দিকের বারেণ্ডার প্রান্তভাগে রজ্জুনির্ম্মিত খাটিয়ার উপর যেন একটি লম্বমান মনুষ্যমূর্ত্তি শয়ান রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল, তাহার অদূরে একটি ক্ষুদ্র হারিকেন বাতিও মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল। দীপশিখা এতই ক্ষীণ ও বাতির কাঁচটি এতই মসীলিপ্ত যে বিশেষ নিরীক্ষণ না করিলে আলো বলিয়া চেনা যায় না। সন্দেহ হইল রোগী হয়তো মরিয়া গিয়াছে, ডাক্তারকে তাহার পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে লুকাইয়া আছে। এই কথা মনে হইবামাত্র দারুণ ক্রোধ হইল, এবং ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সাধারণ বিবেচনাশক্তি হারাইয়া ফেলিলাম। চীৎকার করিয়া পরুষকণ্ঠে বৃদ্ধকে ডাকিতে ডাকিতে বাতিটি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম।

কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়াই দীপশিখার অস্পষ্ট আলোকে মনে হইল যেন কোনও লোক সেই রজ্জু-নির্ম্মিত শয্যার একপ্রান্তে নিজ মস্তকটি রক্ষা করিয়া ভূমিতে উপবিষ্ট রহিয়াছে। দুইটি লোক অথচ কেহ সাড়া দিতেছে না। স্তব্ধ হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। তখনই লক্ষ্য হইল যে উপবিষ্ট লোকটির দক্ষিণ স্কন্ধে সেই লাল ডোরাদার গামছাখানি একভাবে স্থাপিত, এবং তাহার পার্শ্বে আমার ঔষধের বাক্স। এখন আর বৃদ্ধকে চিনিতে দেরী হইল না। সে বোধ হয় পুত্রের শয্যাপ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে, দুশ্চিন্তার আতিশয্যে মূর্চ্ছিত হওয়াও অসম্ভব নয়। ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে যাইতেই

প্রথমে সেই লম্বমান মনুষ্যদেহ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সম্পূর্ণ নগ্নদেহ, হস্তপদ প্রসারিত করিয়া শুইয়া আছে, নিশ্চল ও নিস্পন্দ। মনে হইল এই সেই অসুস্থ যুবক, বৃদ্ধের পুত্র। কিন্তু বৃদ্ধ কথা কহিতেছে না কেন? পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া শোকে কি জ্ঞান হারাইয়াছে? বাতিটি তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধের নিকটে যাইয়া মাথা ঠেলিয়া তাহাকে ডাকিলাম। তাহার কপাল বরফের মত শীতল, আমার হস্তস্পর্শে একখণ্ড পাথরের মত তাহার কঠিন ও ভারী মৃতদেহ সশব্দে আমার ঔষধের বাক্স চাপিয়া ভূমিতে পতিত হইল। দেহের 'রাইগার মর্টিস' (কঠিনতা) দেখিয়া মনে হইল অন্ততঃ চার পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বেই বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে।

আমার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা দূরের কথা এখন ভালরূপ স্মরণও করিতে পারি না। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, ভূতপ্রেতের আষাঢ়ে গল্প কখনও পড়ি নাই, লোককে বলিতে শুনিলে উপহাস করিতাম, বিবাহ করি নাই, সুদৃঢ় বক্ষে অসীম সাহস রাখিয়া থাকি। কিন্তু সেই গভীর রাত্রে নির্জ্জন কুটির মধ্যে দুইটি শবদেহের সম্মুখীন হইয়া ঘামিতে লাগিলাম, কি করিব হঠাৎ স্থির করিতে পারিলাম না, চীৎকার করিবার শক্তিও বোধ হয় হারাইয়াছিলাম। শবদেহ দুইটিকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে হাঁটিতে হাঁটিতে কুটিরদ্বার অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। সমস্ত পথ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ি পৌঁছিলাম। চাকরটি ঔষধের বাক্স মোটরের মধ্যে না পাইয়া মোটর চালকের সহিত তর্ক আরম্ভ করিল। আমি দ্বিতলের কক্ষ হইতে বলিলাম যে ঔষধের বাক্সটি রোগীর বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছি।

বিনিদ্রযামিনী কোনরূপে অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হইবামাত্র সেই ট্যাক্সিচালককে ডাকিয়া আনিবার জন্য কম্পাউণ্ডারকে পাঠাইলাম। ট্যাক্সি আসিলে কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে লইয়া ঢোলী গ্রামাভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিলাম। ঔষধের বাক্সটি চাকর পাঠাইয়া আনাইতে পারিতাম, কিন্তু মনে নানাবিধ প্রশ্ন উঠিয়া আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নিজে সেই স্থানে যাইয়া সমস্ত প্রশ্নের সমাধান না করিলে কোনও কার্য্যে মনোনিবেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। সকাল প্রায় ন'টার সময় সেই গ্রামে উপস্থিত হইলাম। পথে দুই তিনটি গ্রামবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাদের সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে বিশাল এক আম্রবৃক্ষের ছায়ায় বৃদ্ধের কুটিরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমার নিজের প্রশ্নই তখন আমাকে অস্থির করিয়াছে, অপরের প্রশ্নের উত্তর দিবার অবসর কোথায়? দ্রুতগতিতে কুটিরে প্রবেশ করিলাম। রাত্রের সেই একই দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল। খাটিয়ার উপর লম্বমান মৃত যুবক, শয্যাপার্শ্বে মৃত বৃদ্ধ হাঁটু দুইটি সঙ্কুচিত করিয়া পড়িয়া আছে, ভূমিতে তাহার স্কন্ধস্থিত লাল ডোরাদার গামছা, তাহার অদূরে আমার ঔষধের বাক্স, এক অংশের উপর বৃদ্ধের কঠিন হস্ত তখনও বিন্যস্ত। মৃতদেহ দুইটিই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি সেই কুটিরে কেন প্রবেশ করিলাম এবং আমার বাক্সটি বৃদ্ধের নিকট কিরূপে আসিল তাহাই গ্রামবাসীরা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি কোনও উত্তর না দিয়া তাহাদের নিকট শুনিলাম যে যুবকটির রাত্রিশেষে কলেরা হওয়ায় বৃদ্ধ প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার আনিবার জন্য সহরে যায়। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইতে থাকে। প্রায় সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ ডাক্তার না পাইয়া ক্লান্তদেহে ভগ্নহৃদয়ে নিজ

কুটিরে ফিরিয়া আসে। তখনও ছেলেটি জীবিত। হঠাৎ বৃদ্ধের ভেদবমি আরম্ভ হয় এবং রাত্রি প্রায় আট নয়টার সময় তাহার মৃত্যু হয়। তখন গ্রামবাসী দুইজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধকে মৃত এবং ছেলেটিকে মৃতকল্প দেখিয়া গ্রামবাসীরা ভীত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যায়। আমি মৃতদেহ দুইটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম যে গ্রামবাসীদের কথা সম্পূর্ণ সত্য, ছেলেটির কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বেই বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছিল।

গতরাত্রের ঘটনা গ্রামবাসীদের নিকট কিছুই প্রকাশ করিলাম না। অনেক অনুরোধের পর তাহারা মৃতদেহ দুইটি সৎকার করিতে সম্মত হইল। আমি ঔষধের বাক্সটি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম!

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিলের সেই ভীষণ রাত্রিতে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলাম তাহার সমাধান আজিও হয় নাই। বৃদ্ধ কখন মারা গিয়াছিল? সন্ধ্যারাত্রিতে গ্রামবাসীদের সম্মুখে যদি বৃদ্ধ মারা গিয়া থাকে তাহা হইলে রাত্রি ১১টার সময় কে আমাকে তাহার কুটিরে ডাকিয়া আনিয়াছিল? যখন রাত্রি ১১টার সময় চিকিৎসার জন্য আমার ডাক আসিয়াছিল তখনও কি ছেলেটি জীবিত? ইহা কি প্রেতের পরিহাস, অথবা অশরীরী আত্মার মমতার আকর্ষণ?



চলমল সাধুর গানের বন্দনা

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বি-এ,
কাব্যব্যাকরণতীর্থ সাহিত্যরত্ন।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়, তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশে গ্রাম্য-ছড়ায় ও গীতে বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব আত্ম গোপন করিয়া আছে।" পল্লীগীতি ও ছড়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে এ বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারিত হয়।

উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর জেলায় "চলমল সাধুর গান" নামে একটি গান প্রচলিত আছে। গীতি কাব্য হিসাবে উত্তর বঙ্গ গীতিকায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সন্দেহ না থাকিবার সম্ভাবনা। গানের বিষয়বস্তু এইরূপ ;—চানদামা শহরের লক্ষ্মীমাতার পুত্র চলমল সাধুর সহিত পাটগ্রামের শঙ্খরাজার কন্যা দুবুলা সুন্দরীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর ধন দৌলত সব নিঃশেষ হইয়া যায়। লক্ষ্মী মাতার আদেশক্রমে চলমল সাধু বাণিজ্যে গমন করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। নব পরিণীতা প্রিয়তমা পত্নী দুবুলা-সুন্দরীর কাতর মিনতি তাঁহাকে নিবৃত্ত করাইতে পারিল না। সাধু বাণিজ্যে গমন করিলে দুবুলা প্রতিদিন ঘাটের পথে বসিয়া কাঁদে। রাজ্যের কোটাল তাহা দেখিতে পাইল এবং তাহাকে ভুলাইয়া আপন বশে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার স্বামী বিদেশে যাইবার পর, তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, অন্য রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া পরম সুখে কাল কাটাইতেছে। এরূপ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত করিয়া বিদেশ প্রত্যাগত স্বামীকে বধ করিবার জন্য দুবুলাকে পরামর্শ প্রদান করিল। স্বামীকে বধ করিলে কোটাল তাহার সুখের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিল। বার বৎসর পরে চলমল সাধু বাড়ী ফিরিলেন। রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলে "পাণির তেজের ছুরি" দিয়া দুবুলা স্বীয় স্বামীর প্রাণ নাশ করিল এবং কোটালের পরামর্শ অনুসারে "নীল নদীর মাঝে" মৃতদেহ ভাসাইয়া দিল। লক্ষ্মীমাতা সকল বিষয় অবগত হইলেন এবং পুত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করিয়া "নীল নদীর মাঝে" ভাসিয়া চলিলেন। তাহার ক্রন্দনে মহাদেব বিচলিত হইলেন এবং নারদের নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া মন্ত্র প্রয়োগে চলমল সাধুর জীবন দান করিলেন। এদিকে দুবুলা কোটাল কর্তৃক প্রত্যাখাতা হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে স্বামীর নামে একটি "কাঙ্গালখানা" খুলিয়া অতিথি সেবা করিতে লাগিল। লক্ষ্মীমাতা চলমল সাধুকে সঙ্গে লইয়া সে স্থানে উপনীত হইলেন এবং দুবুলার সেবাশুশ্রূষায় বিশেষ প্রীত হইলেন। দুবুলার পরিচয় পাইয়া তাহাকে লইয়া তাহারা দেশে ফিরিলেন এবং দুবুলার পরামর্শমতে চণ্ডী পূজার আয়োজন করিলেন। অন্যান্য সকলের ন্যায় কোটাল সেস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে খড়্গাঘাতে দুবুলা তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল।

আধুনিক কালের অনেক কিছু, গানের মধ্যে প্রবেশ করিলেও শিক্ষণীয় বিষয় ইহার মধ্যে অনেক আছে।

এখন গানের বন্দনাই আমাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু। বন্দনার মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আত্মগোপন করিয়া আছে।

চলমল সাধুর গানের চান্‌দামা শহরের কোন সন্ধান এখন আমরা পাই না। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ির পাশা পাশি স্থানে পাটগ্রাম বলিয়া একটি স্থানের নাম পাওয়া যায়। সেস্থানে শাঁখ রাজার বাড়ী ছিল কিনা জানা যায় না।

গ্রাম্য-গানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া একটা জিনিষের সন্ধান খুব কম মেলে। পাবনার যে সকল

এই চলমল সাধুর গানের আবার "দুবুলা কন্যার গান", "সাধুকন্যার গান" প্রভৃতি নামভেদ আছে। রঙ্গপুরের নাথশ্রেণী কর্তৃক এই গান বিরচিত—নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই গান বেশী প্রচলিত।

অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার বিষয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বেও তাহার নাম গন্ধ সেই সব অঞ্চলে ছিল না। এমন কি, জারির গানের সন্ধান করিতে গিয়া মুসলমান গায়েনের মুখে হিন্দুর দেব দেবীর নামের বন্দনা করিতে শুনিয়াছি। উত্তর বঙ্গে প্রচলিত বহু গানের মধ্যে আছে—

মুসলমানে বলে আল্লা, ভক্তে বলে হরি। গ্রাম্য বন্দনা গানে সর্ব্বপ্রকারে "দেব-দেবীর" উপর নির্ভর করিবার নির্দ্দেশ আছে। দেব-দেবীর নাম করিয়া আসরে দাঁড়াইলে গানের বিষয়-বস্তু নাকি মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইতে থাকে। গ্রাম্য কবির সহজ সরল বর্ণনায় মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই। এস্থলে কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

লক্ষ্মী মা, দিনটার মত আছি মাগো নিরাস্তর হৈয়া।
আসরে দাঁড়াইলাম মা তোমার নাম লৈয়া॥
এস এস মা লক্ষ্মী অগে করি ভর।
জয় শব্দ দিয়া বইস আমার মস্তকের উপর॥

* * *

এস এস মা লক্ষ্মী বন্দোঁ চরণখানি।
গলায় আমার অস (১) দেও, মুকখে যে মধুর বাণী॥
তোমার গাওনা তোমরা গামেন উপলক্ষ্য আমি।
গান ভাঙ্গিলে ওমা লজ্জা পামেন তুমি॥
আমি বাল্লক লজ্জা পাব সভার মাঝে।
তুমি মা পামেন লজ্জা দেবতার ভুবনে॥
লক্ষ্মী মা, ডাইনা দোয়াড়ের কণ্ঠে দিয়া দু'খানি পাও।
আমার কণ্ঠে বসি মাগো লহরী খেলাও॥

দেব দেবীর বন্দনা করিবার পর দশ দিকের বন্দনা উল্লিখিত হইয়াছে। আসরের কোণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান চলিতে থাকে। পূর্ব্ব দিক্ বন্দনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

লক্ষ্মী মা, পূবে আজা বন্দিগাওঁ ভানু ভাসাস্কর।
সকালে উঠিয়া বান্দ: যাক্ (২) করে প্রণাম॥

রাজা ভানু সম্বন্ধে কোন তথ্য এখন অবগত হওয়া যায় না। আপাততঃ সূর্য্যের বন্দনা স্বরূপ উহা ধারণা করা অন্যায় হইবে না। উত্তর দিক বন্দনা-প্রসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

মাগো উত্তরে বন্দিয়া গাওঁ আজা জল্পেশ্বর।*
সেই যে পশুরাম রাজা ভাল বান্দে লোহার ঘর।
ঘরখানি বান্দিল রাজা তাইত জানি মনে।
কত শত লোক মরিলে সেই ঘরের ভিতরে॥
নফর মরিয়া রাজার নাই পোরে আশ্।
অবশেষে মহারাজ ইন্দ্রে (=ইঁদারায়) দিলে ঝাপ্॥

প্রাগৈতিহাসিক যুগে জলপাইগুড়ী, রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি জেলা প্রাগ্জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমানে কামরূপ) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জল্পেশ নামে এক রাজা কামরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে একটি বনের মধ্যে জল্পেশ লিঙ্গ লক্ষিত হয় এবং সেস্থানে রাজা জল্পেশ্বর শিব মন্দির নির্ম্মাণ করেন। চলমল সাধুর বন্দনা গানে পশুরাম রাজা কর্ত্তৃক অধীন ভৃত্যের বধের কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। এই পশুরাম রাজাই জল্পেশ রাজা কিনা তাহা অনুসন্ধেয়। পশুরাম রাজার কাহিনী এখনো লোকের অবিদিত।

রাজা কেন নফর মারিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ, নফর মারিয়া রাজার অনুতাপ হইয়াছিল; সেজন্যই তিনি ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

পশ্চিম দিক্ বন্দনা প্রসঙ্গে মুসলমানের পীর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

মাগো পশ্চিমে বন্দিয়া যাওঁ পাড়ুয়ার মোকাম॥
পাড়ুয়ার মোকামে বন্দোঁ পাড়ুয়ার পঞ্চ পীর।
বেদমন্ত্র ভস্ম যার কল্লে মা জিগ্গীর॥

* * * *

মাগো পীর মধ্যে বন্দি' যাওঁ নামেতে ভেঙ্গরা।
চৌদ্দ সাঙ্গে না নড়ে যার নামাজের কাপড়া॥

শেষোক্ত অংশের সহিত হেয়াত মামুদ বিরচিত ১১৬৫

১। অস—রস। ২। যাক্—যাহাকে।

* জলপাইগুড়ী হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে জল্পেশ নামক গ্রামে জল্পেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। শিব চতুর্দ্দশীর সময় এস্থানে বড় মেলা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন জল্পেশ্বর শিব ভৈরবের অন্যতম মূর্ত্তি বিশেষ। চিলাহাটি ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে বোদা নামক স্থানে বোদেশ্বরীর মূর্ত্তি আছে। উক্ত স্থানে দেবীর ৫২ পিঠের এক পিঠ পড়িয়াছিল—বোদেশ্বরীর অন্য নাম ভ্রামরী (?)। দেবীর মূর্ত্তির কাছে ভৈরবের মূর্ত্তি থাকিবার কথা, সেস্থানে তাহা নাই। জল্পেশ নামক স্থানে তিনি অবস্থিত বলিয়া অনেকের ধারণা।

সালের "আম্বিয়া বাণী"* নামক একখানি পুঁথির বন্দনা গানের সামঞ্জস্য আছে।

গরীব হুসেন বন্দোঁ পীর খোকড় পাশ্।
ছাড়িয়া উত্তর বস্ত্র খোকড়া খোস্ ॥

দক্ষিণ দিক্ প্রসঙ্গে কেলীকদম্ব মূলে শ্রীকৃষ্ণের বংশী-নিনাদকে উপলক্ষ্য করা হইয়াছে। অনন্ত সাগরের মধ্যে একটি কেলীকদম্ব বৃক্ষ ভাসিয়া চলিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ সে স্থানে মনের আনন্দে বাঁশরী বাজাইতেছেন।

মাগো দক্ষিণে বন্দিয়া যাঙ খিল নদীর সাগর ॥
খিল নদীর সাগরে বন্দোঁ খিল কদম্বের গাছ। (১)
খিলা মুকুখ হআ কৃষ্ট বাঁশী পূরায় আশ্ ॥

এইরূপে চারিদিক বন্দনা করিবার পর দশের চরণ-বন্দনা করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দশের চরণ বন্দনা করিবার রীতি বৈষ্ণব যুগ হইতে প্রসারলাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মাগো পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারকোণ বন্দোঁ মাথে।
দশের চরণ বন্দোঁ তুলিয়া নেও মস্তকে ॥

এস্থলে আমরা একটি বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। গানের মধ্যে ব্রজবুলির ভাব ভাষা পাওয়া যায়, তাহা আবার কৃষ্ণ ধামালীর গানকে আশ্রয় করিয়াছে। কৃষ্ণধামালীর গান বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র-ই প্রচলিত। যমুনার তীরে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার মিলন-গীতি চলমল সাধু ও দুবুলা কন্যার মিলনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাণিজ্য হইতে ফিরিবার পর ঘাটের পথে দুবুলা কন্যার সহিত চলমল সাধুর দেখা হয়। তাহারা যেন উভয়ে উভয়কে চিনিতে না পারিয়াই রঙ্গ করিয়া গান করিতে থাকে।

—জল ভর সুন্দর কইনা জলে দিয়া ঢেউ।
একেলা ঘাটে এইসাছ ক'ন্যা, সঙ্গে নাই তোর কেউ।
—তুমি ত রাজার ছাইলা, বিভাও ক'রতে পার।
পরার রমণীক দেখি, জলে পুড়ে মর ॥
—আমি ত রাজার ছাইলা বিভাও করতে পারি,
তোমার মত রূপের কইনা মিলাইতে না পারি ॥
—আমার মত রূপের কইনা যদি মিলাইতে চাও,
গলায় কলসী বেঁধে জলে ঝম্প দেও,
—কোথায় পাব কলসী ক'ন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তোমরা হও যমুনার জল, আমরা ডুবে মরি ॥

ক্রমে গানের বন্দনায় "আকাশের তারা", "পাতালের বালা" প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া, পরে "দেওয়ান মরার" কথা প্রকাশ পাইয়াছে। এই দেওয়ান কে ছিল, তাহাও জানা যায় না।

তারপর বন্দিয়া যাঙ দেওয়ান মরার কথা।
শূন্যাকারে আইসে দেওয়ান নৈরাকারে যায়।
মরিলে যমের বান্দা উত্তর শিওর হয় ॥

উত্তর শিওরে মাথা রাখিয়া শয়ন করা নিষিদ্ধ। এখনো উক্তরূপ সংস্কার গ্রাম্য অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

পরিশেষে গুরুজনকে বন্দনা করিয়া বন্দনা-গান শেষ করা হইয়াছে। কাহাকেও "গুরুদায়" দিয়া গান করিবার রীতি এখনো পল্লী গায়েনদের মধ্যে আছে। গানের গুরু স্থির করিতে হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন ভেদ নাই।

মাগো আদিগুরু বন্দি যাঙ শিক্ষাগুরুর পাও।
শিক্ষার গুরুর পাও বন্দি, বন্দো জননী বাপ মাও ॥
মাও বন্দোঁ কোল ধরণী বাপ জন্ম দাতা।
শ্বশুর শাশুড়ী বন্দোঁ তিন কুলের দেবতা ॥
গাওনার গুরুর চরণ বন্দোঁ হইয়া হরসিত।
তান্ চহর দিয়া গুরু শিক্ষা করায় গীত ॥
মাগো, বন্দনা করিতে মাগো আর নাই শকতি।
প্রণাম করি বন্দি যাঙ মা ভগবতী ॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অনুরূপ অনেক কিছু গ্রাম্য গীতির মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। পল্লীবাসীরা একরকম খেয়ালবশে এই সমস্ত গান করিয়া থাকে, কিন্তু খেয়ালের পিছনেও যে আসল কিছু থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* "অম্বিয়া বাণী"—আল্লার সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে রচিত। আল্লার সৃষ্টির মধ্যে ধরণীই প্রধান সৃষ্টি, সহনীয়তায় এবং কোমলতায় ধরণী অদ্বিতীয়। তাহা প্রসঙ্গক্রমে দেখান হইয়াছে।

১। খিল কদম্বের গাছ—এই গাছ আকারে ছোট হয়। রঙ্গপুর জেলায় শিমূলবাড়ী গ্রামের একটি বিলের মধ্যে এরকম একটি গাছ আছে। গাছটি কত দিনের কেহ নির্ণয় করিতে পারে না, ইহার সঙ্গে অনেক কিম্বদন্তী বিজড়িত।

সাগর-পারের পাখী

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

অস্ত রবির গোধূলি-সোনায় ছড়ায়ে পাখা
কোথা যাও ওগো সুদূর সাগর-পারের পাখী ?
আমার বনের সবুজে কাঁপিছে রঙীন ছায়া,
সেথায় ক্ষণেক পালক দোলায়ে দাঁড়াবে নাকি ?
হয়ত আরেক উতলা ফাগুনে এমন করি'
রঙের নেশায় উঠিবে না হায় নয়ন ভরি',
হয়ত বন্ধু, তোমার অসহ সুরের ডাকে
ফুলের মতন যাবে না জীবন গন্ধে ঢাকি' ;
আজি ডাকি তাই অস্ত-আলোয় ব্যাকুল গানে
অসীমে-হারানো ওগো ও সাগর-পারের পাখী !
তুমি চ'লে যাও আলোক ছড়ায়ে এলানো পাখে,
গানে গানে ভাঙি ছিন্ন মেঘের রক্ত-ফেনা।
তুমি চ'লে যাও অচেনা দেশের আভাস দিয়া
ভুলায়ে আমার মাটির ধরার সকল চেনা।
তুমি চ'লে যাও আমি চেয়ে থাকি অবাক্ প্রাণে,
চেয়ে চেয়ে শুনি বাতাস কাঁপিছে তোমার গানে,
তুমি যেন কার স্খলিত বীণার রাগিণী সম
ছুটিয়া চলেছ গ্রহ-তারাদল স্বপনে ঢাকি'।
আমি ডাকি হায় অস্ত-আলোয় ব্যাকুল গানে
অসীমে-হারানো ওগো ও সাগর-পারের পাখী !



বিপিনের সংসার

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলাইয়ের দাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়া বিপিন রাত্রি দুপুরের পরে বাড়ী আসিল। বাড়ীসুদ্ধ সবাই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওপাড়া হইতে কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী আসিয়া অনেকক্ষণ হইতে বসিয়াছিলেন, বিপিনের মাকে নানারকমে বুঝাইতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ সময় সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা, সুতরাং হুঁকা হাতে রোয়াকের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপিন বলিল কাকা, কখন এলেন? তামাক পেয়েছেন?

—আর বাবা তামাক! তামাক তো আছেই। এখন যে বিপদে পড়ে গেলে তা থেকে সামলে উঠলেই বাঁচি। বৌদিদিকে বোঝাচ্ছি সেই সন্দে থেকে, উনি মা, ওঁর কষ্ট তো চোখে দেখা যায় না—এসো বাবা—পরে বিপিনের চোখে জল পড়িতে দেখিয়া বলিলেন—আহা হা, তুমি অধৈর্য্য হোলে চল্‌বে কেন বাবা? এদের এখন তোমাকেই ঠাণ্ডা করতে হবে—বোঝাতে হবে—বৌদিদি, বৌমা, বীণা—তোমাকে দেখে ওরা বুক বাঁধবে—তোমার চোখে জল পড়লে কি চলে?···

এমন সময় আরও দু পাঁচজন প্রতিবেশী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। একজন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিনের মাকে বোঝাতে গেলেন। একজন বিপিনের হাত ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

—রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়ো সব। সকলেরই শরীর খারাপ, কেঁদেকেটে আর কি হবে বলো বাবা, যা হবার তা হয়ে গেল। সবই তাঁর খেলা, দুনিয়াটাই এইরকম বাবা, আজ আমার, কাল আর একজনের পালা—শুয়ে পড়ো—

কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী রাত্রি এখানেই কাটাইবেন। ইহারা একা থাকিবে তাহা হয় না। আজ রাত্রে অন্ততঃ বাড়ীতে অন্য কেহ থাকা খুব দরকার। বিপিন সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না, কৃষ্ণলালের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় রাত কাটিয়া গেল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন—তুমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ বাবাজি?

—আজ্ঞে ছুটি তো নয়। রাণাঘাট কোর্টে এসেছিলাম কাজে—সেখান থেকে বাড়ী এলাম এক দিনের জন্যে। তারপর তো বলাইয়ের অসুখ ক্রমেই বেড়ে উঠলো আর যাই কি করে—আটকে পড়লাম। তবে জমিদার বাবুকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছি—এ কথাও লিখে দেবো কাল। এখন ধরুন এদের ফেলে হঠাৎ কি করে বাড়ী থেকে যাই? মায়ের ওই অবস্থা, আমি কাছে থাকলেও একটা সান্ত্বনা, তারপর ছোঁড়াটার শ্রাদ্ধশান্তির একটা ব্যবস্থাও আমি না থাকলে কি করে হয় বলুন; শ্রাদ্ধশান্তি আর কি, তিলকাঞ্চন করে দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ খাইয়ে দাও—এ তো জাঁকিয়ে শ্রাদ্ধ করার কিছু নেই। কোনোরকমে শুদ্ধ, হওয়া।

সকালের দিকে মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন দেখিয়া বিপিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ীতে যাইতে ভাল লাগে না—সকলে সহানুভূতি দেখাইবে 'আহা,' 'উহু'

করিবে—বর্ত্তমান অবস্থায় বিপিনের তাহা অসহ্য মনে হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আইনদ্দির বাড়ীতে গেল, পাশের গ্রামে। আইনদ্দির বয়স একশত বছর হইলেও (অন্ততঃ সে বলে) বসিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়। বাড়ীর উঠানে একটা আমড়াগাছের ছায়ায় বসিয়া বৃদ্ধ জালের সূতা পাকাইতেছিল।

—বাবাঠাকুর সকালে কি মনে করে? বোসো—তামাক খাবা? সাজি দাঁড়াও। আইনদ্দির সঙ্গেই তামাক খাইবার সরঞ্জাম মজুত। সে চকমকি ঠুকিয়া সোলা ধরাইয়া হাতে করিয়া সোলার টুক্‌রাটি কয়েকবার দোলাইয়া লইয়া কলিকায় কাঠকয়লার উপর চাপিয়া ধরিল।

বিপিন বলিল—চাচা, দেশলাই বুঝি কখনো জ্বালাও না?

—ও সব আজকাল উঠেছে বাবাঠাকুর—ও সব তোমাদের মত ছেলে ছোকরারা কেনে। সোলা চকমকির মত জিনিস আর আছে? আপনি ভাল হয়ে বোসো। সেকালের দু একট গপ্প করি শোনো। ওই যে দ্যাখ্‌চো অশথ গাছ, ওর পাশের জমিটার নাম ছেল ফাঁসিতলার মাঠ। নীলপুরীর আমলে ওখানে লোকের ফাঁসি হোত। আমার জ্ঞানে আমি ফাঁসি হতে দেখেছি। তুমি আজ বলচো দিশলায়ের কথা—দিশলাই ছেল কোথায় তখন? তুঁষের আর ঘুঁটের আগুন মাগীন্‌রা মাল্‌সা পুরে রেখে দিতো ঘরে—আর পাঁকাটির মুখে গন্ধক মাখিয়ে এক আঁটি করে রেখে দিত মাল্‌সার পাশে। এই ছেল সেকালের দিশলাই বাবাঠাকুর—তবে তামাক খাতি সোলা চকমকির রেওয়াজ ছেল। চাঁদামারির বিলি সোলার জঙ্গল—এক বোঝা তুলে এনে শুকিয়ে রাখো, ভোর বছর তামাক খাও। একটা পয়সা খরচ নেই—আর এখন? একটা দিশলাই এক পয়সা, একটা দিশলাই দেড় পয়সা—হুঁ—

কথা শেষ করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে আইনদ্দি একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিল।

বিপিন বলিল—আচ্ছা চাচা, তুমি তো অনেক মন্তর তন্তর জানো—মানুষ ম'লে তাকে এনে দেখাতে পারো?

আইনদ্দি বিপিনের হাতে কলিকা দিয়া বলিল—ধরো, একটা সোলা দুটো করে তোমায় হুঁকো বানিয়ে দিই। মন্তর তন্তর অনেক জানি বাবাঠকুর তোমার বাপ মায়ের আশিব্বাদে। শ'ন্য ভরে উড়ে যাবো, আগুন খাবো, কাটা মুণ্ডু জোড়া দেবো—

বিপিন এই কথা অন্ততঃ ত্রিশবার শুনিয়াছে বৃদ্ধের মুখে। ভারি সুন্দরলাগে তাহার বৃদ্ধের এই সব সরলতাপূর্ণ গর্ব্বের কথা শুনিতে।

সে বলিল— কিন্তু মরা মানুষ আনতে পারো চাচা?

—ম'লে কি মানুষ ফেরে বাবাঠাকুর? আসমানে তারা হয়ে ফুটে থাকে—নয় তো শেয়াল কুকুর হয়ে জন্মায়। তবে একটা গল্প বলি শোনো—

ইহার পর আইনদ্দি একটা খুব বড় আজগুবি গল্প ফাঁদিল—কিন্তু বিপিনের সে দিকে মন ছিল না—সে আইনদ্দিদের বাড়ীর উত্তরে সুবিস্তৃত বেল্‌তার মাঠ ও চাঁদামারির বিলের ধারের সবুজ পাতি ঘাসের বনের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গেল। যখনই এখানটীতে আসিয়া বসে, তখনই তাহার মনে কেমন অদ্ভুত ধরণের সব ভাব আসিয়া জোটে।

বলাই চলিয়া গেল !....কতদূরে, কোথায় কে জানে ? সে-ও একদিন যাইবে, বীণাও যাইবে, মনোরমাও যাইবে .. মানী···মানীও যাইবে।

কেন খাটিয়া মরা ? কেন দুমুঠা অন্নের জন্য অনর্থক লোক পীড়ন করিয়া পরের অভিশাপ কুড়ানো ? আজ গেল বলাই....কাল তাহার পালা।

একটা জিনিস তাহার মনে হইতেছে। মানী তাহার মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল···মানীর নিকট এজন্য সে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বলাই বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। গরীব লোক এম্‌নি কত আছে এই সব পাড়াগাঁয়ে—যাহারা অর্থের অভাবে রোগের চিকিৎসা করাইতে পারে না। সে ডাক্তারি বই পড়িয়া কিছু ডাক্তারি শিখিয়াছে, বাকীটা না হয় মানীকে বলিয়া, তাহার দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তাহার অধীনে কিছুদিন থাকিয়া শিখিয়া লইবে। ডাক্তারিই সে করিবে—এই সব পাড়াগাঁয়ে প্রজাপীড়ন কার্য্য তাহার দ্বারা আর চলিবে না।

তাহার বাপ বিনোদ চাটুজ্জে প্রজাপীড়ন করিয়া যথেষ্ট জমিজমা করিয়াছিলেন—যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি, যথেষ্ট খাতির। আজ সে সব কোথায় গেল ? বিনোদ চাটুজ্জে আজ মাত্র সতেরো আঠারো বছর মারা গিয়াছেন—ইহার মধ্যেই তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ, বিধবা কন্যা খাইতে পায় না—পুত্র বিনা চিকিৎসায় মারা যায়—বিধবা কন্যার সম্বন্ধে গ্রামে নানা বদনাম ওঠে। অসৎ উপায়ে উপার্জ্জনের পয়সাই বা আজ কোথায়—কোথায় বা জমিজমা।

মানী তাহার চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে নানাদিক দিয়া।

জীবনে মানীকে সে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতে যায় বহুবার, বহুবার। সারা জীবন ধরিয়া।

বিপিন উঠিল। আইনদ্দি বলিল—কি নিয়ে যাবা হাতে করে বাবাঠাকুর ? দুটো মুরগীর আণ্ডা নিয়ে যাবা না, তোমরা বুঝি ও খাওনা। তবে দুটো শাকের ডাঁটা নিয়ে যাও। ভাল শাকের ডাঁটা হয়েল বাবাঠাকুর, সুমুন্দিদের গরুর জন্যি বাড়তি পারলো না। ও মাখন—হ্যাদে ও মাখন—

বিপিন প্রভাতের রৌদ্রদীপ্ত সুবিস্তীর্ণ বেলতার মাঠের দিকে চাহিয়াছিল। চমৎকার জীবন ! এই রকম বাঁশতলার ছায়ায় ..এই রকম সকালের বাতাসে বসিয়া চুপ করিয়া মানীর কথা ভাবা···

কিন্তু ইহা জীবন নয়। ইহা পুরুষ মানুষের জীবন নয়। ৺বিনোদ চাটুজ্জে পুরুষ মানুষ ছিলেন—তিনি পৌরুষদীপ্ত জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন—হৈ হৈ, হল্লা, কঠিন কাজ, মামলা মোকদ্দমা, জমিদারী শাসন, দাঙ্গাহাঙ্গামা—বিপিন জানে সে এই সব কাজের উপযুক্ত নয়। সে শাসন করিতে পারে না তাহা নয়—সে দুর্ব্বল বা ভীরু নয়—কিন্তু তাহার ধাতে সহ্য হয় না ও সব। বিশেষতঃ মানীর সংস্পর্শে আসিয়া সে আরো ভাল করিয়া এসব বুঝিয়াছে। জীবনে অনেক ভাল জিনিস আছে—ভাল বই, ভাল গান, ভাল কথা—খাওয়া দাওয়ার কথা, মামলা মোকর্দ্দমা বা পরচর্চ্চা ছাড়াও আরও ভাল কথা জগতে আছে, মানী তাহাকে দেখাইয়াছে।

জমিদারী শাসন ছাড়াও পুরুষ মানুষের জীবন আছে—রোগের সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে, নিজের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বড় হইতে চেষ্টা পাওয়াও পুরুষ মানুষের কাজ। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেই সে।

তিন মাস কটিয়া গিয়াছে।

এই তিন মাসের মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল। বিপিনকে বলাইয়ের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত বাড়ী থাকিতে হইল। বীণার ব্যাপার একটু আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে হইল বিপিনের কাছে। মনোরমা প্রায়ই বলে, দুজনে গোপনে দেখাশোনা এখনও করে—মনোরমা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বীণাকে বিপিন এজন্য তিরস্কার করিয়াছে, কড়া কথা শোনাইয়াছে, বীণা কাঁদিয়া ফেলে ছেলে মানুষের মত, বলে—ও সব মিছে কথা দাদা। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি পটল-দার সঙ্গে আর দেখাই করিনে।

কথার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল।

বলাইয়ের মৃত্যুর পর বীণার ধারণা হইল পটল-দা'র সঙ্গে গোপনে কথা বলিবার এ লোভ ভাল নয়, এ সব অনাচার, বিধবা মানুষের করা উচিত নয় যাহা, তাহা সে করিতেছে বলিয়াই আজ ভাইটা মরিয়া গেল।

বলাই মারা যাওয়ার ছ'দিন পরে পটল একদিন তাহাদের বাড়ীতে আসিল। বীণার মা বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন –বলাইয়ের মৃত্যু-সংক্রান্ত কথাই বেশী। বীণা লক্ষ্য করিল কথা বলিতে বলিতে পটল-দা জানালার দিকে আগ্রহদৃষ্টিতে চাহিতেছে। অন্য অন্য বার এতক্ষণ বীণা মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়ায়, পটলের সঙ্গে কথা সুরু করে—কিন্তু আজ সে ইচ্ছা করিয়াই যায় নাই। আর কখনো সে পটল-দার সামনে বাহির হইবে না। বেড়াইতে আসিয়াছে, ভালোই, মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করো, চলিয়া যাও—আমার সঙ্গে তোমার কি? বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে তোমার কি?

প্রায় এক ঘণ্টা থাকিয়া পটল যেন নিরাশ মনে চলিয়া গেল। পটল যেমন বাড়ীর বাহির হইল—বীণার তখন মনে পড়িল ছাদের উপর ওবেলা বৌদিদির রাঙা পাড় শাড়ীটা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল—তুলিয়া আনা হয় নাই। ছাদে উঠিয়া কাপড় তুলিতে তুলিতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ওই তো পটল-দা চলিয়া যাইতেছে···তেঁতুল গাছটার কাছে গিয়াছে···সে ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে—যদি পটল-দা হঠাৎ ফিরিয়া চায়? বীণা কি লজ্জায় পড়িয়া যাইবে! পটল-দাকে একটা পান সাজিয়া দিলে ভাল হইত—দেওয়া উচিত ছিল, মা যেন কি! লোক বাড়ীতে আসিলে তাহাকে শুধুমুখে বিদায় করিতে নাই। ইহা ভদ্রতা। তাহাকে ডাকিয়া পান সাজিয়া দিতে বলিলেই সে পান দিত।

কাপড় তুলিয়া বীণা নামিয়া আসিল। তাহার মন খুব হালকা—ভালই হইয়াছে, আজ সে বুঝিয়াছে—পটলের সঙ্গে দেখা না করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, ইচ্ছা করিলেই হয়। একটা কঠিন কর্ত্তব্য সে সম্পন্ন করিয়াছে।

বলাইয়ের শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে পটল আর একদিন আসিল। বীণা উঠান ঝাঁট দিতেছিল, মুখ তুলিয়া কে আসিতেছে দেখিয়াই সে হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। তাহার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই মনে হইল, ছিঃ, অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসা উচিত হয় নাই—পটল-দা কি দেখিতে পাইয়াছে? বোধহয় পায় নাই, কারণ তখনও সে তেঁতুলতলার মোড়ে; তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে। যাহা হউক, পটল-দা তো

বাঘ নয়, ভালুকও নয়—অমনভাবে ছুটিয়া পলাইবার মানে হয় না। সহজভাবে মায়ের সামনে গিয়া কথা বলাই তো ভালো। ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া তোলাই ভালো।

কিন্তু বীণা এদিনও বাহিরে আসিল না—এমন কি যখন পটল জল খাইতে চাহিল, বীণার মা বলিলেন—ও মা বীণা, তোর পটল-দাদাকে এক গেলাস জল দিয়ে যা—বীণা নিজে না গিয়া বিপিনের বড়ছেলে টুনুর হাতে দিয়া জলের গ্লাস পাঠাইয়া দিল।

তাহার হাসি পাইতেছিল। মনে মনে ভাবিল—সব দুষ্টুমি পটল-দার। জল তেষ্টা না ছাই পেয়েছে! আমি আর বুঝিনে ও সব যেন।

সে যাইবে না, কখনও যাইবে না। জীবনে আর কখনো পটল-দার সঙ্গে দেখা করিবে না। শেষ, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ইহার পাঁচ ছ'দিন পরে বীণা একদিন সন্ধ্যার সময় ছাদে শুকাইতে দেওয়া মুসুরির ডাল তুলিতে গিয়াছে—ছাদের আলিসার কাছে আসিতেই দেখিতে পাইল, পটল-দা নীচে বাগানে কাঁটালতলায় দাঁড়াইয়া ওপরের দিকে চাহিয়া আছে।

বীণার সমস্ত শরীর দিয়া যেন কি একটা বহিয়া গেল!..হঠাৎ পটল-দাকে এ ভাবে দেখিবে তাহা সে ভাবে নাই। কিন্তু আজ কয়দিন বীণা দুপুরে ও বিকালের দিকে নির্জ্জনে থাকিলেই ভাবিয়াছে পটল-দাঁর কথা। অন্য কিছু নয়, সে শুধু ভাবিয়াছে এই কথা—আচ্ছা, এই যে দু'দিন সে পটল-দা'র সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিল না, পটল-দা কি ভাবে লইয়াছে জিনিসটা? খুব চটিয়াছে কি? কিংবা হয়তো তাহার কথা লইয়া পটল-দা আর মাথা ঘামায় না। তাহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। দিয়া যদি থাকে, খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছে। পটল-দা কষ্ট পায়, তাহা বীণা চায় না। ভুলিয়া যাক্, সে-ই ভালো। মনে রাখিয়া যখন কষ্ট পাওয়া, ভুলিয়া যাওয়াই ভালো।

দুপুরে এ কথা ভাবিয়া বীণা দেখিয়াছে বেলা যত পড়ে সেই কথাই মনের মধ্যে কেমন একটা—ঠিক বেদনা বা কষ্ট বলা হয়তো চলিবে না—কিন্তু কেমন একটা কি হয়, ঠিক বলিয়া বোঝানো কঠিন—কি বলিয়া বুঝাইবে সে ভাবটা?...যাহোক্, যখন সেটা হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে, যখন বড় তেঁতুলগাছটায় কালো কালো বাদুড়ের দল ঝাঁক বাঁধিয়া ফেরে, সন্তুদের নারকেল গাছটার মাথায় একটা নক্ষত্র ওঠে, বৌদি সাঁজালের মালসা হাতে গোয়াল ঘরে সাঁজাল দিতে ঢোকে, একটু পরেই ঘুঁটের ধোঁয়ায় উঠানের পাতিলেবুতলাটা অন্ধকার হইয়া যায়,—তখন ছাদের ওপর একা দাঁড়াইয়া বাঁশঝাড়ের মাথার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বীণার যেন কান্না আসে···কোথাও কিছু যেন নাই···কোথাও কিছু নাই···

এ ভাবটা সে বেশীক্ষণ মনে থাকিতে দেয় না—তখনি তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নীচে নামিয়া আসে।···নিজের কান্নাতে নিজে লজ্জিত হয়, ভীত হয়।

অথচ কাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই। কাহারও নিকট একটু সান্ত্বনা পাইবার উপায় নাই। মা নয়, বৌদিদি নয়। কাহারও কাছে কিছু বলা চলিবে না, বীণা বোঝে। এ তার নিজস্ব কষ্ট, অত্যন্ত গোপন জিনিস—গোপনেই সহ্য করিতে হইবে।

হঠাৎ এ সময় পটল-দাকে এ ভাবে দেখিয়া বীণা যেন কেন কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া

কথা বাহির হইল না। পটল গাছের গুঁড়িটার দিকে আর একটু হটিয়া গেল। বীণার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—বীণা, আমার ওপর তোমার রাগ কিসের ?

বীণা এবার কথা খুঁজিয়া পাইল। বলিল—রাগ কে বল্লে ?

—দুদিন তোমাদের বাড়ী গেলাম, বাইরে এলে না, দেখা করলে না—রাগ নয় তো কি ?

—রাগ নয় এম্‌নি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—মিথ্যে কথা। কাজে ব্যস্ত থাকলেও একটু বাইরে আসা যায় না কি ? না সত্যি বলো লক্ষ্মীটী আমি কি দোষ করেছি ?

তুমি পাগল নাকি পটল-দা ? আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা এখানে এসেছ আবার, লোকে দেখলে কি মনে করবে—তোমায় একদিন বারণ করে দিইছি মনে নেই ! যাও বাড়ী যাও—

বীণা কথাটা বলিল বটে—কিন্তু তাহার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরণের হাসি, অশ্রুগলিত ধরণের আনন্দ আসিয়া জুটিয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকার অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে, জোনাকীজ্বলা অন্ধকার, সাঁজালের ঘুঁটের চোখ-জ্বালা-করা ধোঁয়ায় ঘনীভূত অন্ধকার।...

তাহাকে কেহ চায় নাই জীবনে এমন করিয়া—সে কথা কহে নাই বলিয়া ছুটিয়া আশসেওড়া বিছুটিবনের আগাছায় জঙ্গলের মধ্যে, সাপে খায় কি ব্যাঙে খায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকে নাই কখনো—কাঙালের মত, একটুখানি মিষ্ট কথার প্রত্যাশী হইয়া—বিশেষ করিয়া যখন সে তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছে, সামনে বাহির হয় নাই, কথা কয় নাই—তাহার পরেও,—এক পটল-দা ছাড়া।

পটল মিনতির সুরে বলিল—কেন এমন করে তাড়িয়ে দেবে, বীণা ? আমি কি করেছি বলো—

—তুমি কিছু করোনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা আর চলবে না—

—কেন চলবে না বীণা ?

—কেউ পছন্দ করে না।

—কেউ মানে কে কে, শুনতে পাবো না ?

—না—তা শুনে কি হবে ? ধরো আমার বাড়ীর লোক। আমি তো স্বাধীন নই—তাঁরা যদি বারণ করেন, অসন্তুষ্ট হন, আমার তা করা উচিত নয়।

—তুমি আমায় ভালবাসো না ?

বীণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

—আমার কথার উত্তর দাও, বীণা।

—আচ্ছা পটল-দা, ও কথার উত্তর শুনে লাভই বা কি ? আমার আর তোমার সঙ্গে দেখা করা চলবে না। তুমি কিছু মনে কোরো না পটল-দা, এখন বাড়ী যাও, লোকে কি মনে করবে বলো তো। সন্ধেবেলা এখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছ দেখলে বৌদি এখুনি ছাদের ওপর আসবে, তুমি যাও এখন।

—আচ্ছা এখন যাচ্ছি, কাল আসবো ?

—না।

—পরশু আসব ?

—না।

—কবে আসবো আচ্ছা তুমিই বল বীণা।

—কোনোদিন না। কেন আমায় এসব কথা বলাচ্ছ পটল-দা? আমি এক কথার মানুষ—যা বলেছি, তা বলেছি। এখন যাও।

—তাড়াবার জন্য অত ব্যস্ত কেন বীণা, যাবোই তো, থাকতে আসিনি। বেশ তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয়—তবে চল্লাম—এ-ও বলে রাখছি, জীবনে আর কখনও আমায় দেখতে পাবে না।

—না পাই না পাবো, তা আর কি হবে? না পটল-দা, আর বকিও না, কথায় কথা বাড়ে, আমি নীচে নেমে যাই, বৌদিদি মনে করবে—কতক্ষণ ছাদের ওপর এসেছি।

পটল আর কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বীণা যেমন সিঁড়ির মুখে নামিতে যাইবে দেখিল অন্ধকারের মধ্যে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে। বৌদিদির ভাব দেখিয়া বীণার মনে হইল সে বেশীক্ষণ আসে নাই—এবং সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া তাহাদের শেষ কথা শুনিয়াছে।

আসলে মনোরমা কিছুই শুনিতে পায় নাই—কিন্তু ছাদে উঠিবার সময় বীণা কাহার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কথা কহিতেছে জানিবার জন্য সিঁড়ির মুখে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল। এবং অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পরেই বীণা কথা বন্ধ করিয়া নামিতে আসিয়া অন্ধকারে তাহার সঙ্গে ধাক্কা খাইল।

মনোরমা বলিল—কার সঙ্গে কথা বলছিলে ঠাকুরঝি?

বীণা ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—জানিনে—সরো রাস্তা দাও—উঠে এসে দাঁড়িয়ে তো আছ দিব্যি অন্ধকারে!······বাবারে, সবাই মিলে খাও আমাকে—খেয়ে ফেল—বলিয়া সে তরতর করিয়া নামিয়া গিয়া মায়ের ঘরে একখানা ছেঁড়া মাদুর এককোণে পাতিয়া সোজাসুজি শুইয়া পড়িল—সে রাত্রে আর উঠিলও না, কাহারও সঙ্গে কথাও কহিল না—কিছু খাইলও না।

মনোরমা মনে মনে বড় অস্বস্তি অনুভব করিল। নানা দিক দিয়া এ সব কি অশান্তি ও অকল্যাণ সুরু হইল সংসারে! বীণা আবার গোপনে পটলের সঙ্গে দেখাশুনা করিতেছে তাহা হইলে। নিশ্চয়ই পটল ও—আর কাহার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ছাদ হইতে চাপাসুরে কথাবার্ত্তা বলিবে সে!···ঠাকুরঝির রাগের কারণই বা কি আছে তাহা সে বুঝিয়া পায় না। সে আড়ি পাতিয়া কাহারো কথা শুনিতে যায় নাই সিঁড়ির ঘরে। কি কথা হইতেছিল, যাহার সহিত কথা হইতেছিল তাহাও সে জানে না—তবে আন্দাজ করিয়াছিল বটে। দুশ্চিন্তায় মনোরমার রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ঠাকুরঝি আবার সুরু করিয়াছে—দিন কতক পটলের সামনে বাহির হইত না, তাহাতে মনোরমা খুব খুসি হইয়াছিল মনে মনে। কিন্তু এত বলার পরেও আবার যখন সুরু করিল তাও আবার লুকাইয়া, তখন ফল ভাল হইবে না।

কি করা যায়, কি করিয়া সংসারে শান্তি আনা যায়? তাহাদের বাড়ীটাকে যেন অলক্ষ্মীতে পাইয়া বসিয়াছে। দারিদ্র্য, রোগ, মৃত্যু···অনাচার···কুৎসা কলঙ্ক···বীণা ঠাকুরঝি যে রাগ করে, নতুবা কাল দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সে বেশ করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া বলিতে পারে। বলিতে পারে যে, এসব ব্যাপারের ফল কখনও ভাল হয় না। পটল বিবাহিত লোক, তাহার স্ত্রী পুত্র বর্ত্তমান, বীণাকে লইয়া নাচানো ছাড়া তাহার আর কি ভাল উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ

মানিয়া চলিতে হয়—বীণা বিধবা, বিশেষতঃ ছেলেমানুষ, অনেক বুঝিয়া তাহাকে এখন সংসারে চলিতে হইবে।···কিন্তু বীণা শুনিবে কি তাহার হিতোপদেশ ?

ইহার পর পটল আর একদিন অসিল। অমনি সন্ধ্যাবেলা, অমনি ভাবে লুকাইয়া। কিন্তু এদিন বীণা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, ছাদে যাইবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া যায় নাই। ছাদে গিয়াছিল মনোরমা। সিঁড়ির মুখে নামিবার সময় দেখিতে পাইল পটল কাঁটাল তলায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই পটল গুঁড়ির আড়ালে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, একটু থতমত খাইয়া গেল—তাহাকেই বীণা বলিয়া ভুল করিয়াছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে নাকি ? মনোরমার হাসিও পাইল। ভাবিল—পোড়ার মুখো ড্যাকরার কাণ্ড ছ্যাখো। জঙ্গলের মধ্যে এই ভর্ সন্দেবেলা দাঁড়িয়ে মরছেন মশার কামড় খেয়ে ! খ্যাংরা মারো মুখে— বীণাকে সে কিছুই বলিল না নীচে নামিয়া। তাহাকে চোখে চোখে রাখিল, বীণা চুপি চুপি ছাদে যায় কিনা। বোধ হয় ঠাকুরঝি জানে না। তবে ওদের মধ্যে নিশ্চয় পূর্ব্ব হইতে বলা-কওয়া ছিল।

এরকম ব্যপার চলিতে দিলে সংসারের সর্ব্বনাশ হইবে, রাত্রে শুইবার সময় সে কৌশল করিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—আজ হয়েছে কি জানো ঠাকুরঝি, ওপরে তো ছাদে গিয়েছি সন্ধ্যের সময়—দেখি কে একজন কাঁটালতলায় দাঁড়িয়ে—ভাল করে চেয়ে দেখি—

বীণার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—কে পটল-দা ?

মনোরমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসির ধমকে কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "পটল-ই বটে।"

—আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি বৌদি, আমি কিছুই জানি নে।

বীণা কিন্তু একথা কিছুতেই বলিতে পারিল না যে সে পটল-দাকে সেদিনই আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। সেকথা তাহার আর পটল-দার মধ্যে গুপ্ত থাকিবে—বাহিরের লোককে তাহা জানাইলে পটল-দার অপমান হইবে। লোকের সামনে পটল-দা'কে সে ছোট করিতে চায় না। তাহার মন তাহাতে সায় দেয় না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এত বলার পরও পটল-দা আবার আসিয়াছিল। রাত্রে শুইয়া শুইয়া বীণা কতবার পটলের উপর রাগ করিবার....দারুণ রাগ করিবার চেষ্টা করিল। ভারি অন্যায় পটল-দা'র, যখন সে বারণ করিয়া দিয়াছে, তখন কেন আবার দেখা করিবার চেষ্টা পাওয়া ? ছিঃ ছিঃ, বৌদিদি না দেখিয়া যদি অন্য লোক দেখিত ? পটল-দা লোক ভাল নয়। ভাল লোক নয়। খারাপ চরিত্রের লোক। ভাল চরিত্রের লোক যারা, তারা এমন করে না।

আচ্ছা, একটা কথা—তাহারই সঙ্গে বা পটল-দা দেখা করিবার অত আগ্রহ কেন দেখায় ? আরও তো কত মেয়ে আছে। এই অন্ধকারে···আগাছায় জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া—সত্যি, যদি সাপে কামড়াইত ? কথাটা মনে করিবার সঙ্গে সঙ্গে পটলের উপর এক প্রকার অদ্ভুত ধরণের সহানুভূতি আসিয়া জুটিল বীণার মনে। মাগো, পটল-দাকে সাপে কামড়াইত ! না, ভাবিতেও কষ্ট হয়। তাহারই জন্য পটল-দাকে সাপে কামড়াইত তো ? আর কেহ তো তাহার জন্য ভাবে না, তাহার মুখের কথা শুনিবার

অত আগ্রহ দেখায় না, সংসারে কে তাহার জন্য ভাবিয়া মরিতেছে? কোন্ আলো আছে তাহার জীবনে ?···

এই শূন্য, অন্ধকার জীবনের মধ্যে তবুও পটল-দা তাহার সঙ্গে একটু কথা কহিবার ব্যাকুল আগ্রহে রাত্রি, অন্ধকার, সাপের ভয়, মশার কামড়, লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকে, ভাঙা কোঠায় সালের জঙ্গলের মধ্যে—যেখানে বিছুটি জঙ্গল এমন ঘন যে দিনমানেই যাওয়া যায় না! তাও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃথা ফিরিয়া গেল। চোখের দেখাও তো তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

নিজের স্বামীকে বীণা মনে করিতে পারে—খুব সামান্য, অস্পষ্টভাবে। এগারো বৎসর বয়সে বীণার বিবাহ হয়। এক বৎসর পরে বাপের বাড়ী থাকিতেই একদিন সে শুনিল স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। মনে আছে, বেশ ছেলেটি। খুব অল্পদিন দেখাশোনা হইয়াছিল। কোথায় স্কুলে পড়িত, শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে বাড়ী বেশীদিন থাকিতে দিতেন না—স্কুল-বোর্ডিংএ পাঠাইয়া দিতেন।

সে-সব আজকার কথা নয়—বীণার বয়স এখন তেইশ চব্বিশ—বারো বছর আগের কথা, স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ বীণা দেখিল সে কাঁদিতেছে—হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে, বালিসের একটা ধার একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে চোখের জলে। (ক্রমশঃ)

মিনতি

কুমারী উমা দেবী

আমি চলে গেলে তুমি কোনো শ্রাবণে
যদি কভু বসে থাকো সন্ধ্যা বেলা—
মেঘ-পানে মেলে আঁখি একা বিজনে ;
ধীরে-ধীরে বয়ে যাবে বরষা হাওয়া,
ঝরে যাবে ধারা কার ব্যথায় ছাওয়া,
আন্‌মনে মোর কথা ক্ষণেক তরে
সে সময়ে একবার এনো স্মরণে।

রিম্ ঝিম্ ঝরে যাবে শ্রাবণ ধারা,
সুধাইবে কেঁদে বায়ু—'কে প্রিয়-হারা' ?
গুরু গরজন ঘন মেঘের পুরে
জাগাইবে ব্যথা কোন্ গভীর সুরে,
দীর্ঘ নিশ্বাসে—নহে—উদাস মনে
সে সময়ে মোর কথা এনো স্মরণে !

গুণনিধি

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

"আরে নিধি যে!"

গুণনিধি আমাকে সংশোধন করিয়া বলিল,—"নিধি নয়, গুণেন্দু।" কলেজ ছাড়িবার প্রায় দশ বৎসর পরে হঠাৎ গুণনিধির সহিত ট্রামে দেখা হইয়া গেল।

গুণনিধিকে এই অপরূপ বেশে আজ এতদিন পরে দেখিতে পাইব আশা করি নাই। যে গুণনিধির দেহে একদা গ্রীষ্মকালে সিল্ক, আদ্ধি, শান্তিপুরী এবং শীতকালে রকমারি শীতবস্ত্রের স্যুট ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাইতাম না, সেই গুণনিধির আজ এ কি ঘোর পরিবর্ত্তন! একদা একশ গজ দূর হইতেই চক্ষু বুজিয়া বলিয়া দিতে পারিতাম যে গুণনিধি আসিতেছে—এমনই উগ্র সেণ্ট সে ব্যবহার করিত। সাবান, স্নো এবং 'পমেটম' ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্যবহার করিয়া গুণনিধি পৈতৃক দেহের রংটারও এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ফেলিয়াছিল যে আমরাও, অর্থাৎ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত বন্ধুরাও, তাহাকে মাঝে মাঝে ঈষৎ গৌরবর্ণ বলিয়াই ভ্রম করিয়া ফেলিতাম। সে নিকটে আসিলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া লইতাম যে, হ্যাঁ, পৃথিবীতে যদি কেহ ঈশ্বরের উপরও টেক্কা মারিতে পারিয়া থাকে ত, সে আমাদের গুণনিধি। নিজের দৈহিক বর্ণের উপর এমনই খোদার উপর খোদকারী সে করিত।

সেই গুণনিধি আর এই গুণনিধি! তাহার পরিধানে রহিয়াছে স্থানে স্থানে তালি দেওয়া ময়লা এক কাপড় এবং ততোধিক ময়লা একটা ছেঁড়া শার্ট। মুখে তাহার একটা জ্বলন্ত বিড়ি। প্রথমে নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। গুণনিধি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল, কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া যখন আমার স্থির বিশ্বাস হইল যে, এ আমারই পূর্ব্ব পরিচিত গুণনিধি, তখনই সাহস করিয়া ডাকিলাম,—"নিধি যে!"

গুণনিধি চট্ করিয়া বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া আমার দিকে তাকাইল এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসি আসিবার পরমুহূর্ত্তেই বোধহয় তাহার স্মরণ হইল যে, আমি তাহাকে তাহার সহিত সেই আই-এ ক্লাসে পড়িবার সময়কার পিতৃদত্ত নাম ধরিয়া ডাকিয়াছি, তাই সে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংশোধন করিয়া দিবার জন্য বলিল,—"নিধি নয়, গুণেন্দু।"

কলেজে পড়িবার সময় আমিও একজন কেউকেটা ছিলাম না। রসিক বলিয়া ছাত্র মহলে আমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। কলেজে এবং হস্টেলে কোন আড্ডা, আমি না থাকিলে একেবারেই জমিত না। যখন সেকেণ্ড ইয়ারে উঠিয়াছি তখনই গুণনিধি অন্য এক কলেজ হইতে নাম কাটাইয়া আমাদের কলেজে আসিল। তাহাদের কলজের বিশেষ আভিজাত্য ছিল না, যাহা আমাদের কলেজে পূরামাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

গুণনিধিকে দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ জমাইবার জন্য বিশেষ গা করি নাই; তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইবার মত কোন বিশেষত্বই তাহার ছিল না। নিতান্ত গোবেচারী অথচ সৌখীন, কেমন একটা

বোকা বোকা ভাব তাহার চেহারায় ছিল। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই সে পালিশ হইয়া উঠিল এবং নূতন করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

আই-এ পাস করিয়া গুণনিধি ধুতি পাঞ্জাবী বরখাস্ত করিয়া সুট্ ধরিল। ধুতি চাদরে নাকি স্মার্ট হওয়া যায় না। শুনিলাম, সে আই-সি-এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আই-সি-এস হইতে হইলে যে কিঞ্চিৎ বিদ্যা থাকাও আবশ্যক এ খবরটা যে সে জানিত না এরূপ নহে; তবে বাহ্যিক চাকচিক্যটাই নাকি পরীক্ষকেরা প্রথমে দেখেন এবং স্মার্টনেসের জোরেই সে বোধ হয় ভাইভা ভোসিতে পূরা নম্বর পাইয়া কম্পীট করিবার আশা রাখিত।

সুট ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই গুণনিধি ধুতি চাদরের ন্যায় মাতৃভাষাকেও বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিল এবং প্রায় সকল সময়েই আমরা গুণনিধির মুখ হইতে অপূর্ব্ব ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত বুক্‌নি শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইতে লাগিলাম। প্রতিদিন বৈকালে যে সময়টা আমরা আড্ডা দিয়া নষ্ট করিতাম, গুণনিধি সেই সময় টেনিস খেলিতে সুরু করিল। এমন কি টেনিস খেলিয়া আসিয়া আমাকেই অনুকম্পার ভাব দেখাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"আরে ম্যান, কি পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে আর বাজে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট কোরচ, জাস্ট হ্যাভ টী এণ্ড টেনিস্, বি স্পোর্ট।

আমি প্রথমটা হতবাক্ হইয়া যাইতাম, শেষে আমার উপরেই টেক্কা দেওয়া? তাই সকলের সম্মুখে এমন একটা রসিকতা করিয়া বসিতাম যে, গুণনিধি কিছুদিনের জন্য আমার সহিত বাক্যালাপ করাই ছাড়িয়া দিল।

গুণনিধি আমাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য আমাকে এবং আমার দলটিকে প্রায়ই হোটেলে খাওয়াইত কিন্তু সেন্টিমেন্টের বালাই আমাদের কোন কালেই ছিলনা, গম্ভীর ভাবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দক্ষিণ হস্তের কার্য্য সমাধাও করিতাম, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাহার বেশভূষা, আচার ব্যবহারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিতেও ছাড়িতাম না। অবশ্য হোটেলে খাইবার কালে নয়। সে সময় চুপ চাপ বসিয়া তাহার সমস্ত চাল-মারা সহ্য করিয়া যাইতাম এবং সেই সময়টাতেই গুণনিধি তাহার যাহা কিছু বলিবার থাকিত বলিয়া লইত। অর্থাৎ সেই সময়টা সত্যই সে আই-সি-এস-এর পদ মর্য্যাদা লাভ করিত। . সময়ে এমন কথাও বলিত,—"আরে ভাই পঞ্চাশ টাকা হাত খরচায় কি কোন ভদ্রলোকের চলে? আবার বাবাও হয়েছেন এমন যে পকেট এক্সপেন্সের জন্যে এর চেয়ে এক ফার্দিংও বেশী দেবেন না। অতবড় জমিদারির আয়ের সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্কে জমিয়ে তাঁর যে কি লাভ হবে জানি না!" এইরূপ আরো অনেক কথাই তখন তাহার নিকট শুনিতাম এবং জবাব দিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিবার জন্য একটু নড়িয়া চড়িয়া আবার আহারে মনোনিবেশ করিতাম।

গুণনিধিকে দুইহাতে টাকা উড়াইতে দেখিয়া মাঝে মাঝে সত্যসত্যই ঈর্ষা হইত।

একদিন কলেজে বিরাম সময়ে গাছতলায় বসিয়া আড্ডা দিতে দিতে গুণনিধির চরিত্রের সমলোচনা করিতেছিলাম। গুণনিধির প্রতিবেশী এক ছোকরা আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমাদের সহিত বসিয়া ছিল, সে হঠাৎ আমাদিগকে বিস্মিত করিল। সে বলিল,—"ভুল বল্‌ছেন মশায়, গুণনিধিটা একটা পাক্কা চালিয়াৎ ত বটেই, তাছাড়া ওর মত রাস্কেলও বোধ হয় ভূভারতে আর নেই।" উৎসুক্ক হইয়া তাহাকে ব্যাপারটি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে বলিয়া যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা বোধহয় না

শুনিলেই ভাল ছিল। তাহার নিকট জানিতে পারিয়াছিলাম যে, গুণনিধির সহোদর ভাই মাত্র একটিই আছে। সে গুণনিধির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গুণনিধির আরো পাঁচ সাতটি কনিষ্ঠ সৎ-ভাই আছে; সকলে এই শহরেই থাকে। জমিদারির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহার পিতা কোন এক মফঃস্বল শহরে একশ টাকা বেতনে চাকুরি করেন, সেখানে তিনি এবং তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী থাকেন। গুণনিধির বড় ভাই এখানেই কোন একটা অফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে চাকুরি করে এবং ভাইগুলির তত্ত্বাবধানের ভারও তাহার উপর।

গুণনিধির পিতা তাহাদের খরচপত্রের জন্য মাসে পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইয়া দেন। কিন্তু গুণনিধি শুধু নিজের জন্য সেই পঞ্চাশটি টাকা আত্মসাৎ করে। বড় ভাই সেজন্য অনুযোগ করিলে গুণনিধি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বৈমাত্রেয় ভাইগুলিকে উদ্দেশ করিয়া বলে,—"এই টাকা ওদের জন্যে খরচ করব নাকি!" গুণনিধির বড় ভাই নিতান্ত গোবেচারা ভালমানুষ, সে কোন কথা বলিতে সাহস করে না এবং পিতাকেও ওইসব কথা জানাইবার মত সাহস তাহার নাই। আরো দুই চারিটা টিউশনি জুটাইয়া উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া সে বেচারা সংসার চালায়। এত সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও গুণনিধি বড়ভাইয়ের সম্মুখেই মাঝে মাঝে ছোট ভাইগুলিকে অকথ্য গাল দেয়—'কিক্' করিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিতে চায়। অপরাধ—তাহারা নাকি অত্যন্ত ন্যাস্‌টি। গুণনিধির অগ্রজের তাহাদের ফিটফাট করিয়া সাজাইয়া রাখিবার সামর্থ্য নাই। সে গুণনিধির সমস্ত চোটপাট চুপ করিয়া শুনিয়া যায়।

অথচ এত করিয়া টাকা জুটান সত্ত্বেও গুণনিধিকে অনেক রাস্তা বাদ দিয়া হাঁটিতে হয়। সেই সব রাস্তার অনেক দোকানদারের গুণনিধির নিকট বহু টাকা বাকি আছে। এই সব শুনিয়া গুণনিধিকে লইয়া বরং রসিকতা করিবার প্রবৃত্তিটিই আমার বেশি করিয়া জাগিয়া উঠিল।

সুতরাং এখন হইতে তাহাকে দেখিলেই সকলে হাসিতে সুরু করিতাম। এবং এই সময় হইতে সকলেই তাহার নাম রাখিলাম 'নিধি'। ইহার কিছুদিন পরেই গুণনিধি একদিন আমাকে আড়ালে ডাকিয়া ভীষণ গম্ভীরভাবে বলিল,—"তুই ঠিক ধরেছিস্ সমীর, আমার নামটা সত্যিসত্যিই একবারে অভদ্র; আমার ভাবতেও কান্না পায়, আমি যখন আই-সি-এস হয়ে আমার ইউরোপীয়ান ওয়াইফকে নিয়ে 'কারে' করে যাব, লোকে তখন আমার দিকে তাকিয়ে বলবে কি না গুণনিধি দাস আই-সি-এস যাচ্ছে! সত্যি বাপ মা আমার আর কোন নাম খুঁজে পেলে না, বেছে বেছে নাম রাখলেন কি না 'গুণনিধি'! কী ক্যাডাভারাস্ নাম বল তো!"

আমি ভাবিয়া পাইলাম না যে কবে আমি তাহার নামে খুঁত ধরিয়াছি। হঠাৎ স্মরণ হইল যে আমি সেদিন তাহার গুণনিধি নামটিকে 'নিধি'তে পরিণত করিয়াছি বলিয়াই হয়ত তাহার নিজের নামের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে। তাহাকে বলিলাম,— "কেন, বেশ নাম ত গুণনিধি, এর মধ্যে তুই আবার ক্যাডাভারাস্ কোথায় পেলি?"

গুণনিধি আর আমাকে কোন কথা বলিল না। কিন্তু সেইদিন হইতেই আমাদের কলেজের ভবিষ্যৎ মুখোজ্জ্বলকারী হবু আই-সি-এস্ গুণনিধি তাহার নামটা বদলাইবার জন্য ইউনিভারসিটি অফিসে হাঁটা-হাঁটি করিতে সুরু করিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর নাম বদলান একটু শক্ত ব্যাপার। কিন্তু গুণনিধির আগ্রহের নিকট সকল বাধা বিপত্তি তুচ্ছ হইয়া গেল। এই ব্যাপারটির জন্য গুণনিধিকে লইয়া কলেজে ঠাট্টা তামাসার অন্ত ছিল না, কিন্তু গুণনিধি দমিবার পাত্র নয়।

একদিন কলেজের সামনের পানের দোকানটায় আমি এবং আরো কয়েক জন মিলিয়া সিগারেট টানিতেছি এমন সময় গুণনিধি কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল,—"বাপ্‌স্ এতদিনে বাঁচা গেল, সব ঠিক হয়ে গেল রে, সব ঠিক হয়ে গেল। গুণেন্দু ডস্ নামটা কিরকম শোনায় বল্ তো ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ঠিক হয়ে গেল রে ?"

—"ইউনিভারসিটি অফিস এতদিনে নামটা চেঞ্জ করে দিলে, গুণেন্দু ডস্‌ই নাম রাখলাম রে।" আমি দেখিলাম গুণনিধির ঘাড় ভাঙ্গিয়া হেটোলে আহার করিবার এই একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ। তাই তাহাকে তৎক্ষণাৎ বলিলাম,—"ব্যস আর কি, তাহলে আমাদের খাইয়ে দে।" গুণনিধি দ্বিরুক্তি না করিয়া খাওয়াইতে রাজি হইয়া গেল।

আমরা কিন্তু গুণনিধির 'নিধি' নামই বজায় রাখিয়াছিলাম। বি-এ পাশ করার খবর যখন সংবাদ পত্রে বাহির হইল তখন গুণনিধি আমাকে তাহার নিজের ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত নামটা দেখাইয়া বলিল,—"দেখেছিস্ ছাপার অক্ষরে Doss Gunendu নামটা কিরকম ব্রিলিয়াণ্ট দেখাচ্ছে।" নামটা কিন্তু শুধু বি-এ পাস-এর লিস্টেই ছিল। অনার্স গুণনিধি পায় নাই।

গুণনিধির সহিত সর্ব্বাপেক্ষা বিপদে পড়িতাম সে যখন মাঝে মাঝে টাকা ধার চাহিত। তাহাকে টাকা থাকিলে না দিয়া পারিতাম না, এবং পরে কোনদিনই সে টাকা ফেরৎ পাই নাই। কিন্তু তাগাদাই বা কি করিয়া তাহার কাছে করি, তাহার স্কন্ধে সিনেমা দেখা, হোটেলে আহার ইত্যাদি প্রায়ই করিয়াছি, চক্ষু-লজ্জা বলিয়াও ত একটা জিনিস আছে। খুচরা খুচরা করিয়া সে আমাদের বেশ কিছু টাকা মারিয়াছিল।

এম-এ পড়িবার সময় গুণনিধির নিকট আই-সি-এস্‌দের আচার ব্যবহার কিরূপ হইয়া থাকে এবং সে নিজে আই-সি-এস্ হইলে তাহার কিরূপ চালচলন হইবে খুব বেশী শুনিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে যদি বা সে কখনও দয়া করিয়া ধুতি চাদর পরিত, এখন হইতে সে তাহাও ছাড়িয়া দিল এবং সব সময়েই আমরা তাহাকে সুট পরিহিত হইয়া থাকিতেই দেখিতে লাগিলাম। এমন কি গুণনিধি আমাদেরও প্রায় উপদেশ দিতে সুরু করিল,—"আরে ম্যান্, কি ধুতি চাদর পরে জবড়জং হয়ে ঘুরিস্, চাকরিতে ঢুক্‌তে ত আর বেশী দিন দেরী নেই। সাহেবদের কাছে ওই ড্রেসে গেলে অ্যাট ওয়ান্স গেট আউট বলে বের করে দেবে। এখন থেকেই সুট্ পরে প্র্যাক্‌টিসড্ হয়ে নে। তাছাড়া ছ্যাখ. কাপড় পরায় কত অসুবিধে, অল্‌ওয়েজ চলতে অসুবিধে, বসতে অসুবিধে, দৌড়তে অসুবিধে, কাজ করতে ......কত আর বোল্‌ব তোদের, সুট পরে ছ্যাখ একেবারে ঝাড়া হাত পা।"

গুণনিধিকে বলিলাম,—"তোর একি হাল হয়েছে রে, আমাদের হবু আই-সি-এস্ ছিলি তুই, সেই তোর আজ একি চেহারা !"

গুণনিধির মুখ এক অপূর্ব্ব হাসিতে ভরিয়া উঠিল।—"আই-সি-এস্ হয়ে আর দেশের কাজ করা যায় না রে, আই-সি-এস্ হলে লোকে দেশের দুরবস্থার কথা ভুলে যায়, তাই আর আমি আই-সি-এস্ পরীক্ষা দিইনি।"

আই-সি-এস্ হইলে যে দেশমাতৃকার সেবা করা যায় না জানিতাম না। তাহাকে বলিলাম,—"তা বেশ করেছিস্, কিন্তু তোর এ বেশ কেন, আর আজকাল করছিস্‌ই বা কি ?"

গুণনিধি বলিল,—"আর বলিস্ কেন, এম-এ পড়া ছেড়ে দেবার পর কিছুদিন জার্নালিজম্ শিখলুম।

তার কিছুদিন পরেই 'দিগন্ত' দৈনিক পত্রিকার এডিটারি করবার জন্যে দিগন্তর পরিচালকরা ভীষণ চেপে ধরলে। আমি কিন্তু অত রেস্‌প্‌ন্সিব্‌ল্ পোস্ট চট্ করে হোল্ড করতে রাজি হবার ছেলে নই। জানিস্‌ই ত ফায়ারি আর্টিক্‌ল্ লেখায় আমার কি রকম হাত ছিল।"

গুণনিধির যে কবে ফায়ারি আর্টিক্‌ল্ লেখার হাত ছিল স্মরণ হইল না। গুণনিধি বলিয়া চলিল,—"বুঝলি কিনা, শেষে মাথা গরম করে লীডার লিখে জেলে যাই আর কি, তাই এডিটারি না নিয়ে একজন ঠুঁটো জগন্নাথকে এডিটার রাখিয়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটার হতে রাজি হয়ে গেলুম। নাইবার খাবারই ফুরসৎ পাইনা, তা জামাকাপড়ের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেবার সময় কোত্থেকে পাব? উদয়াস্ত খাটতে হয় রে ভাই, খবরের কাগজে চাকরি করার দুর্ভোগ তুই কি বুঝবি? দিব্যি আরামে ডেপুটিগিরি করছিস্, বেড়ে আছিস্ যাহোক্!"

গুণনিধিকে বলিলাম—"ডেপুটি হয়েছি তোকে কে বল্লে, একটা কেরানির কাজ পেয়ে গেছি, আজ-কালকার দিনে এই ভাগ্যি, তবে মাইনেটা নেহাৎ মন্দ দেয় না।"

—"তুই করছিস্ কেরানিগিরি!" গুণনিধির মুখের ভাব এরূপ হইল যে মনে হইল এখনি সে মূর্চ্ছা যাইবে।

গুণনিধি কি ভাবিয়াছিল যে আমা হেন ব্যক্তিকে সদাশয় ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বাংলা দেশের গভর্নর করিয়া দিবেন? ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। দিগন্ত অফিস আসিয়া গেল। গুণনিধি ট্রাম হইতে অবতরণ করিতে করিতে বলিল,—"আচ্ছা সমীর, ফের দেখা হবে, তোর ঠিকানাটা বল ত?" আমি তাহাকে আমার মেসের ঠিকানাটা বলিয়া দিলাম।

তাহার পর কিছুদিন গুণনিধির দেখা না পাইয়া একদিন কি খেয়াল হইল, ভাবিলাম, যাই একবার গুণনিধির সহিত দেখা করিয়া আসি। আফিস হইতে ফিরিবার পথে দিগন্ত আফিসে যাইয়া তাহার খোঁজ করিলাম। গুণনিধি আছে কি না একজনকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম যে গুণনিধি নামধারী কোন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এডিটার তাহাদের অফিসে নাই, তবে গুণেন্দু নামক এক ব্যক্তি তাহাদের অফিসে প্রুফ রীডারের কাজ করে বটে। সে আমাকে একটা ঘর দেখাইয়া বলিল যে সেই ঘরটিতে গুণেন্দু আছে। আমি সেই ঘরটিতে প্রবেশ করিতেই গুণনিধি আমাকে দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে একটা বিড়ি ধরাইতে যাইতেছিল, আমাকে দেখিয়া বিড়িটা পকেটে পুরিয়া বলিল—"আরে সমীর যে, কি মনে করে?" ঘরটাতে তখন আর অন্য কেহ ছিল না।

আমি বলিলাম—"এমনি হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল তোর সঙ্গে দেখা করতে চলে এলাম।"

গুণনিধি টেবিলের উপরিস্থিত তাড়া তাড়া প্রুফ দেখাইয়া বলিল,—"দেখছিস্ ত খবরের কাগজে চাকরি করা কি ঝকমারি! এডিটারি থেকে প্রুফ রীডারি, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ সব আমারই ঘাড়ে।"

দিগন্ত অফিসে তাহার পদ যে কি তাহা যে জানিতে পারিয়াছি, সে কথা আর তাহাকে বলিলাম না। গুণনিধি শার্টের বুক পকেট হইতে একটা চ্যাপ্টা গোল্ডফ্লেক্ সিগারেট বাহির করিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। আমি আর আজকাল বড় একটা ধূমপান করি না বলিতেই গুণনিধি মাথা নাড়িয়া বলিল,—"আরে ম্যান্ হ্যাভ এ স্মোক, আমার খাতিরেই না হয় একদিন একটা সিগারেট খেলি।"

আর বাদানুবাদ না করিয়া সিগারেটটি ধরাইয়া তাহাকে বলিলাম,—"তোর হাতে এখন অনেক কাজ পড়ে রয়েছে দেখছি, তোকে আর বিরক্ত করব না, আমি চলি।"

গুণনিধি আমাকে একবারও বসিতে অনুরোধ করিল না, বরং তৎক্ষণাৎ বলিল—"তা যখন যাবিই বলছিস্ আমি আর তোকে বসতে বলি কি করে।"

আমি তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া যখন তাহাদের অফিসের গেটের কাছে পৌঁছিয়াছি তখন গুণনিধি পিছন হইতে আসিয়া আমাকে ডাকিল—"সমীর শোন্ শোন্।"

আমি ফিরিয়া তাকাইতেই গুণনিধি বলিল,—"তোর কাছে পাঁচটা টাকা থাকে ত ধার দেনা ভাই। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি তোকে ফেরৎ দিয়ে দেব। ভয়ানক বিপদে পড়েছি।"

তাহাকে টাকা দিলে যে কিরূপ ফেরৎ পাইব তাহা জানিতাম,—"পাঁচটা টাকা আমার কাছে আছে, তোর এ টাকা ফেরৎ না দিলেও চলবে", বলিয়া পকেট হইতে একটা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিলাম।

—"টাকা ফেরৎ নিবি না কিরে, তুই যে দেখছি এখনো সেই আগেকার মতই ভীষণ সেন্টিমেণ্টাল রয়ে গেছিস্।"

আমি যে কবে ভীষণ সেন্টিমেণ্টাল ছিলাম একবার ভাবিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মনে পড়িল না।

—"না না এ টাকা তোকে ফেরৎ নিতেই হবে," বলিতে বলিতে গুণনিধি ছোঁ মারিয়া আমার হাত হইতে নোটটি লইয়া পকেটস্থ করিল।"

আমি বলিলাম,—"ছাখ নিধি······।"

গুণনিধি বাধা দিয়া বলিল—"নিধি নয় গুণেন্দু", এবং বলিয়াই সরিয়া পড়িল।



ভারতীয় কৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

(২)

আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের দেখা হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না, আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের কন্যা হেলেনকে তিনি বিবাহ করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধেও কোন সঠিক খবর নাই। তবে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করার কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্য হস্তগত করেন এবং এক বিরাট মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। বাহ্লীক অঞ্চলের গ্রীকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তাদের সঙ্গে খুব সম্ভব এমন কোন বন্দোবস্ত হয়েছিল যাতে তারা আর মৌর্য্য সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা করে নাই। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার, এবং পৌত্র অশোকের সময় পর্য্যন্ত মৌর্য্য সাজ্যের সীমানা অটুট ছিল। অশোক খুব সম্ভব কলিঙ্গ জয় করে সে সীমানাকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। অশোকের সময় এই সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানা ছিল হিমালয়, পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও আরব সাগর, দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রদেশের পেন্নার নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব্বে খুব সম্ভব ব্রহ্মপুত্র। এ বিরাট সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করবার জন্য নানা প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, উত্তর পশ্চিমে তক্ষশীলা, পশ্চিমে বিদিশা, এবং কলিঙ্গদেশে ভুবনেশ্বরের নিকটে তোশলী। এই সমস্ত প্রদেশে রাজপ্রতিনিধি থাকত। পাটলিপুত্র ছিল মৌর্য্যদের রাজধানী। মৌর্য্যরাজাদের রাজ্যশাসন-প্রণালী ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ, এবং সেই শাসনপ্রণালীর যে পরিচয় আমরা পাই তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। অনুমান খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকের শেষ দিকে মৌর্য্যরাজ্যের অবসান হয়! কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী ধরে মৌর্য্যরাজারা এবং বিশেষতঃ অশোক দেশকে এমন একটি উন্নত অবস্থায় এনে দিয়েছিলেন যা তাঁদের পূর্ব্বে ছিল কল্পনাতীত।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সে ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্য বহুদূরদেশে, গ্রীস, মিশর, বাহ্লীক, সিংহল, নেপাল প্রভৃতি স্থানে দূত প্রেরণ করেছিলেন। আর নিজের দেশের মধ্যে নানা শিলালিপিতে দেশবাসীকে ধর্ম্মপথে থাকবার জন্য, এবং সমস্ত ধর্ম্মের প্রতি উদার ভাব পোষণ করবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করেছিলেন্। সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েছিল।

মৌর্য্যযুগেই আমরা প্রথম ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন পাই, প্রথম নিদর্শন হলেও সেগুলি যে একটি বিশেষ উন্নত শিল্পের নমুনা তাতে সন্দেহ নাই। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানা স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, মধ্যপ্রদেশের সাঞ্চী ও ভরহুত স্তূপ খুব সম্ভব মৌর্য্যযুগের। এই দুই স্তূপের প্রস্তর-বেষ্টনীতে যে কারুশিল্পের নিদর্শন রয়েছে তা আজও আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে ও মনে আমোদের সঞ্চার করে। অশোক অনেক স্তম্ভ স্থাপনা করেছিলেন। এই সকল স্তম্ভের উপর শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল এবং স্তম্ভের উপরিভাগে নানা জন্তুর মূর্ত্তি স্থাপিত হত। এইরূপ কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং সেগুলির রচনায় শিল্পনৈপুণ্যের অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্য্যযুগের দু-একটি দেবদেবীর মূর্ত্তিও

পাওয়া গিয়েছে। এগুলির আলোচনা করলে বোঝা যায় মৌর্য্যযুগে ভারতীয় শিল্পী অদ্ভুত প্রেরণা পেয়ে এমন একটি অপূর্ব্ব শিল্পের ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে ধারা অবলম্বন করে ভারতীয় শিল্প পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পে পরিণত হয়েছিল।

মৌর্য্যবংশ পতনের পর হতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোন একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ছিল না। এই পাঁচশত বৎসরের মধ্যে ভারতীয় কৃষ্টির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল বটে কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট শৃঙ্খলতার অভাব ছিল।

খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে পাটলিপুত্রে সুঙ্গ ও কণ্ববংশ রাজত্ব করেন। সুঙ্গবংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র সমস্ত উত্তরাপথে হয়ত নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী রাজারা তা রাখতে পারে নাই। দক্ষিণপথে অন্ধ্র রাজারা স্বাধীন রাজ্যস্থাপনা করেছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চিম ভারতের অনেক অঞ্চল রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বহু বৈদেশিক জাতি রাজ্য স্থাপনা করেছিল।

পুষ্যমিত্র সুঙ্গের রাজ্যকালেই বাহ্লীক হতে গ্রীকরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব অধিকার করে। পাঞ্জাবে শাকল নগরে (বর্ত্তমান শিয়ালকোট) তাদের নূতন রাজধানী হয়। শাকলের গ্রীক রাজাদের মধ্যে মিলিন্দ (Menander) নামক রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তিনি খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ব্যাপার নিয়েই মিলিন্দ-প্রশ্ন নামক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ বৌদ্ধ-সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন-বিশেষ।

এর কিছুকাল পরেই পারসিকেরা পাঞ্জাব আক্রমণ করে এবং তক্ষশীলা এবং মথুরা অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু তাদের আধিপত্যও ছিল ক্ষণস্থায়ী, কারণ মধ্য-এশিয়া হতে শকজাতি প্রথমে পাঞ্জাবে এবং পরে উজ্জয়িনী অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে, এবং খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের মধ্যভাগে কুষাণ জাতি পাঞ্জাবে প্রবেশ করে। কুষাণ রাজারা ছিলেন বিশেষ পরাক্রমশালী এবং অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করে অল্পকালের মধ্যেই নিজেদের রাজত্ব বিস্তার করেন। পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশাওয়ার) ছিল তাঁদের রাজধানী। এই বংশের রাজা কণিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেছিলেন। দক্ষিণে খুব সম্ভব বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই কুষাণ রাজারা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁদের বংশধরেরা কাশ্মীরে খৃষ্টীয় একাদশ শতক পর্য্যন্তও রাজত্ব করেছিলেন।

এই যুগে রাজনৈতিক শক্তি বৈদেশিক রাজবংশের হস্তগত হলেও ভারতীয় সভ্যতার প্রসারে কোন অন্তরায় ঘটে নাই। গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীরা ভারতীয় সভ্যতাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন, এবং ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। উজ্জয়িনীতে শকরাজারা হিন্দু ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি কল্পে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। এই রাজাদের শিলালিপিতেই সর্বপ্রথম সংস্কৃত কাব্যের পরিচয় পাই। শিলালিপিগুলির ভাষা, ভাব, এবং রচনাশৈলী অনেক সংস্কৃত কাব্যের রচনারীতির অনুরূপ। 'মহাভাষ্য' রচয়িতা পতঞ্জলি এই উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী গোনর্দ নামক স্থানের লোক। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য ও তাঁর নবরত্নের উপাখ্যান ঠিক ইতিহাস না হলেও এ কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে উজ্জয়িনী সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টির একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

কুষাণ বংশীয় কণিষ্ক ছিলেন বৌদ্ধ, পুরুষপুর নগরে তিনি যে বিরাট বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন তার সৌন্দর্য্য বহু শতাব্দী ধরে বিদেশী পর্য্যটককেও আকৃষ্ট করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক প্রধান আচার্য্য, নাগার্জ্জুন, সংঘরক্ষ, অশ্বঘোষ সকলেই তাঁর আমন্ত্রণে পুরুষপুরে এসেছিলেন। নাগার্জ্জুন ছিলেন দার্শনিক, মাধ্যমক নামক বৌদ্ধদর্শনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। অশ্বঘোষ ছিলেন কবি, তাঁর রচিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থগুলি, বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ, প্রভৃতি কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে তুলনা করে অনেকে অশ্বঘোষকেই উচ্চাসন দিয়েছেন। কণিষ্কের প্ররোচনায় সে যুগের প্রধান বৌদ্ধ আচার্য্যগণ পুরুষপুরে সমবেত হয়ে সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রের মহাবিভাষা নামক বিরাট টীকা রচনা করেন। সুতরাং কণিষ্ক বৈদেশিক রাজবংশের রাজা হলেও ভারতীয় সভ্যতার উন্নতিকল্পে যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তার তুলনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বেশী নাই।

কণিষ্কের সময়ে নাগার্জ্জুন, অশ্বঘোষ এবং অন্যান্য আচার্য্যদের হাতে বৌদ্ধধর্ম্মের এক নূতন মতবাদ পরিপুষ্টি লাভ কর্‌ল। এই নূতন বৌদ্ধধর্ম্মকে বলা হয় মহাযান এবং এর প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মকে বলা হয় হীনযান। হীনযানের দৃষ্টি ছিল সঙ্কীর্ণ, হীনযানীরা বুদ্ধপ্রদর্শিত আচার ব্যবহার পালন করে, ধর্ম্মপথে থেকে পুণ্য অর্জ্জন করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু বুদ্ধত্বলাভ করবার দুরাশা পোষণ করতেন না। মহাযানে বুদ্ধত্বলাভ করা এবং সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন করাই হচ্ছে প্রধান কাম্য। মহাযানে দুটি বিশিষ্ট দার্শনিক মত আছে—মাধ্যমক ও যোগাচার। মাধ্যমকের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাগার্জ্জুন এবং যোগাচারের প্রথম প্রচারক মৈত্রেয় নাথও খুব সম্ভব নাগার্জ্জুনের অল্পকাল পরেই জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই দার্শনিক মতে জগৎ মায়ামাত্র। তার পেছনে যে পারমার্থিক সত্য আছে তা নাগার্জ্জুনের মতে শূন্যতা। অঙ্কশাস্ত্রে 'শূন্য' বা zero হচ্ছে সেই বস্তু যার মধ্যে দেনা পাওনা কিছুই নাই। সুতরাং শূণ্যতাও হচ্ছে সেই অবস্থা যার সৃষ্টি, বিনাশ কিছুই নাই। যোগাচার-পন্থীরা এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণ কর্‌লেন এবং সেই শূন্যতা লাভ করবার জন্য উপায় স্থির কর্‌লেন। এই উপায় যোগ-সাধনা, সেই জন্য সম্প্রদায়ের নাম যোগাচার।

শাকল নগরে যে সকল গ্রীকরা গ্রীকরাজাদের অধীনে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপন করেছিলেন তারাও ভারতীয় কৃষ্টির উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা করেছিল। তাঁদের বিশেষ দান হচ্ছে শিল্পে। গ্রীকরা শিল্পী ছিলেন, এবং প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্য জগতের একটি প্রধান কীর্ত্তি। এই শিল্পনিপুণ গ্রীকরা যখন ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করল তখন গ্রীক ভাস্কর্য্যের অনুরূপ একটি ভারতীয়-বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের বিশিষ্ট ধারার পত্তন করল। সেই কারণে এ ধারার নাম ইন্দো-গ্রীক। এই ইন্দো-গ্রীক ভাস্কর্য্যের রচনা-শৈলী ছিল মূলতঃ গ্রীক, আর অনুপ্রেরণা ছিল ভারতীয়। এই শিল্পীরা বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির যে মূর্ত্তি রচনা কর্‌লেন তার রচনা পদ্ধতিতে গ্রীক প্রভাব ছিল, অথচ তার প্রাণ ছিল ভারতীয়। এই ইন্দো-গ্রীক শৈলী ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হতে আফগানিস্থান, মধ্য-এশিয়া, চীন, জাপান পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সে শিল্প যে প্রাচীন ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান তাতে সন্দেহ নাই।

এই যুগে মথুরা অঞ্চলে শকদের প্রভাবে আর একটি শিল্পধারার উদ্ভব হয়েছিল যাকে ইন্দো-শক বলা যায়। এই ধারার ভাস্কর্য্যের মধ্যে শকদের আদিম দেশ মধ্যএশিয়ার প্রভাব ধরা পড়ে। এ শিল্পধারা ইন্দো-গ্রীক ভাস্কর্য্যের মত প্রসার লাভ করেনি।

এই যুগের শিল্পে আর একটি স্মরণীয় কীর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায় দক্ষিণাপথে। মাদ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণানদীর উপত্যকায় অমরাবতী নামক স্থানে এই যুগের এক বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ স্থানের প্রাচীন নাম ছিল ধান্যকটক। অন্ধ্র এবং পরে স্থানীয় ইক্ষাকু নামক বংশের রাজাদের সহায়তায় ধান্যকটকের বৌদ্ধসম্প্রদায় একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেছিল। সাঞ্চী এবং ভরহুতের স্তূপের অনুরূপ স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছিল, আর চতুর্দ্দিকে সুশোভিত প্রস্তর-বেষ্টনী, বুদ্ধ বোধিসত্ব মূর্ত্তি প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে গ্রীক বা শকদের কোন প্রভাব নাই, অথচ তা এমন একটি উচ্চাঙ্গের শিল্পের নিদর্শন যা হতে ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

এ যুগে শুধু বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন করেই যে ভারতীয় সভ্যতা উৎকর্ষলাভ করেছিল এ কথা মনে করবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বেই বলেছি যে এই যুগেই উজ্জয়িনী-নগরী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই অঞ্চলেই সে সংস্কৃতি দুটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমতকে অবলম্বন করে পরিপুষ্টি লাভ করে। এ দুটি ধর্ম্মমত ছিল শৈব এবং ভাগবত। এই ভাগবত সম্প্রদায় হতেই পরবর্ত্তী-কালের বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি। গোনর্দের মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ছিলেন শৈব, এবং তিনি যোগদর্শন নামক একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতের স্থাপনা করেন। এ মত শিবভক্তদের হাতেই পরিপুষ্টি লাভ করে। পতঞ্জলি ছিলেন খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের লোক, পুষ্যামিত্র সুঙ্গ এবং শাকলের গ্রীক রাজাদের সমসাময়িক।

এই অঞ্চলে বিদিশা (বর্ত্তমান ভিল্‌সা) নামক স্থানে সেই সময়ের একটি গরুড়স্তম্ভ পাওয়া যায়। এই স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ লিপি হতে বোঝা যায় যে, সে যুগে ভাগবত মত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হেলিয়োদোরস্‌ নামক এক গ্রীক দূত সে ধর্ম্ম গ্রহণ করে গরুড়স্তম্ভ স্থাপনা করেন। বিদিশা সুঙ্গ সাম্রাজ্যের একটি প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, এবং পুষ্যামিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র এই বিদিশাতেই রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। পুষ্যমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞ করেন এবং সে যজ্ঞে খুব সম্ভব পতঞ্জলি পৌরহিত্য করেছিলেন। অগ্নিমিত্রের ইতিহাস অবলম্বনেই কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক রচিত হয়।

এই যুগেই ভারতীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান কীর্ত্তি, মহাভারত এবং রামায়ণ রচিত হয়। এই দুই মহাকাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এই দুই গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত প্রমাণ আছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রামায়ণ খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়েছিল। নানা প্রাচীন উপাখ্যান এবং খণ্ডকাব্য অবলম্বন করে মহাভারতের প্রধান অংশও এই যুগে রচিত হয়, পরে সে গ্রন্থ পরিবর্দ্ধিত হয়ে লক্ষ শ্লোকে পরিণত হয়। এই দুই মহাকাব্য ইতিহাস নয়, কাব্য, এবং সেই কাব্যের অন্তরে ভারতীয় রীতি নীতি, রুচি, আদর্শ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সে আদর্শ এত উচ্চ যে তা চিরদিন শুধু যে হিন্দুদের মনকেই আলোড়িত করেছে তা নয়, বর্ত্তমান কালে বিদেশের যে সমস্ত পণ্ডিতেরা সে গ্রন্থ আলোচনা করেছেন তাঁরাও তার প্রশংসা না করে থাকতে পারেন নি।

এই যুগে নানা দার্শকিক মত, সাংখ্য, বৈশেষিক ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সমস্ত দর্শন উপনিষদের ধারা অবলম্বন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের প্রভাবও তার মধ্যে পাওয়া যায়। সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রও এই যুগে রচিত হয়। এ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল হচ্ছে প্রাচীন কল্পসূত্র। নীতিশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাও এই যুগে।

এ পর্য্যন্ত যা বলেছি তা থেকে আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট যুগ। এই যুগে রাজশক্তি নানা বৈদেশিক জাতির হাতে থাকা সত্বেও ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পে ভারতীয়েরা যে সৃষ্টি করেছিলেন তা কোন যুগেই অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি। বৈদেশিক রাজারা সে সভ্যতার উন্নতিকল্পে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন, কোন অন্তরায়ের সৃষ্টি করেন নাই। ভারতীয় মন ছিল সম্পূর্ণ সজীব, সেই কারণে প্রত্যেকটি ধর্ম্মমত, দার্শনিক মতবাদ এবং শিল্পের ধারাই পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্ররম্ভে গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুদয়। গুপ্ত রাজাদের প্রচেষ্টায় খণ্ড রাজ্যগুলির মধ্যে পুনরায় ঐক্য স্থাপিত হয় এবং সমস্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের উত্তরাংশ নিয়ে আবার একটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত এই সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ পরাক্রমশালী ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চমশতকের শেষভাগে গুপ্তরাজবংশের অবনতি আরম্ভ হয় এবং বৈদেশিক হূণদের আক্রমণ পাঞ্জাব অঞ্চলে হূণ রাজ্য স্থাপিত হয়। হূণদের রাজধানী ছিল প্রাচীন শাকল নগর। অন্যান্য ক্ষুদ্ররাজ্যও এই সময়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে হর্ষবর্দ্ধন পুনরায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনা করেন বটে, কিন্তু, তাও ছিল অল্পকালস্থায়ী।

এ যুগের সভ্যতা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ধারা হারায় নি। গুপ্ত রাজারা সাহিত্য ও শিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সহায়তায় সাহিত্য ও শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে। মহাকবি কালিদাস ছিলেন খুব সম্ভব চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। গুপ্তরাজাদের শিলালিপিতে সংস্কৃত রচনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে এ যুগে সংস্কৃত কাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। গুপ্তরাজারা ছিলেন ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু তাঁরা বৌদ্ধধর্ম্মেরও পরিপোষক ছিলেন। তাঁদের সহায়তায় নালন্দায় যে মহাবিহার স্থাপিত হয় তা অল্পকালের মধ্যেই একটি বিরাট শিক্ষায়তনে পরিণত হয়।

খুব সম্ভব গুপ্তরাজাদের দু'টি রাজধানী ছিল, পাটলিপুত্র এবং অযোধ্যা। অযোধ্যায় এই সময়ে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত সমবেত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। তাঁরা দুই ভাই, জন্ম পুরুষপুরে। অসঙ্গ প্রাচীন যোগাচার দর্শনকে পরিবর্দ্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বসুবন্ধু সেই, দার্শনিক মতবাদের আরও সূক্ষ্ম বিচার করে বিজ্ঞানবাদ নামক একটি দার্শনিক মতের সৃষ্টি করেন। এই বিজ্ঞানবাদ এমন একটি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মত যা বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় দার্শনিকদেরও চমৎকৃত করেছে। এ মতের মূল কথা হচ্ছে যে অলীক জগৎ-সৃষ্টির পেছনে আছে একটি বিজ্ঞান প্রবাহ মাত্র।

গুপ্তযুগে যেমন সাহিত্য, কাব্য নাটক প্রভৃতির চরম সৃষ্টি হয় তেমনি বিজ্ঞান বিশেষতঃ জ্যোতিষ এবং গণিতশাস্ত্র বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। এযুগে বিজ্ঞানের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বরাহমিহির। গুপ্তযুগে শিল্পের প্রাচীন ধারাগুলি তাদের নিজস্বরূপ হারিয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের সম্মিলনে এমন একটি প্রবল ধারার সৃষ্টি হয়েছিল যা ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বপ্রধান গৌরবের বস্তু। গুপ্ত যুগের

ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, শুধু ভারতবর্ষ নয়, সিংহল, নেপাল, মধ্যএশিয়া চীন জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছিল। অজন্তা এই যুগের কীর্ত্তি এবং অজন্তার চিত্রাবলীর অনুকরণে রচিত চিত্র আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে পাওয়া গিয়েছে। গুপ্ত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন অজন্তা, নালন্দা, মথুরা, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। ভাস্কর্য্যের এই ধারাই আমরা সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে পাই। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ভাস্কর্য্য মূলতঃ গুপ্ত শিল্পের পরবর্ত্তী নিদর্শন।

গুপ্তযুগের পরও সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক নূতন সৃষ্টি হয়। হর্ষবর্দ্ধন নিজে কবি ছিলেন এবং নাগানন্দ নামক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁরই সময়ে বাণভট্ট তাঁর প্রসিদ্ধ গদ্য কাব্য কাদম্বরী প্রণয়ন করেন। কিন্তু সে সমস্ত গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য থাকলেও তা গুপ্তযুগের সাহিত্যের তুলনায় অপকৃষ্ট।

হর্ষবর্দ্ধনের পর খণ্ড রাজ্যগুলি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে, এবং ভারতীয় সভ্যতা নানা প্রাদেশিক কেন্দ্রকে অবলম্বন করে বিভিন্নরূপ গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভ হতেই ভারতীয় সভ্যতার এই বহুমুখী ভাব প্রকাশ পায় এবং একটি নূতন যুগের সূচনা করে। এর পর রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে অনেকবার ঐক্য সাধিত হয়েছে বটে, কিন্তু নানা প্রাদেশিক কৃষ্টির মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি ধারাই একটি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে ভারতীয় সভ্যতায় বৈচিত্র্য এনেছিল।



"সরগুয়শ্‌ত-ই-উযীর-ই-খান-ই-লঙ্কুরান"

(লঙ্কুরান শহরের খানের উযীরের কীর্ত্তি)

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম, এ,

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শু'লহ্‌খানম—আপনার এ স্ত্রীর অভ্যাসই হলো বাজে সব মিথ্যা কথা বলা। ও হতভাগাকে আমি কখনও দেখিনি এবং তার কিছুই জানিও না।

উযীর—এ কেমন কথা, তুমি তাকে জান না! তয়মুর অকাকে তুমি দেখ নি? নিশ্চয়ই তাকে তুমি চেন।

শুলহ্‌—তয়মুর আকা আবার এখানে কি করছিল? আপনি যে তাকে পরাজিত করে তার মার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উযীর—এ সব বাজে কথা! আমার কথার উত্তর দাও। তা' হলে তয়মুর আকা তোমার নিকট এসেছিল।

শু'লহ্‌—এ বিষয়ে আমায় মাপ করুন। তয়মুর আকা যদি আমার নিকটই আস্‌ত, তা' হলে আমাদের দু-জনকে একসঙ্গেই দেখতেন। যীবাখানম জানে যে আমি এখন স্নানের ঘরে গিয়েছি। এবং ভেবে নিয়েছে যে আমার কোঠা খালি পড়ে রয়েছে; তাই ইচ্ছা করেছিল, তার প্রিয়তমকে এখানে নিয়ে এসে বেশ আমোদ করবে। আজ তার ঘরে আপনার যাবার পালা বলে, ওকে আর তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে নি। ঘটনাক্রমে স্নানের ঘরে জল না থাকায়, আমরা ফিরে এসে কোঠায় ঢুকি। আমরা অজানিত ভাবে এসে পড়ায়, আর তারা বে'র হয়ে যেতে পারে নি। তাই পর্দ্দার পেছনে গিয়ে রয়েছে। এবং যতক্ষণ না বাইরে যাব, ওখানেই অপেক্ষা করে আমোদ করবে ও আমার যাওয়ার সুযোগে বের হয়ে যাবে।—এই হলো আসল কথা। বেশ চিন্তা করে দেখুন এবং এ চালাকিতে প্রতারিত হয়ে, আমার প্রতি খারাপ ধারণা করবেন না।

যীবাখানম্—(উচ্চস্বরে শু'লহ্‌খানম্‌কে)—আরে বজ্জাত, এসব কি বানিয়ে বলছিস? তোর সব দুর্ণাম আমার মাথায় চাপিয়ে দিতে চাস? হায়, হায়, আমি আত্মহত্যা করব; হায়, খুদা।

শু'লহ্‌—বজ্জাত তুমিই, তুমিই পাপিষ্ঠা। ইচ্ছা হয় মর, না হয় যা ইচ্ছা কর। তোমার এসব দুষ্টামি লঙ্কুরানের সব্বাই জানে। তোমার এ সৎকর্ম্মের কথা আর ঘুরিয়ে প্রচার করতে হবে না। তোমার স্বামীর চোখ আছে, তিনিই এ বুঝবেন—এ তোমার না আমার কাজ।

যীবা—হায়, হায়। হায় খুদা। আত্মহত্যা করব। এ মিথ্যা অপবাদ সব বানিয়ে বল্‌ছে, তবুও এর প্রতিবাদে তুমি কিছুই বল্‌ছ না।

শু'লহ্‌—হে পাপিষ্ঠা, কেন আমার প্রতিবাদ করবেন? তিনি যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তা'হলে তোমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলা উচিত—যেহেতু একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তোমাকে একসঙ্গে পেয়েছেন।

উযীর—(যীবাখানম্‌কে)—নিশ্চয়ই। তোকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলাই উচিত। আমাকে একটু অবসর দে—খানের নিকট পৌছে, আগে তোর সঙ্গীর কাজ সেরে নি। তারপর তোর বিষয়ে চিন্তা করব। জীবনটাই তুই মিথ্যার মধ্যে কাটিয়েছিস। তোকে আমি ভাল করেই চিনেছি।

যীবা—(রেগে)—এই বিচার! আমি মিথ্যা বলেছি। কিন্তু মাশা'আল্লা (খুদাকে ধন্যবাদ), আর তুমি যে কতদুর সত্য বলেছ, তা তোমার কথা হতেই বেশ বোঝা গিয়েছে।

উযীর—আমার সম্মুখ হতে দূর হ পাপিষ্ঠা। (যীবাখানম্ কোঠা হতে বের হয়ে গেলেন।) —শু'লহ্‌, তুমিই ঠিক করে বলতো, এর খবর কিছু রাখ কি?

শু'লহ্‌—আপনার মৃত্যুর শপথ করে বল্‌ছি—আমি এ বিষয়ে কোন রকমেই দোষী নই।

(এ সময় খাজহ্‌, মসউদ্ এক কফি এনে উযীরের পেছনে একটী পাত্রে রেখে বল্‌ল "হুজুর কফি অনুগ্রহ করে নিন।")

উযীর—(ফিরে পাত্র হাতে নিয়ে কফি খাজহ্‌, মস'উ'দের মাথায় ঢেলে দিয়ে)—দূর হ, মুখ পোড়া গাধা। এ সময় কি আর ক্ষিদে পায় যে কফি খাব? এখনই খানের নিকট যাব, সবই বোঝা যাবে।

(খাজহ্‌, মস'উ'দ্ পেছন ফিরে নিজের পোষাক হতে ছড়ান কফি পরিষ্কার করতে যাবে, এমন সময়) —(অত্যন্ত বিমর্ষভাবে) শীগ্‌গীর যা, লাল ঘোড়া ও বাদামী-পোষাক জীন পরিয়ে বাইরে আন্‌তে বল্‌গে।

মস'উদ্—আচ্ছা, হুজুর। আপনার আদেশ মত সব এখনই হাজির করছি।

(তারপর উযীর বাইরে গেলেন।)

শু'লহ্‌খানম্—আল্লাহু আকবর, কি বিপদেই পড়েছিলাম! বাঁচা গেল, খুদাকে ধন্যবাদ। (এ সময় নিসাখানম্ এল, তার দিকে ফিরে) —নিসা, অবাক কাণ্ড হয়ে গেল—এর কোন খবর রাখিস না? উযীর তয়মুর আক্কাকে যীবাখানমের সহিত পর্দ্দার পেছনে দেখেছেন।

নিসা—সত্যি? এ কি বল্‌ছ? যীবাখানম্ পর্দ্দার পেছনে কি কর্‌ছিলেন?

শু'লহ—জানিনা, ও হতভাগী কেন ওখানে গিয়েছিল —যাই হোক, ও আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু খান নিশ্চয়ই তয়মুর আক্কাকে মেরে ফেলবেন। আমি চিন্তা করে উঠ্‌তে পারছি না, কি করে তাকে বাঁচানো যায়।

নিসা—ভয় পেয়ো না। তয়মুর আক্কাকে মারতে পারবে না। কিন্তু এমন না হওয়াই ভাল ছিল। এখন বিষয়টা একটু জটিল হয়ে যাবে। মা তোমাকে ডেকেছেন। চল, তাঁর ঘরে যাই। খাজহ্‌, মস'উদ্‌কে খবর নিবার জন্য দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

(দুজনই চলে গেলেন। পর্দ্দা পড়ল)

"৩য় অঙ্ক"

(নদীর তীরে লঙ্কুরাণের রাজদরবারে খান তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন। রাজসভার নাযির সলীম বেগ ছড়ি হাতে করে রাজার সামনে এবং দু'দিকে সভাসদ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। চাকরদের সর্দ্দার স্বমদবেগ, "অযীয আক্কা ও আরও দুতিনজন চাকর দরবারের পেছন দিক বসে রয়েছে। দরবারের নীচে নায়েব কদীর বেগের নিকটে আবেদন কারীরা অপেক্ষা করছে ও কতকগুলো চাকর ও বেয়ারা দরবারের নীচে একদিকে জড়ো হয়ে আছে।)

খান—আজ দিনটী বেশ করেছে—দরবারের পরই কতক্ষণ বেশ করে নদীতে বেড়ান যাবে, তা'তে মনে বেশ আনন্দ হবে। 'অযীয আক্কা, ছোট একটী নৌকো নদীতীরে এনে রাখতে মাঝিদের বলে দে।

'অযীয আক্কা—আচ্ছা, হুজুর।

('অযীয আক্কা বের হয়ে গেল)

খান—সলীম বেগ, আবেদন কারীদের এখানে নিয়ে আসতে বলো।

সলীম বেগ—(দরবার হ'তে)—কদীর বেগ, আবেদন কারিদের সামনে নিয়ে এসো।

(কদীর বেগ বাদী ও বিবাদী সাম্‌নে নিয়ে এসে অভিবাদন করল)

বাদী—হুজুরের কুরবান্। আমার একটী আবেদন আছে।

খান—আরে হতভাগা, বল্ তোর কি আবেদন।

বাদী—আমি হুজুরের কুরবান। আজ আমার ঘোড়াটাকে জল খাওয়াবার জন্য ঘরে আনতেই, ওটা হাত হ'তে ছুটে পালিয়ে যায়। ওই লোকটা সামনের দিক থেকে আসছিল। ওকে ডেকে বল্‌লাম "ও ভাই, দোহাই খুদার, ঘোড়াটাকে ধরে দাও।" এতে সে রেগে গিয়ে মাটী থেকে একটী পাথরের টুকরো নিয়ে ঘোড়ার দিকে ছুড়ে মারল। ঢিলটা ডান চোখে লেগে ওটাকে কাণা করে দিয়েছে। এটা এখন অকেজো হয়ে পড়েছে, আমার আর কোন কাজেই আসবে না। ঘোড়াটার ক্ষতিপূরণ চাওয়াতে, সে ত দিবেই না, তা আবার আমার সঙ্গে ঝগড়া করে।

খান—আরে বেটা, এ সত্যি?

বিবাদী—হুজুরের কুরবান। হাঁ, এ ঠিক। কিন্তু আমি ইচ্ছা করে ঢিল ছুড়িনি।

খান—মিথ্যা বলিস না; যদি ইচ্ছাই না থাকবে তা

হল্লে এ কেমন করে হয়—মাটী থেকে পাথরের টুকরাকে নিয়ে ঢিল ছুড়্লি? তোরও ঘোড়া আছে?

বিবাদী—হাঁ হুজুর, আছে। যা হতভাগা, বাইরে গিয়ে তুইও ওর ঘোড়াটার এক চোখ কাণা করে দে। "আস্সিন্ন বাস্সিন্ন বাল্'অয়ন বাল্ অয়নই'—দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, এ তো কুর-আনের কথা। এতে আর মুস্কিল কি। স্বমদ বেগ, একটী চাকরকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে দে, যা'তে ও তার প্রতিশোধ নিতে পারে।

(স্বমদবেগ দরবার হতে নীচে নেমে এসে একজন বেয়ারাকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল)

খান—সলীম্‌বেগ, আর কোন আবেদনকারী থাকলে, তাদের আসতে বলো। তাড়াতাড়ি কর—আমি যে আজ বেড়াতে যাব ইচ্ছা করেছি।

সলীমবেগ—ক্দীরবেগ, আরো আবেদকারী থাকলে এখানে নিয়ে এসো।

(ক্দীরবেগ আরো দুজন লোককে এনে হাজির করল।

খান—আবার বিচার! এর চেয়ে আরো কষ্টের দুনিয়ায় কিছু আছে কি! সব্বাই তাদের সুখের চিন্তায়ই ব্যস্ত, কিন্তু আমার করতে হয় হাজার হাজার লোকের চিন্তা ও তাদের ধনসম্পত্তি দেখাশুনা। আমার শাসনের আরম্ভ হ'তে আজ পর্য্যন্ত আমি কোন আবেদনকারীকেই আমার বিচার হতে বিমুখ করিনি।

সলীমবেগ—ওদের আশীর্ব্বাদই যে হবে আপনার এ কষ্টের পারিতোষিক। প্রকৃতপক্ষে ওরা যে আপনার সন্তান তুল্য। আপনার সুবিচারের ফলেই ত এ লঙ্কুরানরাজ্য টিকে আছে।

(আবেদনকারীরা সামনে এসে খান্‌কে সম্মান দেখাল)

বাদী—হুজুরের কুরবান। আমার ভাইএর অসুখ হয়। লোকে বলে 'ও বেটা হকীম (কবিরাজ) ওকে ৩ তুমান (২১ টাকা) দিয়ে ভাইএর শিয়রে ডেকে আনলাম—এই আশায় যে ভাইএর রোগ সারিয়ে দেবে। হকীম রোগীর কাছে এসেই তার শিরা কেটে রক্ত বের করল এবং রক্ত বের করার সঙ্গে সঙ্গেই ভাই মারা গেল। এখন তাকে আমি বলছি—কোন গণ্ডগোল না করে বেশ ভাল মানুষের মত আমার টাকা ফিরিয়ে দাও; টাকা ত দেবই না, তারপর আবার বলে 'যদি আমি রক্ত বের না করতাম, তা হলে আরো খারাপ হতো;—সে আমার নিকট আরো দাবী করে। এর আপনি সুবিচার করে দিন।

খান—(বিবাদীকে)—হকীম স্বাহিব, রক্ত বের না করলে, এর চেয়ে আর বেশী কি খারাপ হতো? এ হতে আর বেশী খারাপ কি হতে পারে?

বিবাদী—হুজুরের কুরবান। খান, ওর ভাই মারাত্মক রোগে ভুগ্‌ছিল। যদি ওর রক্ত বের করে না দিতাম, তা হলে এ নিশ্চিত যে সে আরো ছ'মাস পরে মারা যেতো। রক্ত বের করে দিয়ে, আরো ছ'মাসের খরচ হতে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।

খান—হকীম স্বাহিব। আপনার কথামত আপনি ওর নিকট আরো পাবার আসা করেন।

হকীম—হাঁ হুজুর। যদি সুবিচার হয় নিশ্চয়ই আশা করি।

খান—(উপস্থিত সকলের দিকে চেয়ে) আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না—আর কত সুচারুরূপে বিচার করব, যা'তে সব বিবাদ বিসংবাদ দূর হয়ে যাবে। আর কখনও বিচারের বেলায় এমন মুস্কীলে পড়িনি।

উপস্থিত লোকদের একজন—হুজুরের কুরবান। হকীমকে সম্মান দেখান আমাদের সকল সময়ই কর্ত্তব্য। তাঁরা লোকের অনেক উপকারে আসে। লোকটাকে হকীমকে একটী পোষাক দিয়ে সন্তুষ্ট করবার জন্য, অনুগ্রহ করে আদেশ করুন। এ বন্দহ্ হকীমকে বেশ ভাল করেই জানে। উনি একজন ভাল হকীম।

খান—তা'হলে ও যখন আপনার পরিচিত, আপনার কথা মতই কাজ করা হবে। (বাদীর দিকে ফিরে) এ বেটা, বাইরে গিয়ে ওকে একটী চোগা চাপকান দিয়ে সন্তুষ্ট কর। স্বমদ বেগ, একটী চাকরকে ওই লোকটার নিকট হতে একটী চোগা চাপকান নিয়ে হকীমকে দিবার জন্য পাঠিয়ে দে।

(স্বমদ বেগ নীচে নেমে এল, এমন সময় উযীর হাঁপাইতে হাঁপাইতে দরবারে এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর কলমদানটী পকেট হতে ছিটকে গিয়ে খানের সামনে পড়ল)

উযীর—হুজুরের কুরবান, আমার উযারতীর যথেষ্ট হয়েছে। আমার চাকরীর উপযোক্ত পুরস্কার পেয়েছি। এখন আপনি যাকে উপযোক্ত মনে করেন, তাকেই উযারতীর ভার দিতে পারেন। মাথা গুজে কোন রকমে রাজ্য হতে সরে পড়্‌তে পারলেই হয়।

খান—জনাব উযীর, হয়েছে কি? কেমন করে, কি হলো?

উযীর—হুজুরের সুবিচারের কথা সববাই বলছে এবং আপনার ভয়ে কেউই গরীবের পরিবার ও ধন সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করতে সাহস করে না। কিন্তু দেখুন, আপনার ভাই বেটা তয়মুর আক্কা আপনাকে একেবারেই গ্রাহ্য না করে, দিন দুপুরে আমার মত একজন লোকের বাড়ীতে এসে, তাঁর পরিবারের সন্ধান করছে।

খান—(রেগে) উযীর, এ কি বল্‌ছেন? তয়মুর এমন সাহস করেছে? এর অর্থ কি?

উযীর—যদি মিথ্যা বলে থাকি, তা হলে আপনার নিমক আমাকে অন্ধ করে দেবে! নিজের চোখে আমি এ দেখেছি। ওকে হুজুরের নিকট নিয়ে আসবার জন্য ধরেছিলাম, কিন্তু ও ধাক্কা দিয়ে আমার হাত হতে পালিয়ে গেলেন।

খান—স্বমদ বেগ, শীগগীর তয়মুরকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়, এ বিষয়ে কিন্তু কিছুই বল্‌বি না।

(স্বমদ বেগ সম্মান দেখিয়ে বাইরে গেল)

খান—উযীর, শান্ত হউন, এমন বিচারই আমি এখন করব, যে সমস্ত পৃথিবী এ হ'তে শিক্ষা পাবে।

উযীর—পূর্ব্বের বাদশাহরা বিচারের বেলায়—তাঁদের পরিবার বর্গ ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করতেন না। মহান খলীফহ্‌গণ পরস্ত্রীর উপর বক্র দৃষ্টি ফেলার জন্য, তাঁদের নিজ সন্তানদেরও ভীষণ ভাবে শাস্তি দিয়ে গিয়েছেন, সুলত্বান মহমুদ্‌ গহনবী এই অপরাধের জন্যই নিজের দরবারের এক পারিষদকে স্বহস্তে বধ করেছিলেন, এসব সুবিচারের জন্যই তাঁরা এতদিন পর্য্যন্ত স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

খান—এখনই দেখতে পাবেন যে, আপনাদের খান খলীফহ্‌ ও সুলত্বান মহমুদ হ'তে কোন বিষয়ে কম হবে না—বিশেষতঃ এ ব্যাপারে।

(এমন সময় স্বমদ বেগ তয়মুর আক্কাকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো)

খান—(তয়মুর আক্কাকে) তোমাকে আদেশ করি নি কি, যে খঞ্জর সঙ্গে করে আমার সাম্‌নে এসোনা?

তয়মুর আক্কা—আমার কোমরে ত খঞ্জর বাঁধা নেই।

খান—এরূপই আমার মনে হচ্ছিল। ভাল, উযীরের অন্দর মহলে তোমার কি কাজ ছিল? (তয়মুর মাথা নুয়ালেন,)—এই তোমার মতলব। তোমার মত অকেজো, ভবঘুরে ভাই বেটার জন্য আমার দুর্নাম রটে যাচ্ছে। এ যাত্রা আর তোমার মত ভাইবেটাকে ক্ষমা করা যায় না। বেটারা, দড়ি।

(কয়েকজন চাকর কাশ্মীরী শাল সঙ্গে করে উপস্থিত হলো)—এই পাজি, ভবঘুরের গলায় শাল জড়িয়ে ফাঁসী দে।

(চাকররা শাল গলায় জড়াবার জন্য প্রস্তুত হলো তাদের চোখ অশ্রুপূর্ণ)

নায়েব ও অন্যান্য সভাসদ—হুজুরের কুরবান। জোয়ান পুরুষ! এবার ওঁর অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

খান—পিতার শপথ, ওকে আর ক্ষমা করা যায় না। (চাকরদের)— শাল দিয়ে গলায় জড়া।

(দুঃখের আতিশয্যে নিসাখানমের দম আটকে যাচ্চে —এমন সময় দরজা ধাক্কা দিয়ে তয়মুর আক্কা এসে উপস্থিত হলেন।)

শু'লহ—আরে, এ আবার কেমন? এখানে এলেন কি করে? এ কি সিংহের প্রাণ? প্রাণের ভয় নেই কি?

তয়মুর আক্কা—হয়েছে কি যে প্রাণের ভয় করব?

শু'লহ—না হয়েছে কি? খান আপনাকে খোঁজ করে ধরে নিয়ে মারবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। আপনি নিশ্চিন্তে এখানে কেন আসলেন? 'আক্কা মস'উদ, খুদাকে ধন্যবাদ, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও যা'তে কেউ না আসতে পারে।

(আক্কা মস'উদ বাইরে গেল)

তয়মুর—আপনি কি মনে করছেন যে মরণের ভয়ে আজ সিনাখানমকে দেখতে আসব না? সব সময় আমার মনে কেবল যে এই এক চিন্তা। কিন্তু এখন কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে আসিনি। আজ রাত্রে নিসাখানমকে

অন্য যায়গায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা করেছি। এরপর আর তাকে এখানে রাখা যেতে পারে না। আপনার স্বামী যখন আমার উপর নিমকহারামীই করলেন, আর আমি আমার ভাবীস্ত্রীকে তাঁর বাড়ীতে রেখে যেতে পারি না। আর আগের ন্যায় আসা যাওয়াও করতে পারি না।

শু'লহ—বেশ ভালই। আমিও এতে রাজী আছি। কিন্তু এ দিন দুপুরে আপনার এখানে আসা ঠিক হয় নি। আপনি কি জানেন না—যা'তে আপনাকে বধ করতে পারে ও আমাদের দুর্নামে ফেলতে পারে সেজন্য যীবাখানম সবদিক দিয়ে আমাদের দেখবার জন্য লোক লুকিয়ে রেখেছে। এই ভাল—কোন রকমে এখান থেকে এখন পালিয়ে যান। দুপুর রাত ঘোড়া ও লোক নিয়ে এসে দরজায় অপেক্ষা করবেন; আমিও সে মুহূর্ত্তে নিসাখানমকে বাইরে নিয়ে এসে আপনার হাতে সমর্পণ করব। তখন তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন।

তয়মুর—নিসাখানম, তুমি ও এতে রাজী আছ?

নিসা—নিশ্চয়ই, ও ছাড়া যে আর কোন উপায়ই নেই।

(এমন সময় আকা মস'উদ ঘরে ঢুকে বল্‌লে "হা খুদা, উযীর আস্‌ছেন যে।")

শু'লহখানম ও নিসাখানম—(তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল)—হায়, হায় খুদা, তয়মুর আকা, পর্দ্দার পেছনে গিয়ে অপেক্ষা করুন। দেখি, কোন রকমে, ওঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি কি না।

তয়মুর—(এ অবস্থায় কোনরূপ দুঃখিত না হয়ে) —আমি আর কখনও পর্দ্দার পেছনে যেতে চাই না। সে আসুক, এসে আমাকে এখানে দেখুক।

শু'লহ ও নিসা -(তার পায় জড়িয়ে ধরে, অত্যন্ত বিমর্ষের সহিত)—খুদার নাম করে বল্‌ছি, নিজকে রক্তের ঢেউয়ে ভাসাবেন না, আপনার পিতার কবরের দোহাই, এ পর্দ্দার পেছনে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

তয়মুর—কখনই না।

আকা মস'উদ (আবার ঘরে ঢুকে)—"হায় খুদা, উযীর এসে পড়েছেন যে।"

শু'লহ ও নিসা—আমাদের প্রতি অন্ততঃ অনুগ্রহ করুন। এবার যদি উযীর আপনাকে এখানে দেখেন, তা হলে আর আমাদের জ্যান্ত রাখবেন না।

তয়মুর—কেবল আপনাদের জন্য।

(পর্দ্দার পেছনে গেলেন, মুহূর্ত্ত পরেই উযীর এসে উপস্থিত হলেন)

উযীর—ভালই হয়েছে তোমরা দুজনেই এখানে আছে। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করার আমার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। তোমরা একটু মন দিয়ে শুনো। শু'লহ, তুমি জান, খানকে আমরা তোমার বোন সমর্পণ করব। এতে আমার ও তোমার উভয়েরই পদবী ও সম্মান বেড়ে যাবে। এ অবস্থায় নিজেদের সুনাম নষ্ট করে মান সম্মানকে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত কি? লোকে বলবে খানের স্ত্রীর বোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে মেলা মেশা করে।

শু'লহ—(বেশ শান্ত ভাবে) বলুন, কোন অপরিচিতের সঙ্গে আমি মেলা মেশা করেছি।

উযীর—তয়মুর আকার সঙ্গে, তাকে যে তোমার কোঠায়ই পেয়েছিলাম।

শু'লহ—হাঁ, পর্দ্দার পেছনে, আপনার স্ত্রী যীবাখানমের সঙ্গে।

উযীর—এ ঠিক। তোমার উপর আমার কখনও অবিশ্বাস হয়নি। আমার মনে হয় এমন অপরাধ যীবাখানমেরই সাজে। এইজন্যই তোমার নিকট একথা বলেছি—কয়েকদিন অপেক্ষা করো, দেখো যেন, তোমার সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা খানের নিকট না পৌছে—তা' হলেই তিনি নিসাখানমের আকৃষ্ট হবেন। নিসাখানমের জন্য তিনি এখন যে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছেন। আমাকে এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ের আয়োজন করতে আদেশ দিয়েছেন। এই আংটীটি উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

(চাকরেরা আরো এগিয়ে এলো, সব্বাই চীৎকার করে কাঁদতে না পেরে, ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অনুরোধ করে বলতে লাগলেন "হায় খোদা, খান, এমন আদেশ করবেন না। অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন, মায়ের এক ছেলে।

(হায়, হায় করে কাঁদতে লাগল)

খান—এ হতে পারে না ; এ হতে পারে না। খুদা আমায় ক্ষমা করো।

(ভীষণভাবে রেগে, চাকরদের প্রতি)

—কুকুরের বাচ্চা, তোদের বাঁধতে বলিনি ? (চাকররা শাল হাতে করে আরো নিকটে এগিয়ে গেলো, তয়মুর আকা তাড়াতাড়ি করে হাতটী পর্দ্দার দিকে সরিয়ে নিয়ে, কোমর হতে খঞ্জর বের করে ওদের প্রতি ওঠালেন। চাকররা ভয় পেয়ে দূরে সরে দাঁড়াল, তয়মুর আকা ওদের নিকট হতে সরে, কিনারায় গিয়ে এক লাফে ছুটে পালালেন।)

খান—আরে ধর, যেতে দিস না।

(সব্বাই এগিয়ে এলো, কিন্তু কেউই আর অনুসরণ কর্‌লে না)

খান—(বিরক্তির সহিত সভাসদ্‌দের দিকে চেয়ে) —কেউই আমার অনুগ্রহের উপযুক্ত নয়! এ ভবঘুরেকে তোরা যেতে দিলি কেন ?

(কেউই উত্তর দিলে না)

খান—স্বমদ বেগ। (স্বমদ বেগ সামনে এসে দাঁড়াল।) শীগ্‌গীর ৫০ জন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও। এ পৃথিবীর যেখানেই থাক্ না কেন, খুঁজে বের করে ওকে বন্দী করে এখানে নিয়ে এস। যে পর্য্যন্ত না আমি ওকে বধ করব, রাজ্যের সমূহ বিপদ। আমিও মনে শান্তি পাব না।

স্বমদ্ বেগ—হাঁ, হুজুর।

(বাইরে গেল)

খান—(সভাসদ্‌দের) আপনারা যেতে পারেন। (সব্বাই চলে গেল)।

খান—'অযীয আকা, নৌকো ঠিক আছে তো ?

'অযীয আকা—হাঁ হুজুর, আছে।

খান—উযীর, আপনি যান। নিশ্চিন্ত হউন। কোন ভয় নেই। এর প্রতিশোধ নিতে ভুল হবে না।

এই আংটীটি নিন, নিসাখানমকে দেবেন। আজই স্বর্ণকারের নিকট পাঠিয়ে বিশেষ করে ওর জন্যে এটা তৈরি করে এনেছি। বিয়ের আয়োজন করুন, এক সপ্তাহের মধ্যেই যাতে সব ঠিক হয়ে যায়।

উযীর—হুজুরের আদেশ শীগগীরই সম্পন্ন হবে। (সম্মান দেখিয়ে বাইরে গেলেন। এর পর খান 'অযীয আকাকে সঙ্গে নিয়ে নৌকো করে নদীতে বেড়াতে গেলেন।)

(পর্দ্দা পড়ল)

"৪র্থ অঙ্ক"

(শু'লহ্‌খানমের কোটায় ঘটনা হচ্চে—শু'লহ্‌খানম ও নিসাখানম উৎগ্রীব হয়ে বসে আছেন ও তারা নিজেদের মধ্যে কথা বল্‌ছেন।)

নিসা—এ বিষয় যে কতদূর গড়িয়েছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। মস'উদ ও যে আস্‌ছে না। কোন খবরই নেই। বড় অশান্তি অনুভব করছি।

শু'লহখানম—এত চিন্তা করছিস কি জন্য ? তুইত বলেছিস যে খান তয়মুরের সত্যের উপর কিছুই করতে পারবেন না।

নিসা—এ ঠিকই যে খান কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যদি আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়—এযে মরণ হতেও বেশী।

(এ সময় আকা মস'উদ এসে উপস্থিত হলো)

শু'লহখানম—আকা মস'উদ, বলো, আমাদের জান্‌তে দাও কি হয়েছে ?

মস'উদ—কি হবে আর ? উযীর খানের নিকট বল্‌লে পর খান লোক পাঠিয়ে তয়মুর আকাকে এনে ফাঁস দিয়ে মারবার ইচ্ছা করেছিলেন। তয়মুর আকা খঞ্জর বের করায়, চাকররা দূরে সরে যায় ও তিনি ওদের মধ্য হতে পালিয়ে যান। খান ৫০ জন লোককে তাঁকে ধরে বেঁধে তাঁর সামনে এনে মারবার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এখন শহরের ঘরে ঘরে খুঁজবার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়েছে।

(আংটী নিসাখানমের হাতে দিলেন)

নিসা—যার বোনের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা, সে ত খানের উপযুক্ত হতে পারে না। এ আংটী নিয়ে যান, খানের উপযুক্ত মেয়ে খোঁজ করে আংটীটি পরিয়ে দেবেন।

(উযীরের সামনে মাটিতে আংটী ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেলেন)

উযীর—ও নিসা, আমি তোমার বোনের সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা করেছি না কি ? এ তো কেবল উপদেশের জন্য বললাম।

শু'লহ—এ উপদেশ আপনার স্ত্রী যীবাখানমকে বলা যেতে পারে না কি ?

উযীর—নিশ্চয়ই কালই আরো শক্ত কথায় তাকে বল্‌ব।

শু'লহ—তা' কাল কেন ? আজই বলা যায় না ?

উযীর—এখনই বলবার দরকার নেই, যদি তয়মুর তার প্রেমাকাঙ্ক্ষীই হয়ে থাকে, তা হলে তাকে খুঁজে বের করে, প্রাণে মেরেই হোক, অথবা শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েই হোক কোনরূপে সাজা না দিয়ে, এ সম্বন্ধে কিছু বলে দরকার নেই। এখন আমাদের নিসাখানমের বিয়ের সব আয়োজন করা দরকার।

শু'লহ—তা হলে চলুন মার নিকটে। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলুন। এ যে আমার কাজ নয়।

উযীর—তা হলে তোমার মাকে গিয়ে বলো এখানে আসতে। এখানেই কথাবার্ত্তা বলা যাবে। (এমন সময় পরীখানম ও নিসাখানম এসে উপস্থিত হলো, উযীর পরীখানমের দিকে চেয়ে)—আপনি নিজেই যখন এসেছেন বেশ ভালই হয়েছে। বসুন, অনুগ্রহ করে।

পরীখানম—তোমার জন্য আমার মনে বড় কষ্ট। এখন বসবার সময় নেই, তুমি চলে গেলে আবার পাওয়া ভার। একটা কথা আছে একটু খেয়াল করে শুন। আল্‌হম্‌দুলিল্লহ, তুমি এত কাজের ভিরে থাক যে তোমার দেখাই পাওয়া যায় না।

উযীর—হাঁ, বিশেষ করে এই কয়দিন আমি একেবারেই অবসর পাচ্ছি না। বলুন, শুনি, আপনার কি কথা।

পরী—তোমার জন্য আমার বড় কষ্ট। বেশী কথা নয়। কুরবানের পর গণকের নিকট দু'য়া নিতে গিয়াছিলাম। ইন্‌সা-আল্লা, খুদা তোমাকে আমার মেয়ে শু'লহ্‌ খানম্‌ হ'তে একটী ছেলে দান করেছেন। গণক তাবিজ লিখে, বলে দিয়েছেন—'উযীরের মাথার ওজনের তিনগুণ পরিমাণ গম নিয়ে গরীব দুঃখিদের বিলিয়ে দিও'। এখনই তোমার মাথার ওজনের তিন গুণের পরিমাণ নিতে হয়—গমের সময় যে চলে যাচ্ছে।

উযীর—এ যে আশ্চর্য্য কথা বল্‌ছেন, মা। যে পর্য্যন্ত মাথা আমার শরীরের উপর আছে, কি করে মাথা টেনে এনে এর পরিমাণ নিবেন ?

পরী—পারব—এ খুবই সহজ। গণক নিজেই আমাকে এ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একটী খোলা পাত্র তোমার মাথায় পরাতে হবে, যে পাত্রটি মাথায় লাগবে, সেটাই হবে মাথার পরিমাণ। নিসাখানম একটী পাত্র নিয়ে আয়।

(নিসাখানম বাইরে গিয়ে, যে ছোট পাত্রটী খাজহ্‌-মস'উদ এনে রেখেছিল, সেটা নিয়ে এলেন। পরীখানম তাড়াতাড়ী করে হাত বাড়িয়ে উযীরের টুপীটা আস্তে আস্তে নামিয়ে আন্‌লেন)।

উযীর—যদিও এসব হাঙ্গামা এখন সাজে না কিন্তু এ আপত্তি করতে পারি না। যেমন করে বলে দেওয়া হয়েছে, সেরূপই করা উচিত। শু'লহ্‌খানমের ইচ্ছা পূরণ হউক।

পরী—হাঁ, এ যে তোমারই কুরবান। নিসাখানম, পাত্রটা ওর মাথায় পরিয়ে দে। পাত্রটী উল্টো করে মাথায় দিলেন, উহা ভ্রূর উপর পর্য্যন্ত গিয়ে আর না নামায়, তিনি ইহা আরো নামার জন্য চাপ দিতে লাগলেন)।

উযীর—(হাত তুলে)—উঃ হা খুদা, নাকে যে লাগ্‌ছে, আস্তে।

(পাত্রটা মাথা হতে তুলে নিলেন)

পরী—(তাড়াতাড়ী করে) মা, একটা বড় দেখে নিয়ে আয়। (নিসাখানম দৌড়ে গিয়ে একটা বড় পাত্র নিয়ে এলেন।)

উযীর—আচ্ছা, মা, খুদার নামে এ কি অন্যসময় করা যেতে পারে না ? এখন আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা ছিল—একটা দরকারী বিষয়।

পরী—না, না, বাবা। এ হয় না। ওর সময় যে পার হয়ে যাচ্ছে। ওতো তোমারই কুরবান। কিছুই ভেবো না। এতো এক মিনিটের কাজ। আমরাও তোমাদের জন্যই চিন্তা করি। (কাঁদতে লাগ্‌লেন) তাহলে এই শেষ বয়সে শুলহ্‌খানমের কোলে কোন

ছেলে না দেখেই মরতে হবে। (চোখ অশ্রুপূর্ণ করে, নিসাখানমের দিকে ফিরে)

—মা, পাত্রটী লাগিয়ে দে। তোমার পূর্ব্বেই এরূপ একটী আনা উচিত ছিল। (নিসাখানম পাত্রটী মাথায় লাগালে, ইহা একেবারে কাঁধের নীচ পর্য্যন্ত নেমে এল! পরীখানম গু'লহ্‌খানম্‌কে পর্দ্দার দিকে তাড়াতাড়ী করে ইসারা করলেন। গু'লহ্‌খানম আস্তে আস্তে পর্দ্দা উঠিয়ে তয়মুর অকাকে পর্দ্দার বাইরে নিয়ে এলেন। তিনি অনেকদূর চলে গেলে পর, নিসাখানম পাত্রটী মাথা থেকে তুলে নিলেন।)

উযীর—এখন তা'হলে মা, বসুন। আমি যে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করেছি।

পরী—আচ্ছা, বাবা। (বসতে যাবেন, এমন সময় উঠানে বিষম গণ্ডগোল শুনা গেল, মুহূর্ত্ত যেতে না যেতেই, তয়মূর আক্কা খঞ্জর হাতে করে এসে উপস্থিত উপস্থিত হলেন এবং উযীর তাকে দেখে কাঁপতে আরম্ভ করলেন।)

তয়মূর—আমার পিতা হতেই আপনার এ সম্মান, আর আপনিই কিনা চান আমাকে বধ করতে। যে পর্য্যন্ত না আপনাকে বধ করব, আমাকে মারতে দেব না।

(উযীরের প্রতি খঞ্জর উঠালেন)

গু'লহ্‌খানম—(তয়মূরের পা জড়িয়ে ধরে, অনুরোধ করে)—হায় খুদা, তয়মূর আক্কা ক্ষান্ত হউন। একটু ধৈর্য্য ধরুন।

(তয়মূর আক্কা হাত নামিয়ে আনলেন, এমন সময় স্বমেদবেগ কয়েকজন চাকর সঙ্গে করে তথায় উপস্থিত হয়ে, এক কোণে এসে দাঁড়ালে)

তয়মূর—স্বমেদ্‌বেগ, এখানে কি দরকার? কি করতে চাও?

স্বমেদ—হুজুর, আমরা ত আপনার পিতার চাকর। আমাদের কি শক্তি আছে যে আপনার প্রতি খারাপ ব্যবহার করি। কিন্তু আপনি নিজেও তো জানেন, খানের আদেশ, আপনাকে তাঁর নিকট ধরে নিতে।

তয়মূর—তাঁর সামনে আমাকে তোমরা জ্যান্ত ধরে নিতে পারবে না। তবে আমার মস্তক নিতে পার। আমার মাথাও এত সহজে কারো নিকট ধরা পড়বে না। বিস্‌ম্‌-ইল্লাহ্‌। যদি তার নিমকের জোর থাকে, তা'হলে এগিয়ে এসো।

স্বমদবেগ—হুজুর, শান্ত হউন। এই খঞ্জর দিয়ে মারতে পারেন। আমার সঙ্গে যে একজনকে, ৫০জন সবাইকে ত আর মারতে পারবেন না। এ সবের কোন দরকার নেই। খান কথা দিয়েছেন, আপনাকে কিছুই করবেন না।

তয়মূর—তাঁর কথা ও কাজে আমার কখনই বিশ্বাস নেই। তাঁর কথার কি কোন ঠিক আছে যে কেহ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে। যা বলেছি, তাই হবে।

(আবার উঠানে ভীষণ গণ্ডগোল শুনা গেল, সলীম বেগ ও তয়মূরের বৈমাত্রেয় ভাই রিজ্জা এসে উপস্থিত হলো)

সলীমবেগ—স্বমদবেগ, পিছিয়ে যাও। তয়মূর আক্কার জয় হোক! আপনার কাকা যান নদীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। উল্টো বাতাস এসে নৌকা ডুবিয়ে দেয়, তাতে তিনি জলে ডুবে মারা যান। এখন বিচার সভার সব্বাই একত্রিত হয়েছেন। আপনিও চলুন, বিচারের ভার ও আপনার পিতার স্থান আপনি এসে গ্রহণ করুন।

তয়মূর—রিজ্জা, এ ঠিক?

রিজ্জা—হাঁ, ঠিক। চলুন যাই।

(এমন সময় উযীর ও স্বমদবেগ, তাঁর সামনে মাটিতে পড়ে বলতে লাগলেন, "হুজুরের কুরবান, আমাদের রক্ষা করুন।")

তয়মূর—স্বমদবেগ, সরে দাঁড়াও।

(স্বমদবেগ এক কোণে গিয়ে দাঁড়ল)

তয়মূর—(উযীরের দিকে ফিরে) উযীর, আপনার ঘরে আসার কারণ এই যে—আপনার শালী নিশাখানামকে আমি ভাল বেসে ফেলেছি ও এখনও ভাল বাসি। ইচ্ছা ছিল, খুদার আদেশে ইসলাম মতে, তার মত নিয়ে তাকে গ্রহণ করব। কিন্তু আপনি কতকগুলি উচ্চ দুরাশা মনে পোষণ করে, তাকে ওই হতভাগার নিকট দিতে ইচ্ছে করেন। তাই আমার ইচ্ছা আপনার নিকট আর প্রকাশ করতে পারিনি। এমন কি আপনি আমাকে অবিশ্বাস

করে মারতে চেয়েছিলেন—কিন্তু দৈবক্রমে, অনেক সময় লোকের ইচ্ছা হয়ে যায় বাতিল—

বলীকন্‌ ইত্তিফাক-ই-আস্‌মানী—

কুনদ্‌ তদবীরহা-ঈ-শখ্‌স্ব বাত্বিল।

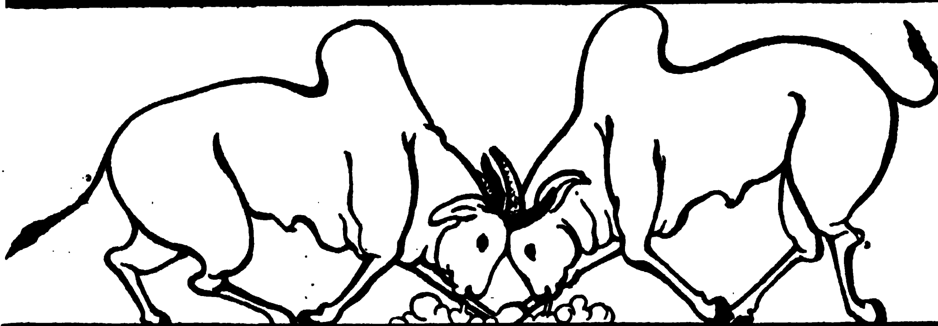
খুদার আদালতে, ধনী ও নির্ধন সব্বাই তাদের কাজের ফল ভোগ করবে। সত্যকে তিনি জয়যুক্ত করেন। এবং আপনাদের বদ খেয়ালের বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রজা ও চাকরদের উপর আপনাদের যেসব অত্যাচার প্রকাশ পেয়েছে, তাতে এখন আবার উযীরের কাজের ভার আপনার উপর দেওয়া উচিত নয়। আপনার আগের কাজ সব জানা আছে। যে বদ অভ্যাস একবার একজনের হয়ে গিয়েছে, তা'হতে তাকে ফিরান অসম্ভব—যাতে সে মানুসের কোন উপকারে আসতে পারে। আপনি এ পরিবার হতেই প্রতিপালিত বলেই আপনার সব দোষ মার্জ্জনা করা গেল। যে পর্য্যন্ত আমি বেঁচে আছি, আপনি পেন্সন পেয়ে নিরাপদে পরিবারবর্গ নিয়ে আপনার ঘরে থাকতে পারবেন। কিন্তু রাজ্য ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ের সংস্কার সম্বন্ধে উযারতীর প্রত্যাশা আর করবেন না। আপনার মত লোক এসব বিষয়ে হাত দিলে, দয়া ও সুবিচারের খিলাফ করা হবে। সব্বাই যখন চান, রাজসংক্রান্ত বিষয়ের সংস্কার ও প্রজা ও ধর্ম্মের উন্নতি হোক, নির্ব্বোধ, অকোজা, ও স্বার্থপর লোকদের সরকার হতে বাধ্য হয়ে বিদায় করে দিয়ে, জ্ঞানী নিঃস্বার্থপর ও কাজের লোকের উপর এর ভার দিতে হবে। ঘুষ নেওয়া-ও দুরাশা যাদের মজ্জাগত অভ্যাস এবং যাদের বিচার কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধি, তারা সত্য ও ধর্ম্মের খিলাফ করে থাকেন। এ বিষয়ে আর বিশেষ বলতে চাই না। বিয়ের কাজটা আগে শেষ করে নিতে হবে। আপনার উপরই এর ভার রইল—নিসাখানমের আবশ্যকীয় বিষয়ের তদারক করে, বিয়ের কার্য্যাবলী ঠিক করে নিন, শীগগীরই আমাদের এ শুভ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। মা, পরীখানম, দিদি শু'লহ্‌খানম, খুদাই রক্ষা কর্ত্তা, আপনারা আপনাদের কাজে যান।

পরী ও শু'ল—খুদা তোমায় দীর্ঘায়ু ও ধনবান করুন। আকা, শত বৎসর রাজত্ব ও সুবিচার কর।

(তয়মুর আকা ও অন্যান্য সকলে একসঙ্গে বের হয়ে এলেন। উযীর অবাক হয়ে তথায় বসে রইলেন।)

চাকররা—(উচ্চস্বরে)—তয়মুর আকার হয়।

[যবনিকা পতন।]





কোন সদাশয় ইংরেজ একটি কুকুরকে হত্যা করিতে গিয়া দেখে কুকুরের কোনই অপরাধ নাই। নিরুপায় হইয়া সে তাহার বিরুদ্ধে একটি কাল্পনিক অভিযোগ সৃষ্টি করিল, এবং তখন তাহাকে পরমানন্দে হত্যা করিল। ইংরেজের দেশে হত্যা করিবার ইহাই রীতি। তাহারা বলে কুকুরের যে-কোনও একটা অপবাদ দাও, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করা সহজ হইবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইহা একটি কুপ্রথা, কিন্তু আসলে কুকুর-হত্যার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন প্রথা নাই। অপরাধ করিলে শাস্তিভোগ করিতে হইবে এই ব্যবস্থা ন্যায়ধর্ম্ম অনুমোদিত, সুতরাং শাস্তিভোগ করিতে হইলে কিছু অপরাধ থাকা উচিত। অপরাধটা কাল্পনিক হইলেও ক্ষতি নাই।

* * *

আমাদের দেশের প্রথা কিন্তু ইংরেজদের প্রথা হইতে স্বতন্ত্র। হয়ত বিভিন্ন দেশের এই বিভিন্ন প্রথাই পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের দেশে কোনও কুকুরকে হত্যা করিতে হইলে পূর্ব্বে দেখিয়া লইতে হয় কুকুর সম্পূর্ণ নিরপরাধ কি না। যদি সম্পূর্ণ নিরপরাধ হয় তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিতে আর কোনও বাধা থাকে না। যদি কুকুরের অতিরিক্ত কিছু সদ্‌গুণ থাকে তবে ত কথাই নাই। অল্পগুণযুক্ত কুকুর দেখিলে কিছু বিবেচনাপুর্ব্বক, এবং অধিক গুণযুক্ত কুকুর দেখিলে কোন বিবেচনা না করিয়া হত্যা করাই আমাদের বিধি। আমাদের দেশের পূজায় যে ছাগহত্যা করা হয় তাহাও বিধিমতে নিখুঁৎ হওয়া চাই, কিঞ্চিন্মাত্র 'খুঁৎ' থাকিলেও তাহাকে দেবতার সম্মুখে হত্যা করা নিষেধ।

* * *

উৎকৃষ্ট জিনিসকে নিকৃষ্ট করিয়া, নিরপরাধকে অপরাধী করিয়া এবং শুভকে অশুভ করিয়া তবে আমরা শান্তিলাভ করি। ইহা আমাদের প্রাচীন প্রথা, এবং ইহাই আমাদের আধুনিক প্রথা। যুগ যুগ ধরিয়া ইহা আমাদিগকে নিরপরাধ কুকুর-হত্যায় দীক্ষিত করিয়াছে। জীবনের বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম বিভাগ পর্য্যন্ত এই শাসনের অধীন—ইহা হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

* * *

সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সম্প্রতি একখানা নাটক লিখিয়াছেন। নাটকখানা পড়িয়াছি, প্লটের দিক দিয়া নাটকখানা চমৎকার। ভাষা সহজ এবং মার্জ্জিত। লিখিবার ভঙ্গি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। নাটকীয় মুহূর্ত্তগুলি মনকে সচকিত এবং বিস্মিত করিয়া তোলে। নাটকের পরিণতি

মনকে আলোড়িত করে। কথোপকথন প্রত্যেকটি চরিত্রের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। চরিত্রগুলি সজীব। সমগ্র নাটকখানি বিচিত্র রসে পূর্ণ। এক কথায় নাটকখানি মনোহর। বন্ধু বলিলেন শুধু এই জন্যেই নাটকখানি স্টেজের পক্ষে অচল হইয়াছে। সকলেই বলিতেছে 'নাটকখানি উচ্চশ্রেণীর হ'য়ে পড়েছে, চালানো শক্ত'।—উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া নাটকখানি কোনও স্টেজে চলিল না! অর্থাৎ উৎকৃষ্টতার দোহাই দেওয়াতে নাটকখানিকে হত্যা করিবার পক্ষে আর কোন বাধাই রহিল না।

*　　　*　　　*

অন্যান্য দেশে উৎকৃষ্ট জিনিস উপভোগ করিবার লোকের অভাব নাই, একটা বিশেষ শ্রেণী আছে যাহারা উৎকৃষ্ট জিনিষেরই ভোক্তা, কিন্তু আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট জিনিসের ভোক্তা যে অত্যন্ত কম ইহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সেদিন একটা ঝকঝকে নূতন বাড়ির সিঁড়িতে উঠিবার সময় লক্ষ্য করা গেল সিঁড়ি এবং সিঁড়ি-সংলগ্ন দেওয়ালের প্রায় সর্ব্বত্রই পর্ণরসরঞ্জিত। মার্ব্বেলের দেয়ালের উৎকৃষ্ট চেহারাকে নষ্ট করিয়া তাহা ব্যবহারের যোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। পরিচ্ছন্নতা একটি উৎকৃষ্ট গুণ, সেইজন্যই পরিচ্ছন্নতা আমাদের পক্ষে সর্ব্বদা পীড়াদায়ক। উৎকৃষ্ট দেয়াল অচল, তাহাকে নিকৃষ্ট করিয়া তবে ভোগ করিতে হইল!

*　　　*　　　*

আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ঘি আমাদের একটি মূল্যবান খাদ্য। সেই জন্যই ঘি আমাদের দেশে চলে না। যাহা চলে তাহার নাম বিশুদ্ধ ঘি। ঘি যখন বিশুদ্ধ ঘি হইয়া ওঠে অর্থাৎ সদ্‌গুণের বিশেষণ প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে হত্যা করিতে আর বাধা থাকে না। বাজারে যতগুলি ঘৃতের দোকান আছে তাহার কোনটাতেই ঘি পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় বিশুদ্ধ ঘি। প্রত্যেকেই যদি বিশুদ্ধ ঘি বিক্রি করে তাহা হইলে অবিশুদ্ধ ঘি কোথায় বিক্রি হয়? অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, কোথায়ও না। নিয়মিত বিশুদ্ধ ঘৃতের ব্যবসা দ্বারা ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই ঘৃতের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ঘৃতের কথাই মনে রাখিয়াছে এবং তাহাই ক্রয়বিক্রয় করিতেছে। বিশুদ্ধ ঘৃত যে শুদ্ধ ঘৃত নহে ইহা লোকে আর ভাবিতেই পারে না! আমাদের দেশীয় খাদ্যালয়গুলির মধ্যে একটিও হোটেল নাই—আছে শুধু পবিত্র হোটেল। যেমন আমাদের দেশে কবি নাই, আছে সুকবি অথবা বিশ্বকবি। কবিকে কবি বলিয়া মানিতে আপত্তি আছে বলিয়াই তাহার সঙ্গে বিশেষণ জুড়িয়া দিতে হয়। কবিকে ছোট করিবার পক্ষে এই বিশেষণগুলি অমোঘ। যেমন চূড়ান্ত নোংরামির দ্বারা আহার এবং আহার্য্যকে কলুষিত করিবার জন্য পবিত্রতার সার্টিফিকেট চাইই!

*　　　*　　　*

প্রথাটি যে প্রাচীন, সতীদাহ প্রথা তাহার সাক্ষ্য দিবে। জীবন্ত সদ্য-বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে চিতায় চড়াইয়া দেওয়া হইত। স্ত্রীকে সতী-বিশেষণে মণ্ডিত করিয়া তবে তাহাকে হত্যা করা হইত। অর্থাৎ স্ত্রী সতী হইলেই দাহ সম্ভব হইত। অসতীর সম্পর্কে দাহর প্রশ্নই ওঠে নাই। রাষ্ট্রপতি হইবার পর রঘুপতি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? কারণ তিনি জানিতেন সীতা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। প্রজাগণও ঠিক এই কারণেই সীতা নির্ব্বাসন চাহিয়াছিল। তাহারা সীতার অগ্নিপরীক্ষায়

পাস করার কথাটা জানিত। তারপর, লক্ষ্মণ সীতা নির্ব্বাসনে সাহায্য করিলেন কেন? কারণ লক্ষ্মণ সীতাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং সেই জন্যই তাঁহার পক্ষে সীতা-সম্পর্কে চাতুরি অবলম্বন করা অতিশয় সহজ হইয়াছিল। রামঘুঘু রাম এবং ঘোড়েল লক্ষ্মণ সীতা-নির্ব্বাসনের জন্য যে সব হীন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই জানা আছে। সে সময় রাষ্ট্রপতি রাম বা সেক্রেটারি লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন লইবার মত কেহ ছিল না। সে রকম প্রবৃত্তিও কাহারও হয় নাই। কারণ তখনও দেশ অহিংস-পথের সন্ধান পায় নাই। তাছাড়া রামলক্ষ্মণ নিরপরাধ ছিলেন না বলিয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থারও প্রয়োজন হয় নাই।

* * *

বড়কে অকারণ ছোট করিবার জন্য আমাদের মন সর্ব্বদা লালায়িত। বিশেষণ যোগ করিয়া আমরা এই কাজটিকে সহজ করিয়া লইয়াছি। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজি মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ দেশবন্ধু দাশ হইয়াছেন; ইহা ছাড়া দেশপ্রিয়, দেশগৌরব প্রভৃতি বিশেষণও দেশসেবকদের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে। এমনি করিয়া ভালমানুষকে আমরা অমানুষ করিয়া তুলি। গান্ধীজিকে মহাত্মা না বলিলে পাছে তিনি দেশের সকল দায়িত্ব ঘাড়ে না নেন, পাছে তিনি আমাদের হইয়া সকল কাজ না করেন ইহাই ঐ বিশেষণটির উদ্দেশ্য।

* * *

কিন্তু মহাত্মা-বিশেষণের বোঝা ভালমানুষের ঘাড়ে চাপাইলে সেই ভালমানুষের যে কি দুর্দ্দশা হয় তাহা ত চোখের সম্মুখেই দেখিতেছি। গান্ধীজিও তাহা ভালই বুঝিতেছেন। তাঁহার মধ্যেকার সাধারণ মানুষটির যে স্বাভাবিক প্রকাশ দেখা যাইত তাঁহার কথায় এবং কাজে, মহাত্মা নামক দুঃসহ বোঝার চাপে তাহা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এবং যত দিন যাইতেছে ততই তাহার বিকার বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ মানুষ যদি শুধু আত্মার দ্বারাই গঠিত হইত তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। এরূপ হইলে আমরা যে-কোন মহৎ লোককে মহাত্মা বা মহাপ্রেতাত্মা বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতাম। কিন্তু মানুষের জীবিত কালে তাহার দেহটিকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গান্ধীজি নিজেও তাহা পারিতেছেন না। অনশন-ব্রত দ্বারা দেহকে অস্বীকার করিতে করিতে পুনরায় স্বীকার করিয়া লইতেছেন। সুতরাং আমরা যেমন কোন লোককে মহা-দেহ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি না (তা সে দেহ যতই স্থূল হউক) তেমনি কোন লোককে আমরা মহাত্মা বলিয়াও সম্বোধন করিতে পারি না (তা সে আত্মা যতই সূক্ষ্ম হউক)। আমার মনে হয় কেবল বি-দেহ আত্মা-সম্পর্কেই আমরা মহাত্মা বিশেষণটি ব্যবহার করিতে পারি—যদিও তাহাতেও সেই মহাত্মার আপত্তি করা উচিত।

* * *

যে আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই (বিচ্ছিন্ন হইলে আত্মার পৃথক সত্তা আছে কিনা স্পিরিচুয়ালিষ্ট বলিতে পারেন) সে আত্মা দেহের সঙ্গে রফা করিতে বাধ্য। দেহধর্ম্ম রক্ষা করিতে আত্মার খানিকটা অংশ দেহের জন্য ব্যয়িত হয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের সম্পর্কে এটা উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের আত্মার যে অংশ ভিখারীকে একটা পয়সা দেয় আর যে অংশ সন্ধ্যাবেলা সিনেমা দেখে

তাহারা সম্পূর্ণ এক নহে। (যদিও, যে অংশ ভিক্ষা দেয়, অনেকের মতে সেটাও দৈহিক তৃপ্তি, অনেকটা আহারের মত।) সিনেমা দেখাটাও ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে ; সেটা মনের ক্ষুধা হইতে পারে ; কিন্তু সেই মন দেহের দিকেই বেশি টানে। আত্মার সঙ্গে তার মুখ্য সম্বন্ধ নাই। একমাত্র সমাধির অবস্থায় দেহ-বিচ্ছিন্ন আত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় হয়ত পাওয়া সম্ভব, কিন্তু আমাদের কাহারও সেই অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

* * *

গান্ধীজিরও মনের এই তুইটি ভাগ আছে। এক ভাগে তিনি আত্মা আর এক ভাগে তিনি দেহ। কিন্তু সেই আত্মা-অংশকে ক্রমাগত মহাত্মা নামে অভিহিত করায় তাঁহার এরূপ ধারণা হওয়া হয়ত অসম্ভব নহে যে তাঁহার দেহ নাই। অথচ আমরা সকলেই দেখিতেছি তিনি দেহধারী, প্রতিদিন সেই দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং যথাসময়ে একদিন সেই দেহ রক্ষাও করিবেন। সুতরাং মহাত্মা-গান্ধী হিসাবে গান্ধীজির যে কি পরিমাণ অসুবিধা ঘটিয়াছে তাহা হয়ত একমাত্র তিনিই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা জানি তিনি হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও এক সন্ধ্যা সিনেমা-ঘরে গিয়া বসিতে পারেন না।

* * *

কিন্তু যদি দেহধারী জীবিত লোককে মহাত্মা বলিতেই হয়, পৃথিবীতে আর একজন লোক আছেন তাঁহাকেও মহাত্মা বলা উচিত। সেই লোকটির নাম চার্লস্ চ্যাপলিন। আমাদের পরিচিত চার্লি চ্যাপলিন। বহুদিন পূর্ব্বে একখানা ছবিতে দেখিয়াছিলাম গান্ধীজি এবং চার্লি চ্যাপলিন একসঙ্গে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। চ্যাপলিনজি গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। চ্যাপলিনজির দিক হইতে আত্মিক আকর্ষণ ছিল। তিনি জানিতেন পৃথিবীর দশজন জীবিত শ্রেষ্ঠ লোকের মধ্যে তাঁরা তুই জনেই আছেন। গান্ধীজি এবং চ্যাপলিনজি—অথবা মহাত্মা গান্ধী এবং মহাত্মা চ্যাপলিন—উভয়েই দারিদ্র্যের প্রতীক। মহাত্মা চার্লির জীবনটাই অভিনয়, আর মহাত্মা গান্ধীর অভিনয়টাই জীবন। উভয়ের মধ্যে এইটুকুই মাত্র পার্থক্য। দারিদ্র্য ইঁহাদের তুই জনকেই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

* * *

আমাদিগকে কিন্তু এই দারিদ্র্যই সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইল। কারণ ইঁহাদের বেশ-দারিদ্র্যকে আমরা ভুল করিয়া আত্মিক দারিদ্র্যের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীও তাহাই করিয়াছেন। তাহা না হইলে তাঁহার পরিচালনায় ভারতবর্ষ ক্রমশই আত্মিক দারিদ্র্য সগৌরবে বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে কেন ? আধ্যাত্মিক জাতির পক্ষে এত বড় ট্র্যাজেডি আর কি থাকিতে পারে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য দেশ যান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে আত্মিক শক্তিতেও ক্রমশ বলীয়ান হইয়া উঠিতেছে। সেই জন্যই চার্লস্ চ্যাপলিন বরঞ্চ চার্লি চ্যাপলিন, কিন্তু কদাচ মহাত্মা চ্যাপলিন নহেন। ইংরেজও আত্মিক শক্তিতে ক্রমশই শক্ত হইয়া উঠিতেছেন। প্রমাণ, ইংরেজ-রাম শুদ্ধমাত্র প্রজানুরঞ্জনের জন্যই ভারত-সীতাকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিতেছেন না। যদি কোনদিন তাহা করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াই করিবেন, সদ্‌গুণের আধার বলিয়া করিবেন না।

* * *

অতএব হে বাঙালী, আমরা আমাদের যাহা কিছু মহৎ এবং বৃহৎ ততদিনে তাহা ধূলিসাৎ করিয়া আমাদের পরকালের সদ্‌গতির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে থাকি। ইহা ভিন্ন আমরা আর কি করিতে পারি ?

বাড়ীর মালিক

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

চরিত্র

উপেন রায়—বাড়ীর মালিক
হরেন—উপেনের ছেলে
বিমলা—উপেনের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী
অমলা—বিমলার বিধবা বোন
ডাক্তার ঘোষ—বাড়ীর চিকিৎসক
নলিনাক্ষ মিত্তির—এটর্নি
মণি—বিমলার বন্ধু
রাধু—চাকর।
কাল—সমসাময়িক আজিকার যুগ
সময়—সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত্রি নটার মধ্যে।

[নাট্য সংস্থান]

অমলা। অপিনদাকে আজ এখনও খেতে দিলে না দিদি! রাত হল যে!

বিমলা। এইত খানিক আগে দুধ পাউরুটী খেয়েছে, আবার এখুনি কি খাবে। নড়তে পারে না, তবু দিন রাত খাই-খাই করছে! এমন জ্বালায় পড়িছি।

অমলা। আচ্ছা, অপিনদা আজকে অমন ঝিম্ মেরে রয়েছে কেন! রোজ গান শুনতে চায়—আজকে ত আর ডাকলে না।

বিমলা। বাহাত্তুরে ধরেছে, এখনও ওঁর প্রেমের গান, ভালবাসার গান শুনতে হবে। তোকে কি বলব আমি! আমার এক এক সময় এমন রাগ হয়! আপদ মরেও না তো।

অমলা। ওকি, শুনতে পাবে যে!

বিমলা। ছাই পাবে...ঢোল কালা—কানের কাছে ঢাক পিটুলেও শুনতে পায় না।

অমলা। তা হ'লেও স্বামীত বটে, যতদিন বাঁচে···

বিমলা। স্বামী কিসের—টাকার জন্তে বিয়ে করেছিলুম···না হলে···হুঁঃ! আর চা খাবি না কি?

অমলা। না দিদি...তোমার এখানে এসেই এই এক আবার চায়ের নেশা ধরে গেছে...কি পাপই জুটল...

বিমলা। তা হ'লে আমিই খেয়ে নিই···রাত্রে ভেবেছিলাম কাঁচা পেঁয়াজ আর ভিনিগার সস্ দিয়ে শশা কুচিয়ে খাব, তা আজ আবার খানিক পরেই রাম মিত্তির আসবে। কথা কইতে মুখে গন্ধ পাবে।...

অমলা। কে? ও সেই উকীল, না?

বিমলা। ওর বিষয়-আসয় যা কিছু সব ওই রাম মিত্তিরই দেখা শোনা করে··ওর টাকা কি কম মনে করেছিস,—হাড়কিপটে, সে-দিন বললাম···হীরের ব্রেসলেট কিনে দিতে,তা বললে কি···কোথায় অত টাকা—দু'হাজার টাকা ওর বেরুল না···আর আমি জানি পাঁচ-লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে—আর সাত খানা বাড়ী···বললে, আমি মলে হীরের ব্রেসলেট পর' অখন। ইচ্ছে হল দিই এক ঘা বসিয়ে...আঃ যন্ত্রণা...আর খেজমৎ খাটতে পারিনে।

অমলা। তা রাম মিত্তির আজ রাত্রে আসছে কেন?

বিমলা। আছে একটা বিশেষ দরকারী ব্যাপার (একটু চাপা হাসি হাসলে।)

অমলা। জেগেছে বোধ হয়। শুনতে পাচ্ছে না কি···

বিমলা। দূর, শুনতে পাবে কি লো...বললাম যে... কান গেছে একেবারে···

অমলা। তবে আসছে কি জন্যে দিদি, বল না।

বিমলা। (উপেনের দিকে একবার চেয়ে মুখ ফিরিয়ে) উইল বদল করে নুতন উইল করবে। সহজে কি রাজী হয়! এতদিনে রাজী হয়েছে···কটা বাজল...আটটার সময় আসবার কথা···

অমলা। ও, তবে হরেণকে বুঝি কিচ্ছু দেবে না? সেকি?

বিমলা। তা কি করে জানব, দেবে কি না দেবে। বলেছে যে···

অমলা। সব টাকা-কড়ি বাড়ী ঘর সব তোমায় দিয়ে যাবে ?

বিমলা। আমারই ত সব পাওয়া উচিত, উচিত নয় ? আমি তার জন্যে কি না করেছি...আমি কিছু বুড়ী হইনি··· আমার কি আর বর জুটত না ? আজ ছ বছর ধরে—কম খেজমৎটা আমি খাটছি ! তবে ?

অমলা। যখন বিয়ে হল তখন ত' সে কথা ভাবনি দিদি ! বুড় দেখেই তো...

বিমলা। ভুল করিনি নিশ্চয় ! (আবার একটু চাপা হাসি হাসলে) জানিস অমি, টাকার চেয়ে আপনার সংসারে আর কেউ নেই।

অমলা। ও কথা আমি মানিনে দিদি, তবে এটা কি খুব সঙ্গত, নিজের ছেলে—আর ছেলেও শুনেছি খারাপ নয়।

বিমলা। কি বললি, খারাপ নয় !—স্বদেশী করে বেড়াত, কলেজ ছেড়ে দিয়ে স্বদেশীদের দলে মিশল—বাপকে এসে বলে যে তোমার অনেক টাকা—দশহাজার টাকা দিতে হবে—দেশের কাজের জন্য—বাপ ত আর বোকা লোক নয় যে সে রাজার বিরুদ্ধে যাবে...সে দিলে না। ছেলে অমনি কলেজ ছাড়লেন, বাপকে ভয় দেখালেন যে আজ তুমি দিলে না, এর পর সব ধন-সম্পত্তি কেড়ে নেব তখন দেখো।

অমলা। তা সে ত আর অন্যায় কাজের জন্যে টাকা চায় নি। দেশের কাজের জন্যেই ত···

বিমলা। টাকা খোলামকুচি না ? জলে ফেলে দেবে ! তারপর—একদিন সে কি কাণ্ড, আমায় মারতে এল চাবুক নিয়ে।

অমলা। ওমা সে কি ? তোমায় ? কেন ?

বিমলা। ওই দেয়ালটায় তার মার একখানা অয়েল পেন্টিং ছবি ছিল···আমি সেটার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে—পেড়ে মাটিতে রেখেছি......অন্যমনস্ক হয়ে কি করতে না দেখে সেটা মাড়িয়ে ফেলেছিলাম, ছবিখানা নষ্ট হয়ে যায়—এই একেবারে রণমূর্ত্তি...বলে "আমার মার ছবি তুমি পা দিয়ে মাড়িয়ে ছিঁড়ে দিলে, আজ তোমায় শেষ করব।" ও ছিল পাশের ঘরে, শেষে পুলিস ডেকে বাড়ী থেকে বার করে দিলে—বললে, কখন যদি বাড়ীর চৌকাট মাড়াও তবে...জেলে দেব। বিষ নেই, কুলো পানা চক্কোর—রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। এতবড় স্পর্দ্ধা তার, আমায় বলে কিনা বিমলী রাক্কুসী...

অমলা। তা সেই অবধি আর বাড়ী আসেনি কোথায় থাকে ?

বিমলা। কে জানে কোথায় কোন্ খোলার ঘরে, কোন্ চুলোয় মরছে হয়ত। তাকে আবার জায়গা দেবে কে। তবে মাঝে শুনেছিলাম—স্বদেশীর দলে মারামারি করেছিল তাই গবমেণ্ট তাকে ধরে জেলে দিয়েছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। বাপকে আর জেলে দিতে হয়নি, আপনিই সে রাস্তা করে নিয়েছে।

অমলা। এখনও তা হ'লে জেলেই আছে.....এই সব ছোঁড়াদের—

বিমলা। শুনছিলাম না কি তাকে ছেড়ে দিয়েছে··· কেন যে ছেড়ে দেয়···একেবারে শেষ করে দিলেই পারে। বলে, অতি বাড় বেড় না ঝড়ে পড়ে যাবে। এদিক নেই ওদিক আছে।

অমলা। আচ্ছা অপিন দা ত' আজ একবারও উঠছে না, সন্ধ্যে থেকে এত ঘুমুচ্ছে যে ..

বিমলা। হয়ে গেল না কি !

অমলা। ছিঃ ছিঃ দিদি তুমি কি ?

বিমলা। কি আমি মন্দ বলেছি—অথর্ব্ব হয়ে হাত নাড়তে পারে না, পা নাড়তে পারে না—বেঁচে মরে থাকার চেয়ে...

(বাইরে সদরে কে কড়া নাড়তে লাগল।)

বিমলা। দেখ ত কে, ওই রামমিত্তির এল বুঝি··· আলোটা জেলে দে···

(বাইরে খুব জোরে কড়া নাড়তে লাগল।)

চাকরটাকে পাঠিয়েছি—মণিকে ডেকে আনতে, সে এলে উইলে সাক্ষী হবে—আর ডাঃ ঘোষ আছে...দেখ না কে ডাকছে···আজকের মধ্যে কাজটা হাসিল করতে পারলে বাঁচি—মণিও ত এখন এল না।

[অমলা ঘর থেকে চলে গেল। বিমলা উপেনের কাছে গিয়ে তার গায়ে একখানা কম্বল ঢাকা দিয়ে দিলে।]

বিমলা। (জোরে) খুব ঘুমুচ্ছ এখনও। ঠাণ্ডা

লাগছে না ত ? (উপেন যেমন ভাবে ছিল, ঠিক তেমনই রইল—নড়লেও না, কথার কোন উত্তর ও দিলে না।) রাম মিত্তির বোধ হয় আসছে, সে এলে তোমায় জাগতে হবে বুঝলে—বিছানায় শুতে বললে কিছুতেই শোবে না··· ওই লোহার সিন্দুকে কেবল চোখ তাকিয়ে বসে আছ··· কে তোমার নিচ্ছে সব ?···

(অমলা ভয়ে ছুটে এসে হাঁফাতে লাগল)

কি লো, কি, কে ? অমন করে' এলি কেন ?

অমলা। হরেন, দিদি, হরেন কড়া নাড়ছে। কি হবে ?

বিমলা। হরেন, ওর ছেলে হরেন ?

অমলা। হ্যাঁ···

বিমলা। সে কোত্থেকে এল ? কি চায় সে ? এখানে কি করতে মরতে এসেছে···জেলে পচে মরতে পারলে না ?

[হরেনের প্রবেশ। বয়স বছর বাইশ হবে। দেখতে বেশ সুপুরুষ—কিন্তু ময়লা খদ্দর পরা, খালি পা চুলে তেল নেই, রুক্ষ...গায়ে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী—তার হাতাটা ছেঁড়া...। ক্ষুধার্ত্তের চেহারা—চোখের কোল বসা, কালী পড়া, নাকের হাড় উঁচু···শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে, তবু মেরুদণ্ড দুমড়ে পড়তে চায় না, জোর করে খাড়া করে রেখেছে।]

হরেন। বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে এলে, তাকে ত বেশ চমৎকার অভ্যর্থনা করতে শিখেছ বিমলী গিন্নী, বাঃ!

বিমলা। এটা তোমার বাড়ী নয়! এখানে কি করতে এসেছ ?

হরেন। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে মিসেস রায়। তোমার নাম ধরে ডাকতে অপরাধ নিয়ো না, আমি কিছুতেই তোমাকে মা বলে ডাকতে পারি নি···

বিমলা। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে, যা ইচ্ছে বলগে যাও···

হরেন। ওই যে, আমার বাবামশায়, আরাম কেদারায় বসে আছেন...বেশ!

বিমলা। ও তোমার সঙ্গে দেখা করছে না,—মনে নেই, পুলিস দিয়ে বার করে দিয়েছিল···ও তোমার মুখদর্শনও করবে না।

হরেন। হ্যাঁ তা জানি, আর একদিন আমি এসেছিলাম, যেদিন জেনে যাই...আমাকে ঢুকতে দেখে সদর দরজা জোরে বন্ধ করে দিয়েছিল...

বিমলা। শোন আমি এখন এ বাড়ীর মালিক, তুমি যদি এখুনি এখান থেকে না যাও, তাহলে আমি পুলিশ ডাকব...

হরেন। আমার জন্যে পুলিসকে ডাকতে হবে না, দরকার হলে তারা আপনিই আসবে···সেজন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। চুলোয় যাক্ ডাকাডাকি—আমায় কিছু খেতে দেবে ?

বিমলা। হ্যাঁ উনেনের ছাই আছে, এক থাল তুলে দেব। খেতে দেবে...

অমলা। আচ্ছা দিদি, তুমি কি! মানুষকে···অমন করে'...

বিমলা। তুই থাম অমি···ওকি মানুষ···

হরেন। শোন, কাল সকাল থেকে আমি কিছু খাই নি···

বিমলা। খাওনি তাতে আমার কি ?

অমলা। কেন দিদি অমন করছ ? দাঁড়াও হরেন—তুমি বোস, আমি খাবার এনে দিচ্ছি···

বিমলা। তোর খাবার কিন্তু থাকবে না।

অমলা। আমি বিধবা, একবেলা না খেলে মরে যাব না...

বিমলা। আচ্ছা বেশ, খাও, খেয়ে শীগ্‌গির শীগ্‌গির চলে যাও, ওর ওঠবার আগে, উঠলে আর রক্ষে থাকবে না।

হরেন। ধন্যবাদ! ওকে যা বসিয়ে দিয়েছ বিমলী গিন্নী, ও আর উঠবে বলে মনে হচ্ছে না।

(অমলা খাবার নিয়ে এসে টেবিলের ওপর দিলে)

অমলা। এস হরেন!

হরেন। ধন্যবাদ।

বিমলা। শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে নাও···বুঝলে···

হরেন। হ্যাঁ—বিমলী-গিন্নী, তুমি যে রকম চালে কথা কইছ, তাতে মনে হয়, দেখছি তোমাকে 'মা' বলতেই হবে। যাক্ ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতেই হবে, দু'দিন না খাওয়ার পর লুচি সন্দেশ বাপের বাড়ীতে মিলল।

যে কারণেই হোক্ দেখছি তোমাকে মা বলতেই হ'ল।

বিমলা। নাও নাও শীগ্‌গির খেয়ে নাও, আর মা ব'লে সোহাগ করতে হবে না...

অমলা। আর দুখানা দিই হরেন...

হরেন। ধন্যবাদ! দাও। আচ্ছা, বাবার কি খুব অসুখ? আমি ক'দিন ধরে দেখছি, ডাক্তার ঘোষ, দু'বার তিনবার করে আসছে।

বিমলা। হ্যাঁ যেদিন তোমার জেল হয়, সেদিন সেই খবর পেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন, পক্ষাঘাতের মতই হয়েছে, বারো দিন কথা বন্ধ হয়ে ছিল—এখন একটা আধটা কথা কইতে পারেন—চলাফেরা করতে একেবারেই পারেন না—এই কদিন বরং, একটু আধটু ধরলে চলতে পারেন, তাও পড়ে যান।

হরেন। (মুখের খাবার দিতে বিষম লাগল। সামলে নিয়ে) হুঁ! তা বাবার ভাগ্য ভাল যে এমন একজন সেবাকারিণী—দয়াবতী সহধর্ম্মিনী পেয়েছেন... হা হা হা হা!

বিমলা। থাক, থাক, আর রসিকতায় দরকার নেই, খাওয়া হল?

হরেন। হ্যাঁ। দেখ, তোমায় আজ একটা কথা বলি।

বিমলা। না, কথা আর বলতে হবে না—পথ দেখ...

হরেন। না, শোন, বাবা তোমায় বিয়ে করেছেন, তোমাকে মা বলতে আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না, আমি এমন ইতরের ছেলে নই যে, বাবার যে স্ত্রী তাকে অবজ্ঞা করব, কিন্তু তুমি, তুমি আমায় অবজ্ঞা করিয়েছ। তোমার ত' ছেলে হয়নি, আমিই ত তোমার ছেলে।

বিমলা। (মাথাটা একেবারে নীচু করে রইল)

হরেন। তুমি আমার মৃতা মার ছবি লাথি মেরে ছিঁড়ে দিলে...আমার মা ত কোন অপরাধ করেনি। আমি তখন ছেলেমানুষ আমার "মা ডাকা" তোমাকে ভোলাতে পারলে না—উঃ! তুমি বাঙালীর ঘরের মেয়ে...

বিমলা। থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে, এখন ওঠ দিকিন্...

হরেন। হ্যাঁ উঠছি,—আমায় গোটাকতক টাকা দাও। এই কাজটা কর, তোমায় বিরক্ত আর করব না।

বিমলা। টাকা নেই, থাকলেও তোমাকে একটা আধলাও দেব না।

হরেন। মা! দেখছি তোমার জিবে কিছুই আটকায় না। ধর আমি যদি বলি যে, আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না।

বিমলা। তাহলে পুলিস ডেকে তোমায় ঘাড় ধরে বার করে দেব—এবাড়ীর মালিক আমি ..

হরেন। তাই নাকি? তা হলে ওই যে বসে রয়েছে—আমিও জানি যে বাড়ীর মালিক ওই।

বিমলা। ভুল ঠাউরেছ। তাকে জাগিয়ে দেখতে পার, সে কি বলে একবার ..

হরেন। তোমার মত মার কুবুদ্ধিতে সে কি বলবে তা আমার জানা আছে।—(উপেনের দিকে অগ্রসর হয়ে) হ্যাঁ, বাপের তুল্য বাপ তুমি।

বিমলা। আর তুমিও ছেলের তুল্য ছেলে—তাই না...

হরেন। (উপেনের দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, বাবা বটে! যখন আমাকে তোমার আশ্রয় দেওয়া উচিত ছিল তখন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করেছ।

বিমলা। তুমি যাবে কি না?

হরেন। গোটা কতক টাকা দিলেই আমি চলে যাব।

বিমলা। তা হলে পুলিস ডাকতে হয়।

হরেন। তাই ডাক, তবে পুলিস আমাকে বিলক্ষণ চেনে ..

(বাইরে দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ)

বিমলা। ওই! দেখ ত অমি! নিশ্চয় রাম মিত্তির মশায় এসেছেন। নাঃ এখুনি ও উঠবে, আর তোমাকে দেখে একটা কাণ্ড করবে। একটা বিশেষ দরকারে তিনি এসেছেন। তুমি যাও না।

হরেন। আঃ...টাকা দিলেই চলে যাব ..

অমলা। তা দাওই না দিদি! সত্যি ওর এত

হরেন। দিলেই চলে যাচ্ছি

বিমলা। কক্‌খনো না—যদি না এখুনি যাও, আমি ওকে ডাকি তারপর···

(মণি ও চাকরের প্রবেশ)

চাকর। মা, মণিবাবু আইচে···মণিবাবু!

বিমলা। এস মণি! এই দেখ কাণ্ড, ওকে যেতে বলছি, তবু যেতে চায় না, আর আমায় জ্বালাতন করে মারছে, এখুনি রাম মিত্তির আসবে। দেখ দিকিনি···

মণি। কি ব্যাপার, তুমি এখানে গোলমাল করছ কেন?

হরেন। প্রয়োজন আছে। তুমি কে?

বিমলা। ও আমার আত্মীয়, বন্ধু···

হরেন। অ! বন্ধু ও বান্ধবী···!

মণি। প্রয়োজনটা তোমার কি শুনি?

হরেন। প্রশ্নটা আমারও ঠিক তাই, তোমার এখানে কি প্রয়োজন···

বিমলা। বার করে দাও না মণি···

অমলা। কি কর দিদি!

মণি। তুমি এখান থেকে যাবে, না ঘাড়টি ধরে বার করে দিতে হবে?

হরেন। তোমাকে আমারও ঠিক ওই প্রশ্ন·

বিমলা। এত বড় আস্পর্দ্ধা, ওগো শুনছ, তোমার—কি করছ মণি—দাও না বার করে, না হয় পুলিস ডাক···

(মণি একটু অগ্রসর হ'ল)

হরেন। খবরদার!

(মণি একটু ভয় পেলে তবু সাহস দেখিয়ে এগিয়ে গেল)

মণি। এত স্পর্দ্ধা...আমায়...

(হরেন অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল নড়লও না)

হরেন। তোমার দ্বারা হবে না, আর কেউ···বলি মাদার! দুটি চারটি আরো এরকম বন্ধু আছে না কি? তাদেরও ডাক। না হয়···

মণি। রেখো! ডাক ত পাহারাওলাকে—দেখাচ্ছি মজা।

হরেন। পাহারাওয়ালা মশায় কি মশায়ের বন্ধু?

মণি। বন্ধু কি না টের পাবে।

হরেন। একটুও কষ্ট করতে হবে না—তারা সবাই আমাকে বেশ চেনে···বরং কষ্ট করে এসেছ, বাবার ঘুম ভাঙা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, আর সেটা যদি সুবিধে মনে না হয়, তা হ'লে কষ্ট করে' ফিরে গেলেও পার। আমি একটু হাত পা ছড়িয়ে সোফাটায় বসি, বুঝলে? অনর্থক···

মণি। এই রেধো, দাঁড়িয়ে রইলি যে—ডাক্ না পাহারাওয়ালা...বল্‌গে বাড়ীতে স্বদেশী গুণ্ডা ঢুকেছে, এখুনি ধরে নিয়ে যাবে—দাঁড়াও এখুনি ট্রেসপাসার বলে চালান দিচ্ছি, গুণ্ডামী করবার জায়গা পাও নি···

রাধু। উও বাপপারে—এখনি মারি-মারা লাগায়ে দিব···

(রাধু চাকর চলে গেল)

হরেন—হ্যালো মাদার! মা বলতে মুখে আটকাচ্ছে—তোমার বন্ধু এ ব্যক্তিটির ক্ষমতা ত' দেখতে পেলে, এখন গোটা কতক টাকা দেবে কি?···

(নলিনাক্ষ মিত্তিরের প্রবেশ)

নলিনাক্ষ। নমস্কার...মিসেস রায়···আপনার এখানে আজ অনেক 'গেস্ট' দেখছি যে···

বিমলা। দেখুন কি মুস্কিলেই পড়ে গেছি, এই লোকটা বাড়ীর ভেতর ঢুকে গুণ্ডামী করছে, বলছে টাকা দাও তবে যাব···

নলিনাক্ষ। কে? ··(মণির দিকে চেয়ে) এই লোকটা···কে তুমি?

বিমলা। না না, ও আমার বন্ধু, ও নয়...

নলিনাক্ষ। তবে?

হরেন। (সোফা থেকে উঠে) আমিই অপরাধী।

নলিনাক্ষ। ও ত' হরেন, ও গুণ্ডামী করছে···হরেন তুমি এ রকম বেহায়া, তোমাকে এরা···

হরেন। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়, মাতৃচক্রে গুণ্ডা বনে গেছি ভাই···

নলিনাক্ষ। তা তোমার এ অবস্থা কেন?

হরেন। কেন জান না বুঝি, গান্ধী মহাত্মার চেলা হয়ে দেশোদ্ধারে গিয়েছিলাম···ইংরেজের জেলে। জেল থেকে ফিরে হয়ে গেলাম দেবতা, আর এখানে বাবার আস্তানায় ঢুকে···খানকতক লুচি খেয়ে গ্যাঁট হয়ে গুণ্ডা বনে গেলাম...আমি হলাম অপরাধী, আমার নিজের বাড়িতে করলাম অনধিকার প্রবেশ! হা হা হা হা···

নলিনাক্ষ। তা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না

হরেন। তোমার বাপ একটা বৈষয়িক কাজে আমাদের অফিসে খবর পাঠান, তা বাবার শরীরটা ভাল নেই, বয়স হয়েছে, তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। তা এখানে এত গোলমাল কিসের···এ লোকটাই বা কে?

হরেন। শুনছি ত উনি মার বন্ধু।

বিমলা। ওঁকে একজিকিউটার করবার জন্যে উনি আসতে বলেছেন, তাই এসেছেন। উনি আমার বিশেষ আত্মীয়।

নলিনাক্ষ। একজিকিউটার করবার কথা ত উপেন বাবু আমাদের জানাননি···তিনি উইলটা বদল করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, তাই এসেছি। আর তাঁর সঙ্গে নিভৃতে সে-কথা কইতে হবে বলে, তিনি রাত্রি আটটার সময় আসবার নির্দ্দেশ করেছেন।

হরেন। আমাকে বিষয় থেকে একেবারে বরবাদ করবার জন্যে এসেছ নাকি নলিন?

নলিনাক্ষ। তা ত বলতে পারছি না এখন···তোমার বাবা তোমাকে বিষয় দেবেন, কি তোমার মাকে দেবেন, কি নিমতলায় বাঁধা ঘাট করে দেবেন..তাত কিছুই বলতে পারছি না। (ঘড়ির দিকে চেয়ে) তা আমার ত বেশীক্ষণ থাকবার উপায় নেই, উনি ত ঘুমুচ্ছেন···মিসেস রায়, আমার প্রয়োজন ওঁর সঙ্গে নিভৃতে দেখা করার, অতএব...ওঁর ঘুম ভাঙাতে হয়, এবং এখান থেকে সকলকে সরে যেতে হয়···

বিমলা। ওঁকে একজিকিউটার করবার...

নলিনাক্ষ। হুঁ! সে পরে দেখা যাবে এখন। ক্লিয়ার আলট ওল্ড চ্যাপ, সরে পড়···(মণির প্রতি) ইউ আর দি ট্রেস্পাসার—ক্লিয়ার আউট, উইল ইউ?

মণি। আমি—আমিও...

নলিনাক্ষ। আগে বেরিয়ে যাও এখান থেকে ..

(বিমলা ভয়ে রাগে ও যন্ত্রণায় দুটো হাত রগড়াতে লাগল।).

বিমলা। ওঁকে আপনি শুধু শুধু অপমান করছেন···

নলিনাক্ষ। আমাদের এই পেশা মিসেস রায়, আমরা অপরাধীকে বাজিয়েই টাকা রোজগার করি...

মণি। আপনি আদেশ দেবার কে?

নলিনাক্ষ। (উঠে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে) শোফার!

(মোটরের ড্রাইভার এসে দাঁড়াল) পুলিস ডেকে একে ধরিয়ে দাও।

শোফার। এস।

নলিনাক্ষ। বেরিয়ে যাও।

মণি। (চ'লে যেতে যেতে) আচ্ছা আমি দেখে নেব, দেখে নেব...(বিমলার দিকে চেয়ে) আমাকে ডেকে এনে অপমান...আচ্ছা।

(প্রস্থান)

বিমলা। মণি! মণি!

নলিনাক্ষ। মিসেস রায় ও মণি এখন থাক, তাহলে আপনার স্বামীকে জাগান—আর হরেন, তুমি তা হলে অন্যঘরে গিয়ে বোস, কেমন?

(ডাক্তার ঘোষের প্রবেশ)

ডাক্তার। আরে নলিন যে, কি খবর। আমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে মিসেস রায়, মিঃ রায় কেমন আছেন? এবেলা একটা জরুরী কল্-এ যেতে হয়েছিল তিনটের সময়। ফিরেও নিষ্কৃতি নেই, তখন আবার দুটো কল্, নিঃশ্বেস ফেলতে সময় পাইনি।

নলিন। আমি বেশী দেরী করব না।

(উপেনের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে গেল)

নমস্কার, এ বেলা কেমন আছেন? খুব ঘুমুচ্ছেন যে, দেখি হাতটা···

[ডাক্তার ঘোষ উপেনের মুখের দিকে চেয়ে, তার হাতটা তুলে ধরে নাড়ি দেখতে গিয়ে হাতটা নামিয়ে রেখে সরে এল]

ডাক্তার। কতক্ষণ এ অবস্থায় ইনি আছেন?

বিমলা। এ অবস্থায়? উনি ত সন্ধ্যে থেকেই ওই রকম ঘুমুচ্ছেন। কেন, ডাক্তার...কি...

ডাক্তার। আর এ ঘুম ভাঙবেনা...মিঃ রায় মারা গেছেন!

হরেন। (লাফিয়ে উঠে) অ্যাঁ! বাবা মারা গেছেন! (কেঁদে ফেললে)

নলিনাক্ষ। মাই গড্! মারা গেছেন?

[বিমলা চীৎকার করে কেঁদে উঠল, 'ওগো আমার কি

সর্ব্বনাশ করে গেলে গো।'...অমলা ছুটে এসে বিমলাকে ধরলে। দিদি! দিদি! কাঁদতে লাগল]

ডাক্তার। মনে হচ্ছে, উনি প্রায় দু'তিন ঘণ্টা হল মারা গেছেন।

নলিনাক্ষ। এসেছিলাম, উনি উইল বদল করবেন বলে খবর পাঠিয়ে ছিলেন...এখন এ ত আশ্চর্য্য ব্যাপার! তা এ অবস্থায় পুলিস ইন্‌কোয়েষ্ট হবে না কি? তা হলে ত—

ডাক্তার। না, আমি এতদিন ধরে ওঁর চিকিৎসা করছি—আমার আজ সকালে সন্দেহ হয়েছিল, আমি এইরকমই আশঙ্কা করছিলাম···ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি।

নলিনাক্ষ। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন···

ডাক্তার। তা ত ঠিক। তোমার এখানে আরো কাজ আছে না কি?

নলিনাক্ষ। হ্যাঁ...এখনি আর যাই কি করে, এদিক-কার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাক্তার। আচ্ছা। আমার আবার আরো একটা কল্ বাকী আছে মিসেস্ রায়। আপনি অমন অভিভূত হবেন না, এ ত আমরা প্রতিদিনই আশঙ্কা করছিলাম···

বিমলা। হ্যাঁ! কিন্তু···

ডাক্তার। থাক্ থাক্, আমি কাল সকালেই আসব এখন, তার জন্যে আর কি? (প্রস্থান)

নলিনাক্ষ। তুমি হরেন তাহলে ওঁর কাছে বোস, আমি এদিককার সব ব্যবস্থা করি···তোমার বাবার যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল···

হরেন। নলিন! আমি সত্যই হতভাগা, আমার জন্যেই, আমার জন্যেই···উঃ···নলিন! আমার জন্যেই বাবার এই···

নলিনাক্ষ। শোন হরেন, তোমার বাবা আগে যা উইল করেছিলেন, সেই উইলই সাব্যস্ত রইল। সম্ভবতঃ তোমরা জান সে উইলে কি আছে।

হরেন। আমি শুনিনি, আর জানিওনি—আমি যতদূর আমার এই মার কাছে শুনেছি তাতে বাবা আমাকে সব বিষয় থেকে একেবারে বঞ্চিত করেছেন···উনিই নাকি মালিক।

নলিনাক্ষ। ঠিক তার উল্টো। সমস্ত বিষয়, বাড়ী ঘর, টাকা কড়ি, সোনা গয়না, মায় সমস্ত আসবাব পত্র, সব তোমাকেই তিনি দিয়ে গেছেন, তোমার মার থাকবার জন্য শুধু তালতলার বাড়ী আর মাসহারা একশ টাকা করে বন্দোবস্ত করে গেছেন, তাঁকে আর কিছুই নয়... এ বাড়ী, ও আর যে পাঁচ খানা বাড়ী, তার মালিক তুমি ···তালতলার বাড়ী তোমার মার জীবন-স্বত্ব—যদি তিনি আবার (গলাটা একটু পরিষ্কার করে) অন্য কোন অবস্থায় যেতে চান, অর্থাৎ যদি পুনরায় বিবাহ আদি সম্পর্কীয় ব্যাপারে লিপ্ত হন, তবে ওই বাড়ী ও মাসহারা পাবেন না—আর যেহেতু অমলা ওঁর ভগ্নী, তোমার বাবার রোগ-শয্যায় অনেক সেবা শুশ্রূষা করেছেন, সে জন্য অমলা যতদিন বাঁচবেন ততদিন একশ টাকা মাসহারা পাবেন, তীর্থধর্ম্ম যদি করেন, তার জন্য যা ব্যয় তা তোমার স্টেট থেকেই দেওয়ায় ব্যবস্থা করেছেন। আমার মনে হয় এর চেয়ে সুব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না।

হরেন। মা বোধ হয় সব কান পেতে শুনেছেন···

বিমলা। হ্যাঁ শুনেছি······

হরেন। ভাল করেই শুনেছ বোধ হয়।

বিমলা হ্যাঁ ভাল করেই শুনেছি······

নলিনাক্ষ। আচ্ছা আমি তাহলে সব ঠিক করি গে। আমি ফিরে আসছি······আমার অপেক্ষা কর······

(প্রস্থান)

বিমলা। এইবার বোধহয় হরেন এখান থেকে যাবে······তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে ত?

হরেন। আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না...

বিমলা। তুমি এ বাড়ীতে ঢোক এ ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁর শেষ ইচ্ছেটা যাতে পূরণ হয় অন্ততঃ সে ব্যবস্থা আমি করব। তাঁর সে আদেশ আমি প্রতিপালন করব।

হরেন। মাদার, সব তা হলে ভাল করে শোননি—অথবা ভুলে যাচ্ছ—শোকটা বড্ড লেগেছে কি না?

বিমলা। কি শুনিনি···

হরেণ। এই বাড়ীটার মালিক এখন আমি। ওই ব্যক্তিটা যিনি তোমার স্বামী ছিলেন, আমার বাবা, সব আমাকেই দিয়ে গেছেন। তোমাকে নয়। এখন এখানের

মালেকানি স্বত্বটা তোমার নয় আমার। যিনি দিয়ে গেছেন, তিনিও আর এর মালিক নন (বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে কটমট্ করে হরেনের দিকে চাইলে) এখন আর আমাকে চোর কিম্বা গুণ্ডা বলে তোমার বন্ধুকে দিয়ে পুলিসে পাঠাতে পারবে না—এখন তুমি এই বাড়ী ছেড়ে যেতে বাধ্য—বুঝলে—

বিমলা। আমি যাব !

অমলা। হরেন, তুমি কি তোমার মাকে এই সময়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে ? এই রাত্রে ?

হরেন। নিশ্চয়ই। তোমাকে যেতে হবে না, হবে তোমার ওই ভগ্নীটাকে যেতে।

বিমলা। আমি কক্ষনো যাব না।

হরেন। যেতে হবে মাদার, বুঝেছ, আমি জোর করেই বাধ্য করব।

বিমলা। এত বড় সাহস তোমার ··

হরেন। সাহসটা আমার চিরকালই ছিল, এবং এখনও আছে। ক্লিয়ার আউট—বেরোও এখান থেকে...

বিমলা। আমি !

অমলা। ও যদি না থাকতে দেয়...তাহলে চল আজ রাত্রের মত···

হরেন। তুমি এখানে চিরকাল থাক এবং থাকবে, কোন আপত্তি আমার নেই, অধিকারও নেই···কিন্তু ওকে আমি থাকতে দেব না।

অমলা। তোমার বাবার দেহ এখন পড়ে, এখনও হয়ত সমস্ত তাপটা নিঃশেষ হয় নি···এই অবস্থায় তোমার মাকে...হরেন তুমি এতখানি নিষ্ঠুর···নিশ্চয় নও।

হরেন। কল্পনা করতে পারবে না মাসি, আমি কতখানি নিষ্ঠুর · কেন হব না, কেন নিষ্ঠুর হব না...ক্ষুধার্ত্ত পথের কুকুরকেও লোকে ডেকে পাতের ভাত দেয়—তার সেই কাতর চোখ দেখে, আর উনি আমার বাপের স্ত্রী··· আমাকে পথের কুকুরেরও অধম মনে করেন···আজ যদি বাপ না মারা যেত, ও আমাকে এখান থেকে মেরে তাড়াত···দুঃখে ঘৃণায় মর্ম্মান্তিক অবস্থায় ক্ষিধের জ্বালায় পাগলের মত নিজের বাড়ীতে এলাম · আর আমার যিনি মা, তিনি কি ব্যবস্থা করলেন···তোমারই ত চোখের সামনে মাসি—

অমলা। কিন্তু এ হতে পারে না হরেন, কেউ কখন শোনেনি যে সৎমাকে পিতার মৃতদেহ পড়ে থাকতে থাকতে তার ছেলে···মানুষের চক্ষু লজ্জা বলেও...

হরেন। ভুল ক'র না মাসি, আমাকে ছেলে বলে যদি উনি স্বীকার করতেন, তাহ'লে আমার ওই বুড় বাপ এমন করে মারা যেত না—এখন বাড়ীর মালিক যে কে সেটা আমি দেখিয়ে দেবো, বুঝেছ মাদার। বেরিয়ে যাও - বেরিয়ে যাও।

বিমলা। চল আমি মণির ওখানেই গিয়ে—

অমলা। না দিদি, মণির ওখানে, আমি যেতে পারব না—শোন হরেন, দিদির বুদ্ধিই যদি থাকবে তাহলে কখন ··

হরেন। না সে হবে না মাসি, বাড়ীর মালিক কে, সেটা আমি দেখিয়ে দেবো...

বিমলা। কথা-কাটাকাটির দরকার নেই......চল, রাস্তায় দাঁড়াতে হয় সেও ভাল, তবু এখানে আর নয়... আচ্ছা হরেন, তুমি বাড়ীর মালিক···

হরেন। হ্যাঁ, কাল ছিলাম ভিখারী, আজ লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক...এতগুলো বাড়ীর মালিক, বুঝেছ মা !

অমলা। হরেন ! তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই, তুমি মাকে···

হরেন। বাপের মৃত্যুতে এতবড় বিষয়ের মালিক হ'লে, কারো কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে না কি ··থাকে না ত .. মাসি...বুঝেছ মাসি, এইবার আমি দেখে নেব।···হাঁ- এখনও ইতস্ততঃ করছ, না আমি শুনব না, শুনব না,— কিছুতেই শুনব না...

অমলা। শুনতেই হবে...শুনতেই হবে···কিছুতেই তুমি তোমার মাকে এ বাড়ী থেকে এ রাত্রে তাড়াতে পারবে না···

হরেন। কে আমার মা, ও আমার মা নয়...

বিমলা। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, রাধু—রাধু, একখানা গাড়ী ডাক ত···

[ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একটা হাত বাক্স নিয়ে এসে, তাড়াতাড়ি যাবার ভঙ্গীতে আবার ফিরে এল।]

হরেন। ও বাক্স নিয়ে যাচ্ছ কোথায়, ওতে আমার

মার গায়ের গয়না আছে···ওটা রেখে তবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও...তালতলার বাড়ীতে বাস, আর উইলের একশ টাকা ছাড়া এক কপর্দ্দক এখান থেকে তুমি নিয়ে যেতে পাবে না...

অমলা। ছিঃ ছিঃ হরেন—কি করছ, যত দোষই করুক তোমার বাবা, ওকে তোমার মার আসনেই বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

হরেন। তোমায় ত কিছু বলিনি মাসি—তুমি লোহার সিন্দুকের চাবি নাও, যা করতে হয় কর, যাকে যা দিতে হয় দাও—দু'হাতে খরচ কর, বিলিয়ে দাও, নষ্ট কর, অপচয় কর, কোন কথা বলতে পারব না, কোন কথা বলবার ক্ষমতা বাবা আমায় দিয়ে যান নি, কিন্তু ওকে—ওকে—না—না—কিছুতেই না।

অমলা। আর ওকেই কি কটু কথা বলার অধিকার দিয়ে গেছেন?

হরেন। না—তা নিশ্চয়ই দেননি। কিন্তু মায়ের যে আসন, সে সিংহাসনের ও অমর্য্যাদা করেছে। যে অধিকার মানুষ সহজে পায় না, সেই অধিকার তুমি পেয়েছিলে, তুমি আমার মার রূপে এই বাড়ীতে পা দিয়েছিলে, তুমি হেলায় তা অবহেলা করেছ ···যে শব্দে ত্রিভুবনের দৈত্য-দানব সংযত হয়, সে শব্দকে তুমি অকারণ বিষের জ্বালায় কানে শুনতে পাওনি······ তুমি নিঃসন্তানা হয়ে সন্তান পেয়েছিলে—তাতে তোমার মন ওঠেনি, নইলে তুমি আমার মা, আমি শিক্ষিত ছেলে, মা কি বস্তু তা আমি জানি না? যাও মাসি, মাকে ও-ঘরে নিয়ে যাও। একদিন রাগে দিকবিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে তোমাকে চাবুক মারতে গিয়েছিলাম, আমার ওই বাপ তা আটকেছিল, আর আজ তোমার কতখানি দুর্ভাগ্য মা, যে, ভগবান সেই চাবুক বাবার হাতদিয়ে আরো নির্ম্মম হয়ে তোমাকে আঘাত করলে, বুঝতে পারলে মা—যাও-যাও মা ও-ঘরে, আমায় একটু একলা থাকতে দাও, অনেক কটু কথা তোমায় আজ বলেছি; ছেলে বলে মার্জ্জনা কর'......যাও, মাসি, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও ও ঘরে...··

বিমলা। (কাঁদতে কাঁদতে) হরেন! হরেন! বাবা!

হরেন। অনেক হয়েছে, আর আমায় কাঁদিয়ো না, দোহাই তোমার, যাও-যাও ও-ঘরে যাও······সংসারের আমি কিছুই জানি না—তুমি সত্যি মায়ের মত সংসারের ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে তোমার দু'খানা ডানা দিয়ে বাঁচিয়ো আমায়······

[বিমলা কাঁদতে কাঁদতে মুখে আঁচল ঢাকা দিয়ে উঠল, অমলা তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।]

হরেন। বাবা! বাবা!

[উপেনের মৃতদেহের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। ঘরের আলোটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে বড় জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে উপেনের মৃত দেহের ওপর পড়ল। হরেন তা দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠল···মা! মা!]

(বিমলা ও অমলা ছুটে পাশের ঘর থেকে এল)

হরেন। মা! মা!

বিমলা। কি, কি বলছ বাবা! কি! কি! অমন করছ কেন?

হরেন। মা! আমায় ক্ষমা কর মা, সব অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি বাড়ির মালিক নই মা, তুমি! তুমি!··

(বিমলার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। বিমলা মাটীতে বসে পড়ে হরেনের মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগল)

বিমলা। ওঠ্, বাবা, ওঠ্! আর আমাকে নতুন করে কাঁদতে শেখাস নি······এতবড় দুঃখর মধ্যে এ আনন্দ আমি সহ্য করতে পারছি না হরেন!·····

[চাঁদের আলো জানালা থেকে ক্রমে সরে গেল। কক্ষ অন্ধকার হয়ে গেল।]

[যবনিকা পতন]

[পাশ্চাত্যের একাঙ্ক নাট্যের দু-একটা ডাল ও পাতা এই নাটকের আখ্যান বস্তুতে নেওয়া হয়েছে।]

বেঙি

শ্রীঅমলেন্দু বাগচি

বেঙি আমার খুড়তুতো ছোট বোন। তাহার বয়স ছয় বৎসর। বড়রা যে কেহ একটু আদর করিলেই গলিয়া যায়। কিন্তু কেহ আদর করে না। সে তাহার সমবয়সী আর সকলের মত বেশ-ভূষা ধরণ-ধারণে মার্জ্জিত হইয়া থাকে না। তাহার খাওয়া-পরা-থাকার কোন ঠিক ঠিকানা নাই, আপন খেয়ালে চলে। তাহার মা কন্যা-রত্নে গর্ব্বিতা এবং কন্যার পারিপাট্যের প্রতি অমনোযোগ-শালিনীও নহেন। কিন্তু সে তাহার অগ্রজাকে লইয়া। তাই বেঙিকে মাঝে মাঝে কাঁদিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে দেখা যায় ;—দিদির মত তাহারও কোন শাড়ী বা স্নো বা পাউডার হইল না কেন, এই সমস্যাটা তাহাকে প্রায় উৎপীড়িত করে। আমাদের বাসায় তাহার যৎসামান্য মর্য্যাদা এইটুকু যে তাহাকে লইয়া সবাই কৌতুক করিবার সুযোগ পায়।

ইদানীং অমঙ্গল আশঙ্কার প্রচণ্ড বিষম খাইয়া আমরা আমার খুড়তুত চার বছরের ছোট ভাইকে কঠিন জ্বর-রোগের আক্রমণ হইতে ফিরিয়া পাইয়াছি। বলা বাহুল্য, এখন সে ক্ষীণ-জীবী এবং সকলেরই সাবধান মনোযোগের বিষয়। তাহার সামান্য ক্রন্দনের শব্দ পাইলেই আমরা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসি, এবং সে-ও এখন সামান্য কারণেই উত্যক্ত হইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

আজ সকালে সে একবার কাঁদিয়াছিল। আমরা সকলে কাকার ঘরে ছুটিয়া গেলাম। বেঙি অপ্রতিভ ভাবে সকলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেছে। ঘরে সে-ই ছিল। নিশ্চয় সে কিছু করিয়াছে যাহাতে ভাইটির কষ্ট হইয়াছে। বেঙিকে আশ্রয় করিয়া আরম্ভ হইল অবিশ্রান্ত তর্জ্জন গর্জ্জন। আমি তাহার কান ধরিয়া এক চড় কসিলাম। তারপর ভাইটির নিকটে গিয়া আদর করিয়া কহিলাম, "কি হয়েছে বল।"

ক্রন্দনরত ক্ষীণ শিশু জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল, বেঙি তাহার কপালে মাটি লাগাইয়া দিয়াছে।

দেখিলাম, তাহার কপালে ধূলা লাগিয়া আছে।

পুনরায় বেঙির উপর আক্রমণ চলিল।

এমন সময় বেঙির সম-বয়সী পাশের বাড়ীর টুনি কহিয়া উঠিল :

"না—, আমরা কালীবাড়ীর ওদিকে গিয়েছিলাম, বেঙি সেখান থেকে কালীমণ্ডবের ধূলো এনে তাই ওর কপালে লাগিয়ে দিয়েছে।"

বেঙি অত গালাগালি এবং মার খাইয়াও এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এইবার হাতের উল্টাপিঠ দিয়া চোখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।



রবীন্দ্র রচনাবলী

শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের রচনার ধারা স্বভাবতই তাঁহার জীবনের ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং নূতন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা নব নব রূপে নানা বাঁকে মোড় ফিরিয়াছে। অল্প পরিসরের মধ্যে বালক কবির সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পর্ব্বের মধ্যে দিয়া তাঁহার কবি-জীবনের অভিব্যক্তি ও তার পরিণতির সম্পূর্ণ রূপটি জানিতে পারিলেই কবির রচনার আদর্শ প্রস্ফুট হইয়া ওঠে এবং তাঁহার জীবনের মূল সত্যটিকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়। কবির সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির অধ্যক্ষেরা, রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন ক্রমে, তাঁহার সমগ্র বাংলা রচনা একত্র করিয়া ধারাবাহিক ভাবে সাজাইয়া ছাপাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন অনুসারেই এই রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি সাধারণ ও একটি শোভন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে চারিটি ভাগ থাকিবে, যথা :—(১) কবিতা ও গান (২) উপন্যাস ও গল্প (৩) নাটক ও প্রহসন (৪) বিবিধ প্রবন্ধ।

রচনাগুলি মোটামুটি গ্রন্থাকারের প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত প্রথম খণ্ড আগামী আশ্বিন মাসের প্রথমেই প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে এবং প্রতি দুই মাস অথবা তিন মাস অন্তর এক-একটি খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এইরূপে প্রায় পঁচিশটি খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা একত্রে গ্রথিত হইবে। প্রতি খণ্ডে ৬২০ হইতে ৬৬০ পৃষ্ঠা থাকিবে এবং কাগজ ও বাঁধাইয়ের তারতম্য অনুসারে মূল্য হইবে ৪॥০ ৫॥০ ও ৬॥০ টাকা। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত ও শোভন কাগজে মুদ্রিত পরিমিত সংখ্যক চামড়ার বাঁধাই প্রতি খণ্ডের দাম হইবে ১০ টাকা।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি বিশেষ আকর্ষণ হইবে ইহার আঙ্গিক সৌষ্ঠব এবং চিত্রসম্ভার। ইহাতে থাকিবে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব নানা ফোটোগ্রাফ; অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি কর্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও পুস্তক চিত্রণ, রবীন্দ্রনাথের রচনার পাণ্ডুলিপি এবং কবির অঙ্কিত চিত্র।



পুস্তক পরিচয়

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার

উপন্যাস। লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, প্রকাশক কাত্যায়নী বুকষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-জমিদার-পরিবারকে উপলক্ষ করিয়া লেখক সমগ্র বাংলাদেশের একটি গৌরবময় যুগের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। যুগটিকে অবশ্য নিছক গৌরবময় বলিলে ভুল করা হইবে। সেই গৌরবের সঙ্গে সেই যুগের বাংলাদেশের লজ্জাকর পতনের ইতিহাসও জড়িত হইয়া আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ইতিহাস নহে, নভেল। এবং যে যুগের পটভূমিতে গল্পটি স্থাপিত সেই যুগে বাংলাদেশের জমিদারদের উত্থান এবং পতন কেমন করিয়া সাধিত হইয়াছিল ইহা তাহারই একটি অপরূপ চিত্র।—বাংলার জমিদার কেমন করিয়া জমিদার হইয়াছিল, কেমন করিয়া কলঙ্কের সহজ পথে জমিদার-শক্তির সংহতি ঘটিয়াছিল, এবং কেমন করিয়া সেই সহজলব্ধ ক্ষমতা অসহিষ্ণুতার অতি-চাঞ্চল্যে বিধ্বস্ত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ইহা তাহারই কাহিনী।

কিন্তু শুধু কাহিনী বা নভেল বলিয়া এক কথায় এই গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। গ্রন্থখানির রচনা-কৌশল একটি বিরাট সৌধরচনার কৌশলের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই সৌধের জন্য যত উপকরণ প্রয়োজন, তাঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া সৌধের সুদৃঢ়, সুসমঞ্জস, অনবদ্য পরিণতির রূপ আছে এই গ্রন্থে। সেইটিই জমিদারি-সৌধের ধ্বংসের রূপ।

বহু চরিত্র আছে যাহারা একে একে গাঁথুনিকে উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া সমগ্র কার্য্যফলকে আর্কিটেক্‌চারের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। প্রধান চরিত্রগুলি ইহাকেই আশ্রয় করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য তাজমহলের সূক্ষ্ম জালি-কাজ এবং সূক্ষ্মতর মোজেইক নহে, ইহার মধ্যে কোন বিশেষ লোককে লইয়া মনস্তত্ত্বের কুহেলি সৃষ্টি নাই, চরিত্রগুলি অত্যন্ত সহজ, সরল, যেন গ্রীক স্থাপত্যের উদার মহিমায় মণ্ডিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু চরিত্রগুলিকেই কাহিনীর প্রধান বলিলে ভুল করা হইবে। ইহারা যে কালের মধ্যে স্থাপিত সেই কালের আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক ইহাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। আমরা নভেল বলিতে সাধারণত যে দুর্ব্বল সেন্টিমেন্টের উপর প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত সাবধান-পদবিক্ষেপে-চলা নরনারীর হৃদয়ের ক্ষীণ ঘাতপ্রতিঘাতের মোলায়েম কাহিনী বুঝি—জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার তাহা হইতে বহু উর্দ্ধে হিমালয়ের আভিজাত্য এবং বলিষ্ঠতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইহাতে যে প্রেমের কাহিনী আছে, যে ঈর্ষা আছে, যে আঘাত-প্রত্যাঘাত আছে, যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ইহাতে বহিয়াছে, যে অশ্রু ঝরিয়াছে, যে অট্টহাস্যে ইহার শূন্য কক্ষ শিহরিয়া উঠিয়াছে তাহা যেন সে-সময়ের সমগ্র বাংলাদেশের প্রেম, ঈর্ষা, আঘাত-প্রত্যাঘাত, নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং অট্টহাস্য।

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার মহাকাব্য। মহাকাব্যের সমস্ত মহিমা এবং বর্ণাঢ্যতায় এই কাহিনীটি উজ্জ্বল। ইহা রামধনুর বর্ণ নহে, ইহাতে যে বর্ণ আছে তাহা একাধারে প্রভাত-সূর্য্যের স্বর্ণাভ বর্ণ, প্রখর মধ্যাহ্নের দীপক রাগ আর সন্ধ্যাকাশে দিবসের চিতা-বহ্নির রূপ। আলোহীন আকাশে ঝঞ্ঝার প্রলয়ঙ্কর রূপেরও অভাব নাই। এই প্রলয়ের রূপের উপরেই গ্রন্থের প্রধান ভিত্তি।

ইহার ভিতর বাংলা দেশের খণ্ড চিত্র যে কত আছে এবং সেই চিত্র দেখাইবার জন্য লেখক পাঠককে যে ভাবে, যে অপরূপ ভাষায় প্রস্তুত করিয়াছেন, যে চিন্তার বিদ্যুৎ-

আঘাতে পাঠকের অলস চিন্তাকেন্দ্রকে সচকিত করিয়া জাগাইয়া দিয়াছেন সেই ভাষায় এরূপ চিন্তাশীল লেখক বর্ত্তমান যুগে কমই আছেন। মনে হয় যেন বঙ্কিমচন্দ্রের টেকনীক লেখক সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন।

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে চলন বিলের যে বর্ণনা আছে, পলাশীর যুদ্ধের যে চিত্র আছে, জমিদারে-জমিদারে লড়াইয়ের যে রূপ আছে তাহা ভাষাচিত্রের দিক দিয়া অভিনব। বঙ্কিমচন্দ্রের পর প্লট পরিকল্পনারও এরূপ বলিষ্ঠ চাতুর্য্য অন্য কোন লেখকের মধ্যে দেখি নাই।

ইহা এক-নিশ্বাসে শেষ করিবার মত বই নহে। শান্ত এবং সুস্থির মন লইয়া পড়িতে হইবে—চিন্তা করিয়া পড়িতে হইবে, এবং পড়িতে পড়িতে থামিয়া চিন্তা করিতে হইবে। গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে এইভাবে পরিচিত হইয়া গেলে সমুদ্রের প্রথম ঢেউগুলি উত্তীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত জলে নিশ্চিন্ত মনে ভাসা যাইবে। তবে ভয় হয় ক্ষীণজীবী পাঠক হয়ত প্রথম দিকেই ডুবিয়া যাইতে পারেন। —প

শ্রীমধুসূদন

নাটক। লেখক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ("বনফুল") প্রকাশক ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা বারো আনা।

ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক মহাপুরুষদের জীবনী ভিন্ন কোন বৈজ্ঞানিকের, সাহিত্যিকের বা শিল্পীর জীবনী লইয়া বাংলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে কোন নাটক লেখা হইয়াছে কিনা জানি না। বর্ত্তমান সিনেমার কৃপায় আমরা বিদেশীয় সাহিত্যিক বা শিল্পীর জীবনী নাট্যাকারে অভিনীত হইতে দেখিতেছি। এমিল জোলা, লুই পাস্তোর, রেমব্রাণ্ট, ব্রাউনিং, বেটোফেন প্রভৃতি কয়েকজন মনীষীর জীবনী-নাট্য আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু আমরা যত কিছু নাটক দেখি বা পড়ি তার সবগুলিই ত আসলে কোন না কোন লোকের জীবনী।

কিন্তু জীবন-নাট্য এবং জীবনী-নাট্যে প্রভেদ আছে। জীবন-নাট্যে জীবনটা গড়িয়া তুলিবার (বা নষ্ট করিবার) হাত থাকে নাট্যকারের। নাট্যকার কোনো রেফারেন্স বই না খুলিয়াও এ কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু জীবনী-নাট্যের এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে।

যথার্থ জীবনী-নাট্যকে বলা যায় ডকুমেণ্টারি অথবা পীরিয়ড ড্রামা। অর্থাৎ জীবনের আনুষঙ্গিক যে সব ঘটনা, তাহার ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য বজায় রাখিয়া সেই ঘটনা-গুলি উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। অর্থাৎ সত্যের এবং তথ্যের ভিত্তিতে নাটকীয় প্লটটি খাড়া করিতে হয়। এই উপলক্ষে নাট্যকার স্বয়ং কিছুকাল ঐতিহাসিকের ভূমিকা অভিনয় করেন।

বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক বা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে লইয়া অনেক নাটক রচিত হইলেও কবি বা শিল্পীকে লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন নাটকই রচিত হয় নাই। চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি অবশ্য হইয়াছে, কিন্তু ঐ সব নাটকের রোমাণ্টিক মূল্য থাকিলেও ডকুমেণ্টারি মূল্য কিছু নাই। কাজেই কবি 'বনফুল' কবি মধুসূদনের নামে প্রথম এই কার্য্যটি করিলেন।

মধুসূদনের জীবনটাই নাটক। সংসারে যে চতুর লোকটি সারা জীবন অভিনয় করিয়া কাটায় তাহাকে আমরা বলি স্বাভাবিক মানুষ। আর যে লোকটি নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে এবং নিজের বিশ্বাস মত কাজ করিতে কোন বাধাকেই বাধা বলিয়া মনে করে না, নিজের সারল্যে ঝড়ের মত সোজা পথে চলে, তাহাকেই বলি আমরা অভিনেতা। এবং তাহার জীবনকেই বলি আমরা নাটক। এই নাটক হইতে নাটক লেখাই কঠিন।

সুতরাং শ্রীমধুসূদন-লেখক এই জীবনীনাট্যখানি রচনা করিতে বসিয়া খুব যে আরাম বোধ করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। তিনি হইয়াছেন একাধারে তথ্যসংগ্রাহক, গবেষক, ঐতিহাসিক এবং নাট্যকার, কারণ বাংলা ভাষায় কোন বিখ্যাত লোকেরই পূর্ণাঙ্গ জীবনী নাই। সে জন্য নানা স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ এবং সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া নাট্যরচনা, এই উভয়বিধ কাজ নাট্যকারকে করিতে হইয়াছে। ফলে নাটকে সংগৃহীত তথ্যের কতখানি রাখিবেন এবং কতখানি ছাড়িবেন এ দ্বন্দ্ব যে তাঁহার হয় নাই এমন কথা বলা যায় না। তবে তিনি যে বুদ্ধি করিয়া মধুসূদনের সাহিত্যজীবন-বিকাশের পথে, যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার মুখ্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকে

এই নাটকে প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন এবং ইহাতে নাটক খানির স্টেজ-অভিনয় আশাও যে তিনি ঐ সঙ্গেই জলাঞ্জলি দিবার সাহস দেখাইয়াছেন ইঁহাতে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়।

কারণ এ-জাতীয় নাটক অত্যন্ত 'পপুলার' না করিলে সেদিক দিয়া চলে না। অভিনয়ের আশা না রাখিয়া অথবা তাহা সুদূর ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিয়া তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের একটা ধারাবাহিক অভিব্যক্তির চিত্র তৎকালীন আব-হাওয়ার মধ্যে স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার সকল প্রয়াস সফল হইয়াছে। যাঁহারা মধুসূদনের জীবনের সঙ্গে এবং তৎকালীন বাংলা সমাজের সঙ্গে অনায়াসে পরিচিত হইতে চাহেন তাঁহারা শ্রীমধুসূদন পাঠ করুন। কারণ এই নাটকে মধুসূদনের ঝঞ্ঝাধর্ম্মী জীবনের আরম্ভ, প্রকাশ এবং তাহার শোচনীয় পরিণামের কথা সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেবল পটভূমি, বিস্তৃত কাল এবং ক্ষেত্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অভিনয়োপযোগী নাটক অপেক্ষাও পাঠ্য নাটক হিসাবে বইখানি উপাদেয় এবং বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে।

আর, যদি কেহ মধুসূদনের জীবনী-নাট্য স্টেজে দেখিতে চান তিনি "বনফুল"কে বলুন তিনি যেন তাঁহার শ্রীমধুসূদনের যে-কোন একটা অংশ লইয়া পুনরায় আর একখানা রোমান্টিক নাটক লেখেন তাহা হইলে তাহা এখনই অভিনীত হইতে পারিবে।

"আমার বিশ্বাস য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানাদিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল পূর্ব যুগের অজগর নিদ্রা থেকে। বুদ্ধির সর্বজনীনতা, দৃষ্টির সর্বব্যাপকতা, সর্ব মানবের পরিপ্রেক্ষণিকায় মানবত্বের উপলব্ধি বাংলাদেশেই রামমোহন রায়ের মতো মহামনীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হোলো। আচার, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাংলাদেশেই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠল বাংলাভাষা, তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নব যৌবন সঞ্চারে, সাহিত্য দেখা দিতে লাগল অভূতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে, পৃথিবীর আদিযুগে যেমন করে দ্বীপ উঠেছিল সমুদ্রগর্ভ থেকে, নব নব প্রাণের অন্নদায়িনী আশ্রয়ভূমি হয়ে। চিত্রকলা বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন ক'রে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতা লাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণচারণ চক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হোলো। গীতকলা আজ এই বাংলাদেশেই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটিয়ে কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার ক'রে নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে, তার আশুফলের বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন, নব নবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তিকামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হোতে পারে। প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না, যতদূর থেকেই আহ্বান আসুক, নব যুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায়নি, বাংলাদেশের এই গৌরব এবং এই তার সত্য পরিচয়।"

(মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে অভিভাষণ হইতে) —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সম্পাদকীয়

গত শতাব্দীর অর্থাৎ ইংরেজ আমলের বঙ্গসাহিত্য যে পলিটিক্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত তাই প্রমাণ করবার জন্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্প্রতি একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লিখেছেন। একথা যে ষোল আনা সত্য তার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি গতযুগের বঙ্গসাহিত্য থেকে নানা কথা উদ্ধার করেছেন।

কবিরা, কথাকাররা লিখতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সব কথা সব সময়ে পাঠকসমাজের মনে ধরে না। কিন্তু এঁদের অনেক কথা সেকালের শিক্ষিত সমাজের যে মনের কথা, তা আমি আমার ছেলেবেলাকার অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। আমার বয়েস যখন সবে ছয় পেরিয়ে সাতে পড়েছে তখন আমার গুরুজনরা আমাকে রঙ্গলালের তুটি-একটি পদ্য মুখস্থ করিয়েছিলেন; কারণ কর্ত্তাদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে সেগুলি আমাদের আবৃত্তি করতে হত। আজও তার তুএক লাইন মনে আছে। যথা :—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।"

আর "বাদলের বারিধারা প্রায়
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।"

আমি স্বাধীনতা-হীনতায় আজও বেঁচে আছি, কিন্তু মনের সুখে নয়। আর বাদলের মত বালক কখন ছিলুমও না, হইও নি।

তারপর হেমচন্দ্রের "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে" কবিতা কার না কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছিল? "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়" এ কথা শুনে সেকালের ছেলেরাও অনেকেই চমকে উঠেছিল; যদিও—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

এ বাণী শুনে সেকালে আমাদের হাসি পেত। সেই অল্প বয়েসেই আমাদের মনে হ'ত যে ভারতকে জাগাবার ভার মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে পুরুষরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোবে এ এক অদ্ভুত প্রস্তাব।

নবীনের "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য না হোক, "পেটিওট্রিজম্-এর প্রপাগাণ্ডা। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণের" অভিনয় আমি সাত বৎসর বয়েসে দেখেছি; এবং তা দেখে আমাদের আত্মসম্মান এত ক্ষুণ্ণ হয় যে আমি, ও আমার অগ্রজ থিয়েটার করব স্থির করি। আর সেই সময়েই "শরৎ সরোজিনী"

নামে একখানি অধুনা-বিস্মৃত নাটকের অভিনয় দেখি। নাটকটি সম্ভবত অতিশয় খেলো, কিন্তু ঘোর সিডিশাস্। আর আমাদের ইকনমিক দুর্দ্দশার বিষয় সেকালের কবিরা যে উদাসীন ছিলেন তা নয়। আমার বয়েস যখন আট বৎসর তখন—

"দিনের দিন সবে দীন
হ'য়ে ভারত পরাধীন।"

এই কবিতাটি শুনি।

আমি বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করলুম না এই জন্যে যে তাঁদের সাহিত্য যে দেশানুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত তা কে না জানে? তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা যা করেছিলেন তা সবই "হতাশের আক্ষেপ"। এঁরা দুজনে যা করেছেন তা বৃথা আক্ষেপ নয়, জাতীয় আত্মশক্তি উদ্বোধনের বাণীর প্রচার।

উপরোক্ত যত লেখকের নাম করেছি তাঁরা সকলেই 'মিড্-ভিক্টোরিয়ান' যুগের কবি। এবং এঁদের সকলের উপরেই আমাদের নব শিক্ষার প্রভাব ছিল। কিন্তু গত শতাব্দীর প্রথমেই বাঙলার অদ্বিতীয় মনীষী রামমোহন আমাদের পরাধীনতার বিষয় সম্পূর্ণ সচেতন হয়েছিলেন, এবং দেশের লোককে এ বিষয়ে সজাগ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সকল কর্ম্ম ও চিন্তার মূলে ছিল পরাধীনতা থেকে মুক্তির বাণী। রামমোহনের জ্ঞান ও কর্ম্মের সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত নই, যদিচ তাঁর প্রদর্শিত মার্গই আমরা অবলম্বন করেছি।

যে বিলেতি শিক্ষা আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছে, রামমোহনই সে শিক্ষার প্রবর্ত্তক। বের্গসঁ যাকে বলেন elan vital, বাঙালী জাতির সেই প্রাণের নবস্ফূর্ত্তি রামমোহন প্রথমে আনেন, এবং সেই প্রাণবস্তুতে তিনি আমাদের মনোবস্তুকে অনুপ্রাণিত করেন। ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের কাজই হচ্ছে যুগে যুগে জাতিকে মুক্তি-পথে অগ্রসর করে দেওয়া। আর রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রধান কর্ত্তব্যই হচ্ছে রাজশাসনকে সুশৃঙ্খলিত করা। এক কথায়, অ্যাড্মিনিষ্ট্রেশনের এমন ব্যবস্থা করা যা লোকের মনোমত ও গ্রাহ্য। এই অ্যাড্মিনিষ্ট্রেশন্-এর যাঁরা মেরামত করতে ব্রতী আমরা তাদের পলিটিশিয়ান বলি। মিড্-ভিক্টোরিয়ান যুগের লেখকরা অনেকেই ঘোর পেট্রিয়ট ছিলেন কিন্তু কেউই পলিটিশিয়ান ছিলেন না। তাঁরা অধীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, স্বজাতির কাপুরুষতার জন্য তাঁদের ধিক্কার দিয়েছেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন কিন্তু অ্যাড্মিনিষ্ট্রেশন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি।

যে দিন কংগ্রেসের জন্ম হ'ল সেই দিন থেকেই দলে দলে পলিটিশিয়ান আবির্ভূত হন। পুরোনো কংগ্রেসের ইতিহাস পড়ে দেখবেন আগাগোড়া অ্যাড্মিনিষ্ট্রেশনের কথা।

রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টে যে সাক্ষী দিয়েছিলেন তাকেই কংগ্রেসের মূল খসড়া বলা যায়। তিনি সেকালে অ্যাড্মিনিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা ছকে দিয়েছিলেন, তাই কংগ্রেসের আদি দলিল। প্রথম প্রথম আমরাও কংগ্রেসের মহা ভক্ত হয়ে পড়েছিলুম। কারণ সেকালে কংগ্রেসের মুখে স্বাধীনতা কথাটা উহ্য থাকলেও সকলের মনে মনে তাই ছিল। অন্ততঃ আমাদের বাঙালীর পক্ষে একথা সত্য। এ কথা যে নিঃসন্দেহ তা বাংলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড জেট্ল্যাণ্ডও বেদান্ত এবং সি-আই-ডি রিপোর্ট পড়ে আবিষ্কার করেছিলেন। ("হার্ট অব্ আর্য্যাবর্ত" দ্রষ্টব্য।)

পুরোনো কংগ্রেসের অন্তরে এই মতদ্বৈধ থাকায় সুরাটে সে কংগ্রেস ভেঙে গেল, অর্থাৎ পলিটিক্সের দক্ষিণমার্গ ও বামমার্গ স্পষ্ট বিভক্ত হয়ে গেল বাঙালীর স্বদেশী মনোভাবের প্রচণ্ড ধাক্কায়। বাঙালী যে বামমার্গের প্রতি ঝুঁকল তার কারণ বাংলা সাহিত্য তাদের হৃদয়াবেগের চর্চ্চা করতে শিখিয়েছিল। সে যুগের সাহিত্য এই মনোভাবকেই প্রশ্রয় দিয়েছিল।

তারপর হ'ল ইউরোপের মহাযুদ্ধ। রাশিয়া নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে তুলল, টল্‌স্টয়ের মতানুসারে নয়, সে মতকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান ক'রে। তার পরেই গান্ধী এ নির্জ্জীব কংগ্রেসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন শুনতে পাই টল্‌স্টয়ের মতানুসারে, এবং গান্ধীজি মহাত্মা ব'লে গ্রাহ্য হ'লেন। মহাত্মাজির মতামত আমি কোন কালেই অঙ্গীকার করতে পারিনি। কিন্তু একথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে তিনি কংগ্রেস নামক সমিতিকে একটি বিরাট 'অর্গ্যানিজেশন' ক'রে তুলেছেন। সত্য কথা বলতে গেলে স্বয়ং গান্ধীই হচ্ছেন বর্ত্তমান কংগ্রেস। এর কারণ মহাত্মার মতামত নয়, তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল। তিনি নিজের মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন এবং তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক পুরুষ। বুদ্ধির চাইতে বিশ্বাসের বল যে কত বেশি তা তিনি প্রমাণ করেছেন। আর এতেই তাঁর মহাত্মা নাম সার্থক হয়েছে। বছর সাতেক আগে জনৈক বাঙালী কংগ্রেসের দলপতি বলেছেন মহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন 'মিষ্টিরি ম্যান'। আজও তিনি তাই রয়েছেন।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে বাঙালীর পলিটিক্সের পিছনে আছে বাঙালীর পেট্রিয়টিজ্‌ম, আর বাঙালীর পেট্রিয়টিজ্‌ম-এর পিছনে আছে গত যুগের বঙ্গসাহিত্য। সুতরাং যেসব প্রদেশের পিছনে এ-জাতীয় সাহিত্য নেই সেসব প্রদেশের পলিটিক্যাল মনোভাব ও বাঙালীর মনোভাব সম্পূর্ণ একজাতীয় নয়। সুতরাং কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানের অন্তরে যে ফাট দেখা দিয়েছে তাতে চমকে ওঠবার কোনও কারণ নেই। এর ফলে বর্ত্তমান কংগ্রেস টুকরো টুকরো হবে, কি বেমালুম জোড় লাগবে তা বলতে পারিনে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস এ কংগ্রেস ভাঙবে না। সেকালের কংগ্রেসের সঙ্গে এ কংগ্রেসের প্রধান প্রভেদ এই যে পুরোনো কংগ্রেসের পিছনে জনমত ছিল না, এ কংগ্রেসের পিছনে তা আছে। মহাত্মা গান্ধী আজও জনগণমনঅধিনায়ক।

আমাদের শাস্ত্রে বলে যে পরিবর্ত্তনের ধারা তিনটি, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপর্য্যয়। ইভোলিউশনে হ্রাস-বৃদ্ধির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বিপর্য্যয়ের হিসেব পাওয়া যায় না। যুদ্ধ অনেক সময় সমাজের ও মানুষের মনে বিপর্য্যয় ঘটায়। বিপর্য্যয়ের হিসেব নেই, অতএব তার সন্ধান রোকড় খতিয়ানের ভিতর পাওয়া যায় না। ইউরোপে আবার আর একটি কুরুক্ষেত্র আসন্ন। এখন তার উদ্যোগ-পর্ব্ব চলছে। সেকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বন্ধ করতে পারেননি, একালের যুদ্ধও মহাত্মা গান্ধীও বন্ধ করতে পারবেন না তাঁর শান্তিবচন পাঠ ক'রে। কারণ 'গোরা' না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। আর বলা বাহুল্য যুদ্ধের ফলাফলের উপর শুধু ইউরোপের নয়, এশিয়ারও ভাগ্য নির্ভর করছে। এশিয়া ও ইউরোপ আজ একই পলিটিক্যাল ও ইকনমিক জালে জড়িত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কালিকা প্রেস লিঃ ২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
... নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ হইতে প্রকাশিত।